বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

মাহবুবুল আলম

লেখকের সাহিত্য বিষয়ক অন্যান্য বই

বাংলাদেশের সাহিত্য
বাংলা ভাষার ইতিহাস
বাংলা ছন্দের রূপরেখা
বাংলা সাহিত্যের নানাদিক
নির্ভুল বাংলা লিখতে হলে
মেঘনাদবধ কাব্য (সম্পাদনা)
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (সম্পাদনা)
ময়মনসিংহ গীতিকা (সম্পাদনা)
কালকেতু উপাখ্যান (সম্পাদনা)
মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান (সম্পাদনা)
বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনা
সমালোচনা সংগ্রহ
সাহিত্যতত্ত্ব
বাংলা বানান ও ভাষারীতি
বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা
ভাষাসৌরভ ব্যাকরণ ও রচনা
ব্যবহারিক বাংলা
বাংলা প্যারডি কবিতা
শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকবিতা
বাংলা নীতিকবিতা
মাইকেলের প্রহসন
বাংলা সাহিত্য : কিশোর ইতিহাস
ভালভাষায় লেখালেখি
ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

[প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগ]

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত
ষোড়শ সংস্করণ
জুলাই ২০১৬

অধ্যাপক মাহবুবুল আলম

খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN 984-408-050-9

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
অধ্যাপক মাহবুবুল আলম

প্রকাশক
কে এম ফিরোজ খান
খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার (২য় তলা)
ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত
ষোড়শ সংস্করণ
জুলাই ২০১৬

বর্ণবিন্যাস
আবির কম্পিউটার

মুদ্রণ
মৌমিতা প্রেস
২৫ প্যারীদাস রোড
ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য : পাঁচশত টাকা মাত্র

পঞ্চদশ সংস্করণের ভূমিকা

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চদশ সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত হল।

বর্তমান সংস্করণটি পরিমার্জনা কালে সকল পর্যায়ের পাঠকের কাছে উপযোগিতা বৃদ্ধির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। আগের সংক্ষিপ্ত আলোচনাগুলোর কলেবর বাড়িয়ে এবার আরও পূর্ণতা দানের চেষ্টা করা হয়েছে। অধিকতর তথ্য সমাবেশের দিকে বিশেষ যত্ন রাখা ছাড়াও লক্ষ্য ছিল পরিবেশিত তথ্য সর্বাধুনিক করা।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে সাম্প্রতিককালে যে সব গবেষণা হয়েছে তার আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ব্যাপকতর করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাহিত্যের অংশে সর্বাধুনিক তথ্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। অনেক লেখক লেখিকা এ বইয়ে সংযোজনের জন্য নিজেদের তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন। যথাস্থানে তাঁদের তথ্য সংযোজিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমার লেখা 'বাংলাদেশের সাহিত্য' নামে একটি সুবৃহৎ পৃথক বই প্রকাশিত হয়েছে।

একুশ শতকের শুরুতে বাংলা সাহিত্যের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে অনুসন্ধিৎসু পাঠক। জাতীয় জীবনে প্রেরণা সঞ্চারে বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা অনন্য। তাই আজকের দিনে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সময়ের এই প্রয়োজন সাধনের দিকে লক্ষ রেখে বর্তমান সংস্করণের এই পরিবর্ধিত রূপ। এছাড়া বর্তমান সংস্করণে 'পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য' নামে একটি নতুন অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে বইটির উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

বইটির উৎকর্ষবিধানের জন্য যেসব মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি তার আলোকেও পরিমার্জনা করা হয়েছে। ফলে বর্তমান সংস্করণটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বাংলা অনার্স ও এম. এ. ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সর্বাঙ্গীন প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হবে। সাধারণ পাঠকও এতে উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি।

বইটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত সহৃদয় সহকর্মীগণ যে উদারতা-সহযোগে বইটি অনুমোদন করেছেন, তার জন্য সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আশাকরি, বর্তমান সংস্করণটি আগের মতই পাঠকসমাজের উপকারে আসবে।

সৌরভ
১৩/১, বর্ধনবাড়ি
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

মাহবুবুল আলম

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অখণ্ড ইতিহাস হিসেবে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থটি রচিত। এক খণ্ডের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই বর্তমান গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের সাহিত্য পর্যন্ত পরিসীমায় সকল দিকের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা অবলম্বনে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক ধারার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের আলোচনা এ গ্রন্থে বিধৃত; এর ফলে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকসমাজের পক্ষে প্রত্যেক শাখার সামগ্রিক পরিচয় লাভ করা সহজে সম্ভব।

বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা বাংলাকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। তাই শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এখন পাঠ্যসূচিভুক্ত। বিশেষত বাংলা অনার্স এবং এম. এ. (প্রাথমিক) শ্রেণিতে বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস পড়ানো হয়। তাছাড়া বি. এ. পাস ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতেও সাহিত্যের ইতিহাসের অংশবিশেষ পড়ানো হয়ে থাকে। এসব পাঠ্যসূচির সম্পূর্ণ প্রয়োজন যাতে সার্থকভাবে মিটাতে পারে সেদিকে গ্রন্থ রচনাকালে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পরীক্ষার প্রশ্নাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে।

গ্রন্থ পরিকল্পনা ও রচনাকালে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনারত সহকর্মীগণের সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অনুরাগী পাঠকসমাজের জন্য গ্রন্থটি উপকারে আসলে পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

বাংলা বিভাগ
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা
১লা বৈশাখ, ১৩৮[illegible]

মাহবুবুল আলম

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব : প্রাচীন ও মধ্যযুগ

মধ্যযুগ

প্রথম পর্ব
প্রাচীন ও মধ্যযুগ

প্রথম অধ্যায়
দেশ জাতি ভাষা লিপি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরেরও বেশি সময়ের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ জনপদের বিচিত্র জনগোষ্ঠীর সুখদুঃখ আনন্দবেদনা নিয়ে রচিত এক বর্ণাঢ্য সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাস। বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন এলাকার অধিবাসীদের আদিপুরুষেরা কবে বাংলা ভাষায় প্রথম কথা বলা শুরু করেছিল তার সঠিক দিনক্ষণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। অনুমানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবকাল সম্পর্কে মতবিরোধ থাকলেও মোটামুটি সপ্তম শতক থেকে তার বিকাশ শুরু হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বৌদ্ধ সাধুসন্ন্যাসীদের হাতে রচিত চর্যাপদ থেকে বাংলা সাহিত্যের যে শুভসূচনা হয়েছিল তা কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত, সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত হয়ে আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অন্যতম বলে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

বাংলা সাহিত্য বিচিত্র মানুষের হৃদয়ানুভূতির সমৃদ্ধ ফসল। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশুদ্ধ বাঙালি জীবন-ঐতিহ্যের ধারক, বাহক এবং পরিচায়ক।' একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে এই জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটলেও রাজনৈতিক পটভূমিকায় সে সীমানার যুগে যুগে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সে জনমানব বরাবর সীমাবদ্ধ থাকে নি। তাই বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল আজ বিভিন্ন এলাকায় বিস্তৃত হয়ে আছে। সেই সঙ্গে বৈচিত্র্য এসেছে জনগণের মধ্যে। বিচিত্র বর্ণ, আকার আর আচরণের মানুষ বাংলা সাহিত্যে তাদের আনন্দবেদনার গান গেয়েছে। সে সব মানুষের ধর্মে ছিল ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ছিল তাদের সংস্কৃতিতে। বাংলা সাহিত্যে এই বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর বিদ্যমান। বাংলা ভাষাও সব যুগে একই বৈশিষ্ট্য ধারণ করে নি। যুগে যুগে ভাষার বিবর্তন ঘটেছে, সে বিবর্তনের ফল আজকের রূপ। বাংলা লিপিতেও এসেছে সংস্কারের ছোঁয়া। হাতে লেখা বইয়ের যুগ শেষ হয়েছে অনেক আগেই। ছাপাখানার প্রচলন সাহিত্যসৃষ্টিকে করেছে ত্বরান্বিত। আর আজকের সর্বাধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তি মুদ্রণসৌকর্যে বাংলা সাহিত্যকে নিয়ে এসেছে এক সৌন্দর্যময় গতিশীল জগতে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে যথাযথ জানতে ও বুঝতে হলে বাংলা ভাষাভাষী ভূখণ্ডের সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। নইলে বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি গভীরভাবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হবে না। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ইত্যাদির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পৃক্ততা রয়েছে। ড. আনিসুজ্জামানের মতে, 'বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির সর্বতোমুখী বিকাশের সঙ্গে, বাঙালির সৃজনশীলতার ক্রমবিকাশের পটে, সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি লক্ষ

করতে পারলে বাঙালির জীবন ও চিন্তাধারার সঙ্গে তার মর্মগত যোগ উপলব্ধি করতে পারব।' তাই বাংলা সাহিত্যকে জানতে হলে দেশ জাতি ধর্ম সংস্কৃতি ভাষা লিপি—এ সবকিছুর সঙ্গেই পরিচিত থাকা দরকার।

বাংলাদেশ

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী এই বাংলাদেশ। কালের বিবর্তনের প্রেক্ষিতে বহু বিচিত্র জনপদের রূপান্তরের মাধ্যমে নানা জাতের মানুষের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে এদেশ। প্রাচীন বাংলাদেশের সীমানা নির্ণয় করা কঠিন। তবে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমতলভূমি নিয়ে প্রাচীন বাংলাদেশ গঠিত ছিল বলে অনুমান করা হয়। বর্তমানের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলো তার অন্তর্গত ছিল। তবে এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশ নামে যে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের আমরা অধিবাসী, তা বর্তমান বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিস্তৃত জনপদের একটা অংশমাত্র। বর্তমান বাংলাদেশের বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সবখানে, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যের কিছু অংশে এবং বার্মা বা বর্তমান মায়ানমারের আরাকানে বাংলা ভাষাভাষী লোক বসবাস করে। বর্তমানে বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা আনুমানিক পঁচিশ কোটি।

১৯৭১ সালে মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তা ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ প্রায় দু শ বছরের ইংরেজ শাসনপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেরই নামান্তর। বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা এরকম : পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ; উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরুণাচল ও আসাম রাজ্য; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য ও বার্মা বা মায়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের মোট আয়তন ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল বা ১,৪৩,৯৯৮ বর্গ কিলোমিটার এবং বর্তমান জনসংখ্যা ষোল কোটিরও বেশি।

ব্রিটিশ শাসনকালে চট্টগ্রাম থেকে রাজমহল এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বাংলাদেশের এলাকা বিস্তৃত ছিল। ইংরেজ শাসনামলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে বাংলাকে বিভক্ত করা হয়েছিল। এর আগে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা একত্রে ছিল বঙ্গদেশ নামে। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা পায়। কিন্তু ১৯১১ সালে হিন্দুসমাজের আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বঙ্গদেশ তার পূর্ববর্তী সীমানা ফেরত পায় নি। তখন বিহার ও উড়িষ্যা পৃথক প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। নতুন ব্যবস্থায় পূর্ববঙ্গ ও দার্জিলিংসহ পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বঙ্গপ্রদেশ গঠিত হয়। আসাম পৃথক প্রদেশ হিসেবে স্থান পায়। এর ফলে বাংলা ভাষাভাষী সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়ার একটি অংশ আসাম প্রদেশে থেকে যায়। বিহার ও ছোটনাগপুরেও বাংলাভাষী অঞ্চল কিছুটা রয়ে গেল। বঙ্গভঙ্গ ভারতে জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বিভক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুদের বিক্ষোভ ও সন্ত্রাসবাদের জন্ম নেয়। এতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

ঘটে এবং মুসলমানেরা স্বতন্ত্রবাদী রাজনীতিতে যোগদান করে। সৃষ্টি হয় মুসলিম লীগের। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানেরা হতাশ হয় এবং ক্রমে ব্রিটিশবিরোধী হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বিভক্ত বর্তমানের বাংলা ভাষাভাষী ভৌগোলিক অঞ্চল-দুটি প্রাচীন আমলে ভিন্ন নামে পরিচিত একাধিক দেশের সংমিশ্রণে গঠিত। বাংলা প্রাচীন দেশ। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগেকার ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে বঙ্গ নামে এক দেশের প্রথম উল্লেখ আছে। অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যেও বাংলার উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য বৈদিক যুগে বাংলা আর্যঅধ্যুষিত অঞ্চলের বাইরে ছিল বলে ঋগ্বেদে বাংলার উল্লেখ নেই। মহাকাব্যের যুগে বাংলা আর্যসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়। মহাভারত ও রামায়ণে বঙ্গ ও অন্যান্য জনপদের কথা বলা হয়েছে। জৈন উপাঙ্গ গ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ আছে। এই সুপ্রাচীন বঙ্গদেশের সীমা সম্পর্কে ড. নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভোটান রাজ্য; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে রাজমহল সাঁওতাল পরগনা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমাবিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়-পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীয়-রাঢ়া-সুহ্ম-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ।'

রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি শব্দের সাহায্যে প্রাচীনকালে বিশেষ জাতি বা উপজাতি বোঝানো হত। তারপর তাদের বিশেষ বিশেষ বাসস্থানের নাম হিসেবে তা ব্যবহৃত হত। রাঢ় বলতে মধ্য-পশ্চিমবঙ্গ, সুহ্ম বলতে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ, পুণ্ড্র বলতে উত্তরবঙ্গ, বঙ্গ বলতে পূর্ববঙ্গ, সমতট-হরিকেল বলতে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থান বোঝায়। এখনও রাঢ় বলতে মধ্য-পশ্চিমবঙ্গ এবং বরেন্দ্র বলতে উত্তরবঙ্গকে বোঝানো হয়। বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর মধ্যে গৌড় ছিল সর্বাধিক সুপরিচিত। তবে এর অবস্থিতি সম্পর্কে পণ্ডিতেরা নিশ্চিত নন। পাণিনির গ্রন্থে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়পুর ও গৌড়িক সামগ্রীর উল্লেখ আছে। তুর্কি আমলে লক্ষ্মণাবতী গৌড় নামে পরিচিত ছিল। বঙ্গ জনপদটি দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে গঠিত ছিল। পালরাজাদের আমলে বঙ্গ—উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে বিভক্ত হয়। সমতট ষষ্ঠ শতাব্দীর 'বৃহৎ-সংহিতা' গ্রন্থে বঙ্গ থেকে পৃথক জনপদ বলে উল্লেখিত হয়েছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং একে কামরূপের দক্ষিণে বিস্তৃত বলেছেন। হরিকেল ছিল ভারতের পূর্ব-সীমান্ত দেশ। সপ্তম শতকের গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। পুণ্ড্র নামে এক প্রাচীন জাতির উল্লেখ আছে বৈদিক গ্রন্থে ও মহাকাব্যে। এরা উত্তরবঙ্গের অধিবাসী ছিল বলে এ অঞ্চল পুণ্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত ছিল। বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী ছিল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি জনপদ। বগুড়া রাজশাহী ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে বরেন্দ্রমণ্ডল গঠিত ছিল। রাঢ় ছিল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে মহাভারতে। মেদিনীপুর জেলায় এর অবস্থান ছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাজা শশাঙ্ক এই জনপদগুলোকে গৌড় নামে একত্রিত করেন। 'বাঙালি রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি।' ৬০৬ সালের আগেই তিনি একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ। বাংলার রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে শশাঙ্ককে বাংলার 'প্রথম জাতীয় রাজা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর পরে বঙ্গদেশ পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ—এই তিন জনপদে বিভক্ত ছিল।

তবে হিন্দুযুগের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ছিল। মুসলমান আমলেই বাংলার এ ধরনের খণ্ড নামের অবসান ঘটে এবং বাংলা ভাষাভাষী সম্পূর্ণ অঞ্চল এক নামে অভিহিত হতে থাকে।

বিভিন্ন অঞ্চল একত্রিত করার প্রচেষ্টা মুসলমান শাসনামলে সফল হয়। ১২০৪ সালে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে তুর্কি শাসনের সূত্রপাতে এ চেষ্টার আরম্ভ এবং মোগল সম্রাট আকবরের শাসনকালে ১৫৭৬ সালে মোগল সাম্রাজ্যভুক্তির মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

দেশবাচক নাম হিসেবে বাংলার ব্যবহার মুসলমান অধিকারের গোড়ার দিকে প্রচলিত হয়। সম্রাট আকবরের আমলে সমগ্র বঙ্গদেশ 'সুবহ-ই-বঙ্গালহ' নামে পরিচিত হয়েছিল। ফারসি 'বঙ্গালহ' শব্দ থেকে পর্তুগিজ Bengala এবং ইংরেজি Bengal শব্দ এসেছে। লক্ষ্মণসেনের আমলে ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহই ছিল বঙ্গ। মধ্যযুগের বিখ্যাত বিশ্বপর্যটক ইবনে বতুতা (১৩০৪-৭৩) প্রথম বারের মত মধ্যযুগে 'বঙ্গাল' নাম উচ্চারণ করেন। তখন বঙ্গবাসীই ছিল বঙ্গাল। 'সুবেহ বাঙ্গালা'ই শেষাবধি সব অঞ্চলকে বঙ্গ বা বাংলা নামের মধ্যে বিলুপ্ত করে দেয়।

বাংলায় পাঠান যুগের পূর্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গ 'গৌড়' এবং পূর্ববঙ্গ 'বঙ্গ' এই দুই নামে চিহ্নিত হত। উনিশ শতকের প্রথম ভাগেও গৌড় কথাটি সমগ্র বাংলাদেশের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামের মহাকাব্যে বলেছেন 'গৌড়জন যাহে/আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী পর্যায়েও 'গৌড়' শব্দের ব্যবহার বিরল নয়।

বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে মনে করা হয়, যে অঞ্চলে 'বং' গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত, তারাই এ নামে পরিচিত। সংস্কৃত 'বঙ্গ' শব্দ 'বং' বা 'বঙ' গোষ্ঠীর নাম। 'বং' গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের বাসভূমি ছিল ভাগীরথী নদীর পূর্বতীর থেকে আসামের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত।

মোগল সম্রাট আকবরের সভাসদ বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে সর্বপ্রথম দেশবাচক 'বাংলা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি এর উৎপত্তি সম্পর্কে দেখিয়েছেন যে, এ দেশের প্রাচীন নাম 'বঙ্গ'-এর সঙ্গে বাঁধ বা জমির সীমাবাচক 'আল'—(আলি, আইল) প্রত্যয়যোগে 'বাংলা' শব্দ গঠিত হয়েছে। আবুল ফজলের মতে, চট্টগ্রাম থেকে গর্হি (রাজমহল) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। এখানকার প্রাচীন রাজারা দশ গজ উঁচু ও বিশ গজ প্রশস্ত আল বা বাঁধ নির্মাণ করতেন।

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশ স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই বাংলাদেশের বিশাল বদ্বীপ অঞ্চলটি গঙ্গা-ভাগীরথী-পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বাহিত পলিমাটি দিয়ে সমৃদ্ধ বলে আদিকাল থেকে বিদেশিদের প্রলুব্ধ করেছে। ফলে বিচিত্র মানুষের সমাবেশে এখানে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন জনপদ। নদীনালা খাল বিল বিধৌত এদেশের মানুষের মনমানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে। দেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এখানকার সাহিত্যসৃষ্টিতে।

বাংলার প্রাকৃতিক সীমারেখা, জলাভূমি, আবহাওয়া ইত্যাদি দেশের প্রতিরক্ষার কাজে সহায়ক হয়েছে। ফলে স্বাধীন রাজনৈতিক জীবন অক্ষুণ্ন রেখে বাঙালিরা জাতীয় জীবনের বিকাশ ও সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

বাঙালি জাতি

বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীন ও নব্য প্রস্তরযুগ এবং তাম্রযুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেছেন। এ সকল যুগে বাংলার পার্বত্য সীমান্ত অঞ্চলেই মানুষ বাস করত এবং ক্রমে তারা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমান বাঙালি জনগোষ্ঠী বহুকাল ধরে নানা জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এর মূল কাঠামো সৃষ্টির কাল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দু ভাগে ভাগ করা যায় : ক. প্রাক-আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী এবং খ. আর্য নরগোষ্ঠী। এদেশে আর্যদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অনার্যদেরই বসতি ছিল। এই প্রাক-আর্য নরগোষ্ঠী বাঙালি জীবনের মেরুদণ্ড। আর্যদের আগমনে সে জীবন উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

বৈদিক যুগে আর্যদের সঙ্গে বাংলাদেশবাসীর কোন সম্পর্ক ছিল না। বৈদিক গ্রন্থাদিতে বাংলার নরনারীকে অনার্য ও অসভ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার আদিম অধিবাসী আর্যজাতি থেকে উদ্ভূত হয় নি। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়—এই চার শাখায় বিভক্ত ছিল।

নিগ্রোদের মত দেহগঠনযুক্ত এক আদিম জাতির এ দেশে বসবাসের কথা অনুমান করা হয়। কালের পরিবর্তনে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত। অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে গবেষকগণের ধারণা। কেউ কেউ তাদের 'নিষাদ জাতি' বলেন। প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে অস্ট্রিক জাতি নেগ্রিটোদের উৎখাত করে। এরাই কোল ভীল সাঁওতাল মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির পূর্বপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত। বাঙালির রক্তে এদের প্রভাব আছে। বাংলা ভাষার শব্দে ও বাঙালি জীবনের সংস্কৃতিতে এরা প্রভাব বিস্তার করেছে। অস্ট্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে এবং সভ্যতায় উন্নততর বলে তারা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণেই সৃষ্টি হয়েছে আর্যপূর্ব বাঙালি জনগোষ্ঠী। এদের রক্তধারা বর্তমান বাঙালি জাতির মধ্যে প্রবহমান।

অস্ট্রিক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর জনসমষ্টির মিশ্রণে যে জাতির প্রবাহ চলেছিল, তার সঙ্গে আর্য জাতি এসে সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে বাঙালি জাতি। এ জন্য প্রাক-আর্য আদিম জাতি বাঙালি জনসাধারণের তিনচতুর্থাংশ অধিকার করে রয়েছে। বাংলা ভাষা ও গ্রামীণ জীবনে এদের স্পষ্ট প্রভাব থাকলেও বাংলাদেশে আর্য অভিযানের পর অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী আর্য ভাষা ও জীবনধারার সঙ্গে মিশে গেছে। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় গোষ্ঠীর জনসমষ্টির সংমিশ্রণ ঘটে। বাংলাদেশে আর্যীকরণের পরেই এদের আগমন ঘটে বলে বাঙালির রক্তের সঙ্গে এদের মিশ্রণ উল্লেখযোগ্য নয়, বাংলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এদের অস্তিত্ব রয়েছে। গারো, কোচ, ত্রিপুরা, চাকমা ইত্যাদি উপজাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত।

মৌর্যবিজয় থেকে গুপ্তবংশের অধিকার পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ৫০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে মোট আট শ বছর ধরে বাংলাদেশে ক্রমে ক্রমে আর্যীকরণের পালা চলে। তবে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তযুগেই বাংলাদেশে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি দৃঢ়মূল হয়। আর্যরা ব্রহ্মাবর্ত ত্যাগ করে প্রথমে আর্যাবর্তে বা উত্তর ভারতে আগমন করে এবং পরে মগধ অঙ্গ মিথিলা কলিঙ্গ রাঢ় বঙ্গে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের দিকে সেমীয় গোত্রের আরবিয়েরা ইসলাম ধর্ম প্রচার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বাঙালি জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়। তাদের অনুসরণে নেগ্রিটো রক্তবাহী হাবশিরাও এদেশে আসে। এদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার আগেই মুসলিম বণিক ও ধর্মপ্রচারক এদেশে আগমন করেন। মুসলমান শাসনামলে বহু তুর্কি, আরবিয়, ইরানি, হাবশি, আফগান ও মোগল মুসলমান বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করেন।

এমনি ভাবে অন্তত দেড় হাজার বছরের অনুশীলন গ্রহণ বর্জন ও রূপান্তরীকরণের মাধ্যমে বাঙালির জনজীবন গড়ে উঠেছে। তাই বর্তমান বাঙালি জাতি অস্ট্রিক দ্রাবিড় আর্য মঙ্গোলীয় সেমীয় নিগ্রো ইত্যাদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রক্তধারার সংমিশ্রণে এক বিচিত্র জনসমষ্টি হিসেবে বিদ্যমান। 'বাংলার ইতিহাসের ধারা' গ্রন্থে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গঠিত বাঙালি জাতির মধ্যে মিশ্রণের হার এভাবে দেখিয়েছেন : বাঙালি রক্তের মধ্যে শতকরা ষাট ভাগ অস্ট্রেলীয়, বিশ ভাগ মঙ্গোলীয়, পনের ভাগ নেগ্রিটো এবং পাঁচ ভাগ অন্য নানা নরগোষ্ঠীর রক্ত মিশেছে। নিষাদ, কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ, মালপাহাড়ি প্রভৃতি হল অপেক্ষাকৃত স্বল্পসঙ্কর আদি অস্ট্রেলীয় বা ভেড্ডিড। আর কিরাত, রাজবংশী, নাগা, কোচ, মেচ, মিজ্জার, কুকী, চাকমা, আরাকানি প্রভৃতি হচ্ছে স্বল্পসঙ্কর মোঙ্গলীয়। এই সঙ্গে গৌড়, মালব, চৌড়, শক, হূন, কুলিক, কর্ণাট, লাট, দ্রাবিড়, মুণ্ডা, কুষাণ, ইউচি, আরব, ইরানি, হাবশি, গ্রিক, তুর্কি, আফগান, মোগল, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ রক্তও মিশেছে।

ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'কোল, ভীল, ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, দ্রাবিড়, চাকমা, নাগা, কুকী, আর্য, শক, হূন, তুর্কি, মুঘল, আরব, ইরানি, হাবশি প্রভৃতি

দুনিয়ার নানা গোষ্ঠী, গোত্র ও জাতির সমবায়ে উদ্ভূত আধুনিক বাঙালি জাতির মধ্যে তাই বিচিত্র আচার-সংস্কার, চারিত্রিক বৃত্তিপ্রবৃত্তি ও রুচিসংস্কৃতির আভাস আজও দুর্লভ নয়। দেহাকৃতিগত বৈচিত্র্যও কি কম।'

মানুষের জীবনাচরণের সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তার প্রেক্ষিতে বাঙালি জনজীবনে বিভিন্ন সময়ে নানা ধর্মের প্রভাব পড়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও ধর্মের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় বিষয়ের প্রাধান্য ছিল। আধুনিক যুগের পরিসীমায় ধর্মীয় সাহিত্যের সৃষ্টিও কম নয়। বাঙালি জনগোষ্ঠীর আচরিত ধর্ম এ ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে।

এদেশে আর্যধর্ম বিস্তারের আগে বাংলার ধর্মমত সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ মিলে না। আর্যসভ্যতার সংস্পর্শে এদেশে বৈদিক ধর্মের প্রচলন হয়। সম্রাট অশোকের সময় এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। তখন জৈন ধর্মেরও প্রচলন হয়। গুপ্তযুগে এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও তান্ত্রিক মতবাদের ব্যাপক প্রসার শুরু হয়। অষ্টম শতক থেকে বৈষ্ণব ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে। গুপ্ত যুগে শৈব ধর্মের প্রচলন ছিল। প্রাচীন কালে বাংলায় শাক্ত মতও প্রচলিত ছিল। পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্ম পুনরায় ব্যাপকতা লাভ করে। পাল যুগের পর এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম সহজিয়া ধর্মরূপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সহজিয়া ধর্মমতের আচার্যগণ সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত। সেন রাজাদের আমলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রবল রূপ ধারণ করে। তবে হিন্দু নামে একই জাতির পরিচয় বিধৃত হয় মুসলিম শাসনামলে। পরবর্তী কালে মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে। পর্তুগিজ ও ইংরেজ আগমনে এদেশে প্রচলিত হয় খ্রিস্টধর্ম। এ ভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মমতের জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে আছে তার বিচিত্র প্রতিফলন।

বাংলার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে বাঙালির উন্নত নৈতিক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন সাহিত্যে ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্রও আছে। দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং বাঙালির উদ্যমশীলতা, সাহসিকতা ও বিদ্যোৎসাহিতার প্রশংসা করেছেন। প্রাচীন বাঙালির চরিত্র সম্পর্কে ড. নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন, 'শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য...আবর্তন ও বিপ্লব, দুঃসাহসী সমন্বয়, সাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাংলার ঐতিহ্য ধারায়, বাঙালি বৃত্তি যথার্থত বৈতসী। যে আদর্শ, যে ভাবস্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে তরঙ্গ কখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাংলাদেশ তখন বেতস লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্য বোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার মতই সোজা হইয়া স্ব-রূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালিকে বার বার বাঁচাইয়াছে।'

বিচিত্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত প্রাচীন বাংলার শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু গুপ্ত-পূর্ব যুগের শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে তেমন তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে প্রাচীন কালে রচিত

গ্রন্থে কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতির উল্লেখ থেকে তাদের সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের কথা জানা যায়। গ্রিক লেখকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আগেই বাংলায় রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল। মৌর্যযুগে বাংলার শাসনপদ্ধতি সম্পর্কেও সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে গুপ্তযুগে বাংলায় শাসনপদ্ধতির সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। বাংলার কিছুটা অংশ গুপ্ত শাসকদের অধীনে ছিল, বাকিটা ছিল সামন্তরাজাদের শাসনাধীন। পরে পাল রাজারা চার শ বছর বাংলার ওপর শাসন ক্ষমতা বিস্তার করে রাখেন। পালদের শাসনপদ্ধতি পরবর্তীকালে চন্দ্র, বর্মণ, কম্বোজ ও সেন রাজারা অনুসরণ করেন। এ ভাবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের আগে থেকেই বাংলাদেশে একটি সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীন বাংলার এই পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সমৃদ্ধি ঘটে। আর্যদের আগমনে এদেশে আর্যদের ভাষাই প্রাধান্য পায়। হিন্দু শাসনামলে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছিল। পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধসাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করে। সেনযুগে ছিল সংস্কৃতের প্রাধান্য। প্রাচীন যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য শিল্পকলার বিকাশ ঘটে। প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক জীবন ছিল কৃষিনির্ভর। তবে শিল্পও বিকাশ লাভ করেছিল। এই সমৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে বিদেশিদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বাংলা ভাষা

বাংলাদেশের অধিবাসীরা প্রথম থেকেই বাংলা ভাষায় কথা বলত না। বাংলা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা হিসেবে বিবর্তিত হয়েছে। তাই প্রাক-আর্য যুগের অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট নয়। তবে সেসব ভাষার শব্দসম্ভার রয়েছে বাংলা ভাষায়। অনার্যদের তাড়িয়ে আর্যরা এ দেশে বসবাস শুরু করলে তাদেরই আর্যভাষা বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে।

বাঙালি জাতি যেমন সঙ্কর জনসমষ্টি, বাংলা ভাষাও তেমনি সঙ্কর ভাষা। বর্তমান বাংলা ভাষা প্রচলনের আগে গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা অসুর ভাষাভাষী ছিল বলে অষ্টম শতকে রচিত 'আর্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্প' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এই অসুর ভাষাভাষী লোকেরা ছিল সমগ্র প্রাচীন বঙ্গের লোক। অসুর ভাষাই অস্ট্রিক বুলি। ড. মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, 'বর্তমান বাংলা ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্বে আমাদের দেশে যে এই অসুর ভাষা বা অস্ট্রিক বুলি প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।' অস্ট্রিক বুলির কিছু শব্দ ও বাকরীতি এখনও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেছেন, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে এই মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল। আনুমানিক আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মূল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেসব প্রাচীন শাখার সৃষ্টি হয়, তার অন্যতম হল আর্য শাখা। এ থেকেই ভারতীয় আর্য ভাষার সৃষ্টি। এর কাল ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি স্তর :

ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক-সংস্কৃত), খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত।

খ. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ), খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দশম শতক পর্যন্ত।

গ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, আসামি ইত্যাদি) খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত।

ভারতীয় আর্যভাষার এই স্তরবিভাগ থেকে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্তরে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। জনতার প্রভাবে এ ভাষা পরিবর্তিত হয়ে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরে আসে। প্রথম পর্যায়ে পালি এবং পরে প্রাকৃত ভাষা নামে তা চিহ্নিত হয়। অঞ্চলভেদে প্রাকৃত ভাষা কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটি ছিল মাগধি প্রাকৃত। এ ভাষার প্রাচ্যতর রূপ গৌড়ী প্রাকৃত। তা থেকে গৌড়ী অপভ্রংশের মাধ্যমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। এই পর্যায়ের অন্যান্য ভাষা হল মৈথিলি, মাগধি, ভোজপুরিয়া, আসামি ও উড়িয়া। বাংলা ভাষার জন্মকাল কেউ কেউ দশম শতক বলে নির্ণয় করেছেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী। কম পক্ষে হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষা উৎপত্তির পর থেকে নানা পর্যায়ে পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে আদি মধ্য ও আধুনিক—এই তিন যুগের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। আদি বা প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার কাল দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ের প্রধান নিদর্শন চর্যাপদ। এর ভাষা থেকে তখন পর্যন্ত তার পূর্ববর্তী অপভ্রংশের প্রভাব দূর হয়ে যায় নি, এমন কি প্রাকৃতের প্রভাবও তাতে বর্তমান ছিল। তবে এখানেই বাংলা ভাষা তার স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা ভাষার পরিধি ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ত্রয়োদশ শতকের কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও এ সময়ে বাংলা ভাষা বিবর্তিত হচ্ছিল বলে মনে করা যায়। কারণ চর্যাপদ থেকে মধ্যযুগের প্রথম গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ভাষায় উন্নীত হওয়ার জন্য বিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। মধ্যযুগের আদিস্তর চৌদ্দ-পনের শতকে সীমাবদ্ধ। এ সময়ের নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর-শ্রীকর নন্দীর মহাভারত পাঁচালী, নারায়ণদেব-বিপ্রদাস-বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য, মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার প্রয়োগ, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য ব্যবহার এ যুগের ভাষার লক্ষণ। ষোল সতের আঠার শতক মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অন্ত্যযুগ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এ সময়ে বাংলা ভাষায় উৎকর্ষ সাধিত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য ও পৌরাণিক অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচুর তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান পায়। ষোল শতক থেকে বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি ভাষার প্রভাব পড়ে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা মৈথিলি মিশ্রিত ব্রজবুলি কৃত্রিম কাব্যভাষারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর প্রচুর আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন। তাঁর হাতেই বাংলা ভাষা মার্জিত রূপ লাভ করে। ষোল শতক থেকে চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজে বাংলা গদ্যের ব্যবহার হতে থাকে। আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে পর্তুগিজ মিশনারিরা রোমান হরফে বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অবশ্য তার পূর্বেই বাংলা ভাষায় কিছু পর্তুগিজ শব্দ প্রবেশ করে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পরিধিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যের নিদর্শন রূপায়িত হয়েছে। এই সৃষ্টি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটেছে, আবার বহু যুগ ধরে তা ছড়িয়ে আছে। ফলে ভাষার বৈচিত্র্য খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসব সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষা তখন বিবর্তনের মাধ্যমে উৎকর্ষের দিকে ধাবিত হয়েছে। ভাষায় এসেছে নানা জাতের শব্দ, এসেছে শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ। সব ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধি সাধনের একটা নিরলস প্রচেষ্টা লক্ষণীয় ছিল। প্রতিভাশালী লেখকের হাতে ভাষা উৎকর্ষমণ্ডিত হয়েছে। ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে বাস্তবধর্মিতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়ে ভাষা ক্রমেই জীবনানুসারী হয়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ভাষা তাই বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার নিদর্শন হিসেবে বিবেচনার যোগ্য।

আধুনিক বাংলা ভাষার স্তর ১৮০০ সাল থেকে শুরু হয়ে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রবহমান। এ যুগের প্রথম থেকেই বাংলা গদ্যের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। প্রথম দিকে কিছুটা জড়তা থাকলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে থেকে বাংলা গদ্যের একটা পরিণত রূপ গড়ে ওঠে। কলকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষাও গদ্যরীতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সমগ্র বাংলাদেশে যে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা একমাত্র ব্যবহার্য ভাষা হিসেবে প্রচলিত হয়, তা-ই সাধুভাষা নামে পরিচিত। এ ভাষা সংস্কৃত-ঘেঁষা। পরবর্তী পর্যায়ে কথ্যভাষারীতি সাহিত্যে স্থান গ্রহণ করে এবং বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কথ্য বা চলিত ভাষা সাধু ভাষার পাশাপাশি চলতে থাকে। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যে সাধুরীতির চেয়ে কথ্যরীতির প্রাধান্য বেশি পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের উন্নত দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান এদেশে প্রচারিত হচ্ছে। ফলে আধুনিক চিন্তা ভাবনার বাহন হিসেবে বাংলা ভাষা ক্রমেই অধিকতর যোগ্য হয়ে উঠছে। তাছাড়া বাংলা এখন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারে নিজের যথোপযুক্ততা প্রমাণ করছে এবং প্রয়োজনবোধে বাইরের প্রভাবে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলছে।

আধুনিক বাংলা ভাষা কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে এখনও সম্প্রসারমান। ছাপাখানা ভাষাকে স্থায়ী রূপ দান করলেও তার পরিবর্তন অব্যাহত রয়েছে। বাংলা গদ্যের প্রথম দিকে ইসলামি ও সংস্কৃত প্রভাব, ক্রিয়াপদ ও সর্বনামে পুরানো বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃত বাক্যবিন্যাস ও সমাস সন্ধির গুরুভার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। ভাষায় স্থান লাভ করেছে কলকাতাকেন্দ্রিক চলিতরীতি। এখনও ভাষায় স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে তার পরিবর্তন চলছে। সমকালীন জীবন চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দাবলি ভাষায় স্থান করে নিচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের নিজস্ব পরিসরে স্বকীয় ভাষা প্রয়োগরীতি অনুপ্রবেশ করে এখনকার বাংলা ভাষাকে ক্রমেই সমৃদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য দান করছে।

আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পদ্যে রূপলাভ করেছে। গদ্য এসেছে আধুনিক যুগে। গদ্যের দুটি ভাষারীতি—সাধু ও চলিত। সাধু রীতি সাহিত্যের ভাষা, বইপত্রেই সীমাবদ্ধ। চলিত রীতি ছিল মুখের ভাষা। সাধু রীতির পাশে তা যথাযোগ্য মর্যাদা নিয়ে স্থান লাভ করেছে। এখনকার দিনে চলিত রীতির প্রাধান্যই বেশি। আধুনিক ভাষারীতি হিসেবে চলিত রীতি একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই দুই ভাষারীতির বাইরে আছে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা। দেশের বিভিন্ন এলাকায় শব্দ ব্যবহারে, উচ্চারণে, বাক্য গঠনে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আঞ্চলিক ভাষারীতি গড়ে উঠেছে এবং সাহিত্যেও তার কিছু অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

বর্তমানকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ভাষারীতি সম্পূর্ণ ঐক্য রাখতে পারছে না। শব্দব্যবহারে, উচ্চারণে, শব্দপ্রয়োগ রীতিতে ও বিদেশি ভাষা থেকে অনুবাদের বেলায় একই আদর্শ অনুসৃত হচ্ছে না। বর্তমানে পার্থক্য ক্ষীণ হলেও ভবিষ্যতে দুদেশের ভাষারীতির এ পার্থক্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার নাম ব্যবহারে যুগে যুগে নানা ধরনের নামকরণ করা হয়েছে। উন্নাসিক ব্রাহ্মণ্য অভিজাতদের কাছে বাংলা ছিল 'ভাষা'। উন্নাসিক মুসলমানদের কাছে ছিল 'হিন্দুয়ানি ভাষা'। কেউ বলেছেন 'প্রাকৃত ভাষা', কেউ বলেছেন 'লোকভাষা'। কারও মতে 'লৌকিক ভাষা'। অধিকাংশ লেখক বলেছেন 'দেশি ভাষা' এবং কিছু সংখ্যক লেখক 'বঙ্গভাষা', 'বাঙ্গালা' বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলার বাইরে এর নাম ছিল 'গৌড়িয়া'। আধুনিক যুগে এ ভাষার নাম 'বাংলা'। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলা বিশ্বে চতুর্থস্থানীয় ভাষা।

বাংলা লিপি

বাংলা লিপি ব্রাহ্মী লিপি থেকে উৎপন্ন। শুধু বাংলা নয় সকল ভারতীয় লিপিই এই ব্রাহ্মী লিপি থেকে জন্মলাভ করেছে। ব্রাহ্মী লিপি ভারতের মৌলিক লিপি। সিংহলি, ব্রহ্মী, শ্যামী, যবদ্বীপী ও তিব্বতি লিপির উৎসও ব্রাহ্মী লিপি। সম্রাট অশোকের অনুশাসন সুগঠিত ব্রাহ্মী লিপিতেই উৎকীর্ণ। ব্রাহ্মী লিপির সমসাময়িক কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন ছিল। পরে ব্রাহ্মী লিপি সে স্থান অধিকার করে।

অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মী লিপি থেকে পশ্চিমা লিপি, মধ্যভারতীয় লিপি ও পূর্বী লিপি—এই তিনটি শাখার সৃষ্টি হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভব হয়েছে মধ্যভারতীয় ও পূর্বী লিপির এবং দক্ষিণী ব্রাহ্মী লিপি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের নাগরী লিপির উদ্ভব হয়েছে। পূর্বী লিপি থেকেই বাংলার জন্ম। নাগরী লিপি বাংলা অক্ষরের চেয়ে পুরানো নয়। উত্তর-পশ্চিমা লিপি ষষ্ঠ শতক থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লিপিকে স্থানচ্যুত করে। তবে সপ্তম শতকে উত্তর-পূর্ব ভারতে পূর্বী লিপি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নাগরী লিপি পূর্বভারতে কিছুকাল প্রাধান্য বজায় রেখেছিল, কিন্তু পূর্ব-ভারতে পূর্বী লিপি অক্ষত থাকে এবং একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যেই এই পূর্বী লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে।

সেন যুগে বাংলা লিপির গঠনকার্য শুরু হলেও পাঠান যুগে তার মোটামুটি স্থায়ী আকার লাভ করে। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে হাতে লেখা হয়েছে বলে বাংলা লিপি নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে। ছাপাখানার প্রভাবে পরবর্তীকালে বাংলা লিপির তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে নি। উড়িয়া, মৈথিলি ও আসামি লিপির ওপর বাংলা লিপির প্রভাব বিদ্যমান। আসামি ও বাংলা অক্ষরের মধ্যে গুটিকয়েক অক্ষর ছাড়া কোন পার্থক্য নেই। বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হলেও, বাংলা লিপির কোন ব্যবধান সৃষ্টি হয় নি।

শব্দসম্ভার

বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় :

১. তৎসম, ২. অর্ধতৎসম, ৩. তদ্ভব, ৪. দেশি ও ৫. বিদেশি শব্দ।

১. তৎসম শব্দ : যেসব শব্দ পরিবর্তন ছাড়াই সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলো তৎসম শব্দ। যেমন : চন্দ্র, সূর্য, হস্ত, পদ ইত্যাদি।

২. অর্ধতৎসম শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে কিছুটা বিকৃত হয়ে বাংলায় এসেছে সেগুলো অর্ধতৎসম শব্দ। যেমন : গিন্নি, পিরীত, অঘ্রান, গেরাম ইত্যাদি।

৩. তদ্ভব শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে সেগুলো তদ্ভব শব্দ। যেমন : হাত, পা, ছাতা, পাখা ইত্যাদি।

৪. দেশি শব্দ : যেসব শব্দ এদেশের আদিম অধিবাসী অনার্যদের ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলো দেশি শব্দ। যেমন : ঢেঁকি, ডোঙা, খড়, চুলা ইত্যাদি।

৫. বিদেশি শব্দ : যেসব শব্দ বিদেশি ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলো বিদেশি শব্দ। যেমন : কলম, চেয়ার, চিনি, বেগম ইত্যাদি।

বাংলা বর্ণমালা গড়ে উঠেছে এগারটি স্বরবর্ণ এবং উনচল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে। সাকুল্যে এই পঞ্চাশটি বর্ণের সাহায্যে সৃষ্টি হয়েছে সোয়া লক্ষের মত শব্দের—যার পঞ্চাশ হাজার তৎসম শব্দ, আড়াই হাজার আরবি-ফারসি, শ চারেক তুর্কি, হাজার খানেক ইংরেজি, দেড় শ পর্তুগিজ-ফরাসি, আর কিছু শব্দ বিদেশি, বাদবাকি শব্দ তদ্ভব ও দেশি।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বলা যায়, 'বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মিলও ছিল না। তবু এর মধ্যে এক ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের অধিককালেরও পুরানো। এই দীর্ঘ ইতিহাসের পেছনে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে সংস্কৃত সাহিত্য, ইসলামি সাহিত্য ও ইংরেজি সাহিত্য। তাছাড়া বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের প্রভাব এসেছে ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে। এ প্রভাবের সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র রূপে। বাংলা সাহিত্যের স্বকীয় মূর্তি লাভের শুভ মুহূর্তে সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব যেমন প্রবল ছিল তেমনি পরবর্তীকালে এ সাহিত্যের বিকাশে আরবি ফারসি ইংরেজি সাহিত্যের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। ভূদেব চৌধুরীর মতে, 'সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেণি-সীমায়ত গগণচুম্বী শিল্পসমৃদ্ধির পাশে প্রাকৃত এবং তজ্জাত বাংলা সাহিত্য ভারতীয় সর্বজনীন সমষ্টিধর্মিতার ঐতিহ্যকে বহন করে জাত ও বর্ধিত হয়েছে। অন্য পক্ষে ইংরেজি সাহিত্যের স্পর্ধিত বিভেদমূলকতাকে যৌবনোচিত শক্তিতে অতিক্রম করে এই বাংলা সাহিত্যই আবার মিলনমূলক সামাজিক আদর্শের অভিমুখী হয়েছে। অথচ বারেবারেই 'দেবভাষা' ও তৎকালীন রাজভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে করে নিয়েছে আয়ত্ত এবং স্বী-কৃত।' সেই সঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরবি ফারসি সাহিত্যের প্রভাব স্বীকার করে নেওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে অভিনবত্ব। ইসলামি প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে নানা আঙ্গিকে। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পেছনে নানা প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এভাবেই হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় গড়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস।

বাঙালির জাতীয় জীবনধারা বরাবর একই খাতে প্রবহমান ছিল না। যুগে যুগে এদেশে সংস্কৃতি ও বাঙালিত্ব ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আন্তর ভাব ও বহিরঙ্গ অবয়বে পরিবর্তন এসেছে। জীবনের মূলীভূত ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিবিষয়ক নানা প্রভাবের অভিঘাতেই বিবর্তনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই বৈচিত্র্য যখন স্বাতন্ত্র্যে রূপ নিয়ে বিশেষ বিশেষ সময়ের সীমানায় চিহ্নিত হয় তখনই বিশেষ যুগের পরিচয় ধরা পড়ে। বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগের পেছনে সময়ের বৈচিত্র্য কাজ করেছে।

বাংলা সাহিত্যের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যের অবর্তমানে বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোকপাত করা সম্ভবপর নয়। তাই এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মতের সমাবেশ ঘটেছে। বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী রূপ অপভ্রংশ থেকে কোন মুহূর্তে এ ভাষা স্বপরিচয়ে চিহ্নিত হয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা বিতর্কমূলক হলেও সবাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদকেই স্বীকার করেন। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্যাপদ থেকে শুরু। কিন্তু চর্যাপদের প্রথম রচনার কাল সম্পর্কেও পণ্ডিতেরা ঐকমত্যে পৌঁছান নি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতানুসারে চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০ থেকে ১২০০ সালের মধ্যে। অপর পক্ষে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৯৫০ থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেছেন। এ দুটি প্রধান মত ছাড়াও ভিন্ন মতের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

তবে বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তিকাল সম্পর্কে মতানৈক্য থাকলেও এর পরবর্তী বিকাশের সমৃদ্ধ ইতিহাস নিয়ে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই। চর্যাপদের রচনাকালের শেষ সীমা অতিক্রম করলেই মধ্যযুগের সমৃদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। এ যুগের যথার্থ পরিচয়ও ক্রমশ প্রকাশমান। যথোপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে এবং ব্যাপক অনুসন্ধানের অবর্তমানে মধ্যযুগের অনেক সাহিত্য নিদর্শনের বিলুপ্তি ঘটেছে। হাতের লেখার ধরন পরিবর্তিত হওয়ায় পুরানো সাহিত্যসৃষ্টির পাঠোদ্ধার অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব বিবেচিত হয়েছে। ফলে মধ্যযুগের লেখকদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব হয়েছে এমন আশা করাও অনুচিত। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহশালায় যে বিপুল পরিমাণ হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত আছে তার বেশির ভাগেরই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। অথচ এগুলোর সবই মধ্যযুগের সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের নিদর্শন। এসবের পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে হয়ত মধ্যযুগের সাহিত্যের আরও বিস্তৃত পরিচয় লাভ সহজ হয়ে উঠত। আবার মধ্যযুগের মুসলমান কবির প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে তাঁদের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় নি। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে এই ত্রুটি সংশোধনের যে উদ্যোগ চলছে তার ফলে মধ্যযুগ সম্পর্কে অনেক তথ্যের আবিষ্কার হচ্ছে। এতে মধ্যযুগের সমৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগও যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই মধ্যযুগে মুসলমান কবিগণের অবদানও যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আধুনিক যুগের সাহিত্যনিদর্শন সহজেই জাতির জন্য উদ্দীপনার সঞ্চার করে। এর বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ ও সম্ভাবনা বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে, মধ্যযুগের মাধ্যমে আধুনিক যুগে পৌঁছে বাংলা সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রত্যক্ষ করা যায়। আধুনিক যুগের উদ্ভবের পরও অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য এসেছে এ যুগে সর্বাধিক। সমসাময়িক বা বর্তমান কালের সৃষ্টিসম্ভার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিচ্ছে। সমৃদ্ধি, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের দিক থেকে আধুনিক যুগ অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

তিন যুগ

বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের সূচনা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সাধারণভাবে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—এই তিন যুগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রাচীন যুগ ৬৫০ থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত, মধ্যযুগ ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত এবং আধুনিক যুগ ১৮০০ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। কারও কারও মতে ১২০০ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত এই দেড় শ বছর 'অন্ধকার যুগ'। আধুনিক যুগকে দু ভাগে ভাগ করা যায় : ১৮০০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায় এবং ১৮৬০ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়।

বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন যুগ বা আদি যুগের নিদর্শন চর্যাপদ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে ১৯০৭ সালে আবিষ্কৃত এবং বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষদের সাহায্যে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামক গ্রন্থের চব্বিশ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের রচিত চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের সাতচল্লিশটি গান চর্যাপদ নামে পরিচিত। চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মের গূঢ় সাধনপ্রণালী ও দর্শনতত্ত্ব নানা প্রকার রূপকের মাধ্যমে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত এ পদগুলোর যেমন সাহিত্যিক মূল্য বিদ্যমান, তেমনি প্রাচীন বাঙালি সমাজের চিত্রও এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। ধর্মনির্ভর, আধ্যাত্মিক ও আত্মগত ভাবানুভূতিপ্রধান বিষয়বস্তু অবলম্বনে আদি যুগের বাংলা সাহিত্য তৎকালীন সম্প্রদায়গত বিভেদ বিচ্ছেদ উপেক্ষা করে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত রূপ নিয়েছিল।

মধ্যযুগ ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত। অনেকে ১২০০ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময়টুকুকে যুগসন্ধি বা অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করে থাকেন। এ সময়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে বলে তেমন প্রমাণ মিলে না।

১২০৪ সালে তুর্কি বীর ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি বাংলাদেশ অধিকার করেন। পরবর্তী দেড় শ বছর রাজনৈতিক আলোড়নের জন্য কোন সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয় নি বলে অনেকের ধারণা। তাই এই দেড় শ বছরকেই অন্ধকার যুগ বলা হয়েছে। তবে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে এ দাবির সত্যতা স্বীকৃত হয় না। বাংলা সাহিত্যবর্জিত এ যুগের জন্য তুর্কিবিজয় ও তার ধ্বংসলীলাকে দায়ী মনে করা বিভ্রান্তিকর। এ দেশের মানুষের চিরন্তন জীবন যাপন ব্যবস্থা, এখানকার আবহাওয়া, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনার জন্য এ সময়ের কোন সাহিত্য নিদর্শনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা হয়ত সম্ভব হয় নি। তাছাড়া এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের বাইরে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন বর্তমান থেকে এ অপবাদের অসারতাও প্রমাণ করছে। এ সময়ে 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' সংকলিত হয়েছে, 'শূন্যপুরাণ' ও তার 'কলিমা জালাল' বা 'নিরঞ্জনের রুষ্মা,' 'ডাক' বা 'খনার বচন', 'সেকশুভোদয়ায়' ধৃত পীরমাহাত্ম্যজ্ঞাপক বাংলা আর্যা অথবা 'ভাটিয়ালী রাগেণ গীয়তে' নির্দেশক বাংলা গানের বা মন্ত্রের কথা সে আমলের সাহিত্য নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এ সব কারণে অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকার না করে ১২০০ সাল থেকেই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সূত্রপাত মনে করা উচিত।

মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। আনুমানিক চৌদ্দ শতকের শেষার্ধে বা পনের শতকের প্রথমার্ধে কবি বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি অবলম্বনে এ কাব্য রচনা করেন। এ সময়ে মৈথিলি কবি বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। মধ্যযুগের প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর পঞ্চদশ শতকে প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্য 'ইউসুফ-জোলেখা' রচনা করেন। মধ্যযুগের অন্যতম বিশিষ্ট নিদর্শন অনুবাদ সাহিত্য। পনের শতকের শেষার্ধে কবি কৃত্তিবাস কর্তৃক সংস্কৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে এ ধারার সূত্রপাত এবং মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদের মাধ্যমে তা সম্প্রসারিত হয়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এ পর্যায়ের বিশিষ্ট গ্রন্থ।

মধ্যযুগের বিরাট পরিসর জুড়ে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল। দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক এই কাব্যধারার সূত্রপাত হয় পনের শতকে। তবে ষোল শতকে এর সর্বাধিক প্রসার ঘটে। ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবমঙ্গল বা শিবায়ন প্রভৃতি এ

পর্যায়ের বিভিন্ন শাখা। মনসামঙ্গলের আদি কবি কানা হরিদত্ত। তাছাড়া নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই এই ধারার বিশিষ্ট কবি। চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মাণিক দত্ত; কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এই ধারায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে আঠার শতকে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচয়িতা কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ নতুন কাব্য সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন কাহিনি অবলম্বনে জীবনী সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হয়। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য জীবনী কাব্য। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্মমত ব্যাপকভাবে বিকশিত হয় এবং এর ওপর ভিত্তি করে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ পদকর্তাগণ বৈষ্ণব পদাবলীর ধারাটি সমৃদ্ধ করেন। রসমাধুর্যে বাংলা সাহিত্য এক অনন্য রূপ লাভ করে।

মধ্যযুগে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয় এবং সেখানকার মুসলমান কবিগণ ধর্মসংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয়কাহিনি অবলম্বনে কাব্য রচনা করে এক নতুনতর বৈশিষ্ট্য দেখান। দৌলত কাজী ও আলাওল এ সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁরা মানবিক প্রণয় কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করে ধর্মাশ্রিত কাব্যজগতে এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেন। মধ্যযুগে শাক্ত পদাবলী, নাথসাহিত্য, বাউল ও অপরাপর লোকসঙ্গীতের প্রচার হয়। ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা এ যুগের সৃষ্টি। মধ্যযুগের শেষের দিকে কবিওয়ালাদের আবির্ভাব সমকালীন স্থূলরুচির পরিতৃপ্তি ঘটায়। এ সময়ে শায়ের বা দোভাষী পুঁথিকারেরা উর্দু-ফারসি মিশ্রিত ভাষায় পুঁথিসাহিত্য সৃষ্টি করেন। এমনিভাবে ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

১৮০০ সাল থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের শুরু। ১৮০০ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত সময়টুকু প্রথম পর্যায় এবং ১৮৬০ থেকে আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্যায়। এ সময়ে দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের ফলে শিক্ষিত বাঙালি সমৃদ্ধ ইংরেজি সাহিত্যের রসাস্বাদনে তৎপর হয় এবং ইংরেজি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলনের চেষ্টা চলে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত। আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ে বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয় এবং সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গদ্য পরিণত পর্যায়ে উন্নীত হয়। অথচ আঠার শতকেই বাংলা গদ্যের ব্যবহারের বৈচিত্র্যপূর্ণ নমুনা পাওয়া গেছে। গদ্যের উৎকর্ষ সাধনের ফলে গদ্যনির্ভর সাহিত্য— যেমন প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক সৃষ্ট হয়ে বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যমুখী করে তোলে। উইলিয়াম কেরির অধিনায়কত্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠী বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক চর্চা শুরু করেন। পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের মাধ্যমে তা সাহিত্যের যথার্থ বাহন হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম সার্থক নাট্যকার। মাইকেলের বিস্ময়কর কবিপ্রতিভা বাংলা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতার সৃষ্টি

করে। তাই ১৮৬০ সাল থেকে আধুনিকতার পরিপূর্ণ লক্ষণ বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ভূদেব চৌধুরীর ভাষায়, 'নবীন বাঙালিত্বের, নব ভারতীয়তার, প্রথম উদগাতা বাঙালি-শিল্পী কবি শ্রীমধুসূদন। বাংলা সাহিত্য মধুসূদনের কাল থেকেই অসংশয়িত পদক্ষেপে আধুনিকতার পথে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে।' মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর অমর সৃষ্টি মেঘনাদবধকাব্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের ধারার প্রবর্তন করেন। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করে বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রেও যুগান্তর ঘটান। বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রথম গীতিকবিতার প্রবর্তন করেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে কাব্যই সমগ্র পরিসর জুড়ে ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে কাব্যের বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে। তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে বাংলা সাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছে। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন রেখে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরেরও অধিক কালের ইতিহাসে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি উন্নতি সাধিত হয়েছে আধুনিক যুগের উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই দেড় শ বছরে। বিশেষত ১৮৬০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আশি বছরের অবদান সমৃদ্ধি ও গতিশীলতার অনবদ্য নিদর্শন।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিন যুগের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছে। সাহিত্যে বরাবরই জীবনের প্রতিফলন স্পষ্ট। যুগে যুগে জীবনাদর্শের পরিবর্তনের ছাপ ফুটে ওঠে সাহিত্যে। কাল বদলায়, জীবনাদর্শও পরিবর্তিত হয়। সাহিত্যসৃষ্টি সে পরিবর্তনের চিহ্ন নিয়ে নতুন যুগে নতুন বৈশিষ্ট্যে দেখা দেয়। যুগধর্মকে সাহিত্যস্রষ্টা অস্বীকার করেন না। সে যুগধর্ম সাহিত্যে এক যুগ থেকে আরেক যুগের পার্থক্যের সৃষ্টি করে থাকে। প্রাচীন যুগের সাহিত্যের নিদর্শন স্বল্প পরিমাণ এবং তাতে ধর্মীয় বক্তব্য প্রাধান্য পেয়েছে বলে কাব্যের উৎকর্ষপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে তা চিহ্নিত হতে পারে নি। এ ভাষায় প্রাচীনতার বৈশিষ্ট্য তাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে নি বলে এতে অপভ্রংশের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পরিসর যথেষ্ট বিস্তৃত। এ সময়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রাচীন যুগের মতই ধর্মীয় পরিবেশ থেকে তেমন মুক্তি লাভ করে নি। মধ্যযুগের সাহিত্য প্রধানত ধর্মনির্ভর। একমাত্র মুসলমান কবিগণের রচিত প্রণয়োপাখ্যানগুলো ধর্মীয় বিষয়বস্তুর সীমানার বাইরে ছিল। সে সবের মধ্যে মানবিক কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। তবে প্রাচীন যুগের বৈচিত্র্যহীনতা এ যুগেও অবর্তমান। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মধ্যযুগের সাহিত্য রচিত হলেও তাতে নানা ধরনের বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং অনেক কবিই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দান করেছেন। অবশ্য এ যুগের সাহিত্যে মৌলিকতার খুব বেশি পরিচয় মিলে না। প্রাচীন ও মধ্য উভয় যুগে কাব্যই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগেই বাংলা সাহিত্য বৈচিত্র্যে, উৎকর্ষে ও ভাষার বিবর্তনে গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। ধর্মীয় বিষয়ের সীমাবদ্ধতা থেকে এ যুগের সাহিত্য মুক্ত। গদ্যের প্রচলনে এ সময়কার সাহিত্য নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য

প্রভাবে আধুনিক যুগেই বাংলা সাহিত্যের নবজীবন দেখা দিয়েছে। মধ্যযুগ পর্যন্ত পল্লী বাংলার বুকে যে সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য প্রভাবে কালান্তর ঘটিয়ে কলকাতা তথা নগরকেন্দ্রিক আসর জমাল।

সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিবেচনা করেই বাংলা সাহিত্য প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে বিভক্ত। এই তিন যুগের সাহিত্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য যেমন স্পষ্ট, তেমনি প্রকাশকলার দিক থেকেও ভিন্নতা রয়েছে। এমনও দেখা যায় যে, একই বিষয় ভিন্ন যুগের কবিরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। মধ্যযুগে পৌরাণিক কাহিনি যে ভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে আধুনিক যুগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের হাতে তা পেয়েছে স্বতন্ত্র মর্যাদা। মূল্যবোধের পরিবর্তনের জন্য সাহিত্যে আসে পরিবর্তন। আধুনিক যুগে এই কারণে সাহিত্যে এসেছে বিচিত্র বিষয়বস্তু এবং তার প্রকাশের জন্য এসেছে আঙ্গিকের বৈচিত্র্যপূর্ণ ধারা। গদ্য ও পদ্যের বিচিত্র রূপ এযুগে প্রকাশমান। সাহিত্যে যুগে যুগে মানুষের মর্যাদা বিবেচনা করলেও যুগের পার্থক্য লক্ষণীয় হতে পারে। বক্তব্য প্রকাশের পদ্ধতিও সাহিত্যের যুগবিভাগে বিবেচিত হয়ে থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় যুগবিভাগের বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করা যায়।

তবে সাহিত্যের যুগবিভাগের দিনক্ষণ তথা নির্ধারিত সীমারেখা সম্পর্কে পণ্ডিতগণ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, 'ভাষা-সাহিত্যের জন্মলগ্ন কিংবা বিবর্তন-রূপান্তর দিন-সন দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে না। সবটাই হবে লাক্ষণিক ও আনুমানিক। তাও আবার কোথাও স্থূল, কোথাও সূক্ষ্ম, কখনও আঙ্গিকগত, কখনও মর্মগত। তাছাড়া স্থান-কাল-প্রতিবেশ (শাস্ত্র-সমাজ-সরকার) অভিন্ন থাকা সত্ত্বেও সামাজিক আর্থিক শৈক্ষিক নৈতিক অবস্থানভেদে মানুষের ব্যক্তিক ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণ বিপরীতমুখী এবং বহু বিচিত্র হতে পারে। কাজেই কোন যুগই একক লক্ষণে মর্মে আঙ্গিকে বক্তব্যে চিহ্নিত হতে পারে না। কোন সাহিত্যেরই—বাংলা সাহিত্যেরও দেয়াল তোলা যুগবিভাগ সম্ভবও নয়, স্বাভাবিকও নয়, এমন কি বাঞ্ছিতও নয়।' তাই যুগবিভাগ নিয়ে গবেষকগণের মধ্যে মত পার্থক্যের অভাব নেই।

যুগবিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন মত

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের শাসক ও ধর্মমতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কেউ কেউ যুগবিভাগ করেছেন বলে এই মতানৈক্য প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাচীন ও আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস রচনার গৌরব পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের প্রাপ্য। ১৮৭৩ সালে তিনি 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও উনিশ শতকের সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করেন। তাঁর ইতিহাস তিনটি অংশে বিভক্ত হয়েছিল :

১. আদ্যকাল অর্থাৎ প্রাক-চৈতন্য পর্ব। এই অংশে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের আলোচনা আছে,

২. মধ্যকাল অর্থাৎ চৈতন্যযুগ থেকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত,

৩. ইদানীন্তন কাল—ভারতচন্দ্র থেকে রামগতি ন্যায়রত্নের সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের বিবরণ রয়েছে।

১৮৯৬ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে ড. দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাস তুলে ধরেন এবং সেখানে বিভিন্ন সাহিত্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বাংলা সাহিত্যকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করেন।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন যুগবিভাগ করেছেন এ ভাবে :

ক. হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ (৮০০ থেকে ১২০০ সাল),

খ. গৌড়ীয় যুগ বা শ্রীচৈতন্য পূর্ব যুগ,

গ. শ্রীচৈতন্য সাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম যুগ,

ঘ. সংস্কার যুগ এবং

ঙ. কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ।

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সামনে তথ্যের অভাব ও গবেষণার অপূর্ণতা বিদ্যমান ছিল বলে তিনি যুগ লক্ষণ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেন নি। প্রাচীন যুগকে তিনি যে অর্থে হিন্দু-বৌদ্ধযুগ বলে চিহ্নিত করেছেন তা একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ দিয়ে প্রমাণিত হয় না। কোন সঠিক সূত্র প্রয়োগে তিনি যুগবিভাগ করেন নি; কোথাও ধর্ম, কোথাও শাসক তাঁর যুগবিভাগে আদর্শ হয়েছে বলে তা সুষ্ঠু হতে পারে নি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের যে যুগবিভাগ করেছেন তা হল :

ক. প্রাচীন বা মুসলমানপূর্ব যুগ (৯৫০-১২০০ সাল),

খ. তুর্কি বিজয়ের যুগ (১২০০-১৩০০),

গ. আদি মধ্যযুগ বা প্রাকচৈতন্য যুগ (১৩০০-১৫০০),

ঘ. অন্ত্য মধ্যযুগ (১৫০০-১৮০০), চৈতন্য যুগ বা বৈষ্ণবসাহিত্য যুগ(১৫০০-১৭০০) ও নবাবি আমল (১৭০০-১৮০০) এবং

ঙ. আধুনিক বা ইংরেজি যুগ (১৮০০ সাল থেকে)।

উপরোক্ত যুগবিভাগও ত্রুটিমুক্ত নয় বলে মনে করা হয়। মুসলমানপূর্ব যুগ কথাটির সঙ্গে তুর্কি বিজয়ের যুগ, প্রাকচৈতন্য বা চৈতন্য যুগ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নবাবি আমল বা ইংরেজি যুগ কথাও যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ অন্যান্য শাসকের নামানুসারে অপরাপর অংশ চিহ্নিত হয় নি। বৈষ্ণবসাহিত্য যুগ নামে কোন যুগ চিহ্নিত হলে অন্যান্য সাহিত্যের পরিচয়সূচক যুগও চিহ্নিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এ সব কারণে এ ধরনের যুগবিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।

ড. আহমদ শরীফ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে চারটি যুগে বিভক্ত করেছেন :

১. মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন শাসন কাল—প্রাচীন যুগ।

২. তুর্কি-আফগান-মোগল শাসন কাল—মধ্যযুগ।

ক. আদি মধ্যযুগ—তের-চৌদ্দ শতক।

খ. মধ্যযুগ—পনের-আঠার শতক।

৩. ব্রিটিশ শাসন কাল—আধুনিক যুগ।
৪. স্বাধীনতা-উত্তর কাল—বর্তমান যুগ।

এ ধরনের যুগবিভাগ করা হয়েছে রাজ্য-রাজত্ব হাত বদল হওয়ার ফলে মানস ও ব্যবহারিক জীবনে যে পরিবর্তন ঘটে তার পরিপ্রেক্ষিতে।

গোপাল হালদার মধ্যযুগকে—
ক. প্রাকচৈতন্য পর্ব (১২০০-১৫০০),
খ. চৈতন্য পর্ব (১৫০০-১৭০০) এবং
গ. নবাবি আমল (১৭০০-১৮০০)—এই তিন পর্বে ভাগ করেছেন।

অন্যদিকে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগকে—
ক. প্রথম পর্ব : প্রাকচৈতন্য যুগ—চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী,
খ. দ্বিতীয় পর্ব : চৈতন্য যুগ—ষোড়শ শতাব্দী,
গ. তৃতীয় পর্ব : উত্তর চৈতন্য যুগ—সপ্তদশ শতাব্দী এবং
ঘ. চতুর্থ পর্ব : অষ্টাদশ শতাব্দী—এ ভাবে বিভক্ত করেছেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মধ্যযুগকে—
ক. পাঠান আমল (১২০১-১৫৭৬) এবং
খ. মোগল আমল (১৫৭৭-১৮০০) হিসেবে ভাগ করেছেন।

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে মধ্যযুগ—
ক. তুর্কি যুগ (১২০০-১৩৫০),
খ. সুলতানি যুগ (১৩৫১-১৫৭৫) এবং
গ. মোগলাই যুগ (১৫৭৬-১৭৫৭)—এই তিন পর্বে বিভক্ত।

ড. আহমদ শরীফ মধ্যযুগকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন :
প্রথম যুগ : ১৩-১৪ শতক—সৃজ্যমান লোকায়ত সাহিত্যের কথকতার যুগ।
দ্বিতীয় যুগ : ১৫ শতক—লিখিত লৌকিক দেবসাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যের যুগ।
তৃতীয় যুগ : ১৬ শতক—ভাববিপ্লব যুগ বা রেনেসাঁস যুগ।
চতুর্থ যুগ : ১৭ শতক—লোকায়ত পীর-দেবতাদের যুগ।
পঞ্চম যুগ : ১৮ শতক—অবক্ষয় যুগ।

এমনিভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন মতের প্রকাশ ঘটেছে। এ সব মতপার্থক্য দূর করার জন্য কেউ কেউ মধ্যযুগকে আদি মধ্যযুগ (১২০০-১৫০০) এবং অন্ত্য মধ্যযুগ (১৫০০-১৮০০)—এই দুই পর্যায়ে ভাগ করেছেন। ড. সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, শৈব, ঐসলামিক ইত্যাদি যুগবিভাগকে একেবারে কাল্পনিক মনে করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে যথাসম্ভব কালানুক্রমিক এবং objective বা বস্তুগতভাবে বর্ণনা করেছেন। ড. আনিসুজ্জামান মনে করেন, 'আমাদের দেশের ও সাহিত্যের ইতিহাসে অনুসৃত তিন পর্বের ধারণা সম্পর্কে, অর্থাৎ এই ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে বিভক্ত করে দেখার বিষয়ে, আমার

কিছু সংশয় আছে। বাংলা সাহিত্যের অনেক ইতিহাসে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যে যে-ভেদরেখা অঙ্কন করা হতো, নবচর্যাগীতি-আবিষ্কারের পরে তা নিরর্থক হয়ে গেছে। সূচনা থেকে মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়টাকে বাংলা সাহিত্যের একটি মাত্র পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করার কোনো বাধা আর এখন নেই। সুকুমার সেন আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ধারাকে অখণ্ডরূপে দেখেছেন। মুহম্মদ এনামুল হকও আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলে কোনো যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। একথা বোধহয় মিথ্যে নয় যে, পৃথিবীর এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ইউরোপকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করার ফলে এই তিন পার্বিক ইতিহাসরচনার শুরু হয়, পরে তা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেও বিস্তৃত হয়।'

বাংলা সাহিত্যের তিন যুগের বৈশিষ্ট্য যদি বহিরাগত শক্তির অবদানে বিবেচনা করতে হয় তাহলে এর তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায় এমন হতে পারে :

ক. আদি পর্যায় : প্রাক-তুর্কি আগমন, ১২০০ সাল পর্যন্ত।

খ. মধ্য পর্যায় : তুর্কি আগমন পরবর্তী কাল, ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত।

গ. আধুনিক পর্যায় : ইউরোপ প্রভাবিত কাল, ১৮০০ সাল থেকে পরবর্তী কাল।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায় ১৮০০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৬০ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রায় দেড় শ বছর বাংলা সাহিত্যের যে ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তাতে সবখানে একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে এমন দাবি করা সমীচীন হবে না। বিশেষত ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের প্রেক্ষিতে এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র রূপ ফুটে ওঠার সুযোগ হয়েছে। বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের মহান শহীদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি নতুন সহস্রাব্দে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় বিশ্ব জুড়ে বাংলা ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যের যে গুরুত্ব ও মর্যাদা তাতে এখানকার স্বতন্ত্র সাহিত্যে সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে মতের ভিন্নতার মাধ্যমে সাহিত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। তবে কালগত ও বিষয়গত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—এ তিন যুগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে বিভক্ত করাই সমীচীন। যুগবিভাগে সুনির্দিষ্ট সন তারিখের চেয়ে সাহিত্যের লক্ষণ, ভাব ও ভাষাগত বিবর্তন প্রধানত বিচার্য। যুগান্তকারী ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে জাতীয় জীবনীশক্তি উদ্বেলিত হয়ে উঠলে সাহিত্যের বিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন আদি ও মধ্যযুগের সন্ধিলগ্নে তুর্কি আক্রমণ জীবন-প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। তখন সহজাত উদ্দীপনায় বাঙালি জীবন ও সাহিত্যে একটি নতুন পর্যায় আত্মপ্রকাশ করে। তেমনি মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে বিজ্ঞানদম্ভী ইউরোপীয় বণিক সভ্যতা বাঙালির নির্জীব মনোজগতে যে সংগ্রামের ঝড় তুলেছিল তারই প্রভাবে বাংলা সাহিত্য নবজন্ম লাভ করেছিল। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে বাংলাদেশের সাহিত্যের গতিধারার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৭১

সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের মনে নবচেতনার সঞ্চার করে। সমকালীন সাহিত্যে তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা। এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের ফলে বিশ্বের উন্নত সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় তার ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার বিকাশ ঘটে। তবে আধুনিকতার বিশিষ্ট লক্ষণগুলো কোন সুনির্দিষ্ট দিন তারিখ থেকে বিকশিত হয়েছে এমন দাবি করা অসঙ্গত। বিভিন্ন লেখকের রচনায় আধুনিকতার যে লক্ষণ ফুটে উঠেছে তা বিভিন্ন সময়ে রচিত ও প্রকাশিত সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। চিন্তাচেতনা, প্রকাশভঙ্গি, শব্দব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিকতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে সাহিত্যকে আধুনিক যুগের নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তাই বিভিন্ন যুগের লক্ষণের দিক থেকে সময়ের ব্যবধান থাকলেও তা সমন্বয় করে একটি নির্দিষ্ট সময় ভিত্তি করে বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ নির্দেশিত হয়েছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত যুগবিভাগের (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক) নীতি অনুসারে কোন কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে মধ্যযুগ প্রাচীন যুগ হইতে ব্যতিক্রম? এই উভয় যুগের মধ্যে ভাব ও ভাষাগত কোন প্রকার যোগসূত্র নির্মাণ করা চলে কি?

২। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের যুগবিভাগ দেখাও। তোমার প্রদর্শিত যুগবিভাগের ভিত্তি ও নীতির সমর্থনে তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শন কর।

৩। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মত আছে। তুমি এই মতগুলির সমন্বয় সাধন করিয়া তোমার নিজের মতামত দান কর।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগের বিভিন্ন প্রণালীর উল্লেখ কর এবং ইহাদের মধ্যে তুমি কোনটির পক্ষপাতী, তাহা যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৫। সাহিত্যে যুগবিভাগ কি যুক্তিসঙ্গত? বাংলা সাহিত্যে তোমার গ্রহণযোগ্য যুগবিভাগের একটি পরিকল্পনা দেখাও এবং সেইরূপ বিভাগের যৌক্তিকতা আলোচনা কর।

৬। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ভাব বা বিষয়ানুগ যুগবিভাগ সম্ভব কি-না আলোচনা কর।

৭। 'কোন দেশের সাহিত্যে এমন তারিখ পাওয়া দুষ্কর, যেখানে এসে আমরা নিশ্চিতভাবে একটি যুগের সমাপ্তি ও অপরটির সূচনা নির্দেশ করতে পারি। তবু সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতার পক্ষে এ ধরনের যুগবিভাগ করা অত্যাবশ্যক।'—এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে তোমার কি অভিমত ব্যক্ত কর।

৮। যুক্তি-প্রমাণযোগে বাংলা সাহিত্যের ক্রম-বৈচিত্র্য ভিত্তিক যুগবিভাগ দেখাও।

৯। বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতামত বিশ্লেষণ করে এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সর্বাধিক যুক্তিসম্মত যুগবিভাগ তোমার মতে কিরূপ হওয়া উচিত? বিভিন্ন ঐতিহাসিকের এতদ্বিষয়ক মতামত স্মরণ রেখে তোমার বক্তব্য পেশ কর।

প্রাচীন যুগ

তৃতীয় অধ্যায়
চর্যাপদ

বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাসকে তিন যুগে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রথম যুগের নাম প্রাচীন যুগ। তবে কেউ কেউ আরও কয়টি নামে এ যুগকে অভিহিত করেছেন। সে নামগুলো হল : আদ্যকাল, গীতিকবিতার যুগ, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, আদি যুগ, প্রাক-তুর্কি যুগ, গৌড় যুগ ইত্যাদি। তবে প্রাচীন যুগ নামটির ব্যবহার ব্যাপক ও যথার্থ যুক্তিসঙ্গত।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদের প্রায় সমসাময়িক কালে বাংলাদেশে যে সব সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ উপকরণ নয়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাপদগুলো সম্পর্কে ১৯০৭ সালের আগে কোন তথ্যই জানা ছিল না। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত Sanskrit Buddhist Literature in Nepal গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করে যে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিলেন তাতে উদ্দীপ্ত হয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৃতীয় বার নেপাল সফর কালে নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে ১৯০৭ সালে সে সাহিত্যের কতকগুলো পদ আবিষ্কার করেন। তাঁর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে সে সব পদ ১৯১৬ সালে (১৩২৩ সনে) চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদ ও কৃষ্ণপাদের দোহা এবং ডাকার্ণব—এ চারটি পুঁথি একত্রে 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে একমাত্র চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ই প্রাচীন বাংলায় লেখা; অন্য তিনটি বাংলায় নয়, অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ১৯২৬ সালে এগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রথম আলোচনা করেন। ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন। ১৯৩৮ সালে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্তৃক চর্যার তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

চর্যাপদের প্রাপ্ত পুঁথিতে উল্লেখকৃত সংস্কৃত টীকাকার মুনিদত্তের মতানুসারে এই পদসংগ্রহের নাম 'আশ্চর্যচর্যাচয়'। নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিতে পদগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। এ দুটি নাম মিলিয়ে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' নামের পরিকল্পনা করেন। সে আমলে শত শত চর্যাগীতি রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। মুনিদত্তের মত অনেকেই বিভিন্ন চর্যাগীতির টীকা রচনা করেছিলেন। কীর্তিচন্দ্র মুনিদত্তের টীকার তিব্বতি অনুবাদ করেছিলেন 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' নামে। এতে মনে হয় মূল সংকলনের নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ'। আধুনিক পণ্ডিতগণের অনুমান যে পুঁথিটির নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ' এবং এর সংস্কৃত টীকার নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'।

চর্যাপদের পুঁথিটি যে-রূপে পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যায়, এটি বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত বিভিন্ন কবির রচিত কবিতা-সমষ্টির সংকলন। কবিতাগুলোর বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গিতে যে দুর্বোধ্যতা ছিল তা দূর করার জন্য মুনিদত্ত পদগুলোকে একত্রিত করে সংস্কৃত ভাষায় পদগুলোর সহজবোধ্য টীকা রচনা করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিতে মূল চর্যাপদ ও মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা যুক্ত করা হয়েছে। পুঁথিটি খণ্ডিত ছিল বলে টীকাকারের নাম পাওয়া যায় নি। পরে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী একই সংকলনের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন এবং তাতে টীকাকার হিসেবে মুনিদত্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবিষ্কৃত পুঁথিটি মুনিদত্তের মূল সংকলন গ্রন্থ নয়—এটি ছিল অনুলিপি অথবা অনুলিপির অনুলিপি।

চর্যাপদ আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলা ভাষার আদি স্তরের লক্ষণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে পালযুগের সাধারণ বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় এতে রূপলাভ করেছে। চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলে বিবেচিত হওয়ায় প্রাচীন বাঙালির জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক রহস্যের সমাধান ঘটেছে। চর্যাপদ সদ্য নির্মীয়মান বাংলা ভাষার নিদর্শন। এর রচয়িতাগণ দুরূহ ধর্মতত্ত্বকে সহজবোধ্য রূপকে উপস্থাপন করেছেন। আর সেই সঙ্গে রেখেছেন কবিত্বশক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

চর্যার প্রাপ্ত পুঁথিতে একান্নটি গান ছিল। তার মধ্যে একটি (১১ সংখ্যক) পদ টীকাকার কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয় নি। আবার পুঁথির কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ (২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক) পদ এবং একটি (২৩ সংখ্যক) পদের শেষাংশ পাওয়া যায় নি। তাই পুঁথিতে সর্বসমেত সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে।

চর্যাপদের প্রাপ্ত পুঁথিটির লিপিকাল বার বা চৌদ্দ থেকে ষোল শতকের মধ্যে বলে অনুমান করা হয়। তবে ১১৯৯ সালে লিপিকৃত 'পঞ্চাকার' নামের পুঁথির লিপির সঙ্গে চর্যাপদের লিপির সাদৃশ্য বিবেচনা করে কেউ কেউ এর লিপিকাল বার শতক বলে মনে করেন। চর্যার পুঁথিটি বাংলা অক্ষরে লিপিকৃত।

চর্যাপদের প্রধান আলোচকগণ

১৯০৭ সালে চর্যাপদ আবিষ্কারের পর থেকে অনেক পণ্ডিত এ বিষয়ে আলোচনা করে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। চর্যাপদের আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ১৯১৬ সালে চর্যাগীতি প্রকাশ করে তিনি একে বাংলা ভাষার প্রথম অবস্থার রচনা বলে যে ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন তা পরবর্তী কালের গবেষকগণ মেনে নিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে প্রকাশিত দুটি দোহাকোষ ও একটি ডাকার্ণব বাংলা রচনা ছিল না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কারের কাহিনি বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, '১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুঁথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মত, গানের নাম চর্যাপদ।' এখান থেকেই চর্যাপদের আলোচনা পর্যালোচনার শুরু। বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯২০ সালে প্রথম

চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। চর্যাগীতির বৈয়াকরণ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে ভাষা আলোচনা করে দেখালেন চর্যাপদ 'বাংলা নিশ্চয়ই, বাংলার প্রায় মূর্তি—অবহটঠের সদ্যোনির্মোক মুক্ত রূপ।' ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার এবং ১৯৩৮ সালে তা প্রকাশ করে চর্যার জট উন্মোচন করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯২৭ সালে চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন এবং ১৯৪২ সালে চর্যাপদের সঠিক পাঠ নির্ণয় করে আলোচনার পথ আরও সহজ করেন। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৪৬ সালে চর্যাগীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। বিহারের প্রখ্যাত পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য, বৌদ্ধ সহজযান ও চর্যাগীতিকা নিয়ে ইংরেজি ও হিন্দিতে প্রচুর গবেষণা করেছেন। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় চর্যাপদ থেকে বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপ এবং বাক্যগঠনরীতির স্বরূপ দৃষ্টান্তযোগে দেখিয়েছেন। এসব আলোচনার ফলে দেশে ও বাইরে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বলে চর্যাপদের আলোচনা ক্রমেই বাড়ছে।

চর্যাপদের কবি

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের মোট চব্বিশ জন পদকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়। গানের মাঝে ও শেষে তাঁরা ভণিতা দিয়েছেন। তবে কারও কারও গুরুর ভণিতা আছে। নামের শেষে গৌরবসূচক 'পা' যোগ করা হয়েছে। চর্যার চব্বিশ জন পদকর্তা হলেন : লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুণ্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন, কম্বলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, সবর, আজদেব, ঢেণ্টণ, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জঅনন্দি, ধাম, তন্ত্রী ও লাড়ীডোম্বী। লাড়ীডোম্বীপার কোন পদ পাওয়া যায় নি।

এ সব নামের কতকগুলো ছদ্মনাম। যেমন : কুক্কুরী, ডোম্বী, শবর, তাড়ক, কঙ্কণ, তন্ত্রী। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি থেকে তাঁরা এসেছিলেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে অনেকে গার্হস্থ্য আশ্রমের সঙ্গে পিতৃদত্ত নামও ত্যাগ করেছিলেন। বৌদ্ধ সহজযানী ও বজ্রযানী আচার্যগণ সিদ্ধাচার্য নামে খ্যাত ছিলেন। চর্যাগীতিকার প্রায় পদকারই বৌদ্ধ চৌরাশি সিদ্ধার অন্তর্গত। চর্যাকারদের মধ্যে লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, ডোম্বী,শবর, ধাম, জঅনন্দি ছিলেন বাঙালি। ভাষাবিচারে আরও কেউ কেউ বাঙালি হতে পারেন। তবে কয়েকজন অবাঙালিও ছিলেন। চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ আছে কাহ্নপাদের, সংখ্যায় তেরটি। তাছাড়া ভুসুকুর আট, সরহের চার, লুই, শান্তি, শবরের দুটি করে, অন্যদের একটি করে পদ বিদ্যমান। অনেকের মতে আদি চর্যাকার লুইপা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে প্রাচীনতম চর্যাকার শবরী এবং আধুনিকতম সরহ অথবা ভুসুকু।

সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়' গ্রন্থে রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে কয়েকজন চর্যাকারের আবির্ভাব কাল এভাবে উল্লেখ করেছেন :

১. আর্যদেব	আট শতকের মধ্যভাগ	সরহের প্রশিষ্য
২. কম্বলাম্বর পা	নয় শতকের মধ্যভাগ	বজ্রঘণ্টের শিষ্য ও দারিকের প্রশিষ্য
৩. গুণ্ডরী পা	নয় শতকের প্রথমার্ধ	সরহের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য

৪.	তন্ত্রী পা	নয় শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষ ভাগ	জালন্ধরী পার শিষ্য
৫.	মহী পা	নয় শতকের শেষ ভাগ	কাহ্ন পার শিষ্য
৬.	কঙ্কণ পা	নয় শতকের শেষ ভাগ	দারিকের শিষ্য
৭.	বীণা পা	দশ শতকের শেষ ভাগ	ভদ্র পার শিষ্য

কাহ্ন পাদ

চর্যাপদের কবিগণের মধ্যে সর্বাধিক পদরচয়িতার গৌরবের অধিকারী কাহ্ন পাদ। তাঁর তেরটি পদ চর্যাপদ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। এই সংখ্যাধিক্যের পরিপেক্ষিতে তাঁকে কবি ও সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা যায়। কানু পা কৃষ্ণপাদ ইত্যাদি নামেও তিনি পরিচিত। বিভিন্ন পদে কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্নু, কাহ্ন, কাহ্নি, কাহ্নিলা, কাহ্নিল্য প্রভৃতি ভণিতা লক্ষ করা যায়। খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকে কানু পার আবির্ভাব হয়েছিল বলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন। কানু পার বাড়ি ছিল উড়িষ্যায়, তিনি সোমপুর বিহারে বাস করতেন। রাহুল সংকৃত্যায়ন কাহ্ন পা বা কৃষ্ণ পাদ বা কৃষ্ণাচার্য পাদ বা কৃষ্ণবজ্র পাদকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। তিনি দেব পালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। তাঁর জীবৎকালের উর্ধ্বসীমা ৮৪০ সাল। তিনি বর্ণে ব্রাহ্মণ এবং ভিক্ষু ও সিদ্ধ। তিনি পণ্ডিত-ভিক্ষু নামে খ্যাত ছিলেন। চর্যাপদ ছাড়াও তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনা করেছিলেন। বিষয়বস্তুর বিচারে কাহ্ন পা সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের যোগী ছিলেন বলে অনুমিত হয়। ড. সুকুমার সেনের মতে, 'কাহ্নুর চর্যাগীতির রচনারীতিতে অস্পষ্টতা নাই। কয়েকটি প্রেমলীলা-রূপকমণ্ডিত চর্যাকে সেকালের প্রেমের কবিতার নিদর্শন বলিয়া লইতে পারি।'

কাহ্ন পা রচিত চর্যাগীতির একটি নিদর্শন :

এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ ॥
কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবণ পইসি নিবিতা ॥
জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ ॥
ছড়গই সঅল সহাবে সুধ।
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ॥
দশবর রঅণ হরিঅ দশ দিসেঁ।
বিদ্যাকরি দম জা অহিলেসেঁ ॥

আধুনিক বাংলা : এবংকার দৃঢ় বন্ধনস্তম্ভ মথিত করে, বিবিধ ব্যাপক বন্ধন ভেঙে ফেলে আসবমত্ত কানু বিলাস করে। সে শান্ত হয়ে সহজ নলিনীবনে প্রবেশ করে। হস্তী যেমন হস্তিনীতে আসক্ত হয় তেমনি মদকল তথতা বর্ষণ করে। ষড়গতি সকল স্বভাবে শুদ্ধ। ভাবে ও অভাবে এক চুলও ক্ষুব্ধ হয় না। দশদিকে দশবল রত্ন আহরণ করে বিদ্যারূপ হস্তীকে অক্লেশে দমন কর।

ভুসুকু পা

চর্যাগীতি রচনার সংখ্যাধিক্যে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হলেন ভুসুকু পা। তাঁর রচিত আটটি পদ চর্যাপদ গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। নানা কিংবদন্তি বিচারে ভুসুকু নামটিকে ছদ্মনাম বলে মনে করা হয়। তাঁর প্রকৃত নাম শান্তিদেব। তিনি সৌরাষ্ট্রের রাজপুত্র ছিলেন এবং শেষ জীবনে নালন্দায় বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করেন। সেজন্য ভুক্তির ভু, সুপ্তির সু এবং কুটিরের কু—এই তিন আদ্যক্ষর যোগে তাঁকে ভুসুকু বলে পরিহাস করা হত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে শান্তিদেব ভুসুকু সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে ভুসুকুর জীবৎকালের শেষ সীমা ৮০০ সাল। ধর্মপালের রাজত্বকালে (৭৭০-৮০৬ সাল) ভুসুকু জীবিত ছিলেন। তিনি রাউত বা অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন। পরে ভিক্ষু ও সিদ্ধা হন। তবে অনেকে এই শান্তিদেব ভুসুকু ও চর্যা রচয়িতা ভুসুকুকে পৃথক ব্যক্তি বলে অনুমান করেছেন। কারও কারও অনুমান চর্যার ভুসুকুর সময় একাদশ শতকের মধ্যভাগ। 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।'—ভুসুকুর এই উক্তিকে প্রমাণ স্বরূপ মনে করে তাঁকে বাঙালি অনুমান করা হয়।

ভুসুকু রচিত চর্যাপদের নমুনা :

কাহেরি ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেটিল ডাক পড়অ চৌদীস ॥
আপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু আহেরী ॥
তিণ চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জানী ॥
হরিণী বোলঅ সুণ হরিআ তো।
এ বণ চ্ছাড়ী হোস্ত ভান্তো ॥
তরসঁন্তে হরিণার খুর ণ দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মুঢ়া হিঅহি ণব পইসঈ ॥

আধুনিক বাংলা : কাকে নিয়ে কাকে ছেড়ে কেমন করে আছি। চারপাশ ঘিরে হাঁক পড়ে। আপন মাংসের জন্যই হরিণ শত্রু। এক মুহূর্তের জন্যও শিকারি ভুসুকু ছাড়ে না। হরিণ ঘাসও ছোঁয় না, জলও পান করে না। হরিণ হরিণীর নিলয় জানা যায় না। হরিণী বলে—হরিণ তুমি শোনো, এ বন ছেড়ে চলে যাও। লাফ দেওয়ার জন্য হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলেন—এ তত্ত্ব মূঢ় ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

লুই পা

চর্যাপদের প্রথম কবিতা লুইপার লেখা। কবিতাটি এ রকম :

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥

দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥
সঅল সহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই ॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপথ ভিতি লেহু রে পাস ॥
ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা ॥

আধুনিক বাংলা : শ্রেষ্ঠ তরু এই শরীর, পাঁচটি তার ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করে। চিত্তকে দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই বলেন, গুরুকে শুধিয়ে জেনে নাও। কেন করা হয় সমস্ত সমাধি? সুখে দুঃখে সে নিশ্চিত মারা যায়। ছলবন্ধ কপট ইন্দ্রিয়ের আশা পরিত্যাগ কর। শূন্যতা পক্ষে ভিড়ে পার্শ্বে নাও। লুই বলেন, আমি ধমন চমন দুই পিঁড়িতে বসে ধ্যানে দেখেছি।

সাধারণত লুই পাকে আদি সিদ্ধাচার্য বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও রাহুল সংকৃত্যায়ন তাঁকে প্রথম বলে স্বীকার করেন না। লুই পা বাঙালি বলে অনুমিত। উড়িষ্যায় তাঁর জন্মস্থান বলে কারও কারও ধারণা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন, তারানাথের মতে লুই বাংলাদেশের গঙ্গার ধারে বাস করতেন। তিনি প্রথম জীবনে উদ্যানের (সোয়াতের) রাজার কায়স্থ বা লেখক ছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল সামন্ত শুভ। তিনি উড়িষ্যার রাজা ও মন্ত্রীর গুরু ছিলেন। লুইপার জীবৎকাল ৭৩০-৮১০ সাল। সংস্কৃত ভাষায় তিনি চারটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর একটি গ্রন্থের নাম 'অভিসময়বিভঙ্গ।'

শবর পা

শবর পা ছিলেন বাঙালি এবং তিনি ছিলেন ব্যাধ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে শবর পা ৬৮০ থেকে ৭৩২ সালে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, শবর পা ছিলেন বিক্রমশীলা নিবাসী, কুলে ক্ষত্রিয় এবং অন্যতম সিদ্ধা। তিনি ৮৮০ সালের দিকে বর্তমান ছিলেন। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থের প্রণেতা। ড. সুকুমার সেনের মতে, লুই পার গুরু শবর পার জীবৎকাল আট শতকের প্রথমার্ধ।

বিরূপ পা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, জালন্ধরী পার শিষ্য বিরূপ ছিলেন বাঙালি। তাঁর জন্মস্থান দেবপালের রাজ্য ত্রিপুরায়। তাঁর শিষ্য ডোম্বী পা। বিরূপ আট শতকে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, বিরূপ পা ভিক্ষুরূপে সোমপুরী বিহারে বাস করতেন। তিনি দেবপালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবৎকালের শেষ সীমা ৮৩০ সালের শেষের দিকে। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

ডোম্বী পা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, ডোম্বী পা ত্রিপুরা বা মগধের রাজা ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন বিরূপ পা। ডোম্বী পার জীবৎকাল ৭৯০ থেকে ৮৯০ সাল। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, ডোম্বী পার জীবৎকালের শেষ সীমা দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৬-৪৯ সাল) ৮৪০ সাল অবধি। তিনি বর্ণে ক্ষত্রিয়, নিবাস মগধ এবং চুরাশি সিদ্ধার একজন।

দারিক পা

কারও কারও ধারণা দারিক পা ছিলেন লুই পার শিষ্য। সে হিসেবে তাঁর সময়কাল অষ্টম শতকের শেষ ভাগ ও নবম শতকের প্রথমার্ধ। তাঁর চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা। অন্য মতে শালীপুত্রের রাজা ইন্দ্রপালই দারিক পা। তাঁর জন্মস্থান উড়িষ্যার শালীপুত্র। তিনি পরে সিদ্ধা হন।

কুক্কুরী পা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, কুক্কুরী পা বাংলাদেশের লোক। তিনি ইন্দ্রভূতির অন্যতম গুরু। তিনি আট শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, কুক্কুরী পা দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। জীবৎকালের উচ্চতম সীমা ৮৪০ সাল। তাঁর জন্মস্থান কপিলাবস্তু। তাঁর জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণ বংশে। তিনি ছিলেন অন্যতম সিদ্ধা। তারানাথের মতে একটি কুক্কুরী সর্বদা সঙ্গে রাখতেন বলেই এই সিদ্ধা কুক্কুরী পা নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

কম্বলাম্বর পা

কম্বলাম্বর বা কম্বল ইন্দ্রভূতি ও জালন্ধরী পার গুরু। তিনি কনকারামের বা কঙ্করের রাজপুত্র বলে কথিত। তাঁর জীবৎকাল ৮৪০ সাল অবধি। তিনি দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল উড়িষ্যা। তিনি ছিলেন রাজকুমার, ভিক্ষু ও সিদ্ধা।

আর্যদেব

আর্যদেব কম্বলাম্বরের সমকালীন। তারানাথের মতে তিনি ছিলেন মেবারের রাজা এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য। তাঁর পদের ভাষা উড়িয়া। তিনি আট শতকের প্রথম পাদের লোক বলে অনুমিত।

কঙ্কণ পা

কঙ্কণ কম্বলাম্বরের বংশজ। তিনি প্রথম জীবনে বিষ্ণুনগরের রাজা ছিলেন। তাঁর চর্যাপদের ভাষায় অপভ্রংশের ছাপ আছে। তাঁর জীবৎকাল নয় শতকের শেষভাগ। তিনি দারিকের শিষ্য ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

মহীধর পা

মহীধর পা কাহ্নপার শিষ্য। তাঁর পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলি। তাঁর জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৭৫ সাল। তিনি বিগ্রহ পাল-নারায়ণ পালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান মগধ। তিনি বর্ণে শূদ্র। কারও মতে তিনি দারিক পার শিষ্য।

ধাম বা ধর্ম পাদ

ধাম বা ধর্ম পাদ কাহ্ন পার শিষ্য ছিলেন। তাঁর জন্ম বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণবংশে। তাঁর পদের ভাষা বাংলা। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, তিনি বিগ্রহ-নারায়ণ পালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৭৫ সাল। তিনি ভিক্ষু ও সিদ্ধা ছিলেন।

ভাদ্র পা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে ভাদ্র পাদ বা ভাদে পা কাহ্ন পার শিষ্য। তাঁর জন্মস্থান মহিভদ্র। তাঁর পদের ভাষা বাংলা। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, ভাদে পার আবির্ভাবকাল বিগ্রহ ও নারায়ণ পালের রাজত্বকাল, নিম্নসীমা ৮৭৫ সাল। তাঁর জন্মস্থান শ্রাবস্তী, পেশায় চিত্রকর এবং সিদ্ধা।

জয়নন্দী বা জয়ানন্দ

জয়নন্দী বা জয়ানন্দ বাংলাদেশের এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বর্ণে ব্রাহ্মণ। তাঁর পদের ভাষা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ তথা প্রত্ন-মৈথিলি-উড়িয়া-বাংলা-আসামি।

শান্তি পা

শান্তি পাদ বিক্রমশিলা বিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তাঁর শিষ্য। এগার শতকের প্রথমে তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলি। শান্তি পা রত্নাকর শান্তির সংক্ষিপ্ত নাম।

বীণা পা

বীণা পার জন্মস্থান গহুর। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং তাঁর গুরুর নাম ছিল বুদ্ধ পাদ। তিনি নয় শতকের লোক। তাঁর চর্যাপদের ভাষা বাংলা।

সরহ পা

সরহ পা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর জন্মস্থান রাজ্ঞীদেশ সম্ভবত উত্তরবঙ্গ-কামরূপ। কামরূপের রাজা রত্নপাল (১০০০-৩০ সাল) ছিলেন তাঁর শিষ্য। তিনি এগার শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনা করেছিলেন। তাঁর পদাবলীর ভাষা বঙ্গ-কামরূপী। তিনি ছিলেন ভিক্ষু ও সিদ্ধা। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

গুণ্ডরী পা

গুণ্ডরী পা দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৬-৪৯) বর্তমান ছিলেন। তাঁর জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৪০ সাল। তাঁর জন্মস্থান ডীশুনগর। তিনি বর্ণে লোহার বা কর্মকার এবং সিদ্ধা। তিনি সরহের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য।

ঢেন্টণ পা

ঢেন্টণ পার জন্মস্থান অবন্তিনগর-উজ্জয়িনী, তিনি ছিলেন বর্ণে তাঁতি এবং সিদ্ধা। তিনি দেবপাল-বিগ্রহ পালের সময়ে বর্তমান ছিলেন। তাঁর জীবৎকালের উর্ধ্বসীমা ৮৪৫ সাল।

ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন, 'তিব্বতী ঐতিহ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সিদ্ধাদের পূর্বজীবনের বর্ণ বা বৃত্তির উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, আর্যদেব, কঙ্কণ, ডোম্বী ও দারিক রাজা ছিলেন, কম্বলাম্বর ও ভুসুকু ছিলেন রাজপুত্র। জয়নন্দী ছিলেন রাজমন্ত্রী, লুইপাদ ছিলেন রাজসভার লেখক। জয়নন্দী, ধাম ও সরহ ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুক্কুরীও সম্ভবত তাই। কাহ্ন সম্ভবত কায়স্থ ছিলেন, বীণা ছিলেন ক্ষত্রিয়। মহীধর শূদ্র ছিলেন, শরবী ছিলেন ব্যাধ। ডোম্বী বিয়ে করেছিলেন ডোমকন্যা, কুক্কুরীর সহচরী পূর্বজন্মে ছিলেন কুক্কুরী। অনাচারের দায়ে বিহার থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন বিরুআ, বিহারের দ্বারপণ্ডিত হয়ে বাকি জীবন কাটিয়েছিলেন শান্তি। সিদ্ধাদের নামের মত এই পরিচিতির মধ্যেও যেমন অনার্যসংস্কৃতির প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি পূর্বজীবনের বর্ণগত পরিচয়দানের প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায় যে, আর্যত্বের মহিমা তখন কত প্রবল ছিল।'

বাংলার পাল বংশের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের আমলে চর্যাগীতিকাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। পাল বংশের পরে পরেই বাংলাদেশে সেন, বর্মণ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গৃহীত হয় এবং দেশি ভাষা বাংলার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা প্রাধান্য লাভ করে। পাল রাজাদের উদারপন্থী বৌদ্ধ মতবাদের পরিবর্তে সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের প্রাধান্যের ফলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়। সেন রাজাদের প্রতাপের জন্যই বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছিল। তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলাদেশের বাইরে নেপালে পাওয়া গেছে।

বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল ভারতবর্ষে এবং বিস্তার লাভ করেছে বিশ্বজুড়ে। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি একদিন এদেশকে বহির্বিশ্বে পরিচিত করেছিল। কিন্তু এদেশ থেকে বৌদ্ধ বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধশাস্ত্র, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের অবসান ঘটেছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত মূল গ্রন্থ প্রায় সবই হারিয়ে গেছে। তিব্বতি, চীনা ও মঙ্গোলীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র ও ধর্মীয় সাহিত্য রক্ষিত হয়েছে। আধুনিক যুগে এ সবের আলোচনা নতুন করে শুরু হয়েছে।

চর্যাপদের রচনাকাল

নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগারে চর্যাপদের যে পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা বাংলা লিপিতে লেখা এবং তা বাঙালির লেখা বলে অনুমান করা হয়। পুঁথিটি পুরানো, তবে রচনাকালের সমসাময়িক নয়। তিব্বতি অনুবাদের রচনাকাল জানা যায় নি। ড. সুকুমার সেন তাকে ষোল শতকের পরবর্তী না হওয়াই সম্ভব বলেছেন। মুনিদত্তের টীকার রচনাকাল পুঁথি লেখার বেশ কিছুকাল আগে। ড. সুকুমার সেনের অনুমান পনের শতক। চর্যাপদের রচনাকাল অনেক আগের। আর সব পদের রচনার সময়ও এক নয়।

চর্যাপদের সঠিক রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতেরা মতৈক্যে পৌঁছতে পারেন নি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ৬৫০ সাল থেকে চর্যাপদের কাল ধরেছেন। অন্যদিকে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৯৫০ সাল থেকে চর্যাপদের রচনাকাল মনে করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথকে প্রথম বাঙালি কবি মনে করে প্রমাণ দেখিয়েছেন যে, তিনি সপ্তম শতকে জীবিত ছিলেন। চর্যাপদে তাঁর কোন পদ নেই, ২১ সংখ্যক চর্যার টীকায় কেবল চারটি পংক্তির উল্লেখ আছে। পংক্তি কয়টি হল :

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাট ॥
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥

ফরাসি পণ্ডিত সিলভঁ্যা লেভির মতে এই মৎস্যেন্দ্রনাথ ৬৫৭ সালে রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে গিয়েছিলেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যাকারদের সম্ভাব্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেখিয়েছেন যে, চর্যার রচনাকাল সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পড়ে। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, লুই পা ও সরহ পা ধর্ম পালের সময়ে (৭৬৯-৮০৯ সাল) বর্তমান ছিলেন। তাঁর মতে চর্যার কাল আট থেকে এগার শতক।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, চতুর্দশ শতকের শেষভাগে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাষা অপেক্ষা চর্যার ভাষা দেড় শ বছরের প্রাচীন। তাঁর মতে, ভাষাতত্ত্বের বিচারে চর্যাপদের অনেকগুলো পদ দ্বাদশ শতকে রচিত। তিনি মনে করেন, মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথের কাল দ্বাদশ শতকের শেষাংশ। তাই মীননাথ দ্বাদশ শতকের লোক। তাঁর মতে ১২০০ সালে রচিত মারাঠি গ্রন্থ 'জ্ঞানেশ্বরী'র লেখক জ্ঞানদেবের গুরু পরম্পরা অবলম্বনে মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ তথা কাহ্ন পাদের সময় দ্বাদশ শতাব্দী। গোরক্ষনাথ-কাহ্ন পাদের আনুমানিক আবির্ভাবকাল ধরে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যার কাল ৯৫০ থেকে ১২০০ সাল বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। চর্যাপদের আলোচনাকারীগণ এই দুটি প্রধান মতের কোন না কোনটার অনুসারী।

চর্যাপদের কবিগণের আবির্ভাব কাল সঠিকভাবে নির্ধারণের সুযোগ নেই। অনেকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে সময় চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে। পণ্ডিতগণের গবেষণালব্ধ তথ্যের ব্যাপারেও সবাই একমত হতে পারেন নি। তাই অতীতের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্নই থেকে গেছে।

চর্যাপদের ভাষা

চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা। ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষার স্বকীয় মূর্তি সম্পূর্ণ রূপে লাভ করতে পারে নি। এই অপরিণত ভাষাতেই চর্যাপদের কবিগণ ধর্মতত্ত্ব প্রতিফলনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণতত্ত্ব চর্যাপদের মহাসুখতত্ত্বে পরিণত হয়েছে। এই মহাসুখের স্বরূপ ও

তা লাভের পন্থা চর্যাপদে কখনও প্রহেলিকা ভাষায়, কখনও দার্শনিক ভাষায়, কখনও যোগসাধনের পরিভাষায়, কখনওবা তান্ত্রিক কায়াসাধনের গূঢ় সঙ্কেতের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। আর এই বক্তব্য প্রকাশের জন্য তখনকার সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষার সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা বলে তখনকার ভাষার প্রাচীনত্বের দরুন গৌড় অপভ্রংশের প্রভাব এতে রয়ে গেছে। ফলে কেউ কেউ অপভ্রংশ, প্রাচীন হিন্দি, মৈথিলি, উড়িয়া বা আসামি ভাষা বলে দাবি করেন। একই গোষ্ঠীজাত বলে এ সব নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে চর্যাপদের ভাষার মিল আছে। চর্যাকারেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে সকলের ভাষা একরূপ হতে পারে না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আর্যদেবের ভাষা উড়িয়া, শান্তি পাদের ভাষা মৈথিলি এবং কাহ্ন সরহ ভুসুকু প্রমুখের ভাষা প্রাচীন বাংলা বঙ্গকামরূপী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে ধ্বনিতত্ত্ব ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, চর্যার পদসংকলনটি আদিতম বাংলা ভাষায় রচিত।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন ও ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী মনে করেন চর্যাপদ বার শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। এ সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষা তার স্বকীয় মর্যাদা লাভ করে নি। তের শতকের পরে উড়িয়া ভাষা এবং ষোল শতকের পরে আসামি ভাষা বাংলা ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে চর্যাপদের ওপর কোন বিশেষ অঞ্চলের বা বিশেষ কোন ভাষার দাবি স্বীকার করা যায় না। সে ক্ষেত্রে চর্যাপদের ভাষা অর্বাচীন অবহট্ঠ বা লেখ্য প্রত্নবাংলা উড়িয়া-মৈথিল-আসামির অভিন্ন জননী-স্বরূপা বলে মানতে হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, সেকালের বাংলা আসামি ও উড়িয়া ভাষায় পার্থক্য ছিল সামান্যই।

উল্লেখ্য যে, উড়িষ্যা, বিহার, আসাম, পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশে নিজ নিজ ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদ বিবেচিত এবং ভাষা-সাহিত্যের পাঠ্য-সূচিভুক্ত।

চর্যার ভাষায় ব্যবহৃত সম্বন্ধ পদে—অর বিভক্তি, সম্প্রদানে—কে, অধিকরণে অন্ত,—ত, অতীত ক্রিয়ার—ইল এবং ভবিষ্যতে—ইব ইত্যাদি লক্ষণ বিচারে এ ভাষাকে বাংলা বলে স্বীকার করতে হয়। বাগভঙ্গিমা ও শব্দযোজনা—যেমন, গুণিয়া লেহঁ, উঠি গেল, আখি বুজিঅ, ধরণ ণ জাঅ, নিদ গেল, আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী, হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী—ইত্যাদি বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

চর্যাপদের রচয়িতাদের প্রায় প্রত্যেকটি পদেই সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত অপভ্রংশ, অবহট্ট, বাংলা, ওড়িয়া, গুজরাটি, আসামি, বিহারি, হিন্দি, পাঞ্জাবি, ভোজপুরিয়া, মৈথিলি, সিংহলি ইত্যাদি শব্দ রয়েছে।

চর্যায় নাসিক্যধ্বনির প্রাধান্য ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে কেউ কেউ এ ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের মনে করেন। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে চর্যার ভাষাকে প্রাচীন বাংলা কিংবা প্রাচীন বঙ্গকামরূপী ভাষা বলাই সঙ্গত।

চর্যাপদের ভাষার বৈশিষ্ট্য

চর্যাপদের ভাষা বাংলা বলে প্রমাণিত হলেও তাতে অপভ্রংশের কিছু কিছু নিদর্শন আছে। চর্যাপদ যে সময়ের রচনা তখন বাংলা ভাষা তার পূর্ববর্তী স্তর অপভ্রংশ থেকে নিজস্ব রূপ গ্রহণ করলেও একেবারে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে নি। চর্যাকারেরা অনেকেই অপভ্রংশে পদ রচনা করেছেন। তাঁদের বাংলা রচনাতে তাই প্রাকৃত বা অপভ্রংশের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। অপভ্রংশের প্রভাব লক্ষ করা যায় এ সব ক্ষেত্রে : আইসন, জৈসন, জিম, তিম, জসু, তসু প্রভৃতি শব্দ; নিষেধার্থক 'মা' অব্যয়ের ব্যবহার—মা হোহি; ক্বচিৎ যুক্ত ব্যঞ্জনের উপস্থিতি—আচ্ছিলেঁ সংপুন্না; 'ইউ' প্রয়োগে অতীতকাল—তোড়িউ; 'মি' বিভক্তি—পীবমি, পুছমি; সর্বনামজাত ক্রিয়াবিশেষণ—জব, তব ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদের ভাষার ব্যাকরণগত যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ :

ক. চর্যাপদের ভাষায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগত বিশেষত্ব আধুনিক বাংলার ধ্বনির মত। সংস্কৃত শব্দের বানানে সর্বত্র এক নিয়ম পালন করা হয় নি। যেমন, সবর, শবর।

খ. বর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণ আধুনিক বাংলার মত চর্যাপদে দেখা যায় না। হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণে কোন নিয়ম ছিল না। যেমন, পঞ্চ-পাঞ্চ।

গ. চর্যাপদে শ, ষ, স—তিনটি বর্ণের পার্থক্য ছিল না। যেমন— সবর, শবর, ষবরালী। তেমনি জ, য এবং ন, ণ—এদের মধ্যেও পার্থক্য নেই।

ঘ. চর্যায় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি বিদ্যমান ছিল।

ঙ. চর্যাপদের ভাষায় অপভ্রংশের প্রভাবে পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হত। তবে ক্লীবলিঙ্গ নেই। বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হলে বিশেষণেও স্ত্রীলিঙ্গ হত। যেমন— নিশি অন্ধারী মুষার চারা। 'ইল' প্রত্যয়ান্ত বা 'এর' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ কখনও কখনও স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নিয়েছে। যেমন, 'সোণে ভরিলী করুণা নাবী,' 'নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহেরি কুড়িআ', 'তোহোর অন্তরে মোএ ঘালিলি হাড়েরি মালী'। ঈ বা আ যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হত। যেমন, হরিণী, শবরী, হরিণা।

চ. চর্যাপদের ভাষায় শব্দরূপের গঠনে একবচন ও বহুবচনের তফাত নেই। সম্বন্ধ বোঝানো ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গেও পার্থক্য দেখা যায় নি।

ছ. একবচনে কর্তৃ, কর্ম, করণ ও অধিকরণ কারকে কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হত না। যেমন, সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই।

বহুবচন বোঝানোর জন্য বহুত্ববোধক শব্দ ব্যবহৃত হত। যেমন, সজল সমাহিঅ। সংখ্যাবাচক শব্দে বহুবচন, যেমন— পঞ্চ বি ডাল। বিশেষণের দ্বিত্ব ব্যবহারে বহুবচন, যেমন—উঞ্চা উঞ্চা পাবত।

কারকভেদে চর্যাপদে বিভিন্ন বিভক্তির দৃষ্টান্ত মিলে। কাল অনুসারেও ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপ ছিল। তখন অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল। সর্বনামের মধ্যেও বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। সংখ্যাবাচক শব্দের প্রচলন ছিল। সব রকম সমাসের দৃষ্টান্ত চর্যাপদে পাওয়া যায়।

সন্ধ্যাভাষা

চর্যাপদের ভাষাকে কেউ কেউ সন্ধ্যাভাষা বা সন্ধাভাষা বলেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই।'—এ কারণে চর্যার ভাষা সন্ধ্যাভাষা। তবে তত্ত্বজ্ঞানীদের কাছে এ ভাষা অবোধ্য নয় বলে এই অর্থ সমর্থনযোগ্য নয়। মুনিদত্ত তাঁর টীকায় সন্ধাভাষ, সন্ধাভাষা, সন্ধ্যাবচন, সন্ধ্যাসংকেত, সন্ধ্যা ও ব্যাজ প্রভৃতি শব্দ চর্যার রূপকাশ্রিত দুর্বোধ্য অংশের বা প্রতীকী শব্দের ভাষ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বারবার প্রয়োগ করেছেন। বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে, সন্—ধা ধাতু থেকে 'সন্ধ্যা' পদ সৃষ্ট—যার অর্থ অভিপ্রেত, উদ্দিষ্ট, অভিপ্রায়িক বচন। তাঁর মতে 'সন্ধা' লিপিকর প্রমাদ—তা হবে 'সন্ধ্যা'। কারও মতে 'সন্ধ্যাদেশ' নামে বিশেষ অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের ভাষার মিল আছে বলে এ নাম হয়েছে। তিব্বতি ভাষায় সন্ধ্যাভাষার অর্থ প্রহেলিকাচ্ছলে উক্ত দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা। ম্যাক্সমুলর 'সন্ধ্যা' কথাটিকে প্রচ্ছন্ন অর্থে গ্রহণ করেছেন। আসলে কথাটির সঙ্গে একটা রহস্য বা দুর্বোধ্যতার ইঙ্গিত আছে। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার গূঢ় তত্ত্ব যাতে অন্য ধর্মের লোকেরা বুঝতে না পারে তার জন্য স্থূল অর্থযুক্ত প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—আলি, কালি, ডোম্বী, শবরী, হরিণী, চন্দ্রসূর্য, গঙ্গাযমুনা, শাশুড়ী-ননদী ইত্যাদি। এ সব শব্দের মাধ্যমে সাধনগত রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত প্রকাশ পাচ্ছে। ভাষার দুর্বোধ্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে বৌদ্ধ বজ্রযানী সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের গোপন সাধনপ্রণালীর ইঙ্গিত। মুনিদত্ত সংস্কৃত টীকার সাহায্যে সন্ধ্যাভাষাকে সহজ করার চেষ্টা করেছেন। চর্যার এ বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে এর ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলাই সমীচীন মনে হয়। অনেক প্রাচীন পুঁথিতে সন্ধ্যাভাষা কথাটার অবস্থিতি একে আরও গ্রহণযোগ্য করেছে। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'আলো-আঁধারি, অভিসন্ধি, অনুধ্যান, ব্যঙ্গার্থ, গূঢ় অর্থ, সাংকেতিক অর্থ প্রভৃতি ব্যঞ্জক বা বাচক গুপ্ত মহাভাষার নাম সন্ধা বা সন্ধ্যাভাষা—এটুকু জানা গেল। তবে সন্ধা বা সন্ধ্যাভাষা যে দ্ব্যর্থক ও রূপকাত্মক সে বিষয়ে মতানৈক্য নেই।'

তন্ত্রের সাধনা ছিল অনেকাংশে গূঢ় বা গোপন। এ সাধনা যাতে সাধারণ লোকের হাতে পড়ে বিকৃত না হতে পারে সে জন্য সন্ধ্যাভাষার ব্যবহার হত। চর্যাপদে এ উদ্দেশ্যেই পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। চর্যার অনেক বর্ণনা আক্ষরিকভাবে এক অর্থ, আবার যোগসাধনার দিক থেকে ভিন্ন অর্থ। যেমন—১১নং চর্যায় :

মারি সাসু ননন্দ ঘরে সালী।
মাঅ মারি কাহ্ন ভইঅ কবালী ॥

এর আক্ষরিক অর্থ—'ঘরে শাশুড়ি ননদ শালীকে মেরে ও মাকে মেরে কাহ্ন কাপালিক হল।' কিন্তু যোগের দিক থেকে এখানে সাসু অর্থ শ্বাস, ননন্দ অর্থ বিষয়ানন্দদানকারী ইন্দ্রিয়াদি, সালী অর্থ নিঃশেষ, মাঅ অর্থ মায়া, আর মারি অর্থ নিঃস্বভাবীকৃত করে। তাই কথাটির অর্থ দাঁড়ায়—'শ্বাস-নিরুদ্ধ করে বিষয়ানন্দের আকর ইন্দ্রিয়াদিকে নিঃশেষিত করে এবং মায়া চেতনাকে নিঃস্বভাবীকৃত করে কাহ্ন কাপালিক হয়েছেন।' এমনিভাবে চর্যায় আক্ষরিক অর্থের অন্তরালে গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করা চলে।

চর্যাপদের তত্ত্ব

সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের যথার্থ মর্যাদা কাব্যসৃষ্টি হিসেবে। তবে তার মধ্যে একটি ধর্মতত্ত্ব চমৎকারভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের ধর্মীয় রীতিনীতির নিগূঢ় রহস্য রূপায়ণের সময় সত্যিকারের কবি হয়ে উঠেছিলেন। তাই চর্যাপদে কবিতার লক্ষণ যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি ধর্মের তত্ত্বকথাও বিধৃত হয়েছে। ধর্মীয় বিষয়বস্তু অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে বিরল নয়, চর্যাপদ দিয়েই তার শুরু হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্বকথা চর্যাপদে বিধৃত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নেপালের তরাই অঞ্চল তৎকালীন কপিলাবস্তুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাধনা করেন গয়া-বারানসিতে এবং মতবাদ প্রচার করেন বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁর কোন লিখিত রচনা নেই, মুখে মুখে প্রচারিত ধর্মমত পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে বুদ্ধের বাণীই কেবল বৌদ্ধ শাস্ত্র নয়। পরবর্তীকালে আনন্দ, শারিপুত্র, মৌগ্গল্য-পুত্রতিষ্য, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, নাগার্জুন, আর্যদেব, চন্দ্রকীর্তি, শান্তিদেব, কুমারাত, ধর্মপাল, শান্তরক্ষিত, সরোজবজ্র (সরহ), তিল্লো পা, কাহ্ন পা প্রমুখ ভিক্ষু- শ্রাবক-যোগী-সাধক-তাত্ত্বিকের অবদানে গড়ে উঠেছে বহু যান সম্বলিত বৌদ্ধ ধর্ম ও বিপুল কলেবর শাস্ত্র, সাহিত্য ও দর্শন এবং বহুবিধ চর্যা ও সাধন পন্থা। পালি, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে এসব লিখিত ছিল। বৌদ্ধ মতবাদ বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত।

চর্যাপদের কতগুলোর বিষয় সোজাসুজি আধ্যাত্মিক। তাতে জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখের দোলা থেকে মুক্তি লাভের এবং সহজ অবস্থার রূপ মহাসুখ-নিবাসে পৌঁছার ঠিকানা আছে, পরমার্থ সত্য উপলব্ধির জন্য গুরু অনুগতির নির্দেশ বিদ্যমান, কতগুলো চর্যায় বাহ্য অর্থের অবগুণ্ঠনে তত্ত্ব-উপদেশ ও সাধনার ইঙ্গিত সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অনেক শব্দের সাধারণ অর্থের বাইরে সিদ্ধাচার্যদের পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। চর্যাপদের মাধ্যমে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা গোপন তত্ত্বদর্শন ও ধর্মচর্যাকে বাহ্যিক প্রতীকের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা কালক্রমে যে সব উপশাখায় বিভক্ত হয়েছিল তারই বজ্রযানের সাধনপ্রণালী ও তত্ত্ব এতে বিধৃত। মহাসুখরূপ নির্বাণলাভ—এই হল চর্যার প্রধান তত্ত্ব। পদকর্তারা কেউ কেউ গুরুবাদী—গুরুর উপদেশ ছাড়া তাঁদের নির্বাণের পথ নেই। আবার কেউ কেউ গুরু তন্ত্রমন্ত্রকে অস্বীকার করেছেন। সাধনতত্ত্বে এই মতপার্থক্য থাকলেও নির্বাণ সম্পর্কে তাঁদের দ্বিমত নেই। বাস্তব জীবনের জরামরণ ও পূর্বজন্মের বিষচক্র অতিক্রম করে নির্বাণ লাভ হচ্ছে সিদ্ধাচার্যদের লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে সহজে পৌঁছানোর জন্য গূঢ় তান্ত্রিক আচার-আচরণের সাহায্য গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মণীন্দ্রমোহন বসু অনুমান করেছেন যে, মহাযান-মত দার্শনিক তত্ত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু পররর্তী কালে বজ্রযানে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করায় চর্যায় তন্ত্র ও যোগের উল্লেখ রয়েছে। চর্যাপদে দার্শনিক তত্ত্বের দিক প্রাধান্য পায় নি, সাধনতত্ত্বের দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছে। মহাসুখ বা মন্ময় আনন্দলাভের জন্য কোন সাধন পন্থা চর্য বা আচরণীয় এবং কোনটি অচর্য বা

অনাচরণীয় তা বিনিশ্চয় বা সুনিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা চর্যাপদের লক্ষ্য। চর্যার ধর্মতত্ত্ব বিশেষ দীক্ষিত জনের প্রতি উদ্দিষ্ট বলে তাকে বিশুদ্ধ লোকধর্মের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করা যায় না।

চর্যাপদের টীকা রচনায় টীকাকার মুনিদত্ত সন্ধ্যাভাষার সরলার্থ করেছেন। এর ফলে চর্যাপদের তত্ত্বকথা সম্বন্ধে অদীক্ষিত ব্যক্তিও কিছু কিছু জ্ঞানার্জন করতে সমর্থ। তবে চর্যাপদ প্রধানত সহজিয়া মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এতে হীনযান, মহাযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, ব্রাহ্মণ্যতত্ত্ব ও নাথধর্মের নানা প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয়।

চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য

চর্যাপদ প্রধানত তত্ত্ববাদের বাহন, গৌণত কবিতা। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচনা হিসেবে চর্যাপদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ পেলেও এর সাহিত্যিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। চর্যাকারগণ সচেতনভাবে কাব্য রচনা করেন নি, কিন্তু তাঁদের বিশেষ রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের গূঢ় ভজনাবলি হলেও এতে স্বতঃস্ফূর্ত রসের আবেদন এবং বাকনির্মিতির শিল্পকৌশল বিদ্যমান থেকে তাকে কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এতে সাধকদের হৃদয়ভাব সার্থক মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে বলে চর্যার সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে সন্দেহ নেই। চর্যাপদের বক্তব্য কেবল জ্ঞানের বিষয় নয়, ভাবের বিষয় এবং তাকে ব্যক্ত করার উপযুক্ত সার্থক মাধ্যমও চর্যাকারেরা আহরণ করেছিলেন। এ কারণেই চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞানচেতনার শৈল্পিক রূপায়ণেই চর্যাপদের সাহিত্যমূর্তি গঠিত হয়েছে।

চর্যাকারেরা দার্শনিক পরিভাষা ও তন্ত্রের বিশেষ শব্দের সাহায্যে তত্ত্বদর্শনকে প্রকাশ করতে গিয়ে নানা চিত্রকল্পের প্রয়োগ করেছেন। এ সব চিত্র প্রতীক অর্থ প্রকাশ করলেও তাতে শিল্পমর্যাদা বিদ্যমান। দুরূহ তত্ত্ব স্পষ্টতর করার জন্য ব্যবহৃত রূপক ও প্রতীক—ভবনদী পারাপার, হরিণ শিকার, শবর-শবরীর মদমত্ত উল্লাস ইত্যাদিতে লোকজীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। যখন মাংসলোলুপ শিকারির দল চারদিক বেড়ে হরিণকে তাড়িয়ে নেয়—হরিণের আপন মাংসই তার বৈরী হয়, তখন আর্ত হরিণ আশ্রয় খুঁজে পায় না—'হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী' (চর্যা নং—৬)। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য না জানলেও এতে প্রতিফলিত চিত্রটি পাঠক-হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করে। কাহ্ন পাদ পটহ মাদল বাজিয়ে ডোম্বীবিবাহে চলেছেন, বিয়েতে যৌতুক পেলেন, সারারাত রঙ্গে কেটে গেল। ১নং চর্যায় এ বিবরণে অর্থের বাইরে দেহাসক্তিপূর্ণ প্রেমের উল্লাস সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ৩৩নং চর্যায় গৃহবধূর সংসার চিত্র—সে টিলার ওপর বাস করে, পাড়াপড়শি নেই, নিরন্ন সংসার, তবু অতিথি আসে। ক্রমবর্ধিষ্ণু তার সংসার।—'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী, হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।'—ইত্যাদি কথায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট গৃহিণীর বিড়ম্বিত জীবনের স্পষ্ট চিত্র প্রকাশমান। ডোমনির প্রেমে মগ্ন হওয়ার কথার মাধ্যমে মানবমনের চিরন্তন প্রেমানুভূতিরই পরিচয় ফুটে উঠেছে। এ ধরনের অনেক চিত্র দুয়েকটি কথায় সহজে রূপলাভ করে চর্যাপদকে সাহিত্যের পরিসীমায় নিয়ে এসেছে।

কাব্যগুণসমৃদ্ধ সুন্দর চিত্র চর্যায় অনেক স্থানে লক্ষ করা যায়। ২৮নং চর্যায় শবর পা তেমনি এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। পর্বতশীর্ষে লীলাময়ী শবরী বালিকা, আরণ্যসৌন্দর্য তার সর্বাঙ্গে, তার খোঁপায় গোঁজা শিখিপুচ্ছ, বুকের ওপর দুলে দুলে উঠছে গুঞ্জার মালা। তার কানের কুণ্ডলে সকালের রোদ ঝিকমিকিয়ে উঠছে। তাকে দেখে আচার্য শবর পা সব ভুলে যান, নিজের স্ত্রীকেই পরস্ত্রী মনে করে উন্মত্ত হয়ে উঠেন। পত্রপুষ্পে গাছগুলো ভরে উঠেছে। তখন খাট পেতে শয্যা রচিত হল, কর্পূরযুক্ত তাম্বুল সেবা করে উভয়েই রাগরক্তিম হয়ে উঠলেন। চর্যাকারের কথায় :

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলি গুহারী।
তোহোরী ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দরী ॥
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুঅঙ্গ ণইরামণি দারী পেম্ম রাতি পোহাইলী ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সূণ নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥
গুরুবাক ধনুআ বিন্ধ নিঅ মনে বাণেঁ।
একে সর সন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম ণিবাণেঁ ॥
উমত সবরো গরুআ রোসেঁ।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥

আধুনিক বাংলা : 'উঁচু উঁচু পর্বত—সেখানে বসে শবরী বালিকা, ময়ূর পুচ্ছ পরিহিত শবরী গলায় গুঞ্জার মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর গোল করো না তোমার দোহাই। এ তোমার নিজ গৃহিণী, নামে সহজসুন্দরী। নানা তরুবর মুকুলিত হল, গগনে লাগল ডাল। কর্ণে কুণ্ডলবজ্রধারিণী শবরী একলা এ বনে বিহার করে। তিন ধাতুর খাট পাতল শবর, শয্যা বিছানো হল। প্রেমিক শবর, প্রেমিকা নৈরামণি, প্রেমে রাত কেটে গেল। হিয়া-তাম্বুলে কর্পূর দিয়ে মহাসুখে খাওয়া হল, শূন্য নৈরামণি কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাত পোহাল। গুরুবাক্যপুঞ্জ নিজ মনবাণে যোজনা কর। এক শরসন্ধানে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর পরমনিধানকে। গুরুরোষে শবর উন্মত্ত। গিরিবরশিখর সন্ধিতে প্রবেশ করলে শবর ফিরবে কিসে।'—এ সব কথায় ধর্মের সঙ্কেত থাকলেও সাহিত্যরস আস্বাদনে কম উপযোগী নয়।

৫০ সংখ্যক চর্যাতেও এমনি একটি সুন্দর চিত্র মিলে। শবরের বাড়ির চারদিকে কার্পাস ফুল ফুটেছে। রাতের আকাশে জ্যোৎস্না নেমেছে, কঙ্গুচিনা পেকেছে, শবর শবরী তা থেকে প্রস্তুত মদ পান করে মাতাল হল :

তইলা বাড়ীর পাসেঁ রে জোহ্না বাড়ী তাএলা।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাস ফুলিলা ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে সবরাসবরি মাতেলা।
অণুদিণ সবরো কিম্পি ণ চেবই মহাসুহেঁ ভোলা ॥

—'তৃতীয় বাড়ির পাশে সে সময় জ্যোৎস্না-বাড়ি হল, দূর হল অন্ধকার, ওরে, আকাশ কুসুমিত হল। কঙ্গুচিনা পেকে উঠল, মেতে উঠল শবর-শবরী। অনুদিন শবর কোন কিছুতেই জাগ্রত হয় না, সে মহাসুখে বিভোর হয়ে গেল।'

প্রকৃতি ও মানুষকে নিবিড়ভাবে চিনলেই এমন বাস্তব ও কাব্যময় চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব। চর্যায় অঙ্কিত ছবিগুলো কত চমৎকার—টিলার ওপর ঘর, হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য সেখানে অতিথি; ঘরের অঙিনায় তেঁতুল গাছের ফলে গৃহস্বামীর অধিকার নেই; নতুন বধূর কানের কানেট চোরে নিয়ে গেছে, শ্বশুর ঘুমাচ্ছেন বলে তা জানেন না, বধূর মুখে বিষণ্ন ভাব; একতারা বাজিয়ে যোগী মনের আনন্দে বিভোর হয়ে পথে চলেছে; নতুন বর যাচ্ছে মাদল বাজিয়ে নতুন সঙ্গিনী আনতে—সেখানে মেয়েলি আচার বাসরঘর নতুন বধূ; বনে বনে শিকারি জাল পেতে হরিণ ধরছে, ভীত সন্ত্রস্ত হরিণ ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে; শান্ত পাহাড়, পুষ্পিত গাছ, স্রোতময়ী নদী, বিহ্বল জ্যোৎস্না, দীপ্ত মন্দির, শান্ত সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টা, গোয়ালে গরু, গরুর দুধ দুয়ানো, অন্ধকার ঘরে চঞ্চল মূষিক—দৈনন্দিন জীবনের এসব মধুর চিত্র ধর্মের উপাদান হয়েও যথার্থ কাব্যের সামগ্রী।

৮নং চর্যায় লোকজীবনের একটি সাধারণ চিত্র সমৃদ্ধিময় আলঙ্কারিক মণ্ডলে এক বিস্ময়কর শিল্পসুষমা লাভ করেছে :

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বাহুড়ই কইসেঁ ॥
ঘুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি ॥
মাঙ্গত চড়হিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ॥
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাচত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা ॥

আধুনিক বাংলা : 'আমার করুণা-নৌকা সোনায় ভর্তি রয়েছে; তাতে রূপা রাখার ঠাঁই নেই। ওরে কম্বলি পা, গগনের (নির্বাণের) উদ্দেশ্যে তুমি বেয়ে চলো; যে জন্ম গেছে সে ফিরবে কি করে? (নৌকা বাইতে গিয়ে) খুঁটি উপড়ে ফেলো, কাছি মেলে দাও। সদগুরুকে জিজ্ঞেস করো, হে কম্বলি পা, তুমি বেয়ে যাও। পথে বেরিয়ে

চারদিকে চেয়ে এগিয়ো; কেড়ুয়াল ছাড়া কেউ কি বাইতে পারে? বাম-ডানে চেপে পথ বেয়ে গেলে ঐ পথেই মহাসুখের সঙ্গে মিলে যাবে।'

মণীন্দ্রমোহন বসু এই চর্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কবিতার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

চর্যাকারেরা বাস্তব উপাদানের সহায়তায় পাঠককে ভাবের জগতে নিয়ে গেছেন। বাইরের আড়ম্বরের সীমারেখা ছাড়িয়ে মনের মধ্যে নিরাবয়ব পরমপ্রিয়কে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মানব মনের ব্যাকুলতাই প্রকাশমান। মহাসুখ পাওয়ার উদ্দেশ্যে সবকিছু ত্যাগ করা, সাধনার পথে বিচরণ করা—বিভিন্ন উপায়ে সাধনার যে স্বরূপ চর্যাকারেরা প্রকাশ করেছেন তাতে তাঁদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে কাব্যময় ভাষায় সাধকদের মনের না পাওয়ার বেদনাই প্রকাশ পেয়েছে। ভাববস্তুর কাব্যময় পরিবেশনে চর্যাপদের গুরুত্ব কম নয়। চর্যাপদের ভাবে আছে জীবনবোধ ও ধর্মানুভব, কিন্তু ভাষাবিন্যাসে আছে শিল্পীর সচেতন প্রয়াস। বক্তব্যে আছে বাস্তব ও অন্তরঙ্গ জীবনচিত্র, কিন্তু প্রকাশভঙ্গিতে আছে কবিতার রূপ-প্রকরণ— যেখানে বিদ্যমান শব্দ ও অলঙ্কার সজ্জায় আভিজাত্যে উজ্জ্বল প্রচ্ছদ। চর্যাকারদের কবিত্বশক্তি ছিল। তাঁদের রচনায় প্রতীক-রূপকের সাহায্যে চিত্রসৃষ্টি, আখ্যানের ইঙ্গিত, মানব চরিত্রের সুখদুঃখ-বিরহমিলনের দৈনন্দিন জীবনচিত্র রূপায়িত হয়ে চর্যার দর্শন ও তত্ত্বের নিষ্প্রাণতাকে কাব্যরসের স্পর্শে সজীব করেছে।

চর্যাপদের এক একটি কবিতা দশ চরণে সমাপ্ত। তবে ৪৩ সংখ্যক চর্যা বার চরণে এবং ২১ সংখ্যক চর্যা আট চরণে রচিত। সব চরণেই অন্ত্যমিল রয়েছে। চর্যাপদ গান হিসেবে রচিত বলে স্বীকার করেও পণ্ডিতেরা এগুলোকে কবিতা রূপে বিবেচনা করেছেন।

চর্যাপদের ছন্দ

চর্যাপদের ছন্দ সম্পর্কে ভিন্ন মত বিদ্যমান। কারও মতে, চর্যাপদ চার মাত্রার চাল ভিত্তিক ষোল মাত্রার পাদাকুলক ছন্দ, কারও মতে পজঝটিকা ছন্দ, কারও মতে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ রচনায় ব্যবহৃত ছন্দের অনুকরণ, কেউবা পয়ার-ত্রিপদী তথা অক্ষরবৃত্তের প্রবণতা লক্ষ করেছেন।

চর্যাপদের ছন্দে সংস্কৃত পজঝটিকা ছন্দের প্রভাব রয়েছে। পজঝটিকা ছন্দের প্রতি চরণ ষোল মাত্রার, চরণে চার পর্ব, চার মাত্রা। আবার শৌরসেনী প্রাকৃত প্রভাবিত মাত্রাপ্রধান পাদাকুলক ছন্দের সঙ্গেও চর্যার ছন্দের মিল রয়েছে। পাদাকুলক ছন্দের চরণও ষোল মাত্রার, প্রতি চরণে চার পর্ব, প্রতি পর্বে চার মাত্রা। তবে এ ছন্দের হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের মাত্রাগণনার পদ্ধতি চর্যাপদে অনুসৃত হয় নি। চর্যাপদের ছন্দ মাত্রাবৃত্ত রীতিতে গঠিত হলেও মাত্রাবৃত্তের বর্তমান সুনির্দিষ্ট গণনা পদ্ধতি এতে মানা হয় নি। আসলে চর্যাপদ গান হিসেবে গীত, কবিতা হিসেবে রচিত নয়। সেজন্য মাত্রা বা অক্ষরের হিসাবে চর্যাপদ ত্রুটিপূর্ণ।

চর্যাপদের ছন্দে সাধারণত চরণের শেষ পর্ব দীর্ঘমাত্রার দুটি অক্ষর হিসেবে বিবেচিত হয়। কোথাও কোথাও শেষ অক্ষরটি পুরা দ্বিমাত্রিকও হয় নি। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, মাত্রাপ্রধান পাদাকুলক ছন্দের এই অক্ষর অভিমুখিতার ফলেই বাংলা ভাষায় অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দের উদ্ভব ঘটেছিল। ষোল মাত্রার ছন্দ ক্রমে চৌদ্দ মাত্রার পয়ার হয়েছে।

চর্যাপদের ছন্দে মাত্রাসমতা বিষয়ে কিছু বৈষম্য লক্ষ করা গেলেও এতে প্রধানত পয়ার ও ত্রিপদীর সুর ধ্বনিত হয়েছে। যেমন :

কাআ তরু বর/পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ/পইঠো কাল ॥

চর্যার রচনাকারেরা তত্ত্বকথা প্রচারের দিকে মনোযোগী ছিলেন, ছন্দ রচনার দিকে নয়। তাছাড়া চর্যাপদ কীর্তন পদাবলীর মত গীত হত বলে কবিরা অক্ষর গণনার নিয়মের প্রতি তেমন লক্ষ রাখতেন না। ড. সুকুমার সেনের মতে, 'চর্যাগীতির ছন্দ একদিকে অবহট্‌ঠ ছন্দ আর একদিকে বিশুদ্ধ বাংলা ছন্দ, দুইয়ের মাঝামাঝি।'

কাব্যবিচারের পারিভাষিক রীতি বা আলঙ্কারিক পদ্ধতির সাহায্যেও চর্যার কাব্যধর্ম নির্ণীত হতে পারে। চর্যাপদে প্রচুর অনুপ্রাসের ব্যবহার করা হয়েছে। ১৪ সংখ্যক চর্যায় আছে : 'বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।' অন্ত্যানুপ্রাস চর্যাপদের সর্বত্র বিদ্যমান। চর্যাপদে অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ কাব্যের লক্ষণ। চর্যার পদগুলো ছন্দে রচিত। তবে এতে ছন্দ-অলঙ্কারের বিচারই বড় কথা নয়, চর্যাপদে আছে সুগভীর মানবতাবোধের নির্মল অনুভূতিপ্রবণ নির্ঝর এবং এর সঙ্গে প্রেমভক্তির সমন্বয়েই তার সাহিত্যমূল্য। চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্যের কথা বিবেচনা করে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'চর্যাগীতিগুলো বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরূপ। পদাবলীর মত এতেও রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে এবং কবির ভণিতা আছে। ভাবের দিক দিয়ে বিচার করলে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকদের রাগাত্মিকা পদের সঙ্গে চর্যাপদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।' মনে রাখতে হবে, চর্যাপদ জ্ঞানের বিষয় নয়, ভাবের বিষয় এবং তা উপযুক্ত শিল্প মাধ্যমে রূপায়িত।

চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ প্রকাশ করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী। তিনি এ অনুবাদের সাহায্যে চর্যাপদের মূল পাঠ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

চর্যাপদের সমাজচিত্র

চর্যাপদগুলো বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত। সমাজচিত্র অঙ্কন এর প্রধান লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু যেসব উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে তাতে তৎকালীন সমাজের চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। আর এর সমাজচিত্র এত সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে যে, এর ধর্মতত্ত্ব, উদ্ভব কাল, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও সমাজচিত্রকে কেউ গুরুত্বহীন বিবেচনা করেন নি। 'সকলেই স্বীকার করেন যে, আধ্যাত্মিক তথ্যের বাহন হলেও চর্যাপদে সমসাময়িক

কালের বাস্তব সমাজচিত্র আছে এবং তা অত্যন্ত মূল্যবান।' চর্যাপদের মধ্যে সে আমলের জীবনযাত্রার নানা আচারব্যবহার, রীতিনীতি, জীবিকা, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় মিলে। ড. সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদে 'সমসাময়িক তুচ্ছ নীচ সাধারণ জীবনের যে জীবনচিত্র ক্ষণোদ্‌ভাসিত তাহা দেবদেবীর নয়, রাজা-উজিরের নয়, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের নয়, ব্যাধ-বণিকেরও নয়। ইহাতে সাহিত্যের রীতিসিদ্ধ গতানুগতিক কারবার নাই। কোনরকম অতিশয়োক্তি নাই। সেকালে অখ্যাত অজ্ঞাত অতি সাধারণ লোকের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ও আচরণের বিম্বপ্রায় খণ্ড খণ্ড প্রতিরূপ থাকায় গানগুলো জীবনরসিক ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান হইয়াছে।'

চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যেরা বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন সময়ে বর্তমান ছিলেন বলে তাঁদের দেখা সমাজ হয়ত এক রকম ছিল না। তবে তাঁরা সবাই সিদ্ধা ছিলেন বলে কালের ব্যবধান সত্ত্বেও একই ধরনের পরিবেশে তাঁদের সিদ্ধাজীবন অতিবাহিত হয়েছে। সে কারণে তৎকালীন সমাজ-চিত্র প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব কিছু নয়। আবার 'পাঠনির্ণয়, শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ ও শব্দার্থ নিরূপণে পণ্ডিতদের মধ্যে যে মতভেদ আছে, তা চর্যাগীতির সমাজচিত্র পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে একটা বড় অন্তরায়স্বরূপ।'

চর্যাপদে যে সমাজের চিত্র পাওয়া যায় তা একান্তভাবে বাংলা বা বাঙালির নয়—সমগ্র পূর্ব ভারতের। বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগী সিদ্ধপুরুষ এই চর্যাকারেরা ছিলেন সামাজিক-গৃহস্থ-বিত্তবান ও শিক্ষা-সংস্কৃতিপুষ্ট বৌদ্ধ সমাজ থেকে বিচ্যুত। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'চর্যাপদে বিধৃত জীবন-জীবিকা ও প্রতিবেশ উড়িষ্যা-বিহার-বাংলা-আসামের প্রতিনিধিস্থানীয় বৃহত্তর সমাজের চিত্র দান করে না, কেবল বর্হিগ্রামবাসী অন্ত্যজ শ্রেণির যারা সাধারণত নির্বিত্ত নিরক্ষর-নিঃশাস্ত্র নিঃস্ব মানুষ—পারিবারিক, নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক জীবনের খণ্ডচিত্র কিছুটা প্রাসঙ্গিকভাবে—অর্থাৎ রূপক-উপমা-উৎপ্রেক্ষা রূপে বিধৃত দেখতে পাই।'

বাংলাদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে যে সব অনার্য জাতি বসবাস করত তারা আর্যীকরণের পরও এ দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। অনার্য জাতির মধ্যে কোল জাতিই প্রাধান্য পেয়েছে বলে আদিম কোলদের ভেতরে শবর পুলিন্দ ডোম চণ্ডাল প্রভৃতি চর্যাপদের আমলে বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল। গুপ্ত ও পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু কলিঙ্গ থেকে আগত বর্মণ এবং কর্ণাট থেকে আগত সেনরাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। সমাজের আর্যীকরণ বর্ণবিন্যাস প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাঁরা যে বর্ণাশ্রম পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তার বাইরে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শ্রেণি সেখানে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। চর্যাপদে যাদের চিত্র পাওয়া যায় তারা ধর্মক্ষেত্রে বৌদ্ধ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবহেলিত বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। চর্যাপদের ভাষা, বস্তুবাচক শব্দ, উপমান-উপমিত পদ, পেশা, প্রতিবেশ, তৈজস, ঘরবাড়ি, ব্যবহারসামগ্রী প্রভৃতি সবটাই নিঃস্ব নির্জিত মানুষের বাস্তব জীবন-জীবিকা ও সমাজ থেকে গৃহীত।

সমাজের নিচু স্তরের মানুষের কথা চর্যাপদে প্রতিফলিত হয়েছে। তারা সমাজের অভিজাত মানুষ থেকে দূরে বসবাস করত গ্রামের প্রান্তে, পর্বত গাত্রে কিংবা টিলায়। ২৮নং চর্যায় :

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥

—'উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা। ময়ূরের পুচ্ছ পরিধানে শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা।' নগরের বাইরে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের বাস। ১০নং চর্যায় বলা হয়েছে 'নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।'—নগরের বাইরে ডোম্বি তোর কুড়ে ঘর। 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী'—টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। ৩৩নং চর্যায়ও জনবসতির বাইরে বসবাসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

লোকালয় থেকে দূরে উচ্চভূমিতে যাদের বাস, তাদের জীবিকাও স্বতন্ত্র ধরনের। তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিপর্যস্ত। তেমন কোন সম্মানজনক বা অর্থকরী বৃত্তি এসব অন্ত্যজ অস্পৃশ্যদের ছিল না। কাপালিক যোগী ডোম্বী চণ্ডালী শবরী ব্যাধ তাঁতি ধুনরী শুঁড়ি মাহুত নট-নটী পতিতা প্রভৃতি নিম্নস্তরের মানুষের কথা চর্যায় বর্ণিত হয়েছে। তাদের জীবিকা কখনও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচায়ক নয়। কয়েকটি চর্যায় ব্যাধবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। ব্যাধকর্তৃক হরিণ শিকারের সুন্দর বর্ণনা আছে ভুসুকুর চর্যায় ৬নং পদে :

কাহেরে ঘিনি মেলি আছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস ॥
আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী ॥

—'কার কাছে মিলে আছ কী ভাবে? চৌদিক বেড়ে যে হাঁক পড়ছে। আপন মাংসে হরিণ সকলের বৈরী, ব্যাধেরা যে ক্ষণকালের জন্যও ভুসুকুকে ছাড়ে না।' কবিতাটির অবশিষ্ট অংশেও ব্যাধ-আক্রান্ত ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের বর্ণনা পাওয়া যায়। ২৩নং পদে ভুসুকু শিকারের ইঙ্গিত দিয়েছেন—'জই তুম্ হে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ মারিহসি পাঞ্চজণা।'—'যদি তুমি ভুসুকু শিকারে যাবে তবে পাঁচজনকে মার।' নৌকার উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত হয়েছে অনেক চর্যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকা একটি সাধারণ উপমা। ৮, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮ ইত্যাদি সংখ্যক চর্যায় নৌকা চালনা, গুণ টানা, জল সেচা ইত্যাদির যে বিবরণ আছে তাতে মনে হয় নৌকা বাওয়া এদেশের জীবনে একটি জনপ্রিয় বৃত্তি ছিল।

ঘুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাছি।
বাহ তু কামলি সদগুরু পুছি ॥ (চর্যা নং ৮)

খুঁটি উপড়িয়ে কাছি মেলে দিয়ে, কামলি তুমি সদ্‌গুরু জিজ্ঞেস করে বেয়ে চল। চর্যাপদে সাগরের উল্লেখ আছে। কিন্তু সাগরের বর্ণনা নেই।

ডোম্বীদের বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা ও চাঙ্গারি তৈরি করা।—'অন্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাঙ্গেড়া।' কারও অন্যতম বৃত্তি ছিল মদ চোয়ানো। যেমন ৩নং চর্যায় :

এক সে শুণ্ডিনী ঘরে সান্ধই।
চীঅণ বাকলত বারুণী বান্ধই ॥

—'এক সে শুঁড়িনী ঘরে ঢোকে। চিকন বাকল দিয়ে সে বারুণী মদ চোলাই করে।' শান্তি পার পদে ২৬নং চর্যায় ধুনরীর উল্লেখ আছে—'তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।'—'তুলা ধুনে ধুনে আঁশ করলাম।' কুঠার দিয়ে গাছ কাটার কথা আছে ৪ ও ৫ নং চর্যায়। নটবৃত্তি সেকালের পেশা হিসেবে প্রচলিত ছিল। ১০নং চর্যায় কাহ্ন পাদ বলেছেন :

এক সো পদমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ি।
তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি ॥

—'একটি সেই পদ্ম তার চৌষট্টি পাপড়ি। ডোম্বী বেচারী তার ওপর চড়ে নাচে।'

দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ ও অশান্তির চিত্র চর্যায় প্রতিফলিত হয়েছে। তখনকার জীবন ছিল রিক্ততায় পরিপূর্ণ :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায় ॥

৩৩নং চর্যায় এই অংশে অনুভব করা যায় যে, সমাজ-সংসার থেকে দূরে, প্রতিবেশীহীন টিলার ওপর ঘর, হাঁড়িতে ভাত নেই। নিত্য সেখানে অতিথি, ব্যাঙের মত সংসার বেড়েই যাচ্ছে। ২০নং চর্যায়—'হঁউ নিরাসী খমণ ভতারী।'

—'আমি আশাহীনা, স্বামী ক্ষপণক।' বিপর্যয়ের এমনি চিত্র আছে ৪৯ নং চর্যায় :

বাজ ণাব পাড়ী পউআঁ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ বঙ্গাল দেশ লুড়িউ ॥
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী ॥

—'বজ্রনৌকায় পাড়ি দিয়ে পদ্মাখালে বাওয়া হল, অদ্বয় বঙ্গাল দেশ লুণ্ঠিত হল। আজ ভুসুকু বাঙালি জন্ম নিল। নিজ গৃহিণী চণ্ডালে নিল।'

চর্যাপদে শাসন ব্যবস্থায় কোটালের কথা আছে। তবে তাঁর শাসন পদ্ধতি যে নিপুণ ছিল না তেমন ধারণা করা যায়। স্থলপথে বা জলপথে ছিল চোর ডাকাতের ভয়।

শুধু বাইরে নয়, ঘরেও ছিল সে আতঙ্ক। শান্তি রক্ষার দায়িত্ব যাঁদের তারা দুর্নীতি পরায়ণ।

দেশে তখন চুরি-ডাকাতির প্রাদুর্ভাব ছিল। 'কানেট চোরে নিল অধরাতী' (চর্যা নং-২), 'জো সো চোর সোহি সাধী' (চর্যা নং-৩৩) ইত্যাদি পদে এর নিদর্শন বিদ্যমান।

সমাজের নৈতিক অবস্থা তখন খুব উন্নত ছিল না। নাগরালি কামচণ্ডালী ছিনালী পতিতা লম্পট প্রভৃতি রূপক চর্যায় ব্যবহৃত হয়ে সে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছে। ২নং চর্যায় আছে :

দিবসহি বহুড়ী কাউ হি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই ॥

—'দিনে বধূ কাকের ভয়ে ভীত আর রাতে কামরূপ চলে যায়।' ৩৩নং চর্যায় দরিদ্রা অস্পৃশ্যার গৃহে অভিজাত যুবকের আনাগোনার কথা আছে। ৩ ও ৫০নং চর্যায় মদ তৈরি ও প্রচলনের কথা পাওয়া যায়।

সমাজের খণ্ড চিত্র চর্যায় বিধৃত হয়েছে। তৎকালীন বাঙালির আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির আভাস চর্যায় সহজেই পাওয়া যায়। একাধিক চর্যায় উল্লেখ থাকায় মনে হয় শ্বশুর-শাশুড়ি ননদ-শালী নিয়ে বাঙালির সংসার গড়ে উঠত। বিয়ের সুন্দর চিত্র আছে ১৯নং চর্যায় :

ভব নিব্বাণে পড়হ মাদলা।
মণ পবণ বেণি করণ্ড কশালা ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুত্তর ধাম ॥
অহণিসি সুরঅ পসঙ্গে জাই।
জোইণি জালে রঅণি পোহাই ॥

—'পটহ ও মাদল জোড়া ঢোল কাঁসি ইত্যাদির জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত হল, কাহ্ন ডোমনিকে বিয়ে করতে চলল। বিয়েতে তার জন্ম সার্থক হবে—বিয়ের যৌতুক অনুত্তর ধর্ম। অহর্নিশি সুরত প্রসঙ্গে যায়, রমণী পরিবৃত হয়ে বাসররজনী পোহায়।' এখানে তৎকালীন বিয়ের নিখুঁত চিত্র প্রত্যক্ষ করা চলে। তখন বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল।

গো-পালন ও দুগ্ধদোহনের কথা চর্যায় বিদ্যমান। তখন বলদের ব্যবহার ছিল। হাতির ব্যবহারও অজানা ছিল না। দাবা খেলা ছিল সে আমলে অবসর বিনোদনের উপায়। মদপান, কর্পূর দিয়ে পান খাওয়া, নাচ গান ইত্যাদি সামাজিক জীবনে প্রচলিত ছিল। গানে নানা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত। চর্যাপদে তৎকালীন জীবনযাত্রার নানা

উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জিনিসপত্রের নিদর্শন চর্যায় সহজে লক্ষণীয়। তৎকালীন সমাজে কাপালিক যোগী ক্ষপণক রসসিদ্ধা প্রভৃতি নানা শ্রেণির ধর্মীয় সাধক বর্তমান ছিল। নারী ছিল অনেকের সাধনসঙ্গিনী।

চর্যাপদের পরিচয় সাধনসঙ্গীত হিসেবে। পদকর্তারা বাস্তব জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন বলে এতে তৎকালীন সমাজ ও জীবনের বাস্তবচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

চর্যাপদে গাঁয়ের উল্লেখ নেই। কিন্তু নগরের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তখন গ্রাম ও নগরের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না বলে অনেক গবেষক মনে করেন। গ্রামের কথা না থাকার জন্য কৃষির কথাও উল্লেখ হয়নি বলে ধারণা করা হয়। চর্যায় নগর জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক বলা হয়েছে, 'অর্থনৈতিক জীবনে তা বস্ত্রোৎপাদনকেন্দ্রিক, অবস্থানের দিক দিয়ে তা নদী-তীরবর্তী। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে, জায়গাটা রাজপথের অদূরবর্তী।'

চর্যাকারগণের অনেকেই সমাজজীবনের উচ্চ পর্যায়ের অধিবাসী ছিলেন। তাঁদের কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ রাজপুরুষ, কেউ রাজপুত্র, কেউ কায়স্থ বা কেউ ছিলেন রাজকরণিক। তবে চর্যায় যে জীবনচিত্রের প্রতিফলন রয়েছে তাতে উচ্চ জীবনধারার পরিচয় নেই। অধিকাংশ পদে অন্ত্যজজাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বেদনাবিধূর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। চর্যায় তত্ত্বকথায় যা-ই থাকুক না কেন, সেখানে চিত্র ফুটেছে সাধারণ মানুষের জীবনের। চর্যায় নদনদী, নৌযাত্রা, নৌকার বিভিন্ন অংশের পারিভাষিক নাম নৌবাণিজ্য, জলদস্যুদের হানা ইত্যাদি সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে চর্যার পটভূমি যে নদীমাতৃক বাংলাদেশ তাতে সন্দেহ নেই। মগধ, উড়িষ্যা, বাংলা ও কামরূপ—এসব অঞ্চলের বিস্তৃত পটভূমিকায় চর্যার জীবনচিত্র অঙ্কিত হলেও বাঙালির জীবনচিত্র হিসেবে বিশেষ দাবি অযৌক্তিক নয়।

ড. আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, 'সন্ধা ভাষার আবরণ বা পণ্ডিতদের মতবিরোধ বহু শতাব্দীর ব্যবধানেও জীবনের সত্যকে আড়াল করতে পারেনি।'

প্রাচীন যুগের সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য

গুপ্তযুগ থেকে শুরু করে মুসলমান শাসনের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে সংস্কৃত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের চর্চা চলেছিল। ক্রমে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের চর্চা লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা বাংলাদেশে বিদ্যমান থাকে। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এদেশে সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য স্মৃতি পুরাণ ন্যায় দর্শন ব্যাকরণ অভিধান ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়। সেনযুগে বিশেষভাবে লক্ষ্মণ সেনের সভায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ চর্চা হয়েছিল—জয়দেবগোষ্ঠী এর প্রমাণ। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় যে পঞ্চরত্নের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁরা হলেন : উমাপতি ধর, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য ও জয়দেব। এই পাঁচজন নিয়েই জয়দেবগোষ্ঠী পরিচিতি লাভ করেছে। কবি জয়দেব ছিলেন তাঁদের মধ্যমণি।

জয়দেব : লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দ' কাব্য রচনা করে সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনি নিয়ে আদিরসাত্মক এই ভক্তিকাব্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে অনস্বীকার্য। জয়দেব বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বার শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। গীতগোবিন্দ কাব্য বার সর্গে রচিত। কৃষ্ণ গোপনে অন্য গোপীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে জেনে রাধার মান, পরে অনুতপ্ত কৃষ্ণকর্তৃক রাধার আনুকূল্য প্রার্থনা এবং সখীদের মধ্যস্থতায় রাধাকৃষ্ণের মিলন—এই সব ঘটনাই গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তু। রাধা কৃষ্ণ ও সখী—এর পাত্রপাত্রী। ভাষা ছন্দ ও অলঙ্কার এ কাব্যের প্রধান সম্পদ। এতে উগ্র আদিরস থাকা সত্ত্বেও ভক্তসম্প্রদায়ের কাছে অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। জয়দেবের অপূর্ব বাণীমূর্তি, বাকরীতি, রূপকল্প, আবেগের তীব্রতা ও ভক্তির ব্যঞ্জনা বাংলা সাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

কবি জয়দেব তাঁর রচিত একটি শ্লোকে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিগণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন :

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিবরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জ্জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎ প্রমেয়রচনৈরাচার্য গোবর্ধনস্পর্ধ
কোহ্পি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিলক্ষ্মাপতি।

আধুনিক বাংলা : উমাপতিধর বাক্য পল্লবিত করেন, জয়দেব শুদ্ধসন্দর্ভ রচনায় সমর্থ, দ্রুত দুরূহ পদরচনায় শরণ শ্লাঘ্য, শৃঙ্গার রসের সৎ ও প্রমেয় পরিবেশনায় গোবর্ধনাচার্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিশ্রুত আর কবি লক্ষ্মাপতি ধোয়ী শ্রুতিধর।

কাব্যের ফলশ্রুতি সম্পর্কে জয়দেবের একটি শ্লোক :

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥

আধুনিক বাংলা : 'যদি হরি-স্মরণে মনকে সরস করতে চাও, আর যদি বিলাসকলাসমূহে কুতূহল থাকে, তবে এই জয়দেব-ভারতীর মধুর কোমল কান্ত পদাবলী শোন।'

গীতগোবিন্দ কাব্যে বারটি সর্গের কিছু বিবৃতি, সখী, রাধা ও কৃষ্ণের নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং চব্বিশটি গানের মধ্য দিয়ে কাহিনিটি বর্ণিত হয়েছে। গীতগোবিন্দের ছন্দে অপভ্রংশের প্রভাব আছে। ঘটনার বর্ণনা ও উক্তি প্রত্যুক্তি সংস্কৃত জাতিচ্ছন্দে রচিত। কিন্তু গানগুলো প্রাকৃতের অনুরূপ মাত্রাচ্ছন্দে রচিত। বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের ওপর জয়দেবের প্রভাব অপরিসীম। উত্তরচৈতন্য যুগে কবি জয়দেবের

খ্যাতি প্রতিপত্তি ছড়িয়েছিল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এবং শেষ পর্যন্ত জয়দেবের কবিখ্যাতিকে আচ্ছন্ন করে তাঁর ওপর ভক্তের গৌরব আরোপিত হয়েছে। চৈতন্যদেব গীতগোবিন্দ আস্বাদন করতেন। জয়দেব ছিলেন বৈষ্ণবদের নবরসিকের একজন। বিদ্যাপতি ছিলেন 'অভিনব জয়দেব' নামে খ্যাত। বৈষ্ণব সাহিত্যে গীতগোবিন্দের ব্যাপক প্রভাব আছে। মধ্যযুগের প্রথম কবি বড়ু চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে আধুনিক কালের মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ সবাই জয়দেবের প্রভাব স্বীকার করেছেন। এসব কারণে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলেও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে বিজড়িত। তাই হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'সংস্কৃত ছন্দে রচিত বর্ণনামূলক শ্লোকগুলি ছাড়িয়া দিলে, যে রাগ-মূলক পদাবলী গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেগুলি নামমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে রচিত হইলেও, এই ভাষা ও ছন্দের ভঙ্গি যতটা প্রাকৃত বা দেশী ভাষা ও ছন্দের অনুযায়ী, ততটা সংস্কৃতের নহে।' দেশীয় ভাব ও ভঙ্গির অনুকরণে রচিত একটি গীতাংশ :

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব-জলধি রত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং ॥

সেনযুগের দুটি উল্লেখযোগ্য কাব্য সংকলন **কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়** ও **সদুক্তিকর্ণামৃত**। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের সঙ্কলনকর্তার নাম বিদ্যাকর। সংকলনটির প্রকৃত নাম সুভাষিত-রত্নকোষ। এতে ১১১ জন কবির কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। কবিগণের অনেকেই বাঙালি ছিলেন। এর অধিকাংশ কবিতাই আদিরসাত্মক—বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক। সদুক্তিকর্ণামৃত ১২০৬ সালের কাছাকাছি সময়ে লক্ষ্মণ সেনের প্রধান কর্মচারীর পুত্র শ্রীধর দাস কর্তৃক সঙ্কলিত হয়েছিল। এতে ৪৮৫ জন কবির ২৩৭০টি কবিতা আছে। এগুলোর অনেক উৎকৃষ্ট শ্লোক বাঙালি রচিত। তার মধ্যে হরপার্বতী ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক শ্লোক পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ। এ সংকলনে তৎকালীন জীবনের বাস্তব চিত্র বিদ্যমান। সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলনের একটি শ্লোক :

ক্ষুৎ কামা শিশবঃ শবা ইব তর্নু মন্দাদরো বান্ধবো
লিপ্তা জর্জর কর্করী জললবৈর্নো মাং তথা বাধতে
গোহিন্যাঃ স্ফুটিতাংশুকং ঘটয়িতুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং
কুপান্তী প্রতিবেশিনী প্রতিমুহুং সূচীং যথা যাচিতা।

আধুনিক বাংলা : 'শিশু সন্তানেরা ক্ষুধায় পীড়িত, শবের মত শীর্ণ দেহ, আত্মীয়েরা আদর করে না, পুরানো জীর্ণ পাত্রে স্বল্প জল ধরে, এ সবও আমাকে তেমন দুঃখ দেয় নি, যেমন কষ্ট পেয়েছিলাম যখন দেখেছিলাম আমার গৃহিণী করুণ হাসি হেসে ছিন্ন কাপড় সেলাই করার জন্য বিরক্ত প্রতিবেশিনীর কাছে সূঁচ ধার চাইছেন।'

প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার সম্পর্ক ছিল। এ প্রসঙ্গে **গাথা সপ্তশতী** ও **প্রাকৃতপৈঙ্গলের** কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ দুটি কাব্য বাংলাদেশে সংকলিত না হলেও এতে বাঙালি জীবনের চিত্র আছে। হাল কর্তৃক মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত গাথা সপ্তশতীর শ্লোকগুলোতে লোকজীবনের বাস্তব পরিচয় মিলে।

সপ্তম শতকে সংকলিত গাথা সপ্তশতীর একটি পদে রাধার উল্লেখ আছে :

> মুহ মারুএণ তং কণ্হ রাহিআএ অবণেন্তা।
> এদাণং বল্লবীণং অন্নাণং বি গারঅং হরসি ॥

আধুনিক বাংলা : 'হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতের দ্বারা রাধার মুখমণ্ডলের গোখুরধূলি অপনোদন করার ছলেই অন্য গোপীগণের গৌরব হরণ করেছ।'

শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' নামক ছন্দ-গ্রন্থে অনেকগুলো চমৎকার প্রাকৃত-অপভ্রংশ কবিতা সংগৃহীত হয়েছিল। সংকলনকর্তা 'পিঙ্গল' নামে অভিহিত। কাব্যটিতে বাঙালি জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। এতে কৃষ্ণের গোপীলীলা, প্রকৃতির বর্ণনা, দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ ও বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রাকৃতপৈঙ্গলের একটি পদ :

> রাআ লুব্ধ সমাজ খল
> বহু কলহারিণ সেবক ধুত্তউ ॥
> জীবন চাহসি সুকখ জই
> পরিহর ঘর জই বহু গুণ জুত্তউ ॥

আধুনিক বাংলা : 'রাজা লোভী, সমাজ খল, স্ত্রী ঝগড়াটে, সেবক ধূর্ত, যদি জীবনে সুখ চাও, তাহলে বহুগুণযুক্ত গৃহ ত্যাগ কর।'

এ প্রসঙ্গে দোহাকোষের কথাও উল্লেখযোগ্য। শৌরসেনী অপভ্রংশে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা রচিত এসব পদে বজ্রযান ও সহজযান মতাবলম্বী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সাধনভজন ও আচার-আচরণের কথা ব্যক্ত হয়েছে। সরহ পাদ ও কাহ্ন পাদের দোহাকোষ দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। এ সব গ্রন্থের পদগুলো যে ধর্মতত্ত্ব, সাধনভজন ও মানসিক পরিবেশে রচিত তা চর্যাপদের সমপর্যায়ের বলে মনে করা হয়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' গ্রন্থে যে চারটি পুঁথি সংকলন করেছিলেন সেগুলো হল : ১. চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, ২. সরোজবজ্রের দোহাকোষ, ৩. কাহ্ন পাদের দোহাকোষ ও ৪. ডাকার্ণব। এগুলোর মধ্যে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুঁথিটি বাংলা, অন্য তিনটি বাংলা নয়, অপভ্রংশে রচিত। তবে চর্যাপদের মতই সেগুলোর সংস্কৃত টীকা সংযোজিত রয়েছে। এ তিনটি পুঁথির ভাষার কিছু নমুনা উল্লেখ করা হল :

১. সরোজবজ্রের দোহাকোষ

জো ভব সো নিবাণ খলু ভেবু ন মণ্ণহু পণ্ণ।
একসহাবে বিরহিঅ নির্ম্মলমই পড়িবণ্ণ ॥
ঘরহি ম থক্কু ম জাহি বনে জহি তঁহি মণপরিআণ।
সঅলু নিরন্তর বোহি ঠিঅ কহি ভব কহি নিবাণ ॥
ণউ ঘরে ণউ বনে বোহি ঠিউ একু পরিআণউ ভেউ।
নিম্মলচিত্ত সহাবউ করহ অবিকল সেউ ॥
এহু সো অধ্যা এহু পর জো পরিভাবই কোই।
তে বিণু বন্ধে বন্ধিকিউ অপ্প বিমুক্কউ তোবি ॥
পর অপ্পাণ ম ভত্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।
এহু সো নিম্মল পরম পউ চিত্ত সহাবেঁ সুদ্ধ ॥
অদ্বয় চিত্ত তরুঅর ফরাউ তিহুঅঁণে বিত্থার।
করুণা ফুল্লিঅ ফল ধরই ণামে পরউআর ॥

২. কৃষ্ণাচার্য পাদের দোহাকোষ

এক্ক ণ বিজ্জই মন্ত ণ তন্ত
ণিঅ ঘরণি লই কেলি করন্ত ॥
ণিঅঘর ঘরিণী জাব ণ মজ্জই
তাব কি পঞ্চবর্ণ বিহরিজ্জই ॥
এষ জপহোমে মণ্ডলকম্মে
অনুদিন অচ্ছসি কাহিউ ধম্মে ॥
তো বিণু তরুণি নিরন্তর নেহে
বোহি কি লাভই এণ বি দেহে ॥

৩. ডাকার্ণব

জগই নিমন্তনু দিহি পহু, কে তুমি সুণ পবেস গও।
উঠহু করুণ সতাথু মহু, কামসি মহসুহ বাজ্জধরু ॥
সুণু সুণু পর উআরু গও, জিম পশুলোঅ মরন্তও।
বিঅসিঅ যম্মু কামমহু, তিম লোঅ সবভ সুহন্তও ॥
রম রম মাই বজ্জহরাই, সহজসরূঅ ন বাচাঈ।
সত্ত লোঅ পরদন্দ আঈ, জিম তুম্মি সুন্ন নিকজ্জঅই ॥
ভারণু সবভধম্মহ তুম্মিই, কে অচ্ছসি সহজ সরূঅ ন গাই।
কামহ মই পরমাথাই, জিম তুম্মি সমলোঅহ জাঈ ॥

ডাক ও খনার বচন

ডাক ও খনার বচনকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হয়। তবে এগুলো যে রূপে সৃষ্টি হয়েছিল তার কোন লিখিত নিদর্শন বর্তমান নেই এবং তা মুখে মুখে প্রচলিত থাকার ফলে তার ভাষাও হয়ে পড়েছে আধুনিক যুগের মত। বিষয় হিসেবে ডাক ও খনার বচন পুরানো এবং ছড়া জাতীয় এসব নমুনাকে লোকসাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ছড়া জাতীয় এসব রচনায় এদেশের আবহাওয়া ও কৃষি সম্পর্কিত বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটেছে। এসবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে নীতিকথা ও বহুদর্শী উপদেশ। ডাক নামে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন কিনা জানা যায় নি। সাধারণত প্রাচীন আমলের এক শ্রেণির বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধককে ডাক বলা হত। প্রাচীন যুগের ফলিত জ্যোতিষ ও কৃষি-বিষয়ক অভিজ্ঞতা এসব বচনের মধ্যে ছড়ার আকারে প্রচলিত হয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন ডাক ও খনার বচন রচনার কাল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক বিবেচনা করেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এর কতকগুলোকে বৌদ্ধযুগের রচনা বলে ধারণা করেছেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় এগুলোকে প্রাক-তুর্কি আমলের রচনা বলে মনে করে লিখেছেন, 'ডাক ও খনার নামে যে বচনগুলো বাংলাদেশে আজও প্রচলিত তাহাও বোধ হয় প্রাক-তুর্কি আমলের চলতি প্রবাদ সংগ্রহ; কালে কালে তাহাদের ভাষা বদলাইয়া গিয়াছে মাত্র।' মনে করা হয়, ছোট ছোট এই প্রবাদ প্রবচনে আদিম যুগের বাঙালির যে আধিভৌতিক মঙ্গলবুদ্ধি পরিচয় মিলে তার ঐতিহ্য এসব রচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ডাকের বচনগুলো আসামের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে রচিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। উড়িষ্যা অঞ্চলেও কিছু ডাকের বচন রচিত হয়েছিল।

ডাকের বচন ও খনার বচনের মধ্যে বিষয়গত ঐক্য বিদ্যমান। ডাকের বচন সম্পর্কে মনে করা হয় যে, বাঙালির যেসব অভিজ্ঞতা দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করত তা-ই ছড়ার আকারে রূপ লাভ করেছে। বাংলা ভাষা সৃষ্টির পূর্বকালে এদের উদ্ভব তাই আবহট্‌ঠে-এর প্রচলন ছিল। বাংলা, আসামি ও উড়িয়া ভাষায় ডাকের বচন প্রচলিত আছে। খনার বচনেও মানব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে এবং ডাক ও খনার বচন উভয়ই বাঙালি জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। ডাক ও খনা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, বচনগুলো তাদের নামে আরোপিত হয়েছে।

ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'নীতিবাক্য, বহুদর্শী উপদেশ, আবহাওয়া ও কৃষি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে ছড়া অবহট্‌ঠেও প্রচলিত ছিল, এগুলি বরাবর চলিয়া আসিয়াছে কালোচিত ভাষা-পরিবর্তন লইয়া। বাংলায় এমন ছড়া 'ডাকের বচন' নাম পাইয়াছে। রাজস্থানিতে মারাঠিতে হিন্দিতে ও অন্যান্য আধুনিক ভাষায় এগুলি 'ডঙ্ক

বচন', 'ভডলী পুরাণ' ইত্যাদি নামে প্রচলিত। ডাক কথাটি ডঙ্ক হইতে আসিয়াছে, অর্থ-মন্ত্রসিদ্ধ গুণী, স্ত্রীলিঙ্গে ডাকিনী।'

ডাক ও খনার বচন প্রাচীন যুগের সৃষ্টি হলেও মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আধুনিক যুগে চলে এসেছে। সেজন্য এর ভাষায় প্রাচীনত্ব অবশিষ্ট নেই। এ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'ডাক ও খনার বচন প্রথমত সাহিত্য নহে, দ্বিতীয়ত এই সমস্ত প্রবাদ-প্রবচনের কোন লিখিত প্রমাণ নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালি বহু অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের দ্বারা দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা এই ছড়া-প্রবচনে ধরা পড়িয়াছে। ডাক ও খনার নামে এই সমস্ত যুক্তি চলিয়া আসিতেছে। এই সংশয়পূর্ণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রবচনগুলির ঐতিহাসিক উদ্ভবকাল আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নহে। যে আকারে এগুলি আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার ভাষা অতিশয় আধুনিক; দুই চারিটি পারিভাষিক শব্দ সত্ত্বেও ডাক ও খনার বচন বলিয়া প্রচলিত ছড়া প্রবচনগুলিকে কিছুতেই প্রাচীন বলা যায় না।'

ডাক ও খনার বচনের কয়েকটি নমুনা থেকে ভাষার স্বরূপ লক্ষ করা যাবে।

ডাকের বচন

১. নিয়ড় পোখরী দূরে যায়।
পথিক দেখিয়া আউড়ে চায় ॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাকে বলে এ নারী ঘরে না টিকে ॥

২. রাঁধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি
অতিথি দেখিয়া মরে লাজে।
তবু তার পূজার সাজে ॥
সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।
মিঠা বোলে স্বামীতে ভকতি ॥
রৌদ্রে কাঁটা কুঁটায় রাঁধে।
খড়কাঠ বর্ষাকে বাঁধে।
কাখে কলসী পানীকে যায়।
হেটমুণ্ডে কাকহো না চায় ॥
যেন যায় তেন আইসে।
ডাক বলে গৃহিণী সেই সে ॥

৩. পরিহর বিনা কড়িতে হাট।
পরিহর বিনা লড়িতে বাট ॥
পরিহর নদীর তীরেতে গাছা।
পরিহর মায়ের বিহনে বাছা ॥

পরিহর যত্নে ঋণের শেষ।
পরিহর যত্নে লাসের বেশ।
পরিহর বিনা ঢাকান বারি।
পরিহর লাজ বিহনে বহুড়ী ॥

খনার বচন

১. খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি ॥
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ভাগ্যে হাভাত ॥

২. দিনে রোদ রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল ॥
কাতিকের উনজলে।
খনা বলে দুন ফলে।

৩. খনা ডাক দিয়া বলে।
চিটা দিলে নারিকেল মূলে ॥
গাছ হয় তাজা মোটা।
শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা ॥
নারিকেল গাছে লুনে মাটি।
শীঘ্র শীঘ্র বাধে গুটি ॥

ডাক ও খনার বচনের বিষয়বস্তুর মধ্যে ঐক্য থাকলেও ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা ও মানব-চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে। খনার বচনে কৃষি ও আবহাওয়ার কথা প্রাধান্য পেয়েছে।

ডাক ও খনার ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। খনা ছিলেন জ্যোতির্বিদ। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত গল্প এ রকম : খনা ছিলেন সিংহলের রাজকন্যা। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের অন্যতম ছিলেন জ্যোতির্বিদ বরাহ। বরাহের সিংহল প্রবাসী পুত্র রাজকন্যা খনাকে বিয়ে করে উজ্জয়িনীতে নিয়ে আসেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য খনার জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে রাজসভার সভাসদ করে নেন। এতে বরাহ ঈর্ষান্বিত হন। তিনি পুত্রকে খনার জিভ কেটে ফেলতে বললে খনা স্বেচ্ছায় নিজের জিভ কেটে প্রাণত্যাগ করেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'ডাক নামক জনৈক গোপ ডাকের বচন প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। যে বংশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার হইয়াছিল, সেই বংশে বঙ্গের সক্রেতিস—ডাকের জন্ম কল্পনা করা কিছু অনুচিত হয় নাই, তবে মিহিরের পত্নী উজ্জয়িনীর ভাষা ছাড়িয়া বাঙ্গালায় নীতি ও জ্যোতিষতত্ত্ব সংকলন করিতেছেন, এ কল্পনার দৌড় আর একটুক বেশি। ডাক

ও খনা দুর্ভেদ্য অন্ধকার জাল হইতে জ্ঞান-রশ্মি বিকীরণ করিতেছেন।...এই সব বচনে কবিত্ব কিছুই নাই, উহারা কঙ্কাল-সার সত্য, ভাষা উহাদিগকে সাজাইয়া বাহির করে নাই।'

আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে খনা কোন মহিলার নাম নয়। কৃষক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই খনা নামে প্রচারিত হয়েছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। চর্যাগীতিকার কাল নির্ণয় কর এবং কোন অর্থে ইহা বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ আছে। বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়া এ সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত কর।

৩। 'চর্যাপদগুলি যে বাংলাদেশেরই সামগ্রী তাহার পক্ষে দুইটি যুক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য— এক, ইহার ভাষা, দুই, ইহাতে বর্ণিত সমাজচিত্র।'—যথাযথ কারণ দর্শাইয়া এই দুইটি যুক্তির সমর্থনে অথবা বিপক্ষে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আলোচনা কর।

৪। 'চর্যাপদের ভাষা বাংলা কিনা এ-বিষয়ে তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু উহা যে বাংলাদেশের বাঙালি কবিকর্তৃক রচিত সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।'—উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া চর্যাপদের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝাইয়া লিখ।

৫। 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনগুলির মধ্যে ধর্মচেতনার প্রকাশ হয়ত ঘটিয়াছে সামাজিক মূল্যও নগণ্য নহে।'—আলোচনা কর।

৬। 'আজ অবধি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সিদ্ধাচার্যদের সাধনতত্ত্বজ্ঞাপক ও অধ্যাত্ম-অনুভূতি পরিচায়ক চর্যাগীতিগুলিতেই অচির-উদ্ভূত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন বিদ্যমান।'—উক্তিটির আলোচনা করিয়া দেখাও চর্যাপদ কত প্রাচীন এবং ইহার মধ্যে কি সাহিত্যিক নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

৭। 'চর্যাপদগুলির ভাষা বাংলা ভাষা, কিন্তু এ-ভাষা প্রাকৃত বা অপভ্রংশের প্রভাবমুক্ত একথা বলতে পারি না। যেমন ভাষায় তেমনি সাহিত্যসৃষ্টিতে চর্যাপদগুলি আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শনে চিহ্নিত।'—আলোচনা কর।

৮। বাংলা কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতির ভাব ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ করে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের সামগ্রিক ধারার সঙ্গে সম্পর্ক নির্দেশ কর।

৯। চর্যাগীতিকায় সেকালের বাংলাদেশের ও বাঙালি সমাজজীবনের যে চিত্র বিধৃত, তাহার পরিচয় দাও।

১০। চর্যাগীতির রচনাকাল সম্পর্কে মতপার্থক্যের কারণ কি? এই বিতর্কের যুক্তিগ্রাহ্য মীমাংসা কি?

১১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাগীতিকার স্থান নির্ণয় কর।

১২। চর্যাপদের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝাইয়া দাও এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

১৩। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন যুগ বলিতে কি বুঝ তাহা নিজের ভাষায় লিখ এবং উক্ত যুগের সাহিত্য এতকাল পর পড়ার এবং তাহার ইতিহাস অনুধাবন করার প্রয়োজন কতটা তাহা বুঝাইয়া দাও।

১৪। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্য বলিতে কি বুঝ? এই যুগের সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১৫। চর্যাগীতির ভাব, ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া সেকালের বাংলাদেশ ও বাঙালি সমাজ জীবনের পরিচয় দাও।

১৬। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ঐতিহ্য চর্যাগীতিগুলি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? চর্যাপদের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তোমার বক্তব্য উপস্থিত কর।

১৭। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করিয়া বল যে, ভাষা অথবা সাহিত্য কোন বিশেষ তাৎপর্যে সেগুলি বর্তমানকালেও আমাদের কাছে পাঠযোগ্য?

১৮। 'প্রাচীন যুগের সাহিত্য যাহা পাওয়া যায় তাহা পরিমাণে অল্প, কিন্তু তাহার সাহায্যে একদিকে যেমন সাহিত্যের বিবর্তনের ধারাটিকে অনুধাবন করা যায় অন্যদিকে তেমনি সমাজের রূপটিকে উপলব্ধি করা যায়।'—মন্তব্যটির সত্যাসত্য যাচাই কর।

১৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগত বিচারে চর্যাপদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন যুগের সূচনাকাল সম্পর্কে প্রচলিত নানা মতের ভিতরে তুমি কোনটি সমর্থন কর? আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২১। কেহ বলেন ভাষার বৈশিষ্ট্য, কেহ বলেন সমাজের চিত্র, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য পাঠের দ্বারা অনুধাবন করা যায়। তুমি এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

২২। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনগুলির পরিচয় দাও।

২৩। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ বলিতে কি বুঝ? ঐতিহাসিকদের মতামত আলোচনা করিয়া আদিযুগের কাল নির্ণয় কর এবং এই যুগের সাহিত্যিক নিদর্শনের পরিচয় দাও।

২৪। চর্যাগীতি এবং অন্যান্য রচনার ভিত্তিতে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের সাহিত্যকর্মের পরিচয় দাও।

২৫। 'বাংলা সাহিত্যের পদযাত্রা চর্যাপদ হইতেই যে শুরু হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু চর্যাপদের পূর্বে বা সমকালে বাংলা ভাষায় আর কিছুই রচিত হয় নাই।'—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিকাশধারা আলোচনা প্রসঙ্গে উক্তিটির যাথার্থ্য প্রদর্শন কর।

২৬। কোন বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদ রচিত হয়েছিল, তা আলোচনা কর।

২৭। 'চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যিক বিদর্শন।'—স্বীকার কর কি? চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মতামত উল্লেখপূর্বক এ সম্পর্কে তোমার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত কর।

২৮। প্রাচীন যুগের সাহিত্যের নিদর্শনসমূহ উল্লেখ করে এ সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।

২৯। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের কালসীমা নির্দেশ কর এবং এ যুগের সাহিত্যসৃষ্টির পরিচয় দাও।

৩০। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ডাক ও খনার বচনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩১। ডাক ও খনার বচনের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩২। টীকা লিখ : কাহ্ন পাদ, ভুসুকু, লুইপা, মীননাথ, সন্ধ্যাভাষা, জয়দেব, প্রাকৃতপৈঙ্গল।

মধ্যযুগ

চতুর্থ অধ্যায়

অন্ধকার যুগ

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের শুরুতেই ১২০০ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে তথাকথিত 'অন্ধকার যুগ' বলে একটি বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্যের অস্পষ্ট আঙিনায় যথোপযুক্ত আলোকপাত না করেই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রতি যথার্থ মর্যাদা না দেওয়ার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বিতর্কের ধূম্রজাল সৃষ্টি করার উদ্যোগ এতে লক্ষ করা যায়। অতীত দিনের লুপ্ত সাহিত্যের সম্পদ অনুসন্ধান প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়ে যায় নি। গবেষণা কর্মের মাধ্যমে নিত্য নতুন তথ্যের আবিষ্কার করে সাহিত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অনেক অবকাশ এখনও রয়েছে। অথচ তা না করে তথাকথিত অন্ধকার যুগ আখ্যা দিয়ে মূল্যবান অবদানকে অস্বীকার করার চেষ্টা চলছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত সময় মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত। এর মধ্যে ১২০০ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত দেড় শ বছরকে কেউ কেউ অন্ধকার যুগ বা তামস যুগ বলে অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশে তুর্কি বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমান শাসনামলের সূত্রপাতের পরিপ্রেক্ষিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি অনুমান করে এ রকম সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি বাংলার সেন বংশের শাসক অশীতিপর বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া বিনা বাধায় জয় করে এদেশে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত করেন। ১৩৪২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ গৌড়ের সিংহাসন দখল করে দিল্লির শাসনমুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর পুত্র সেকান্দর শাহের আমলে বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন।

মুসলমান শাসনের সূত্রপাতে দেশে রাজনৈতিক অরাজকতার অনুমান করে কোন কোন পণ্ডিত অন্ধকার যুগ চিহ্নিত করেছেন। এ ধরনের ইতিহাসকারেরা বিজাতীয় বিরূপতা নিয়ে মনে করেছেন, 'দেড় শ দু শ কিংবা আড়াই শ বছর ধরে হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার চালানো হয় কাফেরদের ওপর। তাদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্ম-সংস্কৃতির ওপর চলে বেপরোয়া ও নির্মম হামলা। উচ্চবিত্ত ও অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই মরল, কিছু পালিয়ে বাঁচল, আর যারা এর পরেও মাটি কামড়ে টিকে রইল, তারা ত্রাসের মধ্যেই দিনরজনী গুণে গুণে রইল। কাজেই, ধন জন ও প্রাণের নিরাপত্তা যেখানে অনুপস্থিত, যেখানে প্রাণ নিয়ে সর্বক্ষণ টানাটানি, সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিলাস অসম্ভব। ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্মেষ-বিকাশের কথাই ওঠে না।' ড. সুকুমার সেনের মতে, 'মুসলমান অভিযানে দেশের আক্রান্ত অংশে বিপর্যয় শুরু' হয়েছিল। গোপাল হালদারের মতে, তখন 'বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি তুর্ক আঘাতে ও সংঘাতে, ধ্বংসে ও অরাজকতায় মূর্ছিত অবসন্ন হয়েছিল। খুব সম্ভব, সে সময়ে কেউ কিছু সৃষ্টি করবার মত

প্রেরণা পায় নি।' কেউ মনে করেন এ সময়ে 'বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বারম্বার হরণকারী বৈদেশিক তুর্কিদের নির্মম অভিযান প্রবল ঝড়ের মত বয়ে যায় এবং প্রচণ্ড সংঘাতে তৎকালীন বাংলার শিক্ষা সাহিত্য সভ্যতা সমস্তই বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়ে যায়।' ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'শারীরিক বল, সমরকুশলতা ও বীভৎস হিংস্রতার দ্বারা মুসলমানেরা অমানুষিক বর্বরতার মাধ্যমে বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তামসযুগের সৃষ্টি করে।' তিনি মনে করেন, 'বর্বর শক্তির নির্মম আঘাতে বাঙালি চৈতন্য' হারিয়েছিল এবং 'পাঠান, খিলজি, বলবন, মামলুক, হাবশি সুলতানদের চণ্ডনীতি, ইসলামি ধর্মান্ধতা ও রক্তাক্ত সংঘর্ষে বাঙালি হিন্দুসম্প্রদায় কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করছিল।' তিনি আরও লিখেছেন, 'তুর্কি রাজত্বের আশি বছরের মধ্যে বাংলার হিন্দুসমাজে প্রাণহীন অখণ্ড জড়তা ও নাম-পরিচয়হীন সন্ত্রাস বিরাজ করিতেছিল।...কারণ সেমীয় জাতির মজ্জাগত জাতিদ্বেষণা ও ধর্মীয় অনুদারতা।...১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাংলাদেশ মুসলমান শাসনকর্তা, সেনাবাহিনী ও পীর ফকির গাজীর উৎপাতে উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছিল। শাসনকর্তৃগণ পরাভূত হিন্দুকে কখনও নির্বিচারে হত্যা করিয়া, কখনও বা বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া এদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। ...হিন্দুকে হয় স্বধর্মত্যাগ, না হয় প্রাণত্যাগ, ইহার যে কোন একটি বাছিয়া লইতে হইত।' ভূদেব চৌধুরীর মতে, 'বাংলার মাটিতে রাজ্যলিপ্সা, জিঘাংসা, যুদ্ধ, হত্যা, আততায়ীর হস্তে মৃত্যু— নারকীয়তার যেন আর সীমা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর প্রজাসাধারণের জীবনের উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ধর্মহানির সম্ভাবনা উত্তরোত্তর উৎকট হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই জীবনের এই বিপর্যয় লগ্নে কোন সৃজনকর্ম সম্ভব হয় নি।' ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমানদের সম্পর্কে লিখেছেন, 'শারীরিক বল, সমরকুশলতা ও বীভৎস হিংস্রতার দ্বারা বাংলা ও তাহার চতুস্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলামের অর্ধচন্দ্রখচিত পতাকা প্রোথিত হইল। খ্রিঃ ১৩শ হইতে ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত—প্রায় দুই শত বছর ধরিয়া এই অমানুষিক বর্বরতা রাষ্ট্রকে অধিকার করিয়াছিল; এই যুগ বঙ্গসংস্কৃতির তামসযুগ, য়ুরোপের মধ্যযুগ The Dark Age-এর সহিত সমতুলিত হইতে পারে।' এ সব পণ্ডিত মুসলমান শাসকদের অরাজকতাকেই অন্ধকার যুগ সৃষ্টির কারণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' গ্রন্থে অন্ধকার যুগের সমর্থকদের মনোভাব এভাবে তুলে ধরেছেন : বখতিয়ার খিলজি মুসলিম বিজেতাদের চিরাচরিত প্রথামত বিগ্রহ-মন্দির বিধ্বস্ত করে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন নতুন মসজিদ। মাদ্রাসা ও ইসলামিক শিক্ষার মহাবিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করে, বিধর্মীদের ধর্মান্তরিত করে ধর্মীয় উৎসাহ চরিতার্থ করেন। বিদেশি তুর্কিদের শাসনসীমা থেকে দীর্ঘকাল শাসিতেরা পালিয়েই ফিরেছে; পালিয়েছে প্রাণের ভয়ে, মানের ভয়ে, এমন কি ধর্ম সংস্কারের বিলুপ্তির ভয়ে। বস্তুত, বখতিয়ারের জীবনান্তের পরে তুর্কি শাসনের প্রথম পর্যায়ের নির্মমতা ও বিশৃঙ্খলার প্রাবল্যের দরুন এই পলায়ন প্রবণতা আরও নির্বারিত হয়েছিল। ১৩৪২ সালে ইলিয়াস শাহি সুশাসন প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত বাঙালির সার্বিক জীবন এক

নীরন্ধ্র বিনষ্টির ঐতিহ্যে ভরপুর হয়েছিল। স্বভাবতই জীবনের সংশয়ে কালজয়ী কোন সৃজনকর্ম সম্ভব হয় নি। নিছক গতানুগতিক ধারায় যা কিছু রচিত হয়েছিল, তাও সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে প্রায়ই রক্ষা না পাবারই কথা। প্রধানত এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আনুমানিক ১২০০ সাল থেকে চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাল সৃজনহীন ঊষরতায় আচ্ছন্ন বলে মনে হয়।

বলা হয়ে থাকে, ক্ষমতালোভী বিদেশাগত মুসলমান আক্রমণকারীরা বিবেচনাহীন সংগ্রাম শাসন আর শোষণের মাধ্যমে দেশে এক অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। চারুজ্ঞান বিবর্জিত জঙ্গীবাদী বস্তুবাদী শাসকদের অত্যাচারে সাহিত্য সৃষ্টি করার মত সুকুমার বৃত্তির চর্চা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘর্ষের ফলে বাঙালির বহির্জীবনে ও অন্তর্জীবনে ভীতি বিহ্বলতার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমান শাসনের সূত্রপাত এদেশের জন্য কোন কল্যাণ বহন করে এনেছিল কিনা তা সর্বাগ্রে পর্যালোচনা করে বিতর্কের অবতারণা করা উচিত ছিল।

প্রকৃত পক্ষে বাংলা সাহিত্যবর্জিত তথাকথিত অন্ধকার যুগের জন্য তুর্কিবিজয় ও তার ধ্বংসলীলাকে দায়ী করা বিভ্রান্তিকর। এ সময়ের যে সব সাহিত্য নিদর্শন মিলেছে এবং এ সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার যে সব তথ্য লাভ করা গেছে তাতে অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। অন্ধকার যুগের দেড় শ বছর মুসলমান শাসকেরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছেন এ কথা সত্য নয়। ইলিয়াস শাহি আমলের পূর্ব পর্যন্ত খিলজি বলবন ও মামলুক বংশের যে পঁচিশ জন শাসক বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন তাঁদের কারও কারও রাজত্বে সাকুল্যে পনের-বিশ বৎসর মাত্র দেশে অশান্তি ছিল, অন্যদের বেলায় শান্ত পরিবেশ বিদ্যমান ছিল বলে ইতিহাস সমর্থন করে। তৎকালীন যুদ্ধবিগ্রহ দিল্লির শাসকের বিরুদ্ধে অথবা অন্তর্বিরোধে ঘটেছে বলে তা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি। ফলে তাতে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার কোনও কারণ ঘটে নি। বরং এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মকর্ম, আচারব্যবহার, আহারবিহার প্রভৃতির প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশবাসীর মধ্যে ইসলামি পরিবেশ গড়ে উঠছিল।

মুসলমান শাসকেরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। তাঁদের উৎসাহ দানের ফলেই বাংলা ভাষা যথার্থ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। নইলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥'—বলে ধর্মীয় বিষয় দেশীয় তথা বাংলা ভাষায় প্রচারের যে নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছিল তাতে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন ছিল। মুসলমান শাসকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সে দুর্দিন থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই ড. দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।' তাঁর মতে, 'মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এ দেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালি হইয়া পড়িলেন।' ভারতে মুসলমান শাসকগণের ব্যাপক অবদানের কথা বিবেচনা করে

ক্ষিতিমোহন সেন মন্তব্য করেছেন, 'তাঁহারা দেশী ভাষার সমাদর ত করিয়াছেনই, সংস্কৃতেরও সমাদর করিয়াছেন।' বাংলাদেশের মুসলমান আগমনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, 'সেনদের কাছ থেকে মুসলিম তুর্কিরা বাংলাদেশ দখল করলেন কূটনীতি শৌর্যবীর্য ও জ্ঞানগরিমার শ্রেষ্ঠত্বে। তখনকার দিনের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মাপকাঠিতে তাঁরা কোন অপরাধ করেন নি। ফলে নির্যাতিত ও নিগৃহীত মানুষ মানুষের প্রাপ্য ইসলামি মর্যাদা পেল; সংস্কৃতের দৈব-আসন টলে গেল; ফারসি এসে তার স্থান দখল করল; আর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার আপনভূমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।' তাঁর মতে, 'তুর্কি কর্তৃক বঙ্গবিজয় এক মহা অপরাধ বলে গণ্য হোক' বা 'এ বিজয়কে নরহত্যা লুণ্ঠন ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা বলে চিহ্নিত' করা অথবা 'এই বাংলা সাহিত্য বর্জিত যুগের জন্য তুর্কিবিজয় ও তার ধ্বংসলীলাই দায়ী'—এ ধরনের ধারণা কোন ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। তাই তিনি বলেন, 'এ সময় বাংলার মানুষ নিজের সুখদুঃখের কাহিনি নিজের ভাষায় লেখে নি, কিংবা নিজের বিরহমিলনের গান নিজের কথায় রচনা করে নি,—এমন একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির কথা ভাবতেও পারা যায় না।'

স্মরণ রাখা দরকার যে, মুসলিম শাসনামলে রাজক্ষমতার পরিবর্তন ঘটলেও বাঙালির জীবনব্যবস্থা মোটামুটি অচঞ্চল ছিল। তখন রাজনৈতিক বিরোধ রাজধানী আর দুর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙালির ব্যবহারিক জীবনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর কোন হস্তক্ষেপ করা হয় নি। মুসলিম শাসকগণের সহানুভূতিশীল আচরণ এবং ইসলাম ধর্মের উদার নীতির ফলে সৃষ্টিশীল জীবন পদ্ধতি গড়ে তোলা সহজ ছিল। এ প্রসঙ্গে মুসলমান শাসকগণের উদারতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকের মতামত উল্লেখ করা যায়। ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন, 'এ দেশে আসিয়া মুসলমান রাজারা সংস্কৃত হরফে মুদ্রা ও লিপি ছাপাইয়াছেন, বহু বাদশা হিন্দু মঠ ও মন্দিরের জন্য বহু দানপত্র দিয়াছেন।' ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'রাজ্য শাসনে ও রাজস্ব ব্যবস্থায় এমন কি সৈন্যাপত্যেও হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। গৌড়ের সুলতানেরা মুসলমান হইলেও রাজকার্য প্রধানত হিন্দুর হাতেই ছিল।' স্টুয়ার্টের মতে, 'অধিকাংশ আফগানই তাঁদের জায়গিরগুলো ধনবান হিন্দুর হাতে ছেড়ে দিতেন। এই জায়গিরগুলোর ইজারা ধনশালী হিন্দুরা নিতেন এবং তাঁরা ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করতেন।' বিনয় ঘোষ লিখেছেন, 'পাঠান রাজত্বকালে জায়গিরদারেরা দেশের ভেতরে রাজস্ব আদায়ের কাজে হস্তক্ষেপ করেন নি। দেশে শাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য হিন্দুদের ওপরই তাঁদের নির্ভর করতে হত।'

রাজত্ব স্থায়ী করার গরজেই শাসিতদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা দানে শাসকবর্গ তৎপর হয়। মুসলমান বিজয়ের প্রথম দেড় শ বছর মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ির আশঙ্কা ছিল বলে সিংহাসনাভিলাষীরা সামন্ত, সর্দার ও ভুঁইয়াদের স্বপক্ষে টানার জন্য দেশে সুশাসন চালাবার চেষ্টা করতেন। ড. যদুনাথ সরকার বখতিয়ার খিলজি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'বখতিয়ার রক্তপিপাসু ছিলেন না, অকারণে প্রজাদের ওপরে উৎপীড়ন কিংবা ব্যাপক বিধ্বংসে তাঁর কোন আগ্রহ বা আনন্দ ছিল না।'

মুসলিম শাসকগণের অবদান সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন করতে গিয়ে ড. দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন, 'রাজকার্যাবসানে মুসলমান সম্রাটগণ পাত্র-মিত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া হিন্দু শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।... মুসলমান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই রাজদ্বারে দীনাহীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহ্বান পড়িয়াছিল।' এসব মন্তব্য থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রতি মুসলিম শাসকগণের আনুকূল্য ও অনুরাগ সম্বন্ধে সহজেই ধারণা করা যায়। অন্ধকার যুগের সমর্থনে ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করলেও ইতিহাসের যথার্থ সত্যকে তিনি গোপন রাখতে পারেন নি। তিনি তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' প্রথম পর্যায় গ্রন্থে লিখেছেন, 'ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যাঁরা বাইরে থেকে বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলেন, অতদিনে সেই তুর্কি শাসকেরাই দেশীয় ঐতিহ্যের পরিপোষক রূপে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সুশাসন সূত্রে এই সব বিদেশি শাসনকর্তা প্রজাসাধারণের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণেই কেবল তৎপর হয়েছিলেন না, দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পুনর্বিকাশেও অনেক ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিলেন।'

তথাকথিত অন্ধকার যুগের সাহিত্যসৃষ্টির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি এ কথাও সত্য নয়। এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক নিদর্শন পাওয়া না গেলেও অন্যান্য ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন বর্তমান থাকাতে অন্ধকার যুগের অপবাদের অসারতা প্রমাণিত হয়। এ সময়ের প্রথমেই 'প্রাকৃতপৈঙ্গলের' মত প্রাকৃত ভাষার গীতিকবিতা গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। রামাই পণ্ডিত রচিত 'শূন্যপুরাণ' এবং এর 'কলিমা জলাল' বা 'নিরঞ্জনের রুষ্মা', ডাক ও খনার বচন, হলায়ূধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়ার' অন্তর্গত পীর-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বাংলা 'আর্যা' অথবা 'ভাটিয়ালী রাগেণ গীয়তে' নির্দেশক বাংলা গান প্রভৃতি এ সময়ের বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির নমুনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য। রাহুল সংকৃত্যায়ন এই সময়ে রচিত কিছু চর্যাপদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন।

শূন্যপুরাণ

রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ 'শূন্যপুরাণ'। রামাই পণ্ডিতের কাল তের শতক বলে অনুমিত হয়। শূন্যপুরাণ ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ—গদ্যপদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য। বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলন সাধনের জন্য রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এবং হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে। শূন্যপুরাণে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে তা 'মুসলমান তুর্কি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরের, অন্তত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের রচনা।' এতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সদ্ধর্মীদের ওপর বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচার কাহিনি বর্ণনার সঙ্গে মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর রাতারাতি ধর্মান্তর গ্রহণের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে অপরিণত ধারণা থেকে মনে হয় যে এ দেশে ইসলাম সম্প্রসারণের প্রাথমিক পর্যায়ে এটি রচিত। ব্রাহ্মণ্য শাসনের অবসান এবং মুসলিম

শাসন প্রচলনের পক্ষে মত প্রকাশিত হওয়াতে এতে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিচয় মিলে। এর ভাষার কিছু নিদর্শন :

আপনি চণ্ডিকা দেবী তিহঁ হৈলা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হৈলা বিবি নূর।
জথেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খাএ রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পাএ রামাঞি পণ্ডিত গাএ
ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥

সেক শুভোদয়া

রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ূধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া' সংস্কৃত গদ্যপদ্যে লেখা চম্পুকাব্য। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, 'সেক শুভোদয়া খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারেই গোড়ার দিককার রচনা।' গ্রন্থটি রাজা লক্ষ্মণ সেন ও শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজির অলৌকিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত। 'শেখের শুভোদয় অর্থাৎ শেখের গৌরব ব্যাখ্যাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।' এতে নানা ঘটনার মাধ্যমে মুসলমান দরবেশের চরিত্র ও অধ্যাত্মশক্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার যে সব নিদর্শন আছে তা হল পীর-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বাংলা ছড়া বা আর্যা, খনার বচন ও ভাটিয়ালি রাগের একটি প্রেমসঙ্গীত। আর্যার সংখ্যা তিনটি এবং এগুলো বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত পীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। হিন্দু কবির দৃষ্টিতে পীরদরবেশগণের ওপর জাগ্রত দেবমাহাত্ম্য আরোপিত হয়েছে।

সেক শুভোদয়ার প্রেমসঙ্গীতটি নিম্নরূপ :

হঙ জুবতী পতিএ হীন।
গঙ্গা সিনায়িবাক জাইএ দিন ॥
দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ।
বায়ু ন ভাঙ্গএ ছোট গাছ ॥
ছাড়ি দেহ কাজ্জ মুঞি জাঙ ঘর।
সাগর মৈদ্ধে লোহাক গড় ॥
হাত জোড় করিঞা মাঙ্গো দান।
বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান ॥
বড় সে বিপাক আছে উপাএ ॥
সাজিয়া গেইলে বাঘে ন খাএ ॥
পুন পুন পাএ পড়িআ মাঙ্গো দান।
মৈদ্ধে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ ॥

শ্রীখণ্ড চন্দন অঙ্গে শীতল।
রাত্রি হৈলে বহএ আনল ॥
পীন পয়োধর বাঢ়ে আগ।
প্রাণ ন জায় গেল বহিঞা ভার ॥
নয়ান বহিঞা পড়ে নীর নিতি।
জীএ ন প্রাণী পালাএ ন ভীতি ॥
আশে পাশে স্বাস করে উপহাস।
বিনা বায়ুতেঁ ভাঙ্গে তালের গাছ ॥
ভাঙ্গিল তাল লুম্বিল রেখা।
চলি যাহ সখি পলাইল শঙ্কা ॥

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর : 'আমি পতিহীন যুবতী, দিনে গঙ্গায় স্নানের জন্য যাই। দৈবযোগে অকাজ হল, বায়ু ছোট গাছ ভাঙে না। কাজ ছেড়ে দাও, আমি ঘরে যাই। সাগরের মধ্যে লোহার গড়। হাত জোড় করে ভিক্ষা মাগি—হে মহাত্মা, একবার সম্মান রাখ। এ যে বড় বিপাক, এক উপায় আছে। সাজগোজ করে গেলে বাঘে খায় না। পুনঃ পুনঃ পায়ে পড়ে ভিক্ষা মাগি, মাঝখানে সুরেশ্বরী গাঙ বইছে। শ্রীখণ্ড চন্দনে অঙ্গ শীতল, রাত হলে অনল বইতে থাকে। পীন পয়োধর, আগুন বাড়ে। ভার বয়ে গেল, প্রাণ যায় না। নিত্য নয়ন বয়ে অশ্রু ঝরে। প্রাণ জীবিত থাকতে চায় না, ভয়ও পলায় না। আশে পাশে শ্বাস উপহাস করে, বিনা বায়ুতে তালের গাছ ভেঙে যায়। তাল গাছ ভাঙল, রেখা লম্বা হল। সখি চলে যাও, শঙ্কা পালিয়ে গেল।'

'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থের প্রেমসঙ্গীতটিকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন হিসেবে মনে করা হয়। প্রাচীন যুগে ব্যক্তিমানসের যে প্রতিফলন এতে ঘটেছে তা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সেক শুভোদয়া গ্রন্থে প্রাচীন আমলের সমাজচিত্রেরও পরিচয় মিলে।

বাংলা সাহিত্যের এসব নিদর্শনের সাহায্যে সে আমলকে বন্ধ্যাত্বের অপবাদ থেকে রেহাই দেওয়া চলে। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাপদের পরে হয়ত এমন কিছু কাব্যের অনুশীলন চলেছিল যার ফলে মধ্যযুগের প্রথম গ্রন্থ বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের মত উৎকর্ষপূর্ণ কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। যথার্থ ধারাবাহিক চর্চা না হলে সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হত না বলে ধারণা করা হয়। এ কারণে তথাকথিত সাহিত্য-বিবর্জিত যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করা অনুচিত।

অন্ধকার যুগের কিছু কিছু সাহিত্যসৃষ্টির নমুনা পাওয়া গেলেও তা যথেষ্ট নয়। এই স্বল্পতার কতিপয় কারণও নির্দেশ করা চলে। সম্ভবত তুর্কি বিজয়ের পূর্বে বাংলা লেখ্য ভাষার মর্যাদা পায় নি। বাংলা তখন ধর্মপ্রচার ও রাজ্যশাসনের বাহন ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচারে বৌদ্ধরা বিতাড়িত হলে অবহেলিত বাংলা ভাষার প্রতি মনোযোগ দানের লোকের অভাব হয়ত ছিল। সব যুগেই দেখা গেছে যে শাসন ব্যবস্থায় ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলেই তার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। মুসলমানদের আগমনের

আগে সংস্কৃতের প্রাধান্য এবং পরে বিদেশি ভাষা ব্যবহারের ফলে রাজকার্যে তখনকার অপরিণত বাংলা ভাষার গুরুত্ব বিবেচিত হয় নি। ধর্মমত প্রচারের ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্য বিবেচিত।

অন্যদিকে বাংলা ভাষার প্রাথমিক অবস্থার অপূর্ণতার জন্য সকলের কাছে তা গৃহীত হতে পারে নি। প্রাকৃতজনের মুখে তখন বাংলায় গান গাথা ছড়া প্রভৃতি রচিত হচ্ছিল; কোন উচ্চবিত্তের লোক বাংলায় সাহিত্য রচনায় আগ্রহ দেখায় নি। তের চৌদ্দ শতকে বাংলা ভাষার গঠনযুগ চলছিল। তাই ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা বার, তের ও চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ অবধি লেখ্যভাষার স্তরে উন্নীত হয় নি। এটি হচ্ছে বাংলার স্বাকার প্রাপ্তির কাল ও মৌখিক রচনার কাল।' এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা অপভ্রংশ অবস্থা থেকে বাংলার আঞ্চলিক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশিত হচ্ছিল। তখনও তার রূপ স্থিতিস্থাপক,—কখনও অপভ্রংশ-ঘেঁষা কখনও পরবর্তীযুগের বাংলা-ঘেঁষা। রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক আবিষ্কৃত নতুন চর্যাপদ ও কৃষ্ণকীর্তনের ভাষাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।' তুর্কি মুসলমানেরা যখন এদেশে শাসনের সূত্রপাত করেন তখন এদেশে সংস্কৃতেরই প্রাধান্য ছিল। তখনকার শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃতশিক্ষিত। সাধারণ মানুষের ভাষার সঙ্গে তৎকালীন শাসকশ্রেণীর সংযোগ স্থাপন সে আমলে সহজে সম্ভব হয় নি। তাই প্রথমাবধি বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বিধানে শাসকগণের সচেষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। পরে যখন তাঁরা বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হন তখন তাঁরা সংস্কৃত থেকে সাহিত্যসৃষ্টি বাংলায় অনুবাদ করিয়েছেন।

দেশে রাজনৈতিক অরাজকতা বিদ্যমান থাকলেও সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব বলে মনে করা যায়। সে আমলের রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে নি। তাছাড়া দেশের বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেও সাহিত্য সৃষ্টি করা যে সম্ভব হয়েছে তা বিভিন্ন আমলে সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা যাবে। আকবর-জাহাঙ্গীরের শাসনামলে দেশে মোগল-পাঠান তথা রাজশক্তি-সামন্ত শক্তির মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। শাজাহানের আমলে হার্মাদদের আক্রমণে বাংলাদেশ বিপর্যস্ত হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের আমলে বাণিজ্যে ইউরোপীয় বণিকদের দৌরাত্ম্যে জনগণ অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ১৩৫০ সনের মন্বন্তরে দেশে চরম দুর্যোগ নেমে এসেছিল। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যায় দেশে জনজীবনে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। আর ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগ চলেছিল। এসব অশান্ত ও প্রতিকূল পরিবেশে বাংলা সাহিত্যের চর্চা অবরুদ্ধ হয় নি। তুর্কি শাসকেরা অত্যাচারী হলে কেবল সাহিত্যের বিকাশই বাধাগ্রস্ত হত না, হিন্দুজীবনের সমস্ত কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে যেত। কিন্তু সে আমলে তা না হয়ে যথারীতি জীবনধারা অগ্রসর হয়েছে।

দেশজ মুসলমানরা বরাবরই বাংলা ভাষায় কথা বলে এসেছে। মুসলমানদের শাসনামলে তা অবহেলিত হওয়ার কথা নয়, কিন্তু অপরিণত রূপের জন্যই তা মুসলমানদের হাতে ব্যবহৃত হয় নি।

তথাকথিত অন্ধকার যুগে এদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা বিবেচনা করলে বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাদের অনীহা বা বিরূপতার কোন কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বরং নানা কারণে নির্যাতিত জনগণের প্রতি শাসকদের যেমন সহানুভূতি ছিল, তেমনি অবহেলিত সাহিত্যের প্রতি উদার সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। এই কারণে অন্ধকার যুগের বিতর্কটি নিতান্তই অর্থহীন মনে করা উচিৎ।

এ সব যুক্তির বাইরে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য অন্ধকার যুগের অস্তিত্বহীনতার পক্ষে রায় দেয়। এই আমলের সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন না পাওয়ার পেছনে আরও কারণ আছে। এদেশের মানুষের চিরন্তন জীবনযাপন ব্যবস্থা, এখানকার আবহাওয়া, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে এই সময়ের কোন সাহিত্য নিদর্শনের অস্তিত্ব বর্তমান থাকা হয়ত সম্ভবপর হয় নি। চর্যাগীতি, সেক শুভোদয়া ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের একটি করে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এগুলোর এই একটি মাত্র নমুনা যদি না পাওয়া যেত তবে এ সব সাহিত্যও লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যেত। তাই মনে করা যায় যে, এ সময়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে থাকলেও তার অস্তিত্ব হয়ত লুপ্ত হয়ে গেছে।

ড. আহমদ শরীফ তথাকথিত অন্ধকার যুগে বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন না পাওয়ার কারণগুলো এভাবে একত্রিত করেছেন :

ক. ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন হয় নি বলে বাংলা তুর্কি বিজয়ের পূর্বে লেখ্য ভাষার মর্যাদা পায় নি।

খ. তের-চৌদ্দ শতক অবধি বাংলা ভাষা উচ্চবিত্তের সাহিত্য রচনার যোগ্য হয়ে ওঠে নি।

গ. সংস্কৃততর কোন ভাষাতেই রসসাহিত্য চৌদ্দ শতকের পূর্বে রচিত হয় নি। তুর্কি বিজয়ের পর প্রাকৃতজনেরা প্রশ্রয় পেয়ে বাংলা রচনা করেছে মুখে মুখে। তাই লিখিত সাহিত্য অনেক কাল গড়ে ওঠে নি।

ঘ. তের-চৌদ্দ শতকে সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ছিল হিন্দু শাসিত মিথিলায়, তাই এ সময় বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চা বিশেষ হয় নি।

ঙ. আলোচ্য যুগে বাংলায় কিছু পুঁথিপত্র রচিত হলেও জনপ্রিয়তার অভাবে, ভাষার বিবর্তনে এবং অনুলিপিকরণের গরজ ও আগ্রহের অভাবে তা নষ্ট হয়েছে। আগুন-পানি-উই-কীট তো রয়েইছে।

চ. লিখিত হলেও কালে লুপ্ত হওয়ার বড় প্রমাণ চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সেক শুভোদয়া প্রভৃতির একাধিক পাণ্ডুলিপির অভাব।

ছ. চর্যাগীতি রচনার শেষ সীমা যদি বার শতক হয়, তাহলে তের-চৌদ্দ শতক বাংলা ভাষার গঠন যুগ তথা স্বরূপ প্রাপ্তির যুগ। কাজেই এ সময়কার কোন লিখিত রচনা না থাকারই কথা।

জ. দেশজ মুসলমানের ভাষা চিরকালই বাংলা। বাংলায় লেখ্য রচনার রেওয়াজ থাকলে তুর্কিবিজয়ের পূর্বের বা পরের মুসলমানের রচনা নষ্ট হবার কারণ ছিল না।

এ সব কারণে পণ্ডিতগণ মনে করেন তথাকথিত অন্ধকার যুগ চিহ্নিত করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাই ১২০০ সাল থেকেই মধ্যযুগ শুরু হয়েছে মনে করা সমীচীন। এ সময় থেকে অপরিণত রূপের প্রাথমিক পর্যায় থেকে ক্রমান্বয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হয়েছে। পূর্বাপর নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বাংলা সাহিত্যে যে ধারাবাহিকতা প্রত্যক্ষ করা যায় তাতে অন্ধকার যুগের দাবি সহজেই উপেক্ষা করা চলে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যাযুগ বা তামস যুগ বলিতে কি বুঝ? এই বন্ধ্যাত্বের পরিসর কতখানি? এই বন্ধ্যাত্বের কারণ কি?

২। 'তের-চৌদ্দ শতকের সংস্কৃত ও অবহট্ঠ-রচনা যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অপ্রাপ্যতার জন্য তুর্কি বিজয়কে দায়ী করা যাবে না। আমাদের বিশ্বাস, বাংলা তখনও বুলিমাত্র,—লেখ্য ভাষার স্তরে উন্নীত হয় নি।' তথ্য নির্ভর আলোচনার দ্বারা এই মত খণ্ডন অথবা সমর্থন কর।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তুর্কি বিজয়ের পরবর্তী দেড় শতাব্দী কাল 'অন্ধকার যুগ' নামে সচরাচর অভিহিত হইয়া থাকে। এই অন্ধকার যুগ নামকরণের পক্ষে যে-সমস্ত যুক্তি সচরাচর দেখানো হয় তাহা খণ্ডন কর।

৪। বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত অন্ধকার যুগ বলতে কি বুঝ। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতামত আলোচনা করে তোমার গ্রাহ্য একটি সমাধান দানের চেষ্টা কর।

৫। বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগে 'অন্ধকার যুগ' কাহাকে বলা হয় এবং কেন বলা হয়? তোমার মতামতসহ এ বিষয়ে একটি আলোচনা লিপিবদ্ধ কর।

৬। 'বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগে অন্ধকার যুগের অস্তিত্বকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে স্বীকার করা যায় না।'—এই উক্তির পক্ষে অথবা বিপক্ষে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

৭। প্রাচীন যুগের শেষ এবং মধ্যযুগের শুরু—এই যুগসন্ধিক্ষণে বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে যে শূন্যতা পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ কি? সেকালের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া তোমার বক্তব্য উপস্থিত কর।

৮। 'সেক শুভোদয়া' ও 'শূন্যপুরাণে'র মত দু-তিনটি কাব্যের নজির দেখাইয়া বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কোন কোন ঐতিহাসিক 'অন্ধকার যুগের' অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তাহাদের এই যুক্তি কি ধোপে টেকে? প্রসঙ্গত সেক শুভোদয়া ও শূন্যপুরাণের ভাষা বিচার করিয়া এগুলির আনুমানিক কাল নির্ণয় কর।

৯। বাংলা সাহিত্যের 'আঁধার যুগ' সম্পর্কে তথ্যসহযোগে তোমার মতামত দাও।

১০। বাংলা সাহিত্যে 'অন্ধকার যুগ' মেনে নেয়া যায় কি? আলোচনা কর।

১১। টীকা লিখ : শূন্যপুরাণ, নিরঞ্জনের রুষ্মা, সেক শুভোদয়া, অন্ধকার যুগ।

পঞ্চম অধ্যায়

মধ্যযুগের সাহিত্যের ধারা ও বৈশিষ্ট্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ১২০০ থেকে আরম্ভ হয়ে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সুদীর্ঘ ছয় শ বছর বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্যমুখী বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগের প্রথম দেড় শ বছরকে তথাকথিত অন্ধকার যুগ বা বন্ধ্যা যুগ বলে কেউ কেউ অভিহিত করলেও সকলের দৃষ্টিতে এর যথার্থতা প্রমাণিত হয় নি। নানা কারণে এ সময়ের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবু ১২০০ সাল থেকেই মধ্যযুগের সূত্রপাত ধরতে হয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য দিয়ে মধ্যযুগের শুরু। পরবর্তী পর্যায়ে মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলি, জীবনী সাহিত্য, নাথসাহিত্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, লোকসাহিত্য ইত্যাদি সাহিত্যসৃষ্টি এই যুগকে পরিসরে ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছে। এ যুগের সমগ্র পরিসর জুড়েই কাব্যের একচ্ছত্র আধিপত্য লক্ষণীয়। তখন পর্যন্ত বাংলা গদ্যের বিকাশ হয় নি; তাই বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ পর্যন্ত গদ্যের কোন স্থান নেই। বাঙালি চিরদিন গদ্যে কথাবার্তা বললেও সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে আধুনিক-পূর্ব যুগ পর্যন্ত কাব্যই সর্বত্র মর্যাদা পেয়েছে। সাহিত্যের ভাষা সব সময়েই দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তার ভাষার কিছুটা মার্জিত রূপ। মধ্যযুগের সাহিত্যসৃষ্টিতেও কবিভাষা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গদ্য থেকে দূরে সরে রয়েছে। দীর্ঘ ছ শ বছর জুড়ে মধ্যযুগের পরিধি বিস্তারিত বলে এখানে বিষয়বস্তুর যেমন বৈচিত্র্য ঘটেছে, তেমনি ভাষাসৃষ্টি ও বিবর্তনে বৈচিত্র্যপূর্ণ নিদর্শনও প্রকাশ পেয়েছে। এ সময়ে সংস্কৃতবহুল শব্দ ব্যবহার যেমন ব্যাপক স্থান জুড়ে আছে, তেমনি আছে আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত ভাষার পরিচয়।

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের সঙ্গে মধ্যযুগের বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। আদিযুগ বলতে কোন জনপদবাসী জনগোষ্ঠীর প্রাচীনতম বিকাশকেই বোঝায়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিকাশের সময়সীমাই আদিযুগ। সেদিক থেকে মধ্যযুগের পরিধি ব্যাপক এবং বিধৃত বিষয়ও বৈচিত্র্যধর্মী। তার চারিত্র্যের ভিন্নতা স্বতন্ত্র যুগের স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। শৈশব অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্য কৈশোরে পদার্পণ করে নিজেকে বিকাশের পন্থা খুঁজে পায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এদেশে মুসলমান শাসনামলের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। ভাষার দিক থেকে বাংলা তখন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নিজস্ব সত্তা আবিষ্কারে সক্ষম হয়। অবহেলিত ও অপরিণত বাংলা ভাষা নিজের মনোরম অবয়ব গড়ে তোলার আনুকূল্য লাভ করে। জনগণের ভাষা তখন মর্যাদা লাভের অধিকারী হয়। শাসকবর্গের এই অনুকূল উদারতার প্রেক্ষিতেই বাঙালির আত্মার বিকাশ ঘটে—সাহিত্য সৃষ্টিসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আত্মবিকাশের চাহিদা থেকেই সৃষ্টি হয় ঐতিহ্য। আর এই ঐতিহ্য-চিহ্নই ইতিহাসের পাতায় নতুন যুগের বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র রূপে ধরা পড়ে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাঙালির নতুনতর আত্মবিকাশের চিহ্ন বিদ্যমান। মধ্যযুগ এক বিশাল জনগোষ্ঠীর বিকাশমান চেতনায় দোটানার আলোড়নে চঞ্চল। এই চাঞ্চল্যের পেছনে কাজ করেছে নতুন রাজশক্তির সগৌরব আগমন।

ইলিয়াস শাহি যুগ ও পরবর্তী কালের শাসনব্যবস্থার ফলে বৃহত্তর বাংলার সমাজ জীবনে ব্যাপক ভারসাম্য ফিরে এসে মধ্যযুগের সাহিত্যধারার বিকাশের পথ সহজ করে। সাহিত্য তখন সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ পায়। ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আদিযুগের সৃজনকর্মের পুনরুত্থানের ইঙ্গিতই কেবল করে না, সম্পূর্ণ এক নতুন জীবনচেতনা ও মূল্যবোধের দ্বারা পরিশ্রুত হয়ে প্রাচীন শিল্পী-স্বভাবের নবীন পুনরুজ্জীবনের নিঃসংশয় বার্তাই ঘোষণা করে। বস্তুত নতুন এই প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করতে পারি কেবল এই জীবনচেতনার পরিণতি ও মূল্যবোধের নবতম পুনরভিব্যক্তির মধ্যেই। বাঙালির জীবনধর্মের এই প্রাণস্পন্দিত পরিবর্তন-ধারা সূচিত হয়েছে জাতীয় চেতনার দুর্লঙ্ঘ্য মর্মমূলে। অতএব, মধ্যযুগীয় সাহিত্যকর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করতে হয় বাঙালির সেই অন্তঃস্বভাবেরই গোপন গভীরে।'

মধ্যযুগের সাহিত্যে নবচেতনা সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব ও তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম বাঙালির চিন্তা-চেতনায় এক নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল, যাকে কেউ কেউ চৈতন্য-রেনেসাঁ বলে উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যদেব শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রতিফলিত হন নি, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব ছড়িয়েছিল। চৈতন্য-জীবন মধ্যযুগের নতুন বাঙালি মনঃপ্রেরণার উন্মোচনের প্রতীকস্বরূপ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে শতধাবিচ্ছিন্ন বাংলার মিলন-চর্যা সার্থক পরিণাম লাভ করেছিল। 'যে নবজাগ্রত জাতীয় চৈতন্যের উৎসমুখে সমগ্র মধ্যযুগীয় প্রাণপ্রবাহ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ করেছিল, এই যুগের মিলনাকাঙ্ক্ষী সাহিত্যিক অভ্যুদয় যে-বিকাশের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি,—চৈতন্যদেব ছিলেন সেই নব-উদ্ভূত সার্বিক জাতীয় চৈতন্যের অধিদেবতা।'

মধ্যযুগের সাহিত্যে দেবদেবীর প্রাধান্য বিদ্যমান। তবে মানুষের কথাও অস্বীকৃত হয় নি। অন্ত্যমধ্যযুগের সাহিত্যে মানবমহিমা উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগের সাহিত্য দৈবানুগত্য-নির্ভর মানবতার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র।

মধ্যযুগে মুসলমান কবিগণ মানবিক প্রণয় কাব্য রচনা করে দৈব-প্রেরণাদীপ্ত সাহিত্যে এক নতুন সুর সংযোজন করেছিলেন। মধ্যযুগের সুবিশাল পরিসরে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য এও ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আধুনিক যুগে সাহিত্যে মানবিকতার যে জয়গান তার উন্মেষ সেখান থেকেই হয়েছে বলে মনে করা যায়।

ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে বৈচিত্র্য যেমন মধ্যযুগকে বিশিষ্ট করে তুলেছে, তেমনি দীর্ঘ সময় ধরে ভাষারও যথেষ্ট বিবর্তন ঘটেছে—সীমাহীন উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। যুগের বিবর্তনের স্বাক্ষর আছে ভাষায়।

মধ্যযুগের আদি নিদর্শন কবি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। বড়ু চণ্ডীদাসের সঠিক কাল নির্ধারিত হয় নি, তবে তিনি চতুর্দশ শতকের শেষদিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত এই কাব্য

বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। বক্তব্যের অভিনবত্ব এবং ভাষার উৎকর্ষের বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন হিসেবে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। চর্যাপদের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা সাহিত্যের সমুন্নতির পরিচায়ক। এই সময়েই বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস প্রমুখ পদকর্তাগণ এই ধারাটিকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করেন। পদাবলি সাহিত্যের ধারা বর্তমান কাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

অনুবাদ শাখা মধ্যযুগের ব্যাপক পরিসর জুড়ে আছে। সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত থেকে অনুবাদ করে এ সময়কার বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করা হয়েছে। প্রত্যেক ধারায় অসংখ্য কবির আবির্ভাব ঘটেছে, অনেকেই অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পনের শতক থেকে অনুবাদের ধারাটির সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। অনুবাদজাতীয় সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে মুসলমান কবিগণের প্রণয়োপাখ্যান কাব্যের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পনের শতকের কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর এ ধারার সূত্রপাত করেন। ধর্মীয় বিষয়ের বাইরে এ সব কাব্য রচিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এ ধারাটির বিশেষ প্রসার ঘটেছে আরাকান রাজসভার কবিগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। দৌলত কাজী, আলাওল প্রমুখ কবিগণ মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রণয়কাব্য রচনায় অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। যে সময়ে ধর্মীয় বিষয়বস্তুই বাংলা সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল তখন মুসলমান কবিরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ফারসি, হিন্দি প্রভৃতি সাহিত্য থেকে এই প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় গ্রন্থের ভাবানুবাদ করেন। মানবিক বিষয়বস্তুর এই অনুপ্রবেশ একটা বিশেষ ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচ্য। কেবল প্রণয়োপাখ্যানই নয়, মুসলমান কবিগণ বৈচিত্র্যধর্মী রচনাতেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাহিনিকাব্য রচনার মাধ্যমে মুসলমান কবিগণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মধুমালতী, বিদ্যাসুন্দর, লায়লী মজনু, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল প্রভৃতি কাহিনি নিয়ে একাধিক কবি কাব্য রচনা করেন। আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজসভার কবিগণও প্রণয়কাব্য রচনায় কৃতিত্ব দেখান। এ ক্ষেত্রে আলাওলের অবদান বিস্ময়কর।

মুসলমান কবিগণ জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টিতেও তৎপর ছিলেন। কবি হায়াত মামুদ এ ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। মুসলিম ধর্মসাহিত্য মধ্যযুগের সাহিত্যের অঙ্গনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 'রসুলচরিত, নবীকাহিনি, ইসলামের উদ্ভবযুগের বীর-বৃত্তান্ত-শরীয়ৎশাস্ত্র, মারফততত্ত্ব, পীর পাঁচালী প্রভৃতি রচনা করে তাঁরা ইসলাম প্রচারের গৌরব, স্বধর্মের প্রসারগর্ব এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ববোধ গণমনে জিইয়ে রাখবার প্রয়াস পেয়েছেন।' জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত যেসব রহস্য জিজ্ঞাসা মানুষকে চিরকাল আকুল করেছে—সেগুলোর শাস্ত্রীয়, কাল্পনিক ও নীতিজ্ঞান প্রসূত উত্তর দানের চেষ্টা আছে সওয়াল সাহিত্যে।

মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের ব্যাপক স্থান জুড়ে আছে। মঙ্গলকাব্যের নানা শ্রেণি—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল ইত্যাদি। পনের শতক থেকেই মঙ্গল-কাব্যের উৎপত্তি এবং মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' রচনার মাধ্যমে

তার পরিসমাপ্তি। মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য বিভিন্ন দেবদেবীর আখ্যান। প্রধানত লৌকিক দেবদেবীর কাহিনি অবলম্বনেই মঙ্গলকাব্যের বিকাশ ঘটেছে। মনসা, চণ্ডী বা শিবের কাহিনি বিভিন্ন শাখায় অনুসরণ করা হয়েছে। অসংখ্য কবি বিভিন্ন শাখায় মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু কাহিনির দিক থেকে কোন নতুনত্ব তাঁরা দেখান নি; একই কাহিনি অনুসরণ করে বহু কাব্য রচিত হয়েছে। অনুকরণপ্রিয়তার বৈশিষ্ট্য মঙ্গলকাব্যে স্পষ্ট। কিন্তু বাঙালি জীবনের প্রতিফলন এবং কবিপ্রতিভার ঔজ্জ্বল্য এই ধারাকে বিশিষ্ট করেছে। কানা হরিদত্ত ছিলেন মনসামঙ্গল কাব্যের আদিকবি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি ছিলেন মাণিক দত্ত। এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম কেবল মঙ্গলকাব্যেই নন, সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি হিসেবে মর্যাদার অধিকারী।

জীবনী সাহিত্য মধ্যযুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি। ষোল শতক থেকে শুরু করে আঠার শতক পর্যন্ত প্রায় তিন শ বছর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব এবং তাঁর অনুসারী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিকাশ বাঙালি মানসকে বিচিত্র পথে সম্প্রসারিত করেছিল। চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনি অবলম্বনে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে জীবনী সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' ইত্যাদি এ পর্যায়ের বিশিষ্ট গ্রন্থ।

লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য প্রাচীন কালের। প্রথমে মুখে মুখে লোকসাহিত্যের উৎপত্তি হলেও তা লিখিত হয়েছে পরবর্তীকালে। লোকসাহিত্যও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ। পরবর্তীকালে সংগৃহীত 'ময়মনসিংহ গীতিকা', 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' অনুপম লোকসাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে বিশ্ব জুড়ে প্রশংসিত হয়েছে। লোকসাহিত্যে আছে বিষয় ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য। বাস্তব জীবনের সুখদুঃখ হাসিকান্না লোকসাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। আধুনিক যুগেও এর আবেদন যথেষ্ট এবং সে কারণে এখনও চলছে লোকসাহিত্যের বিচিত্র নিদর্শনের সংগ্রহকাজ।

নাথসাহিত্য মধ্যযুগের অন্য একটি শাখা। নাথ যোগী ও সিদ্ধাচার্যদের কাহিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনরূপের সঙ্গে জড়িত। চর্যাপদে উল্লেখিত সিদ্ধাচার্যদের সঙ্গে নাথ সিদ্ধাদের ঐক্য রয়েছে। এক সময় বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে শৈবধর্মের সম্মিলনে যে নাথধর্ম প্রসারলাভ করেছিল তারই যোগমাহাত্ম্য ও কাহিনি অবলম্বনে নাথসাহিত্যের বিকাশ ঘটে। নাথসাহিত্যের রচনাকাল সুপ্রাচীন বিবেচিত হলেও রচনার সঙ্গে সঙ্গে তা লিখিত হয় নি, মুখে মুখে তা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে সেসব লোকমুখ থেকে সংগৃহীত হয়েছে বলে এর ভাষায় প্রাচীনত্ব বিদ্যমান নেই।

মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে হিন্দুদের মধ্যে কবিওয়ালা এবং মুসলমানদের মধ্যে দোভাষী পুঁথিরচয়িতা শায়েরগণের আবির্ভাব ঘটে। বিশেষ সময়ের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এই ধরনের রচনা সমাদৃত হয়েছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলতার মধ্যে এক শ্রেণির জনসাধারণের জন্য আনন্দ পরিবেশন করেছিলেন কবিওয়ালা ও শায়েরগণ।

এ সব নিদর্শন ব্যতীত মধ্যযুগে নানা ধরনের সাহিত্যসৃষ্টি লক্ষণীয়। মুসলমান কবিগণ সুফী সাহিত্য, চরিতকথা, মর্সিয়া সাহিত্য, বিজয়কাব্য, পীর-পাঁচালী ইত্যাদি

নানা জাতের কাব্য রচনা করেছিলেন। এ ভাবে মধ্যযুগের সাহিত্য বৈচিত্র্যধর্মী হয়ে বিকশিত হয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে কোন কোন পণ্ডিত দু ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁদের মতে, আদিমধ্যযুগ ও অন্ত্যমধ্যযুগ—এই দু পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার জন্যই চৈতন্যপূর্ব বা আদিমধ্যযুগ এবং চৈতন্যোত্তর বা অন্ত্যমধ্যযুগ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। সে পরিবর্তন কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা সম্প্রসারিত হয়েছিল। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের শ্রেষ্ঠ ফসল বৈষ্ণব পদাবলি। চৈতন্য পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সর্বস্তরে চৈতন্য প্রভাব রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। এর ফলে চৈতন্য-পূর্ব যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য অনুবাদ মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির সঙ্গে এ সব ধারার চৈতন্যোত্তর সাহিত্যসৃষ্টির বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়।

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের কাছে মধ্যযুগ নামটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। তিনি মনে করেন, মধ্যযুগ কথাটির সঙ্গে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও বর্বরতার যোগ আছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এসব ছিল না। বরং মধ্যযুগ ছিল 'চিৎপ্রকর্ষের বিস্ফোরণের' যুগ। তাই তিনি মধ্যযুগকে তুর্কি যুগ, সুলতানি যুগ ও মোগলাই যুগ নামে ভাগ করেছেন। এই তিন ভাগকে একত্র করে মুসলিম শামনামলে বাংলা সাহিত্য নাম দেওয়া যায়। তবে এ নামে যুগের বৈচিত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামান মনে করেন, 'পৃথিবীর এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ইউরোপকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করার ফলে এই তিন পার্বিক ইতিহাসরচনার শুরু হয়, পরে তা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তৃত হয়।' এ কারণে তিনি 'মধ্যযুগ' কথাটা যথাসাধ্য পরিহার করার চেষ্টা করেন।

ধর্মীয় বিষয়বস্তু

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানত ধর্মীয় বিষয়াবলম্বনেই রচিত। অবশ্য বিশ্বের অপরাপর সাহিত্যেও এ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যুগে যুগে ধর্মপ্রচারের বাহন হিসেবে ভাষা ব্যবহারের ফলে ভাষার উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদের বিষয়বস্তু ধর্মীয়। এর আগে সংস্কৃত বা পালি-প্রাকৃত ভাষায় ধর্মের বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে। সে সব দৃষ্টান্তে বাংলা সাহিত্য ছিল প্রভাবিত। ড. দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে মন্তব্য করেছেন, 'ধর্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি।' বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রাথমিক পর্যায়েও হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মকলহ বিদ্যমান ছিল। মুসলমান রাজত্বের প্রথমে পীরফকিরগণের ইসলাম প্রচারে হিন্দু সমাজে ধর্মচেতনা বৃদ্ধি পায়। হিন্দুদের মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব—এই তিন ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রবল ছিল। আবার চণ্ডী বাসলী মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পূজারও প্রচলন হয়। নিজ নিজ ধর্ম প্রচারের জন্য সাহিত্য রচিত হওয়ার ব্যাপক নিদর্শন সে আমলে লক্ষ করা যায়। সিদ্ধাচার্য নাথযোগী ধর্মপূজক নিরঞ্জনী আউল বাউল দরবেশ সবাই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাস প্রধানত হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিষয়বস্তু অবলম্বনেই সমৃদ্ধ হয়েছে। এ সময়ে মুসলমান কবিগণও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা দূর করার জন্য ধর্মীয় কাব্য রচনা করেছিলেন। মধ্যযুগে প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে মুসলমান কবিগণ এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। তার পাশাপাশি মুসলমান কবিগণ ধর্মীয় বিষয়ের অনুবাদ করে ধর্মসাহিত্যের বিকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁদের রচনায় ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়ে জনগণকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সওয়াল সাহিত্য ও চরিতকথার মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়ের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। পীর-পাঁচালী জাতীয় রচনার মধ্যেও ধর্মীয় বিষয় স্থান পেয়েছে। এ সব ছাড়া মধ্যযুগের অপরাপর সাহিত্যসৃষ্টি হিন্দু কবিগণকর্তৃক হিন্দু ধর্মীয় বিষয়াবলম্বনে রূপায়িত হয়েছে। তখন ধর্মীয় বিষয়বস্তু সাহিত্যে যে ব্যাপকভাবে স্থান পেয়েছিল তার নিদর্শন সে আমলের সকল সাহিত্যেই বিদ্যমান। এদেশে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। এর ফলে হিন্দু সমাজে ঘোরতর দুর্দিনের সৃষ্টি হয়েছিল। সম্প্রসারণশীল ইসলামের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে নিজেদের কীভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে সচেতন হয়েই হিন্দু কবিগণ সাহিত্যকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন এবং নিজ ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে তৎপর হন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখ অসংখ্য বৈষ্ণবপদকর্তার বিপুল পদাবলি সাহিত্যের উপজীব্য বৈষ্ণব মতবাদ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের রূপকের অন্তরালে অধ্যাত্ম কথা এতে ব্যক্ত হয়েছে। রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ মধ্যযুগের সাহিত্যের বিশিষ্ট নিদর্শন। এ সবেও ধর্মীয় বিষয় ও আদর্শ রূপলাভ করেছে। হিন্দু ধর্মের বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিপ্রবাহে। দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রকাশক চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগের কবিগণের প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকাহিনি অবলম্বনে যে সব চরিতাখ্যান রচিত হয়েছিল তাতেও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এমনিভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যের বিরাট অংশের বিষয়বস্তু ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক এ সব সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে ধর্মীয় তত্ত্ব প্রচারিত হলেও তাতে কাব্যরস ও জীবনবোধের অভাব ছিল না। দীর্ঘকাল একই ধারা অনুসৃত হয়েছে বলে যুগে যুগে সাহিত্যের আবেদনে পরিবর্তন এসেছে। ধর্মীয় প্রয়োজন তখন অনেকাংশে উপেক্ষিত ছিল, বরং জীবনের রূপায়ণ ও রসসৃষ্টিই ছিল সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বাইরে এর কাব্যরসাস্বাদনে কোনও বাধা নেই, নিছক প্রেমের কাব্য হিসেবে এর আবেদন অম্লান। মধ্যযুগের উষালগ্ন আলোকিত করে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের মধুময় অভ্যুদয় ঘটেছিল। বৈষ্ণব মতবাদ ও দার্শনিকতার বিশেষ গণ্ডি পেরিয়ে বাঙালি জীবনের সকল অনুভূতির মর্মে ছড়িয়ে রয়েছে এক ললিত মাধুর্য। বৈষ্ণব কবিগণ এক বিশেষ ধর্মীয় তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে অপূর্ব সুন্দর পদাবলি রচনা করেছিলেন। কিন্তু এগুলোর সর্বজনীন আবেদন এমন গভীর যে, স্বভাবত এগুলোকে আধুনিক গীতিকবিতার সমপর্যায়ভুক্ত মনে হতে পারে। বৈষ্ণব কবিগণ ঈশ্বরভক্ত ছিলেন, তাঁদের আচরিত ধর্মে তত্ত্বও ছিল, কিন্তু তাঁদের রচিত কবিতায় তা মুখ্য হয়ে ওঠে নি।

ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লেখা মঙ্গলকাব্যেও কাব্যগুণ পরিদৃষ্ট হয়। মঙ্গলকাব্যগুলো খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক, লৌকিক ও পৌরাণিক-লৌকিক সংমিশ্রিত দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্য পূজাপ্রচার ও ভক্তকাহিনি অবলম্বনে রচিত সম্প্রদায়গত প্রচারধর্মী ও আখ্যানমূলক কাব্য। সাম্প্রদায়িক দেবকাহিনি ক্রমান্বয়ে সর্বজনীন মানবিক সংবেদনাপূর্ণ সাহিত্যরূপ লাভ করেছিল। মঙ্গলকাব্যের কবিগণের মধ্যে অনেকেই প্রথম শ্রেণির কবি ছিলেন। বিভিন্ন কবি একই আঙ্গিকের মাধ্যমে বিচিত্র প্রাণরসের বিস্তার সাধন করেছেন। বাঙালি জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় মঙ্গলকাব্যে বিধৃত। অনুবাদ শাখায় ধর্মীয় বিষয় পরিবেশিত হলেও তাতে কবিরা মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এগুলো আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তা মূলের ভাব অবলম্বনে মৌলিক রচনা হিসেবে বিবেচ্য। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যহীনতা এসব কাব্যে বিদ্যমান থাকলেও রসসৃষ্টির ধারা একরূপ ছিল না। বরং প্রতিভাশালী শিল্পীর হাতে পড়ে অনুবাদ ও অনুকৃতিমূলক এ সব রচনায় মৌলিক সৃষ্টির আস্বাদন লাভ সম্ভব হয়েছে। এ সবের মধ্যে অনবদ্য কাব্যরস সৃষ্টি করে কবিরা যথার্থ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

অনুবাদ ও মৌলিক রচনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমগ্র সৃষ্টিকে অনুবাদ ও মৌলিক—এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা চলে। অনুবাদ শাখার মধ্যে এক শ্রেণির সাহিত্য সংস্কৃত থেকে অনূদিত—যেমন রামায়ণ মহাভারত ভাগবত ইত্যাদি। মুসলমান কবি রচিত প্রণয়োপাখ্যান কাব্যগুলো ফারসি হিন্দি প্রভৃতি ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মুসলমান কবিগণের কেউ কেউ নিজস্ব ধর্মীয় সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সেগুলো আরবি ফারসি থেকে অনূদিত। এ সব কাব্য রচনাকালে কবিরা মূলের প্রতি যে গভীর আনুগত্য দেখিয়েছেন তা নয়, বরং তাঁরা মৌলিক রচনার বৈশিষ্ট্য এগুলোর মধ্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

অনুবাদ বা অনুকরণমূলক রচনায় বিষয়বস্তুর জন্য কবিরা পূর্ববর্তী কবিগণের নিকট ঋণী থাকেন। কিন্তু বক্তব্য উপস্থাপনায়, ভাষা ব্যবহারে, চরিত্রচিত্রণে এমনকি নতুন চরিত্র সৃষ্টি বা উপকাহিনি সংযোজনে অভিনবত্ব দেখিয়ে সে সব সাহিত্যসৃষ্টিকে মৌলিকতার কাছাকাছি নিয়ে যান।

মৌলিক রচনার নিদর্শনের মধ্যে বৈষ্ণবপদাবলি, জীবনী সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদির কথা উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবপদাবলি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত। ভক্তকবিগণ নিজেদের হৃদয়ের অনুভূতি এতে প্রকাশ করেছেন। জীবনী সাহিত্য শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য বিভিন্ন দেবদেবীর অলৌকিক লীলামাহাত্ম্য উপজীব্য করে রচিত। লোকসাহিত্যের মধ্যেও মৌলিকতার নিদর্শন মিলে। এ সব মৌলিক রচনার মধ্যে কবিরা বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বাঙালি জীবনের বিভিন্ন দিক এই ধরনের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালির সাহিত্যরস-পিপাসার যথার্থ পরিতৃপ্তি এই বিচিত্র মৌলিক রচনার মাধ্যমে সাধিত হয়েছে বলে এদের জনপ্রিয়তাও যথেষ্ট ছিল।

তবে এই শ্রেণির মৌলিক রচনার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষণীয় যে, এতে পুচ্ছগ্রাহিতা বা অনুকরণপ্রিয়তা সর্বত্র বিদ্যমান। কোন প্রকার অনুকরণ না করে সম্পূর্ণ নিজস্ব কল্পনার প্রকাশ এগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় না। অনুবাদজাতীয় কাব্যের মধ্যে মৌলিকতা আশা করা চলে না সত্য, কিন্তু সে সব ক্ষেত্রেও কবিরা একই কাব্যের অনুবাদে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদের বেলায় এ বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। বিভিন্ন কবি দীর্ঘদিন ধরে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত একই কাব্যের অনুবাদ করেছেন। এমন কি, মৌলিক রচনা বলে যে সব সাহিত্যসৃষ্টি চিহ্নিত তাতেও এমন অনুকরণপ্রিয়তা লক্ষণীয়। বৈষ্ণবপদাবলি অবশ্য মৌলিক রচনা, কিন্তু তাতে একই মূল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের রূপক অবলম্বনে সকল কবি ভক্তিপ্রণতচিত্তে একই ধরনের কবিতা রচনা করেছেন। তাঁদের স্বাধীন চিত্তবৃত্তির কোন প্রকাশ নেই বলে তা গীতিকবিতা হয়েও আধুনিক গীতিকবিতার মর্যাদা পায় নি। জীবনী সাহিত্যও কাহিনি ও চরিত্রগত দিক থেকে গতানুগতিক হয়ে পড়েছিল। দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিকতার পরিচয় দেওয়া অনেক কবির পক্ষেই সম্ভবপর হয় নি। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন শাখা এ ধরনের অনুকরণশীলতার বিশিষ্ট নিদর্শন। বিভিন্ন দেবদেবীর একই কাহিনি অবলম্বন করে অসংখ্য মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। কাহিনিগত দিক থেকে যেমন সেসব কাব্য গতানুগতিক, তেমনি চরিত্রসৃষ্টিতে এদের কোন বৈচিত্র্য নেই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিসম্ভারে এ ধরনের বিষয়গত পুনরাবৃত্তি এর বিকাশ রুদ্ধ ও বৈচিত্র্য ব্যাহত করেছে।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ হিন্দু-মুসলমানদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। উভয়ের ভাবসমৃদ্ধ হয়ে এই বিপুল সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। উভয় জাতির কবিরা নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে সাহিত্য সাধনা করেছেন। এমন কি কোন কোন ধারায় উভয়ের সম্মিলিত সাধনার চিহ্নও বিদ্যমান। বৈষ্ণব পদাবলি রচনার ক্ষেত্রে হিন্দু কবিগণের সঙ্গে কতিপয় মুসলিম পদকর্তা সার্থক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাই এ যুগের সাহিত্যকে শুধু হিন্দু সাহিত্য বা শুধু মুসলিম সাহিত্য নামে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক এই বলে মন্তব্য করেছেন যে, হিন্দুর বাংলা সাহিত্যে যেমন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মুসলিম প্রভাব পড়েছে, মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যে তেমনই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ হিন্দুপ্রভাব পড়েছে। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করার ফলে এ প্রভাব পড়েছে বলে তাঁর ধারণা। এদেশে মুসলিম শাসন প্রবর্তনের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রতিরোধের জন্য ধর্মসমন্বয় ও ঐক্যের বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। সাহিত্যসৃষ্টিতে তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

মধ্যযুগের কাব্যপ্রবাহ বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, এই সুদীর্ঘ সময়ে ধর্মীয় তথা দেবদেবীর কাহিনিকেই কাব্যের উপজীব্য করাতে দৈবশক্তির কাছে মানুষের পরাজয় স্বীকৃত হয়েছে। দেবতার জয়গানে মুখরিত কাব্যের অঙ্গনে মানুষের পদচারণা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এই যুগের কাব্যের স্বরূপ অনুধাবন করলে দেবতার পাশে মানুষের

গুরুত্বও অবহেলা করা চলে না। সর্বত্রই দেবকাহিনি বা ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং মানবজীবনের মহিমা বড় হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের কবিরা দেবতার গানে ব্যাপৃত থাকলেও চারপাশের মানবিক জীবনকে তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই মানুষের সুখদুঃখ আনন্দবেদনার পরিচয়, তৎকালীন সমাজ জীবনের আলেখ্য এবং সে আমলের ইতিহাসের তথ্য কাব্যে স্থান পেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তাৎপর্য রূপকের বাইরে মানবীয় প্রণয়কাহিনি হিসেবে বিবেচনা করা চলে। বৈষ্ণব পদাবলিতে বিশেষ ভাবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী পর্যায়ে নরনারীর জাগতিক প্রেমানুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর প্রাধান্যের অন্তরালে বিশেষত মনসামঙ্গল কাব্যে মানুষের পৌরুষ দেবতাকে ছাড়িয়ে গেছে। সমগ্র রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানেই মানব-মানবীর কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। মানুষের কথাই সেখানে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে। মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের ধারার অনুসারী হলেও তাঁর কাব্যে মানুষই বড় হয়ে উঠেছে। এ ভাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক বিষয় থেকে মানুষের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। দেবদেবী বা ধর্মের কাহিনি এই সময়কার কাব্যের উপজীব্য হলেও মানুষ গুরুত্বহীন হয়ে থাকে নি; বরং অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের জীবন ও তার মহিমা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেবতাকে ছাড়িয়ে গেছে। ফলে ধর্মীয় বিষয়ের রসহীন পরিসরেও কাব্যরসের আবেদন ম্লান হয়ে যায় নি।

মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ছিল প্রধানত গীতিনির্ভর। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রচনা মাত্রই সুরসংযোগে পঠিত হত। এর পর কোন বৈষ্ণবীয় রচনায় কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ চলে। গান বা আখ্যায়িকা যাই হোক না কেন শিল্পিত রচনা মাত্রই গাওয়া হত। দেবপূজায় দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনি গীত হওয়ার রীতি বহুদিনের। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধর্মনির্ভর হওয়ায় এই রীতি এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ব্রতগীত', 'মঙ্গল', 'পাঁচালী' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ সে দিক থেকে অর্থবহ। রাগ-রাগিণীর উল্লেখও এই মত সমর্থন করে। কাব্য প্রচারে গায়েনের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানব মনের ওপর সঙ্গীতের প্রভাব সম্পর্কে মধ্যযুগের কবিরা সচেতন ছিলেন। তাই ড. আহমদ শরীফ 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্য আসলে বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়, গানে গল্পে রসিয়ে বলা শাস্ত্রকথা মাত্র।'

মধ্যযুগের দীর্ঘ পরিসরে বাংলা ভাষা তার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য বাংলা ভাষাকে অনেক অবজ্ঞা-উপেক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। ব্রাহ্মণ্য সমাজ নৈতিক প্রতিরোধের দ্বারা বাংলা চর্চা ব্যাহত করার জন্য বিধান দিয়েছিল। হিন্দু সমাজের এই বিরূপতা আঠার শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। শাস্ত্রকথা বাংলায় লেখার প্রতিবাদে মুসলমান সমাজও সতের শতক পর্যন্ত মুখর ছিল। তখন দেবভাষা সংস্কৃত ও স্বর্গীয় ভাষা আরবি থেকে বাংলা ভাষায় শাস্ত্রানুবাদ পাপকর্ম বলে বিবেচিত হত। মুসলমান শাসনের সূত্রপাতের ফলে অবহেলিত বাংলা ভাষা মর্যাদা লাভ করে এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার সম্প্রসারণ ঘটে। বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রসার

ঘটলেও ধর্মীয় বিষয়ে বাংলার ব্যবহার বিলম্বিত হয়েছিল। আরবি ভাষা এদেশের জনগণ বোঝে না বলে ধর্মীয় বিষয় বাংলায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেও কবিরা দ্বিধান্বিত ছিলেন অনেক দিন।

সতের শতকে কবি মুত্তালিব লিখেছেন :

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ।
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ ॥
মুসলমানি শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুঁ।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ ॥

কবি আবদুল হাকিম সতের শতকে দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা ঘোষণা করেছিলেন :

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়াএ।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যাএ ॥

ভাষার প্রতি অবজ্ঞার জন্য মধ্যযুগের প্রথম দিকে অনুবাদ ও অনুকৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল। মৌলিক রচনায় তখন কেউ মনোনিবেশ করেন নি। মুসলমান শাসনে বাঙালিরা ইরানি ও হিন্দুস্থানি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন করেছে।

শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে মধ্যযুগের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। মধ্যযুগের প্রথম দিকে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সমন্বয়ে কাব্য রচিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে আরবি-ফারসি ও তুর্কি ভাষার সান্নিধ্যে এসে বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের আগমন ঘটতে থাকে। মধ্যযুগের প্রথম কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আটটি আরবি-ফারসি শব্দ স্থান পেয়েছিল। তের শতকের প্রথম থেকে আঠার শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের আধিপত্য বিরাজ করায় প্রচুর আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলায় এ ধরনের শব্দ সংখ্যা এখন আড়াই হাজার বলে ধারণা করা হয়। প্রথম তিন শতকে এ ধরনের শব্দ বেশি আসে নি। ষোল শতকের শেষভাগ থেকে, বিশেষ করে মোগল শাসনের সূত্রপাতের পর এ শ্রেণির শব্দ খুব বেশি বেড়ে যায়। আঠার শতকে বাংলা ভাষায় ফারসি প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। আধুনিক যুগে উনিশ শতকে ফারসির পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজি আইন আদালতে ও শাসনকাজে ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে ফারসির প্রভাব কমে যায়। তবে অনেক আরবি-ফারসি শব্দ তৎসম ও তদ্ভব শব্দকে বিতাড়িত করে বাংলা ভাষায় স্থায়ী হয়ে গেছে। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে পর্তুগিজ ও ইংরেজদের আগমনের ফলে বাংলা ভাষায় পর্তুগিজ ও ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে।

শব্দের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারের ফলে মধ্যযুগে তৎসম-তদ্ভব শব্দ বহুল ভাষারীতির পাশাপাশি আরবি ফারসি শব্দের বাহুল্য ব্যবহারযুক্ত ইসলামি ভাষারীতির প্রচলন হয়েছিল।

মধ্যযুগের সাহিত্যের খসড়া চিত্র

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পরিধি যেমন বিস্তৃত, তেমনি তার বিষয়বস্তুও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ড. আহমদ শরীফ মধ্যযুগের সাহিত্যের একটা খসড়াচিত্র তৈরি করে বিভিন্ন কবির যে উল্লেখ করেছেন তা থেকে মধ্যযুগের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্য সম্পর্কে নিম্নরূপ ধারণা করা যায় :

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য : নাথ ও সহজিয়া সাহিত্য

ষোল শতক : শেখ ফয়জুল্লাহ।

সতের শতক : ভবানীপ্রসাদ।

আঠার শতক : দুর্লভ মল্লিক, আবদুস শুকুর, শুকুর মুহম্মদ, বাউল গান।

ধর্মমঙ্গল

তের শতক : শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজা বিধান।

ষোল শতক : ময়ূর ভট্ট, আদি রূপরাম, মাণিকরাম, খেলারাম।

সতের শতক : মাণিকরাম দাস, শ্রীশ্যাম পণ্ডিত, রূপরাম, মাধবনাথ, রামদাস আদক, সীতারাম দাস।

আঠার শতক : ঘনরাম, রামচন্দ্র, প্রভুরাম, নরসিংহ বসু, হৃদয়রাম, রামকান্ত, শঙ্কর চক্রবর্তী, সহদেব চক্রবর্তী, ক্ষেত্রনাথ, নিধিরাম, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ, লক্ষ্মণ।

প্রণয়োপাখ্যান

পনের শতক : শাহ মুহম্মদ সগীর।

ষোল শতক : সাবিরিদ খান, দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ কবীর, দোনা গাজী।

সতের শতক : কাজী দৌলত, আলাওল, মাগন ঠাকুর, আকবর, পরাগল, মঙ্গলচাঁদ, নওয়াজিস খান, শরিফ শাহ, মরদন, আবদুল হাকিম।

আঠার শতক : মুহম্মদ মুকিম, মুহম্মদ আলী, বদিউদ্দীন, মুহম্মদ জীবন, নূর মুহম্মদ, শাকের মাহমুদ, সৈয়দ হামজা, গরীবুল্লাহ, আবদুর রাজ্জাক, দ্বিজ পশুপতি, সুশীল মিশ্র, বাণীরাম ধর, রামজী দাস, আলি রজা।

রামায়ণ

পনের শতক : কৃত্তিবাস।

ষোল শতক : মাধব কন্দলী, শঙ্কর দেব।

সতের শতক : চন্দ্রাবতী, নিত্যানন্দ (অদ্ভুতাচার্য), ভবানীনাথ, শ্রীলক্ষ্মণ।

আঠার শতক : রামানন্দ যতি, রামানন্দ ঘোষ, রামচন্দ্র, রামনারায়ণ, জগৎরাম, রামপ্রসাদ রায়, দয়ারাম, ফকিররাম, রামশঙ্কর, রাম হাজরা, সীতাসুত, কৃষ্ণদাস, রামগোবিন্দ, ভবানীশঙ্কর, শিবচন্দ্র, গঙ্গারাম, কল্যাণদেব, ষষ্ঠীবর, গুণরাজ খান, সুবুদ্ধিরাম, সর্বাণীনন্দন, দ্বিজ তুলসী, জগন্নাথ, মতিরাম।

মহাভারত ও ভাগবত বা কৃষ্ণমঙ্গল

চৌদ্দ শতক : বড়ু চণ্ডীদাস।

পনের শতক : মালাধর বসু।

ষোল শতক : কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, দ্বিজ গোবিন্দ, যশোরাজ খান, পরমানন্দ, মাধব সেন, মাধবাচার্য, রামচরণ, কবিশেখর রায়, দুঃখী শ্যামদাস, কৃষ্ণদাস, রামচন্দ্র খান, পীতাম্বর, রঘুনাথ, অনিরুদ্ধ, রাম সরস্বতী, ঘনশ্যাম দাস, সঞ্জয়।

সতের শতক : শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, ভবানন্দ, পরশুরাম, ঘনশ্যাম, যশশ্চন্দ্র, কাশীরাম দাস, নন্দরাম দাস, বিশারদ, নিত্যানন্দ ঘোষ, কৃষ্ণানন্দ বসু, রামনারায়ণ, হরিদাস, চন্দন দাস, রামেশ্বর নন্দী, অনন্তমিশ্র, গঙ্গাদাস সেন, দ্বিজ রামচন্দ্র।

আঠার শতক : বলরাম দাস, রমানাথ, গোপাল সিংহদেব, শঙ্কর চক্রবর্তী, দ্বিজ রামেশ্বর, দ্বিজ মাধবচন্দ্র, সনাতন বিদ্যাবাগীশ।

মুসলিম ধর্মসাহিত্য

ষোল শতক : শেখ পরান, নেয়াজ।

সতের শতক : আশরফ, মুত্তালিব, আলাওল, নসরুল্লাহ খোন্দকার, আবদুল হাকিম।

আঠার শতক : আফজল আলি, মুহম্মদ ফসিহ্, আবদুল্লাহ্, কাজী বদিউদ্দীন, মুহম্মদ আলী, নাসিরুদ্দীন, আলি রজা, মুহম্মদ মুকিম, বালক ফকির, সোলেমান, আইনুদ্দীন, সৈয়দ নূরুদ্দীন, আবদুল করীম খোন্দকার।

বৈষ্ণব পদাবলি ও শাক্ত পদাবলি

চৌদ্দ শতক : বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস।

পনের শতক : যশোরাজ খান।

ষোল শতক : চাঁদ কাজী, বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, রামানন্দ বসু, বৃন্দাবন দাস, নরহরি দাস, বাসুদেব, মাধব দাস, বংশীবদন, লোচনদাস, অনন্ত দাস, যদুনন্দন, আফজল, সৈয়দ সুলতান, শেখ কবির, ফয়জুল্লাহ, মুরারি গুপ্ত, সৈয়দ মুর্তজা, মুকুন্দ, ফতেহ, পরমানন্দ, পুরুষোত্তম, হরহরি সরকার, চণ্ডীদাস।

সতের শতক : নরোত্তম, গোবিন্দদাস কবিরাজ, বিদ্যাপতি, গোপালদাস, ঘনশ্যাম দাস, সালেহ বেগ, চম্পতি, জশদানন্দ, নাসির মাহমুদ, সৈয়দ আইনুদ্দীন,গয়াস খান, আলাওল, ভিকন, আকবর, দীন চণ্ডীদাস।

আঠার শতক : প্রেমদাস, গোকুলানন্দ, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, দ্বিজ রঘুনাথ, কমলাকান্ত, রামতনু, পাগল শঙ্কর, গোপীবল্লভ, ভবানন্দ, রামশঙ্কর, চান্দ রায়, ফাজিল, নাসির মুহম্মদ, হরিদাস, হীরামণি, আলি রজা, মির্জা কাঙালী, শিবরাম, চম্পাগাজী, করম আলি, মনোহর, পীর মুহম্মদ। শাক্ত পদাবলি : কমলাকান্ত, নন্দকুমার, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, আলি রজা।

জীবনী সাহিত্য

ষোল শতক : গোবিন্দদাস, চূড়ামণিদাস, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হরিচরণ দাস, ঈশান নাগর, লোকনাথ দাস, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ।

সতের শতক : গোপীজন বল্লভ, তিলকরাম দাস, উদ্ধব দাস, শেখ চান্দ, আবদুন নবী, আবদুল হাকিম।

আঠার শতক : প্রেমদাস, শচীনন্দন, হৃদানন্দ, রামরত্ন, পুরন্দর, নিত্যানন্দ, রামশরণ,জগন্নাথ, লবনী দাস, কৃষ্ণচরণ দাস, নরহরি চক্রবর্তী, উজির আলি, আজমতুল্লাহ, গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, নুরুল্লাহ, শেখ মনোহর।

মনসামঙ্গল

পনের শতক : কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই।

ষোল শতক : নারায়ণ দেব।

সতের শতক : দ্বিজ বংশীবদন, ষষ্ঠীবর সেন, বিষ্ণুপাল, কালিদাস, ক্ষেমানন্দ, বসিল মিশ্র, কবিবল্লভ, কবিচন্দ্র, সীতারাম দাস, ষষ্ঠীবর দত্ত, গঙ্গাদাস সেন।

আঠার শতক : জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মিত্র, তন্ত্রবিভূতি, রাজসিংহ, রামজীবন, দ্বিজ বাণেশ্বর, জগন্নাথ, দ্বিজ রসিক, জানকীনাথ।

চণ্ডীমঙ্গল

ষোল শতক : মাণিক দত্ত, বলরাম, দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম।

সতের শতক : হরিরাম, দ্বিজরাম দেব।

আঠার শতক : মুক্তারাম সেন, লালা জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশঙ্কর দাস, ভারতচন্দ্র রায়, অকিঞ্চন চক্রবর্তী।

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর

ষোল শতক : দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, সাবিরিদ খান (সত্যপীর পাঁচালী)।

সতের শতক : বলরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণরাম দাস, প্রাণরাম, গোবিন্দ দাস।

আঠার শতক : রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায়, দ্বিজ রাধাকান্ত, মধুসূদন চক্রবর্তী, মদন দত্ত, নিধিরাম আচার্য।

শিবায়ন

সতের শতক : রামকৃষ্ণ রায়, শঙ্কর কবিচন্দ্র, দ্বিজ রতিদেব, রামরাজা।

আঠার শতক : বিনয় লক্ষ্মণ (হরমঙ্গল), রামেশ্বর ভট্টাচার্য, দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজ মণিরাম।

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য

ষোল শতক : মাধবাচার্য (গঙ্গামঙ্গল)।

সতের শতক : বলরাম, দ্বিজ হরিদেব (শীতলামঙ্গল), কৃষ্ণরামদাস, মুকুন্দ (বাসুলীমঙ্গল)।

আঠার শতক : দ্বিজ নরোত্তম (লক্ষ্মীমঙ্গল), (দুর্গামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, শীতলা, শনিমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, কপিলামঙ্গল), প্রাণবল্লভ, শঙ্কর নিত্যানন্দ, রুদ্ররাম, রামজীবন, গৌরাঙ্গ, জয়রাম, কমলাকান্ত।

লৌকিক দেবতা ও পাঁচালী

ষোল শতক : ফয়জুল্লাহ, কঙ্ক, মাধবাচার্য (রায়মঙ্গল)।

সতের শতক : কৃষ্ণরাম দাস।

আঠার শতক : ভারতচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, ঘনরাম, রামেশ্বর, ফকিররাম, বিকাশ চট্টোপাধ্যায়, রামশঙ্কর, কৃষ্ণকান্ত, অযোধ্যারাম, জনার্দন, আরিফ, গরীবুল্লাহ, বিদ্যাপতি, লালা জয়নারায়ণ, শিবনারায়ণ।

সুফী সাহিত্য

ষোল শতক : সৈয়দ সুলতান, হাজী মুহম্মদ, ফয়জুল্লাহ, নেয়াজ, 'যোগ কলন্দর'।

সতের শতক : শেখ চাঁদ, মীর মুহম্মদ শফী, আবদুল হাকিম, শেখ জাহিদ।

আঠার শতক : শেখ মনসুর, আলি রজা, হোসেন আলি, শেখ জেবু, বালক ফকির।

লোকসাহিত্য

তের শতক : রূপকথা, কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা, শীতবসন্ত।

চৌদ্দ শতক ও পনের শতক : রামপাঁচালী, ভারত পাঁচালী, লৌকিক দেবতার পাঁচালী, রাধাকৃষ্ণ ধামালী, পালগীতি, নাথগীতিকা।

ষোল শতক ও সতের শতক : ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, নাথগীতিকা, পালগীতি।

আঠার শতক : ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, আদ্যের গম্ভীরা, নাথগীতিকা, ঝুমুর, ঘাটু, বাউল, কবিগান, সিরিয়ার যুদ্ধ, পলাশীর যুদ্ধ, মীর কাসিমের পতন কাহিনি ও ছড়া গান।

জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য

পনের শতক : জৈনুদ্দিন (রসুলবিজয়)।

ষোল শতক : দৌলত উজির বাহরাম খান, সাবিরিদ খান, সৈয়দ সুলতান।

সতের শতক : মুহম্মদ খান, জাফর, আকিল, নসরুল্লাহ খোন্দকার।

আঠার শতক : গরীবুল্লাহ, ইয়াকুব, হায়াৎ মামুদ, আলী মুহম্মদ, আবদুল হামিদ, জিন্নত আলী।

সওয়াল সাহিত্য

সতের শতক : আকিল, আবদুল হাকিম, নসরুল্লাহ খোন্দকার, মুহম্মদ খাঁ (সত্যকলি বিবাদ সংবাদ)।

আঠার শতক : সুলতান জমজমার পুঁথি, আলি রজা, শেখ মনসুর, আকিল, সেরবাজ চৌধুরী, শেখ সাদী, এতিম সালেক, হায়াৎ মামুদ, মুহম্মদ দানিশ, সৈয়দ নূরুদ্দীন, আবদুল করীম খোন্দকার, মুজাফফর, মুহম্মদ দানেশ।

রাগতালনামা

ষোল শতক : ফয়জুল্লাহ।

সতের শতক : আলাওল।

আঠার শতক : ফাজিল, নাসির মুহম্মদ, আলি রজা, বকশ আলি, কাজী দানিশ, মুজাফফর, নাসির মাহমুদ, চামারু, দ্বিজ রামতনু, দ্বিজ ভবানন্দ, দ্বিজ রঘুনাথ, দ্বিজ রামগোপাল, দ্বিজ পঞ্চানন, চম্পাগাজী।

বিবিধ রচনা

ষোল শতক : বৈষ্ণব শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, মুজাম্মিল (নীতিশাস্ত্র বার্তা)।

সতের শতক : বৈষ্ণব শাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

আঠার শতক : বৈষ্ণব শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, ফালনামা, জ্যোতিষ, দারুটোনার পুঁথি, ইসাপুরের ইতিহাস, শমশের গাজী নামা, মহারাষ্ট্র পুরাণ, ভ্রাতৃবিলাপ-রহিমুন্নিসা।

কবি ও কাব্যের কালনির্ণয়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিরা হেঁয়ালি ভাষায় কাব্যরচনার কাল বা নিজের জন্মকাল নির্দেশ করতেন। ছাপাখানার উদ্ভবের পর গ্রন্থের প্রকাশকাল মুদ্রিত হয়। মধ্যযুগের কাব্যে কবিরা এক ধরনের সঙ্কেত ব্যবহার করে কালের উল্লেখ করেছেন। যেমন :

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান।

এখানে সিন্ধু-৭, ইন্দু (চন্দ্র)-১, বেদ-৪, মহী-১।

সংস্কৃত নিয়মে 'অঙ্কস্য বামা গতি'—বাম দিক থেকে গণনা করতে হবে। তাহলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৭১৪১ এবং তা বাম দিক থেকে গণনা করলে হবে—১৪১৭ শকাব্দ।

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র সকের বৎসর ॥

বসু-৮, শূন্য-০, ঋতু-৬, চন্দ্র-১ = ৮০৬১

সংখ্যাকে বাঁ দিক থেকে গণনা করলে দাঁড়ায়—১৬০৮ শকাব্দ।

ড. ওয়াকিল আহমদ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থে কালনির্ণায়ক এ ধরনের শব্দ ও সংখ্যার একটি তালিকা দিয়েছেন। সে অনুসারে কতিপয় শব্দ ও তার সংখ্যাজ্ঞাপক অর্থ উল্লেখ করা হল : অঙ্ক-৯, অভ্র-০, ইন্দু-১, ঋতু-৬, ঋষি-৭, কর-২, গ্রহ-৯, চন্দ্র-১, ধরা-১, ধাতা-১, নেত্র-৩, নিধি-৯, পক্ষ-২, ব্রহ্মা-১, বসু-৮, বাণ-৫, বায়ু-৫, বিন্দু-০, বেদ-৪, ভুবন-৩, মুনি-৭, যুগ-৪, রস-৬/৯, শর-৫, শশাঙ্ক-১, শশী-১, শূন্য-০, সমুদ্র-৭, সিন্ধু-৪/৭।

মধ্যযুগের কাল নির্দেশের জন্য যে সব অব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হল : শকাব্দ, বিক্রমাব্দ, গুপ্তাব্দ, লক্ষ্মণাব্দ, মঘী, হিজরি, বঙ্গাব্দ, সাল ইত্যাদি।

বর্তমানে সালের সঙ্গে তুলনা করে অন্যান্য অব্দের সময় সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। সালের সঙ্গে অন্যান্য অব্দের হিসাবটি এ রকম :

সালের সঙ্গে বঙ্গাব্দের সময়ের পার্থক্য ৫৯৩ বছর। তাই বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলে সাল পাওয়া যাবে। যেমন—বঙ্গাব্দ ১৪১৬ + ৫৯৩ = ২০০৯ সাল। অথবা সাল থেকে ৫৯৩ বাদ দিলে বঙ্গাব্দ পাওয়া যাবে।

সাল থেকে শকাব্দ ৭৮ বছর কম। সাল থেকে মঘী সন ৯৬৩ বছর কম।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। সামগ্রিক ভাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মেজাজ ও চারিত্র্য বিচারে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলির বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখ।

২। অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ ছাড়াও মধ্যযুগের সাহিত্যে মৌলিক রচনার নিদর্শন বর্তমান। এই সাহিত্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক আলোচনা লিপিবদ্ধ কর।

৩। 'অনুবাদের বাহিরেও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মৌলিক রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আমাদের কবিরা যে বাংলার ঘরের কথাকে ঘরের ভাষায় প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সাহিত্যরস পিপাসার তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, এমন প্রচুর নিদর্শন আছে।'—আলোচনা কর।

৪। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে 'হিন্দু সাহিত্য' বা 'মুসলিম সাহিত্য' নামে চিহ্নিত করা যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা আলোচনা কর।

৫। মিলিত হিন্দু-মুসলমানদের ভাবসমৃদ্ধ সাহিত্য আঠার শতকের বাংলা সাহিত্য।—আলোচনা কর।

৬। 'মধ্যযুগের হিন্দুর রচনা মাত্রই ছিল ধর্মনির্ভর। তবু তার মধ্যে কাব্যরস ও জীবনবোধের অভাব ছিল না।'—আলোচনা কর।

৭। 'মধ্যযুগের সাহিত্যের বড় দোষ পুনঃগ্রাহিতা—কি অনুবাদে কি মৌলিক রচনায় এই বিষয়গত পুনরাবৃত্তি এর বিকাশ রুদ্ধ ও বৈচিত্র্য ব্যাহত করেছে।'—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ লক্ষণ বর্ণনাসূত্রে এই মন্তব্য যথার্থ কিনা বিচার কর।

৮। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনের জন্য মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে কিনা তাহা যুক্তি সহকারে আলোচনা কর।

৯। মধ্যযুগের কাব্যগুলিকে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ধারার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

১০। মধ্যযুগের সাহিত্যের সবটাই অনুবাদ নয়, মৌলিক রচনাও রয়েছে এবং তার সবটা পুনরাবৃত্তিমূলকও নয়।'—এই মন্তব্যের আলোকে মধ্যযুগের মৌলিক রচনাগুলির পরিচয় দাও।

১১। 'মধ্যযুগেও বাংলা রচনার মূলে ছিল ধর্মীয় কোন্দল ও প্রশাসনিক প্রয়োজন।'—এ সিদ্ধান্ত যথার্থ কিনা পরীক্ষা কর।

১২। 'মধ্যযুগের সমস্ত দীর্ঘ কাব্য একই ছন্দ, একই শব্দবিন্যাস ও একই গতি অবলম্বন করিয়া রূপ পাইয়াছে, পার্থক্য সূচিত হইয়াছে শুধুমাত্র বিষয়ের তারতম্যে।' মধ্যযুগের সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণগুলি আলোচনা করিয়া এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগের রাজনৈতিক পটভূমি : মুসলিম শাসন ও পৃষ্ঠপোষকতা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা সাহিত্যসৃষ্টির বিকাশসাধন ও উৎকর্ষবিধানে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। এদেশে মুসলিম শাসন জনজীবনে শক্তি সংহতি ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হয়েছিল। কারণ অধিকাংশ বিদেশি শাসক নিজের দেশ হিসেবেই বাংলাদেশকে বিবেচনা করেছেন। জনগণের কাছে যাওয়ার জন্য দেশীয় ভাষার মর্যাদা প্রদান করে, কবিগণের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে মুসলমান শাসকেরা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। দীর্ঘ সময়ের অনুশীলনের ফলে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে বৈচিত্র্য, এসেছে উৎকর্ষ, সেই সঙ্গে খুলে দিয়েছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ১২০৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম মুসলমান শাসনের সূত্রপাত এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ে তার অবসান। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সবটুকুই মুসলিম শাসনামলের অন্তর্গত। তাই এ সময়ের সাহিত্যকে মুসলিম শাসনামলের বাংলা সাহিত্য নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে বাংলা সাহিত্যের যা কিছু বিকাশ ও উৎকর্ষ তার সকলের সঙ্গেই মুসলিম শাসন বিজড়িত। এই সম্পর্ক নির্ণীত হতে পারে দুদিক থেকে—একদিকে মুসলমান কবিগণ বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টিসম্ভারে মধ্যযুগের সাহিত্য-ইতিহাস সমৃদ্ধ করেছেন, অপরদিকে মুসলিম শাসকগণ হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে কবিগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক নদীয়া অধিকারের মাধ্যমে। সমগ্র বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেন বখতিয়ার খিলজির অতর্কিত আক্রমণে নদীয়া ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। এসময় থেকে ধীরে ধীরে এক শ বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ মুসলমান শাসনাধীনে আসে। সমগ্র মুসলিম শাসনকালকে প্রধানত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা চলে :

১. খিলজিদের অধীনে বাংলা : ১২০৪—১২২৭ সাল।
২. দিল্লির অধীনে বাংলা : ১২২৭—১৩৪১ সাল।
৩. ইলিয়াসশাহি বংশের প্রথম ধারা : ১৩৪২—১৪১৩ সাল।
৪. গণেশ-জালালুদ্দিনের অধীনে বাংলা : ১৪১৪—১৪৪১ সাল।
৫. ইলিয়াসশাহি বংশের পরবর্তী ধারা : ১৪৪২—১৪৮৭ সাল।
৬. হাবশি শাসনে বাংলা : ১৪৮৭—১৪৯৩ সাল।
৭. হুসেনশাহি বংশ : ১৪৯৩—১৫৩৮ সাল।

৮. পাঠান আমলে বাংলা : শেরশাহ ও সুর বংশ : ১৫৩৮—১৫৬৪ সাল।
৯. কররানী বংশ : ১৫৬৫—১৫৭৬ সাল।
১০. মোগল শাসনে বাংলা : ১৫৭৬—১৭৫৭ সাল।

বাংলাদেশে খিলজি বংশের শাসন প্রবর্তিত হলেও তাঁদের মধ্যে গোলযোগের অন্ত ছিল না। সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ (১২১৩-২৭) দিল্লির অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীন নরপতি হিসেবে বার বৎসর বাংলার শাসন পরিচালনা করে তিনি বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতানের মর্যাদা পান। খিলজিদের অন্তর্বিরোধের ফলে দিল্লির সুলতানেরা বাংলাদেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁরা দিল্লি থেকে বাংলায় শাসক পাঠাতেন। তাঁদের কেউ কেউ দিল্লির প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। রাজ্য সম্প্রসারণ ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দিকেই শাসকদের তখন লক্ষ ছিল। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি সাধনের তেমন কোন নিদর্শন এ সময়ে লক্ষ করা যায় না। ড. মুহম্মদ এনামুল হক এ সময়কে তুর্কি যুগ বলে অভিহিত করে ১২০০ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত এর পরিধি নির্ধারণ করেছেন। তখন প্রধানত ভাষাগঠনের যুগ ছিল বলে মনে করা হয়। এ সময়ের কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

ইলিয়াস শাহি বংশের প্রতিষ্ঠাতা শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ সালে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। প্রথম পর্যায়ে (১৩৪২-১৪১৩) একাত্তর বৎসর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৪৪২-১৪৮৭) পঁয়তাল্লিশ বৎসরের দীর্ঘ শাসনকালে এই বংশের শাসক দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। ইলিয়াস শাহ বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। ১৪১৪ থেকে ১৪৪১ সাল পর্যন্ত সময়ে রাজা গণেশ ও তাঁর পুত্র যদু বা জালালুদ্দিন সাময়িক ভাবে বাংলার সিংহাসন ভোগ করেন। পরে রাজা গণেশের বংশধরদের হাত থেকে বাংলার শাসনভার ইলিয়াস শাহি বংশের হাতে চলে যায়। নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ, রুকনউদ্দিন বরবক শাহ, শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ প্রমুখেরা ছিলেন এই বংশের উল্লেখযোগ্য শাসক।

ইলিয়াস শাহি শাসনের সময়েই হাবশি খোজারা প্রতাপান্বিত হয়ে ওঠেন এবং কিছু দিনের জন্য বাংলার সিংহাসন দখল করেন। তাঁদের শাসনামলে দেশে অত্যাচার চলে। পরবর্তী পর্যায়ে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ হুসেন শাহি বংশের (১৪৯৩-১৫৩৮) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ও তাঁর পুত্র নসরত শাহ বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়ের সংযোজন করেছিলেন। ১৫৩৮ সালে শের শাহ গৌড় অধিকার করলে বাংলায় পাঠানদের শাসনের সূত্রপাত হয়। শের শাহ দিল্লি থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সুর বংশের পর বাংলার শাসনভার তাজ খান কররানীর হাতে যায়। কররানী বংশও বেশি দিন বাংলার শাসন চালাতে পারে নি। এই বংশের দাউদ কররানী মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মুনিম খানের হাতে পরাজিত হলে ১৫৭৬ সাল থেকে বাংলার শাসন মোগলদের হাতে চলে যায়। এ আমলে সুবাদারদের হাতে শাসনভার ন্যস্ত ছিল। তখন কোন কোন জমিদার মোগল অধীনতা অস্বীকার করেন।

মোগল শাসনের শেষ দিকে দিল্লির দুর্বলতার সুযোগে দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খাঁ এক প্রকার স্বাধীন ভাবেই বাংলাদেশ শাসন করেন। তাই তাঁকে বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব

বলা চলে। ১৭২৭ সালে তিনি মারা যান। পরে ১৭৪০ সালে নবাব আলিবর্দী খাঁ বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিপতি হন। তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হলে এদেশে মুসলমান শাসনের সমাপ্তি ঘটে এবং ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়।

১৩৪২ সালে ইলিয়াস শাহি বংশের শাসন শুরু হলে বাংলাদেশের এক নতুন যুগের সূচনা হয়। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার রাজধানী গৌড়ে যে শাসনের সূত্রপাত করেন তা বাংলা সাহিত্যের সফল বিকাশের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিল। বাংলা সাহিত্যের এই যুগকে 'সুলতানি যুগ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর পরিধি ১৩৫১ থেকে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ে গৌড়ীয় শাহি দরবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাংস্কৃতিক স্নায়ুকেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে। গৌড়কে কেন্দ্র করে এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের গুরুত্ব বিবেচনায় ড. দীনেশচন্দ্র সেন এই আমলকে 'গৌড়ীয় যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, 'গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহই বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রথম কারণ। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।' বাংলাদেশে মুসলমানেরা যেখান থেকেই আগমন করেন না কেন তাঁরা সহজে মনেপ্রাণে বাঙালি হয়ে পড়েছিলেন। ফলে অবহেলিত বাংলা ভাষা তাঁদের সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হয়। মুসলমানদের ধর্মের উদারতা, সহনশীল মনোভাব ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ হিন্দুজনগণকে আকৃষ্ট করে এবং উভয় জাতির মধ্যে নিবিড় মৈত্রী স্থাপিত হয়। ড. আহমদ শরীফ 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'ইসলাম নবদীক্ষিতদের বৈষয়িক জীবনে ভাগ্য পরিবর্তনের তেমন সহায়ক না হলেও তাদের দিয়েছিল মানসমুক্তি ও সামাজিক স্বাধীনতা, জাগিয়েছিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মমর্যাদার চেতনা, এনেছিল ঘরে-বাইরে অঘৃণার ও নিরাপত্তার স্বস্তি।' ইলিয়াস শাহি বংশের শাসকগণের দ্বারা বাংলা ভাষা রাজদরবারে সমাদৃত হয় এবং তাঁরা বাংলা সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষকতাও দান করেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাই মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা সাহিত্য ও চারুকলার পরিপোষক আবহাওয়া সৃষ্টিতে একটির পর একটি করিয়া মুসলিম সুলতানদের নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব প্রবল অনুপ্রেরণা যোগাইতে থাকে।'

সুলতানি আমলে বাংলাদেশে ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটাতে এদেশের সমাজের আমূল পরিবর্তন হয়। ড. আবদুল করিম লিখেছেন, 'হঠাৎ দেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। সংস্কৃত ভাষা তাহার পূর্ব মর্যাদা হারাইয়া ফেলে এবং ফারসি ভাষা সরকারি ভাষায় পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পূর্ব মর্যাদাও লোপ পায়। মুসলমান শাসকদের নিকট ব্রাহ্মণ-শূদ্রে কোন পার্থক্য ছিল না, তাহাদের দৃষ্টিতে সকলেই হিন্দু এবং সকলেই বিজাতি। সংস্কৃতের পরিবর্তে ফারসি ভাষা শিখিলেই রাজ-সরকারে চাকুরি পাওয়া যায়। অন্যদিকে নির্যাতিত বৌদ্ধ ও শূদ্ররা মুসলমান সুফীসাধকের চরিত্রে এবং মুসলমানদের বর্ণবৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থায় মুগ্ধ হইয়া ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়।' যখন হিন্দু সমাজের গোঁড়াপন্থীদের ধর্ম প্রবাহে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে বাংলা ভাষায় শাস্ত্রজ্ঞান বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যখন শাস্ত্রানুবাদকারীদের গালি দিয়ে 'কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে, আর বামুন ঘেঁষে—এই তিন সর্বনেশে' বলা হত, তখন মুসলমান শাসকদের সান্নিধ্যের প্রভাবেই শাস্ত্রানুবাদ ও

অন্যবিধ কাব্যচর্চা বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে নি। ইসলামের প্রভাব রোধ করার জন্য ব্রাহ্মণেরা তাদের বিধিনিষেধ শিথিল করতে বাধ্য হয়; ফলে গোটা হিন্দু সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের সূচনা হয়। সুতরাং অন্য কারণ বাদ দিলেও শুধু মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই বাংলা সাহিত্য বিকাশের পথ সুগম হয়।

ইসলামের সান্নিধ্যে এসে এ সময়ে হিন্দুমানসের মুক্তি সাধিত হয়েছিল। বৈষ্ণব মতবাদের প্রবর্তনও এ যুগে ঘটে। তখন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে উন্নত ফারসি সাহিত্যের সংযোগ সাধিত হয়। এতে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন প্রাণস্পন্দন জেগে ওঠে। ফলে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এ সময়ে অনুবাদ শাখা, বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, প্রণয়কাব্য ইত্যাদি বিচিত্র জাতের সাহিত্যসৃষ্টির প্রাচুর্য দেখা যায়।

স্বাধীন সুলতানগণের শাসনের দীর্ঘ সময়ে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন। প্রথমে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শাহ মুহম্মদ সগীরই প্রথম কবি যিনি গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে কাব্য রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের জন্য গৌড় দরবারে স্বীকৃতি অর্জনের কৃতিত্ব রামায়ণের অনুবাদক কবি কৃত্তিবাসের। গৌড়েশ্বর তাঁকে পুষ্পমাল্য দানে সম্মানিত করেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের রচয়িতা কবি মালাধর বসু সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহের কাছ থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন। তাছাড়া সুলতান ইউসুফ শাহের কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে কবি জৈনুদ্দিন 'রসুলবিজয়' কাব্য রচনা করেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ১৪৯৩ সালে গৌড়ের সিংহাসনে বসলে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, 'বাংলার ইতিহাসে হুসেনী বংশের পঁয়তাল্লিশ বর্ষব্যাপী রাজত্বকাল (১৪৯৩-১৫৩৮) রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার জন্য, অধিকন্তু সুখশান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য চিরবিখ্যাত। এই বংশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল।' 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কবি বিজয়গুপ্ত এবং 'মনসাবিজয়' কাব্যের কবি বিপ্রদাস পিপিলাই হুসেন শাহের প্রশংসা করেছেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর হুসেন শাহকে কৃষ্ণের অবতার বলেছেন। বিজয়গুপ্তের কথায়, 'হুসেন শাহ নৃপতি তিলক।' যশোরাজ খানের মতে 'সাহ হুসন জগতভূষণ।' কবীন্দ্র পরমেশ্বরের ভাষায় :

নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈব যেন কৃষ্ণ অবতার ॥

কবি যশোরাজ খান ব্রজবুলিতে বৈষ্ণবপদ রচনা করে হুসেন শাহের যে ভাবে গুণকীর্তন করেছেন তাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি হুসেন শাহের সীমাহীন প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর কর্তৃক 'মহাভারত পাঁচালী' রচিত হয়। এই কাব্য 'পরাগলী মহাভারত' নামে

খ্যাত। হুসেন শাহের সুযোগ্য পুত্র নাসিরুদ্দিন নসরত শাহ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। কবিরঞ্জন উপাধিধারী বিদ্যাপতি ও শেখ কবির নসরত শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। নসরত শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ কবি শ্রীধরকে বিদ্যাসুন্দর কাব্যরচনার আদেশ দেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবি আফজাল আলি কর্তৃক কিছু বৈষ্ণবপদ রচিত হয়েছিল। গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত' এবং লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে কাব্য রচনা করেন।

গৌড়ের সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতার আনুকূল্যে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির প্রমাণ মিলবে তখনকার কবিদের রচিত বিভিন্ন রাজপ্রশস্তিতে। ড. ওয়াকিল আহমদ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থে এর একটি তালিকা দিয়েছেন :

গৌড়েশ্বর	কবি	কাব্য
গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০)	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ-জোলেখা
জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ (১৪১৮-৩১)	কৃত্তিবাস	রামায়ণ
রুকনউদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৪)	মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণবিজয়
শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮১)	জৈনুদ্দিন	রসুলবিজয়
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)	বিজয় গুপ্ত	মনসামঙ্গল
	বিপ্রদাস	মনসাবিজয়
	যশোরাজ খান	বৈষ্ণবপদ
নাসিরুদ্দিন নসরত শাহ (১৫১৯-৩১)	বিদ্যাপতি	বৈষ্ণবপদ
	শেখ কবির	বৈষ্ণবপদ
আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৫৩২-৩৩)	আফজাল আলি	বৈষ্ণবপদ
	শ্রীধর	বিদ্যাসুন্দর

মুসলমান শাসকগণের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিমুখর হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের হিন্দু মুসলিম সব কবিই তাঁদের পৃষ্ঠপোষকগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে কৃপণতার পরিচয় দেন নি। মধ্যযুগের কবিগণের পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি বহু কৃতজ্ঞতা প্রকাশক উক্তি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

* মনুষ্যের মৈদ্ধে জেহ্ন ধর্ম অবতার।
মহা নরপতি গ্যেছ পিরথিমীর সার ॥

* পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বরে পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥

* গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান ॥

এ ধরনের অসংখ্য প্রশস্তি বাক্য মধ্যযুগের কাব্যে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা দানের মাধ্যমে মধ্যযুগে মুসলমান শাসকগণ যে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন তার স্বীকৃতি তৎকালীন কবিগণ প্রদান করে গেছেন। মুসলমান শাসন সে আমলে সাহিত্যসৃষ্টির যে বিশেষ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল

সে সম্পর্কে ড. দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা দেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল, এ যুগে সেই শ্রী শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। এই পাঠান-প্রাধান্য যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল।' ড. ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন, 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশে গৌড় রাজশক্তির একটা নীরব হাতছানি ছিল।...তাঁরা বাংলা ভাষার চর্চার প্রতিকূলাচরণ করেন নি। কৃত্তিবাস, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, শাহ মুহম্মদ সগীরকে অনুবাদ কার্যে নির্দেশ দেওয়ার পেছনে বাংলা ভাষার চর্চায় সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। মালাধর বসুকে উপাধিতে ভূষিত করে বাংলা ভাষার গৌরব বর্ধন করেন।...ধর্মের বাণী স্থানীয় ভাষায় চর্চা করা নিষিদ্ধ—হিন্দু মুসলমান জনগণের এরূপ অন্ধমুখোশ খুলে দেওয়া হয়। বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে গৌড়রাজের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।' সুলতানগণের সাহিত্যানুরাগী মনোভাবের ফলে তখন বাংলা সাহিত্যের বিকাশের অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করেও অনেক কবি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। মুসলমান শাসকগণের উদার ও সহনশীল মনোভাবের জন্য হিন্দু কবিগণ নানা বিষয়ে কাব্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৫৩৯ থেকে ১৫৬৪ সাল পর্যন্ত শের শাহ ও তাঁর বংশের অন্যান্য শাসকের পঁচিশ বৎসর শাসনকালেও বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট বিস্তার সাধিত হয়। এ সময়ে অনুবাদ, জীবনী সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি ইত্যাদি সাহিত্যের অনেক নিদর্শন সৃষ্টি হয়েছিল। সুলতানি আমলের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, 'এই যুগে হিন্দুর বাংলা সাহিত্যে যেমন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মুসলিম প্রভাব পড়িয়াছে, মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যে তেমনি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ হিন্দু প্রভাব পড়িয়াছে।' ১২০৪ থেকে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত এই পৌনে চার শ বছর গৌড়ের মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিজস্ব মূর্তিতে যেভাবে বিকশিত হয়েছিল তার জন্য এ সময়টুকুকে 'গৌড়যুগ' বলে অভিহিত করে বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে। গৌড়, গৌড়েশ্বর বা গৌড় রাজদরবার বাদ দিয়ে এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা মোটেই সম্ভব ছিল না।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষ পর্যায়কে 'মোগল যুগ' (১৫৭৬-১৭৫৭) বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলার স্বাধীনতার অবসান এবং মোগল সাম্রাজ্যভুক্তি বাঙালির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর প্রথম পঞ্চাশ বৎসর সময়ে পূর্বের সুলতানি যুগেরই অনুসরণ চলেছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, 'প্রাক-ইংরেজ যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি ফিরে তাকালে দেখা যায় মোগলাই যুগই বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।' কারণ এই আমলে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়েছিল। এ সময়ে গৌড়ের প্রাধান্য কমে যায়। বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও আরাকান রাজ্যে বাংলা সাহিত্যচর্চার বিশেষ সুযোগ ঘটে। আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান কবিগণ প্রণয়কাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেন। এ সময়ে ইসলামি সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ ঘটে। মোগল যুগের শেষ পর্যায়ে পর্তুগিজদের সংস্পর্শে আসাতে

বাংলা সাহিত্যে পর্তুগিজ প্রভাব পড়ে। মোগল যুগের অবসানে এদেশে ইংরেজ অধিকারের সূত্রপাত এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সৃষ্টি হয়।

ড. আবদুল করিম 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'মুসলমান আমলে বাংলা ভাষা সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে এবং এই আমলেই বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। প্রাক-মুসলমান আমলে সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা বলিয়া গণ্য হইত এবং দেবভাষায় অব্রাহ্মণদের কোন অধিকার ছিল না। সেকালে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া সাহিত্যসৃষ্টি হইত এবং এই সকল কারণে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের অন্তরায় ছিল। কিন্তু দেশ মুসলমানদের অধিকারে যাওয়ায় ব্রাহ্মণদের গৌরব ক্ষুণ্ন হইল এবং বিশেষ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির পথও সুগম হইল। এই জন্যই আমরা দেখিতেছি এই পর্যন্ত যতগুলি প্রাচীন বাংলা কাব্য পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনটিই মুসলমান আমলের পূর্বের নয়। স্বাভাবিক কারণেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিগণ সকলেই হিন্দু। মুসলমানেরা বাংলায় বহিরাগত। এই দেশের ভাষা শিক্ষা করিতে তাহাদের সময় লাগে। অমুসলমানদের অনেকেই হয়ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কাব্য রচনা করেন কিনা জানার উপায় নাই। হিন্দু কবিদের অনেকেই মুসলমান সুলতান বা তাঁহাদের অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন, সুতরাং মুসলমানেরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পরে মুসলমান কবিরাও বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন।'

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের প্রতি মুসলমান শাসকগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টি বাংলা সাহিত্যের কতিপয় ইতিহাসকার সরলভাবে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মুসলমান শাসনের পূর্বে সংস্কৃত ভাষার যে প্রাধান্য ছিল তার অবসান ঘটে এদেশে মুসলিম আগমনের ফলেই। অবহেলিত বাংলা ভাষার মর্যাদাহীনতার জন্য সংস্কৃত ভাষানুসারীরা মোটেই উদ্বিগ্ন ছিলেন না। তাঁদের এই অবজ্ঞার প্রেক্ষিতে মুসলমান শাসন বাংলা ভাষার জন্য আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে একথা অনেক হিন্দু পণ্ডিতও সমর্থন করেছেন। কেউ কেউ এত উদারতা তো দূরের কথা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতেও বিবেচনা করতে সক্ষম হন নি। সেজন্য মধ্যযুগের শুরুতেই একটি অবাস্তব অন্ধকার যুগের নিরর্থক বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়েছিল। বাংলাদেশের গবেষকবৃন্দ এই অনাবশ্যক বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছেন।

মুসলমান শাসন প্রবর্তিত না হলে ধর্মবিপ্লবের আবরণে সমাজবিপ্লব তথা নির্জিত গণমানুষের শাস্ত্রসমাজের শাসন-পীড়ন-শক্তির আন্দোলন সম্ভব হত না। নতুন ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে এদেশে একটা ভাববিপ্লবও সৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই তুর্কিবিজয় কেবল সদ্ধর্মীদের মুক্তির আশ্বাস দিল না, নির্জিত বাঙালিরও আত্মপ্রতিষ্ঠার ও সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। এ দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য রাজশক্তির হস্তক্ষেপের অভিযোগ যে যথার্থ নয় সে সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে : 'স্বধর্ম প্রচারের কোন চেষ্টাই রাজশক্তি করে নি। ...ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সুফী-দরবেশ-আলিমের ব্যক্তিত্ব ও সদাচারের প্রভাবে। সরকার অর্থবিত্ত দিয়ে তাঁদের পরোক্ষে সাহায্য করেছে বটে, তবে প্রকাশ্যে ফরমান যোগে কোথাও প্রচারে সহায়তার আশ্বাস দেয় নি।'

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। 'আমাদের বিশ্বাস, মুসলমানকর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে।'—কেন ও কিভাবে তাহা বিশদভাবে আলোচনা কর।

২। তুর্কিকর্তৃক বঙ্গবিজয় দ্বারা কিভাবে বাংলা ভাষায় শ্রীবৃদ্ধিসাধন সম্ভব হইয়াছিল বিশদভাবে বল।

৩। 'মুসলমান সুলতান বাদশা যদি বাংলা সংস্কৃতিসম্পৃক্ত সাহিত্য রচনার দিকে যথার্থ মনোযোগ না রাখিতেন বাংলা ভাষা সাহিত্যের স্বরূপ অন্যতর হইত।'—এই উক্তি বিশ্লেষণে স্বীয় মতামতসহ একটি নিবন্ধ রচনা কর।

৪। 'ইসলামি সংস্কৃতির বিস্তার বাঙালির চিত্তলোকে যে নবীন চিন্তাধারার উদ্বোধন আনে, তার ফলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিপ্লবমুখী এবং সৃজনশীল হয়ে উঠে।'—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইহার কি নিদর্শন মিলে?

৫। মুসলমানদের সাহিত্য সাধনার ফলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কি কি কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা কর।

৬। 'মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বাংলা ভাষার সৌভাগ্য সূচনা করে।'—কেন এবং কি ভাবে তাহা বিশদ করিয়া আলোচনা কর।

৭। মুসলমান রাজশক্তির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পরোক্ষ প্রেরণায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কোন কোন ধারা কিভাবে সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়াছে, ঐতিহাসিক সূত্র রক্ষা করিয়া তাহা আলোচনা কর।

৮। হোসেন শাহি আমল বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি আশার বাতায়ন খুলে দিয়েছে। এই মন্তব্য সম্পর্কে তোমার সুচিন্তিত মতামত দাও।

৯। 'বাংলাদেশে মুসলিম বিজয় কেবল নির্জিত বৌদ্ধদের পক্ষেই নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল।'—কেন এবং কিভাবে, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা কর।

১০। 'তুর্কিদের বঙ্গবিজয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের সহায়ক হয়েছিল'—কেন এবং কিভাবে তাহা আলোচনা কর।

১১। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে হুসেন শাহি আমল একটি স্মরণীয় অধ্যায়।'—কেন আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

১২। রাজনৈতিক পরিবর্তন মধ্যযুগের সাহিত্যকে কিভাবে কতটা প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দাও।

১৩। তুর্কি সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা আলোচনা কর। এই সময়ের বাংলা সাহিত্যকে 'গৌড় যুগ' বলিবার কোন তাৎপর্য আছে কি? বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীতে গৌড়-রাজসভায় কি প্রভাব পড়িয়াছিল তাহা ব্যাখ্যা কর।

১৪। সুলতানী আমলে কিভাবে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটেছে তা আলোচনা কর।

১৫। 'মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হয়েছিল।'—আলোচনা কর।

১৬। টীকা লিখ : হুসেন শাহ।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাস সমস্যা

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের প্রথম কাব্য এবং বড়ু চণ্ডীদাস মধ্যযুগের আদি কবি। ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের কৃষ্ণলীলা-সম্পর্কিত কাহিনি অনুসরণে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে, লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ প্রেম-সম্পর্কিত গ্রাম্য গল্প অবলম্বনে কবি বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন। ১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামে এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়ালঘর থেকে পুঁথি আকারে অযত্নে রক্ষিত এ কাব্য আবিষ্কার করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটান। বৈষ্ণব মহান্ত শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র-বংশজাত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধিকারে এই গ্রন্থটি রক্ষিত ছিল। ১৯১৬ সালে (১৩২৩ সনে) বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

পুঁথিটির প্রথম দিকের দুটি পাতা এবং শেষের পাতাটি ছিল না। এ ছাড়া পুঁথির মধ্যেও কিছু পাতা নেই। রীতি অনুযায়ী পুঁথির প্রথম দিকে দেবতার প্রশংসা, কবির পরিচয় ও গ্রন্থনাম উল্লেখিত হয় এবং শেষ দিকের পাতায় পুঁথির রচনাকাল ও লিপিকাল লিখিত থাকে। প্রথম ও শেষ অংশ খণ্ডিত থাকায় কবির আত্মপরিচয় ও রচনাকালের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেছে।

বৈষ্ণব মতবাদে গৃহীত রাধাকৃষ্ণের রূপকের বাইরে এ কাব্যের পরিচয়। বৈষ্ণব সাধনা ও ঐতিহ্যের বিরোধী এ কাব্য রুচিহীন গ্রাম্যতা, যৌনকামনা ও মিলনের বর্ণনায় অশ্লীল, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির ব্যঞ্জনার অভাব এ কাব্যকে করে তুলেছে বিতর্ক মুখর। তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে কাব্যটি অচিরেই ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

বাংলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে এই কাব্যের মূল্য অসাধারণ বলে গ্রহণযোগ্য। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে প্রাচীন যুগের নিদর্শন চর্যাপদের পর এবং মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মাঝামাঝি সময়ে আর কোন বাংলা কাব্য আবিষ্কৃত হয় নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমকালে বা কিছু পরে রচিত বিদ্যাপতির পদাবলি, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ইত্যাদি কাব্যের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নি। এ সবের ভাষা যুগের পরিবর্তনে অপেক্ষাকৃত আধুনিক হয়ে পড়েছে। পরবর্তী বৈষ্ণব ভাবধারা ও রসপর্যায়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আদর্শগত বিরোধ বিদ্যমান থাকায় কাব্যটি লোকসমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। ফলে এর ভাষায় পরিবর্তন ঘটতে পারে নি।

কাব্যটির প্রথম ও শেষাংশ খণ্ডিত ছিল বলে কাব্যের নাম ও কবির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় নি। গ্রন্থের ভেতরে কবির ভণিতা থাকলেও কাব্যের নাম নেই। সম্পাদক

কিংবদন্তি অনুসারে এবং কাব্যে কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু দেখে নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।' তবে এই নাম যথার্থ নয়।

'কীর্তন' কথাটি নামকরণে সংযোজনে পণ্ডিতদের আপত্তি। 'নাম রূপ ও গুণাদি সরবে উচ্চারণ করাই কীর্তন। ভক্তির সঙ্গে নাম গুণ ও লীলা কীর্তনই বৈষ্ণবচর্যা।' কবি বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের উদ্দেশ্য সভক্তি কীর্তন নয়। তাই ড. বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 'কীর্তন শব্দের একটি অর্থ হইতেছে কীর্তি, খ্যাতি ও যশ বিষয়ক স্তুতিগান। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণের চরিত্র যতদূর সম্ভব, মসীলিপ্ত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত কৃষ্ণ চরিত্রের সঙ্গে প্রেমের কোন সম্বন্ধই নাই; সে শুধু আত্মতৃপ্তি চায়, সে নায়িকাকে শুধু গালাগালিই করে না, ফৌজদারি মোকদ্দমার আসামীর মত সে মায়ের বকুনি খাইয়া নায়িকার নামে দুরপনেয় কুৎসা ঘোষণা করে, তাহার মনে দয়া নাই, মায়া নাই, সে বহুবার নায়িকাকে উপভোগ করিয়াও তাহার দোষ-ত্রুটিই শেষ পর্যন্ত মনে রাখে এবং সে জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করে। বসন্তরঞ্জন বাবুর আবিষ্কৃত খণ্ডিত পুঁথির নাম রাধাকৃষ্ণের ধামালী বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয়।'

কালিদাস রায় বলেছেন, 'বলপ্রয়োগ, ভয়প্রদর্শন, গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ, বর্বরোচিত আচরণের সমাবেশে আলঙ্কারিক বিচারে এই কাব্যে রসাভাব ঘটেছে।' গোপাল হালদার বলেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ যতই আপনার দেবত্বের বড়াই করুক সে ধূর্ত এক গ্রাম্য লম্পট ছাড়া আর কিছুই নয়।' ধামালী কথাটির অর্থ— রঙ্গরস, পরিহাস বাক্য, কৌতুক। রঙ্গ তামাসার কালে কপট দম্ভ প্রকাশ করে যে-সব উক্তি করা হয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাকে ধামালী বলা হত। নাটপালায় এরূপ ধামালী হাস্যরসের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হত। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এর নিদর্শন আছে। কৃষ্ণ নিজে নারায়ণ, সত্য-ত্রেতা ও দ্বাপরে তিনি অবতাররূপে অতিলৌকিক বীরত্ব দেখিয়েছেন একথা বলে বৃন্দাবনের গোপকিশোর নন্দসুত কৃষ্ণ সাগররাজার কন্যা ও আইহনের পত্নী কিশোরী রাধাকে বশীভূত করার চেষ্টা করলে উভয়ের মধ্যে যে উক্তি প্রত্যুক্তি হয়, বড়ু চণ্ডীদাস তার বিবরণে লিখেছেন—'রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বারটি স্থানে ধামালী কথাটির প্রয়োগ আছে। এই প্রেক্ষিতে কাব্যটির নাম 'রাধাকৃষ্ণের ধামালী' হতে পারে বলে গবেষকগণ মনে করেন।

পুঁথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুট অনুসারে এই কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)। চিরকুটে লেখা ছিল :

শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ — শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্বের ৯৫ পচানই পত্র হইতে একসত্ত দস পত্র পর্য্যন্ত একুনে ১৬ শোল পত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রীশ্রী মহারাজা হুজুরকে লইয়া গেলেন পুনশ্চ আনিয়া দিবেন—সন ১০৮৯

তাং ২৬ আশ্বিন
সন ১০৮৯
তাং ২১ আগ্রহায়ান
শুং কৃষ্ণপঞ্চানন কৃষ্ণসন্দর্ব্ব
১৬ পত্র দাখিল হইল।

তারিখটি বঙ্গাব্দ হলে ১০৮৯ + ৫৯৩ = ১৬৮২ সাল। কেউ কেউ মনে করেন চিরকুটটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কিত নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ নামকরণ যথার্থ নয়। পণ্ডিতগণের ধারণা কাব্যটির নাম 'রাধাকৃষ্ণের ধামালী' বা 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় নি। বরং কাব্যটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামেই এখন পরিচিত। কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস; কবি কাব্যের আদ্যন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা ব্যবহার করেছেন। কোথাও কোথাও চণ্ডীদাস ভণিতা আছে, সাত বার আছে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। সব ভণিতার সঙ্গে বাসলী দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে। কবির নাম যে বড়ু চণ্ডীদাস তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভণিতা থেকে অনুমিত হয় কবি শাক্তদেবী বাসলীর সেবক ছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যের ভাব, ভাষা, উপস্থাপনা পদ্ধতি ও রুচিবোধের যে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে পদাবলির চণ্ডীদাস থেকে পৃথক কবি বলে বিবেচনা করা হয়।

কবির কাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কিছু অংশ খণ্ডিত বলে কবি বড়ু চণ্ডীদাস সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় নি। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায়ের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে কবির জন্মকাল ১৪০৩, ১৪১৭ অথবা ১৩৮৬ থেকে ১৪০০ সালের কোন এক সময়। অন্য মতে ১৩২৫ সাল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতানুসারে কবির জীবনকাল ১৩৭০ থেকে ১৪৩৩ সাল। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, ছাতনার রাজা হামির উত্তর ১৩৭৩ থেকে ১৪০৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এ সময়ে ছাতনায় বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যমান ছিলেন।

কবির ধর্মমত সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। কবি ছিলেন 'শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সুদক্ষ অনুবাদক ও রসজ্ঞ কবি।' সেজন্য তিনি ব্রাহ্মণ হতে পারেন বলে কারও কারও ধারণা। তবে ভণিতায় তিনি দ্বিজ ব্যবহার করেননি। তাই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, 'জন্মগত সামাজিক বন্ধনের দিক থেকে কবি বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভবত কায়স্থ ছিলেন।' তাঁর মতে, 'চণ্ডীদাস বৈষ্ণবও ছিলেন না কিংবা সহজিয়া তান্ত্রিকও ছিলেন না। চণ্ডীদাস ছিলেন সনাতনপন্থী হিন্দু এবং তাঁর উপাস্য ছিলেন চণ্ডীদেবী।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল নিয়ে বেশ মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। পুঁথিতে প্রাপ্ত চিরকুটটি ১০৮৯ বঙ্গাব্দের। সে হিসেবে ১৬৮২ সালে পুঁথিখানি বনবিষ্ণুপুরের রাজগ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল। পুঁথিটি অবশ্যই এই চিরকুট অপেক্ষা প্রাচীনতর। ড. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'এই পুঁথি ১৩৫৮ সালের পূর্বে সম্ভবত চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধে লিখিত।' ড. রাধাগোবিন্দ বসাকের ধারণা, 'পুঁথিখানির লিপিকাল ১৪৫০ থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে।' যোগেশচন্দ্রের মতে, এ পুঁথির লিপিকাল ১৫০০ সালের পূর্বে নয়।' ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ড. রাধাগোবিন্দ বসাকের মত সমর্থন করেন। ড. সুকুমার সেনের মতে, 'কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রাপ্ত পুঁথিটি কবির স্বহস্তলিখিত নয়—পরবর্তী এক বা একাধিক লিপিকরের লেখা। তাই এর রচনাকাল লিপিকালের পূর্বেকার। ড. সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় এ কাব্যের ভাষাকে ১৫০০ সালের পূর্বের বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাছাড়া রসবিচারে কাব্যটির ভাষা চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী বলেও ধরা হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস আদিমধ্যযুগ তথা চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি। চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৬ সালে। বড়ু চণ্ডীদাস এর আগেই কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে কবির জন্মকাল ১৩২৫ থেকে ১৪১৭ সালের মধ্যে। চণ্ডীদাস যে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার সমর্থনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে তথ্য প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। জয়ানন্দ মিশ্র (জন্ম ১৫০৫ সাল) তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে লিখেছেন :

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত তারা করিল প্রকাশ ॥

১৫৮১ সালে রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥

সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদন করেন নি, করলে, এই 'কাব্যকে ভক্ত বৈষ্ণবেরা মাথায় করে রাখতেন....শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এমন ভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত না।' তাঁর মতে, পনের শতকের শেষার্ধে বড়ু চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন।

বিভিন্ন মতামত ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে ড. আহমদ শরীফ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এ ভাবে : 'পনের শতকের কবি কৃত্তিবাস—মালাধর বসু—শাহ মুহম্মদ সগীর— বিজয়গুপ্ত— বিপ্রদাস—কবি চন্দ্র মিশ্র প্রভৃতির ভাষা থেকে প্রাচীনতর ভাষার নিদর্শন, জয়দেবের বিশেষ প্রভাব, বৈষ্ণব প্রভাবমুক্ত লোকায়ত অপৌরাণিক কাহিনি, স্থূলতা, আদিরসসর্বস্বতা, উক্তি ও ঘটনার পৌনঃপুনিকতা, স্থানে স্থানে উক্তির ও ঘটনার উল্লেখে পূর্বাপর অসামঞ্জস্য, নায়ক চরিত্রের গুণাভাব, কথকতা সুলভ ঘটনা ও পদবিন্যাস, লোক নৃত্যনাট্যের আঙ্গিক এবং পদাবলি সংকলন গ্রন্থে বড়ু চণ্ডীদাসের বিক্ষিপ্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ পদের অভাব, একাধিক পুঁথির অপ্রাপ্যতা প্রভৃতি দেখে আমাদের মনে হচ্ছে বৈষ্ণবতত্ত্ব বিরোধী এ গ্রন্থ নিশ্চিতই চৈতন্য-পূর্বকালের এবং আনুমানিক ১৪২৫ সালের আগে রচিত।'

অনুমান করা চলে চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি কোন সময়ে বড়ু চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং চৌদ্দ শতকের শেষ দিকে তাঁর কাব্য রচনা করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির লিপি ১৪৩৬ থেকে ১৫২০ সাল পর্যন্ত লিপি অপেক্ষা প্রাচীন। তাঁর মতে এর লিপিকাল আনুমানিক ১৪০০ সাল। তিনি মনে করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ১৩৪০ থেকে ১৪৪০ সালের মধ্যে রচিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কালের রচনা। কবি বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক পালাগান রচনা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার চরম বিরাগ ক্রমে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরম অনুরাগের একান্ত আত্মনিবেদনে পর্যবসিত হয়েছে। চৈতন্য-আবির্ভাবের পর রাধাকে জন্ম থেকেই কৃষ্ণময়ী ও মহাভাবস্বরূপিণী রূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। রাধা চরিত্রের এই

বৈশিষ্ট্য থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্বের ধারণা করা চলে। কাব্যে অনুসৃত রসপদ্ধতি, চরিত্র ও বিষয় ভাবনা ইত্যাদি চৈতন্যপূর্ব যুগের বলে অনুমিত হয়। চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করেছেন বলে উল্লেখিত হয় তা বড়ু চণ্ডীদাসের নয়। কারণ পদাবলির দেহাতীত প্রেমরস ছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আস্বাদ্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের গ্রাম্যতাদুষ্ট অশ্লীল উপকরণ তাঁর আস্বাদনীয় হতে পারে না।

বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব স্থান সম্পর্কেও মতভেদ বিদ্যমান। কারও মতে তাঁর জন্মস্থান বীরভূমের নান্নুর, আবার কারও মতে বাঁকুড়ার ছাতনা। নানা প্রবাদ, সহজিয়া গ্রন্থ প্রভৃতি অনুসারে বীরভূমের নান্নুর বাসলী দেবীর পীঠস্থান এবং চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। আবার বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামে বাসলী দেবীর মন্দির ও চণ্ডীদাসের ভিটার প্রবাদও প্রচলিত আছে। কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের 'চণ্ডীদাসচরিত' গ্রন্থে ছাতনার দাবি প্রবল ভাবে উত্থাপিত হয়েছে। প্রাচীন পদে ও বৈষ্ণব সহজিয়া গ্রন্থে রামী-চণ্ডীদাসের সাধনতীর্থ হিসেবে নান্নুরের বহু উল্লেখ আছে। চণ্ডীদাস নাম থেকে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াইয়ের প্রতি রাধার উক্তি 'বড় যতন করিআঁ চণ্ডীকে পূজা মানিআঁ তবে তাঁর পাইবে দরশন'—এ থেকে মনে হয় বড়ু চণ্ডীদাস চণ্ডীমূর্তি বাসলীর ভক্ত ছিলেন। ছাতনার বাসলী দেবী চণ্ডীমূর্তি এবং নান্নুরের বাসলী দেবী সরস্বতীমূর্তি বলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বড়ু চণ্ডীদাসকে ছাতনার অধিবাসী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। হয়ত কোন একজন চণ্ডীদাস ছাতনায়, অন্য কেউ নান্নুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

চণ্ডীদাস ও তাঁর প্রণয়িনী সম্পর্কে নানা গালগল্প প্রচলিত আছে। তাঁর একজন সাধনসঙ্গিনী ছিলেন। তিনি রজকিনী, তাঁর নাম ছিল নানারকম—তারা, রামতারা, রামী। হয়ত 'বাসলী মন্দিরে, সুবর্ণমণ্ডিত স্তম্ভের অন্তরালে প্রাতঃসূর্যের আলোকে এক সোনার পুতলীকে' দেখে শুভদৃষ্টিতে উদ্বেলিত হৃদয় চণ্ডীদাসকে কবি করে তুলেছিল। সতের শতক থেকে এ ধরনের গল্প প্রচলিত। তবে তা সত্যাশ্রিত কিনা সঠিক বলা চলে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে খণ্ডিতপদসহ মোট পদের সংখ্যা ৪১৮টি। পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক আছে ১৬১টি। পুঁথির পাতার সংখ্যা ২২৬, অতএব পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫২; এর মধ্যে মাঝের মোট ৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি। ৪৫ পৃষ্ঠা বাদ গেলে পুঁথির প্রাপ্ত পৃষ্ঠার সংখ্যা ৪০৭। পুঁথির লিপি তিন হাতের লেখা। ৪১৮টি পদের মধ্যে কবির ভণিতা আছে ৪০৯টি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনি

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মোট তের খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলো হল : জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ।

প্রথম সর্গ জন্মখণ্ডে দেবগণের প্রার্থনায় ভূভার হরণের জন্য রাধাকৃষ্ণের জন্মকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে বসুদেবের পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করে এবং বৃন্দাবনে নন্দের গৃহে স্থানান্তরিত হয়। কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য লক্ষ্মীদেবী সাগর গোয়ালার ঘরে পদুমার গর্ভে রাধারূপে জন্ম নেয়। তাম্বুলখণ্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনে কৃষ্ণ বড়াইয়ের মাধ্যমে আয়ান ঘোষের পত্নী রাধাকে তাম্বুলাদি প্রেরণ করে, কিন্তু

স্বরূপবিস্মৃতা রাধাকর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। দানখণ্ডে কৃষ্ণ বড়াইয়ের সহায়তায় রাধার দধিদুগ্ধের পসার নষ্ট করে রাধাকে বলপর্বক সম্ভোগ করে। নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ যমুনায় কাণ্ডারী সেজে গোপীগণকে পার করে নৌকা ডুবিয়ে রাধার সঙ্গে জলবিহারে মগ্ন হয়। এখান থেকেই রাধার মনের প্রতিকূলতা দূর হতে থাকে। ভারখণ্ডে কৃষ্ণ ভারবাহীরূপে রাধার পসরা বহন করে। ছত্রখণ্ডে রাধাকে সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণের ছত্রধারণ এবং রাধাকর্তৃক রতিদানের আশ্বাস প্রদান করা হয়। বৃন্দাবনখণ্ডে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বনবিহার এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন। যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণের কালিয় নাগের দমন, গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলবিহার এবং কৃষ্ণকর্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। হারখণ্ডে রাধার হার অপহরণের জন্য যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে রাধার অভিযোগ। বাণখণ্ডে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৃষ্ণ রাধার প্রতি মদনবাণ নিক্ষেপ করে, এতে রাধা মূর্ছা যায়। ফলে কৃষ্ণের মনে অনুতাপ জাগে, বড়াই কৃষ্ণকে বন্ধন করে। পরে কৃষ্ণের অনুনয়ে বন্ধনমোচন করা হয়। কৃষ্ণ রাধার চৈতন্য সম্পাদন করে এবং উভয়ের মিলন ঘটে। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধার মনে প্রবল উৎকণ্ঠা জাগে, রাধা কৃষ্ণের বাঁশি অপহরণ করে এবং পরে কৃষ্ণের অনুনয়ে তা ফেরত দেয়। রাধাবিরহে রাধার বিরহ, উভয়ের মিলন, রাধার নিদ্রা এবং সেই অবকাশে কৃষ্ণের কংসবধের জন্য মথুরা যাত্রা। এর পর কাব্য খণ্ডিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধান কাহিনি ভাগবত থেকে সংগৃহীত। মাঝে মাঝে কিছু পংক্তি ও কাব্যবস্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য থেকে নেওয়া। পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসরণে কৃষ্ণের জন্মকাহিনি ও বাল্যলীলা বর্ণিত হয়েছে। কবি পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণের লীলা অপেক্ষা গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত অপৌরাণিক কাহিনির প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রাচীন কাল থেকে পুরাণ কাহিনির পাশাপাশি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কথা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল, কাহিনি নির্বাচনে কবিকর্তৃক তা অনুসৃত হয়েছে। 'অনভিজাত লোকপ্রণয়-মূলক রাধা-কাহিনিকে অভিজাত পৌরাণিক মননমণ্ডিত রূপাধারে উপস্থিত করার প্রাথমিক প্রয়াস রয়েছে কৃষ্ণকীর্তনের পরিকল্পনার মূলে।' এ কাব্যের কাহিনি বাহ্যত পৌরাণিক রাধার অনুসারী, কিন্তু মূলত লোকজীবনা-দর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তখন পর্যন্ত রাধা বাঙালি বৈষ্ণব চেতনায় তত্ত্ব হয়ে ওঠে নি বলে কবি প্রাচীন কবিদের রাধাকৃষ্ণ গানের ধারা অনুসরণ করেছেন। ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'বস্তুর দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনন্যতা নাই। তবে মৌলিকতা আছে— আদিরসের ভিয়ানে ও লৌকিকতার ছাঁচে।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনি বৈষ্ণব-সাধনা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বৈষ্ণব পদাবলির রাধাকৃষ্ণকে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ ধরনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-বহির্ভূত কাব্য। দেবলীলা নয়, মানবলীলাই এর উপজীব্য। কোন প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়াই কাব্যের অর্থ ও রস অনুভব করা চলে। গল্প ও চরিত্র পাঠকের কাছে সহজেই আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম। ভাষায় আছে অপরিণতির ঊষর উচ্চাবচতা, কাহিনিতে আছে লোক-জীবনাচারের স্থূল গতানুগতিকতা, কিন্তু তারই গভীরে অনির্বচনীয় প্রেমবেদনার ফল্গুধারাটিও অনুভবনীয় ব্যঞ্জনা লাভ করেছে কবিচেতনার সহৃদয়তার স্পর্শে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূলত একটি যাত্রার পালা ছিল বলে মনে করা হয়। কাব্যটি সংস্কৃত গীতগোবিন্দের অনুরূপ গীতি এবং সংলাপবহুল নাট্যলক্ষণাক্রান্ত রচনা বলে তা নাট্যগীতিকাব্য হিসেবেও আখ্যাত হয়েছে। এ কাব্যে নাট্যরসাশ্রয়ী ঘটনা ও সংলাপ থাকলেও তা বর্ণনামূলক কাব্যের মর্যাদার অধিকারী। কোথাও কবি নিজে কাহিনির মধ্যে উপস্থিত থেকে সংলাপের সঙ্গে বর্ণনা যোগ করেছেন, আবার কোথাও সংস্কৃত শ্লোকের সাহায্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। গীতিসংলাপমূলক এই আখ্যানকাব্যে নাটকীয়তা বিদ্যমান। নাটকীয়তার নিদর্শন আছে আখ্যান গ্রন্থনে আদ্যন্ত অখণ্ডতায়, মূল কাহিনির মধ্যে কবিদৃষ্টির কেন্দ্রীয়করণে, পার্শ্বকাহিনি বা উপকাহিনির পথে পথে দিগভ্রান্তির অভাবে, ঘটনাগত ও চারিত্রিক দ্বন্দ্বে এবং সংলাপগত সংঘাতে। কিন্তু নাট্যধর্মের সবচেয়ে বড় অভাব এর ঘটনাবিরলতায়। কাহিনির ঐক্যের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিশিষ্টতা বিদ্যমান। কাহিনির একমুখী গতি এবং শাখা কাহিনির অভাব কাব্যকে স্বকীয়তা দান করেছে। কাব্যটি ঘটনাবিবৃতি, নাট্যরস ও গীতিরস এই তিন বৈশিষ্ট্য নিয়ে রূপায়িত হয়েছে। তবে ঘটনা ও গীতিরস অপেক্ষা নাট্যরসের প্রাধান্য বেশি। কবি ঘটনার বিবৃতিকার রূপে কমই আত্মপ্রকাশ করেছেন। কবি একাব্যে অজ্ঞাতসারে নাট্যকারসুলভ বস্তুপ্রধান ঘটনা আশ্রয় করে নিজ ব্যক্তিত্বকে দমন করেছেন। 'রাধাবিরহ' অংশ বাদ দিলে এ কাব্য প্রধানত নাট্যধর্মী আখ্যান বলে অভিহিত হতে পারে। এ কাহিনির কেন্দ্রীয় সমস্যাটি দ্বন্দ্বমূলক। এ দ্বন্দ্ব ঘটনা এবং ব্যক্তি ইচ্ছা ও চেষ্টার টানাপোড়নে বিকশিত এবং চারিত্রিক বিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই দ্বন্দ্ব আখ্যানটিকে হৃদয়গ্রাহী করেছে এবং নাটকীয়তা সঞ্চারে এর আস্বাদ বাড়িয়েছে।

রাধা কৃষ্ণ ও বড়াই—এই তিনটি চরিত্র অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনি রূপায়িত হয়েছে। প্রধান চরিত্র রাধা—এ চরিত্র কেন্দ্র করেই কাব্যের আখ্যানবস্তুর বিকাশ ঘটেছে। রাধা চরিত্রের বিকাশে ও পরিণতিতে বড়ু চণ্ডীদাস যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। কাব্যের প্রথমে তাম্বুলখণ্ডে যে এগার বছরের রাধার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, 'সে সংসারনভিজ্ঞ রূঢ় সত্যভাষিণী অল্পবয়সী অশিক্ষিত গোপ বালিকা।' তারপর কবি ঘটনাকৌশলে মূঢ় বালিকাচিত্তে কামের ও প্রেমের যে উন্মেষ ও বিকাশ ঘটালেন তাতে গোপকন্যা 'শাশ্বতরসিক চিত্তবলভীর পৌঢ়পারাবতী শ্রীরাধায়' পরিণত হয়েছে। রাধার এগার থেকে তের বৎসর বয়স পর্যন্ত চিত্তোন্মোচন এবং দেহমন-সমন্বিত উদ্বুদ্ধ মানসিকতার কাহিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। রাধাচরিত্রের বিবর্তন মনস্তাত্ত্বিক। বিভিন্ন খণ্ডের মাধ্যমে বিচিত্র প্রেমানুভূতি প্রকাশ পেয়ে বিরহখণ্ডে দেহমিলনের কামনা ব্যক্ত হয়েছে। তবে দেহকেন্দ্রিক হলেও রাধার মানসিক লীলা এখানে অধিক নভোচারী। রাধা চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ নারীচরিত্র অঙ্কনে ও তার প্রেমচেতনার পরিণতির প্রত্যেকটি স্তরে নিপুণ আলোকসম্পাদনে কবি বড়ু চণ্ডীদাস সীমাহীন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাধার মনে এক দুর্জয় প্রেম কীভাবে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবর্তন চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে 'একেবারে সূচনা থেকে প্রতিক্ষণে, প্রতি খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে রাধার জীবনকে তিলে তিলে কবি পরিণামের অভিমুখে বিকশিত করে তুলেছেন,—

একটি পূর্ণস্ফুট পদ্মকোরকের মত। নিছক দেহাসঙ্গ-বৃত্তির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নারীর সেই অপরিণত গঠন মনোবৃত্তি, ভয় এবং প্রণয়বৃত্তির দ্বিধা,—অপরিণামদর্শী প্রেমের বেদীতে অসহায় আর্তি—সব কিছু মিলে রাধার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বাঙালি লোক-মানবীকেই নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ করি;—হৃদয়বিদারণ বেদনার অগ্নিতাপে তার ইন্দ্রিয়-ব্যাকুলতাময় প্রণয়বৃত্তির খাদ পুড়ে ছাই হয়েছে, দেখা দিয়েছে নিখাদ প্রেমের স্বর্ণবিভূতি।'

কৃষ্ণ চরিত্র অঙ্কনে কবি পৌরাণিক ও মৌলিক ভাবের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। কৃষ্ণ চরিত্রে স্থূল দাম্ভিকতা, দেহলোলুপ রিরংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের কুটিল ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন মহৎ গুণ বা কোমল মানবিক প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। এ চরিত্রে পূর্ণতা বা সঙ্গতি নেই। কামপ্রবৃত্তির প্রবণতা, বালসুলভতা, লঘুকৌতুক ও গ্রাম্যতা কৃষ্ণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যে কামবাসনা প্রবলতর হয়ে কৃষ্ণ চরিত্রে দেখা দিয়েছে, তাতে হৃদয়ের সম্পর্ক কম। রাধার দেহসম্ভোগ ছাড়া কৃষ্ণের মনে রাধার প্রতি স্নেহ করুণা প্রেম প্রভৃতি সদবৃত্তির কোন বিকাশ ঘটে নি। কৃষ্ণের এই মনোভাবের জন্য কাব্যের শিল্পবোধ ক্ষুণ্ন হয়েছে। রাধার প্রতি কৃষ্ণের মানবিক চেতনা জাগে নি বলে কৃষ্ণচরিত্রে অসঙ্গতি বিদ্যমান। শঙ্করীপ্রসাদ বসু কৃষ্ণ চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্বের সবটুকু আত্মসাৎ করিয়াছে রাধা। যাহার নাম কীর্তন করিতে কাব্যটির রচনা সেই কৃষ্ণই উহার দোষের আশ্রয়। কাব্যটির যত কিছু দুর্নাম কৃষ্ণের জন্য।' কৃষ্ণের আচরণে বিরূপতা ও নির্মমতার পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সর্বশেষ অংশে—যেখানে কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে রাধার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বড়াই অনুরোধ জানালে কৃষ্ণ বলে :

শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
জায়িতে না ফুরে মন নাম শুণী তারে ॥
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে ॥
আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী।
রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শমতী ॥
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোমার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত ॥
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী ॥
মথুরা আইলোহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস ॥

আধুনিক বাংলা : 'বড়াই তোমাকে বলি তুমি আর শক্তি প্রয়োগ করো না। তার নাম শুনে আমার আর যেতে মন চায় না। সে আমাকে যত দুঃখ দিয়েছে তা তোমার জানা। আমি মন স্থির করেছি তাকে আর দেখব না। ওগো বড়াই, তুমি সেখানে ফিরে যাও। রাধিকার জন্য আর আমাকে বলো না। কাটা ঘায়ে আর কত লেবুর রস দিবে? রাধা যত কথা বলেছে তা তোমার বিদিত আছে। এ ধন রাজ্য সব ত্যাগ করতে পারি,

কিন্তু দুঃসহ বাক্যজ্বালা সইতে পারি না। গোকুলের বাস ত্যাগ করে মথুরায় এসেছি। স্থির করেছি কংসের বিনাশ করব।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পৌরাণিক কংসারী কৃষ্ণকে ভগবান বিষ্ণুর বীররসাত্মক অবতার হিসেবে পাওয়া যায় না বলে কোন কোন সমালোচক বক্রোক্তি করেন এই বলে যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ আছে, কীর্তন নেই।' এ কাব্যের নামকরণে কীর্তন কথাটি সংযোজন করা হলেও এর তাৎপর্য কাব্যের বক্তব্যে লক্ষ করা যায় না। বৈষ্ণবদের ধর্মচর্চার বিশেষ অঙ্গ কীর্তন। তাঁরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক হিসেবে মনে করে থাকেন। পদাবলিতে এই প্রেমের দার্শনিকতা ও ধর্মনৈতিকতা প্রতিফলিত। কীর্তন সঙ্গীতে তা অলৌকিক ব্যঞ্জনায় রূপায়িত হয়ে ওঠে। কীর্তনের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের প্রেম গায়ক-শ্রোতাকে এক আধ্যাত্মিক জগতে উন্নীত করে। রসে ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে মানবহৃদয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য হলেও তা লৌকিক কাহিনিকাব্য। কবি তৎকালীন রুচির পরিপ্রেক্ষিতে নামমাত্র রাধাকৃষ্ণ-কাহিনি নিয়ে আদিরসাত্মক কাব্য লিখেছিলেন। তাই এতে পদাবলির সে আধ্যাত্মিক আবেদন নেই। পদাবলির কৃষ্ণ সমুন্নত চরিত্রের অধিকারী, প্রেমের উচ্চগ্রামে তাঁর সুর বাঁধা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ অশালীন, স্থূল কামনাবাসনার অধিকারী গ্রাম্য যুবকের লক্ষণাক্রান্ত। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, 'কাব্যখানি গ্রাম্য শ্রোতার জন্য, কৃষ্ণ বা রাধা তাহার উপাস্য নহে। দ্বিতীয়ত কবি বৈষ্ণব নহেন। সে যুগে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রবল ছিল, কবি অনন্ত বড়ু এ ভেদবুদ্ধি প্রসূত কৃষ্ণের চরিত্র বিকৃত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন কিনা বলা যায় না। কবির কৃষ্ণ কামুক, কপট, মিথ্যাবাদী, অতিশয় দাম্ভিক এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ।' পদাবলিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম দৈহিক স্থূলতাকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক সুরমূর্ছনা জাগিয়ে তোলে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রেম দৈহিক কামনাবাসনার বাইরে যেতে পারে নি। চৈতন্যভাবরসে নিমগ্ন পাঠক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাঠে রুচির অশুচি পীড়ন অনুভব করবে। বিষয়বস্তু ও রসাদর্শের দিক থেকে চৈতন্যযুগের রাধাকৃষ্ণ কাহিনি বৈষ্ণবপদ শাখার সঙ্গে এর যেন বংশকৌলিন্য ভেদ বিদ্যমান। নিত্যশুদ্ধ ও সাত্ত্বিক মহাজন-পদের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ, জাতিচ্যুত গ্রাম্য বলে মনে হয়। তাই এ কাব্য কীর্তনের মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না। এমন কি বৈষ্ণব ভাবাদর্শ থেকে বিচ্যুত বলে কেউ কেউ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ নেই কীর্তনও নেই' বলে মন্তব্য করেন।

বড়াই চরিত্রটি রসিকতায়, কূটবুদ্ধিতে, ছদ্ম-অভিনয়ে সার্থকতার পরিচায়ক। টাইপ জাতীয় চরিত্র হিসেবে এর মর্যাদা স্বীকার্য। বড়াই গ্রাম্য কুট্টনী জাতীয় চরিত্র। বয়সে সে বুড়ী। কাব্যে তার বাস্তব বর্ণনা আছে। তবে তা কুটিল ছিল না। সে অল্পেই চটে যায়, আবার অল্পেই রাধা-কৃষ্ণের দুঃখে গলে যায়। সে সরলা ও সহানুভূতিসম্পন্না। সে আমলের সমাজ জীবনের একটি জীবন্ত চিত্র হিসেবে তাকে অঙ্কন করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অশ্লীলতা সম্পর্কে অভিযোগ ওঠে। তবে শ্লীলতা ও রুচিবোধ সম্পর্কে তৎকালীন আদর্শ বর্তমানকাল থেকে ভিন্ন ছিল বলে মনে রাখতে হবে। তবু বলা যায় যে, কাব্যটিতে দেহগত কামনার যে উদগ্রতা এবং দেহমিলনের বর্ণনার যে পুনরুক্তি ঘটানো হয়েছে তাতে কাব্যে শ্লীলতার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে

রাধা কামাসক্তা ও সম্ভোগলিপ্সু; কৃষ্ণ লম্পট, কপট, নির্মম, দায়িত্বহীন, নির্লজ্জ,—তার কথা ও আচরণ স্থূল ও অশ্লীল। ড. দীনেশচন্দ্র সেন এ প্রসঙ্গে যুক্তি দেখিয়েছিলেন এভাবে : 'চণ্ডীদাস যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব এড়াইবেন কিরূপে? তিনি সে যুগের বাংলা ভাষার অমার্জিত রূপ, রুচি ও ইঙ্গিতকে তাঁহার রচনায় ব্যক্ত করিতে যাইয়া সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভাবী প্রেম-সাধনার যুগের আলো দেখিয়াছিলেন, সেই আলো তাঁহার লীলাময় মাথায় বজ্রাঘাত করিয়াছিল এবং সেই আলোকপাতে তাঁহার 'রাধাবিরহ' অভিনব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছিল। জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড গাহিতে গাহিতে তিনি বাগ্দেবীর কৃপায় নূতন মন্ত্র শিখিয়া ফেলিলেন। সেই মন্ত্রের মোহিনীতে 'রাধাবিরহ' আশ্চর্যরূপ উপাদেয় হইয়া উঠিল।'

বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃত পুরাণ সাহিত্য অলংকার দর্শনের ওপর তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল। তার প্রমাণ মিলে কাব্যের স্থানে স্থানে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক থেকে। কাব্যের বিভিন্ন জায়গায় যেসব সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে সেসব শ্লোকের রচয়িতা যদি কবি নিজে হয়ে থাকেন, তাহলে সেখানে তাঁর প্রখর পাণ্ডিত্যের উদাহরণ বিদ্যমান। অনেকের অনুমান অপর কোন সংস্কৃত কাব্য থেকে সেই শ্লোকগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। তাহলেও কেবল প্রয়োগবিধির ঔচিত্য ও পরিমিতিবোধ দেখে কবির গভীর সংস্কৃত জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

রূপ বর্ণনায় কবি শাস্ত্রজ্ঞানের নিদর্শন দেখিয়েছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ওপর ব্যাপক। গীতগোবিন্দ বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি- প্রত্যুক্তি-সমন্বিত নাট্যলক্ষণযুক্ত কাব্যগ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও তাই। গঠনগত দিক থেকে দুটি কাব্যের মধ্যে আশ্চর্য মিল বর্তমান। জয়দেবের গীতগোবিন্দের বহু অংশের ভাবানুবাদে তাঁর কৃতিত্ব নিহিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় রয়েছে অপরিণতির উষ্ণ কাঠিন্য, কাহিনিতে আছে লোক-জীবনাচারের স্থূল গতানুগতিকতা, কিন্তু তারই গভীরে অনির্বচনীয় প্রেমবেদনার ফল্গুধারাটির অনুভবনীয় ব্যঞ্জনা লাভ করেছে কবিচেতনার সহৃদয়তার স্পর্শে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পরিকল্পনার মূলে আছে অনভিজাত লোক- প্রণয়মূলক রাধাকাহিনিকে অভিজাত পৌরাণিক মননমণ্ডিত রূপাধারে উপস্থিত করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা। কৃষ্ণের বাঁশির সুরে রাধার প্রেমানুভূতি কি বিচিত্ররূপে উৎসারিত হয়ে উঠেছে কবি তার অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন :

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥

আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন আভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥

আধুনিক বাংলা : 'বড়ায়ি, কে সে বাঁশি বাজায় কালিন্দী নদীকূলে? কে সে বাঁশি বাজায়, বড়ায়ি, এই গোষ্ঠ গোকুলে? আমার শরীর আকুল, মন ব্যাকুল। বাঁশির শব্দে আমার রান্না এলোমেলো হয়ে গেল। কে সে বাঁশি বাজায়? সে কোন জন? দাসী হয়ে তাঁর পায়ে নিজেকে সঁপে দিব। বড়ায়ি, চিত্তের হরষে কে সে বাঁশি বাজায়? বড়ায়ি, তার পায়ে আমি কী দোষ করেছি? আমার নয়নের পানি অঝরে ঝরছে। বড়ায়ি, বাঁশির শব্দে আমি প্রাণ হারিয়ে ফেললাম। আমার মন আকুল করার জন্যই কি নন্দের নন্দন সুস্বরে বাঁশি বাজায়? পাখি নই যে তার ঠাঁই উড়ে যাই। মেদিনী বিদীর্ণ করে দাও, সেখানে প্রবেশ করে লুকাই। ওগো বড়ায়ি আগুনে বন পোড়ে, জগতজন তা জানে, আমার মন পোড়ে যেন কুম্ভকারের পোয়ানের মত। কৃষ্ণ-অভিলাষে আমার অন্তর শুকিয়ে যাচ্ছে। শিরে বাসলী দেবীর বন্দনা করে চণ্ডীদাস গাইলেন।'

এককালে হয়ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের স্থূল বর্ণনার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম অধ্যাত্মব্যঞ্জনা পাঠককে মুগ্ধ করত, কিন্তু এখনকার পাঠকের কাছে এর মানবরস বেশি উপাদেয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গান স্বর্গলোকের উদ্দেশে নিবেদিত নয়, জগৎ সংসারের নরনারীর প্রেমময় হৃদয়ের কামনাবাসনার প্রতিফলনে বিশিষ্ট করে বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর বিস্ময়কর কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। কাব্যটি গীতিরস, কাব্যিক লাবণ্য, নাট্যগুণ, সংলাপে সমৃদ্ধ এবং নৃত্যনাট্য হিসেবেও রসোত্তীর্ণ। আখ্যান পরিকল্পনায়, চরিত্রচিত্রণে, ভাবে ও ভাষায় একে সুগঠিত নাট্য গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্যদানে কবির কৃতিত্ব নিহিত। কাব্যের রচনারীতি ও কাব্যকলাতে কবি যে অসাধারণ প্রাজ্ঞ ছিলেন তার নিদর্শন এই কাব্যে বিদ্যমান। বর্ণনাকৌশল, অলংকার সন্নিবেশ ও শব্দযোজনার ক্ষেত্রেও কবির কৃতিত্ব কম নয়। অসংখ্য কাব্যরসোচ্ছল উক্তি এ কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। রাধার রূপের বর্ণনা দিয়ে কবি লিখেছেন :

কনক কমলরুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুঈলাখ যোজনে ॥
ললিত আলক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।
তমাল কলিকা ফুল রহে বন মাঝে ॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পসি তপ করে নীল উতপল ॥

কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পশিলা সাগরের জলমাঝে ॥
কুচ যুগ দেখি তার আতি মনোহরে।
অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে ॥
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিনী চল বিলম্বে ॥

আধুনিক বাংলা : 'কনক কমলের মত দ্যুতি তার বিমল বদনে। তা দেখে চাঁদ লাজে দুই লাখ যোজন দূরে চলে গেল। রাধা নামে আমার নাতনি পদ্মিনী, অনুপম রূপবতী, তাকে দেখলে মুনির মন মুগ্ধ হয়। তার অলকপাঁতির ললিত কান্তি দেখে তমালকলি বনমাঝে আশ্রয় নেয়। তার কাজল শোভিত অলসলোচন দেখে নীলোৎপল জলে প্রবেশ করে তপ করে। কণ্ঠদেশ দেখে শঙ্খের লজ্জা হল। সে সত্বর সাগরের জলে প্রবেশ করল। তার অতি মনোহর কুচ দেখে পাকা ডালিম অভিমানে বিদীর্ণ হল। তার মাঝা ক্ষীণ, বিপুল নিতম্ব গুরুভার, সে মত্ত রাজহংস অপেক্ষা ধীরে চলে।'

অলংকার সন্নিবেশে কবি প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের রীতি অনুসরণ করেছেন। এ সবের উৎস হল সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে কবির যে প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল তা এ বৈশিষ্ট্য থেকে প্রমাণিত হয়। অলঙ্কৃত উপমা দিয়ে রাধার প্রেম বিরহের ছবিটি অঙ্কন করা হয়েছে :

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি চখুত নাইসে নিন্দে ॥
শীতল চন্দন অঙ্গে বুলাওঁ তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি লুকাও তাহার পেটে ॥
আল। দাহে পৈসু কাল দুতী।
উথাআঁ পাথাআঁ আক্ষা আনিল বিফলে পোহাইল রাতী ॥
একে দহদহ ঘসির আগুন আরে কেনা জালে ফুকে।
ভিড়ি আলীঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ এ শাল হাকিল বুকে ॥

আধুনিক বাংলা : 'দিনে সূর্য পুড়িয়ে মারে, রাতে চাঁদ দুঃখ দেয়। বড়াই, প্রাণে কী করে সহ্য করি, চোখে নিদ আসে না। শীতল চন্দন অঙ্গে বুলাই তবু বিরহ টুটে না। বড়াই, মেদিনী বিদীর্ণ হোক, তার পেটে লুকাই। ওগো দূতী কাল দহে প্রবেশ করলাম। উথাল পাথাল ঢেউ আমায় ফিরিয়ে আনল, নিষ্ফল রাত কাটাই। ঘসির আগুন একে দগদগ করে, তাতে আবার কে যেন জ্বাল ও ফুঁক দিচ্ছে। কাছে গিয়েও আলিঙ্গন দিতে পারলাম না, এই শাল বুকে রইল।'

কাব্যে কয়েকটি আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ আছে। শব্দগুলো হল : কামান, খরমুজা, বাকী, মজুর,মজুরিআ, গুলাল, লেম্বু, অফার। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দেও কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ প্রয়োগে বৈচিত্র্য ফুটিয়ে

তুলেছেন। কাব্যটি গীত হত বলে ছন্দের ক্ষেত্রে শৈথিল্যও প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার শীর্ষে রাগতাল এবং কোথাও কোথাও অভিনয় পদ্ধতির সংকেত রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সমালোচনা করে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আখ্যানটি সর্বত্র আধুনিক পাঠকের অভিনন্দন লাভ করিতে পারিবে না। ইহার বহু স্থলে অনাবশ্যক বাগবাহুল্য আছে। তাম্বুলখণ্ডে রাধার রূপবর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণের মদন শরাহত অবস্থা বর্ণনা এবং দানখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তির বহর অত্যন্ত ক্লান্তিকর—মাঝে মাঝে অপ্রাসঙ্গিকও বটে। বড়ু চণ্ডীদাস প্রত্যক্ষভাবে ঘটনা সূত্রের স্তর পরম্পরা বর্ণনা করিতে পারেন নাই। পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়া কাহিনি বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য বহুস্থলে পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। বংশীখণ্ডের দুই-একটি পদের গীতিরস ছাড়িয়া দিলে উহার কাব্যমূল্য প্রশ্নাধীন হইয়া পড়ে। নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড প্রভৃতি পর্যায়ের মধ্য দিয়া ঘটনাবিচ্যুতি গীতিবহুল নাট্যরসের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছে। ইতিপূর্বে কোন প্রাদেশিক ভাষায় রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত কাব্যকাহিনি রচিত হয় নাই। গীতগোবিন্দের মধ্যে কাহিনি যৎসামান্য। সেই দিক দিয়া বড়ু চণ্ডীদাস যেভাবে কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মথুরাগমন পর্যন্ত দীর্ঘ কাহিনিটির ধারাবাহিকতা ও সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রচনাকৌশল, বিশেষত কাহিনি-রচনা কৌশল প্রশংসাযোগ্য।' কবির আন্তরিক একাত্মতার গুণে কাব্য হয়ে উঠেছে জীবন-রস-নিবিড় মাধুর্যপূর্ণ। নিছক ভাব-ভাষা বা ছন্দ শৈলীতেই নয়, বাগভঙ্গির বৈশিষ্ট্যেও আন্তরিকতার পরিচয় মিলে। যেমন :

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহি লোঁ
বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরুজনে।
হেন মনে পরিহাসে আহ্মা উপেখিয়া রোষে
আন লয়ে বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥
বড়ায়ি গো,
কত দুখ কহিব কাহিনি।
দহ বলি ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় অভাগিনী।
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো
আ ল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥

আধুনিক বাংলা : 'বড়াই, যে কৃষ্ণের জন্য আমি আর কিছু চাই নি, লঘু গুরুজন মানি নি, আমার মনে হয়, সে আমার প্রতি রোষবশত আমাকে উপেক্ষা করে অন্য

রমণীর সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস করছে। বড়াই গো, দুঃখের কাহিনি কত বলব। ডুবে মরব বলে সরোবরে ঝাঁপ দিলাম, তা-ও শুকিয়ে গেল। আমি বড় অভাগিনী নারী। নন্দের নন্দন, যশোদার পুত্র সে কৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতি বাড়ালাম। যে কাজ গোপন রাখতে হত তা প্রকাশ করে উচিত ফল পেলাম।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রথম দিকে যে স্থুল ও দেহগত কামনাবাসনার সুতীব্র প্রকাশ লক্ষ করা যায় শেষ পর্যায়ে বংশী ও বিরহ খণ্ডে তা পরিবর্তিত হয়ে মানব প্রেমচেতনার অতীন্দ্রিয় অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। এখানেই বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বংশী ও বিরহ খণ্ডের কবিতায় বৈষ্ণব পদাবলির অনুসরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথমাংশের রুচিহীনতার পরিসীমা অতিক্রম করে কাব্যের পরিণতি পদাবলির সঙ্গে অনেকটা সঙ্গতিপূর্ণ। 'সাহিত্যে ও দর্শনে শ্রীরাধার কমলিনী মূর্তির ক্রমবিকাশ এক পরম্পরানুগত পদ্ধতি অনুসরণ করে এসেছে,—তার শতদলরূপের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়ত বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে। কিন্তু যে-কটি মানস-ভাবনার দল মেলে রাধাকমলিনী এই শতদল মূর্তিতে বিকশিত হয়ে উঠেছেন,—তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী এক সাহিত্যিক রূপ নিঃসন্দেহে রয়েছে কৃষ্ণকীর্তনে।' এ জন্যই বলা হয়ে থাকে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যেখানে শেষ, পদাবলি সাহিত্যের সেখানে আরম্ভ।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা প্রথমে বীতরাগ, পরে ব্যাকুলা-অনুরাগিণী। পদাবলির রাধা প্রথম থেকেই কৃষ্ণের অনুরাগিণী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা বুনো ফুল, তার বুনো রূপ, বুনো গন্ধ, রস গ্রাম্য যৌনতাদুষ্ট, সে ভোগ্য। পদাবলির রাধা যত্নে লালিতা ফুল, তার রূপ-রস-গন্ধ নগুরে, সূক্ষ্ম ও পরিশ্রুত, সে প্রেম-উপভোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বৈশিষ্ট্য

১। প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উচ্চারণ-আদর্শে 'অ' ধ্বনির হ্রস্ব 'আ' এবং 'আ' ধ্বনির দীর্ঘ 'আ' উচ্চারণ।—আনেক, আতি।

২। উদ্বৃত্তস্বর তখনও শব্দ শেষে অনেকটা রক্ষিত হত।—গাআ, জাইও।

৩। প্রাকৃত প্রভাবিত এক ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব রূপ সর্বনামে দৃষ্ট হয়।—আহ্মে, তোহ্মে।

৪। পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির এক যুগ্মস্বরে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ বাংলা বাকরীতিতে প্রভাব সূচিত করে।—বুইল, গাইল।

৫। প্রাকৃত অপভ্রংশ প্রভাবিত আনুনাসিক উচ্চারণ ও বানানে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার খুব বেশি হয়েছে।—কাহ্নাঞিঁ, একেঁকে।

৬। বিপ্রকর্ষ, স্বরসংগতি, যুক্তবর্ণের একটি লোপ ইত্যাদি ধ্বনিগত পরিবর্তন লক্ষিত হয়।—পরাণ, সেনেহ, বুধি (বুদ্ধি)।

৭। ভাষায় ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গের রূপ।—কমলবদনী, কোঁঅলী পাতলী বালী।

৮। এক বচন ও বহু বচনে একই রূপ। বহু বচনে রা, রে, সবে, সব, জন, সঅল ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার।

৯। নাম ধাতুর যথেষ্ট ব্যবহার।—চুম্বিলা, মুকুলিল, চিন্তিল।

উপসংহারে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করে বলা যায়, 'মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ঊষারুণ—প্রত্যুষে বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য শুধু মধ্যযুগের নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একখানি অভিনব উপাদেয় গ্রন্থ, তাহা কাব্যরসিকগণ স্বীকার করিবেন। একদা ইহার স্থূল বর্ণনার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম অধ্যাত্মব্যঞ্জনা নিশ্চয়ই সাধারণ শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলিত। কিন্তু আধুনিক কালের পাঠকের নিকট ইহার প্রত্যক্ষ মানবরস অধিকতর উপাদেয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

চণ্ডীদাস সমস্যা

চণ্ডীদাস সমস্যা বাংলা সাহিত্যে একটি বিতর্কিত সমস্যা। চণ্ডীদাসের পদাবলি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকলেও একাধিক চণ্ডীদাস সম্পর্কিত চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভব হয়েছে ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশের পর থেকে। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত ড. দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে একজন চণ্ডীদাসের কথা বলা হয়েছিল। তাঁর মন্তব্য ছিল এ রকম : 'কৃষ্ণকীর্তনে জানা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাসের নাম অনন্ত, তিনি 'বড়ু' উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং বাসলী দেবীর আজ্ঞায় পদ রচনা করিতেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদেই বহু পূর্বে তাঁহার 'অনন্ত' নাম পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার 'বড়ু' উপাধি ও বাসলীর আদেশ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের সকলেই অবশ্য অবগত আছেন। সুতরাং কবি চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা যে অভিন্ন ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে আমাদের সংশয় নাই।' পরে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কিছু পালাগান ও বিচ্ছিন্ন পদ সংগৃহীত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকাশিত হওয়ায় একাধিক চণ্ডীদাস সম্পর্কে ধারণা দৃঢ় হল। ১৩৪১ সনে মণীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক দীন চণ্ডীদাসের পদাবলি প্রকাশিত হলে চণ্ডীদাস সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে।

চণ্ডীদাস সমস্যার রহস্যের বেড়াজালে যে সব প্রশ্নের বিবেচনা করা দরকার সেগুলো হল :

ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কবি দণ্ডীদাস এবং পদাবলির কবি চণ্ডীদাস কি একই ব্যক্তি, না আলাদা?

খ. তাঁরা এক ব্যক্তি না হলে চণ্ডীদাস ক'জন?

গ. একাধিক চণ্ডীদাস হলে আদি কে?

ঘ. বিভিন্ন চণ্ডীদাসের কাল কখন?

ঙ. চৈতন্যদেব কোন চণ্ডীদাসের রচনা আস্বাদন করতেন?

চ. চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববতী না পরবর্তী?

ছ. চণ্ডীদাসের উপাস্য কোন বাসুলী দেবী?

জ. চণ্ডীদাসের জন্মভূমি দুই স্থানের দাবির কারণ কী?

ঝ. চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিণী রামী রজকিনী কোন চণ্ডীদাসের।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশের পর দেখা গেল এ কাব্যের ভাষা, রুচি ও রসের ধারার সঙ্গে পদাবলির চণ্ডীদাসের বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা এবং তিনি চৈতন্যপূর্ববর্তী কবি। পদাবলির চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁর কোন সামঞ্জস্যই নেই। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলির দ্বিজ চণ্ডীদাস ভিন্ন কবি বলে ধারণা জন্মে। পরে মণীন্দ্রমোহন বসু দেখালেন যে, পদাবলির চণ্ডীদাস বড়ু বা দ্বিজ চণ্ডীদাস নন, তিনি দীন চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ভাগবত অবলম্বনে পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সহযোগে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব কোন একজন চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন। এ সম্পর্কে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বলা হয়েছে :

১. বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥
২. বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতি করয়ে প্রভুর আনন্দ ॥

মনে করা হয় রাধাকৃষ্ণের উদ্দাম দেহসম্ভোগজনিত অনাবৃত আকাঙ্ক্ষার উত্তপ্ত ফেনোচ্ছ্বাস চৈতন্যদেবের কাছে আস্বাদনযোগ্য ছিল না। তিনি হয়ত অন্য কোন চণ্ডীদাসের পদ উপভোগ করেছিলেন। আবার পদাবলির চণ্ডীদাস সম্পর্কেও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। পদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিবেচনা করে এখানেও একাধিক চণ্ডীদাসের কল্পনা করা হয়েছে। ড. সুকুমার সেন ও মণীন্দ্রমোহন বসু দুজন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন। অন্যদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র রায়ের মতে চণ্ডীদাস তিন জন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও তিনজন চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখ করেছেন। ড. আহমদ শরীফ তিন জন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন :

১. অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস সর্বপ্রাচীন চণ্ডীদাস।
২. চণ্ডীদাস—চৈতন্য-পূর্বকালের বা জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক।
৩. দীন চণ্ডীদাস আঠার শতকের শেষার্ধ।

সকলের মতামত থেকে যে তিন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের কথা জানা যায় তাঁরা হলেন : ক. প্রাকচৈতন্য যুগের বড়ু চণ্ডীদাস, খ. প্রাকচৈতন্য যুগের উৎকৃষ্ট শ্রেণির পদাবলির চণ্ডীদাস এবং গ. চৈতন্যোত্তর যুগের পালাগান রচয়িতা দীন চণ্ডীদাস। এ সবের উৎস হচ্ছে ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, খ. বড়ু-দ্বিজ-দীন-আদি প্রভৃতি চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদাবলি, গ. মণীন্দ্রমোহন বসু আবিষ্কৃত দীন চণ্ডীদাসের পালাগানের পদাবলি এবং ঘ. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচায়িত বর্ধমানের বনপাশ থেকে সংগৃহীত দীন চণ্ডীদাসের বৃহত্তর পালাগান। এ থেকে যে কজন চণ্ডীদাস সম্পর্কে ধারণা করা হয় তা হল : ১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, ২. পদাবলির দ্বিজ, দীন, বড়ু, আদি প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত চণ্ডীদাস, ৩. পালাগানের দীন চণ্ডীদাস এবং ৪. সহজিয়াপন্থী রাগাত্মিকা পদের চণ্ডীদাস। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, চণ্ডীদাস তিন জন : বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস।

বিভিন্ন সময়ে পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত তথ্যাদি থেকে যে কজন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস সবচেয়ে প্রাচীন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে যে সব প্রাচীনত্বের লক্ষণ লক্ষ করেছেন, তা মধ্যযুগের অন্য কোন কাব্যে নেই। সে সব হল, উত্তম পুরুষের এক বচন ও বহু বচনে দুই পৃথক রূপ (এক বচনে মোএঁ চলোঁ, বহু বচনে আহ্মে চলি), উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞায় ইউ প্রত্যয় (করিউ) স্ত্রীলিঙ্গ কর্তার অকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালে স্ত্রীপ্রত্যয় (রাহী গেলী) ইত্যাদি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৩৭০ সালে বড়ু চণ্ডীদাসের জন্ম এবং ১৪৩৩ সালে মৃত্যু অনুমান করেছেন। এই বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেছিলেন। চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের কাব্য আস্বাদন করেছেন বলে উল্লেখিত হয়েছে তিনি বড়ু চণ্ডীদাস নন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে চৈতন্যপূর্ব কালের রচনা প্রমাণ করে মণীন্দ্রমোহন বসু কতিপয় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। তা হল :

ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা লক্ষ্মী স্বরূপা। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব ভাবনা অনুসারে রাধা হল কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপা, প্রেমসাধনার অবলম্বন; খ. শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী এক, কিন্তু চৈতন্যোত্তর পদাবলিতে পৃথক; গ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ায়ি রাধাকৃষ্ণের একমাত্র প্রণয়-সাধিকা, কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী পদাবলিতে ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি একাধিক সখীর কথা আছে; ঘ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা মানবী নায়িকা—অজ্ঞাতযৌবনা মুগ্ধাবস্থা থেকে প্রগল্‌ভ অবস্থায় তাঁর বিবর্তন। কিন্তু পদাবলিতে রাধা প্রথম থেকেই কৃষ্ণে সমর্পিতা। এ সব বৈশিষ্ট্য থেকে মনে করা চলে যে, চৈতন্য-প্রভাবিত ধর্মাদর্শ সমাজে প্রচলিত হওয়ার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত হয়েছিল।

ভণিতার ব্যাপারেও বড়ু চণ্ডীদাসের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তিনি কোথাও দ্বিজ ও দীন ভণিতা ব্যবহার করেন নি। ভাব ও ভাষাগত দিক থেকে বড়ু চণ্ডীদাস অন্যদের থেকে পৃথক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল পদাবলির তুলনায় প্রাচীন বলেও প্রমাণিত হয়েছে। এতে বড়ু চণ্ডীদাসের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাচীনত্বই স্বীকৃত হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গেই মিথিলার কবি বিদ্যাপতির সম্মিলন ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'এই কাব্যের সঙ্গে চৈতন্যদেবের কোন সম্পর্ক নাই, তবে মনে রাখিতে হইবে ইনি প্রায় সর্বত্র বড়ু ভণিতা দিয়াছেন, বাসলীকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও রামী রজকিনীর উল্লেখ করেন নাই,—এ কাব্যের কোথাও সহজিয়া মতের ইঙ্গিত মাত্র নাই। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাস রামী চণ্ডীদাস কাহিনির নায়ক নহেন।'

চণ্ডীদাস সমস্যা সমাধানে দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে অন্য একজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। ভাব ও ভাষা বিচারে দ্বিজ চণ্ডীদাস স্বতন্ত্র কবি। ড. সুকুমার সেনের মতে, এই 'চণ্ডীদাসের জীবৎকাল ১৫২৫ সালের এদিকে হইবে না।' দ্বিজ চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক বিচ্ছিন্ন পদাবলি রচনা করেছিলেন। তাঁর পূর্বরাগ আক্ষেপানুরাগ ও ভাবসম্মিলনের পদগুলো উৎকর্ষপূর্ণ। এ সব পদের ভাব ও আদর্শ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেব হয়ত তাঁর পদ আস্বাদন করতেন। বড়ু চণ্ডীদাসের মত দ্বিজ চণ্ডীদাসও যে বাসলী দেবীর সেবক ছিলেন তা তাঁর ভণিতা থেকে জানা যায়। দ্বিজ

চণ্ডীদাসের তারা নাম্নী রজকী সাধন-সঙ্গিনী ছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি মাত্র আরবি ফারসি শব্দ আছে, কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলিতে ব্যবহৃত আরবি ফারসি শব্দের সংখ্যা অনেক। এতে দ্বিজ চণ্ডীদাস যে পরবর্তী কালের তা প্রমাণিত হয়। দ্বিজ চণ্ডীদাসের দুটি পদে শ্রীচৈন্যদেবের উল্লেখ আছে। তাঁর একটি পদের ভণিতায় শ্রীরূপের নাম পাওয়া যায় বলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করেছেন, 'মনে হয় যে তিনি চৈতন্য-শিষ্য রূপ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।'

এরপর দীন চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখযোগ্য। মণীন্দ্রমোহন বসু মনে করেন দীন চণ্ডীদাসের পদগুলো দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলেছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পৃথক কবি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন দীন চণ্ডীদাসের প্রামাণিক ভণিতায় বাসলী দেবীর কোন উল্লেখ নেই, রজকিনী রামী বা নান্নুরেরও উল্লেখ নেই। দীন চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণযাত্রা রচনা করেছিলেন, কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত পদাবলি ভিন্ন কোন ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলাকাব্য রচনা করেন নি। তিনি ব্রজবুলিতেও কিছু পদ রচনা করেছেন। মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে ১৭০০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দীন চণ্ডীদাসকে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের লোক মনে করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে, দীন চণ্ডীদাস নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন এবং খুব সম্ভব সতের শতকের গোড়ার দিকের কবি। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'দীন চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে উপস্থিত ক্ষেত্রে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দীন চণ্ডীদাস নামক একজন স্বল্প-প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, যিনি রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে বিরাট পালা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনা অতিশয় নীরস, কবিত্ব প্রতিভা-বর্জিত, সাধারণ স্তরের লেখনী কুণ্ডয়ন মাত্র। মণীন্দ্রমোহন চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত যাবতীয় পদকে দীন চণ্ডীদাসের ক্ষীণ স্কন্ধে আরোপ করিয়াছেন, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।'

এ সব আলোচনা থেকে বড়ু, দ্বিজ ও দীন এই তিনজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কবিযশপ্রার্থী অনেক অখ্যাত কবি চণ্ডীদাসের ভণিতা প্রয়োগ করে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন তাতে সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চণ্ডীদাস সমস্যার এই জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ সহজিয়া চণ্ডীদাস নামে চতুর্থ চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা করেন। তিনি সহজিয়া মতের রাগাত্মিকা পদের লেখক ও পিরীতিমন্ত্রের সাধক। তাঁর সম্পর্কে নানা ধরনের গল্প কাহিনিও প্রচলিত আছে। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের অনুমান যে, সহজিয়া মতের বহু কবি চণ্ডীদাসের ভণিতায় রাশি রাশি পদ জড়ো করে অনাবশ্যক জঞ্জালের স্তূপ বৃদ্ধি করেছেন।

চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কিত মতবাদগুলো সংক্ষেপে এরূপ দাঁড়ায় : ড. দীনেশচন্দ্র সেন অভিন্ন চণ্ডীদাস মনে করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই মতের সমর্থক। বসন্তরঞ্জন রায় পদাবলি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিকে এক ব্যক্তি ধরেছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু ও ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চৈতন্যপূর্ব বড়ু চণ্ডীদাস এবং চৈতন্যপরবর্তী দীন বা দ্বিজ একজন পদাবলির চণ্ডীদাস মানেন। ড. সুকুমার সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ছাড়া দ্বিতীয় কোন উল্লেখযোগ্য চণ্ডীদাসের অস্তিত্বে সন্দিহান। ড. বিমানবিহারী মজুমদার তিনজনের বেশি চণ্ডীদাসের কথা

বলেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়াও পদাবলির দুই চণ্ডীদাস দ্বিজ ও দীন স্বীকার করেন। এ ধরনের আরও মতামত রয়েছে। তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতানুযায়ী চৈতন্যপূর্বযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, পদাবলির দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং চৈতন্যপরবর্তী পদাবলির দীন চণ্ডীদাস—এই তিনজনকে স্বীকার করতে হয়।

চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে পণ্ডিতেরা মতানৈক্য দূর করতে সক্ষম হন নি। দৃঢ় নিশ্চয়তাসহ সমাধান দেওয়ার মত উপাদানের এখনও অভাব। মধ্যযুগের বিস্তৃত পরিসরে প্রায় চার শ বছর ধরে চণ্ডীদাস নামধারী কবিগণ কবিতা রচনা করেছেন। পাঠক-হৃদয় জয় করার বিস্ময়কর ক্ষমতার গুণে যুগ যুগ ধরে তাঁদের পদ সমাদৃত হয়েছে। কবিতার রসের দিকে পাঠকের যত আকর্ষণ ছিল, কবির জীবন-তথ্যের প্রতি তাদের তত মনোযোগ ছিল বলে মনে হয় না। তাঁদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহে জটিলতা বিদ্যমান বলে চণ্ডীদাস সমস্যা বাংলা সাহিত্যে একটি রহস্যজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝাইয়া দাও এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে বেশ কয়েকজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে। এই জটিলতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া সম্ভাব্য সমাধান নির্দেশ কর।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'চণ্ডীদাস সমস্যা' একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। সমস্যাটিকে পরীক্ষা করিয়া তোমার বক্তব্য পেশ কর।

৪। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথি আবিষ্কারের পর উদ্ভূত চণ্ডীদাস সমস্যার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে কি? এই বিষয়ে যুক্তিনির্ভর বক্তব্য পেশ কর।

৫। চণ্ডীদাস সমস্যা কি? ইহার যুক্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে একটি তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ রচনা কর।

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থান নির্ণয় কর।

৭। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কারের ফলে চণ্ডীদাস সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়া পড়িয়াছে।' কেন? এ সমস্যার যুক্তিপূর্ণ সমাধান কি আলোচনা কর।

৮। চণ্ডীদাস সমস্যার সূত্রপাত হইল কিভাবে? বিভিন্ন ঐতিহাসিকের অভিমত আলোচনা করিয়া এই সমস্যার সুসঙ্গত মীমাংসা কর।

৯। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় জটিল চণ্ডীদাস সমস্যা জটিলতর হয়।'—আলোচনা কর।

১০। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছে তার বিবরণ দাও।

১১। টীকা লিখ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাস, বড়াই।

অষ্টম অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলি

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে এই অমর কবিতাবলির সৃষ্টি এবং বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদের সম্প্রসারণে এর ব্যাপক বিকাশ। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বৈষ্ণব গীতিকবিতার ধারা প্রবাহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ষোল-সতের শতকে এই সৃষ্টিসম্ভার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষপূর্ণ ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল বৈষ্ণব পদাবলি।

পদাবলি সাহিত্য বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণবসমাজে মহাজন পদাবলি এবং বৈষ্ণব পদকর্তাগণ মহাজন নামে পরিচিত। বৈষ্ণবমতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই প্রেম সম্পর্ককে বৈষ্ণব মতাবলম্বীগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার রূপকের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন। রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের রূপাশ্রয়ে ভক্ত ও ভগবানের নিত্যবিরহ ও নিত্যমিলনের অপরূপ আধ্যাত্মিক লীলা কীর্তিত হয়েছে। বৈষ্ণবদের উপাস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর আনন্দময় তথা প্রেমময় প্রকাশ ঘটেছে রাধার মাধ্যমে। রাধা মানবী নয়, শ্রীকৃষ্ণরূপ পূর্ণ ভগবৎ-তত্ত্বের অংশ। ভগবানের লীলা চলে তাঁর স্বরূপভূতা শক্তি রাধার সঙ্গে। বৈষ্ণবেরা ভগবান ও ভক্তের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকে পরামাত্মা বা ভগবান এবং রাধাকে জীবাত্মা বা সৃষ্টির রূপক মনে করে তাঁদের বিচিত্র প্রেমলীলার মধ্যেই ধর্মীয় তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। ফলে 'এক প্রাচীন গোপজাতির লোকগাথার নায়ক প্রেমিক কৃষ্ণ এবং মহাভারতের নায়ক অবতার কৃষ্ণ কালে লোকস্মৃতিতে অভিন্ন হয়ে উঠেন। গোপী-প্রধানা রাধার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ই জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রণয়লীলার রূপক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে ধর্ম-দর্শনের ও সাধন-ভজনের অবলম্বন হয়েছে।' নীলরতন সেন মন্তব্য করেছেন, 'পদাবলির কাহিনি, তথ্য উপকরণ এবং ভক্তি-ভাবাশ্রিত সৌন্দর্য চিত্রায়ণে বৈষ্ণব কবিরা উপনিষদ, হালের গাথাসপ্তশতী, আভীর ও অন্যান্য জাতির মৌলিক প্রেমগাথা, ভাগবতসহ বিবিধ পুরাণ, বাৎসায়নের কামসূত্র, অমরুশতক, আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিতাবলী, সূক্তিমুক্তাবলী প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ, লোকধর্ম ও প্রেমগীতিকে আশ্রয় করে ভারতের পূর্বাচার্যদের অনুসৃত পথেই অগ্রসর হয়েছেন।

চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) যুগান্তকারী আবির্ভাবের পূর্বেই রাধাকৃষ্ণ প্রেম-লীলার মাধুর্য পদাবলিগানের উপজীব্য হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রভাবে যে নব্য মানবীয় প্রেমভক্তিধারার বিকাশ ঘটে তা অবলম্বনেই বিপুল ঐশ্বর্যময় পদাবলি সাহিত্যের সার্থকতর রূপায়ণ সম্ভবপর হয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গানে ভক্তিরসের রং লাগলেও তা থেকে আদিরসের ক্লেদ দূর হয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ভক্তহৃদয়ের প্রতিফলন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বৈষ্ণব ধর্মমতকে কেন্দ্র করে যে বৈচিত্র্যধর্মী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তাকে বৈষ্ণব সাহিত্য নামে চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে আছে চৈতন্যদেব ও কয়েকজন প্রধান অনুচরের জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত জীবনী সাহিত্য, বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ এবং পদাবলি। কাব্যগত উৎকর্ষের দিক থেকে অপরাপর বৈষ্ণব সাহিত্যের চেয়ে পদাবলির স্থান সর্বোচ্চে।

পদাবলির কবিগণ বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের পটভূমিকার অপূর্বসুন্দর পদগুলো রচনা করেছিলেন। ভক্তহৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে এ সব পদের মাধ্যমে। কবিহৃদয়ের অকৃত্রিম অনুভূতির প্রকাশ এবং এর সর্বজনীন আবেদনের জন্য পদাবলি গীতিকবিতার মর্যাদালাভের যোগ্য। পদাবলি শুধু কবিতাই নয়, গান হিসেবেও এদের বিশেষ মর্যাদা আছে। পদকর্তাগণের রচিত এসব কবিতা সুরের মাধ্যমে যখন মানবহৃদয়ে অনির্বচনীয় ভাবাবেগের সৃষ্টি করে তখন তাকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার মর্যাদা দেওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলির মধুর রসের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের রূপকাশ্রয়ে ভক্ত ও ভগবানের নিত্য বিরহমিলনের যে লীলাবৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য নিহিত। আধুনিক গীতিকবিতায় কবিহৃদয়ের বিচিত্র ভাবের ছন্দোময় প্রকাশ ঘটে। একান্ত ব্যক্তিক হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসে সমৃদ্ধ যে গীতিকবিতা তাতে থাকে নানা বিষয়ের সমাবেশ। সৌন্দর্য আনন্দ-বেদনা প্রেম-প্রীতির ব্যক্তিগত উপলব্ধি গীতিকবিতায় স্থান পায়। বস্তুর সঙ্গে কবির আত্মিক সংযোগ সাধিত হয়ে কাব্যরূপের সৃষ্টি হয়। তবে গীতিকবিতার বিরহ-ব্যাকুল বেদনাঘন রোমান্টিক আবেদন বৈষ্ণব কবিতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। আধুনিক গীতিকবিতার ব্যক্তিহৃদয়ের ভাবের যে নব নব ব্যঞ্জনা থাকে পদাবলির ধর্মীয় আবেষ্টনীর মধ্যে তা অনুপস্থিত। বৈষ্ণবতত্ত্বের অনুশাসন মেনে এসব কবিতা রচিত। গোষ্ঠীগত চেতনায় কবিরা ছিলেন উদ্বুদ্ধ। তাই সেখানে স্বাধীন স্বকীয় কল্পনার কোন অবকাশ নেই। বৈষ্ণব কবিতার প্রকাশরীতির দিক থেকে কোন বৈচিত্র্য নেই—যা আধুনিক গীতিকবিতায় সহজেই প্রত্যক্ষ করা চলে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই পদাবলির উপজীব্য, কিন্তু বিষয় বৈচিত্র্য গীতিকবিতার প্রধান দিক। তাই বৈষ্ণব পদাবলি গীতিকবিতার পর্যায়ভুক্ত হলেও তা আধুনিক গীতিকবিতা নয়। বৈষ্ণব কবিতা ও শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় ভাবগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য যেমন রয়েছে, তেমনি রূপ ও রীতিগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান।

বৈষ্ণব কবিতায় বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এ সব কবিতায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে তা থেকে ধর্মীয় রূপকের আবরণ সরিয়ে নিলে তাকে বাস্তব সংসারে সাধারণ নরনারীর প্রেমলীলা বলে সহজেই মনে হবে। কৃষ্ণের রূপ দেখে রাধার প্রেমতপ্ত হৃদয়ের সীমাহীন আকুলতা, তাদের পূর্বরাগ অনুরাগ অভিসার প্রভৃতি বিচিত্র পর্যায় বাস্তব মানবমানবীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছেন—'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!' তিনি মানবমানবীর প্রেমসম্পর্ককেই পদাবলিতে প্রতিফলিত দেখেছেন এবং তার মাধ্যমে ভক্তহৃদয় ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বৈষ্ণব কবিতায়' লিখেছেন :

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!
পূর্বরাগ অনুরাগ, মান-অভিমান,

অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবনগাথা—এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারিচক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে—এ কি শুধু দেবতার!
এ সংগীত রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা?

বৈষ্ণব পদাবলি লৌকিকের পথ ধরে অলৌকিক রসস্বরূপ পরম পুরুষের অনুভূতি মানবহৃদয়ে সঞ্চার করে দেয়। ধর্মীয় তাৎপর্যের বাইরে পদাবলিতে অপূর্ব মানবিক আবেদন বিদ্যমান। রাধা ও কৃষ্ণকে নিছক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করলে তাঁদের প্রেমলীলা বাস্তব নরনারীর জীবনেরই পরিচয় ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলি কেবল মর্ত্যবাসনার কাব্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে না, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নিগূঢ় রসতত্ত্ব ও সাধনপ্রণালী তাকে বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'বৈষ্ণব পদাবলিকে পুরাপুরি মর্ত্যপ্রেমের নিরিখে বুঝা যাইবে না, আবার শান্ত রসাস্পদ ভক্তির নিরাকাঙ্ক্ষা আত্মনিবেদনও ইহার একমাত্র পরিচয় নহে—উভয়ের সংমিশ্রণে, প্রেমের বিষামৃতের তীব্রতায় ইহা অনন্যসাধারণ। শ্রীরাধার অঙ্গাবরণের এক পিঠে রসরঙ্গের রক্তিম উচ্ছ্বাস, আর এক পিঠে গৈরিক বৈরাগ্য। বৈষ্ণব পদাবলি প্রেমের গান—স্বয়ং রাসরসশেখর শ্রীভগবান যে প্রেমের নায়ক; বৈষ্ণব পদাবলি ভক্তির গান—মর্ত্যবাসনাজর্জর আদিরসের সঙ্গে যে ভক্তির সহজ মিতালি।'

রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে যে আনন্দের ভাবটি কবির কবিতায় রূপ লাভ করে বক্তব্যকে কাব্য করে তুলেছে তাতে গোষ্ঠীগত চেতনার স্পর্শ রয়েছে। সেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতির ভূমিকা স্পষ্ট না হলেও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখের অতুলনীয় পদাবলিতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে গীতিকাব্যের স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, 'কবিরা পৃথিবী আঁকিয়াছেন এবং স্বর্গও আঁকিয়াছেন—কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা পৃথিবী ও স্বর্গ এক করিয়া দেখাইয়াছেন।' ভক্তি ও ভালবাসা এখানে এক হয়ে আছে।

ব্রজবুলি

বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশই রচিত হয়েছে 'ব্রজবুলি' নামে এক কৃত্রিম মিশ্র ভাষায়। মূলত মৈথিলি ও বাংলা মিশ্রিত এই মধুর সাহিত্যিক ভাষায় রচিত পদাবলি থেকে জনসাধারণ ধারণা করেছে যে, বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ সম্ভবত এ ভাষাতেই কথা বলত। তাই ব্রজের বুলি অর্থে ব্রজবুলি এই কাল্পনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বিদ্যাপতি মৈথিল অপভ্রংশ মিশ্রিত একটি কৃত্রিম সুললিত ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেন।

প্রকৃতপক্ষে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদের ভাব ও ভাষার অনুসরণে বাংলা উড়িষ্যা ও আসামে পনের শতকের শেষ ভাগে ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি হয়। মৈথিলি ভাষার ক্রমরূপান্তর হিসেবে এ ভাষার বিকাশ। ব্রজলীলা সম্পর্কিত পদের ভাষা অর্থে এই ভাষা ব্রজবুলি নামে পরিচিত। ব্রজবুলি কখনও মুখের ভাষা ছিল না; সাহিত্যকর্ম ব্যতীত অন্যত্র এর ব্যবহারও নেই। এই কবিভাষা পদাবলিতে ব্যবহৃত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মৈথিলি ও বাংলার সংমিশ্রণে এতে ধ্বনিঝঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে।

ড. সুকুমার সেনের মতে, 'অবহট্‌ঠ থেকেই ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছে। বাংলা মৈথিলি হিন্দি রাজস্থানি গুজরাটি প্রভৃতি ভাষাগুলি অল্পবিস্তর পূর্ণ পরিণত রূপ ধরবার পরেও অবহট্‌ঠের আদর কমেনি দরবারি সাহিত্যে, বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণ পদাবলিতে। এই পরবর্তী অবহট্‌ঠ যার ওপর মৈথিলি প্রভৃতি স্থানীয় ভাষার প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রজবুলি রূপ নিয়েছিল। সুরদাস প্রভৃতি প্রাচীন ব্রজভাষা-কবিদের রচনায় যে অল্প-স্বল্প অহিন্দি শব্দ ও পদ আছে তা এই পরবর্তী অবহট্‌ঠ বা প্রাচীন ব্রজবুলি যাই বলি-না কেন তার। সুতরাং ব্রজবুলি কোন প্রদেশবিশেষের সম্পত্তি নয়, তা আর্যভাষার সাধারণ সম্পত্তি এবং এক হিসেবে কনিষ্ঠতম সর্বভারতীয় সাধুভাষা।'

ব্রজবুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

১। তিনটি শ, ষ, স-এর পরিবর্তে একটি মাত্র 'স'-এর ব্যবহার।
২। ব্যঞ্জনধ্বনি বর্জন ও স্বরধ্বনির ব্যবহার প্রবণতা।
৩। অ-আ, ই-ঈ, উ-ঊ-এর হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণে ও লিখিত বানানে খুবই শৈথিল্য ছিল।
৪। য এবং ব-এর অন্তস্থ 'ইয়' 'ওয়া' উচ্চারণ লোপ পেয়েছে।
৫। ভিন্ন দুই যুক্ত ব্যঞ্জন অনেক সময় এক ব্যঞ্জনের দ্বিত্বে রূপান্তরিত হয়েছে।
৬। অনেক সময় দুই যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি লোপ পেয়েছে।
৭। ধ্বনি পরিবর্তনের, বিশেষ করে বিপ্রকর্ষ ও স্বরসংগতির যথেষ্ট উদাহরণ মিলে।
৮। আনুনাসিক উচ্চারণ কম।
৯। সম্প্রদানের পৃথক রূপ নেই।
১০। সমাসবদ্ধ বিভক্তিহীন সম্বন্ধ পদের যথেষ্ট ব্যবহার।
১১। তৎসম ও তদ্ভব শব্দই বেশি ব্যবহৃত।

'পনের শতকেই মিথিলা, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে পদাবলি রচনার রীতি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। আসামে পনের শতকের বিখ্যাত কবি শঙ্করদেব এবং ষোল শতকে তাঁর শিষ্য মাধবদেব ব্রজবুলিপদ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিলেন। উড়িষ্যায় ব্রজবুলি পদ রচনার কৃতিত্ব চৈতন্য-সুহৃদ রামানন্দ রায়ের; আর বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রাচীন ব্রজবুলি পদের রচয়িতা হলেন যশোরাজ খান। অবশ্য বাংলাদেশই ব্রজবুলি পদরচনার উর্বর ক্ষেত্র। এত বেশি ব্রজবুলি পদ অন্য কোনো প্রদেশে রচিত হয় নি। ড. সুকুমার সেন বলতে চান, ব্রজবুলি বাংলার একটি উপভাষা, তবে কথ্য নয়, সাহিত্যিক এবং এই উপভাষার রসপুষ্টিও ঘটেছে বাংলা ভাষার আশ্রয়ে এবং বাঙালি

কবিদের হাতে। ব্রজবুলি মৈথিলি ও বাংলার সংমিশ্রণ— এতে আছে সংস্কৃত শব্দের আধিক্য, সেইসূত্রে কিছু হিন্দি শব্দও এতে পাওয়া যায়; আর এতে প্রচুর অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহারও হয়েছে ছন্দ-ধ্বনির অনুরোধে। এই ভাষা আঞ্চলিক নয়, সর্বজনীন; ছন্দে ও ধ্বনিতে আছে ললিত কোমল মাধুর্য, সেজন্য ব্রজবুলি কীর্তনেরও উপযোগী। চৈতন্যের মৃত্যুর পর লীলাকীর্তনের আসর জমে উঠেছিল ব্রজবুলি পদের কল্যাণে।'

বিদ্যাপতির প্রভাবে বাংলাদেশে পদাবলি রচনায় ব্রজবুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গোবিন্দদাস ব্রজবুলিতে বহু সংখ্যক প্রথম শ্রেণির পদ রচনা করেছিলেন। তাছাড়া জ্ঞানদাস, বলরামদাস, জগদানন্দ, রায়শেখর প্রমুখ কবিগণের রচিত ব্রজবুলি পদ রয়েছে। গোবিন্দদাসের পদের একটি অংশ :

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরী বারী ঢারি করু পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥

এদেশে বৈষ্ণবচেতনা জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাব্যের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তার রসমূর্তি রূপায়িত হয় সহজ প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে। শ্রীচৈতন্যদেবের দৃষ্টিতে ভগবান মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর মতে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সহজ মানবীয় প্রেমসাধনায় চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে নবপ্রাণের সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর প্রভাবে সমগ্র বাংলাদেশ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হয়। চৈতন্যদেবের জীবনলীলার প্রেমময় অবলম্বনে বিরাট বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায় গড়ে ওঠে এবং তাঁদের ভক্তহৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে অজস্র পদাবলির মাধ্যমে।

বৈষ্ণব সাহিত্য একসময় এদেশে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার মনে রসের তরঙ্গ তুলেছিল। বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে বিশেষ সহায়তা দান করে। তাছাড়া বাংলার ধর্মে সমাজে সংস্কৃতি ও মননে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম। বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ফলে এদেশে বৈষ্ণব মতবাদের সম্প্রসারণ ঘটে।

বৈষ্ণব মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল মতবাদ সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়েছিল। বৈষ্ণব মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শাক্ত সম্প্রদায়ে ভক্তিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে এবং প্রধানত বাৎসল্যরসাশ্রিত শাক্ত পদাবলি রচিত হয়। মুসলমানেরাও রাধাকৃষ্ণকে জীবাত্মা-পরমাত্মা, দেহমনের এবং ভক্ত ভগবানের রূপ হিসেবে গ্রহণ করে পদ রচনা ও আস্বাদন করেছে। লৌকিক প্রণয়গীতিতে নায়িকা অর্থে 'রাই' এবং নায়ক অর্থে 'কালা' সাধারণ রূপে গৃহীত হয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলির উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। পদগুলোকে বৈষ্ণবরসতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। যেমন : গৌরাঙ্গ বিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কালিয়দমন, পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, ভাবসম্মিলন ইত্যাদি। নায়িকা রাধার অবস্থাভেদে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, যেমন : অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা।

পদাবলির সকল রচনা এখনও সংগৃহীত হয় নি। সংগৃহীত পদের সংখ্যা সাত আট হাজার। পদকর্তার সংখ্যা দেড় শতাধিক। তার মধ্যে কয়েকজন মুসলমান কবিও পদাবলি রচনা করেছিলেন।

কবিরা পদের শেষে ভণিতা ব্যবহার করেছেন। অনেক সময় নিজের নাম উল্লেখ না করে বিশেষণ প্রয়োগে ভণিতার ব্যবহার দেখা যায়। নব জয়দেব, কবি কণ্ঠহার, কবিশেখর ইত্যাদি ভণিতা কবি বিদ্যাপতির। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক কবি একই ভণিতা ব্যবহার করেছেন। পাঁচ জন চণ্ডীদাস, দু জন বিদ্যাপতি, ছয় জন গোবিন্দদাস এবং পাঁচ জন বলরাম দাসের পরিচয় পদাবলির ভণিতা থেকে পাওয়া যায়। ভণিতায় কবির বিনয়াবনত মনের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। কখনও কবির পৃষ্ঠপোষকের কথাও তা থেকে জানা যায়। সে হিসেবে ইতিহাস ও ধর্মাবেগের জন্য ভণিতাগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলায় প্রচলিত পদাবলির দুটি সুস্পষ্ট ভাগ রয়েছে। একটি চৈতন্য পূর্ববর্তী কবিগোষ্ঠী—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস এবং অপরটি চৈতন্য পরবর্তী কালে বিকাশ লাভ করে।

গবেষকগণের মতে, 'চৈতন্যপূর্বযুগের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলি রচনার সুস্পষ্ট ধারার সূচনা সংস্কৃত ভাষার কবি জয়দেব থেকেই। পরবর্তীকালের কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস জয়দেবের পদাবলির বিষয়বস্তু ও কাব্যকলা কমবেশি অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁদের রচনা পদাবলির ধারাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। পদাবলি সাহিত্যের এই কবিদের অবদান বড় সন্দেহ নেই, তবু বলতে হয় বৈষ্ণব পদাবলির রূপ ও রসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয় চৈতন্যের প্রভাবে। চৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ পদাবলিকে ভক্তিরসাশ্রিত সাহিত্যের নতুন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করে।'

বিদ্যাপতি

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি বাঙালি না হয়েও অথবা বাংলায় কবিতা রচনা না করেও 'বাঙালি বৈষ্ণবের গুরুস্থানীয়, রসিক বাঙালির শ্রদ্ধেয় কবি, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকদের নবরসিকের অন্যতম।' 'মৈথিল কোকিল' ও 'অভিনব জয়দেব' নামে খ্যাত এই বিস্ময়কর প্রতিভাশালী কবি একাধারে কবি, শিক্ষক, কাহিনিকার, ঐতিহাসিক, ভূবৃত্তান্ত-লেখক ও স্মার্ত নিবন্ধকার হিসেবে ধর্মকর্মের ব্যবস্থাদাতা ও আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থের লেখক ছিলেন। তাঁর অন্যান্য উপাধি ছিল—নব কবিশেখর, কবিরঞ্জন, কবিকণ্ঠহার, পণ্ডিত ঠাকুর, সদুপাধ্যায়, রাজপণ্ডিত ইত্যাদি।

বিদ্যাপতি নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তাঁর কবিতায় কিছু বলেন নি। বিভিন্ন গবেষকের তথ্য থেকে জানা যায় বিদ্যাপতি দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত বিসফী নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাপতির জীবনকথা মিথিলার রাজবংশের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত ছিল। বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্রের মতই নাগরিক জীবনের কবি। বিদ্যাপতির কবিতা রসজ্ঞ রাজন্যবর্গ ও রাজসেবক কর্মচারিগণের রসতৃষ্ণা মিটানোর জন্য রচিত হয়েছিল। অপরদিকে স্মার্ত পণ্ডিত হিসেবে মিথিলার শিথিলীকৃত ব্রাহ্মণ সমাজকে নতুন করে নিয়মপাশে বদ্ধ করার প্রয়োজনে স্মৃতি সংহিতার বিধিনিষেধকে

পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। কবি, রসিক, পণ্ডিত ও ভাষার যাদুকর বিদ্যাপতি সংস্কৃত অবহট্‌ঠ ও মৈথিল বুলিতে তাঁর জ্ঞান, চিন্তা, রসবোধ ও কাব্যকুশলতার সার্থক পরিচয় দান করেছেন।

ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, বিদ্যাপতি সম্ভবত ১৩৮০ থেকে ১৪৬০ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, ১৩৯০ থেকে ১৪৯০ সালের মধ্যেই বিদ্যাপতির জীবন আবর্তিত হয়েছে। ড. আহমদ শরীফ বিস্তারিত যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, বিদ্যাপতি ১৩৬০-৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৫৫ সালের মধ্যে পরলোকগমন করেন।

সংস্কৃতে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল, অপভ্রংশে তিনি 'কীর্তিলতা' নামে ঐতিহাসিক কাব্য লিখেছিলেন, বিভিন্ন বিষয়ে সৃষ্টিবৈচিত্র্য তাঁকে বিশিষ্ট করেছে; কিন্তু নিজ মাতৃভাষা মৈথিলিতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক যে অত্যুৎকৃষ্ট পদাবলি রচনা করেছিলেন তা-ই তাঁকে অমরতা দান করেছে। তাঁর পদাবলি বাংলা আসাম উড়িষ্যা ও পূর্ববিহারে সমাদৃত। দীর্ঘ ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যাপতি কবিতা লিখেছেন, দশ-বার জন শাসকের উত্থানপতন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি পদাবলি রচনা করলেও কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন শৈব। কারও মতে পঞ্চোপাসক। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল বলে বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা চলে না; তবে কবি হৃদয়ের নিবিড় আকূতি বৈষ্ণব পদাবলিতেই তিনি প্রতিফলিত করেছেন। বিদ্যাপতি তাঁর কবি জীবনে বিভিন্ন শাসকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। রাজা শিবসিংহের আমলে রচিত কবিতায় যে পরিমাণে 'বিলাস-কলাকুতূহল, নর্মলীলার উল্লাস এবং আনন্দোজ্জ্বল জীবনের প্রাচুর্য' দেখা যায় তা পরবর্তী কালের রচনায় অনুপস্থিত।

বিদ্যাপতি রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থ রচনার আদেশদাতাগণের তালিকা :

গ্রন্থ	আদেষ্টা
১. কীর্তিলতা	কীর্তিসিংহ [১৪০২-০৪]
২. কীর্তিপতাকা	রূপনারায়ণ
৩. পুরুষপরীক্ষা	শিবসিংহ [১৪১০-১৫ খ্রিঃ]
৪. গোরক্ষবিজয় [নাটক]	
৫. ভূপরিক্রমা	গরুড়নারায়ণ দেবসিংহ [১৪১৬-১৭ খ্রিঃ]
৬. শৈবসর্বস্বসার	পদ্মসিংহ ও তৎপত্নী বিশ্বাসদেবী [১৪১৮-২৫ খ্রিঃ]
৭. গঙ্গাবাক্যাবলী	
৮. লিখনাবলী	দ্রোণবারের রাজা পুরাদিত্য [১৪২৮ খ্রিঃ]
৯. বিভাগসার	দর্পনারায়ণ নরসিংহ [১৪৩০-৫৫ খ্রিঃ]
১০. দানবাক্যাবলী	নরসিংহ পত্নী ধীরমতী
১১. দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী	কংসনারায়ণ ধীরসিংহ
	ভৈরবসিংহ [রূপনারায়ণ ও হরিনারায়ণ]

১২. ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী দর্পনারায়ণ নরসিংহ
১৩. বর্ষকৃত্য বা ক্রিয়া—অপ্রাপ্ত।
১৪. গয়াবাক্যাবলী বা গয়াপত্তন—অপ্রাপ্ত।

বাংলাদেশে বিদ্যাপতি প্রধানত পদকর্তারূপে পরিচিত। কিন্তু তাঁর প্রতিভা দিগবিস্তারী ও বহু ব্যাপক ছিল বলে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থও তাঁকে অমর করে রাখার জন্য যথেষ্ট।

বিদ্যাপতি বিচিত্র বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর 'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী' পাণ্ডিত্য-বিচার সম্বলিত স্মৃতিগ্রন্থ। 'বর্ষক্রিয়া', 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী', 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' পৌরাণিক হিন্দুর পূজা ও সাধনপদ্ধতির সঞ্চয়ন। 'কীর্তিলতা', 'কীর্তিপতাকা' উৎকৃষ্ট ইতিহাসগ্রন্থ। 'ভূপরিক্রমা' ভৌগোলিকের তীর্থ পরিক্রমা। 'পুরুষপরীক্ষা' মণীষা ও শিল্পকৃতির সমন্বয়রূপ কথাসাহিত্য। 'লিখনাবলী' অলঙ্কার শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ।

মাতৃভাষা মৈথিলি ছাড়া আরও তিনটি ভাষায় তিনি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

১. বিদ্যাপতির স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ ও পুরুষপরীক্ষা সংস্কৃত ভাষায় লেখা।
২. কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা অবহঠট ভাষায় রচিত।
৩. বাংলাদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতি পদাবলির ভাষা ব্রজবুলি।

বিদ্যাপতি সহস্রাধিক পদাবলি রচনা করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে এমন পদের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। অন্যগুলোতে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ না থাকলেও তাদের প্রেমলীলা বিষয়ক পদ হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা নেই। বিদ্যাপতির কাব্যে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রতিফলিত হয় নি, তিনি এই অলৌকিক প্রেমকাহিনিকে মানবিক প্রেমকাহিনি হিসেবে রূপ দিয়েছেন। নারী-পুরুষের কাম-প্রেম সম্পৃক্ত এমন সূক্ষ্ম, বহুধা ও বিচিত্র অনুভব জগতের আর কোন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতিই কাম-প্রেম রসের বিচিত্র বর্ণালি জগতের প্রথম ও প্রধান সার্থক স্রষ্টা। নবোদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী রাধার বয়ঃসন্ধি থেকে কৃষ্ণবিরহের সুতীব্র আর্তি বর্ণনা বিদ্যাপতির কবিতার উপজীব্য। রাধা চরিত্রের পরিকল্পনায় অপূর্ব কবিত্বের পরিচয় দিয়ে কবি কামকলায় অনভিজ্ঞা বালিকা রাধাকে শৃঙ্গাররসের পূর্ণাঙ্গ নায়িকায় রূপান্তরিত করেছেন, প্রগাঢ় প্রেমানুভূতিতে দেহমনকে আচ্ছন্ন করে রাধার মনে ভাবান্তর এনেছেন, কৃষ্ণবিরহের তন্ময়তায় রাধার বিশ্বভুবন বেদনার রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যাপতির পদাবলিতে ধর্মীয় আবেগের চেয়ে রসবোধই বেশি প্রকাশিত হয়েছে। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের বিচিত্র লীলা কবির কাছে আকর্ষণীয় বিবেচিত হয়েছিল বলে তিনি রাধা-কৃষ্ণলীলার পদই বেশি রচনা করেছিলেন।

বিদ্যাপতির পদে শাশ্বত কালের কলাকুতূহলপূর্ণা রহস্যময়ী নায়িকার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীরচঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তদেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানশীলতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়া

যায় না।' বিদ্যাপতি যে বিপুল সংখ্যক পদে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা রূপায়িত করেছেন, তার মধ্যে রাধার বয়ঃসন্ধি, অভিসার, প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ, বিরহ ও ভাবসম্মিলনের পদগুলো বিশেষ উৎকর্ষপূর্ণ। মিথিলার ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজসভায় বিদ্যাপতি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ভাষা ভাব শব্দ ছন্দ ও অলঙ্কারের খনি থেকে রত্নরাজি আহরণ করে রাধার প্রেম বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'বিদ্যাপতির কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির গান মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি।' আর রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির কাব্যকে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' বলে অভিহিত করেছেন। ছন্দে অলঙ্কারে শব্দবিন্যাসে ও বাগবৈদগ্ধ্যে বিদ্যাপতির পদ 'হীরকখণ্ডের মত আলোক বিচ্ছুরণে সহস্রমুখী', আবার 'জীবনের আলো ও আঁধার, বিপুল পুলক ও অশান্ত বেদনা, রূপোল্লাস ও ভাবোন্মাদনা, মিলন ও বিরহ, মাথুর ও ভাব সম্মেলনে' তাঁর পদ আজও অতুলনীয়।

বিদ্যাপতির পদগুলো স্থানভেদে মর্যাদার তারতম্য ঘটেছে। মিথিলাবাসী ও হিন্দিভাষী পণ্ডিতগণ বিদ্যাপতির শৈব ও শাক্ত পদগুলোর ওপর সঠিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অপরদিকে বাংলাদেশে বিদ্যাপতির সব পদই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। বিদ্যাপতির পদাবলির শ্রেণিবিভাগ এ রকম : ক. রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, খ. হরগৌরী ও কালী বিষয়ক, গ. গঙ্গা বিষয়ক, ঘ. প্রহেলিকা জাতীয় এবং ঙ. দেবতা সম্পর্কবর্জিত বিভিন্ন ধরনের পদ।

বিদ্যাপতির ভণিতায় প্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক পদে রাধাকৃষ্ণ বা অনুরূপ কোন উল্লেখ নেই। এ ধরনের পদকে যে আদিরসাত্মক মানবপ্রেমের পদ বলে বিবেচনা করতে হবে এমন নয়। যেমন :

সহজ প্রসন মুখ দরস হৃদয় সুখ
লোচন তরল তরঙ্গ।
আকাশ পাতাল বস সেও বইসে ভেল অস
চাঁদ সরোরুহ সঙ্গ ॥
বিধি নিরমিল রামা দোসর লছমি সমা
ভাল ভুলাএল নিরমান।

আধুনিক বাংলা : 'স্বভাবতই প্রসন্ন মুখ, হৃদয়ে সুখ হয়, (নয়নের জ্যোতি) তরল তরঙ্গ। চাঁদ আকাশে এবং কমল পাতালে থাকে, উভয়ের একত্রবাস কেমন করে ঘটল? বিধাতা দ্বিতীয় লক্ষ্মীর মত করে রামাকে নির্মাণ করল, নির্মাণ কালে ভাল করে তুলনা করেছিল।'

এখানে রাধার উল্লেখ না থাকলেও তা যে রাধার অপূর্ব রূপলাবণ্যের ব্যঞ্জনা তা সহজেই বোঝা যায়।

বিদ্যাপতির কবিকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লক্ষ করেছেন :

১. তাঁর মননশীলতা ও মার্জিত বাচনভঙ্গি যা তাঁর আলঙ্কারিকতায় ও রূপনির্মিতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

২. তাঁর কাব্যের মানবিক আবেদন—ইন্দ্রিয়প্রধান দেহবর্ণনায় এবং নায়িকার চরিত্রচিত্রণে যার প্রকাশ।

৩. নায়িকার চরিত্রচিত্রণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা।

৪. ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জগৎ থেকে পরিণামে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে উপনীত হওয়া—বয়ঃসন্ধির রাধা, তৎপরবর্তী অবস্থার রাধার বর্ণনায় যার প্রকাশ।

বিদ্যাপতি পদাবলি রচনায় যে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর অসংখ্য পদে লক্ষ করা যায়। রাধার প্রেমলীলার বিচিত্র পরিচয় তাঁর পদে বিধৃত। এ প্রসঙ্গে কবির বর্ষাবিরহের শ্রেষ্ঠ পদটির উল্লেখ করা যেতে পারে :

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

আধুনিক বাংলা : 'সখি আমার দুখের শেষ নেই। এ ভরা বাদল, ভাদ্র মাস, আমার মন্দির শূন্য। চারদিকে ঝেঁপে মেঘ গর্জন করছে, ভুবন ভরে বর্ষণ হচ্ছে, কান্ত প্রবাসী, কাম দারুণ, সঘন খর শর হানছে। শত শত বজ্র পতিত হচ্ছে, আনন্দোন্মত্ত ময়ূর নাচছে, মত্ত দাদুরী আর ডাহুকী ডাকছে, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। চারদিকে ঘন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, ঘোর যামিনী, অস্থির বিদ্যুৎ পংক্তি। বিদ্যাপতি বলছেন, হরিবিনে এই দিবস রজনী কেমন করে কাটবে?'

ভাব ভাষা চিত্ররূপ অলঙ্কার ও ছন্দে পরবর্তী কালের অনেক পদকর্তা বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করেছেন।

চণ্ডীদাস

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস। তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলি যুগ যুগ ধরে বাঙালির হৃদয়কে সীমাহীন রসমাধুর্যে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। বাংলা সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাস নিয়ে জটিল চণ্ডীদাস সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

এর যথার্থ সমাধান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যত মতানৈক্যই থাকুক না কেন চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাবলির চণ্ডীদাসের বিস্ময়কর প্রতিভা সম্পর্কে কোনও মতবিরোধের অবকাশ নেই। চণ্ডীদাসের আবির্ভাবের স্থান ও কাল নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের এখনও অভাব রয়েছে। সম্ভবত তিনি চৌদ্দ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চণ্ডীদাসের বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচায়ক আশ্চর্য সুন্দর পদগুলোতে অপূর্ব ভাবতন্ময় কৃষ্ণপ্রেম-সাধিকা শ্রীরাধার যে মনোমুগ্ধকর চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে তা কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙালির রসপিপাসু মনের পরিতৃপ্তি সাধন করে যাচ্ছে। তাঁর পদাবলির 'অনাবৃত প্রাণের নিরাভরণ আনন্দ-বেদনায় মেদুর মুহূর্তগুলো পাঠকের মনে যে প্রশান্তি, স্নিগ্ধতা ও প্রাপ্তির আনন্দঘন উপলব্ধি সৃষ্টি করে' তার মূল্য অপরিসীম।

শিক্ষিত বাঙালি বৈষ্ণব সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেয়েছে চণ্ডীদাসের পদাবলি থেকে। কবি রাধার মনের বিচিত্র অনুভূতিকে আশ্চর্য সুন্দর ভাষায় রূপদান করে বাঙালির চিরদিনের সমাদর লাভের উপযোগী করে গেছেন। তাঁর পদাবলিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতির রূপকের মাধ্যমে সে ধর্মীয় চেতনা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি এর রূপকের বাইরে একটা সর্বজনীন ও সার্বভূমিক আবেদন বিদ্যমান। বেদনা আর ব্যাকুলতা এসব পদের মূল সুর বলে নিখিল মানবের হৃদয় এতে খুব সহজেই সাড়া দেয়। সচেতন শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস না দেখিয়ে নিরাভরণ বৈরাগ্যের মধ্যেও যে কাব্যগুণ চমৎকার প্রতিফলিত হতে পারে তা চণ্ডীদাসের পদে সহজেই লক্ষ করা যায়।

চণ্ডীদাস রাধাকে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারারূপে চিত্রিত করেছেন। দেহগত কামনা-বাসনা রাধাচরিত্রে প্রাধান্য পায় নি। কবি তাকে মর্ত্যলোক থেকে বহু দূরদুর্গম অধ্যাত্মতীর্থে স্থান দিয়েছেন। চণ্ডীদাস রাধার কামগন্ধহীন প্রেম অত্যন্ত সহজ সরল কথায় ছন্দে ও অলঙ্কার প্রয়োগে প্রস্ফুটিত করেছেন। কবি রাধার চরিত্রে মিলনের আনন্দের চেয়ে বিচ্ছেদের বেদনা তীব্রতর করে রূপ দিয়েছেন। কবি এই অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন :

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি ॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু-কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয় ॥
চাতক-জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল ॥
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে ॥

চণ্ডীদাস কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন এই বলে :

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয় ॥

চণ্ডীদাস শব্দঝঙ্কারে নিঃস্ব, তাঁর ভাণ্ডারে দু চারটি 'মাটির অলঙ্কার ও মাঠের ফুল ভিন্ন কোন হীরামাণিক্য' নেই। তিনি অলঙ্কারহীন, নিরাবরণ, জীবনের দুটি অশ্রুকলুষিত ব্যথিত দৃষ্টি উপহার দিয়েছেন—যা সহজেই মানব-হৃদয়ের গভীরে প্রভাব বিস্তার করে।

চণ্ডীদাস সহজ সরল ভাষায় অপার্থিব আত্মনিবেদনের পদ রচনা করেছেন :

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায় ॥
না ঠেলহ ছলে অহলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে যে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

চণ্ডীদাসের ভাষা জাতির হৃদয়কে সিক্ত করেছিল। এই ভাষা এখন পর্যন্ত আধুনিক বাংলা ভাষার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য, আড়ম্বর ও ভঙ্গিমার অভ্যন্তরে একটি ক্ষীণস্রোত নিত্য পুণ্যের রস সঞ্চার করে চলেছে। চণ্ডীদাসের ভাষা বাঙালির গভীরতম আবেগ-মুহূর্তকে স্পর্শ করেছে। এই ভাষাই বৈষ্ণব সাহিত্যের সাধারণ ভাষা। কবি এক অসামান্য

অন্তর্দৃষ্টিবলে বাঙালির ব্যবহৃত সংস্কৃত-প্রাকৃত আরবি-ফারসি ও দেশজ শব্দ সমুদ্রের ভেতর থেকে সেই মণিখণ্ডগুলো আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন যেগুলো হৃদয়ের নিকটবর্তী, অনুভূতির রেখাঙ্কিত এবং বহু নিভৃত স্বপ্নসাধ ও সাধনার স্মৃতিময় ভাষাপূর্ণ।

চণ্ডীদাসের কতকগুলো পংক্তি প্রবাদের মত :

১. কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে।
২. তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।
৩. চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে।
৪. গড়ন ভাঙিতে সই আছে কত খল।
ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল ॥
৫. বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা।
সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা ॥
৬. ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।
৭. পিরীতি আঠা ননদী কাঁটা পড়শী হৈল ফাঁসী।

বৈষ্ণব পদাবলির দুই অমর স্রষ্টা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনার জন্য রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'চণ্ডীদাসের রাধা মুগ্ধা নায়িকা নহেন—প্রেম-প্রৌঢ়া নারী। আপনার পূর্ণবিকশিত পরিণত প্রেমিক সত্তাটিকে লইয়া তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছিলেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগত বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি। চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতি অনুরাগ। বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার সৌন্দর্য বর্ণনার মাধুর্য আছে; কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। চণ্ডীদাসের পিরীতি গভীর দুঃখবেদনার পথেই সুখের সন্ধান করিতেছে। বিদ্যাপতির রাধা তরুণী নায়িকা, চণ্ডীদাসের রাধা প্রবীণা সাধিকা।'

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিস্ময়কর প্রতিভা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায় : 'বিদ্যাপতির কবিতা স্বর্ণহার, চণ্ডীদাসের কবিতা রুদ্রাক্ষমালা, বিদ্যাপতির গান মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি, চণ্ডীদাসের গান সায়াহ্ন সমীরণের দীর্ঘনিঃশ্বাস।' রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গি, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য; চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক। এই জন্য ছন্দ-সংগীত এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এই জন্য তাহাতে সৌন্দর্য সুখ সম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা।'

চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলির স্বরূপের পরিবর্তন হয় এবং তাঁর প্রভাবে পরবর্তীকালে পদাবলি সাহিত্যের সম্প্রসারণ ঘটে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে কোন কোন কবি পদ রচনা করে এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এ সময়ে চৈতন্য বিষয়ক কিছু পদাবলি রচিত হয়েছে। আবার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলিও রচিত

হয়েছে। এ সময়কার পদকর্তা হিসেবে মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন, রামানন্দ বসু প্রমুখের অল্প কিছু পদের নমুনা পাওয়া গেছে। এসব পদে বৈষ্ণব ধর্মীয় চেতনা যথার্থ ভাবে প্রতিফলিত হয় নি।

চৈতন্য পরবর্তী পদকর্তা

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলাদেশ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। তাঁর মৃত্যুর পর ষোল শতকের শেষার্ধে পদাবলি সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। বৈষ্ণব সমাজ শ্রীচৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতার বিবেচনা করে তাঁর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়ে এবং ভক্ত কবিগণ তাঁর ভাবাদর্শ কাব্যে রূপায়িত করে পদাবলি সাহিত্যের ঐশ্বর্য যুগের সৃষ্টি করেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পদাবলির যে দুটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেছিলেন পরবর্তী কবিগণ মোটামুটি তা-ই অনুসরণ করেছেন। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বলরামদাস এই পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞানদাস

সম্ভবত ষোল শতকে বর্ধমান জেলায় কবি জ্ঞানদাসের জন্ম। তিনি চণ্ডীদাসের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করে এবং তার সঙ্গে নিজের মৌলিক প্রতিভার সমন্বয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনার মাধ্যমে মানবমানবীর শাশ্বত প্রেমবেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি ছিলেন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। তিনি ব্রজবুলি ও বাংলায় পদ রচনা করেছিলেন, তবে বাংলা পদেই তাঁর কৃতিত্ব বেশি। জ্ঞানদাস পদাবলিতে সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা দিয়েছেন, আবেগের সূক্ষ্ম কারুকর্ম ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি মানবজীবনের বাতায়নে বসে ভাব বৃন্দাবনের কিশোর কিশোরীর লীলা প্রত্যক্ষ করে শিল্পী হয়ে উঠেছেন। তিনি তপস্বিনী রাধার মূর্তিটি নিরাভরণ ও নিরলঙ্কার ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়িকার রূপবর্ণনা, অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার তীব্রজ্বালা, মিলনের জন্য ব্যাকুলতা, মিলনের গভীর উল্লাস ও বিরহের মর্মস্পর্শী আর্তি কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদানের পদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। জ্ঞানদাস ছিলেন শিল্পী, আর চণ্ডীদাস ছিলেন সাধক। জ্ঞানদাস রাধার বেদনাকে পরিস্ফুট করে তুললেও তাকে 'হর্ষোৎফুল্ল মিলন-ব্যাকুলা সুরসিকা নায়িকা' হিসেবে রূপ দিয়েছেন। জ্ঞানদাস চৈতন্যপরবর্তী কবি বলে ভাবের বৈচিত্র্য দেখিয়েছিলেন। ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে জ্ঞানদাস যে লিরিক প্রেমবেদনার বিশিষ্ট অনুভূতির রূপ দিয়েছিলেন তাতেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। বিরহের মর্মস্পর্শী আর্তি ফুটে উঠেছে জানদাসের কবিতায় :

> রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
> প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
> হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
> পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥

জ্ঞানদাসের ভাষা সহজ, সরল, অলঙ্কারবর্জিত, কিন্তু প্রবল আবেগে পরিপূর্ণ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দার্শনিক তত্ত্ব ও মননশীলতা।

গোবিন্দদাস

সম্ভবত ষোল শতকের তৃতীয় দশকে গোবিন্দদাসের জন্ম এবং সতের শতকের দ্বিতীয় দশকে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি প্রায় সাত শ পদ রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে কিছু বাংলা পদ থাকলেও অধিকাংশ পদ ব্রজবুলিতে রচিত। বিদ্যাপতির ভাবাদর্শে তিনি বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন, বিদ্যাপতির অলঙ্কার ও চিত্রকল্প তাঁকে বিমুগ্ধ করেছিল। গোবিন্দদাস নিজের রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন :

রসনারোচন শ্রবণবিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥

কবির পদ শুধু রসনারোচন ও শ্রবণবিলাস হয়েই থাকে নি, বরং শব্দকল্পনা, অলঙ্করণ, রূপরীতি ও মঞ্জুল ঝঙ্কারের বাহনে কবির সৌন্দর্যকামী ও ভক্তিগত চেতনা যে সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা, চিত্রল প্রতীকতা ও সুরময় ধ্বনিরণন সৃষ্টি করেছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার কোন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

গোবিন্দদাসের পদাবলিতে রাধা চরিত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ করা যায়। তিনি ছিলেন ভক্তকবি। অভিসারের পদগুলোতে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পদের অপূর্ব বাণীঝঙ্কার, চিত্ররীতি, অলঙ্কার-নৈপুণ্য ও ছন্দের কারুকার্য তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। নীলরতন সেন মন্তব্য করেছেন, 'বিদ্যাপতির মত গোবিন্দদাসও সচেতন শিল্পী ছিলেন, ভাবতন্ময়তার তুলনায় বহিরঙ্গ রূপচিত্রণের প্রতি তাঁরও অনুরাগ কিছুমাত্র কম ছিল না। তবে চৈতন্যপূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতির পদে রাধারূপের বর্ণনায় মানবীয় প্রেম বিশ্লেষণে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভাবচিত্র লক্ষ করা যায়, চৈতন্য-পরবর্তী কবি গোবিন্দদাস সে সকল বর্ণনার ক্ষেত্রে ভক্তিতত্ত্বের প্রভাবে অনেকাংশে সংযত হয়েছেন, রূপদক্ষ শিল্পীর সঙ্গে সেখানে বৈষ্ণব ভক্তের মিলন ঘটেছে। গোবিন্দদাস ছিলেন বিদগ্ধ কবি, রুচির রসিক এবং শান্তভক্ত। গোবিন্দদাস অনবদ্য প্রকাশভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। একজন সার্থক চিত্রকরের মত তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বিরহব্যাকুল রাধার চিত্রটি চমৎকার ভাবে তাঁর লেখনীতে রূপ লাভ করেছে।

গোবিন্দদাস ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। ছন্দ, অলঙ্কার ও পদবিন্যাসে তিনি যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন তা একক ও তুলনারহিত। চিত্রকল্প নির্মাণে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। তাঁর বিরহব্যাকুলা রাধার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর মধ্যে আছে বৈচিত্র্য ও মাধুর্য, মৌলিক কল্পনা ও শব্দ চয়নেও ছিল তাঁর বিশেষ দক্ষতা। এসব দিক থেকে তিনি গুরু বিদ্যাপতির চেয়েও অগ্রণী ছিলেন বলে সমালোচকেরা মনে করেন। গোবিন্দদাসের বর্ণনায় বহিরঙ্গের মাধুর্য প্রাধান্য পেয়েছিল।

ছন্দের লালিত্য, ভাষায় মাধুর্য ও অত্যাশ্চর্য প্রকাশভঙ্গির গুণে তাঁর পদাবলি অভিনব বলে বিবেচনার যোগ্য। ব্রজবুলির ছন্দঝংকার ও সংস্কৃত অলঙ্কার সমৃদ্ধ গোবিন্দদাসের পদের নমুনা :

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ ॥
প্রেম আকুল গোপ-গোকুল
কুলজ কামিনী কান্ত।
কুসুম রঞ্জন মঞ্জু মঞ্জুল
কুঞ্জ মন্দিরে সন্ত ॥
গণ্ড মণ্ডল বলিত কুণ্ডল
চূড়ে উড়ে শিখণ্ড।
কেলি তাণ্ডব তাল-পণ্ডিত
বাহুদণ্ডিত দণ্ড ॥
কুঞ্জলোচন কলুষ-মোচন
শ্রবণ-রোচন ভাস।
অমল কোমল চরণ কিসলয়
নিলয় গোবিন্দদাস ॥

বলরামদাস

একাধিক বলরামদাসের কথা পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন। তাঁর নামে যে সব পদ পাওয়া যায় তাতে সবচেয়ে বেশি কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বাৎসল্যরস ও রসোদ্‌গারের পদে। রাধার আক্ষেপানুরাগের পদগুলোও তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি প্রাণের গভীর আবেগে যে সুখদুঃখের চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছেন তা তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। তাঁর পদের মূল সুর হচ্ছে সহজ জীবনরসপ্রীতি। বলরামদাসের একটি পদে কৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট রাধার উক্তি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

মুখ দেখিতে বুক বিদরে
কে তাহে পরাণ ধরে।
ভাবিলে কামিনী দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে ॥
সই কি জানি কদম্ব তলে।
দেখিয়া ও রূপ কুলে তিলাঞ্জলি
যাইতে যমুনা জলে ॥

লোচনদাস

লোচনদাস ছিলেন চৈতন্যজীবনীকার। তিনি কিছু বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন নরহরি সরকার। লোচনদাস গৌর নাগর ভাবের অনেকগুলো আদিরসাত্মক পদ রচনা করেছিলেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, লোচনদাস মাত্রা ছাড়িয়ে কটু আদি রসের ভিয়ান চড়িয়ে শৃঙ্গার উদ্বোধক ধামালির চটুল ছন্দে নদীয়া-নাগরীগণের গৌরাঙ্গ-আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করেছেন। তাঁর পদের কয়টি পংক্তি :

আর শুনেছ আলো সই গোরাভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কাঁদে আকুল তথা ॥
হলুদ বাটিতে গোরী বসিল যতনে।
হলুদবরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে ॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপ মনপ্রাণ টানে।
ছন্‌ছনানি মনে লো সই ছটফটানি প্রাণে।

পদাবলি সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে পরবর্তী কালে দীর্ঘদিন ধরে অগণিত পদকর্তা কবিতা রচনা করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বাসুঘোষ, জগদানন্দ, শশিশেখর, রায় শেখর, রায় বসন্ত, কবিরঞ্জন বা ছোট বিদ্যাপতি প্রমুখ।

মুসলমান কবির পদাবলি

পদাবলি সাহিত্যে মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। একদল মুসলমান কবি উৎকৃষ্ট শ্রেণির বৈষ্ণবপদ রচনা করে বিচিত্র কবিপ্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। ড. আহমদ শরীফের মতে, 'তাঁদের কেউ করেছেন নেশার ঝোঁকে আর কেউ করেছেন পেশা হিসেবে। নেশার ঝোঁকে করার কারণ দুটো : ১. সুফী মতবাদের সঙ্গে বৈষ্ণবাদর্শের আত্যন্তিক সাদৃশ্য ও আচরিক মিল এবং ২. জগৎ ও জীবনের চিরাবৃত রহস্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক নির্ণয়ের কৌতূহল প্রভৃতি মানুষের মনে যে জিজ্ঞাসা জাগায়, তার সদুত্তর সন্ধান প্রয়াসজাত যে অভিব্যক্তি তাতে দেশে বহুল প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ রূপকের ব্যবহার।' সুফী মতাসক্ত বাঙালি মুসলমানকে বৈষ্ণব সাধনা অনুপ্রাণিত করেছিল বলে জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ছত্রচ্ছায়ায় মুসলমান কবি জগৎ ও জীবন এবং আত্মা-পরমাত্মার রহস্য উদ্‌ঘাটনে তৎপর হয়েছেন। তাঁরা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন নি, মরমী-সাধক ও সুফী-পন্থী হিসেবে তাঁরা হৃদয়ানুভূতি প্রকাশে রাধাকৃষ্ণের রূপক অবলম্বন করেছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 'বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থে মুসলিম পদকর্তা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'এই শ্রেণির মুসলমানরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকে প্রায়শ স্বীকার করেন নাই। স্বীকার করিয়াছেন—প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্তপ্রতীক রাধাকৃষ্ণকে। ইঁহারা কৃষ্ণ বলিতে গীতার কৃষ্ণকে জানেন না, জানেন রাধাবন্ধু কৃষ্ণকে। এই রাধাকৃষ্ণ আবার অধিকাংশ মুসলমান কবিদের নিকট অপৌরুষেয়। ইঁহারা বৃষভানু-নন্দিনী বা যশোদানন্দন নহেন। 'কানু ছাড়া গীত নাই', 'কানু ছাড়া উপমা নাই'—প্রভৃতি প্রবাদের দ্বারা যে প্রেমিক কানুর কথা বলা হইয়াছে, প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া সেই কানুর নাম মুসলমান কবিরাও গ্রহণ করিয়াছেন।'

মুসলমান কবি রচিত পদাবলির মধ্যে কেউ 'ধর্ম সমন্বয় ও ধর্মসহিষ্ণুতার মহতী বাণী' লক্ষ করেছেন, কেউবা এ ধরনের কবিকে 'কৃষ্ণভক্ত ও বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন' মনে করেছেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য অনুসরণে বলা যায় যে, মুসলমান পদকর্তারা মুসলমানই, তাঁরা কেবল বৈষ্ণবদের ঢঙে কবিতা রচনা করেছিলেন। কোন কোন মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদাবলির অনুসরণে ইসলামি পদাবলিও রচনা করেছিলেন। কেউ কেউ রাধাকৃষ্ণের নাম উল্লেখ না করেও সুফী মতের অনুসরণে পদ রচনা করে গেছেন।

বিশেষ আদর্শসচেতন না হয়েও নিছক কবি-স্বভাবের জন্যই মুসলমান কবিরা বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন এমন মন্তব্য করে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এই বলে মনোভাব প্রকাশ করেছেন যে, খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হয়েও যেমন মাইকেল 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য রচনা করেছেন, নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব না হয়ে যেমন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা সম্ভব হয়েছে, বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী না হয়েও যেমন বহু পুরুষ ও মহিলা কবি রাধাকৃষ্ণ প্রেমমূলক কবিতা রচনা করেছেন এবং এখনও করছেন, ঠিক সেরূপ মুসলমান ধর্মাবলম্বী কোন কোন কবি রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত কবিতা রচনা করে প্রেমধর্মেরই মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। যাঁর প্রেম-প্রবণ হৃদয়ে কবিত্ব আছে, অধিকন্তু কাব্যাকারে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করতে যিনি সক্ষম, তিনি প্রেমের গান গাইবেনই। গান গাইতে গিয়ে গায়কদের মধ্যে যেমন কেউ সারঙ্গ, কেউ মৃদঙ্গ, কেউ এস্রাজ্যের সাহায্য নেন, প্রায় অনুরূপভাবে প্রেমের কথা বলতে গিয়েও কেউ আশিক-মাশুক, কেউ শিরি-ফরহাদ, কেউ লায়লী-মজনু, কেউ মেঘদূতের যক্ষ-যক্ষবধূ অথবা কেউ রাধাকৃষ্ণের রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। মনের ভাব প্রকাশের জন্য প্রতিবেশী হিন্দুলেখক কর্তৃক যে জাতীয় শব্দ, উপমা ও রূপক সচরাচর ব্যবহৃত হত, মুসলমান কবিদেরও কেউ কেউ সে জাতীয় শব্দ, উপমা ও রূপকের প্রয়োগ করেছেন। এ সকল কবির পক্ষে সময়ের প্রভাব অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি বলেই তাঁরা বৈষ্ণবভাবে খানিকটা অনুপ্রাণিত হয়ে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পদ রচনা করতে প্রলুব্ধ হয়েছেন।

মুসলমান পদকর্তার সঠিক সংখ্যা নির্ণীত হয় নি। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 'বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থে শতাধিক মুসলমান পদকর্তার নামোল্লেখ করেছেন। মুসলমান পদকর্তাদের মধ্যে প্রথম কবি ছিলেন সম্ভবত শেখ কবির। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আফজাল, শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ আইনুদ্দিন, সৈয়দ মুর্তজা, আলাওল, আলি রজা, কমর আলী, সৈয়দ সুলতান, নওয়াজিস প্রমুখ।

সৈয়দ মুর্তজার একটি পদ 'পদকল্পতরু' সংকলন গ্রন্থে সংগৃহীত হওয়ায় প্রাচীন বৈষ্ণবসমাজে কবির পরিচিতি লাভ হয়েছিল। পদটি এরকম :

শ্যামবন্ধু চিতনিবারণ তুমি।
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি ॥
যখন দেখিয়ে এ চাঁদ বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি ॥
মোঝে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুনহ পরাণ কানু।
কুলশীল সব ভাসাইলুঁ জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু ॥

সৈয়দ মুর্তজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রৈলু তুয়া পায়ে
জীবনমরণ ভরি ॥

সতের শতকের পরে বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের আর সমৃদ্ধি সাধিত হয় নি। মহাজনেরা তখন সাম্প্রদায়িক সংহতি ও প্রচারের দিকে যত মনোযোগী ছিলেন, পদাবলি সাহিত্যের উন্নতির জন্য তত তৎপর ছিলেন না। ক্রমে এ ধারা গতানুগতিক হয়ে পড়ে। তাই 'বিশাল এই পদাবলি-সাহিত্যের অনেক পদই ভক্ত ভিন্ন অন্যদের নিকট বিশেষত্ববর্জিত, ক্লান্তিকর, বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ধরাবাঁধা মামুলী দৃষ্টান্ত মাত্র।'

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতা'—এই শিরোনামায় একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ। প্রসঙ্গত এই ধারায় মুসলমানদের অবদান ও তাহার মূল্যায়ন সম্পর্কে তোমার মতামত প্রদান কর।

২। 'আধুনিক কালের পূর্বেকার বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব জীবনীকাব্য নয়, মঙ্গলকাব্য নয়, নানা পৌরাণিক কাব্যও নয়—সে গৌরব বৈষ্ণব গীতিকবিতা বা পদাবলি সাহিত্য'—বিশ্লেষণ কর।

৩। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলির রূপ ও রসের আবেদন কি অর্থে অনন্য পরীক্ষা কর।

৪। মধ্যযুগের কাব্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের শিল্পমূল্য রোমান্টিক কাহিনি কাব্যের তুলনায় কম অথবা বেশি তাহা বিশ্লেষণ করিয়া একটি নিবন্ধ লিখ।

৫। 'বৈষ্ণব পদাবলিকে বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক কাব্যসৃষ্টি বলা হয়ে থাকে।'—সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে কথাটির বিচার কর।

৬। 'বাংলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাহিনির সূচনা জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে, প্রাথমিক বিকাশ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং চূড়ান্ত সমুন্নতি ঘটেছে বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলিতে।' কথাটা স্বীকার কর কি? এই সম্পর্কে তথ্যনির্ভর বক্তব্য লিপিবদ্ধ কর।

৭। গীতিকবিতার মূল্য বিচারে মধ্যযুগে রচিত বিভিন্ন ধরনের গীতিকবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

৮। কোন কোন সমালোচকের মতে, বৈষ্ণব পদসাহিত্য মধ্যযুগের গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ অভিমত কতটা গ্রহণযোগ্য তাহা যুক্তি সহকারে আলোচনা কর।

৯। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলির প্রধান কবিদের অবদান আলোচনা কর।

১০। টীকা লিখ : পদাবলি সাহিত্য, মহাজন পদাবলি, ব্রজবুলি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, লোচনদাস।

নবম অধ্যায়
শ্রীচৈতন্যদেব ও জীবনী সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব অপরিসীম। এদেশে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে তিনি বিপর্যস্ত হিন্দু সমাজে যে নবচেতনার সঞ্চার করেছিলেন তার ব্যাপক প্রভাব ধর্মের সীমানা অতিক্রম করে তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্যে সম্প্রসারিত হয়ে তাঁকে অমর করে রেখেছে। তাঁর প্রভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিচিত্রমুখী বিকাশ ছাড়াও সাহিত্যের অপরাপর শাখায় যথেষ্ট উৎকর্ষ ও অভিনবত্ব দেখা দিয়েছিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চৈতন্যদেবকে মুসলিম যুগে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এবং বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'বর্ষাঋতুর মত মানব সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশে সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নতুন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।'

শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মানুষের জীবন ভূমিতে প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। তাছাড়া দেব-প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন সাহিত্যসৃষ্টিতে জীবন্ত মানবিক অনুভবের সংযোজন চৈতন্যোত্তর কালের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

চৈতন্য জীবনকথা

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি শনিবার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ সালে পুরীতে মারা যান। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র সিলেট জেলার ঢাকা দক্ষিণ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সিলেট থেকে নবদ্বীপে যান এবং শচীদেবীকে বিয়ে করে সেখানেই বসবাস করেন। তখন নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সংস্কৃতি, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র এবং ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রবিদ ও সমাজপতিদের নিবাস ছিল। একারণে সিলেট থেকে জগন্নাথ মিশ্র ও আরও অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এসে নবদ্বীপে বাস করেছিলেন।

চৈতন্যের বাল্য নাম ছিল নিমাই, দেহবর্ণের জন্য নাম হয় গোরা বা গৌরাঙ্গ, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বম্ভর, সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সংক্ষেপে 'চৈতন্য' নামে পরিচিত হন। চৈতন্যদেবের জীবনীকার বৃন্দাবনদাসের মতে, তিনি জগতকে কৃষ্ণনাম বলিয়েছেন, কৃষ্ণের কীর্তন প্রকাশ করেছেন, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আবার জয়ানন্দের মতে, কৃষ্ণই চৈতন্যসন্ন্যাসী হয়ে জগতকে চৈতন্য দান করেছেন, তাই তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

চৈতন্যদেব বাল্যকালে অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। গঙ্গার ঘাটে স্নান-উপাসনারত ব্রাহ্মণ-ভক্ত নরনারীকে বিব্রত করায় তিনি আনন্দ পেতেন। পরিণত বয়সেও তিনি

অপরকে পরিহাস ও উত্যক্ত করে আনন্দ পাবার অভ্যাস ত্যাগ করেন নি। বড় ভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁরও সন্ন্যাসী হওয়ার আশঙ্কায় লেখাপড়া থেকে তাঁকে প্রথমত বঞ্চিত রাখা হয়। পরে নিজের আগ্রহাতিশয্যে তিনি বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। তিনি যৌবনে সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন এবং টোল খুলে শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। সন্ন্যাসপূর্ব কালে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের একটি টীকা রচনা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। গঙ্গার ঘাটে বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে দেখে তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবী বিয়ের অল্পদিন পরেই সর্প দংশনে মারা যান। মায়ের পীড়াপীড়িতে তিনি পুনরায় বিয়ে করেন। তাঁর এ পত্নীর নাম ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া।

২৩ বৎসর বয়সে গয়ায় পিতৃপিণ্ড দান করতে গিয়ে তিনি প্রখ্যাত বৈষ্ণবভক্ত ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর নিকট তিনি দীক্ষা নেন। দীক্ষার পর তিনি ভবগত প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন; প্রেমের মন্ত্র তার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

২৪ বৎসর বয়সে তিনি কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য নামে খ্যাত হন। তখন অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তারপর চৈতন্যদেব পুরীতে নীলাচলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি কয়েকবার ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ান। দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, গৌড় ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি দু বছর কাটান। এই দীর্ঘ কাল তীর্থাদি পর্যটনের ফলে তিনি বহু সাধু-সন্ন্যাসী পণ্ডিত-দার্শনিকের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর প্রেমধর্মের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁর কাছে দীক্ষা নেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের বিশিষ্ট কর্মচারী সাকর মল্লিক ও দবীর খাস পদে অধিষ্ঠিত রূপ ও সনাতন। জীবনের শেষ আঠার বছর চৈতন্যদেব পুরী ছেড়ে অন্য কোথাও যান নি। অধিকাংশ সময় তিনি কৃষ্ণপ্রেমে দিব্যভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। তখন শ্রীকৃষ্ণলীলার কীর্তনে, গানে ও প্রেম উচ্ছ্বাসে তাঁর সময় অতিবাহিত হত। নীলাচল বাসের বিশ বছর অন্তরঙ্গ লীলারসে অসংখ্য ভক্তচিত্তকে আনন্দ মথিত করে তোলেন, সেই সঙ্গে তিনি মধুরকণ্ঠের সুললিত নাম সংকীর্তনে সারাদেশকে করেছিলেন পরিপ্লাবিত। ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি পুরীতেই দেহত্যাগ করেন। জীবনের শেষ বার বছর তিনি প্রায়ই বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকতেন। সে অবস্থার উল্লেখ করে কবি লিখেছেন :

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর ॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥

চৈতন্য প্রভাব

তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মুসলমান শাসন ও ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে তৎকালীন হিন্দু সমাজে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তাকে প্রতিরোধ করার মন্ত্র ছিল চৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদের মধ্যে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে যে

প্রভাব লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে, ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক থেকে দেশ জাতীয় মুক্তির পাথেয় সন্ধান পায়, মানবপ্রেমাদর্শে সমৃদ্ধ বৈষ্ণবদর্শন ও ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে ওঠে এবং অধ্যাত্ম ভাব, চিত্রসৌন্দর্য ও মধুর প্রেমরসের এক সমৃদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি হয়। 'বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।'—চৈতন্যপ্রভাবের স্বরূপ সম্পর্কে কবির এই উক্তি থেকে তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। চৈতন্য ও তাঁর শিষ্য বা পরিকরগণের তীর্থদর্শনের প্রেক্ষিতে বাঙালির ভৌগোলিক সংকীর্ণতা দূরীভূত হয় এবং সারা ভারতের সঙ্গে সংযোগ ঘটে। এতে নীলাচল, বৃন্দাবন ও মথুরা বাঙালির তীর্থে পরিণত হয়। প্রেমভক্তির দিক ছাড়াও ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির বিচারে চৈতন্য-প্রভাব বাংলাদেশের জন্য সীমাহীন গুরুত্ব বহন করে।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর জীবিতকালেই ভক্তদের কাছে ভগবানের অবতার বলে গৃহীত হয়েছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে অনুসারীরা প্রেমধর্মে দীক্ষিত হয়। চৈতন্যদেব বাল্যকাল থেকেই কবিতা ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। এ সব গানের ভাবগত প্রসঙ্গ তাঁর মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করে ভক্তিভাবের উন্মেষ ঘটায়। তিনি প্রচার করলেন—'জীবে দয়া ঈশ্বরে ভক্তি, বিশেষ করে নাম-ধর্ম, নাম-সংকীর্তন।' একজন ভগবদভক্ত হিসেবেই তিনি ভগবানের প্রতি প্রেমধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। মুসলমান শাসনামলে পীর দরবেশের প্রভাবে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু সমাজের এই ধ্বংসোন্মুখ প্রবণতা রোধ করার জন্য চৈতন্যদেব ও তাঁর শিষ্যগণ ধর্মীয় তৎপরতা দেখিয়েছেন। এক উদার ধর্মমতের বন্ধনে শ্রীচৈতন্য সকলকে আকৃষ্ট করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'ধর্মের নামে আচার বিচারে নিষ্ঠা এবং পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা মানুষের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ আনে, সমাজকে খোঁয়াড়ে পরিণত করে, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বাঁধায়। চৈতন্য সব মানুষকে যে খোলা হাওয়ার চলাপথে ডাক দিলেন তাহাতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র একসঙ্গে জুটিতে সংকোচ বোধ করে নাই। নবদ্বীপে-শান্তিপুরে, নীলাচলে, কাশীতে,—সর্বত্র মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন-সাধনা সঙ্গীতের রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশের ভাবুক চিত্তভূমি আর্দ্র ও সরস করিয়াছিল।'

সমাজের ওপর শ্রীচৈতন্যের প্রভাব পড়েছিল ব্যাপক ভাবে। এ প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের মন্তব্য উল্লেখ করা যায় : 'বাঙালি শাসিত শ্রেণির সাংস্কৃতিক প্রতিরোধকে তিনি সার্থক রূপ দান করেন—একদিকে অভিজাতদের মধ্যে স্লেচ্ছাচার রোধ করে, অন্যদিকে জনসাধারণকে সংকীর্তন ও নামধর্মের সাহায্যে প্রেমধর্মে সমান অধিকার দান করেন। আর তৃতীয়ত এইভাবে হিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্গকে এক-ধর্মাচরণে ও ভাবাদর্শে পরস্পরের সন্নিকট করে শ্রীচৈতন্যদেব এক আত্মীয়-ভাবাপন্ন হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করেন;—এবং সেই সমাজের মন থেকে আগেকার অনুষ্ঠানবাহুল্য কতকটা বিদূরিত করেন, সাধারণ ভাবে সেই সমাজের মনে জাগিয়ে তোলেন সর্বকালের প্রতি একটা মমতা (তাই চৈতন্যভক্তের কথা হল, 'প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগ সার'), মানুষের একটা মূল্যবোধ (তুচ্ছতম মানুষও 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'), মর মানুষেরও একটা ঐশী মহিমা ('কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ')। এই সাংস্কৃতিক-সামাজিক জাগরণে বাঙালির চেতনা সাহিত্যে সঙ্গীতে দর্শনে নানাদিকে অপূর্ব ভাবৈশ্বর্যে মূর্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বাঙালির এই জাগরণ সম্পূর্ণ জাগরণ

নয়, কারণ বাস্তব জীবন ও বৈষয়িক উদ্যোগ-প্রয়াস এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে দূরে সীমাবদ্ধ কয়েকটি ক্ষেত্রেই এই জাগরণ আবদ্ধ ছিল। তবু এই জাগরণ এক পরম মহোৎসব, আর সাহিত্যে মুখ্যত তা শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্ত বৈষ্ণবমণ্ডলীর দান।'

চৈতন্যদেব ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করেন। এতে সমাজ জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁর কোন প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। হিন্দু সমাজের মধ্যে ধর্মান্তর প্রতিরোধ করা এবং ধর্মীয় চেতনায় সমাজ জীবনকে উদ্দীপ্ত করার মধ্যেই চৈতন্যপ্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল।

চৈতন্য প্রবর্তিত আবেগমূলক বৈষ্ণবধর্ম বাঙালির চিন্তাপ্রণালীর পরিবর্তন সাধন করে এবং এ পরিবর্তন শুধু জীবন ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রেই আসে নি, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চৈতন্যপ্রভাব অবিস্মরণীয় ঘটনারূপে পরিগণিত হয়। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল সেদিক বিবেচনায় কোন কোন পণ্ডিত মধ্যযুগকে চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্যপরবর্তী যুগে বিভক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। রাধার অধ্যাত্মমূর্তির মহিমাময় পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে চৈতন্যযুগে। তাই চৈতন্য-পূর্ব ও চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলি সাহিত্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাব্যকে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরিণাম হিসেবে। শ্রীচৈতন্যের দিব্যভাব ও আচরণে এবং তাঁর পরমভক্ত ও পরম জ্ঞানীগুণী পরিকরবর্গের ধ্যানমননের মধ্যে রাধার এক নতুন রূপ উপলব্ধি করা যায়। এই কারণে বৈষ্ণব সাহিত্যে অধ্যাত্মরস ও কাব্যরসের সম্মিলন ঘটেছে।

তবে বৈষ্ণব সাধনা বাঙালিকে ভাবাবেগে ব্যাকুল এবং উদারতার মানববোধে উদ্বুদ্ধ করলেও সে অনুপাতে বলিষ্ঠতা, শক্তি ও সামর্থ্য দিতে পারে নি। প্রেমের মধুর কোমল অনুভূতি দিয়ে আবেগমথিত হৃদয়কে পরস্পরের কাছে এনেছিল, কিন্তু বিদ্রোহের ভাব সেখানে সঞ্চারিত হয় নি। প্রেমের বাইরে প্রবলতা দিয়ে বিরুদ্ধতা জয় করার কোন শক্তি এতে ছিল না।

চৈতন্যদেব সর্বদা সংস্কৃত কবি জয়দেব, মৈথিলি কবি বিদ্যাপতি ও বাঙালি কবি চণ্ডীদাসের পদাবলি শুনতে পছন্দ করতেন। চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে :

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
পায় শুনে পরম আনন্দ ॥

এ থেকেই তাঁর ভক্তসমাজে পদাবলি রচনায় ও গানে আধ্যাত্মিক মূল্য আরোপিত হয়েছিল। এর প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে পদাবলি সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। চৈতন্যদেবের প্রভাবে এদেশে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তাকে কেউ কেউ 'চৈতন্য-রেনেসাঁ' বলে অভিহিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এই নবজাগরণের নির্দশন বিদ্যমান।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'চৈতন্যের প্রভাবেই বাংলা সাহিত্য তুচ্ছ মঙ্গলকাব্য ও নাথসাহিত্যের রহস্যময় 'কাল্ট' হইতে মুক্তি পাইয়া উদারতার পরিমণ্ডলে সম্প্রসারিত হইল। চৈতন্যের সাক্ষাৎ প্রভাবে ও অলোকসামান্য আদর্শে পরিকল্পিত চৈতন্যজীবনগ্রন্থগুলি এ বিষয়ে দীপবর্তিকার মতই সাহায্য করিয়া থাকে। চৈতন্যদেব অবতার বা অবতারকল্প মহাপুরুষ হইলেও সর্বোপরি তিনি মানুষ এবং তাঁহার মানুষী ও ভগবত লীলাকথার অপূর্ব বৃত্তান্ত চৈতন্য-জীবনকাব্যগুলিকে একটা বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত করিয়াছে।' চৈতন্য-জীবনচরিতগুলো বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেও চৈতন্যপ্রভাবের সর্বোৎকৃষ্ট ফসল পদাবলি সাহিত্য। চৈতন্যপ্রভাবেই বাংলা ভাষা গোঁড়া ব্রাহ্মণের নিকটও সংস্কৃতের ন্যায় আদরণীয় হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব পদাবলি ও জীবনী সাহিত্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে গতানুগতিকতার ধূলিধূসর পথ থেকে প্রেমসৌন্দর্য ও অধ্যাত্মলোকের আলোকতীর্থে নিয়ে গেছে।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন, 'চৈতন্যদেবের বড় অবদান হচ্ছে সুফিমতের প্রভাবে ভক্তিধর্মকে প্রেমধর্মে উন্নীত করা।..., কিঞ্চিন্ন্যূন পাঁচ শ বছর আগে চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ্য সর্বসংস্কার ও গীতা-স্মৃতির সর্বপ্রকার শাসনমুক্ত হতে পেরেছিলেন। জৈন-বৌদ্ধ ঐতিহ্যের দেশে সুপ্ত সাম্যচেতনা ও মানব মর্যাদাবোধ ইসলামের স্পর্শে চৈতন্যদেবের জীবনে ও বাণীতে নবরূপে পুনর্জাগ্রত হল।...চৈতন্য প্রভাবে বর্ণাশ্রিত হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ— যারা শূদ্রাদি অস্পৃশ্য মানুষকে গৃহপোষ্য পশুর বেশি মর্যাদা দিত না,— কুলগৌরব, আভিজাত্যবোধ, বর্ণগর্ব, বিদ্যাভিমান, সংস্কৃতিচেতনা ও কুলবাচি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পরিহার করে ভক্ত মানুষের ভিড়ে মিশে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে হল ধন্য ও কৃতার্থ।... ষোল শতক সর্বার্থেই অবিশেষ বাঙালি জীবনে রেনেসাঁসের যুগ। বস্তুত বাঙালির মনে-মননে, সমাজে, ধর্মমতে—উদার মানবিকবোধজাত প্রীতিসুন্দর বিনয়মধুর বাসন্তী হাওয়ার স্পর্শ লাগল, যার ফলে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে সোনার ফসল ফলেছিল।'

চৈতন্যদেবের ভক্ত ও অনুসারীগণের মধ্যে অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা পরবর্তী এক শ বছর বৈষ্ণব মতবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালি সমাজকে প্রাণরসে উজ্জীবিত রেখেছিলেন। তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে বৃন্দাবনের সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী না থাকলে এবং দর্শন, ভক্তিসাধনা, রসতত্ত্ব ও বৈষ্ণবস্মৃতিবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচনা না করলে বাংলাদেশে বৈষ্ণব মতবাদ এত ব্যাপকভাবে ছড়াত না। বাংলাদেশে বৈষ্ণব মতবাদ সম্প্রসারণে বিভিন্ন বিষয়ে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর শিষ্যরা সম্প্রদায় গঠন করেন এবং বৈষ্ণবধর্মকে আবেগ ও প্রেমের উচ্ছ্বাস থেকে দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। চৈতন্য-পারিষদগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাস। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, নয়নানন্দ মিশ্র, জগদানন্দ পণ্ডিত, বাসুদেব ঘোষ, নরহরি সরকার, রঘুনন্দন, দামোদর রায়, রামানন্দ, গদাধর পণ্ডিত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রঘুনাথ দাস প্রমুখ।

'বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী' নামে পরিচিত চৈতন্যদেবের ছয় জন প্রখ্যাত শিষ্য বৃন্দাবনে অবস্থান করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁরা হলেন : সনাতন

গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্ট। প্রথমোক্ত তিনজন বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনায় এবং শেষোক্ত তিনজন বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সমাজের প্রতিষ্ঠা করে সারা বাংলাদেশে বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বাঙালি বৈষ্ণব সমাজে কৃষ্ণলীলার দর্শন ও তত্ত্ব প্রচারে এই ষড়গোস্বামী বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রও এই ষড়গোস্বামীর হাতেই গড়ে উঠেছিল। কারণ চৈতন্যদেব কোন গ্রন্থ রচনা করে যান নি এবং ভক্তদের জন্য নির্দিষ্ট কোন শাস্ত্রও তৈরি করেন নি। তাঁদের ছাড়া আরও অনেক বৈষ্ণব মহাজন পদাবলি ও জীবনী রচনায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এর ফলে বৈষ্ণব পদাবলি রচনায় ব্যাপকতা ও উৎকর্ষের সৃষ্টি হয়েছে এবং জীবনী সাহিত্য রচনাতেও কবিত্বশক্তি নিয়োজিত হয়েছিল।

জীবনী সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারায় জীবনী সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর কতিপয় শিষ্যের জীবনকাহিনি অবলম্বনে এই জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি। তবে এর মধ্যে চৈতন্য জীবনীই প্রধান। চৈতন্যদেব জীবিতকালেই কারও কারও কাছে অবতাররূপে পূজিত হন। তাঁর শেষজীবন দিব্যোন্মাদ রূপে অতিবাহিত হয়েছে বলে তাঁর পক্ষে ধর্মমত প্রচার করা সম্ভব হয় নি। তাঁর শিষ্যরা এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে তাঁরা শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনি আলোচনা করতেন। চৈতন্যের জীবদ্দশায়ই সংস্কৃত শ্লোকে, কাব্যে ও নাটকে এবং বাংলা গানে ও কাব্যে তাঁর চরিতকথা স্থান পেয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর জীবনী সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রাচুর্য এসে বাংলা সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য এনেছে। বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যেই রক্ত-মাংসের মানুষ সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে একক প্রসঙ্গ হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থগুলোর সমবেত উপাদান থেকে শ্রীচৈতন্যের নরলীলার দেশ-কাল-চিহ্নিত বিশেষিত স্বভাবের একটি নির্ভরযোগ্য মোটামুটি কাঠামো আবিষ্কার করা সম্ভব।

আধুনিক জীবনী সাহিত্যের সঙ্গে মধ্যযুগের জীবনী সাহিত্যের পার্থক্য সম্পর্কে অধ্যাপক আহমদ কবির মন্তব্য করেছেন, 'একালের জীবনীগ্রন্থ বলতে আমরা যা বুঝি, বৈষ্ণব চরিতকাব্যগুলো সেরকম নয়। জীবনচরিতে বাস্তব মানুষের জীবনালেখ্য, কর্ম, কীর্তি ও আদর্শের পরিচয় থাকে, আর থাকে তাঁর দেশকালের ছবি। যে-মানুষ তাঁর কর্ম ও আদর্শের প্রেরণায় বহু মানুষকে প্রভাবিত করেছেন, সে-মানুষেরই জীবনী রচিত হয়। ভক্ত ও অনুরাগীরাই এ-জীবনী লিখে থাকেন। এভাবে জীবনী রচিত হয়েছে ধর্মগুরু, দার্শনিক, লেখক, কবি, বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, ত্যাগী মানবদরদী কীর্তিধন্যদের। এঁরা অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব— এঁদের গুণমাহাত্ম্য ও মহিমা অপরকে প্রভাবিত করে। অবশ্য ব্যক্তি দোষেগুণে মানুষ। শুধু গুণের আদরে ব্যক্তিকে ভূষিত করলে ব্যক্তির পূর্ণ ছবি পাওয়া যায় না। ভক্তের লেখায় ব্যক্তির দোষ সাধারণত পরিত্যাজ্য। তবু একালের জীবনীগ্রন্থ অনেকাংশে বস্তুনিষ্ঠ। সন্দেহ নেই যে, একালে মানুষের ভক্তিনিষ্ঠাও অনেক কমেছে এবং মানুষ ক্রমশ বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী হয়ে

উঠেছে। তাছাড়া খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনসম্পর্কিত তথ্যাদি ও বিবরণ পাওয়ার সুবিধাও হয়েছে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের খবর, ব্যক্তিগত ডায়েরি, আত্মজীবনী, ঘনিষ্ঠজনের স্মৃতিকথা, ক্যাসেট, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ভিডিও চিত্র ফিল্ম ইত্যাদি একজন লোকমান্য ব্যক্তির জীবনী-প্রণয়নে সহায়তাদান করে। এভাবে গড়ে ওঠে একটি তথ্যনিষ্ঠ সত্য জীবনকাহিনি। একালের জীবনচরিত রক্তমাংসের বাস্তব মানুষেরই বাস্তব জীবনালেখ্য।'

ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টি মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য। চৈতন্য জীবনী সাহিত্যও এই বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নয়। কারণ চৈতন্যদেবকে অনেকেই অবতার হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন এবং তাঁকে অবলম্বন করে রচিত কাব্য ভক্তিকাব্য হয়ে পড়েছে। ভক্তেরা চৈতন্যদেবকে মানুষরূপে কল্পনা করেন নি, করেছেন নররূপী নারায়ণরূপে। ফলে জীবনীগ্রন্থ হয়েছে দেব-অবতারের মঙ্গলপাঁচালী। তবে কৃষ্ণলীলার আদলে নরনারায়ণের জীবনলীলা বর্ণনা কালে কবিরা নিজেদের দেশ-কাল-পরিবেশ উপেক্ষা করতে পারেন নি। ড. আহমদ শরীফের মতে, জীবনী সাহিত্য 'ষোল শতকের শাস্ত্রিক সামাজিক ভৌগোলিক অবস্থা ও সাম্প্রদায়িক, প্রশাসনিক, নৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের সংবাদ-চিত্র বহন করেছে। চরিতাখ্যানগুলির সর্বাধিক গুরুত্ব এখানেই।' জীবনী কাব্যগুলো যে সামাজিক ইতিহাস হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চৈতন্য জীবনের কাহিনিতে কবিরা অলৌকিকতা আরোপ করেছেন। তবু চৈতন্য ও তাঁর শিষ্যরা বাস্তব মানুষ ছিলেন এবং এ ধরনের বাস্তব কাহিনি নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। এ পর্যন্ত রচিত বাংলা সাহিত্যের বিষয় ছিল পৌরাণিক গল্প, দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনি ও রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলি। কিন্তু জীবনী সাহিত্যে সমকালীন ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তব মানুষের জীবনকাহিনি সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। চৈতন্য জীবনী সাহিত্য সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'ইহাতে একজন মহাপুরুষের ভাবজীবনের গভীর ব্যাকুলতা, তাঁহার সর্বত্যাগী পার্ষদগণের পূত জীবনকথা, ভক্তিদর্শন ও বৈষ্ণবতত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বৈষ্ণবসমাজ ও বৈষ্ণবসমাজের বাহিরে বৃহত্তর বাঙালি হিন্দুসমাজ, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক প্রভৃতি বিবিধ তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই এই জীবনীকাব্যগুলি শুধু জীবনী মাত্র হয় নাই,—ইহাতে গৌড় বিশেষত নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ, নীলাচল ও ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস, বিকাশ, পরিণতি প্রভৃতি ব্যাপারে ঐতিহাসিক তথ্যের যে প্রকার বাহুল্য দেখা যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকার করিতে হইবে। মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে গেলে চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলির সাহায্য অপরিহার্য।'

জীবনী সাহিত্যের রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্যদেবের মহান জীবনকাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের গৌরব প্রতিষ্ঠা করা। ফলে এতে অনেক অলৌকিক ঘটনা অলঙ্কার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের নামে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাগুলো ছিল এরকম :

বৌদ্ধভিক্ষুর মস্তক কর্তন ও পুনঃসংযোজন, কাশী মিশ্র ও প্রতাপ রুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্তি প্রদর্শন, ভাবাবিষ্ট চৈতন্যের এক হস্তের দীর্ঘীভবন, সর্বদ্বার রুদ্ধ গৃহ থেকে চৈতন্যের নিষ্ক্রমণ ইত্যাদি।

এর জন্য অনেকে এগুলোকে যথার্থ জীবনী হিসেবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। জীবনীকারগণ চৈতন্যকে স্বয়ং কৃষ্ণ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ তাঁর ভাবজীবনের তাৎপর্য বোঝানোর জন্য বাস্তব ঘটনাকে অলৌকিকতার স্পর্শ দান করেছেন। এতে চরিতগুলোতে অলৌকিকতা ও অতিরঞ্জন স্থান পেয়েছে। সেই জন্য কারও কারও মতে চৈতন্য জীবনীগুলোকে চরিতকথা হিসেবে মূল্যবান দলিল স্বরূপ গণ্য করা চলে না, বরং ভক্ত কবিগণ ভক্তির প্রাবল্যে 'চরিতামৃত' রচনা করেছেন।

চৈতন্যজীবনীর ভক্ত কবিগণ তাঁদের তত্ত্বালোচনায় ও কাব্যরূপায়ণে শ্রীরাধা এবং শ্রীচৈতন্যকে অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন কল্পনা করেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর গৌর অঙ্গে অরুণ বর্ণের বসন ধারণ করে চৈতন্যদেব দেহমনে যেন রাধারূপ লাভ করেছিলেন। পরবর্তী কালে প্রেমোন্মাদ দশায় তাঁর আচরণ প্রেমোন্মাদিনী রাধার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা চৈতন্যদেবকে দেখেছেন 'আমার গোরা ভাবের রাধারাণী।' ভক্তজনের কাছে এ সব জীবনীকাব্যের যথেষ্ট মূল্য থাকলেও আধুনিক সাহিত্যরসিক পাঠক তাতে তেমন কোন আবেদন অনুভব করতে পারে না। সে জন্য কারও কারও মতে বৈষ্ণব জীবনী সম্পূর্ণ জীবনচরিত নয়, সে সব দেবচরিত ও ভক্তচরিত। কিন্তু জীবনী সাহিত্য মধ্যযুগের যে পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে তাকে অস্বীকার করলে চলবে না। মধ্যযুগের মানুষ অলৌকিকতায় সহজে বিশ্বাস স্থাপন করেছে বলে এ সব কাব্যে এ ধরনের উপাদান পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া মহাপুরুষদের জীবনকাহিনি শুধু বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রূপায়িত হয়ে ওঠে না, তাতে অলৌকিকতা বা অধ্যাত্মজগতের অবাস্তব কথা সহজেই অনুপ্রবেশ করতে পারে। এ সম্পর্কে যত মতবিরোধই থাকুক না কেন, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের এই সব জীবনী সাহিত্যের গুরুত্ব অত্যধিক। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে জীবনী সাহিত্যের বিশেষ গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। ধর্মীয় চেতনার জন্য জীবনীগুলো ভক্তদের কাছে সমাদৃত, কাব্যগুণের জন্য তা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে আর তৎকালীন সমাজ ও ইতিহাসের তথ্যের জন্য ঐতিহাসিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্কৃত জীবনী

চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। নরহরি সরকার, রঘুনাথ দাস প্রমুখেরা চৈতন্যবিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। তবে চৈতন্যের প্রথম জীবনী লেখক হিসেবে মুরারি গুপ্ত কৃতিত্বের অধিকারী। 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে পরিচিত তাঁর কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম।' মুরারি গুপ্ত মূলত সিলেটের অধিবাসী ছিলেন এবং পরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের সহাধ্যায়ী ছিলেন। মুরারি গুপ্তের গৃহে চৈতন্যের প্রথম ভাবাবেশ ঘটেছিল বলে জনশ্রুতি বিদ্যমান। তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন বলে অধিকাংশ ঘটনা নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। কবি মুরারি গুপ্ত

চৈতন্য জীবনের প্রথম দিকের সন্ন্যাস জীবন পর্যন্ত বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যের মধ্য ও শেষ লীলা অন্যের রচনা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে এ বিষয়ে লিখেছেন :

আদি লীলা মধ্য যত প্রভুর চরিত
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিল গ্রন্থিত ॥
মধ্য শেষ প্রভুলীলা স্বরূপ দামোদর
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥

মুরারি গুপ্ত কেবল প্রথম চৈতন্য-জীবনী লেখকই নন, তিনি চৈতন্য-জীবনী রচনার অবিতর্কিত আদর্শের প্রবর্তনকারী। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৩৩ থেকে ১৫৪২ সালের মধ্যে। কবি কর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ কবিগণ মুরারি গুপ্তের কাছে বহুলাংশে ঋণী। কবি কর্ণপুর উপাধিধারী পরমানন্দ দাস সংস্কৃতে দুখানি গ্রন্থ—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য রচনা করেন। স্বরূপ দামোদরও কড়চা রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর গ্রন্থ পাওয়া যায় নি।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' নামক কাব্য রচনা করেছিলেন। এতে তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সাহিত্যরুচি, ভক্তি সব কিছু সুনিপুণ ভাবে রূপ লাভ করেছে। এই কাব্যে সব ধরনের সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটি স্তোত্রকাব্য বলে এতে ভক্তির আতিশয্য ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই সমস্ত রচনার মাধ্যমে একদিকে যেমন চৈতন্যমহিমা প্রচারিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে এগুলো পরবর্তীকালে জীবনী রচনায় উপাদান যুগিয়েছে।

কড়চা

চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে 'কড়চা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন : মুরারি গুপ্তের কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, গোবিন্দদাসের কড়চা প্রভৃতি। কড়চা কথাটির প্রয়োগ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন, 'কড়চা শব্দটি আসিয়াছে প্রাকৃত 'কটকচ্চ', সংস্কৃত 'কৃতকৃত্য' হইতে। 'কট' শব্দ প্রাচীন অনুশাসনে 'খসড়া লেখা' (Original draft) অর্থেই পাওয়া গিয়াছে। কড়চার অর্থও এই ব্যুৎপত্তির অনুরূপ—খসড়া রচনা, স্মারক লিপি, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য।' কড়চাকে দিনপঞ্জি বা রোজনামচা হিসেবে বিবেচনা করা চলে। এতে লেখক নিজের জীবনের ঘটনা বা তাঁর দেখা বা শোনা ঘটনার বিবরণ প্রতিদিন লিখে রাখতেন। পরবর্তী কালে কোন রচনার উপকরণ হিসেবে তা ব্যবহৃত হত। তবে চৈতন্য জীবনীকে কড়চা নামে অভিহিত করাতে কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাংলা জীবনী

চৈতন্যদেবের বাংলা জীবনীকাব্যগুলো বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালির জীবন, সমাজ ও সাধনা সম্পর্কিত অনেক মৌলিক ঐতিহাসিক তথ্য এই সব গ্রন্থে বিধৃত। পদাবলি সাহিত্যের বিকাশের জন্য এগুলোর

বিশেষ অবদান আছে। বস্তুতপক্ষে চৈতন্য চরিতকাব্যগুলোর মাধ্যমে চৈতন্যের জীবনকথা, বৈষ্ণব-ধর্মতত্ত্ব ও রহস্য বৈষ্ণব মতানুসারী বাঙালির কাছে প্রচারিত হয়।

বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত

বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। কবি সম্ভবত ১৫১৮ সালের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাব্য প্রথমত 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল, পরে এ কাব্যে ভাগবতের প্রভাব ও লীলা-পর্যায় দেখে এর নাম চৈতন্যভাগবত রাখা হয়। কাব্যটির রচনাকাল সম্ভবত ১৫৪৮ সাল। এ কাব্য রচনায় কবি বৃন্দাবনদাস তাঁর গুরু নিত্যানন্দের কাছ থেকে অধিকাংশ উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। কবির আমলে জীবিত এমন অনুচরদের কাছ থেকেও তিনি তথ্যাদি পেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ভাগবত থেকেও উপকরণ নিয়েছিলেন।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে কৃষ্ণ ও বলরামের অবতার বলে বিবেচনা করতেন। এই বৈশিষ্ট্য কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কবি চৈতন্যদেবের বাল্য ও কৈশোরলীলা খুব বাস্তবতা ও সরলতা সহকারে বর্ণনা করেছেন। চৈতন্যদেবের চরিত্রে কবি করুণ কোমলতার সঙ্গে সুকঠোর চরিত্র ও পৌরুষের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের মানবমূর্তি ও ভাগবতমূর্তি সমানভাবে এ কাব্যে বিধৃত। বৈষ্ণবভক্তের বাইরের সমাজের কাছে এই কাব্যের বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। কারণ এতে সমকালীন শাসক-শাসিতের সম্পর্ক, তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা, শাসকের সাংস্কৃতিক প্রভাব, হিন্দুর লৌকিক ধর্ম, শাস্ত্রাচারের শিথিলতা, ব্রাহ্মণ্য সমাজের নীতিশিথিলতা ও দুর্নীতি, তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজের বিপ্লব, হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক, বৈষ্ণব সমাজের উপমত, সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষের বিলাসবহুল জীবনচিত্র বিধৃত হয়েছে। ড. বিমানবিহারী মজুমদার এ কাব্য সম্পর্কে লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক বহির্মুখী দৃষ্টির নিকট খুঁটিনাটি ঘটনায় বৃন্দাবনদাসের সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়িলেও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত ঐতিহাসিক তথ্যের আকর স্বরূপ।' মধ্যযুগের বিশেষত ষোল শতকের বাঙালি সমাজের ধর্মাচরণ, শিক্ষাব্যবস্থা, ইসলাম ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। ভক্তিকথা, চৈতন্যলীলা, বৈষ্ণব সমাজ ও ধর্ম, চৈতন্য-পরিকরদের জীবনী বর্ণনা ইত্যাদি যেমন এ কাব্যে সার্থক ভাবে রূপায়িত হয়েছে, তেমনি মানবীয় রস এ কাব্যের স্বতন্ত্র মর্যাদা সৃষ্টি করেছে।

ড. বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, 'বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচনায় ক্রমভঙ্গ, অতিশয়োক্তি ও অলৌকিক ঘটনা সংযোজনের প্রবৃত্তি থাকিলেও সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে তাঁহার গ্রন্থ বিশেষভাবে মূল্যবান। শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত বৈষ্ণবদের মধ্যে মতভেদ, নিত্যানন্দ প্রভুর বিবিধ কার্যকলাপ ও গৌড়দেশে প্রেমধর্ম প্রচার সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থই আমাদের একমাত্র উপজীব্য।' কাব্যটির মধ্যে অলৌকিকতা থাকলেও কবির বিশ্বাস কোথাও শিথিল হয় নি। প্রায় সমগ্র কাব্যটি অনাড়ম্বর বর্ণনাধর্মী ভাষায় পয়ার ছন্দে রচিত। অল্প কিছু স্থানে ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিভাশালী কবির পরিচয়

এ কাব্যে সহজলভ্য। কবিত্বের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি পদে চৈতন্যের ভাবাবেশ-মুগ্ধ চরিত্রের যে প্রতিফলন ঘটেছে তা লক্ষণীয় :

বিমল হেম জিনি তনু অনুপম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥
জিনি মদমত্ত হাতী গমন মন্থর গতি
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসন ছবি যেন প্রভাতের রবি
গৌর অঙ্গে লহরী খেলায় ॥

'চৈতন্যভাগবত' কাব্যের ঐতিহাসিক সমৃদ্ধি ও সরসতার পেছনে রয়েছে তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা, আর বিশ্বাসনিষ্ঠ আন্তরিকতা। এই দুর্লভ গুণাবলির সমন্বিত সমাবেশে, ইতিহাসের তথ্যে, ভক্ত-হৃদয়-জাত বিশ্বাস-সত্যে এবং শৈল্পিক সরসতায় 'চৈতন্য- ভাগবত' যথার্থই বৈষ্ণব ধর্মের 'ভাগবত' হয়ে উঠেছে।

কবি বৃন্দাবনদাসকে চৈতন্যলীলার ব্যাস বলা হয়েছে। তিনি চৈতন্যদেবের জীবনের বিশাল ঘটনাকে যেভাবে রূপ দিয়েছেন তাতে তাঁর কবিত্বশক্তি ও রচনাশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। তাঁর কাব্য কেবল তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও দার্শনিকের জন্য রচিত নয়, সাধারণ বৈষ্ণবসমাজ ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। চৈতন্য জীবনকে পরিচ্ছন্ন ঘটনার মাধ্যমে সাজিয়ে কবি নিজ ভাবাদর্শ ও রুচি-প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। কবি সঙ্গীত বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলে তাঁর বর্ণনায় যথার্থ রসমাধুর্যের সমাবেশ ঘটেছে।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল

কবি লোচনদাস তাঁর গুরু চৈতন্য-পরিকর শ্রীখণ্ড বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা নরহরি সরকারের আদেশে ১৫৫০ থেকে ১৫৫৬ সালের মধ্যে চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যটি সাধারণ বিশ্বাসপ্রবণ বৈষ্ণবভক্তের জন্য রচিত এবং রচনাধারা অনেকাংশে মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ। তাছাড়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 'গৌরনাগর' শাখার মতাদর্শ ও সাধন প্রণালী এতে উপজীব্য হয়েছে। কবি এ কাব্য রচনায় মুরারি গুপ্তের কড়চার সহায়তা নিয়েছিলেন। তবে কবি চৈতন্য অবতারের পটভূমি ও প্রমাণ হিসেবে ভাবগত, ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, নারদপঞ্চরাত্র, মহা- ভাগবত প্রভৃতির অনুসরণ করেছিলেন। সম্ভবত চৈতন্যের নাগরী ভাব বর্ণনার জন্য কাব্যটিতে রসের সঞ্চার হয়েছিল। কাব্যে চৈতন্য জীবনের আদিরসাত্মক লীলার যে বর্ণনা দান করা হয়েছে তাতে ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। তবে কবি হিসেবে লোচনদাস সার্থকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কল্পনা শক্তির অবাধ চর্চা করতে গিয়ে কবি ভক্তহৃদয়ের বিশ্বাসের ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ন করেন নি। তাঁর কাব্যে ইতিহাসের ঘটনার যাথার্থ্য সম্পর্কে কিছু ত্রুটি থাকলেও তাতে ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার অভাব ঘটে নি। তিনি চৈতন্যজীবনের প্রচলিত ঐতিহ্যের অপলাপ না করেও

কাব্যের অসংখ্য খণ্ড-বিচ্ছিন্ন মুহূর্তকে গীতিরসস্নিগ্ধ করে তুলেছেন। লোচনদাস গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণে বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়বেদনা এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

কি কহিব মুই আর মুই তোমার সংসার
সন্ন্যাস করিবে মোর ডরে।
তোমার নিছনি লৈয়া মরি যাঙ বিষ খাইয়া
সুখে নিবসহ নিজ ঘরে ॥
না যাইহ দেশান্তরে কেহো নাহি এ সংসারে
বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া।
কহিতে না পারে কথা অন্তরে মরম ব্যথা
কান্দে মাএ চরণ ধরিয়া ॥

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

কবি জয়ানন্দ আনুমানিক ১৫১৩ সালে বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত ১৫৬০ সালের দিকে কবি চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। জনসাধারণের জন্য গতানুগতিক ভাবে কাব্যটি রচিত বলে এতে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে অনৈক্য প্রকাশ পেয়েছে। এ কাব্যের রচনারীতি মঙ্গলকাব্য ও পৌরাণিক ধরনের। এই কাব্যটি বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকল প্রকার পাঠক-শ্রোতার উদ্দেশ্যে রচিত ও গেয় বলে তাতে বৈষ্ণবসুলভ ঐকান্তিক নিষ্ঠা, ভক্তি ও ভক্তিতত্ত্ব অবিমিশ্রভাবে অভিব্যক্তি পায় নি। ইতিহাস থেকে বিচ্যুতি ক্রমভঙ্গদোষ এবং পরিচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের অনুপস্থিতির ফলে এ কাব্য বৈষ্ণবসমাজে সমাদৃত হয় নি। কাব্যগুণও এতে বেশি নেই। স্বাধীন রচনা হিসেবে কাব্যটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে বাস্তব বর্ণনা এ কাব্যকে গতানুগতিক আদর্শ থেকে পৃথক করেছে।

কবি জয়ানন্দের চৈতন্যতত্ত্ব সম্পর্কিত ভাবাদর্শ চৈতন্যের উক্তিতে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

আরে রে সংসারে লোক দেখ মোর নাট।
ক্রয়বিক্রয় কর মোর প্রেম হাট ॥
কার মাতা কার পিতা স্বামী পুত্র সখা।
স্বপ্ন হেন সংসার কার সনে কার দেখা ॥
বাজিকর নাচাএ যেন কাঠের পুত্তলী।
তেমত সংসার নাচাএ কৃষ্ণ করে কেলি ॥
মিথ্যা ধন মিথ্যা জন মিথ্যা পরিবার।
যথাএ সম্পদ তথা বিপদ অপার ॥

জয়ানন্দের রচনায় গায়েন সুলভ চিত্তচমৎকারিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা ছিল মুখ্য। কবি-চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদনের অভাবে তা অপরিণত পাঁচালির পর্যায় অতিক্রম করে কাব্য পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। সার্থক জীবনী হিসেবে তার কোন দাবি থাকতে পারে না। কবিও সে দাবি করেন নি। 'পাঁচালির গান জমিয়ে জীবিকার্জন করতে পেরেই তিনি কৃতার্থ হয়েছিলেন।'

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' জীবনী কাব্যটি পাণ্ডিত্য, মনীষা, দার্শনিকতা ও রসমাধুর্যে অদ্বিতীয় বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কাব্যটি তত্ত্বশাস্ত্রের আকর, তবে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। চৈতন্যের মর্ত্যলীলা, চৈতন্যতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব ইত্যাদি উচ্চ দার্শনিক সূক্ষ্মতায় বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। কবি এ কাব্যে চৈতন্যদেবের প্রচলিত কাহিনির পুনরাবৃত্তি না করে 'চৈতন্যজীবনাদর্শ, ভক্তিবাদ, দ্বৈতবাদী দার্শনিক চিন্তার গৌড়ীয় ভাষ্য এবং বৈষ্ণব মতাদর্শকে সংহত, দূরাভিসারী ও মনন-নিষ্ঠ' আকার দিয়ে 'বাঙালি-মনীষার এক উজ্জ্বলতম স্মারক চরিত্র' হয়ে আছেন।

কৃষ্ণদাস আনুমানিক ১৫২৭ সালে বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যসহচর নিত্যানন্দ কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বৃন্দাবনে আসেন এবং সেখানে তিনি রূপ সনাতন প্রমুখ চৈতন্য অনুচরগণের সাক্ষাৎ পান। এখানেই তিনি বৈষ্ণব আচার্যগণের সহায়তায় যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি পাণ্ডিত্য ও রসবোধে সে আমলে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন। বৃন্দাবনে বৈষ্ণব আচার্য ও গুরুদের অনুরোধে কবি সম্ভবত ১৬১৫ সালে বৃদ্ধাবস্থায় এ কাব্য রচনা করেছিলেন। এতে তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থ, মতাদর্শ ও উক্তি অবলম্বনে চৈতন্যজীবনী ঢেলে সাজাতে গিয়ে প্রামাণিকতাকে গুরুত্ব দেন নি। চৈতন্যদেবের জীবনের অন্ত্যলীলা বর্ণনাই কবির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কবি প্রথম জীবনে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাবিষয়ক 'গোবিন্দলীলামৃত' নামক সংস্কৃত কাব্য রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি সে আমলে একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে সম্মানিত ও সমাদৃত গ্রন্থ। সর্বাপেক্ষা সুলিখিত গ্রন্থ হিসেবে জীবনী সাহিত্যে এ গ্রন্থের পরিচয়। ভাবুক বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে কাব্যটি ভক্তি সাধনার জীবনবেদ।

ভক্তকবির দৃষ্টি নিয়ে তিনি রাধা ও শ্রীচৈতন্যকে এক করে দেখেছেন :

রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখদুঃখ উঠে নিরন্তর ॥
শেষলীলায় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ভব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে ॥

যুক্তি ও বিচারনিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে কবি বক্তব্যের তীক্ষ্ণ, সংহত ও যথাযথ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই জন্য তাঁর কাব্যে শৈল্পিক কলাকুশলতার অভাব ঘটেছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। কাব্যটির বহু অংশ কেবল দার্শনিক বিচারের আশ্রয়, সে কারণে তা প্রায় নিত্যপাঠ্য মন্ত্রের মহিমা লাভ করেছে। কবি কৃষ্ণদাসের পাণ্ডিত্য বৈষ্ণবশাস্ত্রের শিক্ষণের দ্বারা সঞ্জীবিত ছিল। তাঁর প্রাণ ছিল বৈষ্ণব-ভাব-বিশ্বাসে ভরপুর। তাই যুক্তি-

তথ্য, বিচার পাণ্ডিত্যকে ছাপিয়ে সেই বিশ্বাসের ঐকান্তিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এ জন্য তা বৈষ্ণব ভক্তজনের পক্ষে প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

শ্রীচৈতন্যের ভাব আস্বাদনের সহায়ক হিসেবে এ গ্রন্থের মূল্য অত্যধিক। বৈষ্ণব সমাজে তা উপনিষদের মত মর্যাদা পেয়েছে। চৈতন্যজীবনের তথ্যাদির চেয়ে বৈষ্ণব দর্শনের প্রতিষ্ঠা করা এ কাব্যের প্রধান লক্ষ্য বলে কাব্যটি এত সমাদৃত। বাঙালির মনন, দর্শন, তত্ত্বজ্ঞান ও রসবোধের এরূপ বিপুল পরিচয় আধুনিক যুগের গ্রন্থেও খুব সুলভ নয়। ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন 'চৈতন্যচরিতামৃত মহৎ বই, মহৎ লেখকের লেখা, মহৎ শ্রোতার জন্য লেখা।'

গোবিন্দদাসের কড়চা

'গোবিন্দদাসের কড়চা' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিতর্কিত গ্রন্থ। কাব্যটি চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণের কাহিনি অবলম্বনে লেখা। গোবিন্দদাস ছিলেন চৈতন্যদেবের তীর্থ ভ্রমণকারী ভৃত্য। কড়চায় কবি পরিচিতি থেকে জানা যায় যে, বর্ধমান জেলার কাঞ্চনপুর নিবাসী গোবিন্দ কর্মকার পত্নী শশিমুখীর হাতে লাঞ্ছিত হয়ে মনোদুঃখে গৃহত্যাগ করেন এবং কাটোয়ায় এসে চৈতন্যের মহিমার কথা শুনে নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর ভৃত্যপদ গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ সালে জয়গোপাল গোস্বামী এ কাব্য প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কাব্যটিকে কেউ আংশিক কৃত্রিম, আবার কেউ সবটাই জাল বলেছেন। এর কারণ কড়চার রচয়িতা কর্মকার গোবিন্দদাস বলে চৈতন্যদেবের খড়ী-খড়ম বাহক কোন অনুচরের নাম শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কেউ উল্লেখ করেন নি। ড. বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 'কড়চার আগাগোড়া সমাজটাই যে জয়গোপাল গোস্বামীর কল্পনাপ্রসূত, তাহার কোন প্রকৃত প্রাচীন ভিত্তি নাই, এ কথা বলা সঙ্গত মনে হয় না। কোন প্রকার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাইলেও আমার বিশ্বাস যে গোস্বামী মহাশয় হয়তো কোন কীটদ্রষ্ট প্রাচীন পুঁথিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে যাহা পাইয়াছিলেন তাহাই পল্লবিত করিয়া নিজের ভাষায় লিখিয়া গোবিন্দদাসের কড়চা নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।' কড়চার বক্তব্য মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খায় না, আধুনিক যুগের ভাব ও ভাষার সঙ্গে এর মিল। যেমন :

দারা বল পুত্র বল বেদিয়ার খেলা।
দিন দুই তরে করে সংসারেতে মেলা ॥
খাবার লাগিয়া ছল করে পরিবার।
ভাব দেখি ভাই তুমি কে হয় তোমার ॥
গলে দিয়া প্রেম ফাঁসি নারী জোরে টানে।
সেই টানে বোকা কর্তা মরেন পরাণে ॥
মুখেতে মধুর ভাষা অন্তরেতে বিষ।
অর্থ না পাইলে হাত করে খিশমিশ ॥

রমণীর প্রেম হয় গরল সমান।
অমৃত বলিয়া তাহা মূর্খে করে পান ॥
মৃত্যুকালে পুত্র কন্যা নিকটে আসিয়া।
বলে বাবা মোর তরে গেলা কি করিয়া ॥

চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়

ড. সুকুমার সেন এ কাব্যটি প্রকাশ করেছেন। কাব্যের অপর নাম 'ভুবনমঙ্গল'। কাব্যটি খণ্ডিত। বৈষ্ণব সমাজে এর মোটেই প্রচার হয় নি। এতে চৈতন্যজীবনীর তথ্যগত ভুলভ্রান্তিও আছে। সম্ভবত শ্রুতি-স্মৃতিই কবির এই কাব্য রচনার মুখ্য অবলম্বন ছিল। এতে এমন ঘটনাও সন্নিবেশিত হয়েছে যা অন্যত্র উল্লেখিত হয় নি।

অন্যান্য গ্রন্থ

চৈতন্য-জীবনী রচনা ছাড়াও চৈতন্যদেবের কয়েকজন শিষ্যের জীবন কাহিনি অবলম্বনেও কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগুলোও জীবনী সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় তাঁর প্রধান পারিষদ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রমুখেরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের কারও কারও জীবনকাহিনি চরিতকাব্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। চৈতন্যশিষ্য অদ্বৈতের জীবনকাহিনি নিয়ে কাব্য রচিত হয়েছিল। শ্রীহট্ট লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ অদ্বৈতের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করে কৃষ্ণদাস নামে খ্যাত হন। তিনি অদ্বৈতের বাল্যলীলা অবলম্বনে সংস্কৃতে 'বাল্যলীলাসূত্র' রচনা করেন। পরে শ্যামানন্দ 'অদ্বৈততত্ত্ব' নামে তা বাংলায় অনুবাদ করেন। বাংলা অদ্বৈতজীবনী ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ' ১৫৬৮-৬৯ সালের দিকে লিখিত হয়। হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' অন্য একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য। সতের শতকে চৈতন্যশিষ্য শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের জীবনী অবলম্বনে কাব্য রচিত হয়। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস আলোচনায় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। 'প্রেমামৃত' গুরুচরণ দাসের রচিত শ্রীনিবাসজীবনী। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' আঠার শতকে রচিত একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। সতের শতকের শেষে বৈষ্ণব প্রেরণা মন্দীভূত হয়ে আসে। তখন জীবনী কাব্য রচিত হলেও সে সবের তেমন কোন সাহিত্যমূল্য নেই। তবে বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসে এগুলোর গুরুত্ব আছে।

ষোল শতকের শেষার্ধ থেকে শুরু করে আঠার শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রায় দেড় শ বছর ধরে বাংলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখার যে বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল তার মধ্যে চৈতন্যদেব ও তাঁর সহচরগণের জীবনকথা অবলম্বনে যে জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তা তথ্য ও কাব্যগুণে ছিল সমৃদ্ধ। শ্রীচৈতন্যের আদর্শ থেকেই জীবনচরিত শাখার সূত্রপাত হয়ে প্রমাণ করেছে যে ধর্মশাস্ত্র থেকে মানুষ মহত্তর, মানবলীলার সৌন্দর্যপাতেই শাস্ত্র উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শাস্ত্রীয় যবনিকার অন্তরালবর্তী মানবসত্তার গুরুত্ব তাই কবিগণের দৃষ্টিতে বিধৃত হয়েছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। 'চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে নহে, সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিনব ঘটনা।'—কেন ও কিভাবে? আলোচনা কর।

২। 'চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, বাঙালির সাহিত্যক্ষেত্রেও কালান্তর ঘটিয়েছিল।'—কিভাবে তাহা আলোচনা করিয়া দেখাও।

৩। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁহার জীবন দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনচরিত, পদাবলি রচনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।'—বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। জীবনী সাহিত্য বলিতে কি বুঝ? বৈষ্ণব চরিতাখ্যানের বিশিষ্টতা কি? সাহিত্যের ইতিহাসে এই জীবনী সাহিত্যের স্থান নির্দেশ কর।

৫। চৈতন্য-চরিতগুলির ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই শাখার বিশেষ মূল্য নির্ণয় কর।

৬। মধ্যযুগের জীবনী সাহিত্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৭। 'বৈষ্ণব চরিতাখ্যানগুলি সর্বকালীন বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপকরণ হিসেবেই বিশেষ মূল্যবান।'—এই উক্তির অনুসরণে চৈতন্যচরিতগুলির পরিচয় দাও।

৮। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব-জীবনী কাব্যসমূহ এক সম্পূর্ণ নতুন জিনিস।'—কি অর্থে এবং কেন? আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৯। জীবনী সাহিত্য বলিতে কি বুঝ? বৈষ্ণব চরিতাখ্যান ও আধুনিক জীবনী সাহিত্যে পার্থক্য কি? এই পার্থক্যের কারণ কি? বৈষ্ণব চরিতাখ্যানগুলির পরিচয় দান প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ কর।

১০। 'মিলিত বাঙালি হিন্দুমুসলমান স্তরের নয়, বরং নবজাগ্রত আত্মরক্ষাকামী সংস্কৃতির প্রাণ-পুরুষ হয়ে উঠলেন শ্রীচৈতন্যদেব আর তাঁর বৈষ্ণব-মণ্ডলী।'—চৈতন্যদেবের জীবনাদর্শ ও ধর্মান্দোলন দ্বারা প্রভাবিত বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিচয় দিয়া এই উক্তির যাথার্থ্য নিরূপণ কর।

১১। আধুনিক জীবনী সাহিত্য ও মধ্যযুগের জীবনী সাহিত্যের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? মধ্যযুগের জীবনী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনাকালে এই বিষয়ে মন্তব্য কর।

১২। 'বাংলার ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে নয় শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বিপ্লব ঘটাইয়াছিল।' এই উক্তির অনুসরণে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবদের দানের মূল্য নিরূপণ কর।

১৩। 'চৈতন্যচরিত গ্রন্থসমূহ সমকালীন জীবন ও সমাজের আলেখ্য হিসেবেও মূল্যবান।'—এই মন্তব্যের আলোকে চরিতগ্রন্থসমূহের ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ কর।

১৪। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

১৫। চরিত সাহিত্য বলতে কি বোঝ? এ ধারার সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১৬। চরিত সাহিত্য কি? মধ্যযুগের চরিত সাহিত্যের ধারা বর্ণনা কর।

১৭। চৈতন্য চরিত সাহিত্য অনন্য কেন? কয়েকটি চরিতগ্রন্থের গুণাগুণ আলোচনা কর।

১৮। টীকা লিখ : কড়চা, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস।

দশম অধ্যায়
অনুবাদ সাহিত্য
[রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত]

সকল সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে অনুবাদমূলক সাহিত্যকর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। 'সমৃদ্ধতর নানা ভাষা থেকে বিচিত্র নতুন ভাব ও তথ্য সঞ্চয় করে নিজ নিজ ভাষার বহন ও সহন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলাই অনুবাদ সাহিত্যের প্রাথমিক প্রবণতা।' ভাষার মান বাড়ানোর জন্য ভাষার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হয়, আর তাতে সহায়তা করে অনুবাদকর্ম। উন্নত সাহিত্য থেকে ঋণ গ্রহণ করা কখনও অযৌক্তিক বিবেচিত হয় নি। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষার সীমিত শব্দাবলিতে কোন বিশেষ ধ্যানধারণা তত্ত্ব-তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষা-সাহিত্যের সান্নিধ্যে এলে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিশব্দ তৈরি করা সম্ভব হয়, অন্য ভাষা থেকে প্রয়োজনীয় শব্দও গ্রহণ করা যায়। অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের বক্তব্য আয়ত্তে আসে। ভাষা ও সাহিত্যের যথার্থ সমৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ ও সম্পদশালী ভাষায় উৎকর্ষপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির অনুবাদ একটি আবশ্যিক উপাদান। নতুন বিকাশমান ভাষার পক্ষে অনুবাদ 'আত্মোন্নতি সাধনের এক অপরিহার্য পন্থা।'

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল এবং পরিণামে এ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। সত্যিকার সার্থক সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে সৃষ্টি করার বিস্তর বাধা থাকলেও ভাষা সাহিত্যের গঠনযুগে অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই ড. দীনেশ সেন মন্তব্য করেছেন, 'ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রথমত অনুবাদ গ্রন্থেরই আবশ্যক।' অনুবাদমূলক সাহিত্যসৃষ্টি ভিত্তি করেই মুখের ভাষা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হয়ে থাকে। আবার এ ধরনের রচনা সাহিত্যকে সম্প্রসারিত হতে সাহায্য করে। শ্রেষ্ঠ ভাষা থেকে সাহিত্যিক অনুবাদের মাধ্যমে নতুন ভাষা কেবল সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার ও দক্ষ প্রকাশরীতিই আয়ত্ত করে না, শ্রেষ্ঠতর ভাবকল্পনার সঙ্গেও পরিচিত ও অন্বিত হতে পারে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনুবাদ শাখার ভূমিকা থেকে এ কথার তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করা যায়।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়ের বেলায় শুদ্ধ অনুবাদ অভিপ্রেত। কিন্তু সাহিত্যের অনুবাদ শিল্পসম্মত হওয়া আবশ্যিক বলেই তা আক্ষরিক হলে চলে না। ভিন্ন ভাষার শব্দ সম্পদের পরিমাণ, প্রকাশক্ষমতা ও বাগভঙ্গি অনুযায়ী ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত কথায় সংকোচন, প্রসারণ, বর্জন ও সংযোজন আবশ্যিক হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে অনুবাদের ধারাটি সমৃদ্ধি লাভ করে তাতে সৃজনশীল লেখকের প্রতিভা কাজ করেছিল। সে কারণে মধ্যযুগের এই অনুবাদকর্ম সাহিত্য হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে।

প্রাচীন যুগ থেকে বাঙালিরা সংস্কৃত পালি ও প্রাকৃত ভাষা এবং মধ্যযুগ থেকে হিন্দি আরবি ফারসি ইত্যাদি ভাষার সংস্পর্শে এসেছে। সাহিত্যসৃষ্টিতে উপাদান যুগিয়ে এ সব ভাষা বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। শব্দসম্ভার বৃদ্ধিতে অন্যান্য ভাষার অবদান থাকলেও সাহিত্যসম্পর্কিত প্রভাবই এগুলোর বেশি। বাংলাদেশে আর্য সভ্যতার সম্প্রসারণে সংস্কৃত ভাষায় ধর্মশাস্ত্র ও কাব্য নাটকাদি রচিত হয়। সংস্কৃতে রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হিসেবে বাঙালিকে বিমুগ্ধ করেছে। মধ্যযুগে মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হলে মুসলমান শাসকেরা এ দেশের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম আকর্ষণও দেখিয়েছিলেন। এ দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি এই কৌতূহলবশত অনেক মুসলমান শাসক সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতের গল্প বাংলা ভাষায় পরিবেশন করার জন্য কবিগণকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শাসকগণের সহানুভূতি লাভ না করলে মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের এত উৎকর্ষপূর্ণ বিকাশ সাধিত হত না।

এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা ভাষায় অনুবাদকর্মের সূচনা হয় রাজদরবারে। রাজকর্মচারী গুণরাজ খান মালাধর বসু সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৯-৭৪) আমলে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে ভাগবত অনুবাদ শুরু করেন ১৪৭২-৭৩ সালে এবং শেষ করেন শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের আমলে ১৪৮১ সালে। কবি কৃত্তিবাসও সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহের শুভেচ্ছা লাভ করেছিলেন। চট্টগ্রামের সেনানী শাসক পরাগল খানের কর্মচারী কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসও পরাগল খানের নির্দেশে 'মহাভারত' রচনা করেন, কবি শ্রীকরনন্দীও তেমনি ছুটিখানের প্রত্যক্ষ আগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষণে মহাভারতের 'অশ্বমেধপর্ব' রচনা করেছিলেন। এতে বোঝা যায় বিদেশি বিভাষী বিধর্মী শাসক শাসনের সুবিধার জন্য দেশি লোকদের জাতীয় সত্তার ও জাতীয় আত্মার সন্ধান নিতে আগ্রহী ছিলেন। প্রশাসনিক প্রয়োজনও ছিল, শাসিত জনের জীবন-চেতনার ও জগৎ ভাবনার, তথা তার ধর্মতত্ত্ব, শাস্ত্র, ঐতিহ্য, জীবনাদর্শ, আচার আচরণ, রীতি রেওয়াজ, ন্যায়-অন্যায়বোধ জানা না থাকলে শাসক শাসিতের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে, আশঙ্কা থাকে প্রজার অসন্তোষের, বিক্ষোভের বিদ্রোহের। তাই ইংরেজরা যেমন করেছিল পরবর্তীকালে, ঠিক তেমনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল তুর্কিদেরও। তাঁরা হিন্দুর বিধিবিধান জানার জন্য দরবারে পণ্ডিত এবং প্রশাসনে সাহায্য সহায়তা করার জন্য হিন্দু কর্মচারী রাখতেন। যেহেতু হিন্দুর মন-মনন, আচার-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-ইতিহাস তাদের জাতীয় মহাকাব্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত মাধ্যমে জানা সহজ, সেহেতু ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত অনুবাদে সুলতানেরা পনের শতক থেকেই উৎসাহ দান করেন।' রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুদের জাতীয় মহাকাব্য। হিন্দু জাতির জীবনদর্শনের সর্বাত্মক প্রতিফলন ঘটেছে এই দুই মহাকাব্যে। মহাকাব্য দুটি জাতীয় সংহতি ও একাত্মতার প্রতীক। তাই মুসলমান শাসনামলে হিন্দুদের মধ্যে যখন আত্মসচেতনার সৃষ্টি হচ্ছিল তখন এসব সংস্কৃত মহাকাব্য বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং মুসলমান শাসকগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য

উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। রামায়ণ-মহাভারতের যে প্রভাব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লক্ষ করা যায় তা আধুনিক যুগেও সম্প্রসারিত হয়ে আছে।

তাছাড়া মুসলমান শাসনামলে এ দেশে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় যে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছিল তা রোধ করার জন্য বাংলা ভাষায় রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের নীতি আদর্শ ও তত্ত্ব-কাহিনি প্রচারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সকল শ্রেণির হিন্দুর মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থা আনয়ন করতে না পারলে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করা যাবে না বলে ধারণা হয়েছিল। অভিজাত ও অনভিজাত হিন্দুর মিলন প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বাহক মহাকাব্য ও পুরাণাদির অনুবাদের প্রেরণা আসে। তাই অনুবাদের মাধ্যমে এ সব গ্রন্থের ভাবাদর্শ লোকভাষা বাংলায় বহুল প্রচারিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের বিস্তারিত নিদর্শন লক্ষ করলে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত সাহিত্যের বিবরণে দেখা যায়, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যেমন সংস্কৃত থেকে এসেছে, তেমনি আরবি, ফারসি, হিন্দি থেকে প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় বহু গ্রন্থ, জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য, মুসলিম ধর্মসাহিত্য, সওয়াল সাহিত্য ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দান, বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং কালের ব্যবধানের প্রেক্ষিতে এই সব সাহিত্যসৃষ্টি স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রচারিত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণ অনুবাদের মাধ্যমে সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। এ দেশে মুসলমান শাসন ও ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আরবি-ফারসি সাহিত্যের ঐতিহ্য এখানে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মুসলমান কবিগণ অনুবাদভিত্তিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর সাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার সূত্রপাত করেন। তা ছাড়া তাঁরা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত সাহিত্যও বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এ ভাবে ব্যাপক পরিসীমা নিয়ে মধ্যযুগের বৈচিত্র্যধর্মী অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। হিন্দু ও মুসলমান কবিরা অনুবাদ জাতীয় কাব্য রচনার কৃতিত্বের দাবিদার। হিন্দু কবিরা যেমন তাঁদের ধর্ম ও ঐতিহ্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, মুসলমান কবিরাও তেমনি স্বকীয় পরিমণ্ডল থেকে বিষয়াহরণ করে কাব্যসৃষ্টিতে তৎপরতা দেখিয়েছেন। সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির কবিরা নিজ নিজ ঐতিহ্যেরই আন্তরিক অনুসারী ছিলেন।

সাধারণ মানুষের উপভোগ্য করার দিকে কবিরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন বলে এ সব অনুবাদ তেমন আক্ষরিক ভাবে সম্পাদিত হয় নি। কোথাও কিছুটা আক্ষরিক, অধিকাংশ ভাবানুবাদ; আবার কখনও কখনও স্বকপোলকল্পিত ভাব পরিবেশনের মাধ্যমে কবিগণ নিজেদের মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে অনুবাদ সাহিত্য মৌলিক গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয় হতে পেরেছে। আধুনিক যুগের অনুবাদ আক্ষরিক। মধ্যযুগের মত এখানে মৌলিকতার নিদর্শন নেই।

রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদের পেছনে মুসলিম শাসকগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতা বর্তমান ছিল। কিন্তু প্রণয়োপাখ্যান, ধর্মকথা ইত্যাদি বাংলায় রূপান্তরের বেলায় কবিরা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি শেখ মুত্তালিব বলেছেন :

আরবীতে সকলে ন বুঝে ভাল মন্দ।
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ ॥
মুছলমানী শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলু।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু ॥
কিন্তু মাত্র ভরসা আছয়ে মনান্তরে।
বুঝিয়া মুমিন দোয়া করিব আমারে ॥
মুমিনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক।
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ খেমিবেক ॥

কবি মুজাম্মিল লিখেছেন :

আরবী ভাষার লোকেঁ ন বুঝে কারণ।
সভানে বুঝিতে কৈলুঁ পয়ার রচন ॥
যে বলে বলৌক লোকেঁ করিলুং লিখন।
ভালে ভাল মন্দে মন্দ ন যাএ খণ্ডন ॥

কবি মোহাম্মদ কবীর লিখেছেন :

মনোহর মালতীর অকুল পিরীতি।
গাহিব সকল লোক মন হরষিত ॥
এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দীতে আছিল।
দেশি ভাষায় মুঞি পাঞ্চালি ভণিল ॥
অন্ত অন্তে অন্ত যএ সিন্ধু তার কাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল নিজিরার পাঁচ ॥
পণ্ডিত জনার ঘিন্না মূর্খের গোহারি।
শিরে ধরি কাব্য কথা দিলুং সঞ্চারি ॥
মোহাম্মদ কবিরে কহে ভাবিয়া আকুল।
কি জানি ডুবিব শেষে এই কুল অই কুল ॥

জাতীয় জীবনের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন মুসলমান কবিরা। ধর্মীয় বিষয় দেশি ভাষা বাংলায় পরিবেশন করায় যে সংস্কার বাধা হয়ে উঠেছিল তা অতিক্রম করার সাধনা ছিল কবিগণের। তাছাড়া নিজস্ব ঐতিহ্য যে কাব্যসাধনাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে তা নিশ্চয়ই তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন।

বিভিন্ন ভাষা থেকে মধ্যযুগে যে সব কাব্য অনূদিত হয়েছে তার সংখ্যা কম নয়। সংস্কৃত ভাষা থেকে একটা বিরাট অংশ গৃহীত হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রধান প্রধান উল্লেখযোগ্য কাব্য হল রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত। এ ছাড়া কিছু প্রণয়োপাখ্যান ও নাটক সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। মুসলমান কবিগণের হাতে ফারসি থেকে কতগুলো প্রণয়োপাখ্যান বাংলায় অনূদিত হয়। ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, গুলে বকাওলী, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, সপ্তপয়কর ইত্যাদি নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হিন্দি থেকেও কতিপয় প্রণয়কাব্য বাংলায় অনূদিত হয়েছে। সে সবের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্মাবতী, সতীময়না লোরচন্দ্রানী, মধুমালতী, মৃগাবতী ইত্যাদি। মুসলিম রচিত অনুবাদ শাখার বিষয়বস্তু ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্যগুলো এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম ধর্মসাহিত্য ও সওয়াল সাহিত্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। আরবি ও ফারসি ভাষা থেকেও অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল।

হিন্দি ও ফারসি থেকে অনূদিত প্রণয়োপাখ্যানগুলো বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এক স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছে। মধ্যযুগে ধর্মনির্ভর সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে প্রণয়োপাখ্যান-গুলো মানবিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ এবং গতানুগতিক ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম। এ ক্ষেত্রে মুসলমান কবিগণের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রণয়োপাখ্যানগুলো স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

মধ্যযুগের অনুবাদক কবিগণের বিষয় নির্বাচনের স্বরূপ বিশ্লেষণে লক্ষ করা যাবে যে, হিন্দু-মুসলমান কবিগণ নিজ নিজ ধর্ম ও ঐতিহ্য থেকে যেমন উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তেমনি ভাষাগত উৎস সম্পর্কিত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দু কবিগণ সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য সম্পদের মধ্যে তাঁদের কাব্যসৃষ্টির উৎস খুঁজে পেয়েছেন। সংস্কৃত থেকে পৌরাণিক কাব্য, প্রেমোপাখ্যান ও নাটক বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। অন্যদিকে মুসলমান কবিদের উৎস ছিল আরবি, ফারসি ও হিন্দি ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্য। আরবি থেকে এসেছে ধর্মীয় গ্রন্থ, ফারসি থেকে এসেছে ধর্মীয় ও প্রেমোপাখ্যান এবং হিন্দি ভাষা থেকে এসেছে প্রেমোপাখ্যান।

অনূদিত গ্রন্থের তালিকা

ড. ওয়াকিল আহমদ সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও হিন্দি উৎস থেকে বাংলায় অনূদিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তালিকাটি নিম্নরূপ :

ভাষা	অনুবাদ গ্রন্থ	লেখক	মূলগ্রন্থ/উৎস
সংস্কৃত পৌরাণিক কাব্য	রামায়ণ	কৃত্তিবাস, অদ্ভুতাচার্য, চন্দ্রাবতী, দ্বিজ গঙ্গা-নারায়ণ, ঘনশ্যাম দাস, ভবানীদাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, রামশঙ্কর, কৈলাস বসু, ষষ্ঠীবর সেন, শিবচন্দ্র সেন, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুনন্দন গোস্বামী, রামানন্দ ঘোষ ইত্যাদি	বাল্মীকি-রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ এবং রামকথা বিষয়ক অন্যান্য পুরাণ।
	মহাভারত	কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয়, রামচন্দ্র খান, দ্বিজ রঘুনাথ, কাশীরাম দাস, দ্বিজ অভিরাম, নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বৈপায়ন দাস, কৃষ্ণরাম ইত্যাদি।	ব্যাসকৃত মহাভারত, জৈমিনি-ভারত ও অন্যান্য পুরাণ কথা

ভাষা	অনুবাদ গ্রন্থ	লেখক	মূলগ্রন্থ/উৎস
	ভাগবত (শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, গোপালবিজয়, কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী)।	মালাধর বসু, সনাতন বিদ্যাবাগীশ, কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণকিঙ্কর, দ্বিজ হরিদাস, অভিরাম দত্ত, কবি শেখর, কবিচন্দ্র, দ্বিজ মাধব, পরশুরাম চক্রবর্তী ইত্যাদি।	ভাগবত পুরাণ (ব্যাসদেব কৃত), বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি।
	কৃষ্ণকর্ণামৃত	যদুনন্দন দাস	কৃষ্ণকর্ণামৃত (বিল্বমঙ্গল-কৃত) ও সারঙ্গরঙ্গদা (কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত)।
	দানলীলাচন্দ্রামৃত	যদুনন্দন দাস	দানকেলিকৌমুদী (রূপ-গোস্বামীকৃত)।
	গোবিন্দবিলাস	যদুনন্দন দাস	গোবিন্দলীলামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত)।
	হংসদূত	নরসিংহ দাস ও নরোত্তম দাস	হংসদূত (রূপগোস্বামী কৃত)।
	বিলাপকুসুমাঞ্জলি	রাধাবল্লভ দাস	বিলাপকুসুমাঞ্জলি (রঘুনাথ গোস্বামীকৃত)
প্রেমাখ্যান	বিদ্যাসুন্দর	দ্বিজ শ্রীধর, সাবিরিদ খান	চৌরপঞ্চাশিকা (বিলহণ-কৃত), বিদ্যাসুন্দরম (বররুচিকৃত)।
নাটক	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়	প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় (কবিকর্ণপুর রচিত)।
	জগন্নাথবল্লভ	লোচনানন্দ দাস ও অকিঞ্চন দাস	জগন্নাথবল্লভ (রামানন্দ রায় কৃত)।
	রসকদম্ব	যদুনন্দন দাস	বিদগ্ধমাধব (রূপগোস্বামী কৃত)
আরবি ধর্মীয় গ্রন্থ	নবীবংশ	সৈয়দ সুলতান	কিসাসুল আমবিয়া (স'লাবা বিরচিত)।
	আম্বীয়াবাণী	হেয়াত মাহমুদ	ঐ
	কিফায়িতুল মুসল্লীন ও কায়দানি কেতাব	শেখ মুত্তালিব	ফিকাহ্-হাদিস ইত্যাদি।
	দাকাইকুল হকাইক	সৈয়দ নুরউদ্দীন	কনজুদ-কদায়িক (ইমাম হাফিজুদ্দীন আবুল বরকত আবদুল্লাহ রচিত)
	সায়াতনামা	মুজাম্মিল	ইলমুস-সায়াৎ।
ফরাসি প্রেমাখ্যান	ইউসুফ-জোলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ।	ইউসুফ ওয়া জুলয়খা (জামীকৃত)।

ভাষা	অনুবাদ গ্রন্থ	লেখক	মূলগ্রন্থ/উৎস
	লায়লী-মজনু	দৌলত উজীর বাহরাম খান মুহম্মদ খাতের।	লায়লা ওয়া মজনুন্ (নিজামীকৃত)।
	হানিফা ও কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	(অজ্ঞাত)
	সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান	দোনা গাজী চৌধুরী, আলাওল, ইব্রাহিম।	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা।
	সপ্ত পয়কর	আলাওল	হফত পয়কর (নিজামীকৃত)।
	সিকান্দরনামা	আলাওল	সিকান্দরনামা (ঐ)।
	জেবলমুলুক শামারুখ	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	(অজ্ঞাত)
	গুলেবকাওলী	নওয়াজিস খান, মুহম্মদ মুকীম	তাজুলমূলক্ গুল-ই বকা গুলী (ইজ্জতুল্লাহকৃত)।
ধর্মীয় গ্রন্থ	নসিহৎনামা	শেখ পরান, আবদুল হাকিম, শেখ সুলায়মান	(অজ্ঞাত)
	সিহাবুদ্দীন নামা	আবদুল হাকিম	(অজ্ঞাত)
	নূরনামা	আবদুল হাকিম, আবদুল করিম ও মীর মুহম্মদ শফী	(অজ্ঞাত)
	তোহফা	আলাওল	তোহফাতুন নেসায়েহ (ইউসুফ গদাকৃত)
	ফায়েদুল মুক্তদী	মুহম্মদ মুকীম, বালক ফকীর	(অজ্ঞাত)
	ফিকরনামা	শেখ শেরবাজ চৌধুরী	(অজ্ঞাত)
	মুসার সওয়াল	নসরুল্লাহ খান, মুহম্মদ আকিল	(অজ্ঞাত)
	তুতীনামা	মুহম্মদ নকী	(অজ্ঞাত)
	হাতেম তাই	সাদতুল্লাহ, সৈয়দ হামজা	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা
	আমীর হামজা	আবদুন নবী, সৈয়দ হামজা	কিস্সা-ই-আমীর হামজা (মোল্লা জালাল বালখি কৃত)
শোককাব্য	মকতুল হোসেন	মুহম্মদ খান, ফকির গরীবুল্লাহ	(অজ্ঞাত)
হিন্দি প্রেমাখ্যান	সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী	কাজী দৌলত, আলাওল	মৈনাসত (সাধনকৃত), চন্দায়ন (মোল্লা দাউদকৃত)
	পদ্মাবতী	আলাওল	পদুমাবত (মালিক মুহম্মদ জায়সীকৃত)।
	মধুমালতী	মুহাম্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা, মুহম্মদ চুহর, শাকের মুহম্মদ	মধুমালত (মনঝনকৃত)।
	মৃগাবতী	মুহম্মদ মুকীম, ভবানন্দ (হরিবংশ), দ্বিজ পশুপতি (চন্দ্রাবলী), করীমুল্লাহ (যামিনীভান)।	মৃগাবত (কুতবনকৃত)।

প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ মহাভারত ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ বাংলা অনুবাদ সাহিত্য নামে চিহ্নিত। পনের শতক থেকেই এ সবের অনুবাদ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। মধ্যযুগের বাঙালি মানসের বিবর্তনের জন্য এ সব অনুবাদ সাহিত্যের ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলার লোকভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের আগ্রহ দেখা দেয়। অভিজাত পৌরাণিক-ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যকে সংস্কৃত ভাষার আবরণ মুক্ত করে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করার চেষ্টাই সেদিন মুখ্য ছিল। মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল উদার এবং হিন্দু সমাজকল্যাণব্রতীরা এ ক্ষেত্রে তৎপর ছিলেন। পনের শতকের শেষার্ধে জীবিত কবি কৃত্তিবাস কর্তৃক রামায়ণ অনুবাদের মাধ্যমে এই ধারার সূত্রপাত হয়েছে এবং মহাভারত ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে তার সম্প্রসারণ ঘটেছে।

রামায়ণ

সংস্কৃত কবি বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে সমগ্র ভারত-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। রামায়ণ আদি মহাকাব্য। শিল্পসম্মত ও আলঙ্কারিক কাব্যকৃতি রূপে রামায়ণই প্রথম কাব্য। রামায়ণ মহাকাব্যে আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্বাত্মক বিকাশের রূপ ফুটে উঠেছে। রামায়ণ সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত। কাণ্ডগুলো হল : বাল, অযোধ্যা, আরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তর কাণ্ড। চব্বিশ হাজার অনুষ্টুপ শ্লোকে এটি রচিত। প্রথম ও শেষ কাণ্ড দুটি বাল্মীকির রচিত নয় বলে পণ্ডিতদের অনুমান। এই দুই কাণ্ডে রামকে বিষ্ণুর অবতার বলে নির্দেশ করে ভক্তি দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাকি পাঁচটি কাণ্ড সংহত ও মহাকাব্যের রীতি অনুসারে রচিত এবং এগুলোতে রাম বীর ও আদর্শ চরিত্র রূপে অঙ্কিত হয়েছে।

রামায়ণে আদর্শ আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিভূ রামচন্দ্রের গৌরবগাথা বর্ণিত হলেও এই কাব্যে তিনটি পৃথক কাহিনিতে তিনটি চিরন্তন জীবনসত্য বিধৃত হয়েছে। অযোধ্যা কাণ্ডে ঈর্ষার অগ্নিতে মানব জীবনকে তীব্র তরঙ্গসংকুল করে তুলেছে। দ্বিতীয় কাহিনিটিতে আছে সুগ্রীব ও বানরগোষ্ঠীর ঘটনা প্রসঙ্গ—সেখানে গৃহবিবাদে এসেছে পরাধীনতার শৃঙ্খল। তৃতীয় পর্যায়ে লঙ্কাকাণ্ডে নারীর মর্যাদা হানি যে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ এবং এতে যে ধ্বংস অনিবার্য তা দেখানো হয়েছে।

রামচন্দ্রের কাহিনি এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল বলে মনে করা হয়। এ কাহিনি অবলম্বনে বাল্মীকি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রামায়ণ রচনা করেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে রামায়ণ কাহিনির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবত অনার্যেরাই এই গল্পের আদি জন্মদাতা। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এই গল্পের মালমসলা হাতে পেয়ে একে নতুন রূপ দান করলেন—ছন্দে ও ভাবৈশ্বর্যে যা অপরূপ। সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে এটাই প্রথম সজ্ঞান শিল্পসৃষ্টি প্রচেষ্টা। এ ঘটনা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের। ব্রাহ্মণগণ রামায়ণের নায়ককে

বিষ্ণু অবতার রূপে দাঁড় করিয়ে অন্যান্য বীর, বানর, রাক্ষস, অযোধ্যার রাম ও লঙ্কার রাবণকে একই সূত্রে গ্রথিত করে একটি মহাকাব্য গড়ে তুললেন। এই সংস্কৃত মহাকাব্য বাল্মীকির নামের সঙ্গে যুক্ত হল।

রামায়ণের কাহিনী

অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম। দশরথের তিন রানির গর্ভে চার পুত্রের জন্ম হয়। তার মধ্যে কৌশল্যার গর্ভজাত রাম সর্বশ্রেষ্ঠ। এঁর পরে কৈকেয়ীর গর্ভজাত ভরত ও সুমিত্রার গর্ভজাত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ।

দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছা করেন। এই সংবাদে দাসী মন্থরার প্ররোচনায় দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী ভরত-জননী কৈকেয়ী ঈর্ষান্বিতা হয়ে পড়েন। আশৈশব রামকে স্নেহ করলেও মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী দশরথের পূর্ব প্রতিজ্ঞার সুযোগে, এক বরে ভরতের যৌবরাজ্য লাভ ও অন্য বরে রামের চৌদ্দ বছর বনবাসের ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে সীতা ও লক্ষ্মণ রামের অনুগমন করেন।

পিতৃসত্য পালনার্থ রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে বন্ধু নিষাদরাজ গুহের সাহায্যে গঙ্গা উত্তীর্ণ হন। প্রয়াগের নিকট ভরদ্বাজমুনির আতিথ্য গ্রহণ করেন ও তাঁর পরামর্শে দণ্ডকারণ্যের চিত্রকূট পর্বতে বাস করতে থাকেন। রামের বনগমনের পর দশরথ পুত্রশোকে প্রাণ ত্যাগ করেন। ভরত রাজ্যলোভ ত্যাগ করে রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য চিত্রকূটে উপস্থিত হন। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসকাল পূর্ণ করার সংকল্প স্থির রাখেন। তাতে ভরত রামের পাদুকা তাঁর প্রতীকস্বরূপ সিংহাসনে স্থাপন করে রামের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। এরপর এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে বাস করে রাম নির্বাসনের দশ বছর কাটিয়ে বিন্ধ্য পর্বতে অগস্ত্যমুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। অগস্ত্য মহাসমাদরে অতিথি-সৎকার করে রামকে বৈষ্ণবধনু, ব্রহ্মাস্ত্র ও অক্ষয় তূণীর দান করলেন। মহর্ষির উপদেশানুসারে রাম গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বনে কুটির নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। তখন এই বন রাক্ষসে পরিপূর্ণ ছিল। রাবণের বিধবা ভগিনী শূর্পণখা এই বনে বাস করত। এই রাক্ষসী রামের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রণয় নিবেদন করলে রাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও বিতাড়িত হয়ে সীতাকে গ্রাস করবার চেষ্টা করে। রামের আদেশে লক্ষ্মণ এই রাক্ষসীর নাক ও কান কেটে দিলেন। তারপর শূর্পণখার দুই রক্ষক খর ও দূষণ রামকে আক্রমণ করলে, রাম তাদের দুজনকে এবং সমস্ত সৈন্যকে বধ করে পঞ্চবটী বন রাক্ষসশূন্য করেন। শূর্পণখা তখন তার ভাই রাবণের নিকট সমস্ত সংবাদ নিবেদন করল। রাবণ সীতার রূপলাবণ্যের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে ও ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচের সহিত পঞ্চবটী বনে যান। মায়াবী মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে সীতার সম্মুখে ভ্রমণ করতে লাগল। সীতা তখন রামকে ঐ স্বর্ণমৃগ এনে দিতে অনুরোধ করায়, রাম লক্ষ্মণকে কুটিরে রেখে স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করে মৃগকে শরাঘাত করলেন। শরবিদ্ধ মারীচ রামের স্বর অনুসরণ করে 'হা লক্ষ্মণ, হা সীতা' বলে প্রাণত্যাগ করল। এই কাতরোক্তি শুনে রামের বিপদ আসন্ন ভেবে সীতা লক্ষ্মণকে রামের খোঁজ করতে পাঠালেন। এই সুযোগে রাবণ গুপ্তস্থান থেকে ভিক্ষুকবেশে উপস্থিত হয়ে বলপূর্বক সীতাকে নিজের রথে চড়িয়ে লঙ্কার দিকে প্রস্থান

করলেন। রাম ও লক্ষ্মণ কুটিরে ফিরে এসে কুটির শূন্য দেখে সীতা অন্বেষণে যাত্রা করে পথে মস্তকহীন কবন্ধকে হত্যা করলে তার অশরীরী আত্মা বানররাজা সুগ্রীবের সাহায্য গ্রহণ করতে বলল। সুগ্রীবকে তার ভাই বালীর হাত থেকে হৃত রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা উদ্ধারে সাহায্য করাতে রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা স্থাপিত হল। এর ফলে সীতা উদ্ধারে সমস্ত বানরকুল ও হনুমানের সাহায্য পেলেন। লঙ্কায় উপস্থিত হলে রাবণের কনিষ্ঠ ভাই বিভীষণ সীতাকে মুক্তি দেবার জন্য রাবণকে বলেন। এতে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বিভীষণকে অপমাণিত করলে বিভীষণ রামের পক্ষে যোগদান করলেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে রাম-লক্ষ্মণ রাবণকে সবংশে সংহার করে সীতাকে উদ্ধার করলেন ও বিভীষণকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সীতার সম্বন্ধে রাম বললেন, চরিত্ররক্ষা, অপবাদ খণ্ডন এবং তাঁর বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করার জন্য সীতাকে বর্জন করবেন। এই অশ্রুতপূর্ব কথা শুনে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করবেন ঠিক করলেন। তখন সীতা প্রজ্জ্বলিত চিতায় প্রবেশ করলেন। প্রথমে অগ্নিতে স্বর্ণ প্রতিমা সীতা বিলীন হয়ে গেলেন। তারপর অগ্নি সীতাকে রামের নিকট ফিরিয়ে দিয়ে সীতার সুচরিত্র সতীত্বের প্রমাণ করে দিলেন।

এভাবে চৌদ্দ বছর পর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অযোধ্যায় ফিরে এলে ভরত রামের হাতে রাজ্যভার প্রত্যার্পণ করলেন। তখন রাম রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন। এই সময়ে তিনি শুনতে পেলেন, সীতা দীর্ঘকাল রাবণের গৃহে একাকী বন্দিনী থাকায় প্রজারা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে নানারকম কুৎসা রটনা করছে। সীতাকে নিজে সতী জেনেও প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য রাম লক্ষ্মণকে বললেন, সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করে আসতে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্মণ এই আদেশ পালন করলেন। তখন সীতা পূর্ণগর্ভা ছিলেন।

এর পর রাম অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলেন। সীতা বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যক্তা হবার পর তাঁর দুই যজম পুত্রের জন্ম হয়। মহর্ষি এদের নাম দিলেন— লব ও কুশ। বাল্মীকি কুশ ও লবকে যত্ন সহকারে শিক্ষা দিলেন। রামের অশ্বমেধযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে বাল্মীকি লব ও কুশের সাথে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। লব কুশের রামায়ণ গান শুনে রাম মুগ্ধ হলেন এবং এদের আকার ও অবয়ব দেখে নিজের পুত্র বলে বুঝতে পারলেন। বাল্মীকির কাছে সীতার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা শুনে রাম সীতাকে রাজসভায় আনতে বললেন। বাল্মীকি সীতাকে আবার অযোধ্যায় এনে বললেন, রাম, তুমি লোকাপবাদে ভীত, এখন আজ্ঞা কর, সীতা তোমায় প্রত্যয় উৎপাদন করবেন। তখন সীতা অত্যন্ত ব্যথিতা হয়ে মাতা বসুধার কোলে স্থান পাবার জন্য প্রার্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হল এবং সীতা তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেন। সীতাকে হারিয়ে রাম বিষণ্ন চিত্তে দিন কাটাতে লাগলেন। এমন সময় একদিন কালপুরুষ তাঁর কাছে এসে গোপনে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। কিন্তু সেই গোপন কথাবার্তার সময়ে কেউ সেখানে উপস্থিত হলে রাম তাকে বর্জন করবেন, এইরূপ স্থির ছিল। লক্ষ্মণ প্রহরীরূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে সেখানে দুর্বাসা মুনি এসে উপস্থিত হয়ে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। লক্ষ্মণ সাক্ষাৎকারে বাধা দিলে তিনি লক্ষ্মণকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন। তখন লক্ষ্মণ বাধ্য

হয়ে রামের নিকট উপস্থিত হলেন। রাম সত্য বাক্য পালনের জন্য লক্ষ্মণকে বর্জন করতে বাধ্য হলেন। বর্জিত হবার পর লক্ষ্মণ সরযু সলিলে আত্মবিসর্জন করেন। প্রিয় ভাইকে বর্জন করার পর রাম শোকে ম্রিয়মান হয়ে কুশকে কোশলের ও লবকে উত্তর কোশলের রাজা করে সরযূতে প্রবেশ করে যোগাবলম্বনে প্রাণত্যাগ করেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

দীর্ঘ সময় ধরে রামায়ণ কাহিনি দেশে দেশে রসসঞ্চার করে এসেছে। বাল্মীকির রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করে কবি কৃত্তিবাস মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম জয়যাত্রা শুরু করেন। কালের আবর্তে এই অমর কবির প্রকৃত সৃষ্টিরূপ, তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় বিলীন হয়ে গেলেও, তিনি তাঁর অমর সৃষ্টির মাধ্যমে যে অবিনশ্বর ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাকে ড. সুকুমার সেন 'অসমসাহসিকতার নামান্তর' বলে অভিহিত করেছেন।

কৃত্তিবাসের কবিকীর্তি আশ্রয় করেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদকর্মের সগৌরব সূত্রপাত ঘটেছিল। কবির অবদান সম্পর্কে প্রবচনময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি হলেও তাঁর মূল সৃষ্টির আস্বাদ লাভ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'ছাপাখানার কল্যাণে ঘরে ঘরে আদি ও অকৃত্রিম (?) কৃত্তিবাসী রামায়ণের যত বিচিত্র আকারের গ্রন্থ বিরাজ করছে, তার একটিতেও এমন এক ছত্র পাওয়া দুরূহ, নিঃসংশয়ে যাকে কৃত্তিবাসের নিজের রচনা বলে দাবি করা যেতে পারে।' এর কারণ হিসেবে মনে করা হয় যে, সে আমলে একাধিক পুঁথি রচনা করা কবির পক্ষে সম্ভব হত না। তাই জনগণের মধ্যে পুঁথির প্রচলন হয় নি, কাব্যের প্রচলন হয়েছে পাঁচালি গানের মাধ্যমে। সে আমলে গায়েনের স্মৃতিশক্তিই ছিল কবিগণের সৃজনকীর্তির শ্রেষ্ঠ ধারক। অনুলিপি করার সময় লিপিকর প্রমাদ বা অন্য কারণে মূল রচনার স্বরূপ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। স্মৃতির বাহনে মূল রূপ অক্ষুণ্ন থাকে নি। আক্ষরিক অর্থে কোন প্রাচীন রচনায় অকৃত্রিম প্রতিরূপ লাভ সম্ভব নয়। কৃত্তিবাসের যে দীর্ঘ আত্মজীবনী পাওয়া গেছে তাতে কোন এক গৌড়েশ্বরের দরবারে কবি উপস্থিত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গৌড়েশ্বরের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান।

সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়' গ্রন্থে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, 'কৃত্তিবাস ১৪৪৩ সালের ৬ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ১৪৫৪ সালে ৪ঠা জানুয়ারি তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য উত্তরবঙ্গের দিকে রওনা হয়েছিলেন এবং ১৪৬৫ থেকে ১৪৭৬ সালের মধ্যে কোন এক সময়ে তিনি রুকনউদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৯-৭৪) সভায় গিয়ে গৌড়েশ্বরের কাছে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন।'

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, এই গৌড়েশ্বর হলেন রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৮-৩১)। তাঁর মতে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়েছিল ১৩৯৯ সালে। তবে পনের শতকের শেষার্ধে কবি জীবিত ছিলেন এ সম্পর্কে তেমন কোন সংশয় নেই। পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেছিলেন। কাব্যটি অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল বলে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত থেকে মূল ভাষা পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক হয়ে পড়েছে। তাই এ কাব্যের কোন প্রামাণিক নিদর্শন মিলে নি। ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝা আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥
*　　*　　*
চন্দনে ভূষিত আমি লোকে আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী ॥

নিজের সম্পর্কে কবির এই উক্তি যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। কৃত্তিবাসের অবদানের গুরুত্ব বিবেচনা করে ড. দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, 'কৃত্তিবাস যেদিন রাজার দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন, সে দিন নগরীতে ধন্য ধন্য শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, সেই ধন্যবাদের প্রতিধ্বনি এখনও লুপ্ত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে সে এক শুভ মুহূর্ত। তাঁহার পূর্বপুরুষ উৎসাহ যেরূপ আত্মমর্যাদা, তেজস্বিতা এবং বৈরাগ্যের সঙ্গে রাজকীয় স্বর্ণগাভী দান উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কৃত্তিবাসও সেইভাবে গৌড়েশ্বরের দান প্রতিগ্রহ করিতে সম্মত হন নাই। তিনি গৌরব চান, পার্থিব অর্থ নগণ্য, 'আমার রচনা অনিন্দ্য এই শুধু শুনিতে চাই।' সে কথা গৌড়েশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রতি গৃহে স্বীকৃত হইয়াছে।'

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে এটি আবিষ্কার করেছিলেন হারাধন দত্ত ভক্তনিধি। তিনি এটি ড. দীনেশ সেনকে দিয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগৃহীত আত্মজীবনীটি প্রকাশ করেন ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী। আত্মজীবনীটি নিয়ে শত বছর ধরে পণ্ডিতদের মধ্যে বাদানুবাদ চলেছে কিন্তু কৃত্তিবাসের জন্ম সাল ও গৌড়েশ্বরের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় নি। কৃত্তিবাস অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু জন্মের সন তারিখটি উল্লেখ করেন নি এবং গৌড়শ্বরের নামও বলেন নি। এর ফলেই অমিমাংসীত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়

'পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা ॥
দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভোগ ভুঞ্জিলেক সংসারের সার ॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর ॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান ব্রাহ্মণ খুজ্যা বুলে ॥
গঙ্গাতীরে দাণ্ডায়্যা ব্রাহ্মণ চতুর্দিকে চাই।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথাই ॥

পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুক্কুরের ধ্বনি ॥
কুক্কুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চাহে।
আকাশবাণী হয়্যা তথা ব্রাহ্মণ যে রহে ॥
মালী জাতি ছিল পূর্বে মালঞ্চেতে থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা ॥
গ্রামরত্ন জগতে যে ফুলিয়া বাখানি।
দক্ষিণ পশ্চিম চেপ্যা বহেন গঙ্গা-সোণি ॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি।
ধনে ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়এ সন্ততি ॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য গোবিন্দ তাহার তনয় ॥
জ্ঞানেতে কুলেতে শীলে মুরারি ভূষিত।
সাতপুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ঠাকুরাল ধর্মচরিত্র গুণে মহাগুণী ॥
মদন-আলাপে ওঝা সুন্দর মুরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি ॥
সুস্থির ভাগ্যবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলি ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞিঃ-প্রসাদে।
মুরারির পুত্র বাড়এ সম্পদে ॥
মাতা পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ॥
সংসারে আনন্দ লয়্যা আইল কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় ষড় রাত্রি উপবাস ॥
সহোদর শান্তিমাধব সর্বলোকে ঘুষি।
স্ত্রিকর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিনী হৈল সতাই উদর ॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী ॥
আপনার জন্মরস কহিব যে পাছে।
মুখটী বংশের কথা আর কহিতে আছে ॥
সূর্য পণ্ডিতের পুত্র হইল নাম বিভাকর।
সর্বত্র জিনিঞা পণ্ডিত বাপের সোসর ॥

সূর্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সহস্র লোক রয় যাহার দুয়ার ॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদ ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া ॥
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বড়ই সুন্দর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর ॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্যন্ত কীর্তি ঘুষএ সংসার ॥
মুখটী বংশের পদা শাস্ত্র অনুসার।
ব্রাহ্মণে সজ্জনে শিখে যাহার আচার ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মস্বজ্য গুণে।
মুখটী বংশের কথা কব জনে জনে ॥
আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।
শুভক্ষণে গর্ভে থাকি পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতামহ আমা কৈল কোলে ॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ ॥
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন কালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
বারান্তর উত্তরে গেলাম বড় গঙ্গার পার ॥
যথা যথা পাইলাম আমি বিদ্যার প্রচার।
তথায় করিনু আমি বিদ্যার উদ্ধার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার কলেবর।
নানা ছন্দে নানা ভাষা বিদ্যার প্রসর ॥
আকাশবাণী হৈল সাক্ষাৎ সরস্বতী।
তাহার প্রসাদে কণ্ঠে বৈসেন ভারথি ॥
বিদ্যাসাঙ্গ হইল প্রথম করিল মন।
গুরুকে দক্ষিণ দিয়া ঘরকে গমন ॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মিকি চ্যবন।
হেনগুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার প্রসন ॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উর্মাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥
গুরুকে মেলানি কৈল মঙ্গলবার দিসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥
সাতশ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বর।
সিংহময় রাজা আমি করিলাম গোচর ॥

সপ্তঘটি বেলা যখন দিয়ানে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধায়া আইল দূত হাতে সুবর্ণ লাটি ॥
কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশে হৈল করহ সম্ভাষ ॥
নয় বৃহন্দ গেল্যাম রাজার দুয়ার।
সোনারূপার ঘর দেখি মনে চমৎকার ॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাশে বস্যা আছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র বস্যা রাজা পরিহাসে মন ॥
গন্ধর্বরায় বসি আছে গন্ধর্ব অবতার।
রাজ-সভা-পূজিত তিঁহো গৌরব অপার ॥
তিন পাত্র দাণ্ডাইয়া আছে রাজ পাশে।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা করে পরিহাসে ॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্মাধিকারিণী ॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥
রাজার সভাখান যেন দেব-অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়াছে রাজার সমুখে ॥
চারিদিগে নাটগীত সর্বলোকে হাসে।
চারিদিগে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে ॥
আঙ্গিনায় পাতিআছে রাঙ্গা মাজুরি।
তথির উপর পাতিয়াছে পাটনেত তুলি ॥
পাটের চাঁন্দয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসের খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥
দাড়াইনু গিয়া আমি রাজাবিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে ॥
রাজা আজ্ঞা কৈল পাত্র ডাকে উচ্চস্বরে।
রাজার নিকটে আমি চলিলাম সত্বরে ॥
রাজার ঠাঞি দাণ্ডাইলাম চারিহাত আন্তর।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বর ॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে আমার মুখে শ্লোক সরে ॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িয়ে সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমাপানে চায় ॥

নানামতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্রে বলে গোসাঞি করিলে সম্মান ॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥
পাত্রমিত্র সভে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যত খুজ তত দিতে পারে মহারাজে ॥
কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার ॥
আকৃতি প্রকৃতি আমি যত অস্থিতি।
পাটপাছড়া পাইনু আমি চন্দনে ভূষিতি ॥
ধন আজ্ঞা কৈলে রাজা ধন নাঞি লই।
যথা যথা যাই আমি গৌরব সে চাহী ॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইনু রাজার দুয়ারে।
অপূর্ব জ্ঞানে ধায় লোকে আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোকে আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী ॥
বাপ মায়ের আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান ॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
মহারাজ আজ্ঞায় বাল্মীকি মহামুনি।
রামায়ণ কবিত্ব তিহোঁ করিলা আপুনি ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি কর‍্যা যত দেবগণ।
বাল্মীকি মুখে সবে শুনেন রামায়ণ ॥
পৃথিবী জিনিতে সবে চড়ে ইন্দ্রের কান্ধে।
দিগদিগান্তর জিনিতে কেহো সেতু বান্ধে ॥
কোন রাজা জীএ ষাটি হাজার বৎসর।
কোন রাজা মরণ জিনে সিদ্ধ কলেবর ॥
রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচিল বাল্মীক মুনি বরে ॥'

কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ থেকে কাহিনির সারভাগ গ্রহণ করে নিজের কল্পনার সঙ্গে পুরাণ ও অন্যান্য রামায়ণের ঘটনা মিলিয়ে পুরাতনী রামায়ণী কথাকে বাঙালির মনোভাবের অনুকূলে বর্ণনা করেছেন। কৃত্তিবাস গান গাওয়ার জন্য রামায়ণকে পাঁচালি হিসেবে রচনা করেছিলেন, মহাকাব্য হিসেবে পড়ার জন্য নয়। তাই তাঁর কাব্য জীবনের সঙ্গে বক্তব্যকে মিলিয়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাল্মীকির কাব্যের তুলনায় নীরস মনে হতে পারে। এ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'কৃত্তিবাস বাঙালি জনসাধারণের উপযোগী করে পাঁচালির ঢঙে মূল রামায়ণকে পরিবেশন করেছেন। তাই এতে আর্ষ-রামায়ণের সুগভীর ভাষাবৈদগ্ধ্য, চিত্রকল্পের বৈচিত্র্য, রামলক্ষ্মণাদির চরিত্র প্রভৃতি অতটা শিল্পসমুৎকর্ষ লাভ করে নি তা স্বীকার করতে বাধা নেই। মূল রামায়ণের বীর রামচরিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভক্তের ভগবানে পরিণত হয়েছেন, ক্ষত্রিয়বধূ সীতা হয়েছেন সর্বংসহা বাঙালি কুলবধূ, হনুমানের রঙ্গরস প্রভৃতিও বাঙালি সংস্কৃতিরই পরিচায়ক। এক কথায় কৃত্তিবাস মূল রামায়ণকে অনেকটা বাঙালির মনঃপ্রকৃতির অনুকূলে ঢেলে সাজিয়েছেন—তাই তাঁর গ্রন্থ বাঙালির জীবনে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।' কৃত্তিবাসের রামায়ণের সব কাণ্ডেই বর্ণনাগত ও ভাষাগত আঞ্চলিক ও কালিক বিকৃতি, সংযোজন, বর্জন, সংক্ষেপণ ইত্যাদি এত অধিক ও বিচিত্র যে তাঁর গ্রন্থ সম্পাদনায় আজ পর্যন্ত কেউ খুব নির্ভরযোগ্য সফলতা লাভ করতে পারেন নি। বর্তমানে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃত্তিবাসের রচনা কতটুকু তা নির্ণয় করা কঠিন। কৃত্তিবাসের পরে অসংখ্য রামায়ণ রচিত হয়েছে, কিন্তু জনপ্রিয়তায় কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন নি। কৃত্তিবাসের রচনায় 'আলঙ্কারিক নিপুণতা, বাগভঙ্গির তির্যকতা—সর্বোপরি পৌরাণিক বাঁধা পথের আলঙ্কারিক কৌশলের' সঙ্গে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনচিত্র মিশে আছে। যেমন :

চরণে নূপুর বাজে রুনঝুনু শুনি।
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি ॥

...   ...

ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সে ক্ষণে।
কাটিলে কদলী যেন ভূমিতে লোটায় ॥

...   ...

কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুর দুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে ॥

কবি কৃত্তিবাসের কাব্যের মূলরূপ অনুসন্ধান করা অসম্ভব। তবে কাব্যের বর্তমান রূপ থেকেও তাঁর প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করা কঠিন নয়। তাঁর কাব্যে তথ্যের দিক থেকে আছে মহাকবি বাল্মীকির বহুল অনুসরণ, ভাষায় আছে প্রথম রচয়িতার সংহত সাবধানী পদক্ষেপ, চরিত্রচিত্রণে আছে বাঙালি লোকজীবনের নৈকট্য—এ সব গুণের জন্যই কবি কৃত্তিবাস 'চিরকালের বাঙালি মনের নিত্যসঙ্গী' হয়ে আছেন আর তাঁর কাব্য হয়ে উঠেছে 'অভিজাত-অনভিজাত সংস্কৃতির মিলন সেতু।'

কৃত্তিবাস ছিলেন আদিমধ্যযুগ তথা চৈতন্যপূর্বযুগের কবি। এ সময়ের অনুবাদ সাহিত্য ভাবে ও ভাষায় অনেকাংশে মূলানুগত। চৈতন্যদেবের প্রভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে

যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার নিদর্শন অনুবাদ সাহিত্যেও প্রকাশমান। চৈতন্যোত্তর অনুবাদ সাহিত্য তত মূলানুগত না হয়ে বরং বেশি পরিমাণে ভাবানুগত ছিল। তাছাড়া ভাবানুগত অনুবাদের প্রচেষ্টা সংস্কৃত মূলের চেয়ে সমকালীন বাঙালি জীবনের বৈশিষ্ট্য দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছে। ফলে এ সময়ের অনুবাদে পৌরাণিক রাম চৈতন্য-জীবনাদর্শের প্রভাবে মানুষ রামে পরিণত হয়েছেন। শূরধর্মী কাব্যকে করা হয়েছে গৃহীধর্মী,—মহাকাব্যকে রূপায়িত করা হয়েছে আবেগ-প্রধান গল্পসমৃদ্ধ গাথাকাব্যে।

কৃত্তিবাসী-মুকুরে বাল্মীকির রামায়ণ প্রতিবিম্বিত হয় নি। বাল্মীকির রচনায় রামচন্দ্র দেবতা নন—দেবোপম, মানুষী শক্তি ও বীর্যবত্তার আতিশয্যে তাঁকে কখনও কখনও দেবতা বলে ভুল হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র আরাধ্য অবতার তুলসীচন্দনে লিপ্ত বিগ্রহ। কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে গিয়ে ড. দীনেশ সেন মন্তব্য করেছেন, 'গৌড়েশ্বর ধন্য যিনি কবিকে রামায়ণ অনুবাদের ভার দিয়া বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ হিতসাধন করিয়াছিলেন।' যুগপ্রভাবে সংস্কৃত আদর্শের মহাকাব্যিক শিল্পকলা ক্রমশ শিথিল হয়ে অজস্র কাহিনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

কবি কৃত্তিবাসের প্রাপ্ত রামায়ণ থেকে তাঁর কবিপ্রতিভার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'কৃত্তিবাসের কাব্যের যেসব পুঁথি আমরা পাই তাহাতে ভণিতা ছাড়া আর কিছু খাঁটি (অর্থাৎ মূল রচনা) অব্যাপন্ন রহিয়া যায় নাই।' তাই ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'কৃত্তিবাসের কবিত্ব-পাণ্ডিত্য ও কাব্যগুণ আলোচনা নিরর্থক।'

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক ১৮৩০-৩৪ সালে সংকলিত ও মুদ্রিত রামায়ণের ভাষা থেকে সহজেই ধারণা করা যাবে যে এতে প্রাচীনত্বের কোন লক্ষণই নেই। যেমন :

দশদিক শূন্য দেখি সীতার অভাবে।
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয়ে কে ভাবে ॥
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণি ॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন ॥

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বটতলা সংস্করণ নামে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে সংস্করণ প্রচলিত আছে তা সবই আসল পাঠ থেকে দূরে। ড. দীনেশ সেন ১৯১৬ সালে রামায়ণ সম্পাদনা কালে কাব্য কুণ্ডায়নের লোভ সামলাতে পারেন নি।

রামায়ণ রচনাকারীর মোট সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। পঞ্চাশ জনেরও বেশি কবির পরিচয় জানা গেছে।

অদ্ভুতাচার্য

কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ আচার্য। তিনি 'অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণকথা' রচনা করেছিলেন বলে নিজে এ নামে পরিচিত হন। পাবনা জেলার সোনাবাজু পরগনায় অমৃতকুণ্ডা গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ষোল শতকের কবি। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী কবির জন্ম আনুমানিক ১৫৪৭ সালে মনে

করেছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের রামায়ণ সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ স্থান পেয়েছে। এ কাব্য উত্তর ও পূর্ববঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এমন কি কৃত্তিবাসের ভণিতায় প্রচলিত আধুনিক কালের মুদ্রিত রামায়ণে অদ্ভুতাচার্যের কাহিনি ও কাব্যের প্রভাব সমধিক। কল্পনা ও স্বকীয়তায় কবি সংস্কৃত কাব্যের সাধারণ সংকলনের পরিচয়সীমা অতিক্রম করে তাকে বাঙালির জীবনগাথায় পরিণত করেছিলেন। অদ্ভুতাচার্যের রচিত রামায়ণ 'অদ্ভুত রামায়ণ' নামে পরিচিত হলেও সংস্কৃত ভাষায় রচিত অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে কোন সংশ্রব নেই। সম্ভবত তিনি রামায়ণের সপ্তকাণ্ডই রচনা করেছিলেন এবং আকৃতির দিক থেকে তা কৃত্তিবাসের রামায়ণের চেয়ে বড় ছিল। কবির রচনারীতি ছিল পরিচ্ছন্ন; তিনি সরসতা সহকারে করুণ রস ও আবেগপূর্ণ ভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত সহজ ভাষার জন্য বক্তব্যবিষয় পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। অদ্ভুতাচার্য ঘটনাবিবৃতি ও গালগল্প দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও ভক্তির আবেগ তাতে যথার্থ পরিস্ফুট হয় নি। কৃত্তিবাসের মত 'ভাষার ঝঙ্কার, প্রসন্নতা, ক্লাসিক গাম্ভীর্য, তৎসম শব্দের যথাযথ প্রয়োগ এবং দেশি শব্দের সার্থক ব্যঞ্জনা' অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে পাওয়া যায় না।

তাঁর রচনার নমুনা :

রাজার কুমার রাম ষুখের কায়া।
প্রচণ্ড রবির তাপে কেবা দিবে ছায়া ॥
বৃক্ষ্যছাল পরিধান হাতে ধনুর্ধনু।
কিমত হাটিবা বনে মাএর প্রাণতনু ॥
আমাকে ছাড়িয়া তুমি যাবা দেসান্তরে।
শ্রীরামের মাও বলি কে ডাকিবে মোরে ॥

চন্দ্রাবতী

মহিলা কবি চন্দ্রাবতী কিশোরগঞ্জ জেলার অধিবাসী ছিলেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, তিনি ১৫৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন 'মনসামঙ্গল' রচয়িতা কবি দ্বিজ বংশীদাস। কবি চন্দ্রাবতী নিজের জীবনে প্রেমের করুণ পরিণতির জন্য নিজেই লোককাব্যের নায়িকা হিসেবে পরিচিতা। চন্দ্রাবতীর বাল্যসখা জয়ানন্দের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কের ফলে বিয়ের সিদ্ধান্ত হয়। এমন সময় জয়ানন্দ এক মুসলমান মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে ফেলে। কিছুদিন পর অনুতপ্ত হয়ে জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে আসে এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে নদীতে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

জীবনের গভীর বেদনা ভুলে থাকার জন্য তিনি ফুলেশ্বরী নদীর তীরে শিবমন্দিরে উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনায় হস্তক্ষেপ করে জীবনের বেদনা ভুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা সমাপ্ত করার পূর্বেই তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়। তিনি কয়েকটি ক্ষুদ্র গাথাও রচনা করেছিলেন। ময়মনসিংহ গীতিকায় সে সব সংগৃহীত হয়েছে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি। লোককাহিনি সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক তা মহিলাকণ্ঠ থেকে সংগৃহীত হয়ে পূর্ববঙ্গ গীতিকায় উদ্ধৃত হয়েছে। আনুমানিক ষোল শতকের শেষে অথবা সতের শতকের প্রথমে চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তিনি গীতিকার একটা অংশমাত্র রচনা

করেন এবং তাও আংশিক ভাবে সংগৃহীত হয়েছে। চন্দ্রাবতী গ্রাম্য রামকথার ওপর নির্ভর করে মেয়েলি রীতিতে পালা রচনা করেছিলেন বলে তাতে অনুবাদ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের চেয়ে লোকসাহিত্যের লক্ষণ বেশি ফুটে উঠেছে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের 'ভাষা, বর্ণনা ও বাগভঙ্গিমা নারীসুলভ কোমলতায় পূর্ণ, প্রায় ছত্রেই ছড়ার সুর' অনুভব করা যায়। কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনা ছাড়াও ময়মনসিংহ গীতিকার মলুয়া ও দস্যু কেনারামের পালা গীতিকা দুটি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনার নিদর্শন :

আষাঢ় মাসেতে দিন রে ঘন বরিষণ।
তর্জিয়া গর্জিয়া আসে গো যত দেয়াগণ ॥
মেঘে তত নাইকো পানি সীতার চক্ষে জল।
কান্দিয়া ভিজাই আমি গো অশোকের তল ॥
বিষ খাই জলে ডুবি গো বুঝিতে না পারি।
সান্ত্বনা করিয়া রাখে গো সরমা সুন্দরী ॥

রামায়ণ রচনার ধারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সম্প্রসারিত হয়ে মধ্যযুগের পরিধি অতিক্রম করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। যে সব কবি সামগ্রিক বা আংশিক ভাবে রামায়ণের কথা বাংলায় প্রচার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—দ্বিজ মধুকণ্ঠ, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, দ্বিজ ভবানীদাস, দ্বিজ দুর্গারাম, জগৎরাম রায়, শিবচন্দ্র সেন, কবিচন্দ্র, শঙ্কর, লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুনন্দন গোস্বামী, রামানন্দ ঘোষ প্রমুখ।

মহাভারত

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের অনুবাদ বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, দু হাজার বছরের সকল ভারতীয় সাহিত্যের উপকরণ-উপাদান, আদর্শ ও বক্তব্য রামায়ণের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতও যুগিয়েছে। সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, অবহট্‌ঠে কিংবা আধুনিক সকল ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যের দেহের ও প্রাণের জন্য রামায়ণের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের কাছেও ঋণী।

পণ্ডিতেরা মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব থেকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা উপকাহিনি এ দেশে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বিচ্ছিন্ন কাহিনিগুলো একত্রিত করে বিরাটাকার মহাভারত মহাকাব্য রচনা করেন। আদি যুগে তা যুদ্ধের মহাকাব্য থাকলেও পরবর্তী কালে নানা কাহিনি এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সুদীর্ঘদিন ধরে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে এতে একটি বিশাল যুগের সমাজ ও জীবনাদর্শ স্থান পেয়েছে। পাণ্ডবদের কীর্তিকথা, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কৌরবদের বিনাশ এবং পরিণামে পাণ্ডবদের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা মহাভারতের বিষয়বস্তু। মূল ঘটনা-বহির্ভূত অসংখ্য কাহিনি ও তত্ত্বকথা স্থান পেয়ে মহাভারত জাতির জীবনকাব্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, 'মহাভারত একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।' ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মহাভারতে 'জয়ধ্বনি ও শ্মশানসঙ্গীত এক সঙ্গে মিশিয়া গিয়া মানব জীবনের অনন্ত বেদনাকে, ব্যর্থ পরিণামকে, মুখর আকাঙ্ক্ষার নিদারুণ নিঃসঙ্গতাকে বৈরাগ্যের ধূসর আস্তরণে আবৃত করিয়াছে।'

মহাভারতের বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

মহাভারত ভারতীয় মহাবংশ-চরিত ও কুরু-পাণ্ডবীয় যুদ্ধ-বর্ণনাত্মক কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বেদব্যাস কৃত মহাকাব্য। ব্যাসদেব ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, তিনি এইরূপ পবিত্র কাব্য রচনা করবেন— যাতে বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, বেদ-বেদাঙ্গ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ, বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ— এই তিন কালের নিরূপণ, জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব ও অভাবের নির্ণয়, বিবিধ ধর্মের ও বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র— এই চতুবর্ণের নানা পুরাণোক্ত আচারবিধি, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও যুগ-প্রমাণ, ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, আত্মতত্ত্ব-নিরূপণ, ন্যায়-শিক্ষা, চিকিৎসা, দানধর্ম, পাশুপতধর্ম এবং যিনি যে-কারণে দিব্য বা মানব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর বিবরণ, পবিত্র তীর্থ, দেশ, নদী, পর্বতী, বন, সমুদ্র, দিব্যপুরী, দুর্গ, সেনার ব্যূহ-রচনাদি কৌশল ইত্যাদি কথিত হবে। অথচ যিনি অখিল সংসার ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরম ব্রহ্মাই প্রতিপাদিত হবেন। এই মহাভারত পঞ্চম বেদ নামে প্রসিদ্ধ। মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে সমাপ্ত। আবার এই অষ্টাদশ পর্বের মধ্যে একশত পর্বাধ্যায় আছে। মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক আছে। পৃথিবীর মধ্যে মহাভারত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মহাকাব্য। কথিত আছে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁর পৌত্রের প্রপৌত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং নিজের শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত পাঠের আদেশ দেন। বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে তিন বৎসরে এই মহাভারত রচনা করেন।

মহাভারত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের জাতীয় মহাকাব্য। সেই সঙ্গে এটি তাদের প্রাচীন শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ব্যাস রচিত মহাভারত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতকোষ। এটি নীতিকথা ও লোককাহিনির আকর। মহাভারত হিন্দুর দৃষ্টিতে পঞ্চম বেদ। তাদের কাছে এটি ধর্ম, অর্থ ও কামশাস্ত্র। 'এতে ভারতবর্ষের ভূগোল, প্রকৃতি, প্রাণিজগৎ, জনজীবন, রাজনীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, ন্যায়নীতি, জীবিকাপদ্ধতি, ধর্মার্থকামমোক্ষপন্থ, দ্বন্দ্ব-মিলন, আর শাস্ত্র-সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস বিম্বিত, চিত্রিত ও বিধৃত রয়েছে।' মহাভারত বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই কাব্য হিন্দুদের জাতীয় আত্মার বা জাতিসত্তার নামান্তর।

বাংলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদের সূচনা পনের শতকে হলেও সতের শতকে কাশীরাম দাসের অনুবাদের মাধ্যমে এ দেশে মহাভারত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মহাভারতের প্রচার বিলম্বিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন মনে করেন, 'বাংলার পুরাতন সাহিত্যে ভারতপাঁচালির উদ্ভব ও প্রসার প্রধানত রাজদরবারের আওতায়ই হইয়াছিল।' রামায়ণে রাজবংশের কাহিনি ও আর্যবিজয়ের ইতিহাস থাকলেও তাতে বাংলার লোকায়ত গার্হস্থ্য জীবনরসের উপাদান থাকার জন্য তা খুব সহজেই বাঙালির হৃদয় জয় করেছিল। কিন্তু মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের ইতিহাস ও অন্যান্য অসংখ্য কাহিনি থাকলেও বাঙালির জীবন তাতে প্রতিফলিত হয় নি। বাঙালি হিন্দুরা মহাভারতীয় কৃষ্ণ ও তাঁর গীতার অনুসারী এবং শাস্ত্রগ্রন্থ হিসেবে সসম্মানে একে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতিবোধ ও সমাজ-সংস্কৃতির

পরিবর্তন ঘটেছিল এবং মহাভারতীয় নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে পালনীয় নীতিশাস্ত্রের পার্থক্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে মধ্যযুগে বাঙালি মানসে মহাভারতের প্রভাব ছিল সামান্য ও সীমিত। ফলে বাংলায় অনুবাদের পিছনে মুসলমান শাসকের আগ্রহই বিদ্যমান ছিল; বাঙালি জনগণের হৃদয়ে রসের আবেদন সৃষ্টি করেছে অনেক পরে।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও পরাগলী মহাভারত

বাংলা ভাষায় মহাভারত কাব্যের প্রথম অনুবাদক কবি ছিলেন 'পরাগলী মহাভারতের' লেখক কবীন্দ্র পরমেশ্বর। গৌড়েশ্বর সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৮) সেনাপতি লস্কর পরাগল খানের উৎসাহে কবি এ কাব্য রচনা করেছিলেন বলে কাব্যটি পরাগলী মহাভারত নামে খ্যাত। বাংলা ভাষা সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হুসেন শাহ চট্টগ্রাম জয় করে সেখানে পরাগল খাঁকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। পরাগল খাঁ মহাভারতের কৌতূহলোদ্দীপক যুদ্ধকাহিনি শুনে মুগ্ধ হন এবং তা সংক্ষিপ্ত আকারে একদিনে শোনার উপযোগী করে রচনা করার জন্য সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে নির্দেশ দেন। মূল মহাভারত কাব্যের সাহিত্য-রস আস্বাদনের আগ্রহের চেয়ে যুদ্ধকাহিনির উত্তেজক উপাদান প্রেরণা দান করেছিল বলে ধারণা করা হয়। মহাভারত মুখ্যত রাজবংশের ইতিহাস বলে শাসকদের কাছে তা উপভোগ্য হওয়ার অধিকারী ছিল। পরাগল খাঁর এই নির্দেশে কবি খুব সংক্ষেপে মহাভারত অনুবাদ করেন। এ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন :

> তাঁহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিলা।
> কবীন্দ্র পরম যত্নে পাঁচালী রচিলা ॥

তবে এতে প্রধান ঘটনাবলি বাদ যায় নি। কবি তত্ত্বকথা পরিহার করে কেবল কাহিনি পরিবেশনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষককে প্রশংসা করে 'লস্কর পরাগল খান মহাদাতা কর্ণসম' অথবা 'শ্রীযুক্ত পরাগল খান মহামতি' ইত্যাদি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর কাব্যে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ ও পরাগল খাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও নিজের সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেন নি। কারও মতে কবির নাম পরমেশ্বর এবং উপাধি কবীন্দ্র, কারও মতে কবির নাম শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁ প্রদত্ত উপাধি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. সুশীলকুমার দে, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে কবি শ্রীকর নন্দীর উপাধি মনে করে উভয়কে এক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অন্যদিকে ড. সুকুমার সেন প্রমুখেরা ভিন্ন মত পোষণ করে উভয়কে ভিন্ন ব্যক্তি মনে করেছেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর লস্কর পরাগল খানের আদেশে ব্যাস-মহাভারত অবলম্বনে সংক্ষেপে অনুবাদরীতিতে ভারতপাঁচালি রচনায় স্বচ্ছতা ও স্বতঃপ্রবহমানতা ফুটিয়ে তুলেছিলেন বলে তাতে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব বিদ্যমান। তাঁর 'পরিচ্ছন্ন, সহজ অনলঙ্কৃত বর্ণনা অভূতপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত না হলেও মোটামুটি সুখপাঠ্য।' সংস্কৃত ভাষার ওপর তাঁর ভাল দখল ছিল বলে তিনি তাঁর কাব্যে তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রাচুর্য দেখিয়েছেন। কবীন্দ্রের ভাষার নমুনা :

সুদেষ্ণাএ বোলেন্ত শুনহ বরনারী।
মাথে করি তোহ্মারে রাখিতে আহ্মি পারি ॥
নারী সব তোহ্মা দেখি পাসরিতে নারে।
কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য রাখিবারে ॥
রাজাএ দেখিলে তোহ্মা মজিবেক মন।
বল করি ধরিতে রাখিবে কোন জন ॥
আপন কণ্টক আহ্মি আপনে রোপিব।
মৃত্যুএ ধরিলে যেন বৃক্ষ আরোহিব ॥

শ্রীকর নন্দী ও ছুটিখানী মহাভারত

শ্রীকর নন্দীর ভণিতায় অন্য একটি মহাভারত কাব্যের অস্তিত্ব রয়েছে। ভণিতায় কোথাও শ্রীকর নন্দী নামও উল্লেখিত আছে। তিনি পরাগল খানের পুত্র ছুটিখানের আদেশে জৈমিনি মহাভারতের ওপর নির্ভর করে কেবল 'অশ্বমেধ পর্বের' অংশ নিয়ে মহাভারত রচনা করেন। কাব্যটি ছুটিখানী মহাভারত নামে পরিচিত। ছুটিখান সম্ভবত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের বস্তুসংক্ষেপ জাতীয় কাব্যে পরিতৃপ্তি লাভ করেন নি। তাই তিনি আরও বিস্তৃত করে কাব্য রচনার জন্য কবি শ্রীকর নন্দীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ছুটিখানের নির্দেশ সম্পর্কে কবি লিখেছেন :

অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্তি মোর জগত সংসার ॥
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দী কহিলেন পয়ার রচিয়া ॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী এই দুই ভণিতাই পরাগলী মহাভারতে রয়েছে, কিন্তু ছুটিখানী মহাভারতে কেবল শ্রীকর নন্দীর ভণিতা আছে। এ সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন, 'প্রথমে ছুটিখান শ্রীকর নন্দীকে জৈমিনি ভারত অনুবাদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে কবীন্দ্র পরমেশ্বর উপাধি দেন। তারপর পরাগল খাঁ তাঁহাকে মহাভারতের অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করেন। সেই সময় কবির উপাধি এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে তাঁহার নিজের নাম ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন ছিল না।' ড. সুকুমার সেন প্রমুখ যাঁরা শ্রীকর নন্দীকে স্বতন্ত্র কবি মনে করেন তাঁরা ছুটিখানী মহাভারতে কবিপ্রতিভার কিছুটা উৎকর্ষ লক্ষ করেছেন এবং তাঁদের মতে দুই কবি প্রায় এক সময়ে এক শাসক বংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন বলে একের কাব্যে অন্যের ভণিতা ও রচনাংশ প্রবেশ করেছে। শ্রীকর নন্দী শুধু অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেছিলেন বলে বিস্তারিতভাবে মূল অনুসরণ করেন। তাঁর অনুবাদ আলঙ্কারিক বর্ণনায় সমৃদ্ধ না হলেও বক্তব্যের সহজ প্রকাশের জন্য প্রশংসার যোগ্য। রচনার কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে সুখময় মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন,—পরমেশ্বরের মহাভারতের উচ্চতম

সীমা ১৫০১; এবং শ্রীকর নন্দীর মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব লেখা হয়েছিল ১৫১৮ সালে হুসেন শাহের রাজত্বাবসানের আগেই।

ছুটি খানের প্রকৃত নাম নসরত খান। কবি শ্রীকর নন্দী তাঁর প্রশংসায় লিখেছেন :

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভীক ছুটি খান মহাশয় ॥
তাহার যথেক গুণ শুনিয়া নরপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতূহল মতি ॥
নৃপতি আগ্রেত তার বহুত সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খান ॥
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এরে দেশ।
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥

সঞ্জয়ের মহাভারত

সঞ্জয় নামে একজন মহাভারত অনুবাদকের কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। আবার অনেকে এই নামের কোন কবির অস্তিত্ব অস্বীকার করে সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। 'সঞ্জয়-বিরচিত মহাভারত' প্রকাশিত হয়েছে সুপরিকল্পিত পুঁথি-ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ রূপে। এতে কবি সঞ্জয়ের রচনার প্রামাণিক পরিচয় পাওয়া যায় এবং এর সম্পাদক সঞ্জয়কে বাংলা মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কবি বলে দাবিও করেছেন। সিলেট থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত অঞ্চলে সঞ্জয়ের কাব্যের অনেক পুঁথি পাওয়া গেছে। এতে মনে করা হয় যে, কবি সিলেট অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তবে কবীন্দ্র পরমেশ্বরই যে মহাভারতের প্রাচীনতম অনুবাদক সে সম্পর্কে গবেষকগণ একমত। সঞ্জয়ের মহাভারতের সঙ্গে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের এত বেশি সাদৃশ্য বিদ্যমান যে উভয়কে একই কবি বলে মনে করতে হয়। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে, 'সঞ্জয়ের ভারত পাঁচালী ও কবীন্দ্রের পরাগলী ভারত এক ছাঁচে ঢালা।' কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, কিন্তু সঞ্জয়ের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নি। তাই মনে করা হয়, কবীন্দ্রের মহাভারত সামান্য পরিবর্তনসহ সঞ্জয়ের নামে চলেছে। ভণিতা থেকে মনে হয়, কবি সঞ্জয় পৌরাণিক সঞ্জয়ের অন্তরালে নিজেকে গোপন করেছেন। অবশ্য ড. দীনেশচন্দ্র সেন সঞ্জয় নামে একজন কবির ভণিতা উল্লেখ করেছেন :

সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়।

অথবা

সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা।

এতে সঞ্জয়ের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা আছে। একটি পুঁথিতে আছে :

হরিনারায়ণ দেব দীন হীন মতি।
সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব ভারতী ॥
ব্যাসদেব হৈতে মহাভারত প্রচার।
সঞ্জয় রচিয়া কৈল পাঞ্চালী পয়ার ॥

এখান থেকে জানা যায় যে হরিনারায়ণ নামে কোন কবি সঞ্জয় ছদ্মনামে মহাভারত লিখেছিলেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেন এসব অনুমানের পরও মন্তব্য করেছেন, 'কোন কোন পুঁথির অধিকাংশই অপরাপর কবির লিখিত, অথচ গ্রন্থের নাম 'সঞ্জয়-মহাভারত।'

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, কোন গায়ক বা সঙ্কলক কবীন্দ্র পরমেশ্বরের রচনায় পৌরাণিক সঞ্জয়ের নাম জুড়ে দিয়ে এ কাব্যের উপাদেয়তা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির চেষ্টায় দ্ব্যর্থবোধক 'সঞ্জয়' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি স্বতন্ত্র কবি হলে ভণিতায় অবশ্যই আরও পরিচয় বিধৃত হত। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'কবীন্দ্রের রচনাকে অবলম্বন করিয়া কোন অল্পমেধাবী লেখক, লিপিকর বা পাঁচালীগায়ক পৌরাণিক সঞ্জয়ের নামের অন্তরালে বসিয়া কবীন্দ্রের যশে ভাগ বসাইয়াছেন।' সঞ্জয়ের মহাভারতে কবীন্দ্রের রচনা হুবহু স্থান পেয়েছে, যেখানে দু এক কথা নিজের সেখানে কৃতিত্বহীনতার নিদর্শন বিদ্যমান।

ড. আহমদ শরীফ তাঁর 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে সঞ্জয় সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ পর্যালোচনা করে এই বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, 'আমাদের ধারণায় সঞ্জয় কবিযশ প্রার্থী কোন গায়েন-কবি। কবীন্দ্র মহাভারতই তাঁর অবলম্বন। তাঁর স্বকীয় যোজনাও রয়েছে, এমনকি গায়েন-লিপিকর পরম্পরায় পাঁচালীর স্থানিক ও কালিক স্ফীতিও ঘটেছে। সঞ্জয় নকলবাজ বলেই কুলপদবী ব্যবহার করেন নি। অথবা তাঁর প্রকৃত নাম হরিনারায়ণ দেব।'

বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত নামে অন্য একটি কাব্য রয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেছিলেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি জাল এবং এ নামে কোন কবি ছিলেন না। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতই এ নামে চলেছিল। কবীন্দ্রের 'বিজয় পাণ্ডব কথা' লিপিকর-প্রমাদে 'বিজয় পণ্ডিত কথা' নামে প্রচারিত হয়েছে।

ষোল শতকের মহাভারত অনুবাদক হিসেবে রামচন্দ্র খান ও দ্বিজ রঘুনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। রামচন্দ্র খান 'জৈমিনির অশ্বমেধপর্ব' কাব্য ষোল শতকের মধ্যভাগে রচনা করেছিলেন। রঘুনাথ লিখেছিলেন 'অশ্বমেধ পর্ব'। কবি উৎকলাধিপতি মুকুন্দদেবের. সভায় নিজের কাব্য পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ১৫৬৭-৬৮ সালে কাব্যটি রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এই কাব্যের সঙ্গে কাশীরাম দাসের কাব্যের সাদৃশ্য বিদ্যমান। কোচবিহাররাজ নরনারায়ণের ভাই শুক্লধ্বজের নির্দেশে কবি অনিরুদ্ধ ভারত পাঁচালী রচনা করেছিলেন। তিনি কামরূপের অধিবাসী ছিলেন এবং রাম-সরস্বতী উপাধি ব্যবহার করেছেন।

ষোল শতকের মহাভারত রচয়িতাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পিতা-পুত্র কবি ষষ্ঠীবর সেন ও কবি গঙ্গাদাস সেন। ষষ্ঠীবর সেনের 'স্বর্গারোহণ পর্ব' এবং গঙ্গাদাস সেনের 'আদি পর্ব' এককালে জনসমাদৃত হয়েছিল।

কাশীরাম দাস

সতের শতকের কবিসমাজে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় নাম কাশীরাম দাস। তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সংস্কৃত মহাভারতের অনুসরণে 'মহাভারত' রচনা করেন। তিনি কথক, গায়েন, লিপিকর ও ছাপাখানার বদৌলতে লোকপ্রিয় সমগ্র মহাভারতের

রচক হিসেবে সাধারণের কাছে পরিচিত। সতের শতকের একেবারে প্রথমেই (১৬০২-৩ সালে আদি পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল, বিরাট পর্বের সমাপ্তিকাল ১৬০৪-৫ সাল) কবি এ কাব্য সমাপ্ত করেছিলেন। কাব্যের সর্বত্র ভণিতা একই রকম :

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার সিদ্ধি গ্রাম কবির জন্মস্থান। কবি জাতিতে ছিলেন কায়স্থ, বংশগত উপাধি ছিল দেব। তাঁর পিতা কমলাকান্ত দেব দেশ ত্যাগ করে উড়িষ্যায় বাস করেন। কাশীরাম দাস তাঁর কাব্যে আত্মপরিচিতি দিয়েছেন :

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিদ্ধী গ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস-পুত্র সুধাকর নাম ॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস-পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥
পাঁচালী প্রকাশি করে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ ॥

কাশীরাম দাস মহাভারতের সমগ্র অংশ রচনা করে যেতে পারেন নি। এর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে :

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর ॥

কাশীরাম দাস মহাভারতের চার পর্ব—আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের কিছু অংশমাত্র রচনা করেছিলেন। কাব্যের অবশিষ্ট অংশ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম এবং অপর কয়েকজন কবি সমাপ্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে নন্দরামের উক্তি উল্লেখযোগ্য :

কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা।
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা ॥
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিহঁ খুল্লতাত।
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ ॥
আত্মত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক।
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক ॥
ত্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে।
রচিবে পাণ্ডব-কথা পরম সাদরে ॥
আশীর্বাদ দিয়া মোরে গেলা সেই জন।
অবিরত ভাবি আমি শ্যামের চরণ ॥
কাশীদাস মহাশয় আশীর্বাদ দিল।
তাহার প্রসঙ্গে আমি পুরাণ রচিল ॥

রামায়ণের কবি হিসেবে কৃত্তিবাস যেমন অতুলনীয় খ্যাতির অধিকারী, মহাভারত রচনার ব্যাপারেও কাশীরাম দাস তেমনি সীমাহীন খ্যাতির গৌরব লাভ করেছেন। কবি কাশীরাম দাস কেবল একজন শ্রেষ্ঠ কবি নন, তিনি সামগ্রিক একটি ঐতিহ্যের প্রতিভূ। তিন পর্বের মত রচনা করেও তিনি আঠার পর্ব মহাভারত রচনার অমর গৌরবের অধিকারী। কাশীরাম দাস বংশানুক্রমিকভাবে বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর অন্তরের বৈষ্ণব-প্রাণতা তাঁর বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ছিলেন 'দেব' বংশের লোক, কিন্তু 'দাস' উপাধিতে নিজের পরিচয় অমর করে রেখে গেছেন।

কাব্যের বৈশিষ্ট্য বিচারে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, চার পর্বই কবি কাশীরাম দাসের রচনা—এ অংশে তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন বিদ্যমান। অপরাপর অংশ ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা বলে তাতে নানাপ্রকার ত্রুটি ও অসঙ্গতি দেখা যায়। কাশীরাম দাস কাব্যটি সংস্কৃত থেকে হুবহু অনুবাদ করেন নি। মধ্যযুগের অন্যান্য অনুবাদ সাহিত্যের মত তা মৌলিক রচনার গুণে সমৃদ্ধ। কবি সংক্ষেপে সংস্কৃত মূলকাহিনি অনুসরণ করেছেন, দু একটি স্বরচিত আখ্যান মূলকাহিনির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ভাল দখল ছিল। ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে তার নিদর্শন আছে। কবির বিনয়াবনত বৈষ্ণব মনটি রচনার মধ্যে সার্থক ভাবে প্রতিফলিত। এই বিশেষ মনোভাবের ফলেই রাজসভার কাব্য বাঙালির জীবনকাব্যে রূপ লাভ করেছে। বাঙালি জীবনাদর্শ কবিপ্রতিভা বিকাশের পটভূমিকায় সক্রিয় ছিল বলে মহাকাব্যের উদাত্ত বীর্যগাথা রূপান্তরিত হয়েছে কোমল স্নিগ্ধপ্রেমগাথায়; তাই—'বাঙালিয়ানার এই ঐতিহ্যারোপ কাশীরাম-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।' কবি কাশীরাম দাস 'স্বচ্ছন্দ সরল পয়ার-ত্রিপদীতে বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের পটভূমিকায় পুরাণাশ্রয়ী সংস্কৃতির আলোকে' মহাভারতকে বাংলা ভাষায় প্রচার করে কৃত্তিবাসের মতই অমর হয়ে আছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত কাশীরাম দাসের মহাভারতে অজস্র প্রক্ষেপ রয়েছে। মহাভারতের কোন নির্ভরযোগ্য সংস্করণ নেই। কাশীরাম দাসের মহাভারত অসম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু মুদ্রিত রূপে আঠার পর্বের মহাভারত সবটাই কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত আছে।

কাশীরাম দাস যুগ যুগ ধরে বর্ণজ্ঞানহীন ব্যক্তি থেকে কৃতবিদ্য পণ্ডিত সমাজের সর্বত্রই শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তাঁর রচনা পাঁচালি জাতীয় হলেও ভাষা ভঙ্গিমায় ক্লাসিক তৎসম শব্দাঢ্য গ্রন্থনৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয়। তার পরিচয় আছে রমণীর রূপবর্ণনায় :

অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুন্তল কমল-প্রিয়বন্ধু ॥
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর-রঙ্গিমা,
ভ্রূভঙ্গ অরুণ চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা ॥
খঞ্জন-গঞ্জন চক্ষু অঞ্জনে রঞ্জিত।
শুকচঞ্চু নাসা শ্রুতি পৃথিবী নিন্দিত ॥
নির্ধূমাগ্নি কিম্বা যেন রচিল বিদ্যুতে।
বালাসূর্য উদয় হইয় পূর্বভিতে ॥

কাশীরাম দাস শিল্পাদর্শের দিক থেকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবে বিবেচিত। তাঁর ভাষা তৎসম শব্দবহুল, বাগবন্ধন পরিমিত এবং রচনারীতি প্রশংসনীয়। তাঁর ভাষা পৌরাণিক আবহ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। কাশীরাম দাস চৈতন্য পরবর্তী যুগে আবির্ভূত হয়ে মূল ব্যাস বা জৈমিনিকে সামনে রেখে সংক্ষেপে মহাভারতের চার পর্বের যে ভাবানুবাদ করেছিলেন তা হিন্দু বাঙালির মনোজীবন গঠনে বিশেষ সহায়তা করেছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর পরবর্তী কবিদের অনেক অবদান সংযোজিত হয়ে তাঁর কাব্যের পূর্ণতা দান করলেও তা অখণ্ড ভাবেই সমাদৃত হয়ে আছে।

কাশীরাম দাসের কাব্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তা হয়ত পরবর্তী কবিগণকে এ ধারায় কাব্যরচনায় বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই পরবর্তী সময়ে মহাভারতের অনুবাদক কবির সংখ্যা কম ছিল না। অনেকেই সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন, কেউ কেউ খণ্ড খণ্ড পর্বের অনুবাদ করেন। সতের-আঠার শতকের কবি হিসেবে দ্বৈপায়ন দাস, নিত্যানন্দ দাস, শঙ্কর চক্রবর্তী, সরলাদাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কাশীরাম দাসের পুত্র পরিচয়ে যাঁদের ভণিতা আছে তাঁদের মধ্যে দ্বৈপায়ন দাস অন্যতম। তাঁর ভণিতায় মহাভারতের বনপর্ব, গদাপর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্বের পুঁথি পাওয়া গেছে। কবি নিত্যানন্দ দাস সতের শতকের শেষভাবে 'মহাভারত' রচনা করেন। তাঁর কাব্যটি পশ্চিমবঙ্গে বহুল প্রচারিত হয়েছিল। কবি শঙ্কর চক্রবর্তী ভারত পাঁচালী রচনা করেছিলেন। রাঢ়দেশের অধিবাসী সরলাদাস মহাভারতের 'আদি' ও 'বিরাট পর্ব' রচনা করেছিলেন।

মহাভারত রচনায় এই ধারার শেষ পর্যায়ে কাব্যের বর্ণনা নিষ্প্রাণ ও গতানুগতিক হয়ে পড়ে, ফলে কাব্যের আকর্ষণীয়তা কমে যায়। কোথাও কোথাও পুরাণকথা থেকে ধার করা গল্পের জৌলুস এনে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু কাশীরাম দাস তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার সাহায্যে মহাভারতের যে অমর রূপ দান করেছিলেন তার সর্বগ্রাসী আলোকে অপরাপর প্রচেষ্টার ফল ম্লান হয়ে গেছে।

ভাগবত

'শ্রীমদ্ভাগবত' হিন্দুদের সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। এতে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল আদর্শ সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথার বর্ণনাভঙ্গিতে। তাই ভাগবতে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণলীলা বা শ্রীকৃষ্ণ জীবনের বিবৃতিও লক্ষ করা যায়। ভাগবত কাব্যে শাস্ত্রালোচনা ও কাহিনিবিন্যাস অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত হয়ে আছে। ভাগবতের উৎস সন্ধান করতে হলে হিন্দু পুরাণ প্রসঙ্গে যেতে হবে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত এক ধরনের কাহিনিকেন্দ্রিক ধর্মগ্রন্থ পুরাণ নামে পরিচিত। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে এগুলোর প্রচার এবং একাধারে ইতিহাস, কাহিনি, দর্শন ও কাব্য হিসেবে এগুলোর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় হিন্দু মানসের ওপর পুরাণের প্রভাব অপরিসীম। পুরাণের সর্বমোট সংখ্যা ছত্রিশ—আঠারখানি মহাপুরাণ এবং আঠারখানি উপপুরাণ বা অর্বাচীন পুরাণ। আঠারটি মহাপুরাণের অন্যতম হল ভাগবত পুরাণ। এর রচনাকাল নিয়ে মতানৈক্য আছে। আধুনিক গবেষকেরা ভাগবতকে আট

শতকের পূর্ববর্তী রচনা বলে মনে করেন। মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেবের নামে পুরাণগুলো চলতে থাকলেও তা কোন একক ব্যক্তির রচনা নয়। কারও কারও মতে ব্যোপদেব দক্ষিণ ভারতে ভাগবত গ্রন্থিত করেন এবং চৌদ্দ শতকে তা বাংলাদেশে প্রচারিত হয়। ভাগবত বারটি স্কন্ধ বা পর্বে বিভক্ত। প্রথম নয়টি স্কন্ধে বিভিন্ন গল্প-আখ্যান ও তত্ত্বকথা বর্ণিত হয়েছে এবং দশম থেকে দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও পরবর্তী লীলা স্থান পেয়েছে। বৈষ্ণব ভক্তসমাজের প্রভাবে শেষ তিন পর্ব এ দেশে সুপরিচিত হয়ে ওঠে এবং এই তিন পর্বই সাধারণত বাংলায় অনূদিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে ভাগবতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণবিজয় জাতীয় গ্রন্থ রচনার বাহুল্য দেখা দেয়। ভাগবত অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় রাধাকৃষ্ণ লীলার মধুর রসাত্মক কাহিনির প্রচার ঘটেছে। চৈতন্য-সংস্কৃতির প্রভাবে 'পরম সত্যের' অনুসন্ধিৎসু সর্বভারতীয় পৌরাণিক কৃষ্ণকথা বাংলা ভাষায় মধুর রসোজ্জ্বল বাঙালিধর্মী প্রণয় গাথায় পরিবর্তিত হয়েছে।

মদ্‌ভাগবতের প্রথম অংশ কৃষ্ণের জন্মগ্রহণের কারণ থেকে কৃষ্ণ-বলরামের মথুরা যাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত; এই অংশের নাম কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বলা যায়। দ্বিতীয় অংশ কংসবধ থেকে দ্বারকায় বাসের মন্ত্রণায় শেষ; এই অংশকে কৃষ্ণের মথুরালীলা বলা যায়। শেষ অংশে বিশ্বকর্মার দ্বারকাপুরীনির্মাণ থেকে কৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণিত; এই অংশ কৃষ্ণের দ্বারকালীলা।

প্রথম অংশে আছে অবতারসমূহ কথন, অসুরভারাক্রান্ত পৃথিবীর ব্রহ্মার নিকট অভিযোগ ও বিষ্ণুর নিকট আবেদন, বিষ্ণুর অভয়দান, বসুদেব ও দেবকীর বিয়ে, ভাগিনেয়ের হাতে নিধন হওয়ার দৈববাণী শ্রবণে কংসের দেবকী হত্যার উদ্যোগ, কংসহস্তে সন্তানদানে বসুদেবের প্রতিশ্রুতি, বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে প্রেরণ, দেবকীর ছয় পুত্রকে হত্যা, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জন্ম, যশোদার শয্যায় শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন, যশোদার কন্যারূপী মহামায়াকে বসুদেবের আনয়ন, মহামায়াকে শিলাপটে নিক্ষেপ, নন্দোৎসব, পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ, কৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ ও যশোদার বিশ্বরূপদর্শন, যমলার্জুন ভঞ্জন, নন্দের বৃন্দাবনে বাস, বৎসাসুর, বৃকাসুর ও অঘাসুর বধ, ব্রহ্মার গর্বনাশ, ধেনুকাসুরবধ, কালিয়দমন, দাবাগ্নিভক্ষণ, প্রলম্বাসুরবধ, গোপীদের বস্ত্রহরণ, গোবর্ধনগিরি ধারণ, রাসলীলা, রাসবিহার, জলকেলি, মহাসর্প থেকে নন্দ-উদ্ধার, শঙ্খচূড় অরিষ্টকেশী ও ব্যোমাসুর বধ, মথুরাযাত্রা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অংশে আছে মথুরায় কংসের রজকবধ, কুব্জাকে অনুগ্রহ, কুবালয়াপীড়বধ, চানূর মুষ্টিক কংস প্রভৃতি নিধন, বলরাম ও কৃষ্ণের চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিদ্যাশিক্ষা, উদ্ধব-সংবাদ, জরাসন্ধের নিকট সতের বার পরাজয়বরণ, দ্বারকায় বাসের মন্ত্রণা ইত্যাদি।

শেষ অংশে আছে বিশ্বকর্মা কর্তৃক দ্বারকানির্মাণ, কালযবনবধ, বলরামের সঙ্গে রেবতীর বিয়ে, রুক্মিণীহরণ, সম্বরবধ, স্যমন্তক মণি-উপাখ্যান, জাম্ববতী সত্যভামা ও কালিন্দীর বিয়ে, খাণ্ডববন দাহন, মিত্রাবিন্দা ভদ্রা নাগ্নজিতী ও লক্ষ্মণার বিয়ে, নরাকাসুরবধ, ষোল শ রাজকন্যাকে বিয়ে, রৈবতক-বিহার, পারিজাতহরণ, বাণের

পরাজয়, ঊষা-অনিরুদ্ধ মিলন, নৃগোপাখ্যান, বলদেবের সাপমোচন, বলদেবের রাস, বলদেবের দ্বিবিদ বধ, পৌণ্ড্রক বাসুদেব কাশীরাজ জরাসন্ধ শিশুপাল ও শাল্ববধ, অনিরুদ্ধের বিয়ে, বলরাম কর্তৃক দন্তবক্রের দন্তোৎপাটন, রুক্মী ও দন্তবক্র বধ, বজ্রনাভ কাহিনি, প্রভাবতী ও প্রদ্যুম্নের মিলন, তালজঙ্ঘ ও বজ্রনাভ বধ, সুদামা কাহিনি, বসুদেবের যজ্ঞানুষ্ঠান, ভৃগু আখ্যান, বৃকাসুরবধ, বিপ্রের মৃত পুত্রোদ্ধার, দেবকীর ছয় পুত্রের পুনর্জীবন, সুভদ্রাহরণ ও সুভদ্রার বিয়ে, অজামিলা কাহিনি, মুষল উৎপত্তিবৃত্তান্ত, উদ্ধবকে সাংখ্যযোগ উপদেশ, বিশ্বরূপ প্রদর্শন, ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ববর্ণনা, মোক্ষলাভের উপায় নির্দেশ, উদ্ধব গীতা, বর্ণাশ্রমধর্ম ও অষ্টাঙ্গ যোগ, যদুবংশনাশ, বলদেব ও কৃষ্ণের তিরোধান, অর্জুন কর্তৃক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন, দ্বারকায় প্লাবন, অর্জুনের পরাজয়, ব্যাস-অর্জুন আলাপ ইত্যাদি।

মালাধর বসু বা গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়

মালাধর বসু ভাগবতের প্রথম বাংলা অনুবাদক এবং তাঁর কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থ। মালাধর বসু বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী কুলীন গ্রামে সম্ভবত পনের শতকের প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন— 'গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।' গৌড়েশ্বর রাজকর্মচারী মালাধর বসুর কর্মদক্ষতা, বিশ্বস্ততা, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি গুণে প্রীত হয়ে এই উপাধি দান করেছিলেন। ড. সুকুমার সেনের মতে এই গৌড়েশ্বর সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৪)।

মালাধর বসু ব্যাসদেব কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অনুসরণে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করেন। ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ সাল—এই দীর্ঘ সাত বৎসরের চেষ্টায় কবি এ কাব্য রচনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই কাব্যটি রচিত হয়েছিল। চৈতন্যদেব কবি মালাধর বসুর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন এবং তাঁর কাব্যের প্রশংসা করেছেন। কবির পুত্র সত্যরাজ খান এবং পৌত্র রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য 'গোবিন্দবিজয়' ও 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত। অনুবাদমূলক হলেও রাগরাগিণীযুক্ত এই পাঁচালি রাধাকৃষ্ণ প্রেমপ্রতীকে ভক্তিবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত বলে ধরা হয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য প্রচার কবির উদ্দেশ্য ছিল, সে হিসেবে 'বিজয়' বা 'মঙ্গল' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। মালাধর বসু ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনি অংশই প্রধানত অনুসরণ করেছিলেন। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা পর্যন্ত বিবরণ আছে। একাদশ স্কন্ধে যদুকুল ধ্বংস ও কৃষ্ণের দেহত্যাগের ঘটনার সঙ্গে অনেক তত্ত্বকথা বর্ণিত হয়েছে। কবি তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে কাহিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ থেকেও কবি কিছু কাহিনি নিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের আদিরসের কিছু নিদর্শন থাকলেও বীররসাত্মক কাব্য হিসেবে এর যথার্থ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

মালাধর বসু সে আমলের উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা ও অসহযোগের মধ্যেও ধর্মীয় বিষয় কেন বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তার যুক্তি দিয়েছেন এভাবে :

১. পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার।
পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব সংসার ॥
২. ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিক মতে ॥
৩. ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া ॥
গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হবে সকল সংসার ॥

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য ভাগবতের অনুবাদ বলে পরিচিত হলেও এতে আক্ষরিক অনুবাদের অংশ খুবই কম। কবিও একে অনুবাদ বলেন নি। কবি লিখেছেন :

ভাগবত শুনিলু আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে ॥

মালাধর বসু বৈষ্ণবসমাজে শ্রদ্ধেয় ভক্তকবি হিসেবে গৃহীত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব অকুণ্ঠ ভাষায় কবি ও কাব্যের প্রশংসা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণব ধর্মকথা ও আদর্শ যথাযথভাবে এ কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বৈষ্ণব-ঐতিহ্যের প্রবেশক গ্রন্থ হিসেবে শ্রীকৃষ্ণবিজয় বিশেষ মূল্যবান। কবি এখানে যতটুকু ভক্তি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন সে অনুপাতে শিল্প-সৌন্দর্য প্রকাশ পায় নি। কাব্যের মধ্যে ভক্তিভাব প্রাধান্য পেলেও কোথাও কোথাও কবিত্বশক্তির নিদর্শন আছে। যেমন কৃষ্ণের সম্ভাব্য বিরহে গোপীদের হাহাকার :

আর না যাইব সখি চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে ॥
আর না দেখিব সখী সে চাঁদ বদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন ॥
আর না যাইব সখী কল্পতরুমূলে।
আর কানু সঙ্গে না গাঁথিব ফুলে ॥
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥
অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥

প্রকৃতপক্ষে কবি অধ্যাত্মচিন্তা প্রকাশের দিকে মনোযোগী ছিলেন বলে কাব্যকলার দিকে লক্ষ করেন নি। ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয় গাহিবার জন্য লেখা হইলেও ইহা বর্ণনাময় আখ্যায়িকা-পাঞ্চালী। ইহাতে কাব্যকলানৈপুণ্য প্রকাশের অবকাশ থাকিলেও কোন চেষ্টা নাই। তবুও আন্তরিকতা ও সরল ভক্তিভাব রচনার মধ্যে

স্থানে স্থানে ভাবুকতার স্নিগ্ধতা দিয়াছে।' কবির স্বাতন্ত্র্য ও কৃতিত্ব প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, সে আমলে 'কাব্যের তথা সাহিত্যের অনুবাদ আক্ষরিক হত না, কবিগণ গ্রহণে-বর্জনে ও সংযোজনে স্বাধীন পথ অবলম্বন করতেন, কাজেই অনুবাদ মাত্রই ছিল কোথাও কায়িক, কোথাও ভাবিক, কোথাও ছায়িক, তথা আক্ষরিক ভাবানুসরণ ও ছায়ানুকরণ,—এক কথায় অনুকরণ-অনুসরণের সাথে থাকত সংযোজন-বর্জন ও রূপান্তরের স্বাধীনতা, তাই মালাধর বসুর রচনায়ও বাংলার প্রতিবেশ ও বাঙালির জীবনযাত্রার পরোক্ষ চিত্র মেলে।'

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা করার মাধ্যমে যুগচেতনাশ্রিত কবি একদিকে যেমন শক্তি-দীন মানুষের জীবনশীর্ষে অমানুষী শক্তির উজ্জ্বল শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছেন, অপরদিকে সেই দীপবর্তিকাকে আচার আচরণে বাঙালি জীবনের আপন সম্পদ করে তুলেছেন।

চৈতন্যপূর্ব যুগে মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মাধ্যমে ভাগবতের অনুবাদের যে ধারাটির প্রবর্তন করেছিলেন তা চৈতন্যোত্তর যুগে বিচিত্ররূপে বিকশিত হয়ে ওঠে। ষোল শতকের শেষভাগ থেকে সমগ্র সতের শতক জুড়ে ভাগবতের কয়েক স্কন্ধের অনুবাদ হয়েছিল, আবার ভাগবতের আদর্শে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কিছু কাব্যও রচিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধারী কোন কবির আবির্ভাব এ ক্ষেত্রে দেখা যায় নি। এ সময়ের কাব্যরচনায় গল্পের কাঠামোগত দিক থেকে কোথাও কোথাও প্রাসঙ্গিক অনুসরণ থাকলেও ভাবের দিক থেকে পৌরাণিক ঐতিহ্যকে প্রায়ই অস্বীকার করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত প্রেমরসোজ্জ্বলতার প্রভাবে এ সময়ের অনেক কবি ভাগবতের অনুবাদ নামে কৃষ্ণলীলাকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মণীন্দ্রমোহন বসু এই প্রসঙ্গে চব্বিশ জন কবির উল্লেখ করেছেন। ড. সুকুমার সেন হুসেন শাহের পারিষদ যশোরাজ খান রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের কথা বলেছেন। তবে তাঁর কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি। চৈতন্যশিষ্য গোবিন্দ আচার্য ও পরমানন্দ গুপ্তের লেখা কৃষ্ণলীলাকাব্যের উল্লেখও বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী' ভাগবতের মূলানুযায়ী সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। দ্বিজ মাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ভাগবতের অনুসরণে রচিত কৃষ্ণলীলাকাব্য। দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল', কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহের 'গোপালবিজয়', কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' ইত্যাদি কাব্যানুবাদ সতের-আঠার শতকে রচিত হয়েছিল। এ ছাড়া ভাগবত অনুসরণ না করেও কয়েকজন কবি শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য রচনা করেছিলেন।

সতের-আঠার শতকে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থগুলো কৃত্রিম সাহিত্যিক অনুশীলনের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। তাতে বৈষ্ণব সাধকের নিষ্ঠা যেমন ছিল না, তেমনি বৈষ্ণবতত্ত্বের যথাযথ অনুসরণও ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর মুখ্য বিষয় ছিল কাম-প্রেমের উত্তেজক ইন্ধন। কাহিনি হিসেবে বর্ণিত ও গীত হওয়ার জন্যই সেসব রচিত হয়েছিল।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। 'সকল দেশের সাহিত্যের পুষ্টিতে অনুবাদকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ করা যায়। আমাদের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম দেখি না।'—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ শাখার পরিচয় উদ্‌ঘাটন প্রসঙ্গে উক্তিটির সার্থকতা প্রতিপন্ন কর।

২। অনুবাদের মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি কিভাবে সাধিত হইয়াছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহা আলোচনা কর। অনুবাদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানের যদি কোন পৃথক মূল্য থাকে, তবে প্রসঙ্গত তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক নিবন্ধ রচনা কর এবং মধ্যযুগীয় ও আধুনিক অনুবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ কর কি না বল।

৪। অনুবাদ মধ্যযুগের সাহিত্যকে বিচিত্র সম্ভারে পরিপূর্ণ করেছে। এ সময়ের অনুবাদের বিভিন্ন উৎস ও প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনাকালে উপরোক্ত মন্তব্য পরীক্ষা কর।

৫। মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের পরিচয় দাও।

৬। মধ্যযুগে কোন কোন ভাষায় কি কি গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল এবং ইহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কি পরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহা আলোচনা কর।

৭। রামায়ণ ও মহাভারতগুলির প্রসিদ্ধ অনুবাদকগণের নামোল্লেখ করিয়া এই কাব্যসমূহের সাহিত্যিক ও সামাজিক গুরুত্ব নির্দেশ কর।

৮। মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের পরিচয় দাও এবং এই শাখার সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ ও বিশিষ্টতা নির্দেশ কর।

৯। মধ্যযুগে কোন কোন ভাষার কি কি বিষয় বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ঐ সব অনুবাদের প্রকৃতি কিরূপ ছিল? অনুবাদকর্মের দ্বারা সাহিত্য কি পরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়াছিল প্রসঙ্গক্রমে তাহাও উল্লেখ কর।

১০। সংস্কৃতের অনুবাদের মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কি ভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহার পরিচয় দাও।

১১। 'কাব্যানুবাদ সহজ ব্যাপার নয়। অনুবাদেও কবিতার অনুভূতিকে, অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিকে ধরে রাখতে হয়।'—এই বক্তব্যের আলোকে মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের সার্থকতা বিচার কর।

১২। মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা কর।

১৩। মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া এই অনুবাদ কর্মের দ্বারা সাহিত্যের কি উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহা বিবৃত কর।

১৪। রামায়ণ অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়দানসূত্রে বাংলার হিন্দু সমাজে রামায়ণের প্রভাবাধিক্যের কারণ বর্ণনা কর।

১৫। টীকা লেখ :

অদ্ভুতাচার্য, কৃত্তিবাস, ছুটিখানী মহাভারত, সঞ্জয়ের মহাভারত, কাশীরাম দাস, মালাধর বসু বা গুণরাজ খান।

একাদশ অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য

[মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্যান্য]

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত। এগুলো খ্রিস্টীয় পনের শতকের শেষ ভাগ থেকে আঠার শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক, লৌকিক ও পৌরাণিক-লৌকিক সংমিশ্রিত দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্য, পূজাপ্রচার ও ভক্তকাহিনি অবলম্বনে রচিত সম্প্রদায়গত প্রচারধর্মী ও আখ্যানমূলক কাব্য। বলা হয়ে থাকে, যে কাব্যে দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হয়, যে কাব্য শ্রবণেও মঙ্গল হয় এবং বিপরীতটিতে হয় অমঙ্গল; যে কাব্য মঙ্গলাধার, এমন কি, যে কাব্য যার ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয়—তাকেই বলা হয় মঙ্গলকাব্য। 'মঙ্গল' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'কল্যাণ'। যে কাব্যের কাহিনি শ্রবণ করলে সর্ববিধ অকল্যাণ নাশ হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল লাভ ঘটে, তাকেই মঙ্গলকাব্য বলা যায়। মঙ্গলকাব্যের 'মঙ্গল' শব্দটির সঙ্গে শুভ ও কল্যাণের অর্থসাদৃশ্য থাকা ছাড়াও এসব কাব্যের অনেকগুলো এক মঙ্গলবারে পাঠ আরম্ভ হয়ে পরের মঙ্গলবারে সমাপ্ত হত বলে এ নামে অভিহিত হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীর গুণগান মঙ্গলকাব্যগুলোর উপজীব্য। তন্মধ্যে স্ত্রীদেবতাদের প্রাধান্যই বেশি এবং মনসা ও চণ্ডীই এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। লৌকিক দেবদেবীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলোতে ক. বন্দনা, খ. গ্রন্থ রচনার কারণবর্ণনা, গ. দেবখণ্ড ও ঘ. নরখণ্ড বা মূলকাহিনি বর্ণনা—মোটামুটি এই চারটি অংশ থাকত। 'বারমাসী' ও 'চৌতিশা' জাতীয় কাব্যাংশ মঙ্গলকাব্যে স্থান লাভ করত। কবি কাব্যে নিজের পরিচয়ও উল্লেখ করতেন।

মঙ্গলকাব্য প্রধানত কাহিনিকেন্দ্রিক। মূল কাহিনির সঙ্গে দেবলীলা, ধর্মতত্ত্ব ও নানা ধরনের বর্ণনায় এসব কাব্য বিপুলায়তন লাভ করেছে। কেউ কেউ মঙ্গলকাব্যকে সংস্কৃত পুরাণের শেষ বংশধর বলতে চান, কেউবা তাকে মহাকাব্য বলেছেন, কেউ মঙ্গলকাব্যকে ধর্মগ্রন্থ বলে ভক্তি করেন, আবার কেউবা এ ধরনের সাহিত্যসৃষ্টি থেকে বাংলার তৎকালীন যথার্থ ঐতিহাসিক স্বরূপ সন্ধান করতে আগ্রহশীল। তবে মঙ্গলকাব্য যে একটি মিশ্র শিল্প তাতে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত পুরাণের সঙ্গে এর বৈশিষ্ট্যগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পুরাণে যেমন দেবমাহাত্ম্য বা রাজবংশের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, মঙ্গলকাব্যের সীমাবদ্ধ পরিসরে প্রায় অনুরূপ ব্যাপার আংশিক ভাবে সমাধা হয়েছে বলে লক্ষ করা যায়। তবে মঙ্গলকাব্যে সংস্কৃত পুরাণের আদর্শ কিছুটা ছায়াপাত করলেও তাকে পুরোপুরি পুরাণ বলা যায় না। লৌকিক ও পৌরাণিক আদর্শ-মিশ্রিত লৌকিক দেবদেবীর মহিমাপ্রচারক এবং ভক্তের গৌরববাচক এই মঙ্গলকাব্যগুলো আখ্যানকেন্দ্রিক ধর্মীয় সাহিত্য হিসেবে গৃহীত হতে পারে। মঙ্গলকাব্যে লৌকিক গ্রামীণ সংস্কার, আর্যেতর দেববিশ্বাস এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও চিন্তাধারা ক্রমে ক্রমে সমন্বয় লাভ করে। মঙ্গলকাব্যে সাম্প্রদায়িক দেবকাহিনি সর্বজনীন মানবিক সংবেদনাপূর্ণ সাহিত্যরূপে

নবজন্ম লাভ করেছিল। গোষ্ঠিগত সাধনায় মঙ্গলকাব্যের শিল্পধর্মী অভিব্যক্তি ঘটেছিল। সৃষ্টির পটভূমি ও স্রষ্টা—উভয়পক্ষের বিচারেই মঙ্গলকাব্যকে যৌথ শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সে আমলে কবিরা নিত্যনতুন কাহিনি রচনার পথ পরিহার করেছিলেন। তখন হয়ত নবনব উন্মেষশালিনী প্রতিভার অভাব ছিল। কবিদের প্রতিভার গুণেই কাব্যগুলো বৈচিত্র্যহীন অনুকরণমাত্র না হয়ে শিল্পসম্মত যুগজীবনবাণী রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের উন্মেষ পর্যায়ে পনের শতকে রচনারীতি গতানুগতিক ছিল। তখন বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ছিল বৈশিষ্ট্যবর্জিত। নায়ক স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু—তাকে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে কোন দেবতার পূজাপ্রচারের জন্য মানবীর গর্ভে পৃথিবীতে জন্ম নিতে হত। পূজাপ্রচারের বিপদসঙ্কুল পথে মঙ্গলকারী দেবতা তার রক্ষক। ষোল শতকের পরবর্তী কাব্যগুলোতে বিষয়বস্তুগত কোন অভিনবত্ব নেই, কেবল চরিত্রগুলোর মার্জিত রসরূপ দান করা হয়েছে। এর সঙ্গে নানা উপকরণের সংযোগে মঙ্গলকাব্যগুলোর যে কাহিনিগত কাঠামো দাঁড়িয়েছে তাতে আছে : প্রথমেই পঞ্চদেবতার বন্দনা, তারপর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা, সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা, মনুর প্রজাসৃষ্টি, প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, উমার তপস্যা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর বিয়ে, কৈলাসে হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, পার্বতী-চণ্ডী বা শিবের সম্পর্কিত অন্য কেউ যেমন মনসা প্রভৃতির নিজেদের পূজাপ্রচারের চেষ্টা, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পূজাপ্রচার, স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশুর স্বর্গে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতির বৈচিত্র্যহীন বর্ণনা। তাছাড়া বারমাসী, নারীগণের পতিনিন্দা, চৌতিশা বা বর্ণানুক্রমিক চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতার স্তব প্রভৃতিও মঙ্গলকাব্যের অঙ্গ হয়ে আছে।

বাংলা সাহিত্যের নানা শ্রেণির কাব্যে মঙ্গল কথাটির প্রয়োগ থাকলেও কেবল বাংলা লৌকিক দেবতাদের নিয়ে রচিত কাব্যই 'মঙ্গলকাব্য' নামে অভিহিত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গল নামধেয় কাব্যের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কোন যোগসূত্র নেই। প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলোকে শ্রেণিগত দিক থেকে পৌরাণিক ও লৌকিক এই দু ভাগে ভাগ করা যায়। পৌরাণিক শ্রেণির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল ইত্যাদি। লৌকিক শ্রেণি হল : শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল (বা বিদ্যাসুন্দর), শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল প্রভৃতি।

মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তির উৎস এদেশের সুপ্রাচীন ধর্মাদর্শের সঙ্গে বিজড়িত। বাংলাদেশে আর্য আগমনের পূর্বে এখানকার আদিম জনগণ নিজস্ব ধর্মাদর্শ ও দেবদেবীগণের পরিকল্পনার অনুসারী ছিল। পরবর্তী কালে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মাধ্যমে আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের সংস্পর্শ ঘটার ফলে তাদের আদিম দেবপরিকল্পনা ও ধর্মসংস্কার পরিবর্তিত হয়েছে। তবে তারা তাদের নিজস্ব আদর্শানুসারে নিজ নিজ লৌকিক দেবতাদের পূজাপদ্ধতি ও মহিমাজ্ঞাপক কাহিনি নিয়ে পাঁচালি রচনা করেছে। এগুলোই পরবর্তী কালে মঙ্গলকাব্যের আকার পেয়েছে। আর্য-ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-সংস্কার সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে কোন সংযোগ রাখে নি; অন্যদিকে জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব সাধারণ মানবসমাজে ছড়িয়ে ছিল। সমাজ ও ধর্মজীবনের এ অবস্থাতেই এ দেশে তুর্কি আক্রমণ ঘটে। এই যুগান্তকারী তুর্কি আক্রমণের পরিণামে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজ সংকটের সম্মুখীন

হয় এবং তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সাধারণ মানবজীবনের সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবীকে গ্রহণ করেছিল। এভাবে আর্য-অনার্যের মিলন ঘটে এবং লৌকিক দেবদেবীরাই মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য হয়ে উঠলে এই নতুন কাব্যধারার প্রবর্তন সহজতর হয়। প্রকৃতপক্ষে এ দেশে তুর্কি আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মঙ্গলকাব্যগুলোর উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল।

বিভিন্ন কবি একই রূপাঙ্গিকে গড়া একই কাহিনির মাধ্যমে বিচিত্র প্রাণরসের বিকাশ ঘটিয়েছেন। সমাজের সঙ্গে কবিগণের সম্পৃক্ততা ছিল ঘনিষ্ঠভাবে। তাঁরা সমাজ জীবনের সত্য আত্মস্থ করেই শিল্পসৃষ্টিতে তৎপর হয়েছিলেন। তাই শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্যে কবির ব্যক্তিজীবন ও সার্বিক সমাজজীবনের বাণী অভিন্ন ঐক্যে গ্রথিত।

এ প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'সেনরাজবংশের পতনের পরই এ দেশে আর এক বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাষ্ট্রশক্তি এক সম্পূর্ণ নূতন ধর্মমতের সঙ্গে পরিপোষক ছিল। তাহা মুসলমান ধর্মমত। এই মুসলমান ধর্মমতের সঙ্গে স্থানীয় লৌকিক ধর্মমতগুলির আদর্শগত বিরোধ এত অধিক ছিল যে তাহা ক্রমে এই দুই সমাজের মধ্যে এক বিশাল ব্যবধানের সৃষ্টি করিল। রাষ্ট্রপোষিত মুসলমান ধর্মমতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেশের তদানীন্তন আপামর জনসাধারণ আপনাদিগকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিতেছিল তখনই মঙ্গলকাব্যের মৌলিক ধর্ম ও সম্প্রদায়নিরপেক্ষ কাহিনিগুলির মধ্যে এক অলৌকিক দৈবশক্তির পরিকল্পনা করিয়া ঐহিক জীবনের সকল দুঃখদুর্দশা তাহারই ইচ্ছাধীন বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস দেখা দিল।...এই অবস্থায় পর-পীড়িত জাতি অল্পকাল মধ্যেই জীবনের সর্বপ্রকার উচ্চতর আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল, নিজের মধ্যে পরিত্রাণের পথ খুঁজিতে গিয়া সকল রকমের দৈব সহানুভূতির উপর আত্মসমর্পণ করিয়া রহিল। সামাজিক জীবনের এই অবস্থা হইতেই বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির জন্ম হইয়াছিল।'

মঙ্গলকাব্যগুলো দেবদেবীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত হলেও এতে বাঙালি জীবনের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলার জীবন-ইতিহাসের বহু অপ্রাপ্ত তথ্যের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে মঙ্গলকাব্যে প্রাপ্ত জীবন-ঐতিহ্যের শিল্পরূপ। তুর্কি আক্রমণের ফলে আকস্মিক সামাজিক বিপর্যয়ের পরিপেক্ষিতে মঙ্গলকাব্যগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল বলে তাতে সমাজমানসের দৈবনির্ভরশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

চৈতন্যোত্তর কালে মঙ্গলকাব্যের অধ্যাত্ম আদর্শ শিথিল হয়ে পড়ে এবং তাতে তৎকালীন সমাজের দৈবভক্তিহীনতার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। এ সব কাব্যে বাংলাদেশের আর্যেতর গ্রামীণ ও লৌকিক দেবসংস্কার এবং জীবনবাদ নিহিত আছে। ভীতিবিহ্বল বাঙালির পূজা-অর্চনা, তাদের আনন্দবেদনা আশা আকাঙ্ক্ষার চিত্র মঙ্গলকাব্যে সহজলভ্য। এ সব কাব্য থেকে বাঙালির জাতীয় জীবনের একটা নিত্যকালের চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। কাহিনি রূপায়ণের দিক থেকে কবিগণ বাঙালির জীবনাদর্শ প্রতিফলিত করেছেন; জামাতা শিবের দারিদ্র্য কল্পনায় বাঙালি পিতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠাই প্রকাশ পেয়েছে, শোকাতুরা সনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার বাঙালি সমাজের দুঃখেরই প্রতিধ্বনি। বাঙালির নিত্যপরিচিত গৃহাঙ্গন থেকে চণ্ডীমঙ্গলের

ফুল্লরা, ভাঁড়ু দত্ত, মুরারি শীল, ধর্মমঙ্গলের কর্পূর সেন, মহামদ পাত্র, মনসামঙ্গলের সনকা, অন্নদামঙ্গলের ঈশ্বরী পাটনী, হীরা মালিনী প্রভৃতি চরিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। পৌরাণিক চরিত্রও এখানে বাঙালি জীবনের পরিচয় প্রকাশক। সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের জীবনের এমন নিবিড় যোগাযোগ এর আগে বাংলা সাহিত্যে আর ঘটে নি।

মঙ্গলকাব্যের সুদীর্ঘ গীতিকাহিনি বিভিন্ন পালায় বিভক্ত। পালা বিভাগ ছিল বিষয়ভিত্তিক। চণ্ডীমঙ্গল আট দিনে গীত হত। প্রত্যেক দিনের জন্য দিবা পালা ও রাত্রি পালার কাহিনি ভাগ করা ছিল। আট দিনে ষোল পালার বিভাগই মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বিভাগ। দিবা পালা দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত এবং রাত্রিপালা সন্ধ্যার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলত। চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ষোল পালায় বিভক্ত থাকলেও ধর্মমঙ্গল বার দিনের চব্বিশ পালায় বিভক্ত ছিল। মনসামঙ্গল প্রতিদিন এক পালা করে গাওয়া হত এবং এক মাসের উপযোগী ত্রিশ পালায় বিভক্ত ছিল। সকল মঙ্গলকাব্যের গানের শেষ রাত জেগে গান গাওয়া হত। পরদিন দিবা পালায় ফলশ্রুতি শোনার পর গান শেষ হত। কাহিনির বাইরে ফলশ্রুতিকে বলা হত অষ্টমঙ্গলা। এতে কবি আত্মপরিচয় ও কাব্যরচনার কালের উল্লেখ করতেন। কাব্যরচনার কাল হেঁয়ালির মাধ্যমে ব্যক্ত করা হত। মঙ্গলকাব্যে কবিগণের বিস্তারিত আত্মপরিচয় দেওয়া হয়েছে। কাব্যে কবিগণের ভণিতা আছে। দেবদেবীর প্রার্থনা জানিয়ে ভণিতা ব্যবহার করা হত। যেমন :

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

সকল মঙ্গলকাব্যই দৈব আদেশে রচিত। কবি কীভাবে দৈব আদেশ লাভ করেছেন তার উপাদেয় বর্ণনাও কাব্যে অন্তর্ভুক্ত থাকত। ভণিতায় কবির পৃষ্ঠপোষকদের নামের উল্লেখ থাকে। মঙ্গলকাব্যে প্রধানত পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মাত্রার সমতা থাকে নি। মাত্রার অভাব গানের সুরের মধ্য দিয়ে পূরণ করা হত। মঙ্গলকাব্যে বার মাসের সুখদুঃখের বর্ণনা 'বারমাসী' এবং চৌত্রিশ অক্ষরে রচিত দেবস্তোত্র 'চৌতিশা' অন্তর্ভুক্ত থাকত।

মঙ্গলকাব্যগুলোতে কাহিনিগত দিক থেকে কোন বৈচিত্র্য না থাকলেও শিল্পগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তা বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। বিশেষত মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের মত প্রথম শ্রেণির কবির বিস্ময়কর প্রতিভা মঙ্গলকাব্য ধারা অবলম্বনেই রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। জীবনদর্শনের যে বাস্তবতার পরিচয় মঙ্গলকাব্যে বিধৃত তা উচ্চাঙ্গ সাহিত্যসৃষ্টির প্রমাণ। বাঁধাধরা কাহিনির অলৌকিকতার মধ্যে বাস্তব জীবনচিত্র অঙ্কনে কবিগণের বিশেষ কৃতিত্ব বিদ্যমান। তাই ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'অলৌকিক আখ্যানগুলি ক্রমশ ক্ষীণতর হইয়া কাব্যের অপ্রধান অংশে পরিণত হইয়াছে, ও কেবল অতীতের ধারার সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ন রাখিবার উপায় মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। দেবতা মানুষের অধীন হইয়াছেন—দেবকীর্তি বর্ণনা উজ্জ্বল বাস্তব চিত্রের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে।' মঙ্গলকাব্যের দেবতারা অনিচ্ছুক ভক্তের কাছ থেকে জোর করে পূজা আদায় করেছে। স্বেচ্ছায় ভক্তিপ্রবণ হয়ে কেউ পূজা করে নি।

তাই নব-সংস্কার-দীক্ষিত হিন্দুসমাজে দেবতাদের প্রতি ভয় থাকলেও ভক্তি শ্রদ্ধার লেশমাত্র ছিল না বলে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'মঙ্গলকাব্য রচনার সর্বশেষ যুগে ইহার ভক্তিহীন শূন্য অন্তঃকরণ চারিদিক দিয়া উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারই অবারিত পথে সমাজের কেবলমাত্র যে নতুন ভাবসম্পদ তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই নহে, ধূলিবালি দ্বারা তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।'

মঙ্গলকাব্যে বাস্তব জীবনের তুচ্ছ সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে বলে কাব্যগুলো উপন্যাসধর্মী। বর্ণনার প্রত্যক্ষতা মঙ্গলকাব্যের একটি বিশিষ্ট গুণ। এই গুণেও তা আধুনিক উপন্যাসের স্বধর্মী। দৈবশক্তির বিরুদ্ধে মানব জীবনের যে দ্বন্দ্বসংঘাত মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য তাতে নাটকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যের প্রথম যুগের ভাষা স্থূল ও গ্রাম্যভাবাপন্ন, মধ্যযুগের ভাষা সহজ ও সাবলীল এবং শেষ যুগের ভাষা অলঙ্কারসমৃদ্ধ।

মনসামঙ্গল

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে মনসামঙ্গল সম্বন্ধেই প্রাচীনতম অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কাব্যের কাহিনি বাংলার আদিম লোকসমাজে প্রচলিত সর্পপূজার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা—লৌকিক ভয়ভীতি থেকেই এ দেবীর উদ্ভব। তাঁর অপর নাম কেতকা ও পদ্মাবতী। এই দেবীর কাহিনি নিয়ে রচিত কাব্য মনসামঙ্গল নামে পরিচিত। কোথাও তা পদ্মাপুরাণ নামেও অভিহিত হয়েছে। চাঁদ সদাগরের বিদ্রোহ ও বেহুলার সতীত্বকাহিনির জন্য মনসামঙ্গল সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মঙ্গলকাব্য ধারায় মনসামঙ্গল বিশিষ্টতা অর্জন করেছে নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহের কাহিনির জন্য। এর পেছনে আছে মুসলিম প্রভাব। এ দেশে মুসলমান আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজব্যবস্থার যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তা থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার প্রচেষ্টার পরিণামে মঙ্গলকাব্যের বিকাশ লক্ষ করা চলে। এ সম্পর্কে 'বাঙলার কাব্য' গ্রন্থে হুমায়ুন কবির লিখেছেন, 'একদিকে পাঠান সুলতান বাংলাকেই স্বদেশ করে তার চিত্ত জয় করতে উন্মুখ, অন্যদিকে সেদিনকার হিন্দু চিন্তানায়ক ইসলামের বিপুল সংহতি শক্তির আঘাতের সম্মুখে হিন্দু সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ব্যস্ত। তাই মুসলমান রাজা সেদিন চেয়েছেন যে বাংলার হিন্দুর পরিচয় চাই, অন্যদিকে হিন্দু সমাজপতি চেষ্টা করেছেন যে জনসাধারণ যেন আত্মবিস্মৃতির দরুন অথবা আত্মপরিচয়ের অভাবে ইসলামের বিজয় প্লাবণে ভেসে না যায়।' এই সংঘাতে হিন্দু মানসে মনসামঙ্গলের সৃষ্টি। আর এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হুমায়ুন কবির আরও বলেন, 'লৌকিক কাহিনি হিসেবেই তাদের সার্থকতা। পূর্ব বাংলার নদনদীবহুল নিসর্গ, বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলোর প্রাধান্য অথবা বেহুলার অভিযান,—এ সমস্ত প্রসঙ্গের আধিভৌতিক তাৎপর্য কেবলমাত্র কষ্টকল্পনা, কিন্তু নদীমাতৃক বাণিজ্যনির্ভর সমৃদ্ধ নরনারীর হিংসা ও প্রেম, তেজ ও সাহস এবং বিপুল অধ্যবসায়ের কাহিনি হিসেবে তাদের মূল্য অপরিমেয়।' অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের চেয়ে মনসামঙ্গল কাব্যে আধুনিক মনোভাবের পরিচয় সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ কাব্যে দৈবের সঙ্গে মানুষের যে

কঠিন সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে তা উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা সাহিত্যে মানবিক প্রেরণার উৎস ছিল। দেবতার ওপরে মানুষের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য এবং তা আধুনিক সাহিত্যের মানবিকতা-বোধের প্রেরণা হিসেবে বিবেচিত।

মনসামঙ্গলের কাহিনি

চাঁদ সদাগর চম্পাই নগরের বণিক। বীরপুরুষ, আত্মশক্তিতে অবিচল বিশ্বাসী চাঁদ সদাগর মহাজ্ঞানী দেবতা শিবের ভক্ত। চাঁদ সদাগর পূজা না করলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচার হয় না। স্ত্রী সনকা গোপনে মনসা দেবীর পূজা করেন। চাঁদ সদাগর তা জানতে পেরে লাথি মেরে মনসার ঘট ভেঙে দিলেন। মনসা ক্রোধান্বিত হলে চাঁদের ছয় পুত্র সাপের কামড়ে মারা গেল। চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করলে মৃত পুত্রেরা প্রাণ ফিরে পাবে বলে প্রলোভন দেখালে চাঁদ লাঠির আঘাতে মনসার পাঁজর ভেঙে ফেলেন। সনকা গোপনে মনসার কাছে স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করলে মনসা তাঁকে পুত্রবর দিলেন। কিন্তু বিয়ের রাতে পুত্র সাপের কামড়ে মারা যাবে বলা হল। সনকা ভবিষ্যতের কথা না ভেবে পুত্রমুখ দেখার আনন্দে মগ্ন রইলেন। এদিকে অবিচল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চাঁদ সদাগর চৌদ্দ ডিঙা সাজিয়ে বাণিজ্যে যাচ্ছেন। মনসা আবার চাঁদকে পূজা করতে নির্দেশ দিলেন। চাঁদ এবারও তাঁকে অপমান করে তাড়ালেন। চাঁদ সদাগর বাণিজ্য বহর নিয়ে পাটনে পৌঁছলেন এবং নিজের তুচ্ছ দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে বহু মূল্যবান সম্পদ লাভ করলেন। ফেরার পথে মনসা আবার পূজা করতে চাঁদকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু শিবভক্ত চাঁদ এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। মনসা রাগে সমুদ্রে অসময়ে ঝড়তুফান তুলে চাঁদ সদাগরের সমুদয় বাণিজ্যবহর ডুবিয়ে দিলেন। চাঁদ বহু কষ্টে তীরে উঠলেন। বার বৎসর নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে চাঁদ ভিক্ষুকের বেশে নিজদেশে ফিরে এলেন।

এদিকে মনসার বরে সনকার পুত্রলাভ হয়েছে। পুত্রের নাম লখিন্দর বা লখাই। চাঁদ সদাগর নিঃস্ব হয়ে ফিরলেও পুত্রের মুখ দেখে সকল দুঃখ ভুলে গেলেন। সনকার অসম্মতি উপেক্ষা করে চাঁদ সদাগর পুত্রের বিয়ের উদ্যোগ নিলেন। উজানী নগরের সায়বেনের কন্যা পরমাসুন্দরী বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে। মনসার কোপ থেকে রক্ষা করার জন্য লোহার বাসর ঘর তৈরি করানো হল, কিন্তু দৈবাৎ চুলের মত সরু একটি ছিদ্র রয়ে গেল। সে ছিদ্র দিয়ে এক সাপ এসে লখিন্দরকে দংশন করলে সে মারা যায়। সর্পদংশনে মৃত লখিন্দরের দেহ ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হল; বেহুলা মৃতস্বামীর অনুগামিনী হয়ে মৃতদেহের সঙ্গে ভেলায় ভেসে চলল। স্বর্গলোকে দেবতাদের কাছ থেকে সে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনবে। নদীপথে বহু বাধার সম্মুখীন হয়েও বেহুলা নিরাশ হয় নি। সমস্ত বাধাবিপত্তি জয় করে সে এগিয়ে চলল। ভেলা স্বর্গের ধোপানী নেতার ঘাটে পৌঁছল। নেতা একটি ছেলেকে নিয়ে কাপড় কাচতে ছিল। ছেলেটির দুরন্তপনায় বিরক্ত হয়ে নেতা তাকে আঘাত দিয়ে মেরে ফেলে রাখে; যাবার সময় তাকে মন্ত্র পড়ে জীবিত করে সঙ্গে নিয়ে গেল। বেহুলা এ দৃশ্য দেখে তার স্বামীর প্রাণদানের জন্য নেতাকে অনুরোধ করল। নেতা নিজের অক্ষমতার কথা বলে বেহুলাকে স্বর্গলোকে নিয়ে গেল। সেখানে নৃত্যগীতে দেবতাদের তুষ্ট করে বেহুলা তাঁদের কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইল। শিবের নির্দেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনসা লখিন্দরের

প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। তবে বেহুলাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন যে চাঁদ সদাগরকে মনসার পূজা করতে হবে। বেহুলা সম্মত হয়ে মনসার দয়ায় ছয় ভাসুর, শ্বশুরের চৌদ্দ ডিঙা বাণিজ্য বহর সবই ফিরে পেল। বেহুলা ধনরত্নপূর্ণ চৌদ্দ ডিঙা নিয়ে চাঁদের সাত পুত্রসহ ঘাটে এসে ভিড়ল। চাঁদ সদাগর ছুটে এলেন; কিন্তু মনসার পূজা করতে হবে শুনে ফিরে চললেন। পুত্রবধূ বেহুলার কাতর আবেদনে অবশেষে চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করতে সম্মত হলেন এবং মুখ ফিরিয়ে বাম হাতে একটি ফুল মনসার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিলেন। মনসা তাতেই খুশি। পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচারিত হল।

মনসামঙ্গলের কাহিনি রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র লৌকিক কাহিনি। মনে করা হয়, পল্লীগীতিকা বা ছড়ার আকারে সংক্ষিপ্ততম মূলকাহিনি লোকমুখে প্রচলিত ছিল, তের-চৌদ্দ শতকে কোন প্রতিভাধর কবির হাতে কাব্য-কাহিনিবদ্ধ হয়েছে। পরে হয়ত অন্য উপকাহিনি যুক্ত হয়ে কাব্যটি বিপুলায়তন লাভ করেছে। কাহিনিটি সে যুগেই বাংলা বিহার ও আসামের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের মত অথবা অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্রের মত কোন প্রথম শ্রেণির কবিশক্তি মনসামঙ্গল রচনায় আত্মনিয়োগ না করলেও কাব্যটি দ্রুত ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মনসামঙ্গলের কাহিনিকে আগাগোড়া কল্পনামূলক বলে দাবি করা যায় না। এর বাস্তব ভিত্তি অবশ্যস্বীকার্য।

মনসামঙ্গলের কাহিনির মাধ্যমে চাঁদ সদাগরের চরিত্রটি গতানুগতিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। নিগৃহীত মানবতার জীবনবাণী রূপে মঙ্গলকাব্যের যে বৈশিষ্ট্য তা এই চরিত্রে যথার্থই প্রতিফলিত হয়েছে। মানবিকতার পরাভব ও আত্মগ্লানিতে পূর্ণ সে যুগে চাঁদ সদাগর শক্তিমান বিদ্রোহী হিসেবে অনন্য পরিচয় দান করেছেন। নিগৃহীত জাতির মর্মগত বঞ্চনা, আর্তনাদ ও বিক্ষোভ চাঁদ সদাগরের বিদ্রোহী স্বভাবের মাধ্যমে রূপ লাভ করেছে। বেহুলা চরিত্রের মধ্যে বাঙালি নারীত্বের যে প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়েছে, তা কেবল ত্যাগ-তিতিক্ষায় সমুজ্জ্বলই নয়, অতন্দ্র আত্মবিশ্বাস ও অমিত বীর্যে ভাস্বর। বেহুলার নারীশক্তি চাঁদ সদাগরের পৌরুষের সমগোত্রীয়। যে আত্মশক্তির প্রাচুর্যে চাঁদ সদাগর বারবার ব্যর্থতার পরেও ভেঙে পড়েন নি, ক্ষুব্ধ আক্রোশে কেবল উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন, সেই মানবী শক্তির সার্থক পরিণামরূপে দেবপুরী-প্রত্যাগতা বেহুলার আবির্ভাব। তাই চাঁদ সদাগর বেহুলার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি।

'মনসামঙ্গল দেবী মনসার মঙ্গল-গাথাই নয় কেবল, বিদ্রোহী মানবতার যশোগানও।'

মনসামঙ্গলের কবিগণ

কানা হরিদত্ত

মনসামঙ্গলের কাহিনির মানবজীবনরসের প্রাচুর্য অসংখ্য কবিকে কাব্যরচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ড. দীনেশচন্দ্র সেন বাষট্টি জন কবির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে সকলের পরিচয় পাওয়া যায় নি। মঙ্গলকাব্যের আদিকবি হিসেবে কানা হরিদত্তকে মনে করা হয়। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের কবি বিজয়গুপ্ত আদিকবি হিসেবে হরিদত্তের কথা উল্লেখ করে বলেছেন :

মূর্খে রচিল গীত না জানে বৃত্তান্ত।
প্রথমে রচিত গীত কানা হরিদত্ত ॥
হরিদত্তের গীত যত লুপ্ত হৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়ে শুনিয়ে মোর উপজে বেতাল ॥

কানা হরিদত্ত সম্পর্কে বিজয়গুপ্তের এই অনুদার মন্তব্য সত্য নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। হরিদত্তের অল্প কিছু পদ পাওয়া গেছে, তাতে তাঁর কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় বিদ্যমান। কানা হরিদত্ত পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। চৌদ্দ শতকের প্রথম দিকে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। কবি হরিদত্ত রচিত দেবীর সর্পসজ্জার বর্ণনায় প্রকৃত কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় মিলে :

বিচিত্র নাগে করে দেবী গরায় সুতলি।
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচলী ॥
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেত নাগে করে দেবী কাঁকালি কাছুনি ॥
সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলি।
মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাসুলী ॥
... ...
দর্পণ হাতে করি দেবী বেশ বানায়।
মনসার চরণে লাচারী হরিদত্তে গায় ॥

নারায়ণ দেব

মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি নারায়ণ দেব। আদিকবি হরিদত্তের পরেই নারায়ণ দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। কবির কাব্য বাংলা ও আসামে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিশোরগঞ্জ জেলার বোরগ্রাম কবির জন্মস্থান। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নারায়ণ দেবের কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'। কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড কবির আত্মপরিচয় ও দেববন্দনা, দ্বিতীয় খণ্ডে পৌরাণিক কাহিনি এবং তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ সদাগরের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কবি পৌরাণিক কাহিনিকে বিস্তৃত করে বর্ণনা করেছেন। চাঁদ সদাগরের কাহিনি সংক্ষিপ্ত। সংস্কৃত পৌরাণিক কাব্যে কবির যে অপরিসীম দক্ষতা ছিল তা দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনি থেকে অনুভব করা চলে। মনসামঙ্গলে প্রতিফলিত করুণ রসের স্বাভাবিক বর্ণনায় নারায়ণ দেবের সমকক্ষ আর কেউ নেই। কেবল শোক বর্ণনাতেই নয়, শোকে দুঃখে আনন্দে-উল্লাসে, স্বার্থপরতা ও ঔদার্যে—সব দিক থেকেই আদিম মনুষ্যত্বের ধীরোদাত্ত স্বভাব বর্ণনায় নারায়ণ দেবের তুলনা মিলে না।

কবি চাঁদ সদাগরের পৌরুষদীপ্ত চরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে যুগচেতনার বৈশিষ্ট্য আত্মসম্মানবোধকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন এভাবে :

কথোক্ষণ থাকি চান্দে স্থির কৈল মন।
পদ্মাকে মন্দ বোলে কঠোর বচন ॥
পুত্র মৈল খোটা জদি দেয় মোরে কানি।
তাহার জতেক গুণ আমি তারে জানি ॥
পদ্মবনে পরিহাস্য করিল সঙ্করে।
সেই দুরাক্ষর বানি ঘোষয়ে সংসারে ॥
পথে আনিতে বাছাই করিতে চাইল বল।
ঘরে আসি খাইল তবে সতাইর ঠোকর ॥
দেব করিয়া বুলিতে লজ্জা নাহি কানি।
এক রাত্রি বিহা করি ছাড়ি গেল মুনি ॥
হাসন-হোসেন লাজ দিল বিধি মতে।
হেমতালে কাকালি ভাঙ্গিল মোর হাতে ॥
বেস করিয়া গেল ধনন্তীর ঘরে।
জপতপ করে কানি ধরিয়া নিল তারে ॥
কোন দোস পাইয়া মোর কাটীল বাউগান।
অকারণে বুড়াইল ডিঙ্গা চৈদ্ধ খান ॥
ডালমুর গেল মুর মৈদ্ধ হৈল সার।
অখনে কানির সনে চাপি করোঁ বাদ ॥
যদি কানির লাইগ পাম একবার।
কাটিয়া সুজিব আমি মরা পুত্রের ধার ॥
জে করি করিমু কানিরে আমার মনে জাগে।
নাগের উৎসিষ্ট পুত্র ভাসাও নিঞা গাঙ্গে ॥

পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সার্থক মিলনে নারায়ণ দেব স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্য সর্বাধিক প্রচারের গৌরব অর্জন করেছিল বলে পরবর্তী কবি ও গায়েনদের কাছে তিনি আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্যকে করুণরসের আকর বলা হয়েছে। এই করুণরসের স্বাভাবিক বর্ণনায় নারায়ণ দেবের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না।

নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'করুণ রসের আধিক্য এবং ব্যঙ্গরসের ভিয়ান এ কাব্যকে সুখপাঠ্য করেছে। আর জনপ্রিয়তাই যদি শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপক হয়, তাহলে নারায়ণ দেবকে একজন শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিতেই হবে।' বাংলাদেশ অপেক্ষা আসামেই নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ বেশি প্রচলিত।

বিজয় গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট সনতারিখ যুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা বিজয় গুপ্ত। কবি তাঁর কাব্যে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন :

মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম ॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥
* * *
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয় ॥

কবি বরিশাল জেলার বর্তমান গৈলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ গ্রামের প্রাচীন নাম ফুল্লশ্রী। কবির কাব্যের উল্লেখিত একটি শ্লোক থেকে অনুমিত হয় তিনি গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের আমলে ১৪৯৪ সালে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ফলে এ ধারায় তাঁর পূর্ববর্তী কবিগণের যশ ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু কাব্যধর্মের বিচারে বিজয় গুপ্তের কবিপ্রতিভা খুব উচ্চস্তরের ছিল না। ভাবপ্রবণতা অপেক্ষা বস্তু-বিশ্লেষণ প্রবণতা তাঁর মধ্যে বেশি ছিল। ফলে কতগুলো বিচ্ছিন্ন সামাজিক চিত্র তাঁর কাব্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য মনসামঙ্গল কাব্য তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হিসেবে বিবেচ্য। বিজয় গুপ্তের পরিকল্পিত দেবচরিত্র তৎকালীন সমাজের জীবন ও মানবচরিত্র রূপে চিত্রিত হয়েছে। কাহিনি পরিকল্পনায় যেমন বৈচিত্র্য আছে তেমনি ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন। উপমাপ্রয়োগেও তাঁর অভিনবত্ব ছিল। তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত অলঙ্কার প্রয়োগ না করে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন। এ ক্ষেত্রে কবিকৃতির নমুনা :

চণ্ডীর কাছে মনসার নিজের দুর্ভাগ্যের বর্ণনা :

জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল ॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে ॥

লখিন্দরকে সর্পদংশনের পর বেহুলার বিলাপ :

আম ফলে থোকা থোকা নুইয়া পড়ে ডাল।
নারী হইয়া এ যৌবন রাখিব কত কাল ॥
সোনা নহে রূপা নহে অঞ্চলে বান্ধিব।
হারাইলাম প্রাণপতি কোথা যাইয়া পাব ॥

বিপ্রদাস পিপিলাই

বিজয় গুপ্তের প্রায় সমসাময়িক কবি বিপ্রদাস পিপিলাই। তিনি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল রচনার এক বৎসর পর তাঁর 'মনসাবিজয়' কাব্য রচনা করেন। কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন :

মুকুন্দ পণ্ডিত সূত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড়্যা বটগ্রাম ॥

এই বাদুড়্যা বটগ্রাম বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমায় বাদুড়িয়ার নিকটবর্তী বড়গাঁ। কবি স্বপ্নাদেশ লাভ করে ১৪৯৫ সালে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালে 'মনসাবিজয়' কাব্য রচনা করেছিলেন। বিপ্রদাস কাব্যের প্রথমে গ্রন্থের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেছেন :

সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গল গীত
বিস্তরে কহিব সপ্ত নিশি।

সাতটি পালায় কাব্যরচনার কথা এখানে উল্লেখিত হলেও কবির প্রাপ্ত পুঁথিতে নয়টি পালা পাওয়া গেছে এবং তাতে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার কাহিনি পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। বিপ্রদাসের কাব্যে মনসামঙ্গলের কঠোর নিষ্ঠুরা দেবী মনসা অনেকটাই করুণাময়ী ও ভক্তবৎসলা হয়ে উঠেছেন। কবির কাব্যরচনায় আছে প্রাঞ্জলতা, আনুপূর্বিকতা ও স্নিগ্ধতা। এ কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর গল্প-বৈচিত্র্য। মনসা প্রসঙ্গীয় অসংখ্য গল্প উপাখ্যান এ কাব্যে সংগৃহীত হয়ে একে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রাপথের বৃত্তান্তে অনেক ভৌগোলিক তথ্য পাওয়া যায়। এই বিবরণে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। কবি হাসেন-হুসেনের যে দীর্ঘ পালাটি এ কাব্যে সংযোজিত করেছেন তা অপরাপর মনসামঙ্গলের তুলনায় সুপরিকল্পিত এবং মুসলমান সমাজ ও জীবনের পুংখানুপুংখ ও তথ্যবহুল চিত্র হিসেবে এর গুরুত্ব অনেক। মনসার চরিত্রচিত্রণে কবি করুণা ও স্নেহমমতা সঞ্চার করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যরচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছিলেন :

শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে ॥
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ ॥
কবিগুরু ধীরজনে করি পরিহার।
রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসার ॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শা গৌড়ের সুলতান ॥
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পীরিত ॥

দ্বিজ বংশীদাস

মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি দ্বিজ বংশীদাস। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য পারিপার্শ্বিক ঘটনা বিবেচনা করে দ্বিজ বংশীদাস সতের শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতানুসারে বংশীদাসের পদ্মাপুরাণের রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোক থেকে ১৫৭৫ সাল পাওয়া যায়। বংশীদাস কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণের অনুবাদে পিতা বংশীদাসের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায় ॥
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনী ॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায় ॥
দ্বিজ বংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে ॥

কবি কাব্যে দ্বিজ বংশী, বংশীধর, বংশীবদন, বংশীদাস ইত্যাদি ভণিতা ব্যবহার করেছেন। কবি দল বেঁধে মনসার ভাসান গেয়ে বেড়াতেন। সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। কবি মনসামঙ্গলের কাহিনিকে কিছুটা স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছেন। তাঁর চাঁদ সদাগরের ইষ্টদেবতা শিব নন, শিবের পত্নী চণ্ডী। সপত্নীকন্যা মনসার সঙ্গে চণ্ডীর বিবাদ। উভয়ের বিবাদের মধ্যে পড়ে চাঁদ সদাগরের দুর্গতির সৃষ্টি হয়। বংশীদাসের কাব্যে চাঁদ-মনসার সেই বিরোধের উৎস-প্রেরণা পরিবর্তিত হয়েছে বাঙালি-ধর্মী বিমাতা ও সপত্নীকন্যার হিংসাতুর দ্বন্দ্বে,—গৌরী ও মনসার ঈর্ষা ও জিগীষার সংগ্রামে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'বংশীদাসের ব্যাপক লোকপ্রিয়তার কারণ, তাঁহার অনুভূতির আন্তরিকতা ও ভাষার প্রত্যক্ষতা। সহজ নিরলঙ্কার ভাষায় ব্যক্ত মনের গভীর ভাবটি পাঠকের মর্মতল স্পর্শ করে। ভক্ত সাধকের সৃষ্টির সঙ্গে সহজ কবিত্বের শুচিদৃষ্টি মিলিত হইয়া তাঁহার কাব্যে মণিকাঞ্চন যোগ সৃষ্টি করিয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্য যে করুণরসের আকর, অন্তরের সহজ ভাবানুভূতি হইতে বংশীদাস তাঁহার কাব্যে তাহা উৎসারিত করিয়াছেন ইহাতে বিন্দুমাত্রও কৃত্রিমতা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবানুভূতির অকৃত্রিমতাই দ্বিজ বংশীকে ভাবপ্রবণ বাঙালির কাছে এত জনপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছে।'

কবি দ্বিজ বংশীদাস বেহুলার দুঃখের চিত্রবর্ণনায় সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন, আবার চাঁদ সদাগরের চরিত্রের দৃঢ়তা বর্ণনা করতে গিয়ে কবিহৃদয় কঠিন হয়ে উঠেছে। কবি চাঁদ সদাগরের দীপ্ত পৌরুষকে শতগুণ উজ্জ্বল করে রূপায়িত করেছেন। মনসার চক্রান্তে চাঁদের ছয়পুত্র সাপের কামড়ে মারা গেছে, পুত্রশোকাতুরা সনকার মাতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠেছে, চৌদ্দ ডিঙা ডুবে ভাগ্যবিপর্যস্ত সর্বহারা চাঁদ একা দেশে ফিরে এসেছেন—তখন অনুচরদের পরিবারবর্গ স্বজন হারানোর বেদনায় আর্তনাদ করে উঠেছে, কিন্তু চাঁদ সদাগর দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়ে বলেন :

যে কান্দে আমার এথা তাহার মুড়িব মাথা
দেশে রাকি নাহি কাজ।
কাতর হইনু জানি হাসিবেক লঘু কানী
সেহি মোর বড় দুঃখ লাজ ॥

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

পশ্চিমবঙ্গের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সতের শতকের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন বলে অনুমিত হয়। তিনি মঙ্গলকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। জনপ্রিয়তার দিক থেকেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। কবির নাম ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস তাঁর উপাধি। তাঁর মতে 'কিআ পাতে জন্ম হৈল কেতকা সুন্দরী।' তাই মনসার অপর নাম কেতকা। মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবির মতে পদ্মপাতায় জন্ম বলে মনসার অপর নাম পদ্মা; কিন্তু ক্ষেমানন্দের মতে কেয়াপাতায় মনসার জন্মের যে বৃত্তান্ত তা অন্যত্র নেই। কবি কেতকা বা মনসার দাস হিসেবে নিজেকে মনে করে কেতকাদাস ভণিতা ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ সম্পর্কে কবি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাতে কিছুটা কবিপরিচিতি পাওয়া যায়। কবি বিস্তারিত ভাবে আত্মপরিচয় দান করেছেন। তা থেকে জানা যায় তিনি হুগলি জেলার কেতেরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে স্থান ত্যাগ করে জগন্নাথপুরে গমন করেন। সেখানে একদিন সন্ধ্যাবেলায় খড় কাটতে গিয়ে কবি মুচিনী বেশধারিণী মনসার সাক্ষাৎ পান এবং পরে মনসা ভুজঙ্গভূষিতা ব্রাহ্মণীরূপে দেখা দিয়ে কাব্যরচনার আদেশ দেন। এই আদেশ ১৬৩৮-৩৯ সালে লাভ করেছিলেন বলে গবেষকগণ অনুমান করেন। কবি কিভাবে দেবীকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সে সম্পর্কে বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন :

যেরূপ দেখিলা দৃষ্টে মানা কৈল প্রকাশিতে
কহিলে না হবে তোর ভাল।
ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিতা কর প্রবন্ধ
আমার মঙ্গল গায়্যা বোল ॥
ব্রাহ্মণী চরণ আশে গাইল কেতকাদাসে
তোমা বিনে অন্য নাহি গতি।
যেই পড়ে যেই শুনে রাখিবে তারে সর্বক্ষণে
অন্তকালে হইবে সারথি ॥

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও রামায়ণ কাহিনির প্রভাব তাঁর কাব্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। কবি তাঁর কাব্যে কবিত্বশক্তির সঙ্গে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বেহুলার দুঃখবর্ণনায় করুণরস সৃষ্টিতে কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে। তাঁর ভাষা সুপরিচ্ছন্ন এবং তা বহুলাংশে পূর্ববর্তী যুগের গ্রাম্যতামুক্ত। কবির পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি এবং সামাজিক রীতিনীতি ও ভৌগোলিক স্থানের বিশদ বর্ণনা কাব্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

ক্ষেমানন্দ

মানভূম থেকে ক্ষেমানন্দ নামে একজন স্বতন্ত্র কবির ভণিতায় মনসামঙ্গলের একটি ক্ষুদ্রকায় পুঁথি পাওয়া গেছে। এটি দেবনাগরী অক্ষরে লেখা এবং আঞ্চলিক শব্দে পূর্ণ। কাব্যটি বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। কাব্যের পুঁথিটি মানভূম জেলা থেকে সংগৃহীত। এর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে সে অঞ্চলের ছাপ স্পষ্ট। এই ক্ষেমানন্দ পূর্ববর্তী কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ থেকে পৃথক ব্যক্তি। সম্ভবত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের জনপ্রিয়তা লক্ষ করে কোন কম প্রতিভাধারী কবি ক্ষেমানন্দ ভণিতা ব্যবহার

করেছেন। রচনাটি আঠার শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে হয় না। চাঁদ সদাগরের চরিত্র পরিকল্পনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি কাহিনিতেও নতুনত্ব আনয়ন করেছিলেন।

বাইশ কবির মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তার জন্য বিভিন্ন কবির রচিত কাব্য থেকে বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ করে যে পদসংকলন করা হয়েছিল তা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' বা 'বাইশা' বা 'বাইশ কবি মনসা' নামে প্রচলিত। এ ধরনের অন্য একটি সংকলনের নাম 'ষট কবি মনসামঙ্গল।' বাইশ কবি মনসামঙ্গলে বাইশ জন কবির তালিকা আছে। তবে গ্রন্থে সকলের নাম পাওয়া যায় না। এ সংকলনে অনেক অখ্যাত কবির নাম স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন কবির কাব্য থেকে বিভিন্ন অংশ সংগৃহীত বলে এ ধরনের সংকলনে সর্বাঙ্গীন কৃতিত্ব নেই। অনেক স্থানে আধুনিকতার নিদর্শনও বিদ্যমান।

মনসামঙ্গল কাহিনির জনপ্রিয়তার জন্য অসংখ্য কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ষোল শতকের গঙ্গাদাস সেন, সতের শতকের রামজীবন বিদ্যাভূষণ, বাণেশ্বর রায়, জীবন মৈত্র প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের ধারায় চণ্ডীমঙ্গলের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। চণ্ডীদেবীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এ দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। চণ্ডীদেবীর উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত। সম্ভবত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে সব স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা কালক্রমে চণ্ডী নামে পরিচিতি লাভ করেছে। চণ্ডী আদিতে অনার্য মূলোদ্ভূত ছিলেন, পরে বৌদ্ধ ও হিন্দুতান্ত্রিক দেব পরিকল্পনার সঙ্গে মিশে ক্রমে পৌরাণিক পার্বতীর সঙ্গে সমঐতিহ্যসূত্রে বিধৃত হয়েছেন। এই চণ্ডীদেবীর কাহিনি অবলম্বনেই 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ধারা রূপায়িত হয়ে উঠেছে। চণ্ডীমঙ্গলের যেসব পুঁথি পাওয়া গেছে তাদের কোনটিই ষোল শতকের আগের রচনা নয় বলে মনে করা হয়। তবে বার শতকের পূর্বে বাংলাদেশে চণ্ডীর পূজা শুরু হয়েছিল এবং চৌদ্দ-পনের শতকে মঙ্গলচণ্ডী পাঁচালি আকারে রচিত হয়েছিল এমনও ধারণা করা হয়। অপরাপর মঙ্গলকাব্যে যেখানে একটি কাহিনি বর্তমান, 'চণ্ডীমঙ্গল' এর ব্যতিক্রম, এতে আছে দুটি কাহিনি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সাধারণ, বর্ণহীন ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনায় সম্প্রসারিত মানব জীবন বর্ণিত হয়েছে। বাঙালির সুখদুঃখ, সামাজিক দলাদলি, কুসংস্কার, বারমাসী, রন্ধনপ্রণালী, বেশভূষা, বিবাহ-বিধি, পরনিন্দা প্রভৃতি বিষয়ও চণ্ডীমঙ্গলে উপভোগ্য হয়েছে। এ কাব্যের গল্প বাস্তবতার অনুসারী, স্বাভাবিকতা ও মানবিকতায় সমৃদ্ধ। চণ্ডী দেবী মনসার মত উগ্র মেজাজের ছিলেন না, তাঁর মধ্যে মানবপ্রীতির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাব্যের গঠন ও উপস্থাপনায় ছিল অভিনবত্ব এবং সে কারণেই এতে উপন্যাসের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম—আক্ষেটিক খণ্ড এবং দ্বিতীয়—বণিক খণ্ড। প্রথম খণ্ডে আক্ষেটিক বা ব্যাধ কালকেতুর কাহিনি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বণিক ধনপতির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের দুটি কাহিনি কেবল চণ্ডীমঙ্গলেই পাওয়া

যায়, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে একটি মাত্র কাহিনি রয়েছে। তবে অপরাপর মঙ্গল কাব্যের মতই চণ্ডীমঙ্গলেও দেবখণ্ড আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনিতে ব্যাধের ওপর চণ্ডীর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সমাজের নিচু পর্যায়ের মানুষের মধ্যে পূজা প্রচারের কথা বলা হয়েছে; আবার বণিকের ওপর প্রভাব বিস্তার করে অভিজাত শ্রেণির মানুষের মধ্যে চণ্ডীর পূজা প্রচারের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

কালকেতু উপাখ্যান

কলিঙ্গরাজ্যের সীমান্তের এক অরণ্যে বনদেবী চণ্ডীর অনুগ্রহে বনের পশুরা পরম সুখে দিনাতিপাত করছিল। এক সময়ে কালকেতু নামক এক ব্যাধের পশুশিকারজনিত অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বনের পশুরা চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হলে চণ্ডী তাদের অভয় দিলেন। পরদিন দেবী ছলনা করে বনের সকল পশু লুকিয়ে রাখলেন। কালকেতু কোন শিকার না পেয়ে এক স্বর্ণগোধিকা ধরে নিয়ে ঘরে ফিরল। চণ্ডীদেবীই স্বর্ণগোধিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। কালকেতুর গৃহে দেবী নিজের মূর্তি ধারণ করলেন এবং নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে কালকেতুকে সাত ঘড়া ধন ও একটি মহামূল্যবান আংটি দান করলেন। দেবীর নির্দেশে কালকেতু গুজরাটে বন কেটে এক নগর স্থাপন করল। নগর ধনেজনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলে ভাঁড়ু দত্ত নামে এক ধূর্তলোক কালকেতুর আশ্রয়ে থেকে প্রজাদের ওপর নানা প্রকার অত্যাচার করতে থাকে। কালকেতু তা জানতে পেরে ভাঁড়ু দত্তকে তাড়িয়ে দিল। ভাঁড়ু দত্ত প্রতিবেশী কলিঙ্গরাজের কাছে অভিযোগ জানিয়ে কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করার জন্য তাঁকে প্ররোচিত করে। ফলে কালকেতু ও কলিঙ্গরাজের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভাঁড়ু দত্তের চক্রান্তে কালকেতু পরাজিত ও বন্দী হলে চণ্ডীদেবীর দয়ায় সে মুক্তি পায়। তারপর দীর্ঘকাল রাজত্ব করে পুত্র পুষ্পকেতুর হাতে রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক কালকেতু স্ত্রী ফুল্লরাসহ স্বর্গারোহণ করে। কালকেতু পূর্বে ছিল স্বর্গের ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর এবং ফুল্লরা ছিল নীলাম্বরপত্নী ছায়া। অভিশপ্ত হয়ে তাঁরা মর্ত্যে ব্যাধের ঘরে জন্ম নিয়েছিল। চণ্ডী দেবী মর্ত্যলোকে নিজের পূজা প্রচার করতে মনস্থ করেছিলেন। ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বরকে তিনি এ কাজের ভার দিতে চেয়েছিলেন। শিবকে এ কথা জানালে শিব অস্বীকৃতি জানান, কিন্তু চণ্ডীর ষড়যন্ত্রে অভিশপ্ত হয়ে নীলাম্বরকে পৃথিবীতে আসতে হয়েছিল।

ধনপতি সদাগরের কাহিনি

উজানী নগরে ধনপতি সদাগর নামে এক বিলাসী যুবক বাস করত। তার প্রথমা স্ত্রী লহনা নিঃসন্তান। শ্যালিকা সম্পর্কিত খুল্লনার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে সে তাকে বিয়ে করে। বিয়ের পর খুল্লনাকে লহনার কাছে রেখে ধনপতি রাজাজ্ঞায় সুবর্ণপিঞ্জর আনার জন্য গৌড়ে গেল। সতীনের প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে লহনা খুল্লনাকে নানা প্রকার অত্যাচার করতে লাগল। বাধ্য হয়ে খুল্লনা বনে গেল ছাগল চরাতে। সেখানে খুল্লনা চণ্ডীদেবীর পূজাপদ্ধতি শিখে নিয়ে চণ্ডীর পূজা সম্পন্ন করে। এতে চণ্ডীদেবী তার প্রতি প্রসন্ন হন। চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে ধনপতি সদাগর ফিরে আসে। খুল্লনার চণ্ডীর পূজা দেখে ধনপতি রেগে পূজার ঘট পায়ে ঠেলে ফেলে দিল। ধনপতি সদাগরের প্রথমা স্ত্রী লহনা এ বিয়ের কথা শুনে অভিমান করেছিল। ধনপতি তাকে অনেক বোঝাল, সবশেষে লহনা একখানা পাটশাড়ি ও চুড়ি তৈরির জন্য পাঁচ তোলা সোনা পেয়ে বিয়েতে সম্মতি দিল।

খুল্লনা বনে ছাগল চরাত বলে স্বজাতিবর্গ তার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করল। খুল্লনা সতীত্বের পরীক্ষা দিল। তাকে জলে ডুবানোর চেষ্টা করা হল, সাপ দিয়ে কামড়ানো হল, প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডে বিদ্ধ করা হল, শেষে তাকে জতুগৃহে রেখে আগুন দেওয়া হল—কিন্তু খুল্লনার কিছুই হল না। সে সতী হিসেবে বিবেচিত হল। কিছুদিন পর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ধনপতি সিংহল যাত্রা করে। পথে কালিদহে কমলে কামিনী মূর্তি দেখতে পায়। সেখানে এক অপরূপ সুন্দরী তরুণী পদ্মের ওপর বসে এক বিরাট হস্তী গলধঃকরণ ও উদ্‌গীরণ করছে। এই অপূর্ব ও আশ্চর্য দৃশ্যের কথা সিংহলরাজকে জানালে তিনি তা দেখতে চাইলেন। কিন্তু চণ্ডীদেবীর মায়ায় ধনপতি তা দেখাতে পারল না। সিংহলে আগমনের পূর্বে ধনপতি খুল্লনাপূজিত চণ্ডীর ঘট ভেঙে দিয়েছিল বলে চণ্ডীদেবী তার ওপর ক্রোধান্বিত ছিলেন। তখন সিংহলরাজ শাস্তিস্বরূপ ধনপতিকে কারারুদ্ধ করেন। ইতোমধ্যে খুল্লনার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তার নাম শ্রীমন্ত। বড় হয়ে সে পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করল। পথে শ্রীমন্তও কালিদহে কমলে কামিনী মূর্তি দেখতে পায়। কিন্তু পিতার মত শ্রীমন্তও সিংহলরাজকে তা দেখাতে পারল না। রাজা অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। শ্রীমন্তের স্তবে চণ্ডীদেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রক্ষা করলেন। পিতাপুত্রে মিলন ঘটল। সিংহল রাজকন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে হল। তারপর পুত্র ও পুত্রবধূ সঙ্গে নিয়ে ধনপতি সদাগর দেশে ফিরে আসে। উজানি নগরে এসে শ্রীমন্ত উজানি নগরের রাজাকে কমলে কামিনীর মূর্তি দেখিয়ে মুগ্ধ করল এবং তাঁর কন্যা জয়াবতীকে বিয়ে করল। তারপর স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরে গেলেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণ

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে অনেক কবি কাব্য রচনা করেছিলেন। ড. সুকুমার সেন তাঁদের সংখ্যা ১৯জন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এ সংখ্যা যথেষ্ট নয়। গতানুগতিক ভাবে কাব্যরচনার ফলে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কবিগণের মধ্যে কবি মুকুন্দরামের প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। পাঁচালি বা লোককথার ক্ষুদ্র গীতিকাব্যের আকারে প্রথমত হয়ত তা প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে কোন নিপুণ কাব্যশিল্পীর হাতে পড়ে তা মঙ্গলকাব্য রূপে প্রচারিত হয়েছে।

মাণিক দত্ত

চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি হিসেবে মাণিক দত্তের স্থান। চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামের কবিবন্দনায় মাণিক দত্তের নাম উল্লেখ করা হয়েছে :

জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দোঁ কালিদাস।
আদি কবি বাল্মীকি বন্দিলুঁ মুনি ব্যাস ॥
মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ-পরিচয় ॥
বন্দিলু গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।
প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণ ॥

মুকুন্দরাম কর্তৃক উল্লেখের ফলে মনে হয় মাণিক দত্তই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। মাণিক দত্তের নামে প্রচলিত পুঁথি পাওয়া গেছে। তবে তা প্রাচীন নয়। হয়ত মাণিক দত্তের কাব্য অনুসরণে তাঁরই নামে অন্য কেউ এ কাব্যের রূপ দিয়েছেন। মাণিক দত্তের রচনা পাঠে মনে হয় কবি গৌড় বা মালদহের লোক ছিলেন। তাঁর কাব্যে যে সব নদী ও গ্রামের কথা বলা হয়েছে সে সব মালদহ অঞ্চলে বিদ্যমান। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে, তাঁর নিবাস ছিল ফুলুয়া নগর। স্থানটিকে মালদহ জেলার বর্তমান ফুলবাড়ি বলে অনুমান করা হয়। সম্ভবত কবি ষোল শতকের বহু পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। চণ্ডীর উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কবি যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে অভিনবত্ব আছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনির সঙ্গেও এর মিল দেখা যায়। মাণিক দত্তের আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন কানা ও খোঁড়া। দেবীর দয়ায় তিনি সুস্থ হন এবং দেবীর স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করেন। কথিত আছে, কবির কাব্যে কলিঙ্গরাজের উল্লেখ থাকার অপরাধে কবি কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কারারুদ্ধ হন, কিন্তু চণ্ডীদেবীর কৃপায় মুক্তি লাভ করেন। কলিঙ্গরাজও দেবীর অনুগত হন এবং রাজ্যে দেবীর পূজা প্রচলিত হয়। কবির বর্ণনায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে :

খুল্লনার বচনে লহনা উঠিল জ্বলিয়া।
লড় দিয়া চুলের মুঠ ধরিল চাপিয়া ॥
চুলেত ধরিয়া গালেতে দিল চড়।
চাপিয়া বসিল খুলনাইর বুকের উপর ॥
কাড়িয়া লইল তার অষ্ট আভরণ।
পরিবার আজ্ঞা দিল খুঞিএর বসন ॥

মাণিক দত্তের কাহিনি আরম্ভ হয়েছে ধর্মমঙ্গল কাহিনির অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দিয়ে। তাঁর কাব্যে গতানুগতিক অন্য কোন দেবতার বন্দনা নেই। তাঁর কাব্যের ধনপতির কাহিনিটি কালকেতুর কাহিনি থেকে অধিকতর সুপরিকল্পিত। কাব্যে কবির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসনীয় হলেও রচনা সর্বত্রই শিথিলবদ্ধ, ছন্দ ও অন্ত্যমিলে আছে সচেতনতার অভাব। কবির রচনা সরল ও অনাড়ম্বর। পরবর্তী কবি মুকুন্দরামের কাব্যের বহুল প্রচারের ফলে মাণিক দত্তের কাব্যে মুকুন্দরামের অনেক পদ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন মাণিক দত্তকে তের শতকের লোক বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এমন প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সতের শতকে ধর্মমঙ্গল কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্বের যে বর্ণনা আছে মাণিক দত্তের কাব্যেও তা দেখা যায়। তাই ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, 'মাণিক দত্ত মুকুন্দরামের অগ্রবর্তী, তবে একেবারে তিন শত বৎসরের অগ্রবর্তী কিনা, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।'

দ্বিজ মাধব

দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম রচয়িতা। দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যের নাম কোথাও 'সারদামঙ্গল', কোথাও 'সারদাচরিত' বলে উল্লেখ করেছেন। কবির কাব্যরচনার কাল সম্পর্কিত পদ থেকে জানা যায় যে, এ কাব্য ১৫৭৯ সালে রচিত। কবির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, 'দ্বিজ মাধবকে যদিও একজন প্রথম

শ্রেণির কবি বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না, তথাপি আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গ চরিত্রসৃষ্টির এমন মৌলিক প্রয়াস তাঁহার পূর্বে আর খুব বেশি কবি দেখাইতে পারেন নাই।' মানবচরিত্র বিশ্লেষণের বিশেষ ক্ষমতা থাকার ফলে কবি কালকেতু ও ফুল্লরার ব্যাধ-জীবনের বৈশিষ্ট্য সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। দ্বিজ মাধব প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বাঙালি জীবনের বিচিত্র বাস্তব পটভূমিকার ওপর একটি গার্হস্থ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর ভাষা অলঙ্কারহীন এবং বর্ণনা অনাড়ম্বর, কিন্তু চরিত্রগুলো উজ্জ্বল। কবি ব্যাধশিশু কালকেতুর বর্ণনা দিয়েছেন :

বাড়ে হে বীরবর যেন মত্ত করিবর
গজশুণ্ড জিনি দুই কর।
আখেটির সুত সব তারা সব পরাভব
খেলায় জিনিতে নাহি পারে।
বাঁটুল বাঁশ লৈয়া করে পশু বধিবার তরে
তার ঘাও বৃথা নাহি যায়।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি ডাকিয়া পাড়য়ে পাখী
ঘুরি ঘুরি পড় যে তথায়।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

ষোল শতকে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের সর্বাধিক প্রসার ঘটে। এ ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি তাঁর কাব্যের প্রথমে যে মূল্যবান আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর নিজের সম্পর্কে যেমন কথা আছে, তেমনি তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয়ও বিধৃত। তাঁর আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় যে, তিনি বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকার ডিহিদার বা প্রধান রাজকর্মচারী মাহমুদ শরীফের অত্যাচারে জন্মভূমি পরিত্যাগ করে কবি মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় নেন। বাঁকুড়া রায় তাঁকে নিজপুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। অল্প কিছুদিন পর পিতার মৃত্যু হলে রঘুনাথ নিজে জমিদার হন এবং কবিকে গুরুরূপে মান্য করে নিজের সভাসদ হিসেবে স্থান দেন। জমিদার রঘুনাথের সভাসদরূপে থাকাকালীন তাঁর নির্দেশে মুকুন্দরাম 'শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। রঘুনাথ কবিপ্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দেন। মুকুন্দরামের জন্ম এবং তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতানুসারে আনুমানিক ১৫৩৭ সালে অর্থাৎ ষোল শতকের পূর্বভাগে কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাব্যসমাপ্তির প্রকৃত কাল সম্পর্কে নানাপ্রকার মতবিরোধ থাকলেও ষোল শতকের শেষ দশকে এ কাব্যের রচনা সমাপ্ত হয়েছিল বলে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতানুসারে কাব্যরচনার কাল ১৫৯৪ সালের শেষ থেকে ১৬০৩ সালের মধ্যে। মুকুন্দরামের কাব্যে উল্লেখিত বাংলার সুবাদার মানসিংহের শাসনকাল বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ১৫৯৪ বা ১৫৯৫ সাল কাব্যরচনার সমাপ্তিকাল। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এ মত সমর্থন করেছেন।

কবি মুকুন্দরাম তাঁর গ্রন্থোৎপত্তির যে একটি মূল্যবান বিবরণ দিয়েছেন তার আরম্ভটা এ রকম :

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিল আচম্বিতে।
... ...
ক্ষুধা-ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
হাতে লইয়া পত্রমসী আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি নিয়ে মুকুন্দরামের আগেই কাব্য রচিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালেও এ ধারা সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে অন্য কোন কবির পক্ষে মুকুন্দরামের সমকক্ষতা লাভ করা সম্ভবপর হয় নি। পূর্ব প্রচলিত কাহিনি অবলম্বনে কবি এ কাব্য রচনা করেন এবং চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মাণিক দত্তের কাব্য থেকেও কিছু সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু কাব্য রূপায়ণে তাঁর কৃতিত্ব অতুলনীয়। মুকুন্দরামের কাব্য চণ্ডীমঙ্গল নামে পরিচিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে 'অভয়ামঙ্গল' নামে উল্লেখিত হয়েছে। কোথাও 'অম্বিকামঙ্গল', 'গৌরীমঙ্গল' এবং 'চণ্ডিকামঙ্গল' নামও পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথমে বন্দনা ও সৃষ্টিকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তারপর দেবখণ্ড—সতী ও পার্বতীর কাহিনি। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম আক্ষেটিক খণ্ড—কালকেতুর কাহিনি এবং তৃতীয় খণ্ডের নাম বণিকখণ্ড—ধনপতি সদাগরের কাহিনি।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত একটিমাত্র কাব্য থেকে যে নতুনতর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁকে একজন প্রতিভাবান জীবনসচেতন কবি হিসেবে বিবেচনা করা চলে। বিষয়বস্তুর গতানুগতিকতা থাকলেও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির সহায়তায় সেখানে তিনি অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এ সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'মুকুন্দরামের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির গুণে পৌরাণিক প্রভাবদ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়াও লৌকিক চণ্ডীর কাহিনিটি বাংলার বিশিষ্ট জাতীয় একটি জীবনবাণী প্রচার করিয়াছে। প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যকে তাঁহার কাব্যে তিনি নিজের স্বকীয় উপলব্ধি দ্বারা অনুভব করিয়া লইয়াছেন। আভিজাত্যের গৌরবহীন সাধারণ বাঙালি জীবন হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যে সাহিত্যিক চরিত্রসৃষ্টি সে যুগেও সম্ভব হইত, মুকুন্দরামের রচনা পাঠ করিলে তাহাই জানিতে পারা যায়। তাঁহার পরিকল্পিত কালকেতু-ফুল্লরা তাহারই প্রমাণ। প্রাচীন সাহিত্যে দেবদেবী কিংবা

অভিজাত চরিত্রই কাব্যের নায়ক-নায়িকার স্থান গ্রহণ করিত। কারণ, সমগ্রভাবে সমাজের দৃষ্টি তাহাদেরই উপর ন্যস্ত থাকিত। কিন্তু মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যের এই দুইটি নায়ক-নায়িকাকে সর্বপ্রকার আভিজাত্য হইতে দূরে রাখিয়াও ইহাদের মধ্যে যে অপূর্ব মানবিক গৌরব দান করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পরম বিস্ময়।'

ড. আহমদ শরীফ তাঁর 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মন্তব্য করেছেন, 'কবিকঙ্কণের অনন্যতা তাঁর বাস্তব জীবন ও প্রতিবেশ চেতনায়, ব্যক্তির ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের বাস্তবনিষ্ঠ বাকচিত্রাঙ্কনে, গৃহগতজীবনে নারীর সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা-অসূয়া, কাম-প্রেম প্রভৃতির সূক্ষ্ম রূপায়ণে, নিম্নবর্ণের ও মধ্যবিত্তের মানুষের জীবিকার গরজে অবলম্বিত ছল-চাতুরীর ও ধূর্ততার বিচিত্র রূপ অঙ্কনে।'

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যে আমলে কাব্যচর্চা করেছিলেন সে আমলে কবিগণের লক্ষ্য ছিল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে সম্ভব-অসম্ভবের রাজ্যে বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা অতিক্রম করে রোমান্টিক কল্পনার আকাশে ঘটনা ও চরিত্রের সন্ধান করে বেড়ানো। সে সময়ে কবি মুকুন্দরাম বাস্তব জীবনদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। বাস্তবতার সঙ্গে যখন কাব্যের কোন সংযোগ ছিল না তখন তিনি বাস্তব জীবননিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

মুকুন্দরাম তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। চারদিকের জীবনের বিচিত্র পরিচয় তাঁর কাব্যে বিধৃত। মুসলমান জীবনের বর্ণনা :

ফজর সময়ে উঠি বিছ্যায়া লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
সোলেমানি মালা ধরে জপে পীর পেগাম্বরে।
পীরের মোকামে দেই সাঁজ ॥
দশ বিশ বিরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুক্ষণ পড়য়ে কোরান।
কেহ বা বসিয়া হাটে পীরের শিরিনি বাঁটে
সাঁজে বাজে দগড় নিশান ॥
বড়ই দানিশ মন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কম্বুজ বেশ শিরে নাহি রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥
আপন টোপর নিঞা বসিলা গাঁয়ের মিঞা
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাত।
শেরানি নেহালি পানি কুড়ানি বিটুনি হুনি
পাঠান বসিল নানা জাত ॥
বসিল অনেক মিঞা আপন তরফ নিঞা
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়্যা নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়িয়া ॥

করে ধরে খুর ছুরি কুকুড়া জবাই করি
দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেই মাথা
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি ॥

এ ধরনের কৌতুককর বর্ণনা পাওয়া যায় পূজারী ব্রাহ্মণ সম্পর্কে। যেমন :

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখয়ে পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে
চাউলের পুটলি বাঁধে টান ॥
ময়রাঘরে পায় খণ্ড গোপঘরে দধি ভাণ্ড
তেলিঘরে তৈল কুপী ভরি।
কোথাহ্ মাসরা কুড়ি কেহ্ দেয় দালি বড়ি
গ্রামবাজী আনন্দে সাঁতরি ॥

এমনি অসংখ্য বাস্তব চিত্র মুকুন্দরামের কাব্যে লক্ষ করা যায়।

কবি মুকুন্দরাম দেবতা ও মানুষের কথা বলতে গিয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। দেবদেবীর মধ্যে মেনকা ও গৌরীর কলহ, শিবের ভিক্ষা, শিব-গৌরীর বিবাদ—এ সবের মধ্যে যেমন জীবন-রস-রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি পশুদের কাতর ক্রন্দনে, কালকেতুর জীবনযাত্রায়, ফুল্লরার প্রার্থনায়, কালকেতুর রাজ্যপত্তনে—সর্বত্র কবির বাস্তব-চিত্রাঙ্কণ প্রতিভার যথার্থ পরিচয় মিলে। তিনি দেবচরিত্রে মানবিকতা আরোপ করে সজীব ও স্বাভাবিক করে তুলেছেন। মানব চরিত্রগুলোও বাস্তবতার অনুসারী হয়ে উঠেছে। স্বল্প পরিসরে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিকশিত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্র। চরিত্রগুলোর কোনটাই একে অপরের প্রতিরূপ নয়। কবি সমাজ-জীবনের প্রেক্ষাপটে অঙ্কন করেছেন বলে চরিত্রগুলো কৃত্রিম হয়ে ওঠে নি। যুগ ধর্মকে অতিক্রম করার মত সাহস ও কুশলতা কবির মধ্যে বিরাজমান ছিল—চরিত্রচিত্রণই তার সাক্ষ্য। মুকুন্দরামকে ব্যক্তিগত সুখদুঃখ সাহিত্যের মাধ্যমে সর্বজনীন করে তোলার জন্য আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের অগ্রদূত বলা হয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা চিত্রিত করেছেন। মানবজীবন সম্পর্কে কবির সুগভীর ও সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার ব্যাপক পরিচয় এখানে বিদ্যমান। চরিত্র চিত্রণের ব্যাপারে কবি বিস্ময়কর সার্থকতার নিদর্শন রেখেছেন। একদিকে তাঁর হাতে যেমন স্বামীগতপ্রাণা বিড়ম্বিতা খুল্লনার চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে তেমনি অন্যদিকে ধূর্ত বণিক মুরারি শীল ও জুয়াচোর ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রও একান্ত বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। বুলান মণ্ডল, দুর্বলা দাসী প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে কবি বাঙালি-জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। বাস্তবতা, সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি, অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি—এ সব বৈশিষ্ট্য মুকুন্দরামের রচনায় ফুটে উঠেছে। কালকেতুর খাদ্য গ্রহণের বর্ণনা :

মোচারিয়া গোঁফ দুইটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে ॥

চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ।
ছয় হাঁড়ি মসুরী-সুপ মিশ্যা তথি লাউ ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
কচুর সহিত খায় করঞ্জ আমড়া ॥

*   *   *

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
গ্রাসগুলি তুলে যেন তে-আটিয়া তাল ॥

ধূর্ত বণিক মুরারি শীল কালকেতুর মূল্যবান আংটি ঠকিয়ে নেওয়ার যে পরিকল্পনা করেছিল তাতে তার চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে :

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু কর‍্যাছ উজ্জ্বল ॥

ধূর্তবেনের স্পষ্ট পরিচয় এতে ফুটে উঠেছে। মুরারি শীল যখন কালকেতুকে প্রতারণা করতে সক্ষম হল না, বরং কালকেতুর কাছে তার ধূর্ত রূপটি ধরা পড়ে গেল তখন মুরারি শীল হেসে বলল, ‘এতক্ষণ পরিহাস কৈলুঁ ভাইপোরে।’ মঙ্গলকাব্যের ধরাবাঁধা কাহিনির মধ্যে কবিমনের ব্যক্তিপ্রতিভা বিকাশের অবকাশ কম হলেও মুকুন্দরামের প্রবল সৃজনী প্রতিভা যে অনবদ্য অবদান রাখতে পারে মুরারি চরিত্র তার জীবন্ত নিদর্শন।

ভাঁড়ু দত্ত চণ্ডীমঙ্গলে এমনি একটি বিস্ময়কর চরিত্র। ড. সুকুমার সেনের মতে, ‘মুকুন্দরামের লেখনীতে ভাঁড়ু দত্ত অমরত্ব লাভ করিয়াছে। পুরানো বাংলা সাহিত্যে এমন উজ্জ্বল জীবন্ত পাষণ্ড চরিত্র আর নাই।’ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার তৎপরতা তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। তার কপট মনের পরিচয় তার কথায় :

খুড়া, তিন গোটা শর ছিল একখান বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস ॥
দৈববশে যদি আমি ছিলাম কাঙাল।
দেখিয়াছি, খুড়া হে, তোমার ঠাকুরাল ॥

তার কাজে, কথা বলার কৌশলে ও কূটবুদ্ধিতে সে অনন্য। স্বার্থহানি ঘটলেই তার স্বরূপ প্রকাশ পায়। ভাঁড়ু দত্ত ক্রোধের আতিশয্যে বলে :

হরিদত্তের বেটা হঙ জয় দত্তের নাতি।
হাটে যদি বেচাঙ বীরের ঘোড়া হাথি ॥
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনরপি হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা ॥

কালকেতুর সর্বনাশ সাধনে সে তৎপর। কিন্তু ধরা পড়লেই তার স্বরূপ বদলে যায়। মিথ্যার মুখোশ পরে ভাঁড়ু দত্ত নিজের স্বার্থসাধনে সচেতন থাকে। ভাঁড়ু দত্ত নিঃস্ব ও নীচাত্মা, শঠ ও ধূর্ত। কালকেতু একটি ধনু ও তিনটি শর নিয়ে বনে শিকার করত, পত্নী ফুল্লরা হাটে হাটে মাংস বিক্রি করত। কিন্তু দৈববলে সে বড় হল, আর ভাঁড়ু যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল—এ অসহ্য দুঃখ ভাঁড়ুকে ঈর্ষান্বিত করেছে। কবি অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে ভাঁড়ু দত্তের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

মুকুন্দরাম তাঁর বিচিত্র পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় অন্যত্রও দিয়েছেন। ধনপতি সদাগর দ্বিতীয় বিয়ের যুক্তি দেখিয়ে প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি প্রার্থনা করে :

রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে।
চিন্তামণি নাশ কৈল কাঁচের বদলে ॥
স্নান করি আসি শিরে না দেও চিরণী।
রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিন্ধে পানি ॥
মাসী পিসী মাতুলানী ভগিনী সতিনী।
কেহ নাহি রহে ঘরে হইয়া রান্ধনী ॥
যুক্তি যদি লয় মনে কহিবা প্রকাশি।
রন্ধনের তরে তব কর্য়া দিব দাসী ॥
বরিষা-বাদলেতে উনানে পাড় ফুক।
কর্পূর তাম্বুল বিনা রসহীন মুখ ॥

সতীনের ঘরে দাসদাসীরা শান্তি পছন্দ করে না। তাই গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করে :

যেই ঘরে দু-সতীনে না করে কন্দল।
সে ঘরে যে বসে চেড়ি সে বড় পাগল ॥
অনুক্ষণ দু-সতীনে করয়ে কন্দল।
তবে দাসদাসী পায় পরম মঙ্গল ॥

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনির মধ্যে কেন্দ্রীয় ঐক্য ছিল না। প্রচলিত কাহিনি মুকুন্দরাম অনুসরণ করেছেন মাত্র। কিন্তু কাব্যের অসংলগ্ন চিত্রগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে আকর্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে তা কেবল কবির বিস্ময়কর প্রতিভার জন্যই।

মুকুন্দরামের চরিত্রচিত্রণের বৈশিষ্ট্যের জন্যই ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, 'মুকুন্দরামকে আধুনিক বাংলার বস্তুতান্ত্রিক ঔপন্যাসিকদিগেরও অগ্রদূত বলা যায়।' মুকুন্দরাম থেকেই বাংলার কাব্যে বাঙালি জীবনের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের জীবনের ঘাত প্রতিঘাত তাঁর কাব্যে সজীব। বাঙালি-জীবনের চিত্রাঙ্কনে বাস্তবের অনুসরণে, দুঃখ বর্ণনায় আন্তরিকতার যে উৎকর্ষ কবি দেখিয়েছেন তা পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যের ধারায় বিশেষ প্রভাবের সৃষ্টি করে। কাহিনিকেন্দ্রিক রচনায় চরিত্রপ্রাধান্য আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ। মুকুন্দরাম প্রায় চার শ বছর আগে এ বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। চরিত্রাঙ্কনের সার্থকতা সম্পর্কে ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'কাব্য লিখিতে লিখিতে যখন অন্তর্দৃষ্টি নির্মল ও প্রতিভান্বিত হইয়াছে, তখন মুকুন্দরাম নিজে লেখনী ছাড়িয়া দিয়াছেন, চরিত্রগুলি হাস্যপরিহাস ও কথাবার্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তিনি ভণিতায় নিজের নাম সই করিয়া গ্রন্থস্বত্ত্ব স্থির করিয়াছেন।' এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'উনবিংশ শতাব্দের শেষ ভাগের আগে বাংলা ভাষায় যদি এমন কোন একটি গ্রন্থের নাম করিতে হয় যাহাতে আধুনিক কালের সাহিত্যবস্তুর— উপন্যাসের রস কিছু পরিমাণেও পাওয়া যাইতে পারে তবে সে বই কী তাহা সহৃদয় যিনি মানে বুঝিয়া মুকুন্দরামের রচনা পড়িয়াছেন তিনিই বুঝিবেন। নিপুণ পর্যবেক্ষণ, সহৃদয়তা, জীবনে আস্থা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যে সব গুণ ভাল উপন্যাস লেখকের রচনায় প্রত্যাশিত

সে সব গুণ, সেকালের পক্ষে যথোচিত পরিমাণে, মুকুন্দরামের কাব্যেই পাই।' এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেই ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মত প্রকাশ করেছেন, 'দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।'

দুঃখবর্ণনায় মুকুন্দরাম যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সে সম্পর্কে ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়। বড় বড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গুনদীর ন্যায় এক অন্তর্বাহী দুঃখ-সংগীতের মর্মস্পর্শী আর্তধ্বনি শুনা যায়। সুশীলার বারমাস্যা হইতে ফুল্লরার বারমাস্যা হৃদয়কে গভীরতর রূপে স্পর্শ করে। নিঃশব্দ করুণরস কাব্যখানিকে বিয়োগান্ত নাটকের গূঢ়-মহিমাপূর্ণ করিয়াছে—সুখবসন্তকাল বর্ণনায়ও কবির প্রেমগীতির মলয় বায়ু পরাভূত করিয়া উদর-চিন্তার আক্ষেপবাণী উঠিয়াছে। নানাবিধ দুঃখের কথা তাঁহার প্রতিভার চরণ নূপুর কাড়িয়া লইয়া যেন গতি মন্থর করিয়া দিয়াছে।'

ড. সাঈদ-উর-রহমান মন্তব্য করেছেন, 'মুকুন্দরামের গুণ তাঁর অকপট বাস্তবতাবোধে, তীক্ষ্ণ সমাজচেতনায়, সহজ রসিকতায়, সযত্ন বুনুনির রচনাশৈলীতে, বিশিষ্ট চরিত্রসৃজনে ও শব্দব্যবহারে দক্ষতায়। ষোল শতকের বাঙালি সমাজের বিভিন্ন দিক তাঁর রচনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। বোধ করি, তাঁর কল্পনাশক্তির দীনতা ছিল। সেজন্য তাঁর কল্পনা উচ্চাঙ্গের হয় নি, সে-ফাঁকটুকু তিনি ভরাট করেছেন সমাজের, পরিবারের ও ব্যক্তিচরিত্রের খুঁটিনাটি বর্ণনার দ্বারা। কালকেতু, মুরারী শীল ও ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রসমূহের স্বভাবসুলভ মনোভাব কবিকঙ্কণ দক্ষতার সাথে ফোটাতে পেরেছেন। কবির ব্যক্তিচরিত্রের প্রক্ষেপ তাতে পড়ে নি। কালকেতু স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা— ব্যাধসন্তান হিসাবে জীবন শুরু করে রাজার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল; কিন্তু তার চরিত্রে দেবত্ব নেই, রাজাসনে বসেও সে ব্যাধ-মানসিকতা পরিহার করে নি।

মুকুন্দরাম যে-কোন দৃশ্য বা চরিত্র জীবন্ত করতে পারতেন। কালকেতুর ভোজন, দেবীর সাথে ফুল্লরার বিবাদ, খুল্লনার সাথে লহনার কোন্দল, ধনপতি সদাগরের পায়রা ওড়ানো, মুরারী শীলের কাছে কালকেতুর অঙ্গুরি-বিক্রয়, ভাঁড়ু দত্তের বাজার করার ও অপমানিত হওয়ার দৃশ্যগুলো পাঠকের মনে থাকবে। দৃশ্যগুলো জীবন্ত করার একটি উপায় তিনি বের করেছেন নির্মল হাস্যরস সৃজন করে।'

ভাষার ওপর দক্ষতা সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, 'মুকুন্দরাম সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন। ফারসি ভাষায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। আশোয়ার (অশ্বারোহী), আখন (শিক্ষক), ইনাম, গরসাল (ধর্মান্তর হয়ে মুসলমান), নিসান নজদিগ, বেগর, মিরাস (নিবাস), মুনশিব (কাজ দেবার কর্তা), সফর (ভ্রমণ) প্রভৃতি দেড়শোর মতো আরবি-ফারসি শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। যথোপযুক্ত অর্থে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারেও তাঁর দক্ষতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের আগে এমন দক্ষতায় আমাদের ভাষা আর কোন লেখক বিশুদ্ধ সাহিত্যরচনায় ব্যবহার করেন নাই।'

কবি মুকুন্দরাম প্রচলিত কাব্যাদর্শের মধ্যে প্রথম এক সদাজাগ্রত শিল্পবোধ ও চারুত্ব সৃষ্টির প্রবর্তন করলেন। 'অতি পল্লবিত, অহেতুক বিস্তারের স্থলে অর্থঘন

সংক্ষিপ্তি, অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ ও ভক্তিবিহ্বলার অস্বচ্ছতার স্থলে মিতভাষিতা ও তীক্ষ্ণ ভাস্বরতা, নির্বিচার প্রথানুবর্তনের স্থলে বাস্তব স্বীকৃতির প্রখর মৌলিকতা, অর্ধ-যান্ত্রিক পূর্ব-রোমন্থনের স্থলে নতুন অনুভূতির দীপ্ত ঝলক'—এ সবই কবি মুকুন্দরামের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতে তাঁর অধিকার ছিল, বিশেষ জ্ঞান ছিল ফারসি ভাষায়। বাংলা শব্দাবলির বিচিত্র ও প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যবহারে তাঁর দক্ষতা তুলনাহীন। তিনি ভক্ত ও বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু দৃষ্টি ছিল ইহলোকে নিবদ্ধ। তাঁর শিল্পবোধ ছিল সংযত ও নিপুণ।

শব্দসংগ্রহে, শব্দযোজনায় ও অলঙ্কারের নিপুণ পরিবেশনে মুকুন্দরামের রচনা সর্বত্রই সমৃদ্ধ। পল্লীসাহিত্যের মাধুর্য যেমন তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে তেমনি সংস্কৃত শব্দের প্রতিও কবি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। পল্লীভাষার সহজস্বরূপ ও পল্লী-উৎপ্রেক্ষা তাঁর কাব্যে অনবদ্যভাবে প্রকাশমান। কাব্যের এই সব গতানুগতিকতারহিত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁকে প্রাচীন ও নতুন যুগের সন্ধিস্থলের কবি বলে মনে করা চলে।

পরবর্তী কবিগণ

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের পরবর্তী কবিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বাক্ষর প্রদর্শন কারও পক্ষেই তেমন সম্ভবপর হয় নি। কবি মুকুন্দরামের বিস্ময়কর প্রতিভা ও ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে কাব্যে নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস সফল হতে পারে নি। তাই পরবর্তী কবিগণ অনুকরণই করেছেন, প্রতিভা দেখাতে পারেন নি।

দ্বিজ রামদেব

দ্বিজ রামদেব চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্য অবলম্বনে 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যটি ১৬৫৩ সালে রচিত। কবি দ্বিজ রামদেব দ্বিজ মাধবকে অনুসরণ করে এ কাব্য লিখেছিলেন। ফলে তাঁর রচনায় বিশেষ কোন মৌলিকতা নেই। তাঁর কাব্যে রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে রচিত শতাধিক পদ আছে—যা ঘটনাবিশেষের প্রারম্ভে স্থান পেয়েছে।

মুক্তারাম সেন

চণ্ডীমঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবি মুক্তারাম সেন। চট্টগ্রাম জেলায় দেবগ্রাম বা বর্তমান আনোয়ারা গ্রামে কবির জন্ম। তাঁর কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল'। ১৭৭৪ সালে কবির গ্রন্থরচনা সম্পন্ন হয়। কাব্যে কবি মুক্তারামের বিস্তৃত আত্মপরিচয় আছে। কাব্যটি ক্ষুদ্রকায়। তাঁর কাব্যে ভাষা সরল, পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা তাতে নেই। কাব্যের কাহিনি সংক্ষিপ্ত ভাবে রচিত। কালকেতুর বিরুদ্ধে পশুদের অভিযোগ :

এই মত কথ কাল যদি নির্বাহিল।
পশুগণ দুর্গাস্থানে কান্দিয়া কহিল ॥
তিষ্ঠিতে না পারি বনে কালকেতুর শরে।
পুত্র দারা এক্ষ স্থানে রহিতে নারি ঘরে ॥
বোলে তাহে মহামাএ না কর ক্রন্দন।
তোর হেতু কালকেতু লভিবেক ধন ॥

সুখমনে পশুগণে যাও নিজালয়ে।
তার ঠাঁই আমি যাই না করিয় ভয় ॥
তদন্তরে নারায়ণী গোধিকা হইলা।
অরণ্যের পন্থমুখে আগুছি রহিলা ॥

হরিরাম

সতের শতকের শেষ ভাগে কবি হরিরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কাব্যটিতে মুকুন্দরামের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। কবি এ কাব্যে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে না পারলেও ভাষার পারিপাট্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

লালা জয়নারায়ণ সেন

মুন্সীগঞ্জ জেলায় বিক্রমপুরের জপসা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন জয়নারায়ণ সেন। তিনিও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি ১৭৭২ সালে রচিত কবির অপর কাব্য হরিলীলার পূর্বে রচিত। তাঁর কাব্যে সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব আছে। কবি মাধব-সুলোচনার উপাখ্যান যুক্ত করে কাব্যে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। ভাষার পারিপাট্য ও লাবণ্য তাঁর কাব্যের বিশেষত্ব। জয়নারায়ণ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর এই পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে তাঁর কাব্যে। তাঁর চরিত্রসৃষ্টি কৃত্রিম ও নিতান্তই গতানুগতিক—কোথাও সজীব হয়ে ওঠে নি।

ভবানীশঙ্কর দাস

ভবানীশঙ্কর দাস ১৭৭৯ সালে মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা রচনা করেন। জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত নামেও তাঁর কাব্য পরিচিত। কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সুবৃহৎ আকারের এ কাব্য সংস্কৃত শব্দ, উপমা ও অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত। এতে কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্য বেশি ছিল।

অকিঞ্চন চক্রবর্তী

অকিঞ্চন চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলের সর্বশেষ কবি। মেদিনীপুরের ঘটাল মহকুমার বেঙ্গারাল গ্রামে কবির নিবাস ছিল। কবির উপাধি ছিল কবীন্দ্র। সম্ভবত আঠার শতকের শেষ ভাগে কাব্যটি রচিত হয়।

কবির ভণিতা ছিল এরকম :

চণ্ডীকার চরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ।
রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন ॥
আজ্ঞা পায়্যা অপাঙ্গিনী আরম্ভে রঞ্জন।
রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন ॥

এ সময় থেকে বাংলার সংস্কৃতি নাগরিক জীবনকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং তাতে নতুনতর অভিব্যক্তি দেখা দেয়। ফলে চণ্ডীমঙ্গলের মৌলিক ধারার অবসান ঘটে।

ধর্মমঙ্গল

ধর্মঠাকুর নামে কোন এক পুরুষ দেবতার পূজা হিন্দু সমাজের নিচু স্তরের লোকদের মধ্যে বিশেষত ডোম সমাজে প্রচলিত রয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, ধর্মঠাকুর হলেন বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রচ্ছন্ন রূপ। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা তাঁকে বৌদ্ধ দেবতা না বলে সুদূর বৈদিক যুগের দেবতা রূপে বিবেচনা করেন। রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুর এখনও জাগ্রত দেবতা, এখনও মহাসমারোহে তাঁর পূজা হয়ে থাকে। ধর্মঠাকুরকে কখনও বিষ্ণু, কখনও শিব, কখনও বুদ্ধরূপে প্রচার করা হলেও তিনি অনার্য দেবতা এবং অনার্য ডোমদের দ্বারাই পূজিত। তবে ধর্মঠাকুর আর্যসমাজে গৃহীত হলেও মনসা-চণ্ডীর মত মর্যাদা পান নি। শূকর, ছাগল, সাদা মোরগ, পায়রা, মদ ইত্যাদি ধর্মঠাকুরের পূজার উপকরণ। ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি নেই। কূর্মাকৃতি একখণ্ড শিলাই ধর্মঠাকুর। ডোম পুরোহিত পূজার কাজ সম্পাদন করেন। অস্ট্রিক ভাষায় কূর্মের প্রতিশব্দ 'দড়ম' থেকে 'ধর্ম' কথাটি তৈরি হয়েছে। ধর্মঠাকুর গ্রামদেবতা, মাঠেই তাঁর আস্তানা। স্থানভেদে তাঁর নামও বৈচিত্র্যময়—বাঁকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, কালু রায়, বুড়া রায় ইত্যাদি। এই ধর্মঠাকুর প্রধানত দাতা, নিঃসন্তান নারীকে সন্তান দান করেন, অনাবৃষ্টি হলে ফসল দেন, কুষ্ঠরোগীকে রোগ থেকে মুক্ত করেন। ধর্মঠাকুর ক্রুদ্ধ হলে কুষ্ঠ হয়। তিনি নিরাকার হলেও সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ বা ফকিরের বেশ ধারণ করেন। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধারার সূত্রপাত হয়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের দুটি কাহিনি—১. রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি এবং ২. লাউসেনের কাহিনি। এর মধ্যে লাউসেনের কাহিনিই কাব্যে অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি

রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর রানী মদনা নিঃসন্তান ছিলেন বলে লজ্জায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছিলেন না। মনের দুঃখে তাঁরা ঘুরতে ঘুরতে বল্লুকা নদীর তীরে এসে দেখলেন সেখানে ভক্তেরা ধর্মের পূজা করছে। রাজারানীও ধর্মের পূজা করে তাঁর কাছে পুত্রবর প্রার্থনা করলেন। ধর্ম তাঁদের পুত্রলাভের বর দিলেন। পুত্রটিকে যথা সময়ে ধর্মের কাছে বলি দিতে হবে। রাজা পুত্রের মুখ দেখার আশায় তাতেই রাজি হলেন। পুত্র জন্মালে তার নাম রাখা হল লুইচন্দ্র বা লুইধর। একসময় রাজারানী প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলেন। একদিন ব্রাহ্মণের বেশে ধর্মঠাকুর উপস্থিত হয়ে রাজপুত্রের মাংস ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা জানালেন। রাজারানী প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে পুত্রের দেহ কেটে রান্না করলেন। এতে ধর্মঠাকুর সন্তুষ্ট হয়ে নিজ মূর্তি ধারণ করে রাজপুত্রকে ফিরিয়ে দিলেন। রাজা মহাসমারোহে ধর্মের পূজা করলেন।

লাউসেনের কাহিনি

গৌড়েশ্বরের একজন সামন্ত—নাম কর্ণসেন। ইছাই ঘোষ নামে জনৈক সামন্তের আক্রমণে কর্ণসেনের ছয় পুত্র মারা যায়। বৃদ্ধ বয়সে সকল পুত্রের মৃত্যুতে তিনি ভেঙে পড়েন। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে সংসারে আবদ্ধ রাখার জন্য নিজের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর

সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহামদ তা পছন্দ করে নি। সে বৃদ্ধ ভগ্নিপতি কর্ণসেনকে আঁটকুড়ে বলে উপহাস করে। রঞ্জাবতী এ গ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধর্মঠাকুরের কাছে পুত্রবর চেয়ে কঠোর ব্রত পালন করে। ধর্মের আশীর্বাদে এক পুত্র হল। তার নাম লাউসেন। মহামদ এ সংবাদে রাগান্বিত হয়ে ভাগ্নেকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু ধর্মঠাকুরের দয়ায় সে প্রতিবারই বেঁচে যায়। যুবক লাউসেনের বীরত্বের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহামদের কুপরামর্শে গৌড়েশ্বর তাকে নানা দুরূহ কাজে নিয়োজিত করেন। ধর্মের আশীর্বাদে সকল কাজেই সে সাফল্য অর্জন করতে থাকে। লাউসেন প্রতিবেশী রাজাদের পরাজিত করে তাঁদের মেয়েকে বিয়ে করে। এক সময় লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ তার রাজ্য আক্রমণ করে, কিন্তু সে লাউসেনের স্ত্রীর কাছে পরাজিত হয়। মহামদ গৌড়েশ্বরকে প্ররোচিত করাতে পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় করানোর জন্য লাউসেন গৌড়েশ্বর কর্তৃক নির্দেশিত হল। ধর্মের দয়ায় লাউসেন তাতেও সাফল্য অর্জন করল। ফলে চারদিকে তার গৌরবের কথা ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে দুষ্কর্মের শাস্তিস্বরূপ মহামদের কুষ্ঠ ব্যাধি হয়। লাউসেনের অনুরোধে ধর্মঠাকুর তাকে কুষ্ঠ থেকে আরোগ্য করে দিল। এ ভাবে ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচারিত হয়। লাউসেনও সুখে রাজত্ব করে যথাসময়ে স্বর্গে চলে গেল।

ধর্মমঙ্গলের প্রথম অংশ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি খুবই পুরাতন, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ লাউসেনের কাহিনি অর্বাচীন। প্রথম কাহিনিটি পৌরাণিক ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অপর কাহিনিটির সঙ্গে ইতিহাস ও লৌকিক আখ্যান জড়িত হয়েছে। তবে ইতিহাসের কালের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। লাউসেনের কাহিনিই যথার্থ ধর্মমঙ্গল নামে পরিচিত।

ধর্মমঙ্গলের কবিগণ

প্রায় বিশ জন কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সতের শতকের পূর্বে রচিত কাব্যের নিশ্চিত প্রমাণ নেই, আঠার শতকের রচনাই সর্বাধিক, উনিশ শতকেও দু-একটি কাব্য রচিত হয়েছে। ড. সুকুমার সেন ধর্মমঙ্গল কাব্যকে 'উপকথা' বা 'কেরামতি কাহিনি' বলে উল্লেখ করেছেন, আবার বলেছেন, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা ধর্মমঙ্গল।' আর কেউ একে 'প্রাচীন বঙ্গের কিশোরধর্মী সাহিত্য' বলেছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধ ও অসমসাহসিকতার কাহিনির বর্ণনা থাকলেও তা বীররসাত্মক কাব্য হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া এই কাব্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দেবদেবীদের লড়াই উগ্র হয়ে ওঠে মানবিকতার আবেদন বিসর্জন দিয়েছে। এতে চলমান জীবনের পরিচিত উপাদানও স্থান পায় নি। ধর্মমঙ্গল কাহিনি, উপস্থাপনা ও পরিকল্পনায় আদিমতার ছাপ বিদ্যমান।

ময়ূরভট্ট

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ূরভট্ট। তাঁর কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি। আদিকবি হিসেবে তিনি পরবর্তীকালের কয়েকজন কবির রচনায় উল্লেখিত হয়েছেন। যেমন কবি গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ধর্মমঙ্গলে লিখেছেন :

আছিল ময়ূর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছন্দে অনাদ্যের গীত ॥
ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-শতদল।
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মঙ্গল ॥

তিনি সতের শতকের লোক ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

আদি রূপরাম

ধর্মমঙ্গলের পরবর্তী কবি রূপরাম। তিনি তাঁর পরবর্তী কবি মাণিক গাঙ্গুলী কর্তৃক আদি রূপরাম নামে উল্লেখিত হয়েছেন। তাঁর কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি।

খেলারাম চক্রবর্তী

খেলারাম চক্রবর্তীর কোন কাব্য আবিষ্কৃত না হলেও এমন কিছু পদ পাওয়া গেছে যা থেকে তাঁর অস্তিত্বের কথা কেউ কেউ কল্পনা করেন। তিনি গ্রন্থরচনার সময়জ্ঞাপক যে পদ উল্লেখ করেছেন তাতে ১৫২৭ সাল পাওয়া যায়। খেলারাম ধর্মমঙ্গলের কাহিনি নিয়ে 'গৌড়কাব্য' নামে একটি পুঁথি রচনা করেছিলেন।

মাণিকরাম

মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে কাব্যের রচনাকাল ১৫৬৯ সাল। কবির জন্মস্থান বর্ধমান জেলার বেলডিহা গ্রাম। ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কাব্যের মত মাণিকরাম চব্বিশ পাতায় তাঁর কাব্য সমাপ্ত করেছেন। তিনি সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। বীররসাত্মক কাব্য ধর্মমঙ্গল রচনায় কবি ওজস্বিনী ভাষা ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত আদর্শে কবি অলঙ্কার প্রয়োগে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

রূপরাম চক্রবর্তী

মাণিকরামের সমসাময়িক এই কবি ধর্মমঙ্গলের ধারায় দ্বিতীয় রূপরাম। তাঁর গ্রন্থরচনার কাল ১৫৯০ সাল। কবির জন্মস্থান বর্ধমান জেলার রায়না থানার শ্রীরামপুর গ্রাম। কাব্যের মধ্যে কবি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে কাব্যটি সরল ও সাবলীল ভাষায় লিখিত। রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যই সন-তারিখযুক্ত প্রাচীনতম ধর্মমঙ্গল কাব্য। কবি তাঁর কাব্যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দান করেছেন। কাব্য রচনার জন্য ধর্মঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে আদেশ করেছেন :

আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।
বার দিনের গীত গাও শোন রূপরাম।

ধর্মঠাকুরের পূজার অপরাধে রূপরাম চক্রবর্তী সমাজে পতিত হয়েছিলেন। ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'পুরানো বাংলা সাহিত্যে যদি আধুনিক ছোটগল্পের মত কোন জীবন-রস নিটোল রচনা থাকে, তবে তাহা রূপরামের এই আত্মকাহিনি।'

শ্যাম পণ্ডিত

ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি শ্যাম পণ্ডিতের কাব্য বীরভূম অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। সম্ভবত কবি এ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। কাব্যে তাঁর আত্মপরিচয় পাওয়া যায় নি। প্রাপ্ত পুঁথির লিপির তারিখ ১৭০৩ সাল। এতে মনে হয় কবি এর আগেই কাব্য রচনা করেছিলেন। জনশ্রুতি অবলম্বনে কবি কাব্য রচনা করেন এবং তাতে কতিপয় নামের পরিবর্তন করেন। কবি তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন নিরঞ্জন-মঙ্গল।

সীতারাম দাস

সীতারামের ধর্মমঙ্গলের রচনাকাল ১০০৪ সন বলে উল্লেখিত হয়েছে। একে বঙ্গাব্দ ধরলে ১৫৯৭ সাল এবং মল্লাব্দ ধরলে ১৬৮৯ সাল হয়। তবে কবি কত সালে এ কাব্য রচনা করেছিলেন তা সঠিক বলা চলে না। সীতারাম তাঁর গৃহদেবতা গজলক্ষ্মীর কৃপায় বনমধ্যে সন্ন্যাসীবেশী ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ পান। তিনি আদেশ করেন :

প্রভু বলে নিরঞ্জন নৈরাকার আমি।
আমার মঙ্গলগীত কর গিয়া তুমি ॥

কবির জন্ম বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে। সীতারামের রচনা সরল, অলঙ্কারহীন এবং কবিত্ববর্জিত।

রাজারাম দাস

১৭০০ সালে এই কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কবি চব্বিশ পরগনা জেলার শিখরবালি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর কাব্যের হরিশ্চন্দ্র পালাটি পাওয়া গেছে।

রামদাস আদক

'অনাদি-মঙ্গল' নামক কাব্যের রচয়িতা রামদাস আদক জাতিতে ছিলেন কৈবর্ত। হুগলি জেলায় তাঁর বাসস্থান। কবি সতের শতকের প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। ১৬৬২ সালে তাঁর কাব্য প্রথম গীত হয়। কবি দৈবনির্দেশে কাব্য রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখিত হয়েছে। ব্রাহ্মণবেশী ধর্মঠাকুর আবির্ভূত হয়ে কাব্য রচনার জন্য আদেশ দিলেন :

আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি।
জাড়গ্রামে কালু রায় ধর্ম হই আমি।

তাঁর ভাব ও ভাষায় পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর ছিল না।

দ্বিজ প্রভুরাম

এ কবির তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। তাঁর পুঁথি ১৬৬৬ সালে অনুলিখিত হয়েছিল বলে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন।

ঘনরাম চক্রবর্তী

ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গলের ধারায় আঠার শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১৭১২ সালে তাঁর কাব্য সমাপ্ত হয়। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির জন্ম। কবি বর্ধমানের অধিপতি কীর্তিচন্দ্রের প্রশংসা করেছেন। কবিরত্ন ঘনরাম চক্রবর্তী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্যে যথার্থ রসসঞ্চার করে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলেন। তাঁর

প্রতিভার স্পর্শেই ধর্মমঙ্গল গ্রাম্যতামুক্ত হয় এবং নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে শ্রদ্ধার আসন লাভ করে। কবি ভারতচন্দ্র ঘনরামের কাব্য থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করেছেন।

কবি ঘনরাম চক্রবর্তী প্রথম ও প্রধান কবি যিনি পৌরাণিক পাণ্ডিত্যের আভিজাত্য ও বর্ণহিন্দুর শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য সহযোগে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তিনি গ্রাম্য লোককথাকে শ্রদ্ধাযোগ্য কাব্যরূপ দান করেছেন। তাঁর সংস্কৃত পাণ্ডিত্য রসোজ্জ্বলতা সৃষ্টি করেছে। সেই সঙ্গে অলঙ্কার শাস্ত্রে দুর্লভ অধিকার প্রভাবে আশ্চর্য বাগবৈদগ্ধ্য সৃষ্টি করেছেন।

কবি নানা পুরাণ-উপপুরাণ ও কাব্যকাহিনি থেকে গল্প উপমা সংগ্রহ করে তাঁর কাব্যের আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন। ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেনের কাহিনিই তাঁর কাব্যের উপজীব্য। বাস্তব অভিজ্ঞতা, সাংসারিক জ্ঞান, মানব চরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে কবির বিশেষ কৌতূহল ছিল বলে তাঁর কাব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। মৃদু হাস্যকৌতুক, করুণরস ও বীররসের বর্ণনায় ঘনরাম চক্রবর্তী সমসাময়িক কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন। ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'ঘনরামের রচনার বিশেষ গুণ প্রসন্নতা ও ভদ্ররুচি। তবে অষ্টাদশ শতাব্দের কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ, অনুপ্রাসের ঘটা, তাঁহার রচনায় বেশ দেখা যায়।' অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনিতে তাঁর কাব্য পরিপূর্ণ। বহু বাংলা প্রবচন ঘনরামের কাব্যে স্থান পেয়েছে, আবার প্রবচন জাতীয় বহু পদ তিনি নিজেও রচনা করেছেন। যেমন :

১. রোগ-ঋণ-রিপু-শেষ দুঃখ দেয় রয়ে।
২. হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাহি খুঁজি।
৩. না করে মিথ্যাকে ভয় বিশেষে ঘটক।
৪. বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তায়।
৫. কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব।

আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যবহার তাঁর ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 'শাস্ত্রজ্ঞানের পুঞ্জীভূত ধূম্রপটল কবির প্রতিভাকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে স্বানুভূত জ্ঞানের কথা তিনি একটিও বলিবার অবকাশ পান নাই।...ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল এত বিরাট ও এত একঘেঁয়ে যে সমস্ত কাব্য যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাঁহার ধৈর্যের বিশেষ প্রশংসা করা উচিত হইবে।' কবি রচনাকাল নির্দেশ করে এভাবে কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন :

সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন ॥
শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশ হংস ভার্গব বাসর ॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্যা দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি ॥

এতে দেখা যায় কাব্যটি ১৬৩৩ শকে অর্থাৎ ১৭১১ সালে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে সমাপ্ত হয়। ঘনরাম চক্রবর্তী 'সত্যনারায়ণ-রসসিন্ধু' নামে একটি ছোট আকারের সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করেছিলেন।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া জেলার চামট গ্রামের এই কবি ১৭৩২ সালে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। মল্লভূমের তৎকালীন রাজা গোপাল সিংহের নাম তাঁর কাব্যে উল্লেখিত হয়েছে। রামচন্দ্রের রচনা বৈশিষ্ট্যবর্জিত। খুব সাধারণভাবে কবি তাঁর কাহিনি বর্ণনা করেছেন। তবে দীর্ঘ কাহিনি কোথাও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে নি বলে পাঠকের কাছে সমাদর পাওয়ার যোগ্যতা বিদ্যমান। তাঁর কবিত্বের অভাব ছিল, কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না।

সহদেব চক্রবর্তী

কবি হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৩৫ সালে ধর্মঠাকুরের স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবি কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। কবি সহদেব চক্রবর্তী তাঁর কাব্যরচনার কাল সম্পর্কে বলেছেন :

দ্বিজ সহদেব গায় পূর্ব তপ কাল।
যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে ॥
চৈত্রের চতুর্থ দিন পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যারে দয়া কৈল যুগপতি ॥

কতগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কাব্যটি সামগ্রিকতা লাভ করতে পারে নি। কাব্য হিসেবে সহদেব চক্রবর্তীর গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য নেই। তাঁর কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যের নাম 'অনিল পুরাণ'। এতে লাউসেনের কাহিনি স্থান পায় নি, নাথসাহিত্যের সিদ্ধাচার্যদের কথা এতে বলা হয়েছে। তাঁর ভাষা সুমার্জিত না হলেও স্থানে স্থানে সরল ও মর্মস্পর্শী।

নরসিংহ বসু

বর্ধমানের শাঁখারি গ্রামে কবি বাস করতেন। কবি বীরভূম রাজনগরের রাজা আসফুল্লাহ্ খানের দরবারে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত, ফারসি, হিন্দি ও উড়িয়া ভাষায় তাঁর দখল ছিল। জনৈক সন্ন্যাসীর নির্দেশে কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নেই এবং ভাষা মার্জিত। ১৭৩৭ সালে নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল রচনা শুরু হয়েছিল বলে কবি উল্লেখ করেছেন।

হৃদয়রাম সাউ

১৭৪৯ সালে হৃদয়রাম সাউ তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। বর্ধমানের খুরুল গ্রামে কবির জন্মস্থান হলেও কবি প্রসিদ্ধ নানুরের দক্ষিণে উচকরণ গ্রামে বসবাস করেন। তাঁর কাব্যে মুকুন্দরামের প্রভাব অত্যধিক। কাব্যের ভাষা সংস্কৃতবহুল ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবি হলেন গোবিন্দদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ, শঙ্কর চক্রবর্তী, রামকান্ত রায়, ধর্মদাস বৈদ্য, বিশ্বনাথ দাস। তাছাড়া আরও কতিপয় কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের ধারায় মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল তা অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে পরিলক্ষিত হয় না। কাহিনি পরিকল্পনা ও কবিত্বসৃষ্টির দিক থেকে অন্য মঙ্গলকাব্যে কোন বৈচিত্র্য নেই। বিশেষত মঙ্গলকাব্যের ধর্মীয় আবেদনের বাইরে সাহিত্যিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় অপরাপর মঙ্গলকাব্যে প্রায় নেই বললেই চলে। এগুলো পূর্ববর্তী কাব্যগুলোর ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র। এদের কোথাও দেবতাই প্রাধান্য পেয়েছে, কোন কাহিনির আকর্ষণ নেই; আবার কোথাও কাহিনি বর্ণনাই মুখ্য, দেবতার কোন স্থান নেই। মধ্যযুগের শেষদিকে দেবদেবীর প্রতি সমাজের ভক্তি ও বিশ্বাস শিথিল হয়ে আসে। ফলে ক্রমান্বয়ে মঙ্গলকাব্যের আবেদন কমে যায়। এ পর্যায়ের মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল, তীর্থমঙ্গল ইত্যাদি।

শিবায়ন

শিব প্রাগবৈদিক দেবতা হলেও হিন্দু সমাজে তাঁর ব্যাপক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। লৌকিক দেবতা হিসেবেও তাঁর বিবর্তন ঘটে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথধর্ম ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন লৌকিক ধর্মের উপাদানের ওপর ভিত্তি করে শিবের এক নতুন রূপ পরিকল্পিত হয়েছিল। তাই পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান মিশ্রিত হয়ে শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্য রচিত হয়।

সকল মঙ্গলকাব্যেই শিবের নিজস্ব ভূমিকা বিদ্যমান। দেবতা হিসেবে শিবের গুরুত্ব বিবেচনা করে কবিরা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে শিবের স্থান করে দিয়েছেন। শিবায়ন কাব্য হিসেবেও বিশিষ্ট এ কারণে যে, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীরা নিজে আড়ালে থেকে মানব মানবীকে নায়ক-নায়িকা করে মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শিবায়ন কাব্যে এ বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম দেখা যায়। শিবায়ন কাব্যে স্বয়ং শিবই কাব্যের নায়ক। মঙ্গলকাব্যের ধারার সঙ্গে শিবায়নের কাহিনির মিল না থাকায় একে মঙ্গলকাব্য বলতে দ্বিধান্বিত। তবে একে মঙ্গলকাব্য হিসেবে বিবেচনা করলে এটি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।

শিবায়নের কাহিনিতে দেখা যায়, যজ্ঞের সময় দক্ষ কর্তৃক জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ না করায় শিবপত্নী সতী বিনা নিমন্ত্রণেই পিতৃগৃহে উপস্থিত হন। সেখানে স্বামীনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। শিব সংবাদ পেয়ে অনুচরদের দ্বারা যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে ফেলেন। পরে সতী হিমালয়ের ঘরে গৌরীরূপে জন্মে ভিক্ষুক শিবকে পতিরূপে লাভ করেন। দারিদ্র্য দূর করার জন্য শিব চাষ করা শুরু করলেন। মর্ত্যলোকে চাষ নিয়ে শিব এত মগ্ন হলেন যে কৈলাসে ফিরে আসার কথা তাঁর আর মনে রইল না। মর্ত্যে শিব কুচনী সঙ্গিনী জুটিয়ে নিয়েছেন। গৌরী তাঁকে কৈলাসে নিয়ে আসার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে গৌরী বাগ্দিনীর রূপ ধরে শিবকে প্রেমাসক্ত করে নানা কৌশলে কৈলাসে নিয়ে যান। গৌরী তার কাছে আত্মসমর্পণ না করে শিবের ব্যভিচারের কথা নারদকে জানালেন। শেষ পর্যন্ত নারদের পরামর্শে শাঁখারি সেজে গৌরীকে শিব শাঁখা পরিয়ে বশীভূত করলেন।

শিবায়নের কবিগণ

রামকৃষ্ণ রায়

সতের শতকের পূর্বে কোন শিবমঙ্গল রচিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সতের শতকের মাঝামাঝি সময়ে রামকৃষ্ণ রায় পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান অবলম্বনে সুবৃহৎ শিবমঙ্গলকাব্য রচনা করেন। কবি কাব্যের 'শিবায়ন' বা 'শিবের মঙ্গল' নাম ব্যবহার করেছেন। সম্ভবত ১৬২৫ সালের দিকে এ কাব্য রচিত হয়। কবির ভাষা ছিল মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের ভাষা।

শঙ্কর কবিচন্দ্র

শঙ্কর কবিচন্দ্র আনুমানিক ১৬৮০ সালে শিবমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তিনি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলের কবি। তিনি ছিলেন লৌকিক ধারার অনুসারী। সহজ সরল ভাষায় কবি কাব্য রচনা করেছেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

রামেশ্বর ভট্টাচার্য আঠার শতকের প্রথম ভাগে 'শিবায়ন' বা 'শিব-সংকীর্তন' নামে কাব্য রচনা করেছিলেন। এটি সর্বাধিক জনপ্রিয় শিবমঙ্গল কাব্য। কবি মেদিনীপুরের যদুপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর কাব্যে সে পরিচয় বিদ্যমান। কাহিনিবর্ণনায় সংস্কৃতের অনুবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তব চিত্রাঙ্কনে কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শিবায়নের অন্যান্য কবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজ মণিরাম, বিনয়লক্ষ্মণ প্রমুখ।

মৃগলুব্ধ কাব্য

চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিবমাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য 'মৃগলুব্ধ' রচিত হয়েছিল। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এ কাব্যের তিন জন কবির সন্ধান পেয়েছেন। তন্মধ্যে দু জনের নাম জানা গেছে—একজন রামরাজা ও অন্যজন রতিদেব। সংস্কৃত পুরাণ থেকে কাহিনি নিয়ে মঙ্গলকাব্যের আদর্শে এ কাব্য রচিত। কাব্যের কাহিনিতে মৃগ ও লুব্ধকের কথা আছে বলে এর নাম হয়েছে মৃগলুব্ধ। গল্পটি এক মৃগলুব্ধ অর্থাৎ ব্যাধের কাহিনি। ব্যাধ শিবের কৃপায় কীভাবে শাপমুক্ত হল এবং কীভাবে রাজা মুচুকুন্দ ও তাঁর রানী শিবচতুর্দশীর ব্রত উপলক্ষে শিবমাহাত্ম্য শুনে সশরীরে স্বর্গে গেলেন—সে কাহিনিই এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। গল্পটি এ রকম : রাজা মুচুকুন্দ শিব-চতুর্দশীর উপবাস-পূজা শেষ করে রানী রুক্মিনীর কাছে ব্রতকথা শুনছিলেন। রানী বলেছিলেন, বিদ্যাধর চিত্রসেন একদিন ইন্দ্রের সভায় নাচের সময় হরিণ শিকারের দৃশ্য দেখে তাল ভঙ্গ করেন। রেগে গিয়ে ইন্দ্র তাকে নরলোকে ব্যাধজীবন যাপনের অভিশাপ দেন। তাকে বলা হয়, ভদ্রসেন মৃগের সাক্ষাৎ লাভ করলে চিত্রসেনের শাপমুক্তি ঘটবে। চিত্রসেন ব্যাধ রূপে সারাদিন হরিণের খোঁজে ব্যর্থ, শ্রান্ত ও উপবাস ক্লিষ্ট হয়ে রাত কাটাবার জন্য এক বেল গাছে আশ্রয় নেয়। ঘুমের ঘোরে গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার ভয়ে জেগে থাকার জন্য

চিত্রসেন বেল পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচে ফেলছিল। গাছের পাদমূলে ছিল শিবলিঙ্গ। একটি বেল পাতা শিবলিঙ্গের ওপর পড়লে শিব খুশি হয়ে ব্যাধকে বর দিতে আসেন। চিত্রসেন মৃগয়ার সাফল্যের বর পেল। ভদ্রসেন মৃগ চিত্রসেন ব্যাধের জালে আবদ্ধ হল। মৃগী কিছুতেই তার স্বামীকে ফেলে যাবে না, নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও স্বামী উদ্ধারে সে কৃতসংকল্প। চিত্রসেনকে মৃগী বলল যে জীবহত্যাসম পাপ নেই, কেবল শিবরাত্রির ব্রতে সে পাপ মোচন হতে পারে—এসব কথা বলে মৃগী তাকে ধর্মোপদেশ দিল। মৃগীর কথায় চিত্রসেনের জ্ঞানোদয় হল এবং সে মৃগ-মৃগীকে ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে শিব মন্দিরে প্রার্থনা করে অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়। ভদ্রসেন মৃগও শাপমুক্ত হয়ে সপত্নীক শিবলোক প্রাপ্ত হল। রুক্মিনীর এই কাহিনি শুনে মুচুকুন্দ শিবব্রতের রাত্রি পালন করলেন এবং শিবপূজা করে শিবলোক প্রাপ্ত হন।

মৃগলুব্ধ কাব্যের যে দুজন কবির পরিচয় পাওয়া গেছে তার মধ্যে প্রথম হলেন রামরাজা। তাঁর কাব্যের নাম 'মৃগলুব্ধ'। কবির জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। তাঁর রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

কবির কৃতিত্বপূর্ণ রচনার নিদর্শন :

বিজুলি চমকে মেঘ করিল গর্জন।
মুষল সমান ধার হইল বরিষণ ॥
ঠাঠারের ঘায় অগ্নি পড়ে নিরন্তর।
ঘোর অন্ধকার হইল বনের ভিতর ॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে ভয় উপজিল।
তরাসে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল ॥

রতিদেব মৃগলুব্ধ কাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'মৃগলুব্ধ সম্পদ'।

কবির বর্ণনা সরল ও কবিত্বপূর্ণ :

কেনে কাল বনে আইলা ব্যাধ হাতে প্রাণ দিলা
মোকে বাম হইল ভগবান।
বনে খাই তৃণ পানি অপকার নাহি জানি
কেনে বিধি এত বিড়ম্বন ॥

এই কাব্যই সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছিল। ১৬৭৪ সালে কবি এ কাব্য রচনা করেন। রতিদেব সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাব্যে অনেক স্থানে সংস্কৃত পুরাণের অনুবাদ লক্ষণীয়। রতিদেবের রচনা সরল ও কবিত্বপূর্ণ। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এ কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'এই কাব্য সর্বাংশেই সংস্কৃত পুরাণের অনুযায়ী, অতএব ইহাতে বাঙালি কবির সহজ কবিত্বস্ফূর্তির বাধা হইয়াছে। ইহাতে চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস নাই, দৈব ছায়া হইতে বিমুক্ত করিয়া কোন চরিত্রের উপর জাতীয় স্বাতন্ত্র্য আরোপ করা হয় নাই।'

কালিকামঙ্গল

কালিকামঙ্গল নামে পরিচিত কাব্যধারা মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যথার্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কালিকামঙ্গলের নামে এ কাব্যে বিদ্যাসুন্দরের প্রেমকাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে কালী শক্তিদেবতা চণ্ডীরই রূপভেদ মাত্র। কিন্তু পরবর্তী কালে নিম্নস্তরের অনার্য সমাজ থেকে কালিকাদেবীর আবির্ভাব ঘটেছে। চণ্ডীর সঙ্গে কালিকার মিল থাকলেও কাব্যরচনায় কোন সামঞ্জস্য নেই। কালিকামঙ্গলের কালিকার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং বিদ্যা ও সুন্দরের গোপন প্রণয়কাহিনি এ কাব্যের প্রধান উপজীব্য।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি

অপূর্ব রূপ-গুণান্বিত রাজকুমার সুন্দর পূজা করে কালিকাদেবীর কাছ থেকে রাজা বীরসিংহের অতুলনীয়া সুন্দরী ও বিদূষী কন্যা বিদ্যার বিয়ের বর পেল। দেবীর দেওয়া শুক পাখি নিয়ে তপঃসিদ্ধ সুন্দর গোপনে গৃহত্যাগ করে। সুন্দর বিদ্যার পিতৃরাজ্যে এসে এক মালিনীর গৃহে ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। মালিনী বিদ্যার জন্য ফুল যোগাতে গেলে সুন্দর বিদ্যার উদ্দেশ্যে ফুলের মালা ও প্রণয়লিপি প্রেরণ করল। বিদ্যা সুন্দরের শিল্পবোধ ও পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হয়ে এবং মালিনীর কাছে রূপগুণের পরিচয় পেয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্নানের ঘাটে তাদের সংকেতে আলাপ হল। রাতে কালিকার দয়ায় বিদ্যার শয়নমন্দির পর্যন্ত গোপন সুড়ঙ্গ কেটে গোপনে বিদ্যার সঙ্গে সুন্দর মিলিত হল। প্রতি রাতে গোপনে সুড়ঙ্গে যাওয়া আসা চলতে থাকে। এক সময় গান্ধর্ব মতে উভয়ের বিয়ে হয়। ক্রমে বিদ্যা সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে এবং রানীর কাছে তা ধরা পড়ে। রানী রাজাকে এ সংবাদ জানালে রাজা ক্রোধান্বিত হন। শেষে কোটালের কৌশলে সুন্দর ধরা পড়ে এবং রাজা তাকে প্রাণদণ্ড দান করেন। সুন্দরকে হত্যা করার জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সুন্দর কালীর স্তব করাতে কালী আবির্ভূত হয়ে বিদ্যাকে সুন্দরের হাতে সমর্পণ করার জন্য রাজাকে আদেশ দেন। রাজা সুন্দরের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে মহাসমারোহে বিদ্যার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। সুন্দর বিদ্যাকে সঙ্গে নিয়ে নিজ দেশে ফিরে গেল।

'কালিকামঙ্গল' কাব্য মঙ্গলকাব্য নামে আখ্যায়িত হবার যোগ্য নয়। এর বাইরের রূপটাই মঙ্গলকাব্য। আদিরসাত্মক বিদ্যাসুন্দর প্রণয়কাহিনির ওপর ভদ্র প্রলেপ চাপিয়ে একে মঙ্গলকাব্য রূপে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কালিকামঙ্গল রচনার আগে বাংলা সাহিত্যে মানবিক প্রণয়কাহিনি নিয়ে কাব্য রচিত হয়েছে। বিদ্যাসুন্দরের উপস্থাপনা ও ঘটনা বর্ণনায় তার প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। বিদ্যাসুন্দর একান্তই আদিরসাত্মক রোমান্টিক কাব্য মাত্র। এতে ইন্দ্রিয় লালসার উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশ্লীলতা প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যাসুন্দর কাহিনি সামাজিক অবক্ষয়ের নিদর্শন। তবে দেবতা ও ধর্ম-সম্পর্কবর্জিত বলে এই কাব্যে মানবিক আবেদন প্রাধান্য পেয়েছে। হাস্যরসাত্মক কাহিনিটি অতি-বাস্তব, আধুনিক উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য।

কালিকামঙ্গলের কবিগণ

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রেমকাহিনি অবলম্বনেই কালিকামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। মূল কাহিনি কাশ্মিরের বিখ্যাত কবি বিলহন কর্তৃক তাঁর 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্যে বার শতকে সংস্কৃতে বিধৃত হয়েছিল। ক্রমে চৌরপঞ্চাশিকার কাহিনি বাংলায় এসে প্রণয়কাহিনিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কালিকামঙ্গলে স্থান পেয়েছে।

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আদি কবি হিসেবে কবি কঙ্ককে মনে করা হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার রাজ্যেশ্বরী নদীর তীরে বিপ্রগ্রামে কবির জন্ম। তাঁর জীবনের করুণ ও বিচিত্র কাহিনি অবলম্বনে রচিত লোকগাঁথা 'কঙ্ক ও লীলা' নামে ময়মনসিংহ গীতিকায় স্থান পেয়েছে।

শ্রীধর কবিরাজ

শ্রীধর কবিরাজ বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অন্যতম কবি। তিনি আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পৌত্র ফিরোজ শাহের উৎসাহে বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। সম্ভবত ১৫৩৩ সালে তাঁর কাব্যরচনা সমাপ্ত হয়। কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

সাবিরিদ খান

সাবিরিদ খান বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি ছিলেন। ড. আহমদ শরীফের মতে, সাবিরিদ খান ১৪৮০ থেকে ১৫৫০ সালের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। কাব্য রচনায় কবি সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন; অলঙ্কার শাস্ত্রেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কাব্য থেকে কবির কালজ্ঞাপক তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। সম্ভবত শ্রীধর কবিরাজের কাব্যের (রচনাকাল ১৫৩৩) অত্যল্পকাল পরে সমসাময়িক কালে এ কাব্য রচিত হয়েছিল। কবি এ কাব্যে কবিপ্রতিভার উৎকৃষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যের কাহিনির সঙ্গে কালিকার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। মানবীয় রস এতে প্রাধান্য পেয়েছে। কবি ছন্দবৈচিত্র্য সৃষ্টিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তেমনি একটি নিদর্শন :

> ভাটের উত্তর কল্পিত সুন্দর হৃদএ আনন্দ অতি।
> বিদ্যারূপগুণ ভাবিয়া যখন বিরহে জ্বলিত মতি ॥
> এ নাট-নাটিকা কাব্যবেদগীতা পুরাণ আগম সুতা।
> অলঙ্কার বোধ ভারত জ্যোতিষ পুছিয়া মন উন্মতা ॥

গোবিন্দ দাস

গোবিন্দ দাস ১৫৯৫ সালে কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কবির নিবাস ছিল চট্টগ্রাম। এ কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়কাহিনি বর্ণনার চেয়ে কালীর মাহাত্ম্যই বেশি প্রকাশমান। কাব্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কালিকামঙ্গলের অপর কবি বলরাম কবিশেখর। তিনি পশ্চিম বঙ্গের কবি বলে অনুমিত। কবি সতের শতকের শেষ দিকে বর্তমান ছিলেন।

রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি। তিনি শ্যামাসঙ্গীত রচনায়ও অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রামপ্রসাদ ১৭২০ সালে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা

জেলার হালিশহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। রামপ্রসাদ অসচ্ছল সংসারের চাপে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তখন থেকেই তাঁর ভাব-তন্ময়তার সূত্রপাত হয়। তিনি এক ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারের মুহুরির কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হিসাবের খাতায় তিনি কালী-কীর্তনের পদ লিখে রাখতেন। অপূর্ব ভক্তিরস-সিক্ত রচনা পাঠ করে জমিদার তাঁকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি দিয়ে কর্ম থেকে অব্যাহতি দেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে এক শ বিঘা জমি নিষ্কর ভোগ-স্বত্ত্বদান করেন।

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁর কাব্যটি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের (১৭৫২) রচনাকালের দুই বৎসর আগে বা পরে রচিত। রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন'। কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনাকে প্রাধান্য না দিয়ে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনি রচনার দিকেই কবি দৃষ্টি দিয়েছেন। তবে এ কাব্য রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন এমন নয়, কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তনের খণ্ড গীতিকবিতাগুলো তাঁর সার্থক প্রতিভার পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে খণ্ডকবিতা রচনাতেই তাঁর প্রতিভাবিকাশের সার্থকতর ক্ষেত্র ছিল। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনিতে অনেক স্থানে তিনি অনাবশ্যক পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। রামপ্রসাদের রচনায় অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ করা যায় :

ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু শোভায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দৃশ্য হয়।
সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়।
তপ্ত তপনীর তনু তারাপতি প্রায় ॥

ভারতচন্দ্র রায়

কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র আঠার শতকের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবেও মর্যাদার অধিকারী। মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ কবি ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাহিনিরও শ্রেষ্ঠ কবি রূপে পরিগণিত। কবি ভারতচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। 'কালিকামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' এই কাব্যের অংশমাত্র।

ভারতচন্দ্র ছিলেন 'ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং পুরাণ-আগম-পারসী-নাগরী-বেত্তা।'

ভারতচন্দ্রের জন্মকাল নিয়ে মতানৈক্য আছে। ঈশ্বরগুপ্ত কর্তৃক উল্লেখিত ১৭১২ সাল সঠিক জন্মসাল নয়। বিভিন্ন তথ্য ও অনুমান মিলিয়ে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ভারতচন্দ্র আঠার শতকের গোড়ার দিকে ১৭০৫ থেকে ১৭১০ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সর্বশেষ তথ্য বিবেচনা করে ১৭০৭ সালে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল বলে মনে করেন।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বর্তমান বর্ধমান বিভাগের ভুরসুট পরগনায় আধুনিক হাওড়া জেলার পেঁড়ো (পাণ্ডুয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভুরসুট বা ভুরিশ্রেষ্ঠ প্রাচীন বাংলার সারস্বত তীর্থভূমি ছিল। চৌদ্দ শতকে চতুরানন নামে এক ব্রাহ্মণ ভুরসুট পরগনায় এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশের অন্যতম শাখা পেঁড়োনিবাসী রাজা কৃষ্ণ রায়ের

বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম। তাঁর পিতা নরেন্দ্র রায় ভুরসুট পরগনার জমিদার ছিলেন। ১৭১৩ সালে বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ ভুরসুট অধিকার করে নেন। নরেন্দ্র রায় এতে হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েন। তখন ভারতচন্দ্র মঙ্গলঘাট পরগনার নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে সংস্কৃত চর্চার মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবনের সূত্রপাত হয়। তৎকালীন যুগের অনুপযোগী সংস্কৃত শিক্ষাগ্রহণ এবং নিজ উদ্যোগে চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে করাতে তাঁর পারিবারিক বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। অনন্যোপায় ভারতচন্দ্র গৃহত্যাগ করে হুগলির দেবানন্দপুর গ্রামের রামচন্দ্র মুনশীর আশ্রয়ে ফারসি শিক্ষা করেন। এ সময়ে চাকরির জন্য ফারসি ভাষা শিক্ষা অত্যাবশ্যক ছিল। এখানেই ভারতচন্দ্রের কবিজীবনের সূত্রপাত হয় এবং তিনি দুটি ক্ষুদ্রাকৃতির 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচনা করেন। একটি হীরালাল রায়ের আদেশে এবং অপরটি রামচন্দ্র মুনশীর আদেশে রচনা করেছিলেন। এই পাঁচালিতে কবি এভাবে আত্মপরিচয় দান করেছেন :

ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদা ভাবে হতকংশ, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত
ফুলের মুখুটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি ॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দ পুর নাম
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমনি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হোন বরদায়,
ব্রত কথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ॥

বিশ বছর বয়সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ভারতচন্দ্র বিষয়কর্ম দেখাশুনার দায়িত্ব নেন। বর্ধমানরাজ কবির পিতাকে কিছু তালুক ইজারা দিয়েছিলেন। বর্ধমানরাজ পুনরায় তা খাস করে নেন। ভারতচন্দ্র এ কাজের প্রতিবাদ করলে রাজকর্মচারীদের ষড়যন্ত্রে কারারুদ্ধ হন। কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে কবি কারাগার থেকে পলায়ন করে বর্ধমান-রাজ রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে পুরীতে চলে যান। সেখানে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে এসে নিজেও সন্ন্যাসী হয়ে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করেন। পথিমেধ্যে আত্মীয়স্বজন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে সন্ন্যাসীবেশ ত্যাগ করে গৃহী হন। জীবিকার জন্য কাজের খোঁজে ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙার ফরাসি সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে যান। গুণগ্রাহী ইন্দ্রনারায়ণ তাঁকে ১৭৪৭ সালে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠিয়ে দেন। তারপর চল্লিশ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি নিযুক্ত হন। তাঁর মাসিক বেতন হয় চল্লিশ টাকা। কবি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রতিদিন কবিতা রচনা করে শোনাতেন। তাঁর কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন এবং প্রচুর ভূসম্পত্তি উপহার দেন। ভারতচন্দ্র পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পর ১৭৬০ সালে মারা যান।

ভারতচন্দ্রের আশ্রয়স্থল নবদ্বীপ বা নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা কবির প্রতিভা বিকাশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত কূটকৌশলে নবদ্বীপের অধিপতি হন। ধূর্ততা ও প্রতারণা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলেও তাঁর রাজসভায় ভারতচন্দ্রের মত প্রতিভাশালী কবির সমাদর ছাড়াও দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, ধর্ম ইত্যাদির চর্চা হত। কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই উচ্চশিক্ষিত কূটরাজ-নীতিপ্রাজ্ঞ মহিমান্বিত রাজচক্রবর্তী একটি পল্লীগ্রামের সামান্য ব্যক্তির মত কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। যুগের প্রভাবে রাজসভার কৌতুকরাশিতে সুরুচি বা সংযত ভদ্রতা ছিল না। রাজসভায় বাংলা ভাষা মর্যাদা লাভ করায় অলঙ্কারের যেমন বাহুল্য ঘটে, তেমনি গ্রাম্য সৌন্দর্য ও নিষ্কাম প্রেমের আবেগ বিসর্জন দিয়ে কামনাপূর্ণ ক্রীড়ায় রসিকচিত্তে উত্তপ্ত মদিরার উল্লাস প্রবাহিত করে। বাকপটু ও ভাষাশিল্পী 'বুদ্ধিমান ভারতচন্দ্র মিশ্র ভাষায় তুচ্ছ কথার জাল বুনে ভাঁড়ামির ভিয়ান দিয়ে কৌতুক, পরিহাস ও বিদ্রূপের আভরণে সজ্জিত করে দেবতা ও মানবকে, কালী ও কৃষ্ণচন্দ্রকে সুকৌশলে তুষ্ট করেছেন।'

ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কবি গ্রন্থোৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন যে, একদিকে দেবীর আদেশ, অন্যদিকে রাজার আদেশে কাব্য রচনা করেছেন। কাব্য রচনায় কবির যে সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল তা হল : রাজার আদেশমত কাব্য রচনা করেছেন, রাজার পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে কুবের বংশজাত ও দেবীর অনুগৃহীত রূপে বর্ণনা করেছেন এবং রাজা ও তাঁর সভাসদগণের মনোরঞ্জনের জন্য কৌশলে কাব্যের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনি সংযোজন করেছেন। তিনি মৈথিলি কবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' কাব্যের অনুবাদও করেছিলেন। 'চণ্ডীনাটক' তাঁর অসমাপ্ত রচনা। সংস্কৃতে 'নাগাষ্টক' ও 'গঙ্গাষ্টক' নামক ক্ষুদ্র কবিতাদ্বয়েরও তিনি রচয়িতা। বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় তাঁর কতগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির কবিতা আছে। তিনি বাংলা সংস্কৃত ফারসি হিন্দি মিশ্রিত ভাষায়ও কিছু কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। এসব নিদর্শন থেকে তাঁর প্রতিভার বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায়।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের ঔজ্জ্বল্যে ভারতচন্দ্রের অপরাপর কবিকৃতি ম্লান হয়ে গেছে। ১৭৫২ সালে অন্নদামঙ্গল রচিত হয়। তখন ১৬৭৪ শকাব্দ। কবি গ্রন্থরচনার কাল উল্লেখ করেছেন :

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ॥

কাব্যটি কেবল আঠার শতকের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থই নয়, বরং বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর অন্যতম। কবির পরিণত বয়সের এ রচনায় পরিপক্ক রচনাশক্তির পরিচয় রয়েছে। অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গল কাব্যের আটটি পালা। কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড—শিবায়ন অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড—বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল এবং তৃতীয় খণ্ড—মানসিংহ অন্নদামঙ্গল। প্রকৃত পক্ষে, তিন খণ্ডকে তিনটি স্বতন্ত্র কাব্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়। প্রথম খণ্ড মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের অনুকরণে রচিত। এই অংশই প্রকৃত অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গল। চণ্ডী ও অন্নদা অভিন্ন—একই দেবীর দুই নাম। এ দেবীর কাহিনিই চণ্ডীমঙ্গলে ও অন্নদামঙ্গলে স্থান পেয়েছে বলে দুই কাব্যের পৌরাণিক অংশে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে লৌকিক অংশে পার্থক্য বিদ্যমান। ভারতচন্দ্রের

ওপর সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের ফলে মুকুন্দরামের চণ্ডী অন্নদামঙ্গলে অন্নদায় পরিণত হয়েছেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর নামে পরিচিত। এ অংশে কালিকামঙ্গলের ধারা অনুসৃত হয়েছে বলে একে কালিকামঙ্গল বলা যায়। কবি এতে নিছক মর্ত্যজীবনের প্রেমচিত্র অঙ্কন করে কালিকাদেবীর কিঞ্চিৎ চরণামৃত ছিটিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনিটি আগেই এ দেশে প্রচলিত ছিল। তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহের বাংলা আক্রমণ, ভবানন্দ মজুমদারের সাহায্য লাভ এবং প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। দেবী অন্নপূর্ণার ভূমিকা এ অংশে উল্লেখযোগ্য বলে মানসিংহ উপাখ্যান অন্নপূর্ণামঙ্গল নামেও পরিচিত। অন্নদামঙ্গল কাব্যের তিন খণ্ডের বিষয়বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ক্ষীণ। কাব্যের যোগসূত্র অন্নদা এবং অন্নদার কৃপায় ভাবনন্দ মজুমদারের ভাগ্যোদয় কাব্যের প্রধান কাহিনি। অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম অংশে দেবী খণ্ড এবং শেষ অংশে মানসিংহ খণ্ড কাহিনির দিক থেকে অনুকরণকারী হিসেবে কবিকে রেহাই দিয়ে মৌলিকতার মর্যাদা দিয়েছে। কবির অনন্য প্রতিভার দলিল হিসেবেও একে মনে করা হয়েছে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাহিনি

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডের উপাখ্যানে সতীর দেহত্যাগ ও উমারূপে জন্মগ্রহণ, শিবের সঙ্গে বিয়ে ও ঘরকন্না, অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ, কাশীপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যন্ত অংশটি যথার্থই অন্নদামঙ্গল। তারপর হরিহোড়ের বৃত্তান্ত এবং ভবানন্দের জন্মকাহিনি। হরিহোড় দেবীর অনুগ্রহে লক্ষপতি হয়েছিল। শেষ জীবনে দ্বিতীয় পক্ষে তরুণী ভার্যা বিয়ে করাতে সংসারে অশান্তি লাগে। দেবী বিচলিত হয়ে হরিহোড়ের গৃহ ত্যাগ করেন এবং ভবানন্দ মজুমদারের প্রতি অনুগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ভবানন্দ-গৃহে যাত্রা করেন। এখানেই প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রধান বিষয় বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনি। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে বাংলাদেশে এসে বর্ধমানের কানুনগো ভবানন্দ মজুমদারের কাছে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি শুনতে চাইলেন। বিদ্যাসুন্দর কাহিনি এরূপে বর্ণিত হয়েছে : বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের সুন্দরী কন্যা বিদ্যা প্রতিজ্ঞা করেছিল, তাকে যে বিচারে পরাজিত করতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করবে। কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের অভাব দেখে রাজা গোপনে কাঞ্চীরাজ্যে ভাট প্রেরণ করেন। কাঞ্চীরাজ গুণসিন্ধু রায়ের সর্বশাস্ত্রবিশারদ পুত্র সুন্দর ভাটের মুখে বিদ্যার অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথা শুনে পড়ুয়ার ছদ্মবেশে বর্ধমানে আসে। দৈবক্রমে রাজবাড়ির মালিনী হীরার সঙ্গে সুন্দরের সাক্ষাৎ হয় এবং এই হীরা মালিনীর গৃহে থেকেই বিদ্যার সংবাদ নেয়। সুন্দর হীরা মালিনীর মাধ্যমে বিদ্যার উদ্দেশে ফুলের মালা ও প্রণয়-কবিতা রচনা করে প্রেরণ করে। বিদ্যার কাছ থেকে যথারীতি অনুকূল সাড়া আসে। সুন্দর এক গোপন সুড়ঙ্গ তৈরি করে বিদ্যার গৃহে যায়। গান্ধর্ব মতে তাদের বিয়ে হয়। পরে বিদ্যা সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লে রানীর হাতে ধরা পড়ে। রাজার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে ক্রোধান্বিত রাজা অপরাধীকে ধরার জন্য কোটালকে নির্দেশ দেয়। কোটাল বহু কৌশলে সুন্দরকে ধরতে সক্ষম হয়। রাজা সুন্দরকে মৃত্যুদণ্ড দেন। দণ্ড কার্যকর করার জন্য সুন্দরকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সুন্দর কালীর স্তব করলে কালী সুন্দরকে রক্ষা করেন।

কালীর আদেশে রাজা বীরসিংহেরও দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। রাজা মহাসমারোহে সুন্দরের সঙ্গে বিদ্যার বিয়ে দিলেন। সুন্দর বিদ্যাকে নিয়ে নিজ দেশে ফিরে গেল।

তৃতীয় খণ্ডের কাহিনি মানসিংহের যশোর গমন, দেবীর অনুগ্রহে ভবানন্দ মজুমদারের সাহায্যে রাজা প্রতাপাদিত্যের পরাজয় এবং বাদশাহ্‌র কাছে খেলাত লাভের উদ্দেশ্যে ভবানন্দের দিল্লি গমন। ভবানন্দ সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে দেবীর মহিমা কীর্তন করলে বাদশাহ্‌ হিন্দুধর্ম ও দেবী সম্পর্কে কটূক্তি করেন এবং ভবানন্দকে কারারুদ্ধ করে রাখেন। কারাগারে ভবানন্দ দেবীর স্তব করলে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অভয় দেন। দেবী বাদশাহ্‌কে আতঙ্কগ্রস্ত করার জন্য দিল্লিতে উৎপাত শুরু করেন। অনন্যোপায় হয়ে জাহাঙ্গীর ভবানন্দের নিকট হার মানেন এবং তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য রাজা উপাধি দেন। তারপর অনেক তীর্থস্থান পর্যটন করে ভবানন্দ দেশে ফিরে কিছুকাল রাজত্ব করে। পরে তার জীবনাবসান ঘটে।

কবি ভারতচন্দ্রের সর্বতোমুখী জ্ঞান ও স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব গুণের সুন্দর সামঞ্জস্যের অনবদ্য ফল অন্নদামঙ্গল কাব্য। অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনি ভারতচন্দ্রের নিজস্ব নয়—মঙ্গলকাব্যের ধারায় তা প্রচলিত ছিল; কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের কাহিনি তাঁর নিজের—তিনি ইতিহাস থেকে তা সংগ্রহ করেছিলেন। তবে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেন নি। মঙ্গলকাব্যধারার সর্বশেষ কবি হিসেবে তাঁর অবদান বিবেচিত হলেও প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে তাঁর যোগ যৎসামান্য। ষোল-সতের শতকের মঙ্গলকাব্যের দেবনির্ভরতা এ কাব্যে প্রকট হয়ে ওঠে নি। কারণ ভারতচন্দ্র মধ্যযুগীয় ভক্তি ও বিশ্বাসের অন্ধ আতিশয্য থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন। অন্তরে ভক্তির প্রাবল্য নিয়ে ভারতচন্দ্র কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নি। তাই তাঁর কাব্যে শিবের চারিত্রিক গাম্ভীর্য মোটেই রক্ষিত হয় নি। তাঁর হাতে ব্যাসদেবের চরিত্রের পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে একটি ভাঁড়ের চরিত্রের মত রূপায়িত হয়েছে। আসলে তখন ধর্মভাব হ্রাস পেয়ে সাহিত্য থেকে দেবতা বহুদূরে সরে গিয়েছিল। ড. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, 'দেবদেবী উভয়ই যেন রাজকীয় রুচির তৃপ্তির জন্য স্বর্গীয় প্রকৃতি ভুলিয়া পার্থিব প্রকৃতিতে অবতীর্ণ—শুধু পার্থিব বলিলেই হয় না। যেন নবাবি শাসনের শেষ আমলের সেই ভোগ ঐশ্বর্যময়, বিলাসময় রাজকীয় আবেষ্টনীর উপযোগী চরিত্রেই তাহারা আবির্ভূত।' ভারতচন্দ্রের যুগে দৈবভয় বিপর্যস্ত দৈবমুখাপেক্ষী মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল না বলে তাঁর কাব্য মঙ্গলকাব্যের ধর্ম ত্যাগ করেছিল। ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিতে ছিল আধুনিকতার প্রতিচ্ছবি, মানবিকতার স্বচ্ছ প্রকাশ।

বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনি এ দেশে আগেই প্রচলিত ছিল। অবৈধ ও অশালীন এই প্রেমকাহিনি কালের আবর্তনে দেবপ্রশস্তিমূলক কাব্যের অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা মঙ্গলকাব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। কামকেলির রুচিবিগর্হিত বর্ণনাও যে দেবভক্তির কাহিনির সঙ্গে সহজে সম্পৃক্ত হতে পেরেছিল বিদ্যাসুন্দর পালা তারই নিদর্শন। নৈতিক আপত্তির কারণ থাকলেও এর কাব্যগুণ বিনষ্ট হয় নি। ভাবের গভীরতার চেয়ে বিদ্যাসুন্দর অংশে রসের উচ্ছলতা বেশি প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যটি মঙ্গলকাব্যের আকারে লেখা হলেও কালীর মাহাত্ম্যকীর্তন করে দেবীকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি নিয়ে অনেকেই কাব্য রচনা করেছেন। সেসবের মধ্যে

ভারতচন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অনতিক্রমণীয়। কাব্যের অশ্লীলতার যে অভিযোগ আনা হয় তা ভারতচন্দ্রের ভাষায় নয়, অশ্লীলতা রয়েছে কাহিনির গঠনে। এ প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, 'ভাষাগত অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা ভারতচন্দ্রে একেবারেই নাই, তাহার মধ্যে যে অশ্লীলতা আছে, তাহা ভাব বা অর্থগত অশ্লীলতা; তাহারও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষতা ছিল না। অশ্লীলতা যে সাহিত্যিক শিল্প সাধনার বিষয় তাহা ভারতচন্দ্রের রচনাতেই প্রথম বুঝিতে পারা গেল।' প্রমথ চৌধুরীর মতে, 'ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভেতর আর্ট আছে, অপরের কাছে শুধু ন্যেচার।'

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় অংশের কাহিনি 'মানসিংহ পালা'টিকে কৌশলক্রমে কাব্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার এই অংশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক। ভারতচন্দ্র ইতিহাসকে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করেন নি, তবে ইতিহাসকে কাব্যের পটভূমি করে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'ভবানন্দের গৌরব প্রচার করিতে গিয়া তিনি ইতিহাস ও রূপকথা, কাব্য ও তথ্য একসঙ্গে মিশাইয়া ইতিহাসের জাতি মারিয়াছেন।'

ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের প্রথম নাগরিক কবি। তিনি সমসাময়িক নাগরিক রস ও রুচির প্রতিনিধি হিসেবে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। তিনি ছিলেন রাজসভার কবি। সে রাজসভা ছিল নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। তাঁর কাব্যে গভীরতর জীবনবোধের পরিচয় নেই, তৎকালীন নাগর ও দরবারি জীবন সেখানে প্রতিফলিত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে নানা রুচি, রূপ ও রস, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার মিশ্রিত হয়ে যে অভিনব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা সমসাময়িক নাগর জীবনেরই প্রতিরূপ। জীবনদৃষ্টি অপেক্ষা আর্ট সৃষ্টিই সে জীবনের লক্ষ্য। সমকালীন জীবনের শূন্যগর্ভতাকে কবি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপে নির্মম ভাবে আঘাত করেছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উপাস্যা দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য প্রচার করতে গিয়ে কবি দৃষ্টি রেখেছিলেন মাটির দিকে।

ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বসে রাজদরবারের অলঙ্কৃত রীতিতে নতুন ভাবে মঙ্গলদেবতার গান গেয়েছিলেন। মঙ্গলকাব্যের জন্মপরিবেশ থেকে তিনি বহু দূরে ছিলেন এবং তার আত্মার সঙ্গেও কবির যোগযোগ ছিন্ন হয়েছিল। তবু তিনি মঙ্গলকাব্যের বাহ্যরীতি যথাসম্ভব অনুসরণ করেছিলেন। কাব্যটিতে কবি অন্নপূর্ণার মহিমা ঘোষণা করেছেন, স্বপ্নাদেশের কথাও বার বার উল্লেখিত হয়েছে, আবার দেবীকেও মাটিতে নামিয়ে আনা হয়েছে, ইতিহাসবিশ্রুত জাহাঙ্গীর বাদশাহ ও মানসিংহের মহিমা দেবীর কাছে অবনমিত হতে দেখা যায়। প্রতিভাশালী শিল্পীকবির হাতে কাব্যকলায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, কিন্তু দেবপরিকল্পনা ম্লান হয়ে গিয়েছে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে প্রধান চরিত্রচিত্রণে কবি নিপুণতার পরিচয় দিতে না পারলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়, ঘটনা বা চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। ঈশ্বরী পাটনী, হীরা মালিনী প্রভৃতি চরিত্র যেন একান্ত বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। ঈশ্বরী পাটনী বাংলা সাহিত্যের অমর চরিত্র। দেবীর পায়ের স্পর্শে লোহার সেউতি যখন সোনার সেউতিতে পরিণত হল তখন সেই নারীর দেবীত্বে ঈশ্বরী পাটনীর মনে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ ছিল না, সে বলেছিল, 'এত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।' অথচ তার প্রার্থনায় ছিল না স্বর্গসুখের কামনা কিংবা দেবীর চরণপ্রসাদ; সে প্রার্থনা করল—'আমার সন্তান যেন থাকে

দুধে ভাতে।' আধ্যাত্মিকতা-বিমুক্ত এমন ঐহিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই ভারতচন্দ্রের সীমাহীন মর্যাদা। হীরা মালিনী চরিত্রটি অন্নদামঙ্গলের কবির একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। তারই চেষ্টায় বিদ্যা ও সুন্দরের সাক্ষাৎ হয়েছে। তাই তার ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হীরার চরিত্র সম্পর্কে কবি মন্তব্য করেছেন :

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম ॥
গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে ॥
চূড়া বান্ধা চুল পরিধানে সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁধে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুড়া আছে শেষে ॥
ছিটা ফোঁটা তন্ত্রমন্ত্র আছে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি ॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায় ॥

কবি হীরা মালিনীর বেসাতি বর্ণনা, নায়ক-নায়িকার দূতীগিরি, ধূর্ততা প্রভৃতি খুবই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করেছেন। হীরা মালিনীর চরিত্র সর্বদোষে কলঙ্কিত, কিন্তু তা অকৃত্রিম বাস্তবতায় অত্যুজ্জ্বল। তার কুটিল ভঙ্গিমা, তার ক্রূর অভিসন্ধি কবি খুবই স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন।

বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনাতেও কবির কৃতিত্ব কম নয়। যুদ্ধ, ঝড়বৃষ্টি, রন্ধন, বিদ্যার রূপ প্রভৃতি বর্ণনায় কৃতিত্বের নিদর্শন বর্তমান। কৌতুক ও হাস্যরস সৃষ্টিতে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে স্থূল কুরুচিও অনন্যসাধারণ শিল্পকৃতি লাভ করেছে। তাঁর হাতে প্রাচীন উপমা নবরূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে প্রায় সকল রকমের অলঙ্কারের প্রয়োগ করেছেন। ভাষা ও ছন্দের সংহত ও সমন্বিত অবয়বে ভারতচন্দ্রের কাব্যদেহ নিখুঁত লাবণ্যে হয়ে উঠেছে অপরূপ। মধ্যযুগের 'অতুল্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি' ভারতচন্দ্রের মধ্যে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা সুসংহত ও সমন্বিত হয়েছিল। তাঁর কাব্যে অলঙ্কারের অবয়বে অসংখ্য বাকপ্রতিমা মণিমুক্তার মত বিচ্ছুরিত হয়। তাই ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'ভাষা ছিল তাঁর হাতে কুমোরের কাদার মত। কাব্যদেহ নির্মাণে তাঁর ভাষা, ছন্দবোধ ও শিল্পরুচি ছিল অতুল্য আর বিন্যাসে নৈপুণ্যও ছিল কুমোরের নিপুণ হাতের ও নিখুঁত চাকের মতই।' ছন্দে ভারতচন্দ্র অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তিনি বিভিন্ন ছন্দের প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলা কাব্যে বিচিত্র গতিশীলতা আনয়ন করেছিলেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন শব্দকুশলী কবি। সুললিত ও রসাল শব্দব্যবহারে তিনি যেমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তেমন রুদ্র ও বীভৎস রস বর্ণনার উপযোগী শব্দাবলির প্রয়োগও সম্ভব হয়েছে। সংস্কৃত, ফারসি, হিন্দি ভাষায় তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল বলে তিনি পছন্দমত শব্দ চয়নে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রসের সার্থক পরিবেশনে ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

মানসিংহ পাতশায় হৈল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী ॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে ॥

কবির বাগ্‌বিদগ্ধতায় সমৃদ্ধ অনেক বক্তব্য সুপ্রচলিত প্রবচন বা সুভাষিতের মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন :

১. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
২. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
৩. যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।
৪. নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।
৫. বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।
৬. হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
৭. বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।
৮. মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে।
৯. বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
১০. কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।
১১. বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।
১২. যার কর্ম তারে সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে।
১৩. ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
১৪. মিছা কথা সিচা জল কতক্ষণ রয়।
১৫. জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরিয়সী।

এসব গভীরতম ভাবদ্যোতক প্রবচনের মত পদে ভাষার ওপর কবির যে অধিকার প্রমাণ করে তা তুলনারহিত।

ভারতচন্দ্রের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল কৌতুকরস, মার্জিত ভাষা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাই 'ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।' ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, 'রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমন তাহার কারুকার্য।' কাব্যের বহিরঙ্গ শোভার দিকে ভারতচন্দ্র বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন বলে তাঁর কাব্যে ভাবগম্ভীরতা ও কল্পনা-সমুন্নতির অভাব ঘটেছে। প্রমথ চৌধুরী অন্নদামঙ্গল কাব্য তথা বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে বলেছেন, 'রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা—সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত ও মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত।' কুরুচি ও অশ্লীলতার অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য তাঁর ব্যক্তিগত নয়, তা যুগগত বৈশিষ্ট্যমাত্র। ভারতচন্দ্রের

কাব্যোৎকর্ষ কেবল তাঁর কাব্য প্রসাধনকলা বা রাজসভাসুলভ রুচিবৈদগ্ধ্যের ওপর নির্ভর করে না, পরন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখলে তাঁর কাব্য ভাবীযুগের সাহিত্যিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার অস্ফুটবার্তা বহন করে।

ভারতচন্দ্রকে কেউ কেউ যুগসন্ধির কবি বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের অবসান হয়েছে। পরবর্তী যুগের প্রকাশ তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায় না। ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনেরও অবসান ঘটেছে। ইংরেজি প্রভাবে যে আধুনিক যুগের শুরু তা ভারতচন্দ্র দেখে যেতে পারেন নি। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত মধ্য ও আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যকে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন বলে তাঁকে যুগসন্ধির কবি বলা হয়। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর একশত বৎসর পূর্বে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। তিনি যুগসন্ধি থেকে বহু দূরে ছিলেন। তাই তাঁকে যুগসন্ধির কবি না বলাই সমীচীন। কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অনন্য প্রতিভার স্বরূপ পর্যালোচনা করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, 'এতকাল মঙ্গলকাব্যের ধারা ঝরনার ধারার মত স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উৎসারিত হইতেছিল, ভারতচন্দ্র তাহাতে সর্বপ্রথম নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ দিয়া তাহাকে পাথরে গাঁথা কুণ্ডে পরিণত করিয়া তাহার গতিপথ রুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তিহীন ব্যঙ্গোক্তি, তাঁহার সর্বব্যাপী ও সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রভৃতির ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তাঁহার ব্যক্তি প্রতিভার ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিয়া মঙ্গলকাব্যের যুগাবসান ঘটাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষত্বগুলি তাঁহার ঐহিক প্রীতির নিদর্শন রূপে গণ্য হইবার মর্যাদা লাভ করিয়া তাঁহাকে আধুনিক যুগেরও অগ্রদূত বলিয়া নির্দিষ্ট হইবার যোগ্যতা দান করিয়াছে।'

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত পরিসরে অনেক দেবদেবীর মাহাত্ম্য গান করা হয়েছে। দেবতার সংখ্যাও যেমন অগণিত তেমনি মঙ্গলকাব্য রচনার প্রবণতাও ছিল ব্যাপক। প্রধানত মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ও শিবের মাহাত্ম্যসূচক মঙ্গলকাব্যগুলোই সমধিক প্রচারিত হয়েছিল এবং অগণিত কবি তাতে সৃষ্টি প্রতিভা দেখাতে তৎপর ছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মত শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা মঙ্গলকাব্য রচনায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে। এসব প্রধান মঙ্গলকাব্য ছাড়াও বিভিন্ন গ্রাম্যদেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য অনেকগুলো মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। প্রথম শ্রেণির প্রতিভাশালী কবির অবর্তমানে এসব মঙ্গলকাব্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি এবং গণ্ডীবদ্ধ সমাজে অপ্রধান মঙ্গলকাব্য হিসেবেই এগুলোর পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

শীতলামঙ্গল

বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলা। তাঁর পূজা বাংলাদেশ ও ভারতের সর্বত্র প্রচলিত আছে। তবে তাঁর নামে আছে ভিন্নতা। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই শীতলামঙ্গলের কাহিনিতে আছে শীতলা দেবীর পূজা প্রচারের উদ্যোগ। বিরুদ্ধ শক্তিকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে পূজা প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শীতলামঙ্গলের আদি কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী শীতলার উৎপত্তি সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনি বর্ণনা করেছেন :

করিল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নহুষ রাজন।
কত মুনি ঋষি আইল কে করে গণন॥
নির্বিঘ্নে করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি।
হইলেক পূর্ণ যজ্ঞ শান্ত মতি॥
যজ্ঞপূর্ণে নিভাইল যজ্ঞের অনল।
তাহে জনমিল এক কন্যা সমুজ্জ্বল॥
মস্তকে ধরিয়া কুলা বাহির হইলা।
দেখি প্রজাপতি তারে যত্নে সুধাইলা॥
কে তুমি সুন্দরী কন্যা কাহার গৃহিণী।
কি হেতু অগ্নিতে ছিলা কহ সে কাহিনি॥
দেবী কন অগ্নিকুণ্ডে মম জন্ম হইল।
কোথা যাই কি করিব পরাণ বিকল॥
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলা বচন।
যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম॥
সেহেতু শীতলা নাম তোমার হইল।
মম বাক্যে যাহ তুমি শীঘ্র ভূমণ্ডল॥

শীতলদেবী মর্ত্যে পূজা প্রচার করতে গিয়ে তাঁর ক্ষমতার কথা বলেছেন। কোন নির্দিষ্ট নায়ক নিয়ে কোন কাহিনি এতে নেই। এর ঘটনাও সুগ্রথিত নয়।

শীতলামঙ্গলের কবিগণ

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী

শীতলামঙ্গল কাব্যের আদি কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাশীযোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ ছিলেন। কবি আঠার শতকের শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন। তিনি ১৭৭৭-৮৩ সালের মধ্যে শীতলামঙ্গল রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কবির ভাষা সুমার্জিত এবং কিছুটা আধুনিকতার পরিচায়ক। তাঁর রচনা সরল।

বল্লভ

কবি বল্লভ আঠার শতকে বর্তমান ছিলেন। কবি সম্ভবত বসন্ত রোগের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তাঁর কাব্যে চৌষট্টি প্রকার বসন্ত রোগের বর্ণনা দিয়েছেন। বল্লভের মধ্যে কবিত্ব ছিল, তবে তাঁর কাব্যের ভাষা মার্জিত নয় এবং গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট।

মাণিকরাম গাঙ্গুলী

ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী 'শীতলামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছেন। একটি স্বতন্ত্র পালায় সংক্ষেপে কাব্যটি রচিত। কাব্যে কবির বর্ণনার সাবলীল ভঙ্গি এবং অবাঞ্ছিত আড়ম্বরের পরিবর্তে পাণ্ডিত্যের সংযম প্রশংসার যোগ্য। কাব্যে চৌষট্টি প্রকার বসন্ত রোগের বর্ণনা আছে। চরিত্র চিত্রণে কবির বিশিষ্টতা ছিল।

ষষ্ঠীমঙ্গল

ষষ্ঠী লৌকিক দেবী। শিশু রক্ষয়িত্রী রূপে এই দেবীর কল্পনা করা হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে বাংলার সমাজে সূতিকা গৃহে শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীদেবীর পূজা প্রচলিত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক পল্লীতে ষষ্ঠীতলা নামে একটি নির্ধারিত স্থান থাকে। সেখানে ষষ্ঠীদেবীর পূজা দেওয়া হয়।

ষষ্ঠীমঙ্গলের কবিগণের মধ্যে কৃষ্ণরাম দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৬৭৯ সালে ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। তিনি কালিকামঙ্গলেরও কবি। তাঁর কাব্যে প্রাচীন বাংলার সপ্তগ্রামের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

রুদ্ররাম ষষ্ঠীমঙ্গরের অপর কবি। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু সংস্কৃত পুরাণ থেকে গৃহীত। দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন। ভাষা বিচারে রুদ্ররাম আঠার শতকের কবি। তাঁর ভাষা সুপরিচ্ছন্ন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তবে তাতে কবিত্বের স্পর্শ তেমন নেই।

শঙ্কর নামে একজন কবির পরিচয় পাওয়া গেছে। কবি তাঁর 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়ে কাল নির্দেশ করেছেন। ১৭৫৯ সালে কাব্যটি রচিত বলে অনুমান করা হয়। তাঁর কাব্যের কাহিনির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। ছোটরানীর সাধভক্ষণের বর্ণনাটি কবি মুকুন্দরামের কালকেতুর কাহিনির নিদয়ার সাধভক্ষণের আনুপূর্বিক অনুকরণ।

সারদামঙ্গল

বিদ্যা ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা বা সরস্বতীর কাহিনি অবলম্বনে 'সারদামঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছিল। সারদা বৈদিক দেবী। কিন্তু সারদামঙ্গল কাব্যে কবিগণ বৈদিক বা পৌরাণিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে মঙ্গলকাব্যের স্ত্রীদেবতার বৈশিষ্ট্য রূপায়িত করেছেন। সারদামঙ্গল কাব্যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। এই কাব্যে বিদ্যার মাহাত্ম্য বর্ণিত হত বলে তা অশিক্ষিত সমাজে সমাদর পায় নি, বিত্তবান লোকদের সন্তানদের বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে ব্যবসায়ী গায়েন কর্তৃক তা গীত হত। সারদামঙ্গলের কাহিনির মধ্যে দেবী নিজের পূজা প্রচার করতে গিয়ে নির্বাচিত ভক্তকে অনুগ্রহ ও অন্যকে নিগ্রহ করেছেন।

সারদামঙ্গলের কবি দয়ারাম আঠার শতকের শেষ ভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যের নাম 'সারদাচরিত্র'। কাব্যটি ছোট আকারের। কবির নিবাস ছিল মেদিনীপুর। কাব্যটি পাঁচালীর লক্ষণাক্রান্ত এবং কাব্যগুণ বিবর্জিত।

সারদামঙ্গলে অন্য একজন কবির নাম **বীরেশ্বর**। তাঁর কাহিনি স্বতন্ত্র ধরনের এবং এ কাব্যে কবি কালিদাস বররুচি প্রভৃতি সংস্কৃত কবির কাহিনি বর্ণনা করেছেন।

সারদামঙ্গল কাব্যের ধারায় আঠার শতকের শেষ ভাগে **রাজসিংহ** 'ভারতীমঙ্গল' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি কালিদাসের একটি লৌকিক কাহিনি অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। কবি সরস্বতীকুণ্ডে স্নান করে কীভাবে অপার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব লাভ করেছিলেন সে কাহিনি এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব প্রকট।

রায়মঙ্গল

বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্যসূচক কাব্য রায়মঙ্গল নামে পরিচিত। দক্ষিণবঙ্গ বা সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব বেশি বলে সেসব অঞ্চলে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণে সুন্দরবন—সেখানকার অধিপতি দেবতা বলে তার নাম দক্ষিণরাজ বা দক্ষিণরায়। কারও মতে ভাটি অঞ্চলের রাজা মুকুটরায়ের সেনাপতি ছিলেন দক্ষিণরায়। এমনও মনে করা হয় যে দক্ষিণরায় ছিলেন একজন সুদক্ষ বাঘ-শিকারি। কালক্রমে দেবতায় পরিণত হয়েছেন। এই দেবতা সম্পূর্ণই লৌকিক দেবতা। রায়মঙ্গলের কাহিনিতে দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের বিবরণ রয়েছে। এর সঙ্গে আছে দক্ষিণরায় ও বড় গাজী খাঁর যুদ্ধের বিবরণ।

'রায়মঙ্গল' কাব্যের আদি কবি মাধব আচার্যের পরিচয় কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। পরবর্তী কবি কৃষ্ণরামের কাব্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দক্ষিণরায় মাধব আচার্যের কাব্যে সন্তুষ্ট না হয়ে কৃষ্ণরামকে কাব্য রচনার আদেশ দান করেন :

পূর্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য ॥

মাধব আচার্যের লেখা রায়মঙ্গলের পুঁথি পাওয়া যায় নি।

কৃষ্ণরাম

কবি কৃষ্ণরাম ১৬৮৬ সালে 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ হিসেবে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই স্বপ্নাদেশের কথা বলা হয়েছে। কবিকে কিছুটা বিশেষ ক্ষমতাও প্রদান করা হয়েছে :

তোমার কবিতা যার মনে নাই লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে ॥

কবি কৃষ্ণরাম কলকাতার কাছেই নিমিতা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কালিকামঙ্গলের অন্যতম কবি। কবি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় আছে। তবে কবি কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে একটি বলিষ্ঠ রচনা ভঙ্গির পরিচয় মিলে। সরলতা তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। কবি আরও কিছু কাব্য রচনা করেছিলেন।

হরিদেব ও **বলরাম** নামে দুজন কবি এক সঙ্গে একটি রায়মঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন।

রুদ্রদেব নামে একজন কবি রায়মঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যের তিনটি পালা :

১. রায়-গাজী যুদ্ধ, ২. রতা বাউলিয়া এবং ৩. পুষ্পদত্ত বণিক পালা। রুদ্রদেবের কাব্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় নেই এবং লোকজীবন-প্রচলিত গ্রাম্য শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এতে বহু ফারসি শব্দেরও ব্যবহার রয়েছে।

সূর্যমঙ্গল

লৌকিক সূর্যদেবতার কাহিনি অবলম্বনে সূর্যমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত সূর্যমঙ্গলেও পূজা প্রচারের কথা বলা হয়েছে। কবি **রামজীবন** ১৭০৯

সালে তাঁর সূর্যমঙ্গল বা 'আদিত্য-চরিত' কাব্যটি রচনা করেছিলেন। রামজীবন মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি। তিনি প্রচলিত সূর্যব্রতের কাহিনি নিয়ে একটি পাঁচালির রূপ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কবি রামজীবনের রচনা কবিত্ব বৈশিষ্ট্য-বর্জিত এবং বৈচিত্র্যহীন ও গতানুগতিক প্রণালীতে রচিত।

মালাধর বসু নামে জনৈক কবি সূর্যমঙ্গলের কাহিনি নিয়ে 'অষ্টলোকপাল কথা' নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেছিলেন। **দ্বিজ কালিদাস** নামে অন্য একজন কবি আঠার শতকে 'সূর্যমঙ্গল' অথবা 'সূর্যের পাঁচালী' নামে একটি আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেছিলেন।

গঙ্গামঙ্গল

গঙ্গার মাহাত্ম্য এবং ভগীরথকর্তৃক মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের কাহিনি নিয়ে 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছে। পুরাণ কাহিনি এর ভিত্তি হলেও মঙ্গলকাব্যের মত তা দেবতার ভক্তি ও বিশ্বাসের আধার। তবে তা বৈষ্ণব ভাব প্রভাবিত বলে রচনায় রুচি ও সংযম বিদ্যমান।

মাধবাচার্য রচিত 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্য এই ধারার সবচেয়ে প্রাচীন কাব্য বলে মনে করা হয়। এই মাধবাচার্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মাধবাচার্য বলে ইতিহাসকারের ধারণা। কবি সতের শতকে বর্তমান ছিলেন।

পরবর্তী কালের কবিগণের মধ্যে **দ্বিজ গৌরাঙ্গ** 'গঙ্গামঙ্গল' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে জয়রাম রচিত 'গঙ্গামঙ্গল', **দ্বিজ কমলাকান্ত** রচিত 'গঙ্গার পাঁচালী', **দুর্গাপ্রসাদ মুখুটি** রচিত 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দুর্গাপ্রসাদের কাব্যটি এ জাতীয় কাব্যের মধ্যে বৃহত্তম। এতে কবির বাস্তবদৃষ্টি ও সরসতার পরিচয় বিদ্যমান।

গৌরীমঙ্গল

গৌরীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম রচয়িতা **পৃথ্বীচন্দ্র**। কবি আত্মপরিচয় অংশে গ্রন্থ রচনার কাল ১২১৩ সন বলে উল্লেখিত হয়েছে। কবি ত্রিবেদী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ। বিশাল আকারে রচিত 'গৌরীমঙ্গল' পাঁচ খণ্ডে ৪১৯ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড পুরাণ অনুকরণে রচিত। দ্বিতীয় অবন্তী খণ্ড, তৃতীয় যুদ্ধ খণ্ড, চতুর্থ নীতি খণ্ড এবং পঞ্চম স্বর্গ খণ্ড। কাব্যটিতে অবন্তী নরপতি শালবাহন এবং তাঁর পুত্র জীমূতবাহনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কবি তাঁর কাব্যে বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন কাব্য ও কবিদের কথা উল্লেখ করেছেন। এসব দেখে কবির মনে কাব্যরচনার উৎসাহ জাগে। তাই তিনি লিখেছেন :

মূর্খের স্বভাব মনে করিল রচন।
দোষ না লইবে কেহ গুণবান জন ॥

কবির অপর কাব্যের নাম 'ভূষণ্ডী রামায়ণ'।

আঠার শতকের শেষ ভাগের কবি **নিবারণ সেন** মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর কাহিনি অবলম্বনে 'গৌরীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন।

দুর্গামঙ্গল

'দুর্গামঙ্গল' পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত। তবে এতে কোন সুনির্দিষ্ট কাহিনি অনুসরণ করা হয় নি। দুর্গামঙ্গল কাব্যের আদি কবি হিসেবে **ভবানীপ্রসাদ রায়কে**

বিবেচনা করা হয়। কবি জন্মান্ধ ছিলেন। সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদে তাঁর কৃতিত্ব বিদ্যমান। কবির বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলায়।

কবি **রূপনারায়ণ ঘোষ** মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। সতের শতকের শেষ ভাগে কবি জীবিত ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার কবি। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে কবির পারদর্শিতা ছিল। তিনি ব্রজবুলিতেও কিছু পদ রচনা করেছিলেন।

'তর্কপঞ্চানন' ও 'কবিকেশরী' উপাধিধারী **রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** আঠার শতকের শেষ ভাগে 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন।

পঞ্চাননমঙ্গল

ব্যাধির অধিদেবতা পঞ্চাননের মর্ত্যে পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যকলাপ অবলম্বনে পঞ্চাননমঙ্গলের কাহিনি রূপায়িত হয়ে উঠেছে। 'পঞ্চাননমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা দ্বিজ রঘুনন্দন। কাব্যের কাহিনিতে অনেক আধুনিক নামের উল্লেখ রয়েছে। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতি অনুসারে এ কাব্যে একটি বারমাস্যা সংযোগ করা হয়েছে। আখ্যান-বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদের সংযোজন ঘটেছে। কাব্যের কাহিনি বর্ণনায় লোকসাহিত্যের অনুরূপ বাগভঙ্গি লক্ষ করা যায়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। 'মঙ্গলকাব্যগুলি বাহ্যত দেবকাহিনি বটে, কিন্তু স্বরূপত বাঙালি জীবনেরই ইতিকথা।'—এই উক্তির আলোকে মঙ্গলকাব্যের মানবিক রসের পরিচয় দাও।

২। মঙ্গলকাব্যের পটভূমিতে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মাদর্শের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ও সমালোচনামূলক নিবন্ধ রচনা কর।

৪। মঙ্গলকাব্যের যে কোন একটি শাখার উদ্ভব ও বিকাশধারা আলোচনা কর।

৫। মঙ্গলকাব্য প্রধানত কয়টি বিভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক ধারার প্রতিনিধিস্থানীয় কবির অবদান সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।

৬। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও পটভূমিকা আলোচনা করিয়া মনসামঙ্গল কাব্যধারার পরিচয় দাও।

৭। 'মঙ্গলকাব্যের ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনির আড়ালে লৌকিক জীবনের ধারাই প্রবহমান'—বুঝাইয়া দাও।

৮। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার প্রধান ধারা ও মুখ্য কবিদিগের পরিচয় দাও।

৯। 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতি দেবদেবীর মহিমাকীর্তনের জন্য মধ্যযুগে যে সকল কাব্য রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে মানুষের মহিমাও প্রকটিত হইয়াছে, এমন কথা কোন কোন সমালোচক বলিয়া থাকেন। এ ধরনের কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া সমালোচকগণের অভিমতের সত্যাসত্য যাচাই কর।

১০। কেহ কেহ মঙ্গলকাব্যগুলিকে 'বাঙালি জীবনের মহাকাব্য' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এ ধারার কাব্য বিশ্লেষণ করিয়া তুমি মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

১১। মঙ্গলকাব্য কাহাকে বলে? চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন রচয়িতার উল্লেখ করিয়া এ শাখার শ্রেষ্ঠ কবির পরিচয় দাও।

১২। 'কালিকামঙ্গল নামত মঙ্গলকাব্য, স্বরূপত প্রণয়োপাখ্যান।'—অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে ইহার রূপগত ও রসগত পার্থক্য নিরূপণ করিয়া অতি সংক্ষেপে এই শাখার যে-কোন দুজন প্রধান কবির কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

১৩। 'মনসামঙ্গলে পাই নিয়ন্তা ও নিয়তির বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহের কাহিনি। দেবানুগ্রহজীবী সমাজে এ বিদ্রোহ নিশ্চিতই মুসলিম প্রভাবজাত।'—মনসামঙ্গল কাহিনির বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি পরীক্ষা কর।

১৪। 'মনসামঙ্গলে আমরা দেবতা ও মানুষের দ্বন্দ্বসংগ্রামের কাহিনি পাই। দেবাশ্রিত সমাজে এ নিশ্চিতই তুর্কিপ্রভাব প্রসূত।'—এ প্রভাবের স্বরূপ কি?

১৫। 'মঙ্গলকাব্যে আমরা দেবকাহিনির আবরণে সমকালীন বাংলা ও বাঙালির অন্তরঙ্গ পরিচয়ই বিধৃত দেখতে পাই।'—এই মন্তব্যের আলোকে যে কোন একটি শাখার মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

১৬। 'মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য (রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত) এবং মঙ্গলকাব্য উভয়ই দেবনির্ভর, কিন্তু মঙ্গলকাব্যে দেবতা অপেক্ষা মানবের প্রতিই কবির পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। এমন কি দেবচরিত্রও দৈবীমাহাত্ম্য হারিয়ে লৌকিক গুণে ভূষিত হয়েছে।'—উক্তিটি আলোচনা করিয়া উহার সত্যতা নিরূপণ কর।

১৭। ভারতচন্দ্রকে কেহ কেহ সন্ধিযুগের কবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই উক্তি কতখানি যুক্তি নির্ভর তাহা আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

১৮। চণ্ডীমঙ্গল কিংবা ধর্মমঙ্গলের প্রধান কবিগণের নামোল্লেখ করিয়া এই শাখার মঙ্গল কাব্যের কাহিনিগত ও রসগত বিশিষ্টতা বর্ণনা কর।

১৯। 'মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবদেবীর কাহিনি যতই প্রত্যক্ষ হোক না কেন, আসলে মানবধর্ম ও সামাজিক বোধই এসব রচনার মর্মকথা।'—বুঝাইয়া দাও।

২০। 'মঙ্গলকাব্যগুলির কাব্যমূল্য যেমনই হোক না কেন, মধ্যযুগের বাঙালি-সমাজের একটা বৃহৎ অংশের বাস্তব ছবি হিসাবে ইহাদের মূল্য অপরিসীম।'—এই মন্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য? বাঙালি সমাজের চিত্র কোন মঙ্গলকাব্যে অধিকতর স্পষ্ট? বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের পরিচয় দান প্রসঙ্গে আলোচনা কর।

২১। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার বিকাশের ইতিহাস বিবৃত কর এবং এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবির কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।

২২। 'মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশের কারণ সমকালীন সমাজের মধ্যে নিহিত।'—এই উক্তির যৌক্তিকতা বিচার কর।

২৩। বৌদ্ধমত প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া ধর্মমঙ্গল পাঁচালির কাহিনিগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

২৪। মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনির ঐতিহাসিক তাৎপর্য বর্ণনাসূত্রে একজন প্রধান মনসামঙ্গলের কবির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২৫। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশের ধারা আলোচনা কর।

২৬। 'মঙ্গলকাব্যের বিস্ময়কর জনপ্রিয়তার কারণ শুধু ধর্মীয় নয়, সাহিত্যিকও বটে।'—বাংলা মঙ্গলকাব্য-ধারার যে-কোন একটির পরিচয় দান প্রসঙ্গে উক্তিটি বিচার কর।

২৭। টীকা লিখ : চৌতিশা, নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, বংশীবদন, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, চাঁদ সদাগর, ভাঁড়ু দত্ত, ধর্মমঙ্গল, রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ঘনরাম চক্রবর্তী, সাবিরিদ খান, রামপ্রসাদ, ভুরসুট, বিদ্যাসুন্দর, হীরামালিনী, মানসিংহ।

দ্বাদশ অধ্যায়

নাথসাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে নাথধর্মের কাহিনি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা কাব্য নাথসাহিত্য নামে পরিচিত। এ দেশে প্রাচীন কাল থেকে শিব উপাসক এক শ্রেণির যোগী সম্প্রদায় ছিল, তাদের আচরিত ধর্মের নাম নাথধর্ম। হাজার বছর আগে ভারত জুড়ে এ সম্প্রদায়ের খ্যাতি ছিল। তাঁদের গতিবিধির ব্যাপকতার জন্য সারা ভারতে তাঁদের কীর্তি ও কাহিনি ছড়িয়ে আছে। নাথ অর্থ প্রভু, দীক্ষান্তে এই নাথ পদবী তাঁরা নামের শেষে যুক্ত করতেন। অলৌকিক ক্ষমতায় তাঁরা ছিলেন সিদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে শৈবধর্ম মিশে এ ধর্মমতের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। বিশেষ সাধনপ্রক্রিয়া দ্বারা মোক্ষ লাভ করা এ ধর্মাবলম্বীদের লক্ষ্য। অন্যান্য ধর্মাদর্শের ন্যায় এই সাধকগণ দেহান্তে মুক্তির পরিকল্পনা করেন নি;—অশুদ্ধ, মায়া-বিমুক্ত, ধ্বংসরহিত পক্কদেহে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দেহে মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করাই তাঁদের জীবনমুক্তির আদর্শ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, 'নাথপন্থ যে বৌদ্ধ মন্ত্রযান হইতে উদ্ভূত বা প্রভাবিত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই নাথপন্থ বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার শূন্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে সাহিত্যরচনার যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল নাথসাহিত্য সৃষ্টির পেছনে তা কাজ করেছে।

অ-বিদ্যা বা অ-জ্ঞান মানুষের তত্ত্বজ্ঞানের বাধা বলে অবিদ্যা দূর করে মহাজ্ঞান লাভের মাধ্যমে বাসনাক্ষয় নাথগণের লক্ষ্য ছিল। এই মহাজ্ঞান তাঁদের অজর অমর করে। সাধনার সাহায্যে দেহ পরিশুদ্ধ করে মহাজ্ঞান লাভের যোগ্য করলে তাকে বলে পক্কদেহ। এই দেহেই ঘটে শিবশক্তির মিলন। শিবকে তাঁরা আদিগুরু বলে বিবেচনা করেন। তাই শিব হলেন আদিনাথ। তাঁর শিষ্য মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। এই মীননাথই নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ। শিবের অপর শিষ্য হাড়িপা বা জালন্ধরিপা এবং হাড়িপার শিষ্য হলেন কানুপা বা কাহ্নপাদ। এই চারজন সিদ্ধাচার্যের মাহাত্ম্যসূচক অলৌকিক কাহিনি অবলম্বনেই নাথসাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মমতে উল্লেখিত চুরাশি সিদ্ধার মধ্যে এই নাথসিদ্ধারাও রয়েছেন। চর্যাগীতিকার পদে ও টীকায় নাথধর্ম ও নাথগুরুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় সাত শতকের মধ্যভাগে মনে করেন। অবশ্য এ সম্পর্কে মতানৈক্য থাকলেও দশ-এগার শতকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাথাচার্যদের অবির্ভাব ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। এ সময়ই নাথধর্ম বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত। হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানে নাথপন্থীরা সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হতে থাকে এবং তারা হিন্দুরূপে পরিচয় দিতে আগ্রহশীল হয়। ক্রমে নাথ সম্প্রদায়ের বিপর্যয়ের পরিণামে 'যুগী বা নাথ উপাধিধারী তথাকথিত নিম্ন শ্রেণির হিন্দুসমাজের মধ্যে এই ধর্মের অবশেষ লাভ করেছিল।' মীননাথ ও গোরক্ষনাথ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও কাহিনির মধ্যে অলৌকিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

নাথধর্মের শ্রেষ্ঠ যুগেই সম্ভবত নাথসাহিত্যের বিকাশ হয়। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা, ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের ঠিক জীবদ্দশাতে না হলেও তাঁদের অব্যবহিত পরে এ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। তবে আঠার শতকের আগে লেখা নাথসাহিত্যের কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি। নাথসাহিত্যের কাল সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'আদিনাথ-মীননাথ কাহিনির শুরু আট শতকে এবং মীননাথ-গোরক্ষনাথ কিংবা হাড়িপা-কানুপার কাহিনির উদ্ভব তার পরে পরেই। এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও মাণিকচাঁদ ময়নামতী গোপীচাঁদ কাহিনি দশ শতকের আগেকার নয়। অতএব, আট-দশ শতকে কায়া সাধনার রূপক কাহিনি মুখে মুখে চালু ছিল। ষোল শতকের মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনি 'গোরক্ষবিজয়' রূপে লিখিত রূপ পায়। গোপীচাঁদ গানও সতের আঠার শতকে লিখিত পাঁচালিতে স্থিতি পায়, কিন্তু মাণিক-ময়নামতী গাঁথা লোকসাহিত্য রূপে বিশ শতকেই সংগৃহীত ও মুদ্রিত হয়।' মৌখিক নাথসাহিত্যের ভাষা আঞ্চলিক ও আধুনিক।

নাথপন্থ বাংলাদেশের বাইরে সম্প্রসারিত হলেও এদেশের সঙ্গে নাথযোগীদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। বাংলা ভাষায় নাথপন্থ সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনার এটাই প্রধান কারণ। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেছেন—যে সকল তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণির হিন্দু তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তাদের হিন্দুজীবনের ঐতিহ্যরূপে ঐ সকল আখ্যায়িকা পরবর্তীকালেও সমাদৃত ও সংরক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সেসব সাহিত্য নিদর্শন তার যথাযথ ভাষারূপ নিয়ে বর্তমান থাকে নি। তাই নাথসাহিত্যের ভাষা অর্বাচীন। চর্যাপদের সমসাময়িক কালে এগুলোর সৃষ্টি। চর্যাপদ লিখিত ছিল বলে তাতে ভাষার প্রাচীন রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু নাথসাহিত্য সৃষ্টির পর মুখে মুখে প্রচলিত ছিল এবং লিখিতরূপ লাভ করেছে বহু পরে। তাই এর ভাষায় প্রাচীনত্বের নিদর্শন বর্তমান নেই। মৌখিক ভাবে প্রচলিত নাথসাহিত্যের ভাষা আঞ্চলিক ও আধুনিকতার পরিচয়বাহক। তবে সাহিত্যে বিধৃত কাহিনির মধ্যে হাজার বছর আগেকার জীবন-চেতনা, জীবনযাত্রা, সমাজ ও সংস্কৃতির বেশ কিছু নিদর্শন ও আভাস লক্ষ করা যায়।

নাথধর্মের সম্প্রসারণের কালে নাথসাহিত্যের যেসব নিদর্শন সৃষ্টি হয়েছিল তার কোন অস্তিত্বই আবিষ্কৃত হয় নি। পুরানো আমলে তা সৃষ্টি হলেও মুখে মুখে গীত হয়ে তা আধুনিক কালে চলে এসেছে। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন (১৮৫১-১৯৪১) উত্তরবঙ্গের কৃষকদের মুখ থেকে নাথসাহিত্যের যে কাহিনি সংগ্রহ করেছেন তার ভাষা অর্বাচীন কালের। অবশ্য ড. দীনেশচন্দ্র সেন নাথসাহিত্যের অন্যতম শাখা 'ময়নামতীর গানে'র ভাষা সম্পর্কে বলেছেন যে তা পূর্ববর্তী যুগের প্রাকৃত-প্রধান বাংলা। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে এগুলোকে আদৌ প্রাচীন বলে মনে হবে না। নাথসাহিত্যে বিধৃত কাহিনি বহুকাল থেকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও ভাষা আধুনিক যুগের, যেসব শব্দ প্রাচীন মনে হয় তা আঞ্চলিক শব্দ। বিষয়বস্তুর প্রাচীনতার জন্য কেউ কেউ নাথসাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যের আদি যুগে স্থান নির্ধারণ করেছেন; কিন্তু ভাষার অর্বাচীনতার জন্য একে মধ্যযুগের অন্তর্গত বলে অনেকে বিবেচনা করেন।

নাথসম্প্রদায়ের জন্যই নাথসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। নাথধর্মের সাধনতত্ত্ব ও প্রাসঙ্গিক গল্পকাহিনি এতে বিধৃত। কিন্তু পরবর্তী কালে এর বিশেষ সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য দূর হয়ে যায় এবং তার মানবিক ভাবের বিকাশ ঘটে। তাতে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের কাছে সমাদৃত হয়। নাথসাহিত্য প্রকৃত পক্ষে গীতিকা বা ব্যালাড হিসেবে প্রচলিত। এগুলো লোকসাহিত্যধর্মী রচনা, শিল্প সাহিত্যধর্মী নয়। ড. সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'যোগী-সিদ্ধাদের পুরাণকথা সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তাহা কখনই পূর্ণ পাঁচালি কাব্যের আকার পায় নাই। আর সে সব কাহিনিতে গৃহস্থকল্যাণের কোন ইঙ্গিতই না থাকায়, বরং বিপরীত ভাব থাকায়, 'মঙ্গল' নাম পাইতে পারে না। সুতরাং শেষ অবধি গাথা-ছড়ার রূপেই এগুলি আমাদের দিন পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।'

নাথগীতিকার উপকরণ ও ভাষার ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, 'পরবর্তী সাহিত্যে বঙ্গভাষার উপরে সংস্কৃত শব্দের যে সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, এই সকল গাথায় তাহার চিহ্নমাত্র নাই। চিরপরিচিত বঙ্গকুটির, মেয়েলি ছড়া, প্রাচীন প্রবাদবাক্য এই সমস্ত গাথার প্রাণ স্বরূপ এবং ইহাতে বঙ্গীয় কাব্যশ্রী সামান্য বসন পরিহিতা বঙ্গীয় পুর-স্ত্রীর মতই অনাড়ম্বর ভাবে আমাদিগকে দর্শন দিতেছে।'

নাথসাহিত্যে আদিনাথ শিব, পার্বতী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা, ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের কাহিনি স্থান পেয়েছে। এ সব কাহিনি দু ভাগে বিভক্ত; একটিতে আছে সিদ্ধাদের ইতিহাস এবং গোরক্ষনাথ কর্তৃক মীননাথকে নারীমোহ থেকে উদ্ধার; অপরভাগে আছে রানী ময়নামতী ও তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনি। প্রথমটি গোরক্ষবিজয়, অপরটি ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান নামে পরিচিত। প্রথমটিতে ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা প্রাধান্য পেয়েছে। অপরটিতে ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার চেয়ে কাব্যগুণ প্রাধান্য লাভ করেছে। গোরক্ষবিজয়ের কাহিনি জীবন-বিমুখ। ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নাথপন্থীদের এ কাহিনি গঠন করতে হয়েছিল বলে এই বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। তবে গোরক্ষবিজয়ের চেয়ে ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানে মানবিক আবেদন অপেক্ষাকৃত বেশি।

গোরক্ষবিজয়ের কাহিনি

আদ্যদেব-আদ্যাদেবী কর্তৃক দেবতারা সৃষ্ট হলে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কানুপা—এই চারজন সিদ্ধার জন্ম হয়। এর পর জন্মান গৌরী। আদ্যদেবের আদেশে শিব গৌরীকে বিয়ে করে মর্ত্যলোকে চলে আসেন। চার সিদ্ধা জন্মেই যোগাভ্যাসে মগ্ন হলেন। গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কানুপা হাড়িপার ভৃত্যরূপে পরিচর্যা করতে লাগলেন।

একদা ক্ষীরোদসাগরে জলের ওপর টঙে বসে গৌরী যখন শিবের কাছ থেকে মহাজ্ঞান শুনছিলেন তখন মীননাথ মাছের রূপ ধরে বা মাছের পেটে থেকে সে মহাজ্ঞান শুনে ফেললেন। এ ছলনার কথা জানতে পেরে গৌরী তাঁকে মহাজ্ঞান বিস্মৃত হওয়ার অভিশাপ দিলেন। শিব রইলেন গৌরীকে নিয়ে কৈলাসে। চার সিদ্ধা চারদিকে চলে গেলেন। হাড়িপা গেলেন পূর্বদেশে, কানুপা দক্ষিণে, গোরক্ষনাথ পশ্চিমে এবং মীননাথ উত্তরে। গৌরীর ইচ্ছা সিদ্ধারা বিয়ে করে সংসার করুন। শিব জানালেন তাঁদের কাম

নেই, তাঁরা বিয়ে করবেন না। গৌরী তাঁদের পরীক্ষা করতে চাইলেন। শিব ধ্যানযোগে সিদ্ধাদের ডেকে আনলেন। গৌরী মোহিনীরূপে অন্ন পরিবেশন করতে গেলেন। এতে মীননাথ হাড়িপা কানুপা তিন জনেরই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটল, কেবল গোরক্ষনাথের মনে দেবীকে দেখে শিশুভাব জাগল। দেবী তখন অভিশাপ দিলেন। দেবীর অভিশাপে মীননাথ কদলীর দেশে গিয়ে ষোলশত রমণীসহ বিলাসে মত্ত রইলেন। হাড়িপা রানী ময়নামতীর পুরীতে হাড়ির কাজ নিলেন। কানুপা ডাহুকের দেশে বধূ নিয়ে ক্রীড়া করতে গেলেন। গোরক্ষনাথকে দেবী নানাভাবে কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমেও আদর্শচ্যুত করতে পারলেন না।

গোরক্ষনাথ একদিন বকুলতলায় বসেছিলেন। তখন আকাশপথে কানুপা উড়ে যাচ্ছেন। তাঁর ছায়া গোরক্ষনাথের গায়ে পড়লে তিনি ক্রোধে পাদুকা ছুঁড়লেন। পাদুকা কানুপাকে ধরে নিয়ে এল। কানুপা বললেন, তুমি বড় সিদ্ধা হয়েছ, তোমার গুরু কদলীর নারীদের মোহে জরাজীর্ণ, তাঁর আয়ু মাত্র তিন দিন। গোরক্ষনাথ জানালেন, তোমার গুরু ময়নামতীর পুত্র রাজা গোপীনাথ কর্তৃক মাটির তলায় বন্দী। তখন দুজন চললেন নিজ নিজ গুরু উদ্ধারে।

গোরক্ষনাথ যমালয়ে গিয়ে গুরু মীননাথের আয়ুর হিসাব কেটে দিলেন। তারপর কদলীদেশে প্রথমে ব্রাহ্মণবেশে এবং পরে যোগীবেশে মীননাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। মীননাথ তখন দুই পাটরানী ও ষোলশত সেবিকা নিয়ে মগ্ন। নর্তকী ছাড়া আর কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে না। অগত্যা গোরক্ষনাথ নর্তকীবেশে সভায় প্রবেশ করে মাদল বাজিয়ে নৃত্য শুরু করলেন। গোরক্ষনাথ মাদলের বোলে মীননাথকে পূর্বের কথা স্মরণ করালেন এবং আত্মজ্ঞান দিলেন। তাতেও চৈতন্য না হলে তাঁর কানে কানে গানের মাধ্যমে মহাজ্ঞান পৌঁছিয়ে দিলেন। কিন্তু মীননাথের চৈতন্য হলেও মোহ কাটে না। গোরক্ষনাথ মীননাথের পুত্রকে আছড়িয়ে মেরে আবার জীবিত করে তুললেন। এতে মীননাথের পূর্ণ চৈতন্য হল। এদিকে কদলীরমণীরা মীননাথকে ছাড়তে রাজি নয়। তারা গোরক্ষনাথকে মেরে ফেলতে চাইল। গোরক্ষনাথ শাপ দিয়ে তাদের বাদুড় করে ফেললেন। তারপর গুরুকে নিয়ে বিজয়নগরে ফিরে এলেন।

গোরক্ষবিজয়ে দেবতার স্থান নেই। এখানে গোরক্ষনাথ নিজেই দেবতার আসন গ্রহণ করেছেন। তাই এতে অলৌকিকতা ও আজগুবি কাহিনির ছড়াছড়ি।

ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান

ত্রিপুরার অন্তর্গত মেহেরকুলের রাজা মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতী ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্যা এবং মহাজ্ঞানের অধিকারিণী। তিনি স্বামীর অকালমৃত্যুর কথা জেনে তাঁকে মহাজ্ঞান দিতে চান। কিন্তু রাজা সম্মত না হওয়ায় যমদূতের কবলে পড়ে অকালে মারা গেলেন। যমপুরীতে গিয়ে ময়নামতী মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু শিব তাঁকে নিরস্ত করে বললেন যে রাজা মাণিকচন্দ্র আর ফিরে আসবেন না। তবে ময়নামতী পুত্রবতী হবেন। সে পুত্র যদি হাড়িপার শিষ্য হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ না করেন তবে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটবে। যথাসময়ে পুত্র গোপীচন্দ্রের জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ময়নামতী পুত্রকে অদুনা-পদুনা নাম্নী দুই রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দিলেন। গোপীচন্দ্র স্ত্রীদের নিয়ে ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে রইলেন। ময়নামতী জানেন পুত্রকে হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে

সন্ন্যাসী হতে হবে, নইলে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটবে। তাই হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য পুত্রকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু তরুণ যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণে গোপীচন্দ্র সম্মত নন। তাঁর স্ত্রীরাও প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগলেন। এমন কি তাঁরা ময়নামতীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। স্ত্রীদের প্ররোচনায় গোপীচন্দ্র মায়ের সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলল যে মায়ের সঙ্গে হাড়িপার অবৈধ সম্পর্ক আছে। তখন ময়নামতী নিজের সতীত্বের প্রমাণ দেওয়ার জন্য কঠোর পরীক্ষা দিলেন এবং তাতে তাঁর সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ দূর হল। অবশেষে বহু বাধাবিপত্তি কাটিয়ে মায়ের নির্দেশে গোপীচন্দ্র হাড়িপার কাছে মন্ত্র নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। হাড়িপা তাঁকে নিয়ে সংসার ছেড়ে গেলেন এবং হীরা নটীর গৃহে বাঁধা দিয়ে চলে এলেন। সেখানে বহু কষ্টে তাঁর দিন কাটতে লাগল। অবশেষে সন্ন্যাস জীবনের সময় অতিবাহিত হলে হাড়িপা তাঁকে নটীর কবল থেকে উদ্ধার করে আনলেন এবং সাধনার সাফল্যের জন্য মহাজ্ঞান দান করলেন। সন্ন্যাসী গোপীচন্দ্র এরপর গৃহে ফিরে এসে স্ত্রীদের নিয়ে মহাসুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। হাড়িপার শিষ্য হয়ে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনের জন্য আর গোপীচন্দ্রের অকালে মৃত্যু ঘটল না।

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাহিনি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'যে সমাজের পটভূমিকায় কাহিনিটি বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা হিংস্র, ক্রূর, বর্বরোচিত প্রবৃত্তির অমার্জিত উচ্ছ্বাসে অসংবৃত ভোগ-লালসায়, শৈশবসুলভ উদ্ভট কল্পনার আতিশয্যে এবং সমাজ ও পরিবার-জীবনের রূঢ়, সুষমাহীন ছন্দে এক অর্ধ-সভ্য, অপরিণত সংস্কৃতি ও জীবনবোধেরই পরিচয় বহন করে। এই অশিক্ষিত, আদিম সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ হইতেও যে এরূপ উন্নত, যথাযথ ভাব প্রকাশক্ষম, সূক্ষ্ম তত্ত্ব পরিস্ফুট করিতে নিপুণ, কাব্যগুণসমৃদ্ধ রচনার প্রেরণা আসিয়াছে ইহাই বাঙালি জীবনের এক চিরন্তন বিস্ময়।'

নাথসাহিত্যের কবিগণ

নাথধর্ম সংক্রান্ত গল্পকাহিনি নিয়ে যেসব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল। ১৮৭৮ সালে প্রথমবার স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন রংপুর থেকে সংগৃহীত একটি গীতিকা 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নাম দিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 'ময়নামতীর গান', 'গোপীচন্দ্রের গান,' 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে একই কাহিনিভিত্তিক পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ শেখ ফয়জুল্লাকৃত 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের পুঁথি আবিষ্কার করে প্রকাশ করেছেন। 'গোর্খবিজয়' নামে অন্য একটি পুঁথি পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত হয়েও প্রকাশিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থ থেকে নাথসাহিত্যের পরিচয় লাভ করা যায়।

গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনি অবলম্বনে রচিত যে সব কাব্য সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো হল : ১. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত কবি শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়', ২. ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি শ্যামদাস সেনের 'মীনচেতন' এবং ৩. ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত কবি ভীম সেনের 'গোর্খবিজয়'। এই তিনটি কাব্যের কবিরা স্বতন্ত্র না একই ব্যক্তি—এ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বিভিন্ন নামে প্রকাশিত এ সব ভণিতার মধ্যে কোন ঐক্য নেই। কবীন্দ্র, শেখ

ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেনের ভণিতা বিক্ষিপ্ত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন, 'গোরক্ষবিজয়ের কবি (অথবা প্রাচীন গায়ক) পাইতেছি অন্তত তিনজন—ভীমসেন রায়, শ্যামদাস সেন ও ফয়জুল্লা। শ্যামদাস সেন ও ফয়জুল্লার রচনার মধ্যে ঐক্য এতটা গভীর যে দুজনকে স্বতন্ত্র কবি মনে করা দুরূহ।' ড. দীনেশচন্দ্র সেন কবি শেখ ফয়জুল্লাকে সংকলক মাত্র মনে করেছেন। আবার ড. পঞ্চানন মণ্ডলের মতে—ফয়জুল্লা, শ্যামদাস সেন বা ভীমসেন কেউ-ই কাব্যের রচনাকার নন—তাঁরা গোরক্ষগীতিকার গায়কমাত্র।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বিভিন্ন মতামত পর্যালোচনা করে লিখেছেন, 'নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে গোরক্ষবিজয় বা গোর্খবিজয়ের কবি শেখ ফয়জুল্লা ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না।' এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে সকল বিতর্ক অবসানের জন্য যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'শেখ ফয়জুল্লার সুপ্রচারিত গ্রন্থের নাম 'গোর্খবিজয়' বা 'গোরক্ষবিজয়'। ইহার যে কয়খানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ গ্রন্থে শ্যামদাস, ভীমদাস ও কবীন্দ্রদাসের দুই একটি ভণিতার সহিত ফয়জুল্লার ভণিতা থাকায় কেহ কেহ মনে করেন, মূল পুঁথি কবীন্দ্রের রচনা। এই ধারণা ভুল। সমস্ত পুঁথির অধিকাংশ ভণিতা এবং তিন চারিখানা পুঁথির সমুদয় ভণিতা শেখ ফয়জুল্লার হওয়ায়, মূল পুঁথিখানি যে ফয়জুল্লার রচনা, সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা অতিরিক্ত পাকামির পরিচায়ক, অথবা মুসলমানের নাম প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হইতে বাদ দিবার প্রয়াস মাত্র। শেখ ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয়ের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভণিতা এইরূপ :

কবীন্দ্র বচন শুনি ফয়জুল্লাএ ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর চরিত্র দিল বুঝাইয়া ॥

ইহা হইতে দেখা যায়, কবীন্দ্রের মুখে গল্প শুনিয়া কবি ফয়জুল্লা তাঁহার কাব্যটি রচনা করিয়াছেন। ভীমদাস ও শ্যামদাস নিশ্চয় এই কাব্যের পরবর্তীকালের অনুলেখক বা গায়ক। নিজেদের নাম কাব্যের সহিত যুক্ত করিয়া রাখার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা মাঝে মাঝে ভণিতায় নিজেদের নাম জুড়িয়া দিয়াছেন।'

শেখ ফয়জুল্লার কাব্যের নাম সম্পর্কেও সমস্যা আছে। কবি কোথাও উল্লেখ করেছেন—'সমাপ্ত হইল জল মীনের চেতন', কোথাও আছে—'গোর্খ বিজয় এ পুস্তক সমাপ্ত', কোথাও উল্লেখিত হয়েছে—'ইতি মীননাথ চৈতন্য গোরক্ষবিজয় সমাপ্ত।' এতে মনে হয় কাব্যের প্রকৃত নাম 'মীননাথ চৈতন্য গোরক্ষবিজয়।' তা সংক্ষেপে 'মীনচেতন' বা 'গোরক্ষবিজয়' নামে প্রচলিত রয়েছে।

শেখ ফয়জুল্লা রচিত পাঁচখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো হল : ১. গোরক্ষবিজয়, ২. গাজীবিজয়, ৩. সত্যপীর, ৪. জয়নালের চৌতিশা এবং ৫. রাগনামা। সম্ভবত ১৫৭৫ সালে সত্যপীর রচিত হয়েছিল। গাজীবিজয় রচিত হয়েছিল ১৫৭০ সালের দিকে। গাজীবিজয় ঐতিহাসিক কাহিনিকাব্য। 'জয়নালের চৌতিশা' মর্সিয়া শ্রেণির কাব্য। 'রাগনামা' সঙ্গীত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। রচনাবৈচিত্র্য সম্পর্কে শেখ ফয়জুল্লা তাঁর 'গাজীবিজয়' কাব্যে উল্লেখ করেছেন :

গোর্খবিজয় আদ্যে মুনিসিদ্ধা যত
কহিলাম সব কথা শুনিলাম যত।
খোটাদূরের পীর ইসমাইল গাজী
গাজীর বিজএ সেহ মোক হৈল রাজি।
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন।
মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন
শেখ ফয়জুল্লাহ ভণে ভাবি দেখ মন।

ড. মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, 'গোরক্ষবিজয় সত্যপীর কাহিনির পূর্ববর্তী রচনা। শেখ ফয়জুল্লা গোরক্ষবিজয়ের কাহিনি 'ভারত পাঁচালী' রচয়িতা কবীন্দ্রের মুখে শুনিয়া পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।' ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গোরক্ষবিজয়ে ব্যবহৃত আরবি শব্দের কথা উল্লেখ করে একে মুসলমানের রচনা বলে মন্তব্য করেছেন। গোরক্ষবিজয়ের বর্ণিত তত্ত্বকথার নমুনা :

দীপ নিবিলে জ্যোতি কোথা গিয়া রহে?
শরীর বিয়োগে প্রাণী কোথা যাই রহে?
শব্দ উঠিলে ধ্বনি রহে গিয়া কোথা?
কোন নালে আইসে প্রাণ কোন নালে যায়?
কোথায় বৈসে মন কোথায় পবন?

গোরক্ষবিজয় কাব্যের কাহিনিতে নাথবিশ্বাস-জাত যোগের মহিমা এবং নারী-ব্যভিচার-প্রধান সমাজচিত্রের বর্ণনা রূপায়িত হয়েছে। অনেকের মতে, এ কাব্যে শিল্প রচনার উদ্দেশ্য ছাপিয়ে ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার আগ্রহ বেশি ফুটে উঠেছে। তবে কাব্যের গাল্পিক আবেদন সর্বত্র বিদ্যমান। নাথসাধকেরা ছিলেন মূলত নিরীশ্বরবাদী, নিজের আত্মার মুক্তি নিজের সাধনা দ্বারা সম্ভব বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। সে জন্য দেবদেবীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নি। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যে একদিকে সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথের মায়ামোহবর্জিত নিস্পৃহ বৈরাগী মন এবং কর্তব্যকর্মে অবিচল নিষ্ঠা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে, আর একদিকে মীননাথের সাংসারিক মায়ামুগ্ধ বিড়ম্বিত চরিত্রটিও সুপরিকল্পিত হয়েছে। দেহের ওপর আত্মার জয় ঘোষণা করা নাথসাধকদের যে উদ্দেশ্য ছিল তা এ কাব্যে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, 'গোরক্ষবিজয়ের মত এরূপ অপূর্ব গ্রন্থ যে বঙ্গসাহিত্যের আদিযুগে রচিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের গৌরবের কথা। গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ শেফালিকা বা যূথিকার ন্যায় শুভ্র; তাহার চরিত্রমাহাত্ম্য বঙ্গ সাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান দিকনির্দেশক স্তম্ভ। ইহা বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চনীতি, গুরুভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে।...এই অপূর্ব পুঁথির গ্রাম্যভাষা ও রুচি যে পাঠককে শ্রান্ত ও ভগ্নোৎসাহ করিবে, তিনি সাহিত্যের এক মহার্ঘ খনির পরিচয় লাভে বঞ্চিত হইবেন।'

অন্যদিকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য গোরক্ষবিজয় সম্পর্কে নিষ্ঠুর মন্তব্য করে লিখেছেন, 'সাহিত্য বিচারে গোর্খবিজয় হইতেছে অন্ধ তমসাবৃত প্রেতরাজ্য। অতিমানবীয় জড়শক্তিই ইহার অধিপতি। এখানে স্নেহ নাই, প্রেম নাই, ভক্তি নাই, হৃদয়স্পন্দনের কোন চিহ্ন নাই, এই জগতে বহিঃপ্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বরের বিধান অস্বীকার করিয়া দৈহিক অমরতার লোভে নাথধর্ম এখানে স্থানু হইয়া বসিয়া আছে...এই জগতের জীবন দানবীয়, ভাষা হেঁয়ালী, উচ্চার্য ডাকিনীমন্ত্র। একটা অস্পষ্টতা ও রহস্যের ধূমল ছায়া ইহাকে হিমশীতল মৃত্যুপুরীতে পরিণত করিয়াছে।'

চরিত্রচিত্রণে কবিরা বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক কালের সাহিত্য সমালোচকগণও গোরক্ষনাথের চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত কবির স্বভাবপটুত্ব না থাকলে এরূপ আদর্শ চরিত্রের যথার্থ সঙ্গতি রক্ষা করা যেত না। গোরক্ষনাথের চরিত্রে উচ্চতম আদর্শ ও মহত্ত্ব লক্ষ করা যায়। তবে মীননাথের চরিত্রটি বেশি সার্থকতার দাবি করতে পারে। এই চরিত্রে মনস্তত্ত্বসঞ্জাত বিকাশ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব লক্ষণীয়।

গোরক্ষবিজয়কে লোকসাহিত্য হিসেবে বিবেচনা করা যায় কিনা সে সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। রচনা কর্কশ, মন ও মেজাজের দিক দিয়ে এতে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যরূপের চেয়ে লোকসাহিত্যের প্রভাব বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একে উচ্চতর কাব্যকলা ও সাহিত্যগুণের আদর্শে বিচার করা যায় না। লোকমত ও লোকসমাজে প্রচলিত এক ধরনের দেহঘটিত রহস্যবাদী চর্যার পটভূমিকায় এই সব কাহিনি রূপলাভ করেছিল।

রানি ময়নামতী ও তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে রচিত কতিপয় কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্রের গীত এক সময় শুধু সমগ্র বাংলাদেশেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তা নয় বরং বাংলার বাইরেও ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। গোরক্ষবিজয়ের কাহিনিতে নাথধর্মের রীতিনীতি ও তত্ত্বকথার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল বলে নাথসম্প্রদায়ের কাছেই এর আবেদন বেশি ছিল। কিন্তু ময়নামতী গোপীচন্দ্রের কাহিনিতে মানবরসের প্রাধান্য থাকাতে তা সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সমাদৃত হয়। এই কাহিনি অবলম্বনে রচিত গানের প্রথম সংগ্রহ করেন জর্জ গ্রীয়ার্সন ১৮৭৮ সালে রংপুর থেকে। এ সংগ্রহের নাম 'মাণিক রাজার গান।' ১৯০৭-১৯০৮ সালে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য রংপুর থেকেই তিন জন যোগীভিখারির কাছ থেকে সমস্ত পালাটি লিখে নেন। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গোপীচন্দ্রের গান' প্রথম খণ্ড এবং ১৯২৪ সালে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের গাথা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত; দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যান দুজন কবির রচনা। একজন ভবানীদাস ও অন্যজন শুকুর মহম্মদ। পরে শিবচন্দ্র শীল 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এ কাব্যের রচয়িতা দুর্লভ মল্লিক। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা থেকে ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গান' এবং শুকুর মহম্মদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

'ময়নামতী বা গোপীচাঁদের গান' কাব্যের রচয়িতাগণের মধ্যে দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস ও শুকুর মহম্মদের নাম উল্লেখযোগ্য। দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'

নামক কাব্যটিকে ড. সুকুমার সেন সবচেয়ে পুরাতন বলে উল্লেখ করেছেন। এ কাব্যের কাহিনিতে প্রাচীনত্ব আছে, বিশেষত এতে ধর্মপূজার সঙ্গে যোগীসিদ্ধাদের সাধনার সম্পর্ক যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। দুর্লভ মল্লিক সম্ভবত সতের-আঠার শতকের কবি।

কবি ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গান' ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভবানীদাসকে ড. সুকুমার সেন ত্রিপুরা অঞ্চলের লোক মনে করেছেন। লোকমুখে প্রচলিত ছড়া-পাঁচালী অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। কাব্যের ভণিতায় চার বার ভবানীদাসের নাম উল্লেখিত হয়েছে। রচনাটি ভবানীদাসের কিনা এ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'ময়নামতীর গান পড়িয়া হিন্দু ভবানীদাস যে পুস্তকের রচয়িতা নহেন, কিন্তু একজন মুসলমান ইহার রচয়িতা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি।' ভাবের দিক থেকে এ কাব্যে মুসলমানি ভাব, ভাষার দিক থেকে আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি বিবেচনা করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে ভবানীদাস গায়েনের নাম কিংবা মুসলমান কবির কল্পিত নাম হতে পারে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন, 'ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গানে' মুসলমান কবি বিলক্ষণ হাত চালাইয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে মূলগান মুসলমানের রচিত। তাহাতে ভবানীদাস নিজের নাম জুড়িয়া দিয়াছেন।' ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুমানকে অযৌক্তিক মনে করেন না।

শুকুর মহম্মদের কাব্যের নাম 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস'। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক শুকুর মহম্মদের কাল আনুমানিক ১৬৮৩ থেকে ১৭৫০ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁকে ত্রিপুরার কবি মনে করেন এবং তাঁর মতে আঠার শতকের গোড়ার দিকে এ কাব্য রচিত হয়। তাঁর মতে এটি ঐতিহাসিক কাহিনিকাব্য। কবি নিজের নাম সম্পর্কে বলেছেন :

আবদুল শুকুর নাম পিতাএ রাখিল।
শুকুর মোহাম্মদ নাম কিতাবে ঘুষিল ॥

ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী শুকুর মহম্মদের পুঁথি দিনাজপুর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। সে পুঁথি শতাধিক বৎসরের পুরাতন। কবির নিবাস বালুরঘাটে সিন্দুর-কুসুম গ্রামে ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। পুরাণ শুনে কবি এ কাব্য রচনা করেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি শুকুর মহম্মদের কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, 'কবির ভাষা প্রাঞ্জল। কিন্তু নারীর বেশভূষা ও রূপবর্ণনা করিবার সময় তিনি সংস্কৃত শব্দের লোভ ছাড়িতে পারেন নাই। অনেক শব্দের অপপ্রয়োগ করিয়াছেন, বর্ণনাও ব্যর্থ হইয়াছে। তথাপি তাঁহার রচনায় সংযম আছে; অন্যান্য কবির ন্যায় গ্রাম্যজনসুলভ অশ্লীলতা নাই। ভাষা দেখিলে কবিকে দুই একশত বৎসরের অধিক পুরাতন বোধ হয় না।' কবির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন :

কান্দিয়া উদুনা চলে রাজার শদনে।
নারির জৌবন প্রভু স্বামির কারণে ॥

স্বামি বিনে নারিলোকের নাহি জাতি কুল।
পতি বিনে নারী ধুতুরার ফুল ॥
বাতাসে ম্রিতিকার তির্ন্ন গগনে উড়ি তোলে।
পতিবিনে যুবতিক বাপ মাএ মন্দ বোলে ॥
উদুনা বোলেন স্বামি কহি তোমার স্থান।
শমুখ হৈয়া কহ কথা যুড়াউক প্রাণ ॥
তোমার শন্যাস স্বামি দেখিয়া নয়নে।
কেমনে ধরিব প্রাণ নারি চারি জনে ॥
শিশের শেন্দুর আমার নয়ানের কাজল।
তোমার শন্যাসে প্রভু সকল বিফল ॥

কবির কাব্যে সাংকেতিক তত্ত্বকথাও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন :

বাসাতে ছাও নাই সদায় উড়ে পড়ে
নগরেতে মনুষ্য নাই বসতি চালে চালে।
পুকুরেতে পানি নাই পাড় কেন ডোবে
অন্ধযে দোকান দেয় খরিদ করে কালে।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক সম্পাদিত 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনি নিয়ে রচিত 'গোপীচন্দ্র নাটক' নেপাল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। ড. সুকুমার সেন এর বিবরণ দিয়েছেন। নাটকটি ১৬২০ থেকে ১৬৫৭ সালের মধ্যে রচিত। নেপালি ভাষায় এ নাটক রচিত হলেও এর প্রধান কাহিনি গানে বিধৃত এবং সে গানের ভাষা বাংলা।

ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনি যে আমলে রচিত হয়েছিল সে সময় থেকে বহুকাল পরে তা সংগৃহীত হয়েছে। তবে মূল বৈশিষ্ট্য থেকে তা পরিবর্তিত হলেও গল্পাংশের মূল কাঠামোর পরিচয় পেতে অসুবিধা হয় না। গোপীচন্দ্রের গানের কাব্যগত আবেদন হৃদয়গ্রাহী। এদেশে ধর্মচেতনায় যে বৈরাগ্যবোধ সম্পর্কিত তার পরিচয় এতে পাওয়া যায়। গোপীচন্দ্রের জীবনে ত্যাগ-তিতিক্ষাময় সাধন-মহিমার সঙ্গে যৌবনে বিরাগী হওয়ার কারুণ্য যুক্ত হওয়ায় এই কাব্যের আবেদন হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। প্রচলিত কাব্যধারায় এই আখ্যায়িকামূলক কাব্য কাঠামো একটি নতুনতর রূপবৈচিত্র্য সংযোজন করেছে। সমালোচকের মতে, 'কাহিনি-গ্রন্থন, চরিত্র-কল্পনা, কিংবা জীবনদৃষ্টির অভিনবতার বিশেষ কোন কাব্যিক উৎকর্ষ—এই সকল সাহিত্যে এ সবকিছুই প্রত্যাশা করা অন্যায়। তবু দুটি পরিচ্ছন্ন-রূপকাহিনির মাধ্যমে সেকালের জনজীবন-বেদনাকে উল্লেখ্য মুক্তি দিতে পেরেছে, এইটুকুই এই শ্রেণির রচনার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।' গোপীচাঁদের কাহিনিতে বৈরাগ্য ও জীবনস্পৃহার যে বেদনাতুর সমাবেশ ঘটেছে তা অর্বাচীনতার খোলসেও আকর্ষণ হারায় নি। তাই বাংলাদেশের বাইরেও এ কাহিনি সমাদৃত। তৎকালীন লোকজীবনের সার্থকতার প্রতিফলনের জন্যও এর গুরুত্ব কম নয়।

নাথদর্শন যোগীসমাজে জীবন্ত চর্যা ও মোক্ষ সাধনা রূপে প্রচলিত থাকায় গোরক্ষবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গানের বাইরেও অনেক পদ, প্রহেলিকা ও রূপক কবিতা প্রচলিত আছে। পরবর্তী পর্যায়ে এ ধরনের কিছু ছড়া-কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। ড. পঞ্চানন মণ্ডল এ ধরনের কিছু পদ সংগ্রহ করে তাঁর সম্পাদিত 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের পরিশিষ্টে সংযোজন করেছেন। সেগুলোতে আছে ১. যোগীর গান, ২. যুগীকাচ, ৩. গোর্খ সংহিতা, ৪. যোগচিন্তামণি। এসব সংগ্রহের কোনটি মুসলিম কবির রচিত বলে তাতে ইসলামি শব্দের বাহুল্য ব্যবহার রয়েছে। কোন কোন পদকর্তা রাধাকৃষ্ণের রূপকে এই সাধনপ্রণালী ব্যাখ্যা করেছেন। যোগ সাধনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকলেও কোথাও কোথাও গোপিনীর বেদনা করুণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন :

যোগীহারা হয়ে আমি সুধাই গো তোমারে।
আমার নীলকান্তমণি রইল কোন সহরে ॥
আমার প্রাণ সদাই কাঁদে যোগীর কারণে।
আমার নীলকান্তমণি রইল কোন স্থানে ॥
যোগী আমার প্রাণেশ্বর, যোগী প্রাণপতি।
পতি বিনে চেয়ে দেখ আমার এ দুর্গতি ॥

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'সাধনমাহাত্ম্য' নামের একখানি নাথগ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। এই কাব্যের রচয়িতা মকসেদ আলী। এতে গোপীচাঁদের সন্ন্যাস-কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। নাথসাহিত্যের উদ্ভব ও স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে এই সাহিত্যরচনার কাল ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা কর।

২। নাথসাহিত্য বলিতে কি বুঝায়? ইহার উদ্ভব ও বিকাশ ধারার পরিচয় দাও। নাথ সাহিত্যের অন্তত দুইজন কবি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কর।

৩। নাথসাহিত্য কাহাকে বলে? এই ধারার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের পরিচয় দাও।

৪। নাথসাহিত্য ধারার উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। টীকা লিখ : গোরক্ষবিজয়, নাথগীতিকা, নাথসাহিত্য, ময়নামতী, মীননাথ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছিল তা এদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙালি মুসলমান কবিরা ধর্মসংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয়কাহিনি অবলম্বনে কাব্যধারার প্রথম প্রবর্তন করে এ পর্যায়ের সাহিত্যসাধনাকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী করেছেন। ধর্মীয় ভাবভাবনায় সমাচ্ছন্ন কাব্যজগতের পাশাপাশি মুক্ত মানবজীবনের আলেখ্য অঙ্কনের মাধ্যমে মুসলমান কবিগণ সূচনা করেছেন স্বতন্ত্র ধারার। সুদূর আরাকানে বিজাতীয় ও ভিন্ন ভাষাভাষী রাজার অনুগ্রহ লাভ করে বঙ্গভাষাভাষী যে সকল প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অবদানে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন এবং মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর সাহিত্যের পাশে মানবীয় প্রণয়কাহিনি স্থান দিয়ে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিগণকর্তৃক সৃষ্ট কাব্যরসাস্বাদনের নতুন ধারাটি বাংলা সাহিত্যের মূল প্রবাহ থেকে স্বতন্ত্র এবং ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তা সর্বজনীন বাংলা সাহিত্যের অভ্যুদয় ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিষয়টি পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে আসতে বিলম্বিত হয়েছে। মুসলমান কবিরা ইসলামি বিষয় অবলম্বনে কাব্যরচনা করায় বৃহত্তর হিন্দুসমাজ তার প্রতি সমাদর দেখায় নি। ফলে হিন্দুসমাজে এসব কবির নাম অজানা ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে ড. দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখের উদ্যোগে হাতে লেখা পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হলেও মুসলমান কবিদের রচনা উপেক্ষিত থেকেছে। পরবর্তী কালে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মুসলমান কবিগণের পুঁথি আবিষ্কার করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের বিস্ময়কর অবদানের বিশাল ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করেন। বাংলাদেশের গবেষকগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণ স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে আরাকানের মুসলিম সংস্কৃতি বাংলাদেশের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে পড়লেও তার মানবিক চেতনাসমৃদ্ধ নতুন সাহিত্যসৃষ্টি যে স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের উজ্জ্বলতম প্রকাশ হিসেবে দেখা দিয়েছিল তা বাংলাদেশের গবেষকগণের ঐকান্তিকতায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের বাইরে বার্মার (বর্তমান মায়ানমার) অন্তর্ভুক্ত মগের মুল্লুক আরাকানে বাংলা কাব্যচর্চার বিকাশ বিশেষ কৌতূহলের ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে 'রোসাং' বা 'রোসাঙ্গ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্মার উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে এর অবস্থান ছিল। আরাকানবাসীরা তাদের দেশকে 'রখইঙ্গ' নামে অভিহিত করত। কথাটি সংস্কৃত 'রক্ষ' থেকে উৎপন্ন বলে মনে করা হয়। আরাকানি ভাষায় 'রখইঙ্গ' শব্দের অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস এবং সে কারণে দেশকে বলে 'রখইঙ্গ তঙ্গী' বা রাক্ষসভূমি। 'রখইঙ্গ' থেকেই 'রোসাঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি।

আইন-ই-আকবরিতে এদেশ 'আখরঙ' নামে অভিহিত হয়েছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'রখইং' শব্দের ইংরেজি অপভ্রংশ 'আরাকান' বলে উল্লেখ করেছেন। আরাকানের অধিবাসীরা সাধারণভাবে বাংলাদেশে 'মগ' নামে পরিচিত। এই 'মগ' বা 'মঘ'শব্দটি 'মগধ' শব্দজাত এবং শব্দটি আরাকানি ও বৌদ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশ মুসলমান অধিকারে আসার পূর্বে আরাকানে মুসলমানদের আগমন ঘটে। খ্রিস্টীয় আট-নয় শতকে আরাকানরাজ মহতৈং চন্দয় (৭৮৮-৮১০) এর রাজত্বকালে যে সকল আরবিয় বণিক স্থায়ীভাবে সে দেশে বসবাস শুরু করে তাদের মাধ্যমেই সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রচার হয়। একই সময় থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলেও ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে ধর্মীয় বন্ধনের মাধ্যমে এই দুই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণ মিলে যে, আরাকানরাজারা দেশধর্মের প্রভাবের ঊর্ধ্বে একটি সর্বজনীন সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছিলেন এবং সেখানে ছিল মুসলমানদের ব্যাপক প্রভাব। মেঙৎ-চৌ-মৌন-এর আমলে ১৪৩০ থেকে ১৪৩৪ সাল পর্যন্ত রোসাঙ্গ গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ্‌র করদরাজ্য রূপে বিদ্যমান ছিল।

'বার্মার মূল ভূখণ্ড ও আরাকানের মধ্যেকার দুরতিক্রম্য পর্বতই আরাকানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন সত্তার এবং সমুদ্রসান্নিধ্য তার সমৃদ্ধির কারণ।' আরাকান-রাজ নরমিখলা বার্মারাজার ভয়ে ১৪৩৩ সালে চট্টগ্রামের রামু বা টেকনাফের শত মাইলের মধ্যে অবস্থিত 'ম্রোহঙ' নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সে সময় থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত তিন শ বছর ম্রোহঙ আরাকানের রাজধানী ছিল। এই ম্রোহঙ শব্দ থেকেই রোসাঙ্গ নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

রোসাঙ্গের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এই সময় থেকে তাঁরা নিজেদের বৌদ্ধ নামের সঙ্গে এক একটি মুসলমানি নাম ব্যবহার করতেন। তাঁদের প্রচলিত মুদ্রার একপীঠে ফারসি অক্ষরে কলেমা ও মুসলমানি নাম লেখার রীতিও প্রচলিত হয়েছিল। যে সব ইসলামি নাম তাঁরা ব্যবহার করেছেন সেগুলো হল : কলিমা শাহ্, সুলতান, সিকান্দর শাহ্, সলীম শাহ্, হুসেন শাহ প্রভৃতি। ১৪৩৪ থেকে ১৬৪৫ সাল পর্যন্ত দুই শতাধিক বৎসর ধরে আরাকান রাজগণ মুসলমানদের ব্যাপক প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই সময়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'এই শত বৎসর ধরিয়া বঙ্গের (মোগল-পাঠান) মুসলিম রাজশক্তির সহিত স্বাধীন আরাকান-রাজগণের মোটেই সদ্ভাব ছিল না, অথচ তাঁহারা দেশে মুসলিম রীতি ও আচার মানিয়া আসিতেছিলেন। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে মনে হয়, আরাকানি মঘসভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচারব্যবহার হইতে বঙ্গের মুসলিম-সভ্যতা রাষ্ট্রনীতি ও আচারব্যবহার অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত ছিল বলিয়া আরাকানি রাজগণ বঙ্গের মুসলিম প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।'

বাঙালি মুসলমানেরা আরাকান রাজাদের সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন রাজপদে নিযুক্তি লাভ করতেন। তাই দেখা যায়, সৈন্যবিভাগের প্রধান কর্মচারী থেকে বিভিন্ন শাসনবিভাগীয় শাখার প্রধান প্রধান পদে মুসলমানেরাই অধিষ্ঠিত হয়েছেন। রাজাদের

প্রধান মন্ত্রী (মহাপাত্র, মুখ্যপাত্র বা মহামাত্য), অমাত্য (পাত্র), সমরসচিব (লস্কর উজির), কাজী বা বিচারক প্রভৃতি উচ্চপদে মুসলমানেরাই দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজারা বৌদ্ধ হলেও তাঁদের অভিষেক মুসলিম প্রধান মন্ত্রীর দ্বারাই সম্পন্ন হত। মুসলমানদের এই প্রভাব ক্রমান্বয়ে ব্যাপকাকার ধারণ করে সতের শতকে তা চরমে ওঠে। আরাকানের রাজাদের মধ্যে মেঙৎ-চৌ-মৌন, থিরী-থু-ধুম্মা (শ্রীসুধর্মা), নরপদিগ্যি (নৃপতিগিরি বা নৃপগিরি), সান্দ থুধম্মা (চন্দ্র সুধর্মা), থদো মিন্তার (সাদ উমাদার) প্রভৃতি রাজার সভায় মুসলমানেরা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কখনও বাংলার মুসলমান শাসকের ছত্রচ্ছায়ায় শাসনকার্য পরিচালনার ফলে, কখনও মুসলমান অমাত্য ও কর্মচারীদের সহায়তায় প্রশাসনযন্ত্র সংগঠনের পরিপেক্ষিতে আরাকানে বিপুল সংখ্যক জ্ঞানীগুণী মুসলমানের মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ সম্ভব হয়েছিল। আরাকানে মুসলমান প্রভাব সম্পর্কে লস্কর উজির আশরফ খানের প্রসঙ্গে দৌলত কাজীর মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

মসজিদ পুষ্কর্ণী ছিল বহুবিদ দান।
মক্কা মদিনাতে গেল প্রতিষ্ঠা বাখান ॥
সৈয়দ, কাজী, সেক, মোল্লা, আলিম, ফকীর।
পূজেন্ত সে সবে যেন আপন শরীর ॥
বৈদেশী, আরবী, রুমী, মোগল, পাঠান।
পালেন্ত সে সবে যেন শরীর সমান ॥

আরাকানে আরবিয় বণিকদের মাধ্যমে ইসলামি প্রভাবের সূত্রপাত হলেও পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরাই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। চট্টগ্রাম ও আরাকানের নৈকট্য এবং একই রাজ্যভুক্ত থাকায় বৃহত্তর বঙ্গদেশ থেকে তার স্বাতন্ত্র্য ছিল। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী বার্মার নিম্নাঞ্চলের একটি বিভাগ হিসেবে আরাকান বৃহত্তর ব্রহ্মদেশ থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। এ জন্য এখানে বঙ্গীয় মুসলমানদের প্রভাবে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার পরিবেশ গড়ে ওঠে। আরাকানের মগরাজারা বাংলা ভাষায় কতটুকু ব্যুৎপন্ন ছিলেন তা নিশ্চিত জানা না গেলেও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই মুসলমান কবিগণ কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁদের এই উদার পৃষ্ঠপোষকতার পরিণামে বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে এক অনন্য নিদর্শন।

ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, রাজনীতি ইত্যাদি কারণে রোসাঙ্গে বসবাসরত বাঙালিদের একটি প্রবাসী সমাজ গড়ে উঠেছিল। সামাজিক কারণে বাঙালি সমাজে স্বাভাবিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল বলে মনে করা চলে। ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রয়োজন পূর্তির জন্য, মানসচাহিদা পূরণের জন্য, মনের রসতৃষ্ণা মিটানোর জন্য সেখানে গুণীজন দিয়ে গান-গাথা-রূপকথা-প্রেমকথা জানানোর, রসকথা শুনানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছে, সৃজনশীল কেউ কেউ নতুন সৃষ্টি দিয়ে তাদের রসতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছে।'

মুসলমান প্রভাবকে আরাকানরাজেরা সহজে গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁদের সভাসদকর্তৃক বাংলা সাহিত্যচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দান সম্ভব হয়েছিল। সতের শতকে

শ্রীসুধর্মা রাজার আমলে তাঁর লস্কর-উজির বা সমর-সচিব আশরফ খানের আদেশে কবি দৌলত কাজী 'সতীময়না' কাব্য রচনা করেন। এ সময়ে কবি মরদন রচনা করেন 'নসীরানামা'। রাজা সাদ উমাদারের রাজত্বকালে প্রধান মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওল তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। রাজা চন্দ্র সুধর্মার সমর সচিব সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে আলাওল 'সপ্তপয়কর', নবরাজ মজলিসের আদেশে 'সেকান্দর নামা', মন্ত্রী সৈয়দ মুসার আদেশে 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। প্রকৃতপক্ষে, আরাকান-রাজসভাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যচর্চা কোন না কোন সভাসদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

এ সময়ের কবিগণ তাঁদের পৃষ্ঠপোষক সভাসদ বা তৎকালীন আরাকানের শাসকবৃন্দ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ও সহানুভূতি কবিগণের জন্য অপরিসীম প্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কবি দৌলত কাজী শ্রীসুধর্মা রাজার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন :

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ-অবতরী।
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।
নাম শ্রীসুধর্মা রাজা ধর্ম অবতার॥
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন॥
দেবগুরু পূজএ ধর্মেত তার মন।
সে পদ দর্শনে হএ পাপের মোচন॥
পুণ্য ফলে দেখে যদি রাজার বদন।
নারকিহ স্বর্গ পাএ সাফল্য জীবন॥

এ ধরনের প্রশংসা অপরাপর কবিগণের লেখনীতেও রূপায়িত হয়েছে।

ড. আহমদ শরীফ মনে করেন, 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য নামটি অসার্থক ও বিভ্রান্তিকর। এ নামটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের বদৌলতে জনপ্রিয় হয়েছে, তবু এ নাম তথ্যবিরোধী বলে পরিহার্য। বরং বলা চলে 'রোসাঙ্গের অমাত্যসভায় বাংলা সাহিত্য', যদিও সব কবি অমাত্য প্রতিপোষিত নন। আবার আলাওল প্রমুখ রচিত সাহিত্যের 'আরাকান রাজ্যে বাংলা সাহিত্য' নামও হবে অযৌক্তিক। কারণ এঁরা রাজধানী রোসাঙ্গবাসী বা রোসাঙ্গে প্রবাসী কবি। এ সময়ে আরাকান রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামবাসী হিন্দু মুসলিম অনেক কবিও স্বগাঁয়ে স্বঘরে বসে কাব্য রচনা করেছেন। অতএব 'রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য' নামই সঙ্গত ও সমীচীন।'

আরাকান রাজসভার কবিগণ কাব্যরচনায় বিবিধ বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছিলেন। ড. সুকুমার সেনের মতে এই কবিরা ছিলেন, 'ফারসি সাহিত্যের মধুকর এবং ভারতীয়

সাহিত্যের রস সন্ধানী।' তাঁরা ফারসি সাহিত্যের সৌন্দর্য-মাধুর্যের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের জীবনরস উৎসকে অনুধাবন করেছিলেন। ফলে তাঁদের রচনায় এই ধারার যথার্থ সম্মিলন ঘটেছে। তাঁরা ফারসি ও হিন্দি উৎস থেকে কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায়ও তাঁরা অধিকার স্থাপন করেছিলেন; হিন্দু যোগদর্শন সম্পর্কেও তাঁরা অবহিত ছিলেন বলে মনে হয়। এ সব কারণে এই পর্যায়ে কবিগণের ব্যবহৃত ভাষায় আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার ব্যাপক নয়। ইসলাম ধর্ম ও রীতিনীতি সংক্রান্ত কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার বেশি প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁরা বিশুদ্ধ সংস্কৃতগন্ধী বাকরীতির প্রয়োগ করেছেন। এই পর্যায়ের কবিগণের সাহিত্যসৃষ্টি প্রধানত অনুবাদভিত্তিক, কিন্তু তাতে তাঁদের অম্লান কবিপ্রতিভার যথার্থ পরিচয় ব্যাহত হয় নি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানবীয় প্রণয়কাব্য রচনা করে আরাকান রাজসভার কবিগণ বিশিষ্টতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাংলাদেশে মোগল পাঠানের সংঘর্ষের ফলে অনেক অভিজাত মুসলমান আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁদের অধিকাংশই সুফি মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের সহযোগিতায় আরাকান রাজসভায় আরবি-ফারসি বিদগ্ধ ও সুফিমতবাদে অনুরক্ত কবিগণের আবির্ভাব ঘটে। আরাকান রাজসভার কবিগণের মধ্যে দৌলত কাজী, মরদন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলাওল, আবদুল করীম খোন্দকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

আরাকানের বাংলা সাহিত্যে দুটি ধারা লক্ষণীয়। একটি ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং অপরটি ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ধারা। ইসলাম ধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উপলব্ধির যথার্থ উপকরণ নিয়ে ধর্মীয় কাব্য রূপ লাভ করেছে। অপরদিকে প্রণয় কাব্যে আছে অনাবিল মানবিক প্রণয়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ রোমান্টিক গাথা ও মর্মস্পর্শী গীতিসাহিত্য। তবে হিন্দি প্রণয়কাব্যের মধ্যে নিহিত সুফি মতাদর্শের প্রভাবে প্রণয়কাব্যের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ লাভ সম্ভব হয়েছিল।

দৌলত কাজী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যখন দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনে মুখরিত হয়েছিল তখন বাংলাদেশের বাইরে আরাকানের বৌদ্ধরাজাদের সভায় বাংলা সাহিত্যচর্চার নিদর্শন হিসেবে কবি দৌলত কাজী 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করে মানবীয় আখ্যায়িকার ধারা প্রবর্তন করেন। এতদিন পর্যন্ত বাংলা কাব্যে দেবদেবীর প্রশংসাই উপজীব্য ছিল, মানুষের কাহিনি অবলম্বনে কাব্য রচনার কোন প্রয়াসই তখন পরিলক্ষিত হয় নি। মধ্যযুগে ধর্ম সংস্কারমুক্ত ঐহিক কাব্যকথার প্রবর্তন করেন মুসলমান কবিগণ এবং তা আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করেই রূপায়িত হয়ে ওঠে। একান্ত মানবিক প্রেমাবেদন-ঘনিষ্ঠ এসব কাব্য অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ সময়ের কবিগণের পুরোধা দৌলত কাজী বাংলা রোমান্টিক কাব্যধারার পথিকৃৎ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দৌলত কাজী চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির আদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক আরাকানরাজের প্রধান অমাত্য ও লস্কর উজির আশরফ খানের নিবাসও ছিল রাউজানের অদূরবর্তী গ্রাম চারিয়ায়। মধ্যযুগের কবিগণের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী তাঁর কাব্যে কবির পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কে বিবরণ থাকলেও নিজের পরিচয়

সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেন নি। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতানুসারে কবির জীবনকাল আনুমানিক ১৬০০ থেকে ১৬৩৮ সাল পর্যন্ত। কবিসম্পর্কে নানা ধরনের কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। সে সব কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, কবি অল্প বয়সে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। বয়সের স্বল্পতাহেতু নিজ দেশে স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থমনোরথ হয়ে কবি আরাকান রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে যথার্থ মর্যাদা লাভে সমর্থ হন। আরাকানের তৎকালীন অধিপতি থিরি থু ধম্মা বা শ্রীসুধর্মার (রাজত্বকাল ১৬২২-১৬৩৮ সাল) 'লস্কর উজির' বা সমর-সচিব আশরফ খানের অনুরোধে দৌলত কাজী 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। সংক্ষেপে কাব্যটি সতীময়না অথবা লোরচন্দ্রানী নামে পরিচিত। এ কাব্যের সঠিক রচনাকাল জানা যায় নি; অনুমান করা হয় ১৬৩৫ থেকে ১৬৩৮ সালের মধ্যে এ কাব্য রচিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত কাব্যটি সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কবি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কবির মৃত্যুর বিশ বৎসর পরে ১৬৫৯ সালে কবি আলাওল কাব্যের শেষাংশ রচনা করে তা সম্পূর্ণ করেন।

সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী কাব্যের কাহিনি খুবই প্রাচীন কাল থেকে লোকগাথা হিসেবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল। এই লোকগাথা অবলম্বন করে হিন্দি কবি সাধন 'মৈনাসত' নামে একটি কাব্য লিখেন। দৌলত কাজী তা অবলম্বন করে 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। ভিন্ন ভাষা থেকে এ কাব্যের কাহিনি বাংলায় রূপান্তরিত করার জন্য আশরফ খান নির্দেশ দিয়েছিলেন :

> ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
> না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে ॥
> দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে
> সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে ॥

এতে মনে হয় হিন্দি ঠেট ও গোহারী (গাঁওয়ারী) ভাষায় অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দি ভাষায় রচিত কোন কাব্যকাহিনি অবলম্বনে দৌলত কাজী তাঁর কাব্যের পরিকল্পনা করেছিলেন। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যের কথাবস্তুতে হিন্দি প্রণয়কথা থাকলেও রূপে ও ভাবে তা বিদগ্ধ ও বিশুদ্ধ বাংলা কবিতা। কাব্যের প্রথমে আল্লাহ্-রসুলের বন্দনা করেছেন। বন্দনার উদার ও সার্বভৌম ভাবটি ধর্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষে সর্বজনগ্রাহ্য। তারপর রাজা শ্রীসুধর্মা ও সমরসচিব আশরফ খানের প্রশংসা, রাজার বিহার ও আশরফ খানের দ্বারা কাব্য রচনার নির্দেশের কথা বলে কবি কাব্যের কাহিনি আরম্ভ করেছেন।

সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী কাব্যের কাহিনি

রাজা লোর মহিষী ময়নামতীর ওপর রাজ্যভার সমর্পণ করে বনবিহারে মগ্ন ছিলেন। সেখানে এক যোগী এসে তাঁকে গোহারী দেশের অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা চন্দ্রানীর চিত্র দেখান। চন্দ্রানী বিবাহিতা, কিন্তু তাঁর স্বামী বামনবীর ছিল নপুংসক। যোগীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা লোর চন্দ্রানীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। গবাক্ষপথে লোরকে দেখে চন্দ্রানী মোহে আত্মহারা হন। ধাইয়ের মধ্যস্থতায় গোপনে তাঁদের মিলন সংঘটিত হল। স্বচ্ছন্দ মিলনের বাধা দেখে রাজা লোর চন্দ্রানীকে নিয়ে পলায়ন করলেন। চন্দ্রানীর স্বামী বামন সন্ধান পেয়ে বাধা দিল। দু জনের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে বামন নিহত

হল। কিন্তু হঠাৎ চন্দ্রানী সর্প দংশনে মারা গেলেন। এক সাধু তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করে দিলেন। গোহারী রাজ্যের রাজা তখন লোর ও চন্দ্রানীকে ফিরিয়ে নিলেন। সেখানে তাঁরা পরম সুখে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। এইটুকু কাব্যের প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনিতে দেখা যায় যে, ময়নামতী স্বামীর কল্যাণের জন্য হরগৌরীর আরাধনায় সর্বদা মগ্ন রয়েছেন। তাঁর অপূর্ব রূপের কথা শুনে ছাতন নামে এক রাজপুত্র ময়নামতীর প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে বশ করার জন্য দূতী রত্না মালিনীকে নিযুক্ত করেন। ময়নামতী নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর প্রতি আকর্ষণ হেতু ছাতনের দূতীকে মাথা মুড়িয়ে মুখে কাল-হলুদ রং মাখিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে ঝাঁটাপিটা করে নদীর অপর পাড়ে বিতাড়িত করে দিলেন। কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড এখানেই শেষ। দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নামতীর বারমাসী পদের এগার মাসের বর্ণনা পর্যন্ত দৌলত কাজী রচনা করে পরলোকগমন করেন। দ্বাদশ মাস-জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনা থেকে কাব্যের শেষাংশ পর্যন্ত কবি আলাওল রচনা করেছিলেন।

কাব্যের তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ আলাওলের রচনা। এ খণ্ডে সখীর পরামর্শে ময়নামতী এক ব্রাহ্মণের হাতে শুক-শারি লোরের নিকট পাঠালেন। ব্রাহ্মণের কৌশলের ফলে লোরের মনে পূর্বের কথা উদিত হল। তখন তিনি পুত্রের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং দুই রানীকে নিয়ে সুখে দিনাতিপাত করতে লাগলেন।

তিন খণ্ডে সমাপ্ত এ কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে দৌলত কাজী কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ে কবিপ্রতিভার যে অনন্য নিদর্শন দেখিয়ে গেছেন তার মূল্য মহাকবি আলাওলের রচনা পাশে খুব সহজেই স্বীকৃত। তৃতীয় খণ্ডে কবি আলাওল দৌলত কাজীর মত সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। আলাওল তৃতীয় খণ্ডে নানা অবান্তর গল্পের অবতারণা করেছেন। রতনকলিকা ও মদনমঞ্জরীর প্রসঙ্গ এবং আনন্দ বর্মার গল্প এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

একটি অসমাপ্ত কাব্যের মধ্যে কবি দৌলত কাজী যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাতে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট আসন লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। দৌলত কাজী শুধু বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন, প্রাচীন বাংলার শক্তিমান কবিদের মধ্যেও তিনি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর কাব্যের আখ্যানভাগ হিন্দি কাব্য থেকে সংগৃহীত বলে হয়ত এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ মৌলিকতা দাবি করতে পারেন না, কিন্তু তিনি যে প্রচলিত লোককাহিনিকে একটি রমণীয় রূপকথাধর্মী রোমান্টিক আখ্যায়িকায় পরিণত করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাব্যের সর্বত্র তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিকাশমান। অমর তুলিকার যাদুস্পর্শে ময়নামতীর সতীত্ব, লোরের যৌবন-চাঞ্চল্য ও কামনা, চন্দ্রানীর নটিপনা ও অসংযম, ছাতনের লাম্পট্য, রত্না মালিনীর ধূর্ততা ও চাতুর্য যেভাবে সার্থকতা সহকারে রূপায়িত হয়ে উঠেছে তাতে তাঁর কাব্যে মৌলিকতার সাক্ষ্য বিদ্যমান। কবি দৌলত কাজীর পাণ্ডিত্যের কোন অভাব ছিল না। ইসলাম ধর্মে তাঁর জ্ঞান ও নিষ্ঠা অটুট ছিল। সুফি সাধনা পদ্ধতিতে তাঁর অনুরাগ ছিল গভীর। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল এমন নিদর্শনও তাঁর কাব্যে বর্তমান। উপলব্ধির সহজ প্রকাশ তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে প্রাঞ্জল ও সরল করে তুলেছে। কবির প্রতিভার স্বতোবিকশিত সারল্য ও অনায়াস-সরলতা কাব্যকে লোক-জীবনের সার্থক রোমান্টিক প্রণয় গাথার শিল্পমূল্য দান করেছে।

দৌলত কাজী ও আলাওলের রচিত অংশের তুলনামূলক আলোচনা করে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য গ্রন্থের লেখকদ্বয় মন্তব্য করেছেন, 'কবি আলাওল দৌলত কাজী হইতে পাণ্ডিত্যে অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু রচনার লালিত্যে, ভাষার মাধুর্যে এবং অল্প কথায় বা একটি ক্ষুদ্র উপমায় অধিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতায়, হতভাগ্য কবি দৌলত কাজী আলাওল হইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।...আলাওলের রচিত অংশে পাণ্ডিত্য আছে, শব্দাড়ম্বর আছে, অস্বাভাবিক ও অবান্তর গল্পের সমাবেশ আছে, কিন্তু দৌলত কাজীর রচনায় যে প্রাঞ্জলতা, যে স্বাভাবিকত্ব ও ভাব প্রকাশক অল্পভাষিতার নিদর্শন আছে, আলাওলের রচিত অংশে তাহা পাওয়া যায় না।' এই উক্তির সাহায্যে কবি দৌলত কাজীর কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায়। ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'আলাওল অকারণে অপ্রাসঙ্গিক 'আনন্দবর্মা-রতনকলিকা' কাহিনি জুড়ে দিয়ে কাব্যের রসাভাব ঘটিয়েছেন।'

কবি আলাওল অসম্পূর্ণ কাব্য সমাপ্ত করতে গিয়ে কবি দৌলত কাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন, 'তান সম আমার না হয় পদগাঁথা'। আসলেই কাহিনি গ্রন্থনে অপ্রাসঙ্গিকতার অবতারণা করে এবং রচনা শৈথিল্যের পরিচয় দিয়ে কবি আলাওল কবি দৌলত কাজীর সুস্থ স্বাভাবিক রচনাদর্শ সম্পূর্ণ বজায় রাখতে পারেন নি। দৌলত কাজী সহজ সরল রচনারীতি প্রয়োগ করেছেন। আর কবি আলাওলের কৃত্রিম কাব্যকলার ঐশ্বর্যে স্বাভাবিকতার অবলুপ্তি ঘটেছে।

দৌলত কাজী তাঁর কাব্যের কাহিনি নির্বাচনে এবং তার বিস্তারিত রূপায়ণে গতানুগতিকতাকে অনুসরণ না করে স্বাধীন চিন্তা ও অপূর্ব কলাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রচিত্রণেও কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের নিদর্শন দেখিয়েছেন। ময়না ও চন্দ্রানী চরিত্রের মাধ্যমে কবি আদর্শবাদ ও ভোগবাদ, সংযম ও স্বৈরাচার, সতীত্ব ও নারীত্ব, মর্যাদা ও লালসা, ত্যাগ ও ভোগ, ক্ষোভ ও তিতিক্ষা প্রভৃতির দ্বন্দ্ব সুনিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বারমাসী রচনায় তাঁর দক্ষতা অতুলনীয়। তাঁর কবিত্বশক্তি ছিল অসাধারণ এবং তাঁর শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ ছিল তীক্ষ্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবুলি ভাষায়ও তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনিই বাংলা ভাষার একমাত্র কবি, যিনি হাতে কলমে প্রমাণ করেছেন যে রাধাকৃষ্ণপ্রেমকাহিনি উপজীব্য না করেও ব্রজবুলি ভাষার সার্থক ব্যবহার করা সম্ভব। কাব্যের লালিত্যবৃদ্ধির জন্য বারমাসীর কোন কোন পদে ব্রজবুলির আবহ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে।

কবির ভাষা ও কবিত্বের নিদর্শন :

রাজার কুমারী এক নামে ময়নামতী।
ভুবন বিজয়ী কন্যা জগতে পার্বতী ॥
কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ ॥
কাঞ্চন-কমল মুখ পূর্ণ শশী নিন্দে।
অপমানে জলেতে প্রবেশে অরবিন্দে ॥
চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে।
মৃগাঞ্জন শরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে ॥

রচনারীতির দিক থেকে কবি বাণীভঙ্গিমায় ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির পরিমিত সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সীমাহীন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বারমাসী রচনায় নায়িকার

মানসিক চাঞ্চল্যের পরিবর্তে যে দৃঢ়চিত্ততার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তাতে তিনি গতানুগতিকার ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত। আবার বারমাসীতে ব্রজবুলির প্রয়োগ তাঁর প্রতিভার বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর। তাই কবির অতুলনীয় কবিত্বের কথা স্বীকার করে 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে লেখকদ্বয় মন্তব্য করেছেন, 'নিষ্ঠুর কাল বঙ্গীয় কাব্যনিকুঞ্জের এই অর্ধস্ফুট গোলাপ কলিকাটিকে অকালে ঝরিয়া পড়িতে বাধ্য না করিলে, কালে ইহার সৌন্দর্যচ্ছটায় দিগমণ্ডল আলোকিত ও মনোরম সুরভিতে চতুর্দিক আমোদিত করিয়া তুলিত, সন্দেহ নাই।' ড. ওয়াকিল আহমদ দৌলত কাজীর কাব্যের মূল্যায়ন করে বলেছেন যে, এতে 'কাহিনি পরিকল্পনায়, চরিত্রচিত্রণে এক সচেতন শিল্প প্রয়াস ক্রিয়া করেছে। হিন্দি কাব্যের অনুবাদ করতে গিয়ে ঘটনার গ্রহণ-বর্জন দ্বারা তিনি কাব্যকে নতুন ভাবরসে মণ্ডিত করেছেন। হিন্দি কাব্যের অধ্যাত্ম রূপকতাকে মানবিক রসসাহিত্যে রূপান্তরিত করে তিনি নিছক শিল্পমূর্তি গড়েছেন। কাল্পনিক অংশ বাদ দিয়ে গল্পকে রোমান্সমুক্ত বাস্তব ভিত্তি দিয়েছেন। তাঁর চরিত্রগুলো সজীব ও সক্রিয়।'

কবি দৌলত কাজী তাঁর কাব্যরচনার মাধ্যমে রূপকথাকে পরিণত মনের পাঠোপযোগী রোমান্টিক কাহিনিতে পরিণত করেছিলেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাঁর কাব্যটিকে একখানি মূল্যবান মর্ত্যজীবনের অসাম্প্রদায়িক কাব্য বলে বিবেচনা করা যায়। কবি হিন্দুর সামাজিক আচার ব্যবহার, জীবন, আদর্শ ও শাস্ত্রসংহিতালব্ধ নানা তথ্য যথাযথ পরিবেশন করে নিজের পাণ্ডিত্য ও বাস্তবতার নিদর্শন রেখেছেন। কবি তাঁর কাব্যে মর্ত্যজীবনের মহিমা উচ্চারণ করেছেন :

নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান ॥
নর বিনে চিন নাহি কিতাব-কোরান।
নর সে পরম দেব তন্ত্র-মন্ত্র-জ্ঞান ॥
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর ॥
তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল।
নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জ্বল ॥

প্রবাদের মত গভীর অর্থবহ উক্তি তাঁর কাব্যের সমৃদ্ধি সাধন করেছে। যেমন :

১. মন বিনা তনু যেন মৃত্তিকাপিঞ্জর।

২. চিন্তিয়া যে করে কাজ সভাতে না পায় লাজ
পাছে নহে কলঙ্ক যন্ত্রণা।

৩. যুবক পুরুষ জাতি নিষ্ঠুর দুরন্ত।
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত ॥

৪. কাণ্ডারী বিহীন নৌকা স্রোতে ভঙ্গ হয়।
পুরুষ বিহনে নারী জীবন সংশয় ॥

বাংলা সাহিত্যের ওপর হিন্দি সাহিত্যের যে প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা মুসলমান কবিগণের অনুবাদের মাধ্যমে প্রথমে সূত্রপাত হয়েছিল। এদিক থেকে কবি

দৌলত কাজী ও তাঁর কাব্য—সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। যে স্বভাবজাত ক্ষমতা ও কবিত্বময় প্রাণ নিয়ে কবি দৌলত কাজী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা তাঁর সমসাময়িক অন্য কোন কবির মধ্যে যে কেবল দেখা যায় না তা নয়, তাঁর পূর্ব ও পরবর্তী কবিগণের মধ্যেও কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

মরদন

'নসীরানামা' নামক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কবি মরদন রোসাঙ্গরাজ শ্রীসুধর্মার রাজত্বকালে (১৬২২-৩৮) আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তাঁর কাব্যে আরাকানরাজের প্রশংসা করা হয়েছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক কবির কাল ১৬০০ থেকে ১৬৪৫ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। কবি সম্ভবত রোসাঙ্গের কাঞ্চি নামক নগরে বসবাস করতেন। হয়ত তিনি সেখানেই কাব্যসাধনায় মগ্ন ছিলেন। কবি কাব্যরচনায় কোন অমাত্যের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন নি। মরদন সতের শতকের চতুর্থ দশকের মধ্যেকার কবি। কবি মরদন রোসাঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত তাঁর আবাসস্থল কাঞ্চি প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> সে রাজ্যেতে আছে এক কাঞ্চি নামে পুরী
> মুমীন মুসলমান বৈসে সে নগরী।
> আলিম মৌলানা বৈসে কিতাব কারণ
> কায়স্থগণ বৈসে সব লেখন পড়ন।
> ব্রাহ্মণ সজ্জন তাত বৈসএ পণ্ডিত
> নানা কাব্য রস সব কহএ সুরীত।

কাব্যের কাহিনিতে দেখা যায় নসীরা বিবি কীভাবে প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও পিতৃবন্ধুর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। ভাগ্যের অনিবার্য পরিণতি দেখানোই কাব্যের উদ্দেশ্য। 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে এ কাব্যকে মৌলিক রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাব্যের উল্লেখিত গল্প এ দেশে আগেই প্রচলিত ছিল, কবি তাকে কাব্যাকারে রূপায়িত করেছেন। দেশীয় উপাদানে এমন কাব্যরচনার কৃতিত্বে কবি মরদন গৌরবান্বিত। কাব্যের কাহিনিতে নিয়তির অমোঘ লীলা প্রতিফলিত হয়েছে। তবে উপাখ্যানে আছে রোমান্স ও আদিরসের পরিচয়। তাই ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকের কাছে তা প্রিয় হতে পারে না। কবি লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে লোকশ্রুতির উপাখ্যানকে স্বাধীনভাবে কাব্যে রূপায়িত করে তুলেছিলেন। কবি তাঁর কাব্যের বিভিন্ন স্থানে 'দুই সাধু কথা', 'নসিরা বিবি-নুরুদ্দিন বিহা' এবং 'নুরুদ্দিন বাখান' নামে উপাখ্যানটিকে অভিহিত করেছেন।

কোরেশী মাগন ঠাকুর

আরাকান রাজসভার অন্যতম খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবে কোরেশী মাগন ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। কবি কোরেশ বংশজাত সিদ্দিকী গোত্রভুক্ত মুসলমান। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় নি। মাগন ঠাকুর তাঁর ডাক নাম। 'ঠাকুর' আরাকানি রাজাদের সম্মানিত উপাধি। কবির প্রপিতামহ ছিলেন আরব থেকে আগত কোরেশ। মাগন ঠাকুরের জন্ম চট্টগ্রামের চক্রশালা বা চাশখালায়। পরে রোসাঙ্গবাসী হন। তিনি 'চন্দ্রাবতী' নামক

কাব্যের রচয়িতা এবং কবি আলাওলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক কবির কাল আনুমানিক ১৬০০ থেকে ১৬৬০ সাল বলে নির্দেশ করেছেন। 'চন্দ্রাবতী' কাব্যটির প্রথম ও শেষাংশ খণ্ডিত বলে কবির নিজের পরিচয় তেমন নেই। কবি আলাওল মাগন ঠাকুরের উৎসাহে 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা করেন। সেখানে মাগন ঠাকুরের কিছুটা পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মাগন ঠাকুর রোসাঙ্গরাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সেখানেই তিনি বসবাস করতেন এবং সেখানেই তিনি মারা যান। মাগন ঠাকুর গুণশালী ও বহু শাস্ত্রবিদ কবি ছিলেন। প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেও তাঁর পক্ষে কাব্যরচনা করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি আরবি ফারসি বর্মি ও সংস্কৃত ভাষা জানতেন। কাব্য নাটক ও সঙ্গীতে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।

কবি আলাওল মাগন ঠাকুরের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

আরবী ফারসী আর মঘী হিন্দুয়ানী।
নানা শাস্ত্র পারগ সঙ্গীতজ্ঞাতা গুণী ॥
কাব্য অলঙ্কার জ্ঞাতা ষষ্ঠম নাটিকা।
শিল্পগুণ মহৌষধি নানাবিধ শিক্ষা ॥

কবি আলাওল মাগন ঠাকুরের নামের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

মান্যের 'ম'-কার আর ভাগ্যের 'গ'-কার।
শুভযোগে নক্ষত্রের আনিল 'ন'-কার ॥
এ তিন অক্ষরে নাম 'মাগন' সম্ভবে।

কবি এ দেশে প্রচলিত রূপকথার কাহিনিকে তাঁর কাব্যের উপজীব্য করেছিলেন এবং যেভাবে তিনি তা রূপায়িত করেছেন তাতে তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে। ভদ্রাবতী নগরের রাজপুত্র বীরভান মন্ত্রীপুত্র সুতের সহায়তায় কিভাবে সরন্দ্বীপ রাজকন্যা অপূর্বসুন্দরী চন্দ্রাবতীকে লাভ করেছিলেন তা-ই এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। বীরভানের রূপগুণের কথা শুনে এবং তার চিত্রার্পিত রূপ দেখে রাজকন্যা চন্দ্রাবতী রাজপুত্রের রূপ ধ্যান করে। সে বীরভানকে পতিরূপে পেতে চায়। চন্দ্রাবতীর সাথী চিত্রাবতী রূপসী চন্দ্রাবতীর এক মনোরম চিত্র তৈরি করে তাতে চন্দ্রাবতীর ঠিকানা লিখে উড়িয়ে দেয়। সেটি ঘুমন্ত কুমারের বুকে গিয়ে পড়ে। রাজপুত্র জেগে ওঠে সে চিত্রপট দেখে চন্দ্রাবতীর সন্ধানে বিবাগী হয়ে ছোটে এবং নাগের-বাঘের-যক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে জয়ী হয়ে, অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ অতিক্রম করে, ষড়যন্ত্র দুঃখবিপদ উত্তীর্ণ হয়ে অবশেষে চন্দ্রাবতীকে লাভ করে।

কবি চরিত্রগুলোকে জীবন্ত ও মানবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে চিত্রিত করেছেন। এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে, 'চন্দ্রাবতী কাব্যখানি কবিত্বের অফুরন্ত ভাণ্ডার ও কাব্যকলার চরম নিদর্শন না হইলেও, তাহার স্থানে স্থানে মুক্তার ন্যায় কবিত্ব ছড়াইয়া রহিয়াছে।...বাস্তব ও অবাস্তবের মিলনে প্রকৃত ও অতিপ্রাকৃতের সামঞ্জস্যসাধনে এই কবি সিদ্ধহস্ত। এই দুই বস্তুর সমাবেশে সমগ্র কাব্যখানি পাঠককে টানিয়া মর্ত্যের ধূলিকণা হইতে বহু ঊর্ধ্বে রূপকথার রাজ্যে লইয়া যায়।' কাব্যের অনেক জায়গায় কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত আবেগ ব্যক্ত হয়েছে। যেমন :

হাহা কন্যা চন্দ্রাবতী তুহ্মি প্রাণধন।
কর্ণের কুণ্ডল তুহ্মি আঁখির অঞ্জন ॥
নয়ানের জুতি তুহ্মি ভিনে হএ ঘোর।
কেমনে দেখিব তোর রূপ মনুহর ॥
কেমতে শুনিব তোর মুখের বচন।
কেমনে দেখিব তোর পাএর চলন ॥
কেমতে ভুরুর কালা চন্দ্রিমা দেখিব।
কেমতে লোচন চারু পোতলি মিলিব ॥
কেবা মোরে সরন্দ্বীপ নগর দেখাএ।
কেবা বিরহের জ্বালা আনল নিবাএ ॥
কেবা মুঞি সূর্য নিয়া চন্দ্রেতে মিলাইব।
কেবা মোর মিত্র মণি গলে গাঁথি দিব ॥
বিরহ অনল জ্বালা কথেক তাপিমু।
বিরহ সাগর মধ্যে কথেক ভাসিমু ॥

ড. আহমদ শরীফ লিখেছেন, 'কবিত্বে পাণ্ডিত্যে মাগন প্রথম শ্রেণির একজন নন বটে, তবে তাঁর ভাষা সুন্দর ও সুবিন্যস্ত, ভঙ্গি ঋজু এবং কাব্যটি বিভিন্ন রসের ও বিচিত্র ঘটনার সমাবেশের দরুন সুখপাঠ্য। দেশী ঐতিহ্যসম্মত উপকরণে ও আদর্শে তিনি সুপ্রাচীন দৈশিক রীতিতে নির্মাণ করেছেন এ কাব্যসৌধ।'

কবি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাব্যটিকে ভিন্ন ভাষার কাব্যের প্রভাব থেকে দূরে রাখেন। মৌলিক পথে বিচরণ করার এই অনন্য নিদর্শন মধ্যযুগের সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। ড. ওয়াকিল আহমদ কবি মাগন ঠাকুর সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি যে পরিমাণে জ্ঞানী ছিলেন সে পরিমাণে শিল্পী ছিলেন না। এ জন্য তাঁর সযত্ন প্রয়াস প্রাণহীন বস্তুপিণ্ডে নিঃশেষিত হয়েছে, কল্পনানুরঞ্জন দ্বারা তিনি অনির্বচনীয় শিল্পমায়া রচনা করতে পারেন নি।'

আলাওল

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর গতানুগতিক পরিসীমায় রোমান্টিক প্রণয়কাব্যধারার প্রবর্তনকারী হিসেবে মুসলমান কবিগণের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। এ সময়ে তাঁরা আরবি ফারসি ও হিন্দি সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও ভাববৈচিত্র্য অবলম্বনে কাব্যরচনায় এক নবযুগের সৃষ্টি করেন। এ পর্যায়ের কবিগণের মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিচারে কবি আলাওলকে সর্বোচ্চে স্থান দেওয়া হয়। 'কবিগুরু মহাকবি আলাওল' আরাকান রাজসভার অন্যতম কবি হিসেবে আবির্ভূত হলেও মধ্যযুগের সমগ্র বাঙালি কবির মধ্যে 'শিরোমণি আলাওল' রূপে শীর্ষস্থানের অধিকারী। কবি আলাওলের মৃত্যুর প্রায় এক শ বছর পরে কবি মুহম্মদ মুকিম তাঁর 'গুলে বকাওলী' কাব্যে কবিকে এভাবে স্মরণ করেছিলেন :

গৌড়বাসী রৈল আসি রোসাঙ্গের ঠাম।
কবিগুরু মহাকবি আলাওল নাম।
শিরোমণি আলাওল মরণে জিওন।
শেষ গুণী গুরু মানি প্রণামি চরণ ॥

বিদ্যাবত্তায় ও পাণ্ডিত্যে কবি ছিলেন অতুলনীয়। আরবি ফারসি হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ব্রজবুলি ও মঘী ভাষাও তাঁর আয়ত্তে ছিল। সে সময়ে আলাওলের মত অন্য কোন প্রতিভাশালী কবি জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি নানা শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রাকৃতপৈঙ্গল, যোগশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, অধ্যাত্মবিদ্যা, ইসলাম ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্র-ক্রিয়াপদ্ধতি, যুদ্ধবিদ্যা, নৌকা ও অশ্বচালনা প্রভৃতিতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে আলাওল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

কবি আলাওলের জন্মস্থান ও জন্মকাল নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন, 'কবির আদি বাসস্থান যে ফতেহাবাদের জালালপুর ছিল তাহা কবির আত্মপরিচয় হইতে পাওয়া যায়।...এই ফতেহাবাদ বর্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি পরগনা ছিল।...এই ফতেহাবাদ পরগনার জালালপুর সম্ভবত কবির জন্মস্থান।' ড. মুহম্মদ এনামুল হক চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে আলাওলের জন্ম বলে মনে করেন। কিন্তু কবির নিজের উক্তি অনুসারে ফরিদপুরের জালালপুরেই তাঁর জন্ম এবং এ সিদ্ধান্তই পণ্ডিতগণ গ্রহণ করেছেন। কবি আলাওলের পিতা ফতেহাবাদের রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুবের মন্ত্রী ছিলেন বলে উল্লেখিত হয়েছে। 'পদ্মাবতী' কাব্যে আত্মকথায় কবি লিখেছেন :

মুল্লুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান।
তথাতে জালালপুর অতি পুণ্য স্থান ॥
বহু গুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলেমা।
কথেক কহিব সেই দেশের মহিমা ॥
মজলিস কুতুব তথাত অধিপতি।
মুই দীন হীন তান অমাত্য সন্ততি ॥
কার্যহেতু যাইতে পন্থে বিধির ঘটন।
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন ॥
বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত।
রণক্ষতে ভোগযোগে আইলুঁ এথাত ॥
কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার।
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলুঁ রাজ-আসোয়ার ॥
বহু বহু মুসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত।
সদাচারী, কুলীন, পণ্ডিত, গুণবন্ত ॥
সবে কৃপা করন্ত সম্ভাষি বহুতর।
তালিম আলিম বলি করন্ত আদর ॥

কবি তাঁর 'সেকান্দরনামা' কাব্যে লিখেছেন :

গৌড় মধ্যে প্রধান ফতেহাবাদ ভূম।
বৈসে সাধু সৎ লোক হর্ষ মনোরম ॥
অনেক দানেশমন্দ খলিফা সুজন।
বহুত আলিম গুরু আছে সেই স্থান ॥

হিন্দুকুলে মহাসভ্য আছে ভট্টাচার্য।
ভাগীরথী গঙ্গা ধারা বহে মধ্যে রাজ্য ॥
রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়।
আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয় ॥
কার্যহেতু পন্থ ক্রমে আছে কর্ম লেখা।
দুষ্ট হারমাদ সঙ্গে হই গেল দেখা ॥
বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ।
রণক্ষতে রোসাঙ্গে আইল মহাপাপ ॥
না পাইল সৎ পদ আছে আঙ্গলেস।
রাজ-আসোয়ার হৈনু আসি এই দেশ ॥
রোসাঙ্গেতে মুসলমান যতেক আছেন্ত।
তালিব আলিম বলি আদর করেন্ত ॥
বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর।
নাট গান সঙ্গীত শিখাইনু বহুতর ॥
বহুল মহন্ত লোক কৈল গুরু ভাব।
সকলের কৃপা হন্তে ছিল বহু লাভ ॥

কবি আলাওল তাঁর সব কাব্যেই এ ধরনের আত্মবিবরণী লিখে গেছেন।

একদা কবি তাঁর পিতার সঙ্গে কার্যোপলক্ষে জলপথে কোথাও গমনকালে পর্তুগিজ জলদস্যুদের কবলে পড়েন। দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে কবির পিতা মারা যান। কবি নিজেও আহত হন এবং বহু দুঃখভোগের পর আরাকানে উপস্থিত হন। সেখানে কবি মগরাজার সেনাবাহিনীতে রাজ-আসোয়ার বা অশ্বারোহী সৈনিকের চাকরি গ্রহণ করেন। অচিরেই তিনি সঙ্গীতবিদ ও গায়করূপে খ্যাতি লাভ করেন এবং সঙ্গীতশিক্ষক রূপে উচ্চমহলে প্রবেশাধিকার পান। আলাওলের বিদ্যাবুদ্ধি ও কাব্য কলাজ্ঞানের কথা অভিজাত সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি আরাকানরাজের প্রধান মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের কাছে আশ্রয় পান। তখন থেকেই আলাওল কাব্যসাধনায় নিমগ্ন থাকেন। এই সময়ে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে শাহ সুজা আরাকানরাজের আশ্রয় লাভ করেন। কোন কারণে রাজার বিরাগভাজন হয়ে ১৬৬১ সালে শাহ সুজা প্রাণ হারান এবং ষড়যন্ত্রে পড়ে কবি আলাওলও কারারুদ্ধ হন। পঞ্চাশ দিন পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে অতি কষ্টে কবি দিনাতিপাত করতে থাকেন। এভাবে এগার বছর কাটে। এ সময়ে মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হলে কবি চরম দুর্গতিতে পড়েন। তারপর তিনি ক্রমান্বয়ে রোসাঙ্গরাজ-অমাত্য সৈয়দ মুসা, সমরসচিব সৈয়দ মুহম্মদ খান, রাজমন্ত্রী নবরাজ মজলিস এবং অন্যতম সচিব শ্রীমন্ত সোলেমান প্রমুখ সভাসদের অনুগ্রহ লাভ করেন। কবি আলাওল ছিলেন এক বিপর্যস্ত জীবনের অধিকারী। রাজ অমাত্যের সন্তান হিসেবে অভিজাত পরিবারে জন্মেও জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করতে পারেন নি। তিনি পিতৃহারা ও বাস্তুহারা হন অল্প বয়সে। জীবিকার জন্য গ্রহণ করেছিলেন রাজ-দেহরক্ষীর কাজ। তারপর কবি-জীবনেও তাঁর উত্থান পতন কম ছিল না। তাঁকে বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষকের মনতুষ্টি করতে হয়েছিল। তিনি ষড়যন্ত্রে হয়েছিলেন কারারুদ্ধ। ভাগ্যের ফেরে পরের সাহায্যে জীবনের অনেকটা

সময় কাটাতে হয়েছে। 'সব ভিক্ষা জীব রক্ষা ক্লেশে দিন যাএ।' সম্ভবত দুঃখের আগুনে পুড়েই তিনি খাঁটি সোনা হয়ে উঠেছিলেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতানুসারে কবি আলাওলের জন্ম আনুমানিক ১৫৯৭ সালে এবং সম্ভবত তিনি ১৬৭৩ সালে আনুমানিক ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক কবির জীবৎকাল আনুমানিক ১৬০৭ থেকে ১৬৮০ সাল মনে করেছেন। ড. আহমদ শরীফ আনুমানিক ১৬০৫ সাল আলাওলের জন্ম সাল ধরেছেন। তাঁর মতে আলাওল ১৬৭৩ থেকে ১৬৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দেহত্যাগ করেন। সৈয়দ আলী আহসানের মতে কবি আলাওলের জন্ম ১৫৯৭ সালে এবং মৃত্যু ১৬৭৩ সালে।

আলাওল 'রচিলু পুস্তক বহু নানা আলাঝালা' বলে অনেক গ্রন্থরচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বেশি সংখ্যক গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। আজ পর্যন্ত কবির যে সব রচনার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে সে সব হচ্ছে : ১. পদ্মাবতী, ২. সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, ৩. সতীময়না, ৪. সপ্ত পয়কর, ৫. তোহ্‌ফা, ৬. সেকান্দরনামা, ৭. সঙ্গীতশাস্ত্র (রাগতালনামা) ও ৮. রাধাকৃষ্ণ রূপকে রচিত পদাবলী।

ড. আহমদ শরীফ কবি আলাওলের রচনাবলির আনুষঙ্গিক তথ্যাবলি একটি ছকে বিন্যস্ত করেছেন। ছকটি নিম্নরূপ :

ক্রমিক সংখ্যা	রচনার নাম	মূল লেখক/উৎস	আদেষ্টা অমাত্য	রচনাকাল (সাল)
১	পদ্মাবতী	মালিক মুহম্মদ জায়সী	মাগন ঠাকুর	১৬৫১
২	রত্নকলিকা আনন্দবর্মা (সতীময়নার পরিশিষ্ট রূপে রচিত)	অজ্ঞাত রূপকথা	শ্রীমন্ত সোলেমান	১৬৫৯
৩	সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল	আলেফ লায়লা	প্রথমাংশ : মাগন ঠাকুর শেষাংশ : সৈয়দ মুসা	১৬৫৮ ১৬৬৯
৪	সপ্তপয়কর	নিজামী গঞ্জভী	সৈয়দ মুহম্মদ খান	১৬৬৩
৫	তোহফা	ইউসুফ গদা	শ্রীমন্ত সোলেমান	১৬৬৪
৬	সেকান্দর নামা	নিজামী গঞ্জভী	নবরাজ মজলিস	১৬৭৩
৭	রাগতালনামা	মৌলিক রচনা		
৮	পদাবলী	মৌলিক রচনা		

পদ্মাবতী কবি আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য। কাব্যটি প্রখ্যাত হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যের অনুবাদ। অযোধ্যার কবি জায়সী ১৫৪০ সালে 'পদুমাবত' কাব্য রচনা করেছিলেন। আলাওল ১৬৫১ সালে আরাকানরাজ সাদ উমাদার বা থদোমিন্তারের আমলে (১৬৪৫-৫২) মাগন ঠাকুরের আদেশে পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন। পদ্মাবতী হিন্দি পদুমাবতের স্বাধীন অনুবাদ। কাহিনি রূপায়ণ, চরিত্রচিত্রণ, প্রকাশভঙ্গি প্রয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মধ্যযুগের প্রতিভাশালী কবিগণ যে কৃতিত্ব দেখিয়ে

মৌলিকতার মত মর্যাদা লাভ করেছেন সেদিক থেকে আলাওলের স্থান সর্বোচ্চে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, 'স্থানে স্থানে প্রকাশিলুঁ নিজ মন উক্তি।' একটি অধ্যাত্মরসের কাব্যকে মানবরসের কাব্যে রূপান্তরিত করতে গিয়ে কবি আলাওল আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

পদ্মাবতী প্রেমমূলক ঐতিহাসিক কাব্য। তবে প্রেমের স্বরূপই এখানে বেশি, ইতিহাস এখানে গৌণ। পদ্মাবতী চিতোরের রানী পদ্মিনীর কাহিনি নিয়ে রচিত। পদ্মাবতীর স্বামীর নাম রত্নসেন। পদ্মাবতী অপূর্ব সুন্দরী। চিতোরের রাজসভায় রাঘবচেতন নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দিল্লির সম্রাট আলাউদ্দীনের নিকট পদ্মাবতীর অনুপম রূপের প্রশংসা করে তাঁকে হরণ করতে প্ররোচিত করেন। আলাউদ্দীন রত্নসেনের নিকট পদ্মাবতী সম্বন্ধে অনুরূপ প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে চিতোর আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রত্নসেন বন্দী হলেও বিশ্বস্ত অনুচরদের সহায়তায় মুক্তি পেতে সক্ষম হন। পরে রাজা দেওপালের সঙ্গে রত্নসেনের যুদ্ধ বাঁধে। সে যুদ্ধে দেওপাল নিহত এবং রত্নসেন আহত হন। এ সুযোগে আলাউদ্দীন পুনরায় চিতোর আক্রমণ করেন। ইতোমধ্যে রত্নসেনের মৃত্যু ঘটলে পদ্মাবতী সহমৃতা হন। আলাউদ্দীন বিজয়ীবেশে চিতোর পৌঁছে তাঁদের জ্বলন্ত চিতা দেখতে পেলেন। তখন চিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুলতান দিল্লি ফিরে এলেন।

ইতিহাসে আলাউদ্দীনের চিতোর বিজয়ের কাহিনি বর্ণিত হলেও তাতে পদ্মিনীসংক্রান্ত কোন কথার আভাসও নেই। হয়ত দেশের চারণ কবিরা যৎসামান্য ইতিহাস অবলম্বনে রাজপুত-বীরত্বের যে গল্পকাহিনি গেয়ে বেড়াতেন কবি জায়সী তাকেই ইচ্ছানুযায়ী রূপ দিয়ে পদুমাবত রচনা করেছিলেন। তাই জায়সীর কাব্যে সব সময় ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি ছিলেন ধর্মমতে সুফিসাধক এবং কাব্যবিচারে রোমান্টিক আখ্যানলেখক; তিনি রূপক প্রকরণ অবলম্বন করেছিলেন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে।

কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী রূপক কাব্য হিসেবে পদুমাবত কাব্য রচনা করেছিলেন। প্রতিভাবান এই কবির হাতে সহজ আওধী বুলি ঠেট ভাষায় রচিত গল্পরসপূর্ণ, উচ্চ ও সূক্ষ্ম তত্ত্বসমন্বিত এ কাম-প্রেমকথা লোকপ্রিয় হয়েছিল। পদুমাবতের গল্প ভাবুকের কাছে জীবাত্মা-পরমাত্মাবিষয়ক তত্ত্বের আকর, প্রেমিকের কাছে প্রেম ও কামতত্ত্ব, সাধারণ পাঠকের কাছে বাস্তব ঘটনামিশ্রিত রসকাব্য হিসেবে বিবেচিত। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মন্তব্য করেছেন, 'পদ্মাবতী উপাখ্যান মালিক মুহম্মদ জায়সীর নানা সময়ের নানা ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক বৃত্তান্তে জোড়া দেওয়া একটি কাব্য মাত্র। তিনি ইতিহাস লিখিতে বসেন নাই। তিনি তাঁহার কাব্যে সুফীমতের ব্যাখ্যার জন্য আদিরসের আবরণে এক আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য রচনা করিয়াছেন।' কবি আলাওল জায়সীকেই অনুসরণ করেছেন। তাই পদ্মাবতীতে ইতিহাসের ছায়া থাকলেও ইতিহাস নির্ভর কাহিনি রূপায়ণ কবির লক্ষ্য ছিল না। তিনি প্রণয়োপাখ্যান রচনায়ই মনোনিবেশ করেছিলেন।

জায়সীর কাব্যের রূপকার্থ কবি আলাওল অনুবাদে অনুসরণ করেন নি, তিনি রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনার প্রয়াসী ছিলেন। জায়সী ছিলেন সুফী প্রেমমার্গীয় অধ্যাত্মরসের কবি। তাই তিনি রোমান্টিক কাব্যের রূপকের আড়ালে সুফী অধ্যাত্মতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা

করেছেন। জায়সীর রূপকার্থে দেহ হচ্ছে চিতোর, মন রাজা, সিংহল হৃদয়, পদ্মিনী বুদ্ধি, শুক পাখি গুরু, নাগমতী জগতের ধাঁধাঁ, রাঘবদূত শয়তান আর আলাউদ্দীন হচ্ছে মায়াবদ্ধ জীব। এ ধরনের প্রতীকের মাধ্যমে জায়সী দেখিয়েছেন যে, রত্নসেনের প্রেমনিষ্ঠা ছিল বলেই তিনি পদ্মাবতী লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, আলাউদ্দীন বা দেবপাল প্রেমে পার্থিব বাসনা রেখেছিলেন বলে তাঁদের পক্ষে পদ্মাবতী লাভ সম্ভব হয় নি। স্রষ্টাকে লাভের ক্ষেত্রেও এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। জায়সী অধ্যাত্মরসের কবি হিসেবে সুফীতত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য তাঁর কাব্যে রূপককাব্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। পরিশেষে মানবজীবনের পরিণাম দেখিয়েছেন। আলাওল সুফী মতানুসারী কবি হলেও তাঁর পদ্মাবতী প্রকৃতপক্ষে মানবপ্রেমের কাহিনি। জায়সী রূপককৌশল, প্রেমের কাহিনি ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে স্বীয় প্রতিভার সার্থক পরিচয় দিয়েছিলেন; আলাওল বিশুদ্ধ প্রেমের আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। তবে আলাওলের কাব্যে গভীর আধ্যাত্মিক কথাও ব্যক্ত হয়েছে। কবি জায়সী ও কবি আলাওলের রচনাদর্শের পার্থক্য সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমদ মন্তব্য করেছেন, 'জায়সীর অভিজ্ঞতা ও আলাওলের অভিজ্ঞতা এক নয়। জায়সীর মানস পরিমণ্ডল গঠনে ধ্যান ছিল, সাধনা ছিল। তিনি আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাকে অঙ্গীকার করে কাহিনি পরিকল্পনা করেছেন। আলাওল জায়সীর কাব্যের রূপকতত্ত্ব বুঝতে পারেন নি এমন নয়, তিনি অনুবাদে তা রক্ষা করতে পারেন নি। এমনও হতে পারে রাজসভার বিলাসী, ধনাঢ্য রঙ্গপ্রিয় পাঠকেরা গল্পের আনন্দ চেয়েছিলেন, তত্ত্বের গরিমা চান নি। আলাওল কাহিনির গ্রহণ-বর্জন করে পাঠকের মানসিক সে চাহিদা পূরণ করেছেন।'

পদ্মাবতী রচনায় আলাওল জায়সীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হলেও বর্ণনা পদ্ধতির বিশিষ্টতা এবং বিশেষ বিশেষ সংযোজনের মাধ্যমে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। উভয়ের কাহিনিতে পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। আলাওল কোথাও মূল ছেড়ে ভিন্ন পথে চলেছেন, কোথাও নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে, বর্ণনার ধারাও পরিবর্তিত হয়েছে। মূলের ছন্দ ও আঙ্গিকের পরিবর্তন করে আলাওল স্বকীয়তা ফুটিয়ে তুলেছেন। রূপবর্ণনায় কবি অনুবাদের পথরেখা অনুসরণ করলেও নিজস্ব ভাবকল্পনার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ প্রায় সবটুকু ভাবানুবাদ, তাই পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিচয় কাব্যের সর্বত্র পাওয়া যায়। আলাওল কবি, কিন্তু পণ্ডিত কবি। তাঁর কাব্যে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে। রত্নসেন সম্পর্কে কবি যে কথা লিখেছিলেন তা তাঁর নিজের পাণ্ডিত্য সম্পর্কেও সত্য বিবেচিত হতে পারে :

শাস্ত্র ছন্দ পঞ্জিকা ব্যাকরণ অভিধান।
একে একে রত্নসেন করিল বাখান ॥
সঙ্গীত পুরাণ বেদ তর্ক অলঙ্কার।
নানা বিধ কাব্যরস আগম বিচার ॥
নিজে কাব্য যতেক করিল নানা ছন্দ।
শুনিয়া পণ্ডিতগণ পড়ি গেল ধন্দ ॥
সবে বলে তান কণ্ঠে ভারতী নিবাস।
কিবা বররুচি ভবভূতি কালিদাস ॥

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, 'বাস্তবিক তাঁহার সমান নানা বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত সে যুগে আর কেহই ছিলেন না।' পদ্মাবতী কাব্যের সর্বত্র এই পাণ্ডিত্যের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষণীয়। কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে জায়সীর উত্তরাধিকার নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলাওলের নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডারের পরিচায়ক। বিশেষত ছন্দশাস্ত্র, অষ্টনায়িকাভেদশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, অশ্বচালনাবিদ্যা, চৌগানখেলা, বিবাহাচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে আলাওল মৌলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর যে মন্তব্য তাতেই তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটেছে। কাব্য সম্পর্কে তাঁর কয়টি পংক্তি :

কাব্যকথা সকল সুগন্ধি ভরিপুর।
দূরেতে নিকট হয় নিকটেতে দূর ॥
নিকটেতে দূর যেন পুষ্পতে কণ্টিকা।
দূরেতে নিকট মধু মাঝে পিপীলিকা ॥
বন খণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বস।
নিয়ড়ে থাকিয়া ভেকে না জানয় রস ॥

প্রেম সম্পর্কে তাঁর ধারণা :

প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ ॥
যার হৃদয়ে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তি পদ পাইল সে সবার ঠাকুর ॥
প্রেম হন্তে পুত্র দারা প্রেম গৃহবাস।
প্রেমত ধৈর্যতা রূপ প্রেমত উদাস ॥
প্রেম মূলে ত্রিভুবন যত চরাচর।
প্রেমতুল্য বস্তু নাহি সংসার ভিতর ॥

এসব ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে আলাওলের পাণ্ডিত্যের গভীরতা অনুভব করা যায়। ড. দীনেশচন্দ্র সেন এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'কবি পিঙ্গলাচার্যের মগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্ট মহাগণের তত্ত্ববিচার করিয়াছেন; খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা ও কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্ট নায়িকা ভেদ ও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজি কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লগ্নাচার্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন প্রবীণা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশান্তিবন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া ধরিয়াছেন।' কোন কোন ক্ষেত্রে কবি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে কাব্যকলার দাবি উপেক্ষা করেছেন। জ্ঞানের পরিচয়ে সে সব ক্ষেত্রে নিছক তথ্য-সমাবেশ হয়েছে—কবিত্ব বিকাশের কোন সুযোগ পায় নি। সেই জন্য তাঁর কাব্যকে পাণ্ডিত্যভারে কিছুটা পীড়িত বলে কেউ কেউ মনে করেন।

কবি অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনায়। সেখানে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ করা যায়। এ দিক থেকে তিনি মধ্যযুগের সকল কবির উর্ধ্বে স্থান পাওয়ার যোগ্য। রূপ বর্ণনার নিদর্শন :

প্রভারুণ বর্ণ-আখি সুচারু নির্মল।
লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলোৎপল ॥
কাননে কুরঙ্গ জলে সফরী লুকিত।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র অঞ্জন রঞ্জিত ॥
আঁখিত পুত্তলি শোভে রক্ত শ্বেতান্তর।
তুলিতে কমল রসে নিচল ভ্রমর ॥
কিঞ্চিৎ লুকিত মাত্র উথলে তরঙ্গ।
অপাঙ্গে ইঙ্গিতে হএ মুনিমন ভঙ্গ ॥

আলাওল পদ্মাবতী কাব্যে তৎকালীন আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিরও প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে কবির দক্ষতার পরিচয় কাব্যের সর্বত্র বিদ্যমান। জ্যোতিষশাস্ত্রে কবির জ্ঞানের পরিচয় মিলে যাত্রার শুভ-অসুভ বর্ণনায় :

চলিতে কুশল ভাল দেখিল বিদিত।
ধেনু বৎস সংযোগে দক্ষিণে উপস্থিত ॥
দধি লে দধি লে করি ডাকে গোয়ালিনী।
পূর্ণ কুম্ভ মাথে দেখ সুভগা রমণী ॥
নাগ শিরে দেখিলেন্ত দক্ষিণে খঞ্জন।
বামেতে শৃগাল ফিরি করে নিরিক্ষণ ॥
পুষ্পের পসার লই সুমুখে মালিনী।
শির পরে মণ্ডলয় সচেন শিখিনী ॥

কবি আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে অনেক সুভাষিত উক্তি মিলে। যেমন :

১. দিবসের মর্ম কভু না বুঝে পেচক।
২. যমে প্রাণ হরি নিতে কিবা নিশি দিশি।
৩. দুগ্ধ মাঝে ননী আছে জগতে প্রচার।
৪. ভাগ্য বিপরীত হৈলে খণ্ডে সব সুখ।
৫. ললাট লিখন দুঃখ যায় না খণ্ডন।
৬. পড়শী হৈলে শত্রু গৃহে সুখ নাই।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কবি আলাওলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অন্যান্য কবির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে ড. ওয়াকিল আহমদ মন্তব্য করেছেন, 'অন্যান্য কবির গুণগুলো কমবেশি আলাওলের মধ্যে আছে, কিন্তু আলাওলের সব গুণ একত্রে কোন কবির মধ্যে নেই। আলাওল গীতিকবি, আখ্যানকবি, তাত্ত্বিক কবি। তিনি সাধক ও গায়ক। তিনি বহু ভাষাবিদ, বহু শাস্ত্রবিদ। এক কথায় তিনি রাজসভার পণ্ডিত কবি। কবিত্বের সামগ্রিক বিচারে আলাওল 'মহাকবি' আখ্যায় ভূষিত হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য।'

আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল। আরাকানরাজের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের উৎসাহে কবি ১৬৫৮ সালে এ কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। এ প্রসঙ্গে আলাওল লিখেছেন :

শ্রীযুত মাগন মনে হৈল অতি সুখ ॥
আক্ষারে বুলিলা গুরু কর অবধান।
ফারসী ভাষেতে এই প্রসঙ্গ পুরাণ ॥
সকলে না বুঝে এই ফারসী কিতাব।
পয়ার প্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব ॥
প্রেমের পুস্তক এই সয়ফুল মুলুক।
নানা অপরূপ কথা শুনিতে কৌতুক ॥
গুরুপদ ভজিয়া কহে হীন আলাওল।
নাশিয়া মনের ঘোর করহ নির্মল ॥

কিন্তু মাগন ঠাকুরের মৃত্যুতে কবি ভগ্নোৎসাহ হয়ে কাব্যরচনা বন্ধ রাখেন। পরে আনুমানিক ১৬৬৯ সালে সৈয়দ মুসার অনুরোধে তা সমাপ্ত করেন। কাব্যটি প্রেমমূলক কাহিনিকাব্য। পরীরাজকন্যা বদিউজ্জামালের ছবি দেখে রাজপুত্র সয়ফুলমুলুক মুগ্ধ হয়। কিন্তু রাজকন্যার সন্ধান তার জানা নেই। একরাতে সে স্বপ্নে বদিউজ্জামালের পরিচয় লাভ করে। তখন সয়ফুলমুলুক বন্ধু সাইদকে সঙ্গে নিয়ে পরীরাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। পথের নানা বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে সয়ফুলমুলুক বহু কষ্টে বদিউজ্জামালকে লাভ করতে সক্ষম হয়। এ কাব্যের কাহিনির উৎস আলেফ লায়লা বা আরব্য উপন্যাস। কবি আলাওল আলেফ লায়লার ফারসি অনুবাদ অবলম্বন করে তাঁর কাব্যের রূপ দেন। পরী ও মানুষের এই প্রেমকাহিনি রোমান্সের দিক থেকে নতুনত্বহীন, তবে কবি এতে সুন্দর বর্ণনাভঙ্গি ফুটিয়ে তুলেছেন। কাব্যটি সমাপ্ত করার জন্য সৈয়দ মুসার অনুরোধ জ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে কবি ভাবছিলেন 'বৃদ্ধকালে গ্রন্থকর্ম উচিত না হএ।' কিন্তু পরে বললেন, 'মোহন্ত জনের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি। প্রবেশিলুঁ কাব্য-ঘরে করতার স্মরি।' জীবনের শেষ দিকে রচিত এ কাব্যে কবি যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকে একে মৌলিক রচনা বলে মনে করেন। অনুবাদের অবলম্বন নয় বরং কাহিনির উৎস হিসেবে আলেফ লায়লাকে গ্রহণ করাই এই সিদ্ধান্তের কারণ। কাব্যটিতে পার্থিব নরনারীর রোমান্টিক প্রেমের কথা বর্ণিত হয়েছে। মানুষের সঙ্গে পরীরাজ কন্যার প্রেম, দেহ ও দেহাতীত, মর্ত্য ও অমর্ত্যের ভাববন্ধন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কবির বৃদ্ধ বয়সের রচনা হলেও তাতে সরসতার অভাব ঘটে নি। অনেকটা নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত বলে এতে স্বাধীনভাবে কল্পনা প্রকাশের অবকাশ ছিল। কাব্যটি অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

দৌলত কাজী রচিত সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী কাব্যের অবশিষ্টাংশ আলাওলের তৃতীয় রচনা। দৌলত কাজীর এ অসমাপ্ত গ্রন্থটি আলাওল আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্রসুধর্মার অমাত্য সোলেমানের উৎসাহে ১৬৫৯ সালে সমাপ্ত করেন। কাব্যের রতনকলিকা আনন্দবর্মার উপাখ্যান আলাওলের নিজের সংযোজন। কবি দৌলত কাজীর রচনায় নিজের লেখা জুড়ে দিতে গিয়ে কবি আলাওল বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন :

শ্রীযুত দৌলত কাজী মহাগুণবন্ত।
তানে আদ্যে করিয়া রচিলা আদি অন্ত ॥
তান সম আমার না হয় পদ-গাঁথা।
গুণিগণ বিচারিয়া কহ সত্য কথা ॥
মোর মত কাব্য সাঙ্গ করিলুঁ পাঞ্চালি।
ভগ্ন বস্ত্র কাজে লাগে যদি দেয় তালি ॥

দৌলত কাজীর মত সার্থকতা আলাওলের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় নি। কবি আলাওলের রচনার তুলনায় দৌলত কাজীর কাব্যাংশ কবিত্বগুণে উন্নত বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু কবি আলাওল তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যে যে অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তার সমকক্ষতা দৌলত কাজী দাবি করতে পারেন না। দৌলত কাজীর মৃত্যুর অনেক দিন পরে কবি আলাওল আদিষ্ট হয়ে কাব্যটির সমাপ্তি কালে হয়ত স্বকীয় প্রতিভার যথোপযুক্ত প্রয়োগ করতে সক্ষম হন নি। 'মানুষের স্ব স্ব ভাগ্যনির্ভরতা ও অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়তা প্রতিপাদনই' এ কাব্যের বর্ণিত গল্পের উদ্দেশ্য। ধর্মবতীপুরীর রাজা উপেন্দ্র দেব তাঁর রানীদের বলেছিলেন :

আমার ভাগ্যের লাগি তুমি সব সুখভোগী
আমি বিনে না জানি কি গতি ॥
সংসারের নারী জাতি স্বামী ভাগ্যে ভাগ্যবতী
রাজভাগ্য সবার অধিক।
পুরুষ আশ্রয় বিনে নারী সবে কদাচনে
না পারএ বঞ্চিতে খানিক ॥

রানী রতনকলিকা এ মন্তব্যের প্রতিবাদ করলেন :

একজন ভাগ্যে আনে না কর এ সুখ।
নিজভাগ্য অনুরূপে ভুঞ্জে সুখ ভোগ ॥
যার যেই কর্মে থাকে কর্ম নিয়োজিত।
নিবন্ধেতে আনি যাকে করে সেই রীত ॥
মোর কর্মে আছে হৈতে রমণী তোমারি।
তে কারণে যোগ্য গৃহে হৈলুঁ অবতারি ॥

অবশেষে রানীর কথাই ঠিক হয়েছিল। আলাওল তাঁর কাহিনি রূপায়ণে দৌলত কাজীর মত প্রাঞ্জলতা ও স্বাভাবিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিতে পারেন নি।

আলাওলের চতুর্থ রচনা 'সপ্তপয়কর'। কাব্যটি পারস্য কবি নিজামী গঞ্জভীর 'হপ্তপয়কর' নামক কাব্যের অনুবাদ। তবে তা আলাওলের অন্যান্য কাব্যের মতই ভাবানুবাদ। আরাকানরাজের সমরমন্ত্রী সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে ১৬৬০ সালে কবি এ কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থোৎপত্তি সম্পর্কে কবি লিখেছেন :

আরবী ফারসী ভাষা বয়েতের ছন্দ।
বিশেষ নিজামী বাক্য সরস প্রবন্ধ ॥
এই গ্রন্থ মাঝে যথ আছে ইতিহাস।
পয়ার প্রবন্ধে তার করহ প্রকাশ ॥

একে মহাপুরুষ বিশেষ পালয়িতা।
পিতার সমান শাস্ত্রে বোলে অন্নদাতা ॥
তান আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি কদাচিত।
যদ্যপি পিঁজরা জীর্ণ চিন্তাএ পীড়িত॥
যদি বা অযোগ্য আমি গ্রন্থ রচিবার।
তান ভাগ্যালোকে হৈব সমুদ্র সাঁতার ॥

এ কাব্যে আরব ও আজমের অধিপতি নোমানের পুত্র বাহ্‌রামের রাজ্যলাভ এবং তাঁর সাতটি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বাহ্‌রাম তাঁর রাজ্যের পার্শ্ববর্তী সাতটি রাজ্য জয় করে সে সব রাজ্যের সাত রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। রাজকন্যারা প্রতি রাত্রে এক একটি গল্প বলে বাহ্‌রামকে শোনাতেন। এ ধরনের সাতটি গল্প নিয়েই 'সপ্তপয়কর'। ফারসি কবি নিজামীর শ্রেষ্ঠ পঞ্চকাব্যরত্ন বা 'খামস্‌' এর অন্যতম কাব্য হিসেবে হপ্তপয়করের স্থান। এই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যটিকে আলাওল স্বাধীন অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা কাব্যে রূপান্তরিত করেন। এ কাব্যে গল্পগুলো খুব সরল ভাবে বর্ণিত হয়েছে; তবে কাব্যমূল্য নিতান্তই নগণ্য।

'তোহফা' গ্রন্থটি কবি আলাওলের পঞ্চম রচনা। এই কাব্য বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ ইউসুফ গদা দেহলভীর 'তোহ্‌ফাতুন নেসায়েহ্‌' নামক ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ। আলাওল ১৬৬৪ সালে এ কাব্য সমাপ্ত করেন। তখন নিজের অবস্থা সম্পর্কে কবি বলেছেন :

মুই আলাওল হীন দৈববশ অনুদিন
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকাল।

ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্বোপদেশপূর্ণ এ গ্রন্থটি শ্রীমন্ত সোলেমানের নির্দেশে রচিত হয়েছিল। তোহ্‌ফা গ্রন্থটি কাব্যাকারে রচিত হলেও ধর্মীয় নীতিকথাই এতে রূপ লাভ করেছে। ধর্মীয় তত্ত্বমূলক ও নৈতিক উপদেশাত্মক কাব্য তোহফা পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এর বিভিন্ন অধ্যায়ে মুসলমানদের ধর্ম আচার-আচরণ কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তৌহিদ, ইমান, এল্‌ম, শাস্ত্রব্যবস্থা, এবাদত, বিবাহ ইত্যাদি ধর্মীয় সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে পয়ার ছন্দে রূপ দিয়ে আলাওল মুসলমানদের জন্য অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে এর মর্যাদা দিয়েছেন। আলাওল ফারসি মূল কাব্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে বলেছেন :

কল্পনা বচন নহে সাক্ষী ফোরকান।
ইমান সবের কথা হাদিসে ফরমান ॥
*   *   *
আরবী কিতাব হন্তে ফারসী ভাষাএ।
রচিলা বয়েত ছন্দে ইসুফ গদাএ ॥
ভক্তি ভাবে একচিত্তে যে জনে পড়এ।
জ্ঞানবৃদ্ধি অতি হএ পাতক নাশএ ॥

'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে তোহ্ফা কাব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ধর্মের করণীয় ক্রিয়াকলাপ ও তৎপ্রসঙ্গে নানা তত্ত্বকথা এমন সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা মুদ্রিত হইলে আধুনিক যুগেও মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মজীবনের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।' ড. আহমদ শরীফ তোহ্ফা কাব্য সম্পাদনা উপলক্ষে মন্তব্য করেছেন, 'পদ্যে রচিত হলেও তোহ্ফা 'কাব্য রস বাক্য নহে নীতিশাস্ত্র কথা।' কাজেই এখানে কবিত্বের ও রসিকতার অবকাশ নেই। ধর্মভীরু কবি মূলের আক্ষরিক অনুবাদ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁর উপাখ্যানগুলির মত 'স্থানে স্থানে নিজ মন উক্তি' প্রকাশে এখানে তিনি সাহসী হন নি। তবে বাচনভঙ্গির সরসতা আছে। বাকপটুতারও অভাব নেই। শাস্ত্র নীতির কথা বা epigram সুভাষিত বুলির আকারেও প্রকাশিত হয়েছে।'

আলাওলের ষষ্ঠ গ্রন্থ 'সেকান্দরনামা'। কাব্যটি নিজামী গঞ্জভীর ফারসি 'সেকান্দর নামা' গ্রন্থের অনুবাদ। নবরাজ উপাধিধারী মজলিস নামক আরাকানরাজ চন্দ্র সুধর্মার জনৈক অমাত্যের অভিপ্রায়ে গ্রন্থটি রচিত।

সেকান্দরনামা কাব্যে কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। সে আত্মপরিচয় পদ্মাবতী কাব্যে প্রদত্ত আত্মপরিচয়ের অনুরূপ। তবে এখানেও কবির পরিচয়টি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। আগের মতই হার্মাদদের হাতে পিতার শহীদ হওয়ার কথা আছে, কিন্তু পিতার নামের উল্লেখ নেই। কবি তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কেও কিছু বলেন নি। তাই এসব তথ্য রহস্যময়ই রয়ে গেছে। 'সেকান্দরনামা' রচনাকালের আগে রোসাঙ্গে শাহ শুজা ঘটিত বিপ্লব কবিকে বিপদাপন্ন করেছিল। এ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন :

সাহ শুজা রোসাঙ্গে আইল দৈবগতি।
হত বুদ্ধি পাত্র সবে ছিল হত মতি ॥
*　　　*　　　*
মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ ॥
*　　　*　　　*
এহিমতে একাদশ অব্দ বহি গেল।
পুনরপি ভাগ্যরবি প্রকাশিত ভেল ॥

নবরাজ মজলিস আলাওলকে গ্রন্থরচনার অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন :

মছজিদ পুষ্কর্ণী নাম নিজ দেশে রহে।
গ্রন্থকথা যথাতথা ভক্তি ভাবে কহে ॥
গ্রন্থ পড়ি সকলের দীপ্ত হএ মন।
নাম স্মরি মহিমা করএ কত জন ॥

কবি আরও লিখেছেন :

সমুদ্রে সাঁতার সম গ্রন্থের গ্রথন।
বিশেষ পারস্য ভাষা বয়েত ভাঙ্গন ॥

মহন্ত নিজামী বাক্য ইঙ্গিত আকার।
বিশেষত পঞ্চ-ভাষ কিতাব মাঝার ॥
আরবী ফারসী আদ্য নসরানী এহুদী।
পাহলবী সঙ্গে পঞ্চ ভাষের অবধি ॥
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি তারে রচিতে অশক্য।
কেবল শ্রীমন্ত মজলিস-ভাগ্য লক্ষ্য ॥
ভাগ্যধর উপরে ঈশ্বর কৃপা অতি।
লঙ্ঘিতে আদেশ তান কাহার শকতি ॥
শাস্ত্র কহে অন্নদাতা ভয়ত্রাতা বাপ।
না ধরিলে তান আজ্ঞা ঘোরতর পাপ ॥
তেকারণে সভা আগে কৈলুঁ অঙ্গীকার।
গুরুকে স্মরিয়া দিলুঁ সাগরে সাঁতার ॥

গ্রন্থের রচনাকাল সম্ভবত ১৬৭২ সাল। আলাওল তখন অতি বৃদ্ধ, শোকতাপ ও অর্থাভাবে বিপর্যস্ত। কাব্যের মূল বিষয় সেকান্দর বা আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয় কাহিনি। আলেকজান্ডারের পিতা ফিলিপ, শিক্ষাগুরু ও মন্ত্রী আরস্তুতালিশ (আরিস্টটল), পারস্যরাজ দারা বা দরায়ুস প্রভৃতির কাহিনি সেকান্দরনামা কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ এবং কান্যকুজরাজ, চৈনিক ও রুশরাজের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ইত্যাদি কাহিনি কাব্যাকারে রূপ লাভ করেছে। কাব্যটিতে যুদ্ধবিগ্রহের দীর্ঘ বর্ণনা আছে, এতে অনেক রূপকথাধর্মী অনৈতিহাসিক গল্পও বিদ্যমান। 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে এ কাব্যের বিশেষ প্রশংসা করে বলা হয়েছে, 'যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় পূর্ণ হইলেও প্রাসঙ্গিকভাবে বহু অমূল্য উপদেশ সন্নিবিষ্ট করায় গ্রন্থখানি অত্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহার ভাষা সর্বত্র মেঘনির্ঘোষবৎ গম্ভীর।'

আলাওল ছিলেন সঙ্গীতবিদ। সঙ্গীত শিক্ষাদানকালে প্রয়োজনের তাগিদে রাগতালের ধ্যান ও ব্যাখ্যা রচনা এবং সেই সঙ্গে উদাহরণচ্ছলে গীত (পদসমূহ) রচনাতেই তাঁর কাব্যের হাতেখড়ি হয়েছিল। এ গানগুলো কবির মৌলিক রচনা। আলাওল বাংলা ও ব্রজবুলিতে বৈষ্ণবপদও রচনা করেছিলেন। এই রচনা গতানুগতিক সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়—তাতে ভক্তহৃদয়ের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। পদ্মাবতী কাব্যে ব্রজবুলির ভাষায় ও বৈষ্ণবীয় ঢঙে রচিত একটি গানের নমুনা :

তুয়া পদ হেরাইতে রাতুল নয়ান যুগে
কামিনী মোহন কটাক্ষ হীন ভেল।
প্রেমমদে বিহ্বল সতত বহএ লোর
অবয়ব পরহরি শুদ্ধি বুদ্ধি হরি গেল ॥
চল চল প্রভুর সে তলপে আরতি ॥

পতি গতি অতি অল্পে। ধুয়া
চন্দন চন্দ্রশীতল মলয়ানিল ছল
সৌরভ বিশিখ খরতর লাগে।
ভ্রমর কোকিল রব শুনত পরাভব
মন্মথ বাণ আনল উপর জাগে ॥

কবি আলাওলের কাব্যসাধনা মোটামুটি অনুবাদমূলক। তবে তাঁর অনুবাদে মৌলিক রচনার স্পর্ধা রাখে। জ্ঞানের প্রাচুর্যে, শব্দসম্ভারের ব্যাপকতায়, বিভিন্ন ভাষাজ্ঞানের দক্ষতায় ও কুশল শিল্পচর্চায় আলাওলের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। তাঁর রচনা অনুবাদমূলক হলেও প্রধানত তৎসম শব্দের ব্যবহারে, বাংলা ছন্দের পরিচর্যায়, বুদ্ধি ও জ্ঞানগত নতুন নতুন সংযোজনে তিনি মৌলিক কবি হিসেবে বিবেচ্য। তাছাড়া তাঁর সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্যটির উপাখ্যানের আভাস ও মৌল কাঠামো আরব্যোপন্যাস থেকে গৃহীত হলেও কাহিনি নির্মাণ ও বর্ণনা সর্বাংশে কবির নিজস্ব। সতীময়না ও লোরচন্দ্রানীর যে অংশ আলাওলের রচনা তা তাঁর নিজস্ব কল্পনার পরিচায়ক—অনুবাদ নয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচিত আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মহাকবি আলাওল একজন অসাধারণ কবি ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে নতুন প্রাণলাভ করিয়াছিল।...অনুবাদে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য রক্ষা করিয়া নিজের অসামান্য প্রতিভার সাহায্যে তাহাতে মৌলিকতার ছাপ দিতে তাঁহার ক্ষমতা অতুলনীয়। এইজন্য তাঁহার গ্রন্থগুলি অনুবাদের গণ্ডী ছাড়াইয়া নূতন সৃষ্টির সৌন্দর্যে মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অনুবাদের ভাষায় কোথাও আড়ষ্টতা নাই, কোথাও শ্রুতিকটুতা নাই, উহা পার্বত্য নির্ঝরিণীর মত স্বচ্ছন্দে সাবলীল গতিতে বহিয়া চলিয়াছে।' মানবীয় প্রণয়কাহিনি ও অধ্যাত্ম প্রেমসাধনা—এই দুই প্রেরণাকে সম্মিলিত করে আলাওল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করেছেন।

আবদুল করীম খোন্দকার

আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার যে বিকাশ সাধিত হয়েছিল তার প্রভাবেই আবদুল করীম খোন্দকারের আবির্ভাব ঘটে। তিনি আরাকানের অধিবাসী ছিলেন এবং রোসাঙ্গের রাজধানী ম্রোহং বা মুরুং শহরে বসে রোসাঙ্গরাজ প্রদত্ত 'সাদিউকনামা' উপাধিধারী রাজ-কোষাধ্যক্ষ আতিবর নামক এক ব্যক্তির আদেশে ১৬৯৮ সালে 'দুল্লা মজলিস' কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি ফারসি গ্রন্থের ভাবানুবাদ। এতে হযরত মুহম্মদ (স) ও অপর কয়েকজন নবী এবং রাসুলুল্লাহ্‌র পরবর্তীকালের কয়েকজন মহাত্মার কথা বর্ণিত হয়েছে। কবি রোজা, নামাজ ও বেহেশতের বিবরণও দান করেছেন। 'হাজার মসাইল' ও 'নূরনামা' নামে দুটি কাব্যও তিনি রচনা করেছিলেন।

শমশের আলী

'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে শমশের আলীকে অন্যতম কবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর কাব্যের নাম 'রিজওয়ান শাহ'। কবির জন্ম চট্টগ্রামের সুলতানপুর গ্রামে। তিনি ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় আরাকানে গমন করেন এবং সেখানেই তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। তিনি রোসাঙ্গে অবস্থান কালে 'রিজওয়ান শাহ' কাব্য রচনা করেছিলেন। সম্ভবত তিনি কোন রোসাঙ্গ-রাজ-অমাত্যের অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন নি। কাব্যটি উপাখ্যানমূলক। কাব্যে বর্ণিত স্থান খোরাসান ও পারস্য দেশ হলেও বাংলাদেশের নানা প্রচলিত কাহিনি এতে স্থান পেয়েছে। কবি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি, ফারসি, উর্দু ও সংস্কৃতে তাঁর দখল ছিল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরাকান রাজসভার কবিগণের অবদান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের ধর্মীয় বিষয়াবলম্বনে রচিত কাব্যের পাশাপাশি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে তাঁরা এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। মানবিক প্রণয়কাহিনি সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁরা মধ্যযুগের সাহিত্যকে বৈচিত্র্যধর্মী করে তুলেন। সংস্কৃত ভাষার বাইরে হিন্দি ও ফারসি ভাষায় রচিত সাহিত্য বাংলায় অনুবাদের প্রথম কৃতিত্ব আরাকান রাজসভার কবিগণের। দেশীয় রূপকথা অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন দেখান কোরেশী মাগন ঠাকুর তাঁর চন্দ্রাবতী রচনার মাধ্যমে। আলাওলের হাতে ফারসি সাহিত্যের গল্পকাহিনি নবরূপে রূপায়িত হয়ে ওঠে।

আরাকান রাজসভার কবিগণই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের গতানুগতিকতা পরিহার করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুনত্ব দেখান। উন্নততর সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ স্থাপন করে এবং কাব্যের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আনয়ন করে আরাকানবাসী কবিগণ ১৬২২ থেকে ১৬৮৪ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলা সাহিত্যের যে অগ্রগতি সাধন করেছিলেন তা সে সময়ে বাংলা ভাষার আপন গৃহেও সম্ভব হয় নি। আরাকান রাজসভার অমাত্যগণের উৎসাহ বাংলা সাহিত্যের বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। এখানকার কবিগণের আদর্শে পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যের ধারা সম্প্রসারিত হয়েছে। কবিগণ তাঁদের কাব্যের উপাদান বাইরে থেকে সংগ্রহ করলেও সে সবের আবেদন সহজেই বাঙালি জনগণকে বিমুগ্ধ করেছে। সমুদ্র-তীরবর্তী চট্টগ্রামের সন্নিহিত রোসাঙ্গ রাজদরবারের সংশ্লিষ্ট কবিগণের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির যে সমন্বয় ঘটেছিল তার প্রভাবে বাংলা ভাষার মধ্যে এসেছে সমৃদ্ধি, সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এসেছে নতুন চেতনা। বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক ক্লান্তিতে, পুরনো বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুবর্তনে রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে রোসাঙ্গ রাজসভার কবিরা একটি নতুন বাতায়ন খুলে দিলেন। বস্তুতপক্ষে, এই কবিগণই মধ্যযুগে মানবিক প্রণয়কাহিনি পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দসম্পদে, ছন্দবৈভবে, পাণ্ডিত্যগর্বে ও ভাষার ঝঙ্কারে বাংলা সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যচর্চার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণ নিরূপণের চেষ্টা কর এবং এই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

২। আরাকান রাজসভায় মানবীয় যে সমস্ত কাহিনিকাব্য রচিত হইয়াছিল একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তাহাদের একটি পরিচিতি লিপিবদ্ধ কর।

৩। 'ধর্মভিত্তিক পুরাণ-মঙ্গলকাব্য প্লাবিত মধ্যযুগে ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক কাহিনিকাব্য সৃষ্টি অভাবিতপূর্ব এবং অনন্য। এই ধরনের কাব্যসৃষ্টির গৌরব একমাত্র মুসলমান কবিদের প্রাপ্য, বিশেষ করে আরাকান রাজসভার কবিকুলের।'—আলোচনা কর।

৪। 'গতানুগতিক ক্লান্তিতে, পুরনো বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুবর্তনের রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে রোসাঙ্গ রাজসভায় কবিরা একটি নতুন বাতায়ন খুলে দিলেন।'—এই উক্তি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আলাওলের কবিকৃতি সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ লিখ।

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোসাঙ্গ রাজসভার কি দান রহিয়াছে? এই অবদান কোন সময়ের? ইহা কি সভাসাহিত্য? এই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কি—বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৬। 'রোসাঙ্গের রাজসভায় আমরা বাংলা ভাষার প্রথম শক্তিশালী মুসলমান কবির দর্শন পাই এবং প্রথম আদরণীয় মানবীয় প্রণয়কাহিনির পরিচয় লাভ করি—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই দুইটি বস্তুরই গভীর অর্থ আছে।'—এই গভীর অর্থ কোনখানে? বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাও।

৭। 'বাংলাদেশ থেকে দূরে, বি-ভাষাশ্রয়ী আরাকানে কয়েকজন বাঙালি কবি ও সাহিত্যমোদী বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি ও সেবার যে দীপশিখা জ্বালিয়েছিলেন তার আলো আজও অম্লান হয়ে আছে।'—আলোচনা কর।

৮। মগের মুল্লুক আরাকানের রাজসভায় বাংলা ভাষা ও কাব্যচর্চার প্রকৃত কারণ কি ছিল? এখানকার কবিদের রচনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। রচনাগুলির উপর উক্ত রাজসভায় কি প্রভাব পড়িয়াছিল তাহা উল্লেখ কর।

৯। 'আরাকান রাজসভার সাহিত্য কেবল যে মূল বঙ্গদেশ হইতে স্থানগতভাবে দূরত্ব রচনা করে তাহাই নয়, সমকালীন বাংলা সাহিত্যের তুলনায় তাহার বিষয়বস্তু এবং আদর্শও ভিন্ন।'—আলোচনা কর।

১০। 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' নামের যাথার্থ্য যাচাই কর এবং রোসাঙ্গ নগরের কবিদের এবং তাঁহাদের কাব্যসমূহের নামোল্লেখ করিয়া বাংলার বাহিরে বাংলা সাহিত্য রচিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

১১। আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যচর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১২। টীকা লিখ : আলাওল, তোহ্‌ফা, পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, সপ্তপয়কর, দৌলত কাজী, মাগন ঠাকুর।

চতুর্দশ অধ্যায়

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের ফল ছিল দু ধরনের—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। তের শতকের মুসলমান শাসনের সূত্রপাতের পরিপ্রেক্ষিতে অবহেলিত বাংলা সাহিত্য তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে প্রাণচাঞ্চল্য লাভ করেছিল তা হল পরোক্ষ ফল। আবার মুসলমান কবিরা পনের-ষোল শতকে রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রত্যক্ষ অবদান সৃষ্টিতে সক্ষম হন। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান শাসকগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় যে নবজীবনের সূচনা হয়েছিল সে সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বাংলার মুসলমানদের যতখানি হাত রহিয়াছে, হিন্দুদের ততখানি নহে। এদেশের হিন্দুগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্মদাতা বটে; কিন্তু তাহার আশৈশব লালন পালন ও রক্ষাকর্তা বাংলার মুসলমান। স্বীকার করি, মুসলমান না হইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মনোরম বনফুলের ন্যায় পল্লীর কৃষককণ্ঠেই ফুটিয়া উঠিত ও বিলীন হইত, কিন্তু তাহা জগতকে মুগ্ধ করিবার জন্য উপবনের মুখ দেখিতে পাইত না, বা ভদ্র সমাজে সমাদৃত হইত না।' পরোক্ষ এই প্রভাবের সঙ্গে মধ্যযুগে মুসলমান কবিগণ মানবিক গুণসম্পন্ন রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে প্রত্যক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান এই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান বা প্রণয়কাহিনি। এই শ্রেণির কাব্য মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয় কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মত মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। মধ্যযুগের কাব্যের ইতিহাসে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর আধিপত্য ছিল, কোথাও কোথাও লৌকিক ও সামাজিক জীবনের ছায়াপাত ঘটলেও দেবদেবীর কাহিনির প্রাধান্যে তাতে মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এই শ্রেণির কাব্যে মানব-মানবীর প্রেমকাহিনি রূপায়িত হয়ে গতানুগতিক সাহিত্যের ধারায় ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে। মুসলমান কবিগণ হিন্দুধর্মাচারের পরিবেশের বাইরে থেকে মানবিক কাব্য রচনায় অভিনবত্ব দেখান। রোমান্টিক কবিরা তাঁদের কাব্যে ঐশ্বর্যবান, প্রেমশীল, সৌন্দর্যপূজারী, জীবনপিপাসু মানুষের ছবি এঁকেছেন। ড. সুকুমার সেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে মন্তব্য করেছেন, 'রোমান্টিক কাহিনি কাব্যে পুরানো মুসলমান কবিদের সর্বদাই একচ্ছত্রতা ছিল।' মুসলমানদের ধর্মীয়

আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দেবদেবীর কল্পনার কোন অবকাশ ছিল না। তাই বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় পরিবেশের বাইরে থেকে এই কবিরা স্বতন্ত্র কাব্যধারার প্রবর্তন করেন। ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন এসব কাব্যে নতুন ভাব, বিষয় ও রসের যোগান দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যের বাইরে নতুন ভাবনা চিন্তা ও রসমাধুর্যের পরিচয় এ কাব্যধারায় ছিল স্পষ্ট। ধর্মের গণ্ডির বাইরে এই শ্রেণির জীবনরসাশ্রিত প্রণয়োপাখ্যান রচিত হয়েছিল বলে তাতে এক নতুনতর ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়।

রোমান্টিক প্রণয়কাব্যগুলোতে স্থান পেয়েছে বিষয়বস্তু হিসেবে মানবীয় প্রণয়কাহিনি। এই প্রণয়কাহিনি মর্ত্যের মানুষের। ড. ওয়াকিল আহমদ মন্তব্য করেছেন, 'মানুষের প্রেমকথা নিয়েই প্রণয়কাব্যের ধারা, কবিগণ মধুকরী বৃত্তি নিয়ে বিশ্বসাহিত্য থেকে সুধারস সংগ্রহ করে প্রেমকাব্যের মৌচাক সাজিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তা অভিনব ও অনাস্বাদিতপূর্ব। মুসলমান কবিরাই এ কৃতিত্বের অধিকারী।'

প্রণয়কাব্যগুলোর বিকাশ ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পরিসরে। মুসলমান কবিগণের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে ছিল হিন্দুপুরাণে পরিপুষ্ট পাঁচালি। এই একঘেঁয়ে ধর্মগীতির ধারা তাঁদের কাছে প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে নি। বরং প্রণয়কাব্য রচনায় মূল্যবান অবদান রেখে তাঁরা বাংলা কাব্যে সঞ্চার করে গেছেন এক অনাস্বাদিত রস। মঙ্গলকাব্যের কাহিনি গ্রথিত হয়েছে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রণয়কাব্যের লক্ষ্য ছিল শিল্পসৃষ্টি ও রসসঞ্চার। রোমান্টিক কথা ও কাহিনির অসাধারণ ভাণ্ডার আরবি-ফারসি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে এই ধারার সৃষ্টি। আর এতে আছে জীবনের বাস্তব পরিবেশের চেয়ে 'ইরানের যুদ্ধামোদী রাজদরবার ও নাগর সমাজের মানসাভ্যাসের প্রতিফলন।' প্রণয়কাব্যগুলোতে উপাদান হিসেবে স্থান পেয়েছে 'মানবপ্রেম, রূপ-সৌন্দর্য, যুদ্ধ ও অভিযাত্রা, অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতা।'

বাংলার মুসলমান কবিগণের মধ্যে প্রাচীনতম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর চৌদ্দ শতকের শেষে বা পনের শতকের প্রথমে 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনা করার মাধ্যমে এই ধারার প্রবর্তন করেন। তারপর অসংখ্য কবির হাতে এই কাব্যের বিকাশ ঘটে এবং আঠার শতক পর্যন্ত তা সম্প্রসারিত হয়। এই দীর্ঘ সময় ধরে মুসলমান কবিগণের স্বতন্ত্র অবদান ব্যাপকতা ও ঔজ্জ্বল্যে বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যকে আরবি ফারসি হিন্দি সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে যে নতুন ঐতিহ্যের প্রবর্তন করা হয় তার তুলনা নেই। পরবর্তী পর্যায়ে দোভাষী পুঁথির মধ্যে এই ধরনের বিষয় স্থান পেলেও তাতে কোন ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয় না। রোমান্টিক কাব্যধারায় যে সব উল্লেখযোগ্য কবি তাঁদের প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন তার একটা তালিকা নিম্নরূপে দেওয়া যেতে পারে :

কাল	কবি	কাব্য
পনের শতক	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ-জোলেখা
ষোল শতক	দৌলত উজির বাহরাম খান মুহম্মদ কবীর সাবিরিদ খান দোনাগাজী চৌধুরী	লায়লী মজনু মধুমালতী হানিফা-কয়রাপরী, বিদ্যাসুন্দর সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল
সতের শতক	দৌলত কাজী আলাওল কোরেশী মাগন ঠাকুর আবদুল হাকিম নওয়াজিস খান মঙ্গল চাঁদ সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	সতীময়না-লোরচন্দ্রানী পদ্মাবতী, সপ্তপয়কর চন্দ্রাবতী লালমতী সয়ফুলমুলুক গুলে বকাওলী শাহজালাল-মধুমালা জেবলমুলুক শামারোখ
আঠার শতক	মুহম্মদ মুকীম শেখ সাদী	মৃগাবতী গদামল্লিকা

এ তালিকার বাইরে আরও কবি রয়েছেন। একাধিক কবি একই বিষয় অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন এমন অনেক নিদর্শন লক্ষ করা যায়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই শ্রেণির প্রণয়কাব্যগুলোর বিবরণ জনৈক কবির লেখনীতে নিম্নরূপে বিধৃত হয়েছে :

খারাব করিল যত আশকের তরে
জোলেখা খারাব হৈল ইউসুফ উপরে ॥
লায়লি উপরে মজনু হৈল আসক।
সংসার-বিখ্যাত যার আশকি সাদক ॥
শিরি ও খোসরু ফরহাদ তিন জনে।
আশক হইয়া মরে প্রেমের কারণে ॥
দামন উপরে নল আশক হইল।
মধুমালতীর পরে মনোহর মজিল ॥
বদরে-মনির উপরেতে বেনজীর।
হাসেনবানুর পরে আশক মনির ॥
হাতেম তাহার লাগি ফেরে বার সাল।
কত মুস্কিলেতে আনে সে সব সওাল ॥
গোলে-বকাওলি পরে তাজল-মুলুক।
আশক হইয়া কত ফিরিল মুলুক ॥

কামকলা লাগি হৈল কুঞার বেহাল।
সয়ফুলমুলুক পরে বদিউজ্জামাল ॥
মেহেরনেগার পরে আশক আমীর।
লড়াই করিল হদ্দ এশ্‌কের খাতির ॥

বাংলা কাব্যে বিচিত্র বেশে এসব প্রণয়কাহিনি স্থান পেয়েছে। মূলত এসব কাহিনিতে মানবীয় প্রেম বহিরঙ্গের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদ ছিল সুফি প্রেমসাধনার পরিণতি রূপে মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা। বাংলা ভাষায় রূপান্তরকালে এই মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে নি, বরং তাতে মানবিক প্রণয় সাধনা প্রাধান্য পেয়েছে। রোমান্টিক প্রণয় কাব্যগুলো যে কোন উৎস থেকে গৃহীত হোক না কেন এসবের মধ্যে মানবিক প্রণয়কথা প্রাধান্য পেয়েছে। আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব উপেক্ষা করে নরনারীর সুখদুঃখ আনন্দবেদনাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এই ধরনের অভিনবত্বের জন্যই বাংলা সাহিত্যে এসব প্রণয়কাব্যের স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে।

প্রণয়কাব্যগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমদ 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'মধ্যযুগের বাংলা রোমান্টিক কাব্য সুচারু শিল্পকলা, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও নির্মল আনন্দরসের অতুলনীয় মানস সম্পদ।... কাব্যগুলিতে সুখ-দুঃখ-প্রেম-বিরহ-মিলনপূর্ণ মানবজীবনের অন্তর্লোক স্পন্দিত ও গুঞ্জরিত হয়েছে। এ সব কাব্যের চরিত্রে অস্বাভাবিকতা, ঘটনায় অবাস্তবতা আছে, কিন্তু তা অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মজীবন প্রভাবে নয়, অলৌকিক রূপকথার প্রভাবে। মানবচেতনার মর্মস্পন্দন, মুক্তিবিলাস, স্বচ্ছন্দ গতি ও মর্মলীলা আছে বলেই এগুলি একান্তভাবে মানবকাব্য নয়, রোমান্টিক কাব্য। রোমান্টিকতা মানবচিন্তার লঘু ভাবসম্প্রসারণ। সত্যের আলোকে তার সব ব্যাখ্যা মিলে না। লঘু-গুরু, বাস্তব-অবাস্তব বস্তুর সত্যধর্ম, বিশ্বাসকল্পতা এই সব কিছুই মিলিয়ে এক সুরে যে জীবনলীলা স্পন্দিত হয়, তাই রোমান্টিকতার জগৎ। মধ্যযুগের বাংলা রোমান্টিক কাব্যগুলোতে মানবপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত ভোগসর্বস্ব মর্ত্য আকুতির এক স্বপ্নসৌন্দর্য ও আনন্দলোক রচিত হয়েছে। এখানে দেও-দানব, জীন-পরী, রাক্ষস-খোক্ষস প্রভৃতি অলৌকিক উপাদান আছে, কিন্তু এ সব কাল্পনিক চরিত্র কখনও মানবচরিত্রকে অতিক্রম করে যায় নি, অবাস্তব ঘটনা মূল কাহিনিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে নি। মধ্যযুগীয় চিন্তার অনুকূলেই এ সব মানবেতর উপাদান এসেছে। তখন মানুষের চিন্তাধারা অন্ধবিশ্বাস ও কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এরূপ মিশ্রভাবের রচনা হিসেবে এগুলো রোমান্টিক প্রেমকাব্য বা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান বা প্রণয়কাহিনি নামেই অভিহিত হওয়ার যোগ্য।'

প্রণয়কাব্যগুলোর উপাদানের বৈশিষ্ট্য সন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এই উপাদান বাঙালির ঘরের নয়, তা বাইরে থেকে সংগ্রহ করে বাংলা কাব্যে রূপদান করা হয়েছে। হিন্দি ভাষায় রচিত ভারতীয় কাহিনি এবং আরবি-ফারসি ভাষায় রচিত আরবি-ইরানি কাহিনি অনূদিত হয়ে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, হানিফা-কয়রাপরী, সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল, জেবলমুলুক-শামারোখ প্রভৃতি কাব্যের কাহিনি ফারসি গ্রন্থ থেকে এবং গুলে-বকাওলী, লোরচন্দ্রানী, পদ্মাবতী, মধুমালতী, গদামল্লিকা প্রভৃতি কাব্যের কাহিনি হিন্দি-আরবি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। এভাবে বাঙালি-

জীবনের বাইরে থেকে কাব্যের উপাদান নির্বাচন করা হলেও কবিরা যে বিশেষ ভাবাদর্শ রূপায়িত করে তুলেছেন তার আবেদন সহজেই বাঙালি রসিকমন অভিভূত করতে সক্ষম। কবিগণ এ সব কাব্যে মানবপ্রেমের জয়গান করেছেন—মানব-মানবীর হৃদয়ের সুখঃদুখ আনন্দবেদনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মূল কাব্যের লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রেই অধ্যাত্মপ্রেম হলেও বাংলা ভাষায় পরিবেশনকালে তা আধ্যাত্মিকতা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং তাতে মানবপ্রেমের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা কাব্যে বাস্তবতার স্পর্শে মানবপ্রেম উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত, অন্যদিকে হিন্দি বা ফারসি কাব্যের প্রেমকাহিনিও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার প্রলেপযুক্ত। এই কারণে বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলো বাইরের উপাদান নিয়ে রূপায়িত হলেও তার আবেদন কম নয়। এই সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যোগ ছিল অত্যন্ত নিবিড়। কবিরা ধর্মকথা না শুনিয়ে মানুষের জীবনের কথাই শুনিয়েছেন। মধ্যযুগের সকল কাব্য যেখানে ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে রূপায়িত হয়েছে সেখানে প্রণয়কাব্যগুলোতে মানবীয় কাহিনি স্থান পেয়ে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থান করতে সক্ষম হয়েছে। কাব্যগুলো মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ হওয়াতে তাতে অধ্যাত্মপ্রেমের পরিচয় লুপ্ত হয়ে মানবপ্রেমের বিচিত্র লীলা ফুটিয়ে তুলেছে। মানবপ্রেমের জয় ঘোষণা করতে গিয়ে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের কবিগণ নরনারীর দেহগত প্রেমের কথাই বেশি বলেছেন। বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই সংযোগ থাকার ফলেই প্রণয়কাব্যগুলোর আবেদন এত হৃদয়গ্রাহী।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ শাখার অবদান ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোও এই অনুবাদের পর্যায়ভুক্ত। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ যেমন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি হিন্দি ফারসি থেকে অনূদিত কাব্যগুলোও বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের বিশিষ্ট সম্পদ। তবে হিন্দি-ফারসি কাব্যের অনুবাদ বাংলা কাব্যে ধর্মীয় ভাবধারার বাইরে মানবীয় অনুভূতি আনয়ন করার মাধ্যমে এক নতুন ধারার সূচনা করে। মানবীয় প্রণয়কাহিনিগুলো মধ্যযুগের ধর্মশাসিত বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচিত। কাহিনির ভাষান্তরকরণেও কবিগণ মৌলিকতার স্পর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন। অনুবাদ নয়, তাঁরা ভাবানুবাদের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। ফলে প্রণয়োপাখ্যানগুলো মৌলিক রচনার স্পর্ধা রাখে। বিদেশি গল্পের অস্থিতে বাংলার রক্তমাংস সংযোজিত করায় তা মৌলিক হয়ে পড়েছে।

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোর একটা অংশ আরাকান রাজসভার কবিগণের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। কবি দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর ও আলাওলের মত প্রতিভাশালী কবি আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় রোমান্টিক কাব্য রচনা করেছিলেন। দৌলত কাজীর সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী, কোরেশী মাগন ঠাকুরের চন্দ্রাবতী এবং আলাওলের পদ্মাবতী ও সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কাব্য।

আরাকান রাজসভার কবিগণের বিস্ময়কর প্রতিভা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা অতিক্রম করে মানবীয় ভাবধারায় সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের

অবদান স্বতন্ত্র মর্যাদায় গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রণয়োপাখ্যানের ধারাটি কেবল আরাকান রাজসভার কবিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ধর্মীয় ভাবধারার বাইরে মানবীয় প্রণয়কথা নিয়ে কাব্যরচনার আগ্রহ মুসলমান কবিগণের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। স্বতন্ত্র ঐতিহ্য সৃষ্টির প্রেরণা মুসলমান কবিগণের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তাই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রণয়কাব্যের ধারাটি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এখানে আরাকান রাজসভার বাইরের কবি ও কাব্যের আলোচনা করা গেল।

শাহ মুহম্মদ সগীর : ইউসুফ জোলেখা

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি হিসেবে শাহ মুহম্মদ সগীর বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তিনি গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে(১৩৯৩-১৪০৯ সাল) ইউসূফ-জোলেখা কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি পনের শতকের প্রথম দশকে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কবি কাব্যে রাজবন্দনা অংশে লিখেছেন :

মনুষ্যের মৈদ্ধে জেহ্ন ধর্ম অবতার।
মহা নরপতি গ্যেছ পিরথিম্বীর সার ॥

মহানরপতি গ্যেছ বলে যাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বলে মনে করা হয়ে থাকে। কবি রাজবন্দনা করলেও কাব্যে কবির ব্যক্তিগত কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। মধ্যযুগের কাব্যে কবিগণের যে আত্মবিবরণী দেখা যায় তাঁর কাব্যে তা অনুপস্থিত। কবির শাহ উপাধি থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি কোন দরবেশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাব্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কতিপয় শব্দের ব্যবহার লক্ষ করে ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বিবেচনা করেছেন। রাজবন্দনার 'মোহাম্মদ ছগীর তান আজ্ঞাক অধীন'—এই কথা থেকে ধারণা করা হয় যে তিনি হয়ত সুলতানের কর্মচারী ছিলেন।

শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ-জোলেখা কাব্যে সুপ্রাচীন প্রণয়কাহিনি উপজীব্য করা হয়েছে। বাইবেল ও কুরআন শরীফে নৈতিক-উপাখ্যান হিসেবে সংক্ষেপে এই কাহিনি বর্ণিত রয়েছে। ইরানের মহাকবি ফেরদৌসী (মৃত্যু ১০২৫ সাল) এবং সুফিকবি জামী (মৃত্যু ১৪৯২ সাল) মূল কাহিনি পল্লবিত করে ইউসুফ-জোলেখা নামে কাব্য রচনা করেছিলেন। ফেরদৌসীর কাব্য ছিল রোমান্স জাতীয়, আর জামীর কাব্য ছিল রূপক শ্রেণির। অনুবাদগত ও বিষয়বস্তুর পরিবেশনার দিক থেকে শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যের সঙ্গে তাঁদের কাব্যের তেমন কোন মিল নেই। জামী শাহ মুহম্মদ সগীরের পরবর্তী কবি বলে তাঁকে অনুসরণের কোন প্রশ্ন ওঠে না। বরং ফেরদৌসীর কাব্যের রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যের যথেষ্ঠ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। তাই ড. মুহম্মদ এনামুল হক অনুমান করেন, 'কুরআন ও ফেরদৌসীর কাব্য ব্যতীত মুসলিম কিংবদন্তিতে ও স্বীয়-প্রতিভায় নির্ভর করিয়াই শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁহার ইউসুফ-জোলেখা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।' ড. ওয়াকিল আহমদ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, 'মুহম্মদ সগীর কুরআনকে ভিত্তি করে ইসলামি শাস্ত্র, ইরানের আধ্যাত্মিক কাব্য ও ভারতের লোককাহিনির মিশ্রণে ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের পূর্ণাঙ্গ কাহিনি নির্মাণ করেন।'

'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের বিষয়বস্তু ইউসুফ ও জোলেখার প্রণয়কাহিনি। কাব্যের আরম্ভে আল্লাহ্ ও রাসুলের বন্দনা, মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রশংসা এবং রাজবন্দনা স্থান পেয়েছে। তৈমুস বাদশাহের কন্যা জোলেখা আজিজ মিশরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও ক্রীতদাস ইউসুফের প্রতি গভীরভাবে প্রেমাসক্ত হন। নানাভাবে আকৃষ্ট করেও তিনি ইউসুফকে বশীভূত করতে পারেন নি। বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে ইউসুফ মিশরের অধিপতি হন। ঘটনাক্রমে জোলেখা তখনও তাঁর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন নি এবং পরে ইউসুফের মনেরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে তাঁদের মিলন হয়। কাব্যে এই প্রধান কাহিনির সঙ্গে আরও অসংখ্য উপকাহিনি স্থান পেয়েছে।

শাহ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যে দেশি ভাষায় ধর্মীয় উপাখ্যান বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। কবি স্বীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন :

বচন রতন মণি যতনে পুরিয়া।
প্রেমরসে ধর্মবাণী কহিমু ভরিয়া ॥
ভাবক ভাবিনী হৈল ইছুফ জলিখা।
ধর্ম ভাবে করে প্রেম কিতাবেতে লেখা ॥
... ...
কিতাব কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ।
ইছুফ জলিখা কথা অমিয়া অশেষ ॥
কহিব কিভাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ ভকত জন শ্রুতিঘট ভরি ॥
দোষ খেম, গুণ ধর রসিক সুজন।
মোহাম্মদ ছগীর ভনে প্রেমক বচন ॥

কবি প্রেমরস অবলম্বনে ধর্মবাণী প্রচার করতে চাইলেও তা কাব্যে মানবীয় প্রেমকাহিনি হিসেবেই রূপলাভ করেছে। ইরানের সুফী কবিরা ইউসুফ জোলেখার প্রেমকাহিনিতে যে রূপক উপলব্ধি করেছিলেন শাহ মুহম্মদ সগীর তাকেই কাব্যের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে ইউসুফ-জোলেখা ভাবুক-ভাবিনী অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মা। প্রেমের মাধ্যমে উভয়ের মিলন সম্ভব। 'ইউসুফ 'মাশুক' তথা পরমাত্মা, জোলেখা 'আশিক' তথা জীবাত্মা। ইউসুফের রূপের প্রতি জোলেখার আকাঙ্ক্ষা আশিক-মাশুকের মিলন কামনারই নামান্তর। কাব্যে দেখানো হয়েছে রূপজমোহ পার্থিব ভোগতৃষ্ণার বিষয়। ইন্দ্রিয় সম্ভোগবাসনার দ্বারা অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না, অন্তরের প্রেম দ্বারাই তাঁকে পাওয়া সম্ভব। বিচ্ছেদের মধ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার দ্বারা জোলেখা যেদিন সেই প্রেম সাধনায় জয়ী হয়েছেন, সেদিন পরমাত্মা নিজেই এসে ধরা দিয়েছেন। উভয়ের মিলন হয়েছে।' তবে কবি যেভাবে বক্তব্য পরিবেশন করেছেন তাতে মানবিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবেই কাব্যটি গ্রহণযোগ্য। জোলেখার মনে প্রেমের প্রভাবে যে চৈতন্য জাগে তাতে আবাল্যের আরাধ্যা দেবীমূর্তি ভেঙে ফেলে প্রেমাস্পদের ধর্মে তার দীক্ষা লাভ ঘটে। জোলেখার এ মনোভাব ব্যক্ত করে কবি লিখেছেন :

পাষাণ ভাঙ্গিয়া আজি করিমু চৌখণ্ড।
ব্যর্থ সেবা কৈলু তোক জানিলুঁ তু ভণ্ড ॥

প্রতিমাক পাছাড়িয়া কৈল খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতলে খেপি তাকে কৈল লণ্ড ভণ্ড ॥
কান্দিয়া পশ্চিম দিকে করিলেন্ত মুখ।
পরম ঈশ্বর সেবা করেন্ত মনসুখ ॥

ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমদ মন্তব্য করেছেন, 'অবলীলাক্রমে গল্প লিখতে পেরেছেন—এটাই সগীরের কৃতিত্ব। গল্পের ঘনঘটায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা রোমান্টিক কবিদের লক্ষ্য ছিল। দর্শনচিন্তা, তত্ত্বচিন্তা অথবা চরিত্রচিত্রণের প্রতি তাঁরা জোর নজর দেন নি। সরস গল্প সৃষ্টি করে নিছক আনন্দের ভোজে পাঠকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সগীরের কলম সে পথ বেছে নিয়েছে। গল্পরচনা কবির লক্ষ্য বলে ঘটনার গ্রহণ বর্জনের কোন হিসেব করেন নি।'

ইউসুফ জোলেখা কাব্যের রূপায়ণে কবি শাহ মুহম্মদ সগীর ফারসি উৎসের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য দেখান নি বলে কাব্যে কবিপ্রতিভার মৌলিকতার নিদর্শন বিদ্যমান। ফেরদৌসীর কাব্যের ঘটনার সঙ্গে সগীরের অনৈক্য অনেক স্থানেই লক্ষ করা যায়। বিশেষত ইবিন আমিন ও বিধুপ্রভার প্রণয় ও পরিণয় কাহিনি শাহ মুহম্মদ সগীরের নিজস্ব কল্পনা। ড. মুহম্মদ এনামুল হক এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'কাব্যটিতে কোন বিদেশি আবহ নাই বলিলেও চলে। বাংলার পরিবেশ এই কাব্যের রক্তমাংস ও বাংলার আবহ ইহার প্রাণ বলিয়া কাব্যখানি পাঠ করিতে করিতে মনেই হয় না যে, ইহা কোন বিদেশীয় পুস্তকের অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ।' শাহ মুহম্মদ সগীর রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করতে গিয়ে কিছু অলৌকিক উপাদান সংযোজন করেছেন। কাব্যে আছে অনেক স্বপ্নের কথা, আকাশবাণী, শিশু ও পশুর মুখে কথা বলানো ইত্যাদি অপ্রাকৃত ঘটনা, কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি কবির নিজের রোমান্সসুলভ খেয়ালী কল্পনার বহিঃপ্রকাশ বলে বিবেচনা করা যায়।

শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে প্রেমরসে ধর্মবাণীর পরিবর্তে প্রেমরসে মানববাণী প্রচার মুখ্য হয়ে উঠেছে। রোমান্টিক কাব্যে প্রেম প্রতিপাদ্য বিষয় বলে উপাখ্যানটির ধর্মীয় পটভূমি থাকলেও তা হয়ে উঠেছে মানবিক প্রেমোপাখ্যান। এই কাব্যে রূপজ ও মোহজ প্রেমের বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ইউসুফ টাইপ ধরনের চরিত্র। তাঁকে নীতিধর্মের শুষ্ক কুশপুত্তলিকাবৎ মনে হয়। সংযমশীলতা ও নীতিবাক্যের আদর্শবাদী ইউসুফ যেন রক্তমাংসের মানবসত্তার অধিকারী নন। জোলেখা এর বিপরীত। সজীবতায় ও বাস্তবতায় তা উজ্জ্বল। জোলেখা মানবিক কামনাবাসনায় বাঙ্ময় মূর্তি। তাঁর রূপের নেশা ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা এক চিরঞ্জীব শাশ্বত প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছে।

শাহ মুহম্মদ সগীর ব্যতীত ইউসুফ জোলেখা কাব্যের অন্যান্য রচয়িতা হচ্ছেন আবদুল হাকিম, গরীবুল্লাহ, গোলাম সফাতউল্লাহ, সাদেক আলী ও ফকির মুহম্মদ।

দৌলত উজির বাহরাম খান : লায়লী মজনু

দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত লায়লী-মজনু কাব্য রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে স্থান পেয়েছে। কবি তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় লিখে গেছেন তা থেকে তেমন কোন বিস্তারিত তথ্য অবগত হওয়া যায় না।

কবির ব্যক্তিজীবনের পরিচয় থেকে জানা যায় যে, তিনি চট্টগ্রামের ফতেহ্বাদ বা জাফরাবাদের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা মোবারক খান চট্টগ্রামের অধিপতির কাছ থেকে দৌলত উজির উপাধি পেয়েছিলেন। কবির পূর্বপুরুষ হামিদ খান গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের প্রধান অমাত্য ছিলেন। বাহ্‌রাম খান শিশু বয়সে পিতৃহীন হন। 'চাটিগ্রাম অধিপতি মহামতি নৃপতি নেজাম শাহ সুর' তাঁকে তাঁর পিতার দৌলত উজির খেতাব প্রদান করেন। কবির পীরের নাম ছিল আসাউদ্দিন। কবির ওপর তাঁর গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

দৌলত উজির বাহ্‌রাম খান তাঁর কাব্যে নিজের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। তবে পীর ও রাজপ্রশস্তি থেকে পণ্ডিতেরা কবির কাল বা কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে অনুমান করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কবি ১৫৬০ সালের কাছাকাছি সময়ে নিজাম শাহ সুর কর্তৃক দৌলত উজির উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক এই সময়কাল বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত করেন যে, ১৫৬০ থেকে ১৫৭৫ সালের মধ্যে কবি লায়লী-মজনু কাব্য রচনা করেছিলেন। ড. আহমদ শরীফ ১৫৪৩ থেকে ১৫৫৩ সালের মধ্যে কাব্যের রচনাকাল বলে মনে করেন। কবি জানিয়েছেন, গৌড়ের অধীনতা দূর হবার পরে নিযাম শাহ নৃপতি হয়েছিলেন এবং তাঁর দৌলত উজির থাকাকালে তিনি লায়লী-মজনু রচনা করেছেন। নিযাম শাহ সম্ভবত একজন সামন্ত জমিদার ছিলেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে লায়লী-মজনু কাব্যের রচনাকাল ১৬৬৯ সাল। কাব্যটি কবির পরিণত বয়সের রচনা। ইমাম বিজয় কবির অপর কাব্য—জীবনের প্রথম দিকে কাব্যটি রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। আত্মপরিচয়বিষয়ক প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের বর্ণনা আছে তাঁর কাব্যে :

নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পুরএ সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
মনোভব মনোরম অমরাবতীর সম
সাধু সৎ অনেক নিবাস ॥
লবণাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলী নদীতট
তাতে সাহা বদর আলম।
আদেশিলা গৌড়েশ্বরে উজির হামিদ খাঁরে
অধিকারী হৈতে চাটিগ্রাম ॥

কবি দৌলত উজির বাহ্‌রাম খান রচিত 'লায়লী-মজনু' কাব্য ফারসি কবি জামীর লায়লী-মজনু নামক কাব্যের ভাবানুবাদ। লায়লী ও মজনুর প্রেমকাহিনি সারা বিশ্ব জুড়ে পরিচিত। এই কাহিনির মূল উৎস আরবি লোকগাঁথা। কাহিনিটিকে ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য বিবেচনা করা হয়। ফারসিতে দশ জন কবি এই প্রেমকাহিনি অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

আমির-পুত্র কয়েস বাল্যকালে বণিক-কন্যা লায়লীর প্রেমে পড়ে মজনু বা পাগল নামে খ্যাত হয়। লায়লীও মজনুর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু উভয়ের বিবাহে আসে প্রবল বাধা; ফলে মজনু পাগলরূপে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অন্যদিকে লায়লীর অন্যত্র বিয়ে হলেও তার মন থেকে মজনু সরে যায় নি। তাদের দীর্ঘ বিরহজীবনের

অবসান ঘটে করুণ মৃত্যুর মাধ্যমে। এই মর্মস্পর্শী বেদনাময় কাহিনি অবলম্বনেই লায়লী-মজনু কাব্য রচিত। দৌলত উজির বাহরাম খান ফারসি কাব্যের ভাবানুবাদ অবলম্বন করলেও তাঁর স্বাধীন রচনা এতে স্থান পেয়েছে। কাব্যটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, 'নিছক কাব্যরস, লিপিচাতুর্য, ভব্যতা ও শালীনতায় 'লায়লী মজনু'র সমকক্ষ কাব্য খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে একটিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।' কবি কাব্যের বক্তব্য রূপায়ণে গতানুগতিক ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন বলে ভাবের ক্ষেত্রে কোন নতুনত্বের পরিচয় নেই। কিন্তু কবিত্বশক্তি প্রকাশে কবি যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করেছেন। তাঁর বিষয়জ্ঞান, নাগরিক বৈদগ্ধ্য, পরিমার্জিত ভাষা, সাবলীল প্রকাশভঙ্গি এবং শিল্পসচেতনতা, তাঁর শিরোদেশে গৌরবমুকুট পরিয়ে দেবে।

ড. আহমদ শরীফ লায়লী-মজনু কাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এর যুগদুর্লভ ছয়টি বৈশিষ্ট্য চিরকাল অম্লান থাকবে। প্রথমত, এটি যথার্থ ট্র্যাজেডি কারণ রামায়ণ, মহাভারত, কারবালা কাহিনি কিংবা অন্যান্য বিয়োগান্ত বা করুণরসাত্মক রচনায় যথার্থ Tragic effect নেই। দ্বিতীয়ত, এ কাব্য-কাহিনি অলৌকিকতামুক্ত প্রায় স্বাভাবিক জীবনভিত্তিক। তৃতীয়ত, এ কাব্য আশ্চর্যভাবে অশ্লীলতা মুক্ত। চতুর্থত, ফারসি প্রণয়কাব্যগুলি সাধারণত অধ্যাত্মরূপকাশ্রিত। কিন্তু দৌলত উজিরের কাব্য নিছক মানবিক প্রণয়োপাখ্যান। পঞ্চমত, এ কাব্য কোন কাব্যের অনুবাদ নয়, লোকশ্রুত পুরানো কাহিনির স্বাধীন অনুসৃতি। ষষ্ঠত, এ কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য গীতিনাট্যের আকারে বিন্যস্ত ঋতু পর্যায় বর্ণন। পুরুষের তথা নায়কের 'বারমাসী' এ কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লায়লী-মজনু উচ্ছ্বাসপ্রধান কাব্য, হৃদয়াবেগই এর প্রাণ।' কবি প্রত্যক্ষভাবে রাজদরবারের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য রাজসভার বিদগ্ধসমাজ তাঁর কাব্যের রসগ্রাহী পাঠক ছিল। কবি বহুভাষাবিদ ছিলেন বলে অনুমিত হয়। আরবি-ফারসি-সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে কবির পরিচয় ছিল। কবি সংস্কৃত থেকে শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প, অলঙ্কার ইত্যাদি গ্রহণ করেছেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, মজনুর যোগীমূর্তি, পক্ষীদৌত্য, লায়লীর রূপ প্রভৃতি প্রসঙ্গের কোন কোন অংশের সঙ্গে কুমারসম্ভব, শিবপুরাণ, নলদময়ন্তী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের চিত্রকল্পের সাদৃশ্য আছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ কাব্যে লক্ষণীয়। ব্রজবুলির প্রয়োগেও কবির কৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে। তাই ড. ওয়াকিল আহমদ মন্তব্য করেছেন, 'ফারসির সৌন্দর্য, সংস্কৃতের গাম্ভীর্য এবং ব্রজবুলির আবেগ তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে।' কবির সুফীতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, সঙ্গীতশাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ছিল। স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গি তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, 'লায়লী-মজনু আদিরসাত্মক কাব্য। কিন্তু অন্তর্নিহিত সুফিভাবের জন্য কোন স্থানে অশ্লীলতা নাই। সুফিগণ বলেন পার্থিব প্রেম পারমার্থিক প্রেমের সেতু। ইহাতে কাব্যে যথেষ্ট সংযম লক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকে যদি বলা হয় মদনানন্দমোদক, লায়লী-মজনুকে বলিতে হইবে মদনজ্বালামলম।' ভাষা প্রয়োগে এবং বর্ণনাশক্তিতে কবিপ্রতিভার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। লায়লীর রূপবর্ণনায় কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় :

দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন চন্দ্রকলা।
পদ্ম যেন বিকশিলা অধিক উজ্জ্বলা ॥

লভিল যৌবন বালা ত্রিলোকমোহিনী।
সুরঙ্গ অধর ধনি কুরঙ্গ নয়নী ॥
খঞ্জন গঞ্জন রামা নয়ন সুটান।
ভুরুযুগ কামধেনু কটাক্ষ সন্ধান ॥
চাচর চামর জিনি মনোহর কেশ।
জাতিএ পদ্মিনী বালা অধিক সুবেশ ॥
দেশ ভরি হৈল তার রূপের কাহিনি।
ইন্দ্রের ইন্দ্রানী কিবা চন্দ্রের রোহিণী ॥
সর্বলোকে প্রশংসএ ধন্য রূপবতী।
না জানি কাহার ঘটে এহেন যুবতী ॥

উপমা ব্যবহারে কবি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তার নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখযোগ্য কতিপয় পংক্তি :

গোপতে রাখিল প্রেম হৃদয় মাঝার।
নয়ানের জলে মাত্র করিল প্রচার ॥
বিকশিত কুসুম পিরীতি উপবন।
চৌদিকে আমোদ কৈল বাদক পবন ॥
শতেক পরতে যদি কস্তুরী ঢাকএ।
অবশ্য তাহার গন্ধ প্রকাশিত হএ ॥
তুলাএ রাখিছে কেবা আনল ছাপাই।
ভাবের কথন কোথা রহিছে লুকাই ॥

বাহরাম খানের কাব্যে সুভাষিত বুলি বা সদুক্তি বা প্রাবচনিক তত্ত্বকথার নিদর্শন প্রচুর। অল্পকথায় চিরন্তন সত্য প্রকাশ করা শ্রেষ্ঠ কবিগণের একটি বিশেষ গুণ। কিছু দৃষ্টান্ত :

১. শতেক পরতে যদি কস্তুরী ঢাকএ।
অবশ্য তাহার গন্ধ প্রকাশিত হএ ॥
২. পণ্ডিত জনের সঙ্গে শোভএ বিবাদ।
মূর্খের সহিত খেল বিষম প্রমাদ ॥
৩. শত ধোপে শ্বেত নহে শ্যামল চিকুর।
৪. এক দেশে দুই নৃপতি কোথায় বসতি।
৫. বামন হইয়া চাহ ছুঁইতে আকাশ।
৬. কাকের মুখেত যেন সিন্দুরিয়া আম।
৭. কুকুরের গলে যেন অপসর ভূষণ।
৮. বিপদ সময় বৈরী হএ বন্ধুগণ।
৯. দুর্জনে সৃজিল কূপ আনের কারণ।
সেই কূপে পড়িয়া হারাইল জীবন ॥
১০. ফুল বিনে বৃক্ষে যেন ফল না ধরএ।
কর্ম বিনে চেষ্টাএ মানস না পুরএ ॥

কবির এসব সদুক্তির মাধ্যমে তাঁর বৈদগ্ধ্য, মনীষা, কবিত্ব, চিন্তাশীলতা ও তত্ত্ব-প্রবণতার পরিচয় লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবন ও জগতের গভীরতর তথ্য আর চিরন্তন সত্যের সাক্ষাৎ মিলে।

কবির ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমদ মন্তব্য করেছেন, 'বাহরাম খানের ভাষা আগাগোড়া আলংকারিকতাপূর্ণ। উপমা-রূপক-অনুপ্রাস উৎপ্রেক্ষাদি অলংকার কাব্যদেহে ছড়িয়ে আছে। অলংকার নির্বাচনে তিনি লৌকিক জীবন, প্রাকৃতিক জগৎ ও পৌরাণিক শিল্পলোকে অবলীলাক্রমে বিচরণ করেছেন। অলংকার ব্যবহারে কবি কেবল প্রচলিত বস্তু, ভাব, ঘটনার আশ্রয় নেন নি, নিজস্ব চিন্তাসম্ভূত অলংকারও সৃষ্টি করেছেন, প্রয়োগ করেছেন।...বাহরাম খান কেবল লিপিকুশলী ছিলেন না, শব্দকুশলীও ছিলেন। বাংলা ভাষা ও শব্দশক্তির ওপর তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। ধ্বনিসাম্য ও ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টিতে তিনি তৎপর ছিলেন। কাব্য ও কবিত্বের সকল গুণে তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবিকুলের মধ্যে উচ্চ পংক্তিতে আসন লাভের উপযুক্ত দাবিদার।'

সাবিরিদ খান : ক. বিদ্যাসুন্দর ও খ. হানিফা-কয়রাপরী

রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের কবি হিসেবে সাবিরিদ খানের নাম উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ কবির নাম শাহ বারিদ খান মনে করেন। তবে কবির প্রায় সব ভণিতায় তাঁর নামের বানান 'সাবিরিদ' পাওয়া যায়। তিনি কালিকামঙ্গল কাব্যধারার বিদ্যাসুন্দর কাহিনির অন্যতম কবি রূপে স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। হানিফা ও কয়রাপরী নামে তাঁর অপর একটি প্রণয়কাব্য রয়েছে। তিনি রসুলবিজয় কাব্যেরও রচয়িতা।

কবির কাব্যের যে সব পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা খণ্ডিত বলে তা থেকে কবির ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় নি। কবি চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, কবির পিতা নানুরাজা মল্লিকের কৃতিত্বেই চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত ইছাপুর পরগনার নানুপুর গ্রাম স্থাপিত হয় এবং তাঁর নামানুসারেই গ্রামের নামকরণ করা হয়। কবির অনুলিখিত পুঁথিগুলোও চট্টগ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হওয়ায় এখানেই কবির জীবন অতিবাহিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছে। ড. আহমদ শরীফের মতানুসারে সাবিরিদ খান ১৪৮০ থেকে ১৫৫০ সালের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। ভাষার প্রাচীনত্ব বিচারে ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর কাব্যকে ষোল শতকের গোড়ার দিককার রচনা মনে করেন। কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

পিয়ার মল্লিক সুত বিজ্ঞবর শাস্ত্রযুত
উজিয়াল মল্লিক প্রধান।
তান পুত্র জিঠাকুর তিন সিক সরকার
অনুজ মল্লিক মুসা খান ॥
রসেত রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি
দাতা অগ্রগণ্য অর্কসুত।
ধৈর্যবন্ত যেন মেরু জ্ঞানেত বাসবগুরু
মানে কুরু ধর্মে ধর্মসুত ॥

তান সুত গুণাধিক নানুরাজ মহল্লিক
জগত প্রচার যশ খ্যাতি।
তান সুত অল্পজ্ঞান হীন সাবিরিদ খান
পদবন্ধে রচিল ভারতী ॥

বিদ্যাসুন্দর

এই কাব্য রচনায় কবি সাবিরিদ খান প্রচলিত কাহিনি অবলম্বন করেছেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কাহিনি কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রসহ অনেক কবি একই কাহিনি ভিত্তিক কাব্যের রূপ দিয়েছেন। সাবিরিদ খানের কাব্যের কাহিনির সঙ্গে দেবী কালিকার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। কাব্যরস সৃষ্টি ব্যতীত এর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না; মানবীয় রস এতে প্রাধান্য পেয়েছে। কবি রোমান্স হিসেবেই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। কবি তাঁর কাব্যকে নাটগীতি বলে উল্লেখ করেছেন।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি সুপ্রাচীন। এই প্রণয়কাহিনির প্রথম রূপ দেন সংস্কৃত কবি বিলহন চৌরপঞ্চাশিকা কাব্যে। তাঁর কাহিনিটি এ রকম : গুর্জর দেশে মহিলাপত্তন নামক এক নগরীতে বীরসিংহ নামে এক নৃপতি রাজত্ব করতেন। তিনি অবন্তী নৃপতির কন্যা সুতারাকে বিয়ে করে পাটরানী করেছিলেন। তাঁর গর্ভে শশিকলা নামের এক পরম সুন্দরী কন্যা জন্মায়। রাজা তাকে সুশিক্ষিত করার জন্য কাশ্মিরের কবি বিলহনকে নিযুক্ত করেন। সুপুরুষ বিলহনের নিত্য সাহচর্যে রাজকুমারী তাঁর অনুরক্ত হন এবং গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেন। অন্তঃপুরের রক্ষীরা রাজকন্যার এই গোপন প্রেমের কথা জানতে পেরে রাজাকে জানায়। কিন্তু রাজা প্রথমে তা বিশ্বাস করেন নি। পরে কবি নিজে রাজপুরোহিতের কাছে সকল কথা প্রকাশ করে রাজার সমীপে রাজকন্যার বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। ক্রুদ্ধ নৃপতি চৌর কবিকে শূলে চড়িয়ে হত্যার আদেশ দিলেন। বধ্যভূমিতে নীত হয়ে কবি রাজকন্যার সঙ্গে অতিবাহিত মুহূর্তগুলোর কল্পনা করে পঞ্চাশটি শ্লোক রচনা করেন। শ্লোক শুনে রাজা খুশি হন এবং তাদের বিয়ে দেন। এই সব শ্লোক নিয়েই চৌরপঞ্চাশিকা কাব্য রচিত।

এই শ্লোকগুলোতে নরনারীর গোপন অবৈধ প্রেম-সম্ভোগের বিবরণ স্থান পেয়েছে। এগুলো আদিরসের খণ্ড কবিতা। সাবিরিদ খান রোমান্টিক কাব্যের আখ্যানবস্তু হিসেবে একে গ্রহণ করতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষার কোন কাব্যের অনুসরণ করেছেন। বিদ্যাসুন্দরের অন্যান্য কবি কালিকামঙ্গলের বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করেন নি। তাই রোমান্টিক কাব্যের ধারায় কেবল সাবিরিদ খানকেই গ্রহণ করা চলে। ড. আহমদ শরীফ সাবিরিদ খানের প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'ভাষা ও উপমা-অলঙ্কারের সংযত ব্যবহারে আর পদলালিত্যে ও ছন্দসৌন্দর্যে গোটা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দরের দ্বিতীয় জুড়ি নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। স্বয়ং ভারতচন্দ্রের কাব্য পদলালিত্য এবং ছন্দগৌরব সত্ত্বেও অনেক সময় অতিকথনের দোষে আমাদের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। কিন্তু সাবিরিদ খানের অনন্যসাধারণ ললিত-মধুর রচনা পাঠক মাত্রকেই চমৎকৃত ও বিস্ময়াভিভূত করবে।' ড. ওয়াকিল আহমদ কবির 'ভাষা সংস্কৃতানুগ, বিশুদ্ধ এবং পরিমার্জিত' বলে মন্তব্য করেছেন।

হানিফা-কয়রাপরী

সাবিরিদ খানের অন্যতম রচনা 'হানিফা-কয়রাপরী' জঙ্গনামাজাতীয় যুদ্ধকাব্য হলেও প্রেমকাহিনির জন্য তা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের পর্যায়ভুক্ত। কবির কাব্যটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে বলে কাব্যের নাম নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ড. আহমদ শরীফ কাব্যের নামকরণ করেছেন 'হানিফার দিগ্বিজয়', আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ 'মোহাম্মদ হানিফা ও কয়রাপরী' এবং ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'হানিফা ও কয়রাপরী' নাম ব্যবহার করেছেন। কবির খণ্ডিত কাব্য থেকে কাহিনির উৎস সম্পর্কেও কিছু জানা যায় নি। হযরত আলীর পুত্র মুহম্মদ হানিফা কাহিনির নায়ক। জয়গুনের সঙ্গে হানিফার পরিণয় হয় এবং দিগ্বিজয়ী হিসেবে উভয়েই বহু রাজাকে পরাজিত করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। তাঁদের এই বীরত্ব কাহিনি ছাড়াও হানিফার সঙ্গে কয়রাপরীর প্রণয়কাহিনি এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটি প্রেমকাহিনিভিত্তিক হলেও তা যুদ্ধসর্বস্ব। হানিফা-জয়গুন-কয়রাপরীর প্রণয়কাহিনি বিসর্পিল গতিতে অগ্রসর হয়ে রোমান্সের পর্যায়ে উঠেছে। কবির অন্য কাব্য বিদ্যাসুন্দরের ভাষায় যে গাম্ভীর্য ছিল আলোচ্য কাব্যে তা নেই। এখানে প্রাঞ্জল ভাষারীতির প্রয়োগ করা হয়েছে। ড. ওয়াকিল আহমদ এ কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'কবির বর্ণনাভঙ্গি বিবৃতিসর্বস্ব। বিদ্যাসুন্দরে গীতিধর্মিতা ও নাটকীয়তার যেরূপ অপূর্ব সমন্বয় দেখা গেছে হানিফা-কয়রাপরীতে তার কণামাত্র রক্ষিত হয় নি। কবি এখানে কথকের ভূমিকা নিয়েছেন, সূত্রধরের ভূমিকা নয়। জীবননাট্য সূত্রে তিনি চরিত্রগুলোকে নাচাতে পারেন নি। ফলে হানিফা-কয়রাপরীতে আর্টের স্বাদ পাওয়া যায় না। কাব্যের ঘটনার ক্রমবিবর্তন আছে সত্য, তবে কবি সকল ঘটনাকে অনিবার্য সম্পর্কে বাঁধতে পারেন নি। কবির ভাষাও খুব দুর্বল, স্থানে স্থানে তা স্থূল ও আড়ষ্ট পরিচর্যাহীন।' তবে কবির সুমার্জিত ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় জয়গুনের বারমাসীতে :

মধুমাসে মধুরিত মাধুরী মধুর।
মাধবী মালতী মল্লি বিকাশে প্রচুর ॥
মলয়া পবন পরিমল বহে মন্দ
মধুকরে ঝঙ্কারে পিবএ মকরন্দ ॥
মর্মক্ষত মদনে প্রাণেশ দূরদেশ।
মরিমু গরল ভক্ষি অল্প অবশেষ ॥
মাধবী মাসেত মদমত্ত মহীরাজ।
বীজোৎপল দন্তরুচি মধুসেনা সাজ ॥
মধুব্রত কূলে মধুমন্ত ভ্রমে নাদ।
মধুর স্ফুটএ পরভৃত কুহু নাদ ॥
মনোরম ধনস্পতি প্রফুল্ল মুকুল।
মানিনী বিভঙ্গ মন বিরহে আকুল।

এ ধরনের উজ্জ্বল পংক্তিমালা খুব বেশি নেই। সেজন্য ধারণা করা হয়, কবির প্রতিভা ও শক্তি ছিল, কেবল সাধনা ও পরিচর্যার অভাবে উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে নষ্ট করা হয়েছে।

সাবিরিদ খানের রসুলবিজয় কাব্য খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে বলে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব নয়। কাব্যে হযরত মুহম্মদের (স) রাজ্যজয় প্রসঙ্গে মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। কবি এ কাব্যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

দোনা গাজী চৌধুরী : সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল

বাংলা রোমান্টিক কাব্য ধারার সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল অন্যতম বিশিষ্ট কাব্য। দোনা গাজী চৌধুরী, আলাওল, ইব্রাহিম ও মালে মুহম্মদ এই প্রেমকাহিনি অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে আলাওলের কাব্যই সমধিক পরিচিত। দোনা গাজীর কাব্যের একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে এবং তাও খণ্ডিত। এ থেকে কবির ব্যক্তিপরিচয় উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নি। কবি একটি ভণিতায় উল্লেখ করেছেন :

দোনা গাজী চৌধুরী দোল্লাই নামে দেস।
রছিল বিরহে পুঁতি চিত্তের য়াবেস ॥

দোনা গাজী আলাওলের পূর্ববর্তী কবি। কবির বাসস্থান চাঁদপুর জেলার কোন এক গ্রামে ছিল বলে অনুমান করা হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক কবির কাল নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন 'আমাদের ধারণা, কবি দোনা গাজী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায় প্রাকৃত ভাব, ছন্দের শিথিলতা, অন্ত্যানুপ্রাসের শৈথিল্য এবং প্রাচীন শব্দপ্রয়োগের বাহুল্য সমস্তই এক সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে স্বাধীনতার যুগের মুসলিম কবিদের সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া তুলিয়াছে।'

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্যের কাহিনির আদি উৎস আলেফ লায়লা বা আরব্য উপন্যাস। এই কাহিনি অবলম্বনে ফারসিতে কাব্য রচিত হয়েছিল। দোনা গাজী ফারসি কাব্য অনুসরণেই এ কাব্য রচনা করেন। প্রেমমূলক কাহিনি কাব্য হিসেবে এর পরিচয়। পরীরাজকন্যা বদিউজ্জামালের ছবি দেখে মিশর রাজপুত্র সয়ফুলমুলুক তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। মন্ত্রীপুত্র সায়েদের সহায়তায় বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামালের সাক্ষাৎ পায় এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। সায়েদ পরীরাজকন্যার সখী মল্লিকাকে বিয়ে করে। কাব্যের এই কাহিনি রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত এবং সে কারণেই রোমান্সের দিক থেকে নতুনত্বহীন। রূপকথাধর্মী অলৌকিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে কবি প্রেমকাহিনি বর্ণনা করেছেন। প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য দুর্বার প্রচেষ্টা কাহিনিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। কবি মূলকাহিনির প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখান নি; কোথাও কোথাও নিজের সংযোজন বা রূপান্তর ঘটিয়েছেন। এই কাব্যের শিল্পমূল্যের পরিচয় পাওয়া যায় রোমাঞ্চকর ঘটনামিশ্রিত প্রেমের কাহিনির রসাত্মক উপস্থাপনায়। মধুর গল্পরস সৃষ্টির দিকে কবির বিশেষ লক্ষ ছিল—চরিত্র চিত্রণের দিকে তাঁর তত মনোযোগ ছিল না। কাব্যটি কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা সমৃদ্ধ অতিযাত্রার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু সে সব অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে এবং তাতে কাহিনির গতি ও সৌন্দর্য ব্যাহত হয়েছে। কবি দোনা গাজীর নায়িকার রূপের বর্ণনা :

তার বর্ণ উদ্দেসিয়া কাজল জন্মিল।
এ লাগি সুন্দরী সবে নয়ানে ধরিল ॥
নিশি নিয়াছিল কিছু বর্ণ করি চুরি।
নিশিনাথে হিয়ায় রাখিল যত্ন করি ॥
কস্তুরী-হরিণী কিছু তাহার বরণ।
অদ্যাবধি সুগন্ধে বেষ্টিত এ কারণ ॥
মুনি তপস্বীরা সে বর্ণেত মজিল।
কোরান পুরাণ বেদ কালি দি লিখিল ॥

কাব্যটি আদিরসাত্মক এবং অনেক স্থানে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। 'কবির বর্ণনা নগ্ন, স্থূল এবং কামোদ্দীপক।' ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, 'দোনা গাজী সাধারণ কবি; তাঁহার ভাষাও সাধারণ।' একই নামে আলাওল যে কাব্য রচনা করেছিলেন দোনা গাজী তার সমকক্ষতা লাভ করতে সক্ষম হন নি।

মুহম্মদ কবীর : মধুমালতী

মুহম্মদ কবীরের রচনা হিসেবে কেবল 'মধুমালতী' কাব্যের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে,—এখন পর্যন্ত তাঁর অন্য কোন কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় নি। মধুমালতীর কাহিনি দিয়ে মুহম্মদ কবীরই প্রথম কাব্য রচনা করেন এবং তিনি 'মধুমালতী' কাব্য রচনাকারীগণের মধ্যে প্রধান কবি হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। প্রাপ্ত পুঁথিতে কবির ব্যক্তিপরিচয় নেই, রচনায় কালজ্ঞাপক উক্তি অনুপস্থিত, কোন পৃষ্ঠপোষকের কথাও তাতে অনুল্লেখিত। এসব কারণে কবি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার সুযোগ নেই। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত। চট্টগ্রামের কতিপয় আঞ্চলিক শব্দ কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব দিক বিবেচনা করে ড. আহমদ শরীফ কবিকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে অনুমান করেছেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক একবার মনে করেন যে, ১৫৮৮ সালে কাব্যটি রচিত। অন্য এক উৎস থেকে তিনি কাব্যের রচনাকাল ১৪৮৫ সাল বলে ধারণা করেছেন। কাব্যের ভাষায় প্রাচীনতার নিদর্শন আছে বলে তাঁর এই অনুমান।

'মধুমালতী' কাব্যে বর্ণিত কাহিনির উৎস ভারতীয় উপাখ্যান। তবে সংস্কৃত ভাষায় এ নামে কোন কাব্যের অস্তিত্বের কথা জানা যায় নি। হিন্দি ও ফারসিতে কয়েকজন কবি মধুমালতী কাব্য রচনা করেছিলেন। এই পর্যায়ের প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ কবি মনঝন সম্ভবত কোন লোকগাথা অবলম্বনে হিন্দিতে 'মধুমালতী' কাব্যের রূপ দেন। মধুমালতী কাব্য রচনা করতে গিয়ে মুহম্মদ কবীর তাঁর একমাত্র পূর্ববর্তী কবি মনঝনের অনুসরণ করেছেন বলে অনুমান করা হয়। ড. ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন, 'বাংলা মধুমালতী রচনায় মুহম্মদ কবীর কার কোন গ্রন্থের অনুবাদ বা অনুসরণ করেছিলেন তার স্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায় না, তবে তিনি কোন এক হিন্দি কবি অথবা ফারসি কবির কাব্যের সহিত পরিচিত ছিলেন তা সুনিশ্চিত।' একটি পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে :

মনোহর মালতীর অকুল পিরীত।
গাহিব সকল লোক মন হরষিত ॥
এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দীতে আছিল।
দেশী ভাষায় মুঞি পঞ্চালি ভণিল ॥

এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'কাব্যটি ফারসি হইতে অনূদিত হইয়াছিল, না হিন্দি হইতে অনূদিত হইয়াছিল, তাহাতে আর এক সমস্যা। মনে হয়, মূল গল্পটি হিন্দিতে ছিল, কোন ভারতীয় মুসলমান কবি এই মূল হিন্দি হইতে গল্পটিকে ফারসি ভাষায় কাব্যিক রূপ দিতে গিয়া পরী প্রভৃতি ইরানি উপাদান ঢুকাইয়া দেন। এই ফারসি কাব্য হইতেই বাংলায় কবি মুহম্মদ কবীর গল্পটি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।' তবে কবি কোন হিন্দি বা ফারসি কাব্য থেকে তাঁর কাব্যের রূপ দিয়েছেন তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন 'বাংলার কবি হিন্দি হোক ফারসি হোক কোন কাব্যই সামনে খোলা রেখে অনুবাদ করেন নি। ঘটনাসম্বলিত কাহিনি ও স্থানবিশেষ ভাবচিত্র অনুসরণ করেছেন।'

বাংলা ভাষায় রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলো রচনার বেলায় ভাবানুবাদের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তাতে মূল উৎস-কাব্যের ধর্মীয় ভাব বর্জন করে নিছক মানবীয় প্রেমোপাখ্যানে রূপ দেওয়া হয়েছে। মধুমালতী কাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়। এ ধরনের কাহিনি বিন্যাসে কবির 'মানবীয়তাবোধ ও উন্নত শিল্পজ্ঞান সমৃদ্ধ মানসিকতা কাজ করেছে।'

মধুমালতী কাব্যে বাস্তব অবাস্তব উভয় শ্রেণির কাহিনি স্থান পেয়েছে। কঙ্গিরা রাজ্যের রাজা সূর্যভান ও রানী কমলাসুন্দরীর পুত্র মনোহর মহারসরাজ্যের অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা মধুমালতীর প্রতি পরীজাদীদের ষড়যন্ত্রে প্রণয়াসক্ত হয়। ক্ষণিক মিলনের অবসানে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর দীর্ঘ দুঃখময় সাধনার শেষে তাদের মধুর মিলন ঘটে। কাব্যে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ লক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে কবি মুহম্মদ কবীর রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাব্যের রূপদান করেছেন। সে কারণে বাস্তবের সঙ্গে অলৌকিকতার সংযোগ ঘটেছে। কবি প্রেমচিত্র অঙ্কনে সার্থকতা লাভ করেছেন। প্রেম ও রূপের বর্ণনায় কবি যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা মধ্যযুগের কাব্যে খুব বেশি পাওয়া যায় না। প্রেম ও সৌন্দর্য বর্ণনায় কবির কৃতিত্ব বিদ্যমান। সংযত ও মার্জিত রুচির পরিচয় কবির বর্ণনায় লক্ষণীয়। নারীদেহের রূপ বর্ণনায় কবির সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মধুমালতীর রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন :

রূপে গুণে কুলে শীলে চন্দ্রিমা সমান।
একন্যা মানবী নএ অপসরা জন ॥
পূর্ণ শশী নিন্দে মুখে নিন্দে অরবিন্দ।
চক্ষে ধরএ জুতি সে রূপের চন্দ ॥
কুন্তল চিত্রল ছাঁচে বিশেষ লক্ষিত।
অলকে মণির খোপা ত্রিলোক মোহিত ॥
চটক চিকন কেশ শীষেত সিন্দুর।
কাজল উঝল অক্ষি অধরে নিন্দে সুর ॥
কাণড় কুন্তল দোলে শ্রবণে রাতুল।
পাবন-বাহন ভুরু জিনিছে ধনুকুল ॥
নাগ-অরি জিনি চঞ্চু নাসিকা বিশিখ।
সোনার বেসর দোলে নাসিকা উপাধিক ॥

দশন বিদ্যুৎ জিনি মুকুতা গুনিছে।
সপ্তছড়ি মুক্তাছড়া হৃদএ পরিছে ॥

কবি যে উৎস থেকে তাঁর কাব্যের রূপ দান করুন না কেন, তিনি নিজের প্রতিভার যথার্থ পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। অন্ধ অনুকরণ বা অনুবাদ নয়, নিজের কল্পনার রঙে পূর্ববর্তী কাহিনি রসমধুর করে পরিবেশন করেছেন। কবির ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমদের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'ভাষাসৌন্দর্যে কবীর উত্তীর্ণ। ললিতমধুর ধ্বনিসুষম ভাষা ছন্দ ও অলঙ্কার সুশোভিত হয়ে খুব সুখপাঠ্য হয়েছে। হিন্দি অথবা ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ করলেও কবি সংস্কৃত প্রভাব পুষ্ট বিশুদ্ধ বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছেন। ধ্বনিসৌন্দর্য ও শব্দার্থ মহিমায় প্রসাদগুণবিশিষ্ট বাণীসৌন্দর্য কাব্যখানিকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। সে যুগে কবিত্বশক্তির পরিচয় ছিল আলংকারিক ভাষায়। মুহম্মদ কবীর সে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। বড় ভাব, বড় চরিত্র নয়, প্রেমপূর্ণ একটি জমাট গল্প স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের ভাষায় প্রকাশ করার মধ্যে কবির সাফল্য অনুসন্ধান করতে হয়। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষাদি আলংকারিক ভাষায় প্রেমাশ্রিত মধুমালতী কাব্য হয়েছে রূপরস সমৃদ্ধ।' ড. মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, 'কবি মুহম্মদ কবীরের বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত চমৎকার। তাঁহার এই কাহিনিকাব্যখানি আখ্যানে সৌন্দর্যে ও বর্ণনায় মাধুর্যে পরম উপভোগ্য।'

মধুমালতীর কাহিনি অবলম্বনে আরও কয়েকজন কবি কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দোভাষী পুঁথিকার সৈয়দ হামজা, মুহম্মদ চুহর, রংপুরের কবি শাকের মুহম্মদ, চট্টগ্রামের গোপীনাথ দাস, জোবেদ আলী ও নূর মুহম্মদ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। মধুমালতী কাব্য রচনার চেষ্টা মধ্যযুগ ছাড়িয়ে বিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত চলে এসেছিল। তবে তাঁদের অবদান খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় নি।

নওয়াজিস খান : গুলে বকাওলী

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ধারায় 'গুলে বকাওলী' কাব্যটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গদ্যে ও পদ্যে গুলে বকাওলী প্রেমকাহিনি বাংলায় পরিবেশিত হয়েছে এবং বিশ শতকেও সাহিত্যরূপ লাভ করায় এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রমাণিত। বাংলা ভাষা ছাড়া হিন্দি ফারসি উর্দু ইত্যাদি ভাষায়ও এ কাব্য রচিত হয়েছিল।

বাংলায় গুলে বকাওলী কাব্যের রচয়িতা হিসেবে নওয়াজিস খান খ্যাতিমান। কবি কাব্যে যে আত্মপরিচয় দান করেছেন তাতে তাঁর বংশলতিকার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এক পূর্বপুরুষ ছিলিম খান গৌড় থেকে চট্টগ্রাম এসে ছিলিমপুর গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কবি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত সুখছড়ি গ্রামে বসবাস করতেন বলে জানা যায়। কবি নওয়াজিস খান গুলে বকাওলী কাব্যের শেষাংশে লিখেছেন :

ধন্য ধন্য আজ্ঞা কর্তা হএ সেই জন।
জাহান আদেশে হৈল পুস্তক রচন ॥
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাত মোহা নরপতি।
ধন্য হেতু সুকল্পনে করিল আরতি ॥
হীন নোআজিসে কহে ভাবি নিজ মনে।
বকাঅলি পুস্তক রচিল তেকারণে ॥

এবে কহি আপনার গ্রাম বিবরণ।
জথাত বসিয়া কৈলু পুস্তক রচন ॥
প্রপিতামোহের পিতা গৌড় হোন্তে আসি।
গোত্র সমে চাটিগ্রামে করিল নিবাসি ॥
ছিলিম খাঁ তাহান নাম সভার প্রধান।
ভাগ্যবন্ত দানে দাতা অধিক বাখান ॥
নিজ নামে গ্রাম বৈসাইল কথ দূর।
সংসারে প্রচার সেই দেস ছিলিমপুর ॥

কবি বিদ্যাবত্তায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন এবং সুফিমতেও দীক্ষিত হয়েছিলেন। কবি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। নওয়াজিস খান চট্টগ্রামের বানীগ্রামের জমিদার বংশের আদি পুরুষ বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে গুলে বকাওলী রচনা করেন। কবির কাব্যে রচনাকালজ্ঞাপক কোন তথ্য না থাকাতে তাঁর আবির্ভাবকাল নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক কবির জনৈক অধঃস্তন পুরুষের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, কবি ১৬৩৮ সালে জীবিত ছিলেন। ড. আহমদ শরীফ এই সালে কবির জন্ম হয়েছিল বলে মনে করেন। সম্ভবত কবি ১২৭ বৎসর জীবিত থেকে ১৭৬৫ সালে মারা যান। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে কাব্যটি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত। ড. ওয়াকিল আহমদ মনে করেন, 'নওয়াজিসের কাব্য সতের শতকে রচিত হতে পারে।' প্রকৃত পক্ষে কবির কাল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে।

শেখ ইজ্জতুল্লাহ্ নামে জনৈক বাঙালি লেখক ১৭২২ সালে ফারসি ভাষায় 'গুলে বকাওলী' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি হিন্দি থেকে ভাষান্তরিত। গদ্যে রচিত এ গ্রন্থের কাহিনি নওয়াজিস খান কাব্যে রূপ দিয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ঘটনা রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য বিচার করলে নওয়াজিস খানকে মনে হয় ইজ্জতুল্লাহ্‌র অনুসারী। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে কবি নওয়াজিস খান কাব্যটি ফারসি থেকে অনুবাদ করেছিলেন। কাব্যের কাহিনি প্রেমমূলক। শর্কিস্তানের রাজপুত্র তাজুলমুলুক পিতার অন্ধত্ব দূর করার জন্য পরীরাজকন্যা বকাওলীর উদ্যানের বকাওলী ফুলের সন্ধানে যায়। বহু দুঃখকষ্ট ও বাধাবিপত্তির শেষে ফুল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সেখানে রাজকন্যা বকাওলীর নিদ্রিতাবস্থায় তাজুলমুলুক অঙ্গুরীয় বিনিময় করে এবং প্রেমপত্র লিখে রেখে দেশে ফিরে আসে। বকাওলী তাজুলের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে তার অনুসন্ধানে বহির্গত হয় এবং বহু দুঃখ অতিক্রমের পর তার সঙ্গে মিলনে সক্ষম হয়। এই মূলকাহিনির সঙ্গে আরও উপকাহিনির সংযোজন ঘটেছে। কাহিনিটি অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ বলে তাতে রোমান্সের বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান। কবি কাহিনি সাবলীলভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। রূপ বর্ণনায় কবির দক্ষতার নিদর্শন আছে। কবি লিখেছেন :

সে কন্যার রূপের সাগর পরিমান।
অল্পমতি এক মুখে কি করি বাখান ॥
শির স্বর্গ, মর্ত্য নাভি, পদ সে পাতাল।
ত্রিভুবনে কন্যারূপে মোহে সর্বকাল ॥
রূপের সাগর ডুবে কন্যারূপ মাঝে।
সকলে আপনা ক্ষতি সেই রূপ লাজে ॥

শিরের উপরে কেশ অতি শ্যাম ভার।
জলদে রোষে লাজে গর্জিআ অপার ॥
অলি পিক চামরিকা গেল বনে বনে।
মহীতলে বাসা কৈল বাসুকী আপনে ॥

কবি নওয়াজিস খান একাধিক কাব্য রচনা করে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর প্রতিভার নিদর্শনের মধ্যে প্রখরতা ও গভীরতা না থাকলেও তাতে স্বচ্ছন্দতা ও সাবলীলতা ফুটে উঠেছিল। তাঁর কাব্য বিবৃতিধর্মী রচনা হলেও রচনাভঙ্গির স্বচ্ছলতা ছিল। কাব্যের প্রকাশভঙ্গিতে ছিল সযত্ন পরিচর্যার স্বাক্ষর। সুললিত ধ্বনিবিন্যাসে কবির লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নওয়াজিস খান 'গুলে বকাওলী' কাব্য ব্যতীত আরও কতিপয় কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা গেছে। তাঁর 'পাঠান-প্রশংসা' প্রশস্তিবাচক ক্ষুদ্র কাব্য, 'বয়ানাত' ধর্মীয় বিষয়ের বিবরণ এবং 'গীতাবলী' গানের সংগ্রহ।

গুলে বকাওলী কাব্যের অপরাপর রচয়িতাগণের মধ্যে চট্টগ্রামের কবি মুহম্মদ মকীমের কাব্য শিল্পগুণে মণ্ডিত। সম্ভবত আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৭৬০ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। কাব্যরূপায়ণে কবির প্রতিভার পরিচয় বিদ্যমান।

আবদুল হাকিম : ক. ইউসুফ-জোলেখা ও খ. লালমতী সয়ফুলমুলুক

কবি আবদুল হাকিম প্রণয়োপাখ্যান রচনার নিদর্শন রেখেছেন 'ইউসুফ জোলেখা' ও 'লালমতী সয়ফুলমুলুক' কাব্য রচনা করে। সতের শতকের এই কবি প্রণয়োপাখ্যান ছাড়াও তত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেগুলো হল : নুরনামা, নসিয়তনামা, সভারমূখতা, চারিমোকামভেদ, দোররে মজলিস ইত্যাদি। ফারসি কবি জামীর 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য অনুবাদ করেছিলেন আবদুল হাকিম। কিন্তু তাঁকে জামীর কাব্যের শ্রেষ্ঠ ও সুষ্ঠু অনুবাদক মনে করা হয় না। তবে তাঁর কাব্যে কবিত্বের নিদর্শন রয়েছে। কবির রচনারীতি ছিল বিবৃতিধর্মী, ভাষা প্রাঞ্জল হলেও ব্যঞ্জনাময় নয়। আবদুল হাকিমের অপর প্রণয়োপাখ্যান লালমতী সয়ফুলমুলুক কোন ফারসি উপাখ্যানের অনুসরণে রচিত। আবদুল হাকিমের সময়ে শাস্ত্রকথা বাংলা ভাষায় লেখা দূষণীয় বলে বিবেচিত হত। কবি হয়ত এ কারণে নিন্দিত হয়েছিলেন। তাই বিক্ষুব্ধ কবি 'নুরনামা' কাব্যে লিখেছিলেন :

যেই দেশে যেই বাক্য করে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন ॥
সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানি।
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যথ ইতি বাণী ॥
... ...
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়াএ।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ ন যাএ ॥

মাতাপিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥

বৈচিত্র্যপূর্ণ কাব্যসৃষ্টির মাধ্যমে কবি আবদুল হাকিম নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তবে বাংলা ভাষার তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি মাতৃভাষার প্রতি মর্যাদা দানের জন্য যে প্রগাঢ় আবেদন জানিয়েছিলেন তা ভাষাপ্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আজকের দিনে কবি আবদুল হাকিমের বক্তব্যের উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সে কারণে কবি এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ড. মুহম্মদ এনামুল হক মুসলমান কবি রচিত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোকে 'সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিম ললিতকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন' বলে মন্তব্য করেছেন। রোমান্টিক কাব্যধারার সীমারেখা আরাকান রাজসভার কবিগণের অবদান পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। মধ্যযুগের কবিগণ বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ইসলামি শরাশরিয়ত, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কাহিনি, মুসলিম সৃষ্টিতত্ত্ব, ইসলামি দর্শন বা সুফিতত্ত্ব, মর্সিয়া, রূপক ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য কাব্যের রচয়িতা হিসেবে মুসলমান কবিরা খ্যাতিমান। কিন্তু রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁরা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তার নিদর্শন অন্যত্র নেই। বিশেষত, মধ্যযুগের ধর্মশাসিত বাংলা সাহিত্যে মানবীয় প্রণয়কাহিনি ব্যতিক্রম অবদান হিসেবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ড. ওয়াকিল আহমদ মন্তব্য করেছেন, 'উৎসবের দিক থেকে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ও হিন্দি-আওধি কাব্যের উপাদান নিয়ে এসব প্রেমকাহিনি রচিত হয়। একমাত্র মাগন ঠাকুর-রচিত *চন্দ্রাবতী* কাব্যে দেশজ লৌকিক উপাদান অনুসৃত হয়। *ইউসুফ-জোলেখা* কাব্যের ইবন আমিন-বিধুপ্রভার প্রণয়বৃত্তান্তও লৌকিক। *সতীময়না-লোরচন্দ্রানী* কাব্যের আলাওলকৃত রতনকলিকা-আনন্দবর্মার প্রেমবৃত্তান্তও লৌকিক। যখন সমাজে ভাববিপ্লব আসে ও ভাষার বিকাশ ঘটে তখন দেশি-বিদেশি উপাদান দিয়ে সাহিত্যের সম্ভার পূর্ণ হয়। যেহেতু প্রণয়কাব্যের মুখ্য আবেদন গল্পরসে, সেহেতু কবিরা নতুন নতুন আখ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে কাহিনিকাব্যে বিষয়বৈচিত্র্য আসে, উৎসের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। বাংলা কাব্যের পটভূমি এই উপমহাদেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে আরব-ইরান পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। মুসলমান কবিদের এটি অভিনব ও স্বতন্ত্র দান।'

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। মধ্যযুগের সাহিত্যে রোমান্টিক প্রণয়কাহিনিমূলক কাব্যধারার পরিচয় দাও।

২। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে জীবনরসাশ্রিত প্রণয়োপাখ্যান রচনায় মুসলিম কবিসাহিত্যিকের একটি বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে।'—এই কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় প্রদান করিয়া উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচার কর।

৩। 'বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের বাহিরে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র ও যথার্থ উল্লেখযোগ্য সম্পদ হইতেছে মুসলিম কবিদের রচিত অলৌকিক প্রণয়কাহিনি কাব্যগুলি।'—বাংলা সাহিত্যের কোন কোন ইতিহাসকারের এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা আছে কি? উল্লেখযোগ্য প্রণয়কাহিনির পরিচয় দান প্রসঙ্গে তোমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ কর।

৪। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতাদের পরিচয় দিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা কর।

৫। 'মধ্যযুগের কাব্য রোমান্টিক প্রণয়-উপাখ্যান বলিতে যে সকল কাব্যের উল্লেখ করা হয় তাহার উপাদান ঘরের নহে বাহিরের, তথাপি উহার আবেদন আমাদিগকে অভিভূত করে।'—রোমান্টিক প্রণয়-উপাখ্যানগুলির গল্প ও পরিবেশ বিচার করিয়া উদ্ধৃতিটির যাথার্থ্য নির্ণয় কর।

৬। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদকর্ম কিরূপে ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া হিন্দি-ফারসি রোমান্টিক কাব্যের প্রধান অনুবাদকের পরিচয় দাও।

৭। হিন্দি-আওধী অবলম্বনে রচিত বাংলা রোমান্টিক কাহিনিকাব্যের পরিচয় দাও। প্রসঙ্গক্রমে ইহার ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা কর।

৮। 'ফারসি ও হিন্দি আওধী সাহিত্যের রোমান্টিক প্রণয়কাহিনির ভাণ্ডার থেকে রস আহরণ করে মধ্যযুগের মুসলমান কবিরা বাংলা সাহিত্যের রুচি বদল করেছিলেন।'—তুমি এই উক্তি স্বীকার কর কি? বুঝাইয়া দাও।

৯। 'মধ্যযুগের মুসলিম রচিত সাহিত্য দেশদুর্লভ নতুন ভাব, চিন্তা, রস ও আত্মবিশ্বাসপুষ্ট জীবনবোধের আকর।'—ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রণয়োপাখ্যানগুলির পরিচয়দানসূত্রে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য যাচাই কর।

১০। 'ষোল ও সতের শতকের প্রণয়োপাখ্যানে আমরা মাটির মানুষের জীবনস্বপ্নের রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করি।'—এই উক্তির আলোকে উক্ত দুই শতাব্দীর প্রধান প্রণয়োপাখ্যানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১১। রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যানগুলি আবিষ্কৃত না হইলে সমগ্র মধ্যযুগের কাব্য আমাদের কাছে একঘেয়ে ধর্মনীতিরূপে প্রতিভাত হইত।'—সমালোচকের অভিমতটি সম্পর্কে তোমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ কর।

১২। লৌকিক দেবদেবী অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলি রোমান্টিক প্রণয়-উপাখ্যান অপেক্ষা বেশি মূল্যবান কি না তাহা উক্ত দুই ধারার কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া পরীক্ষা কর।

১৩। মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের প্রধান অবদান কি? রোমান্টিক প্রণয়কাহিনি রচনা, না—হিন্দু পুরাণ-পাঁচালীর মুসলমান সংস্করণে আত্মনিয়োগ? দুই ধারার কয়েকজন কবি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া প্রশ্নটির মীমাংসা কর।

১৪। মধ্যযুগে রচিত বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

১৫। রেমান্স কাব্যধারার মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কিভাবে মানবিক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়, তার পরিচয় দাও।

১৬। টীকা লিখ : ইউসুফ-জোলেখা, দৌলতউজির বাহরাম খান, মধুমালতী, লায়লীমজনু, শাহ মুহম্মদ সগীর, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, সাবিরিদ খান।

পঞ্চদশ অধ্যায়
মর্সিয়া সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'মর্সিয়া সাহিত্য' নামে এক ধরনের শোককাব্য বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এমন কি তার বিয়োগাত্মক ভাবধারার প্রভাবে আধুনিক যুগের পরিধিতেও তা ভিন্ন আঙ্গিকে এসে উপনীত হয়েছে। শোক বিষয়ক ঘটনা অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টি বিশ্ব সাহিত্যের প্রাচীন রীতি হিসেবে বিবেচিত। 'মর্সিয়া' কথাটি আরবি, এর অর্থ শোক প্রকাশ করা। আরবি সাহিত্যে মর্সিয়ার উদ্ভব নানা ধরনের শোকাবহ ঘটনা থেকে হলেও পরে তা কারবালা প্রান্তরে নিহত ইমাম হোসেন ও অন্যান্য শহীদকে উপজীব্য করে লেখা কবিতা মর্সিয়া নামে আখ্যাত হয়। আরবি সাহিত্য থেকে মর্সিয়া কাব্য ফারসি সাহিত্যে স্থান পায়। ভারতে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশে ফারসি ভাষায় মর্সিয়া প্রচলিত হয় এবং পরে উর্দু ভাষাতেও তার প্রসার ঘটে। এসব আদর্শ অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্যের প্রচলন হয়। ভারতে বিভিন্ন ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্যের প্রচলনের পিছনে পারস্য দেশীয় বণিক, দরবেশ, পণ্ডিত, কবি প্রমুখের অনুপ্রেরণা বিশেষ ভাবে কাজ করেছে।

এসব কাব্যের কোন কোনটি যুদ্ধ কাব্য হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে কোন কোনটি পরিণতিতে চরম বিয়োগাত্মক রূপ গ্রহণ করেছে। শেষে কাব্য হয়ে উঠেছে মর্সিয়া বা শোক কাব্য। কোথাও কোথাও যুদ্ধকাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে জঙ্গনামা। কারবালার বিষাদময় কাহিনিতে যুদ্ধের ঘটনা যত প্রাধান্য পেয়েছে তার চেয়ে বেশি পেয়েছে শোকের অনুভূতি। এ প্রসঙ্গে ড. গোলাম সাকলায়েন মন্তব্য করেছেন, '*জঙ্গনামা* বা যুদ্ধকাহিনি-সংবলিত কাব্যগুলি মুসলিম কবিসৃষ্ট সাহিত্যধারার মধ্যে নানাকারণে বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। কারবালা-যুদ্ধভিত্তিক কাব্যনির্মাণ সেকালের কবিদের কাছে ফ্যাশান হিসাবে গণ্য হতো এবং সেটা প্রলোভনের ব্যাপারও ছিল। তার কারণ সুস্পষ্ট। মুহরম মাস এলেই বাংলার গ্রামে-গঞ্জে মুসলমানদের মন বেদনাকরুণ পুথিপাঠের আসর বসাতো আর সেইজন্য কবিরাও কারবালার করুণ কাহিনি নিয়ে *শহীদে কারবালা, জঙ্গনামা, হানিফার লড়াই* ইত্যাদি কাব্য লেখার তাগিদ বোধ করতেন।'

মর্সিয়া কাব্য বা শোক কাব্যের পটভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে ড. আহমদ শরীফ লিখেছেন, 'যুদ্ধ কাব্যের মধ্যে কারবালাযুদ্ধ কাব্যই ষোল-সতের শতক থেকে বাংলার মুসলিম সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হতে থাকে। তার কারণ দাক্ষিণাত্যের বাহমনিরাজ্যে-বিজাপুরে-বিদরে-বেরারে-গোলকুণ্ডায়-আহমদনগরে ইরানি বংশজ শিয়ারাই সুলতান ও শাসকগোষ্ঠী ছিলেন। শিয়ারা কারবালা যুদ্ধকে স্মরণ করা অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় পার্বণ বলেই জানে। চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের শিয়াদের ও ইরানি শিয়াদের

বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, সে-সূত্রে ষোল শতক থেকেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'মক্তুল হোসেন'(হোসেন নিধন) কাব্য রচিত হতে থাকে, তারপর শিয়া সাফাতী-শাসিত ইরানে আশ্রিত হুমায়ুনের দিল্লি প্রত্যাবর্তনের পরে দরবারসূত্রে ইরানের ও ইরানীয় প্রভাব প্রবল ও সর্বব্যাপী হতে থাকে। আবার আঠার শতকে সাফাতী রাজত্বের অবসানে ভারতে বাংলায় আশ্রিত শিয়া ইরানিদের প্রভাবে মুহররম তাজিয়াদি সহ একটি জনপ্রিয় জাতীয় পার্বণের মর্যাদায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায়।'

মোগল আমলে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে শিয়া শাসক ও আমীর ওমরাগণ শাসনকার্য উপলক্ষে এসে বসবাস করতেন। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মর্সিয়া সাহিত্য বিকাশের প্রেরণা দান করেন। তৎকালীন শিয়া শাসকরা কবিগণকে উৎসাহ প্রদান করতেন। অনেক কবি মুর্শিদাবাদের নবাবের মনোরঞ্জনের জন্য মর্সিয়া রচনায় আত্মনিয়োগ করতেন।

মর্সিয়া সাহিত্যের উৎপত্তি সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'যদিও ইমাম হাসান-হোসেনের প্রতি সমকালে হযরত আলীর ভক্ত-অনুগতদের ছাড়া আর কারও তেমন সমর্থন সহানুভূতি ছিল না, তবু কালক্রমে আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুলের নাতি বলেই মুসলিম মাত্রই হাসান-হোসেনের ভক্ত-সমর্থক এবং মুয়াবিয়া-এজিদের নিন্দুক হয়ে ওঠে। যেহেতু পরবর্তী কালে মুসলিমমাত্রই রসুলের আত্মীয় বলে তাঁর হতভাগ্য দৌহিত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ পরাজিত পক্ষের সমর্থক হয়ে যায়, যেহেতু নায়ক বিজয়গৌরব হীন, সেহেতু তার প্রধান রস করুণ হতেই হয়—শোকের বা কান্নার আধার বলেই এ বিলাপ-প্রধান সাহিত্যের নাম মর্সিয়া সাহিত্য বা শোক সাহিত্য।'

মর্সিয়া সাহিত্যের উৎপত্তি কারবালার বিষাদময় কাহিনি ভিত্তি করে হলেও তার মধ্যে অন্যান্য শোক ও বীরত্বের কাহিনির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফাগণের বিজয় অভিযানের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনিও এই শ্রেণির কাব্যে স্থান পেয়েছে। 'জঙ্গনামা' নামে বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের কাব্য রচিত হয়েছে। মর্সিয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. গোলাম সাকলায়েন তাঁর 'বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'এই কাব্যগুলির মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান তাঁহাদের প্রাণের কথা প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিলেন ও তাঁহারা ইহার মারফত অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিখিলেন। বাংলা মর্সিয়া কাব্যগুলি প্রধানত অনুবাদ সাহিত্য হিসাবেই গড়িয়া উঠে। বাঙালি কবিগণ যদিও মূলত ফারসি ও উর্দু কাব্যগুলির ভাবকল্পনা ও ছায়া আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন তথাপি এগুলির মধ্যে তাঁহাদের মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। ফলে এই কাব্যগুলি এক প্রকার অভিনব সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদূর আরব পারস্যের মানুষের কাহিনি কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া কবিগণ যে বাগভঙ্গি ও পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব ও উদ্ভট হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, বাঙালি কবিগণ মাটির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।'

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় বিষয়বস্তু ব্যাপক ভাবে স্থান লাভ করেছিল। মর্সিয়া কাব্যের উপাদান বিবেচনা করলে এগুলোকেও ধর্মীয় সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তবে অপরাপর ধর্মীয় সাহিত্যের সঙ্গে মর্সিয়া সাহিত্যের বিস্তর পার্থক্যও লক্ষ করা যেতে

পারে। মর্সিয়া কাব্যের নাম থেকেই অনুধাবন করা যায় যে এগুলো প্রকৃত পক্ষে শোককাব্য। তবে শোক প্রকাশের মধ্যেই এদের উদ্দেশ্য সমাপ্ত হয় নি, যুদ্ধকাব্য হিসেবে এদের গুরুত্বও কম নয়। বীরত্বের কাহিনি এসব কাব্যের প্রধান উপজীব্য। সে জন্য মুসলমানদের জাতীয় গৌরব ও ধর্মীয় মর্যাদার প্রকাশক হিসেবে মর্সিয়া কাব্যের বিশেষ তাৎপর্য অনুধাবন করা চলে। মানবিক বীরত্বের কাহিনি বর্ণিত হওয়ার ফলে মর্সিয়া সাহিত্য মধ্যযুগের সাহিত্যে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের ওপর ফারসি উর্দু হিন্দির প্রভাবের নমুনা হিসেবেও এদের তাৎপর্য বিবেচনা করা যায়। তবে ভাবানুবাদের বৈশিষ্ট্যের বাইরেও মৌলিক ভাবে মর্সিয়া কাব্য রচিত হয়েছে।

মোগল আমলে বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ খান, হায়াৎ মামুদ, জাফর, হামিদ প্রমুখ। ইংরেজ আমলে সৃষ্ট মর্সিয়া সাহিত্য বিষয়ের দিক থেকে যথেষ্ট বৈচিত্র্যধর্মী হয়ে ওঠে। এ সময়ের সাহিত্যকে চারটি পৃথক ধারায় বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম ধারা : মোগল আমলের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মর্সিয়া সাহিত্য। হামিদুল্লাহ্ খান এই ধারার অনুসারী। দ্বিতীয় ধারা : মুসলমানি বাংলায় রচিত মর্সিয়া সাহিত্য। গরীবুল্লাহ্, রাধারমণ গোপ প্রমুখ এই ধারার অনুসারী। তৃতীয় ধারা : আধুনিক বাংলায় রচিত মর্সিয়া সাহিত্য। এর গদ্যধারায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন—মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ এবং কাব্যধারায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন—কায়কোবাদ প্রমুখ। চতুর্থ ধারা : লোক সাহিত্যে মর্সিয়া। জারী গান এই পর্যায়ভুক্ত।

মর্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। এদেশে শিয়া মতবাদ প্রসারের ফলে মর্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে দেশের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কথাও উল্লেখযোগ্য। মুসলমান শাসনের শেষ দিকে এবং ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে মুর্শিদাবাদের নবাবদের শাসনশৈথিল্য, বর্গীর হাঙ্গামা ও পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি মিলে সমগ্র দেশে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের নগর সমাজের সকল স্তরে ধনী সামন্তগণের যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা নগ্নমূর্তিতে প্রকাশ পেয়ে সমাজের ভিত্তি নষ্ট করে ফেলে। এসময়ে মুসলমানেরা আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি হারিয়ে ফেলে। এতে তারা অদৃষ্টনির্ভর ও দৈববাদী হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমানি বাংলায় রচিত মর্সিয়া সাহিত্য পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, 'সাধারণ বাঙালি মুসলমান তাহার বিড়ম্বিত জীবন ও লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সত্যপীর, বড় খাঁ গাজী, ইসমাইল গাজী প্রভৃতি ইষ্টপীর বা শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মুসলিম কবিগণ জাতীয় বীরপুরুষগণকে (যেমন ইমাম হুসেন, হযরত আলী প্রভৃতি) কাব্যমধ্যে আমদানি করিয়া কাব্য রচনা করিতে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন।' তখন মুসলমানরা ধর্মমূলক সাহিত্য পাঠের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। বহুকাল তারা হিন্দু দেবদেবী অবলম্বনে রচিত সাহিত্যপাঠে কাব্য পিপাসা মিটাত। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধমূলক কাব্য পাঠের দিকে তারা ঝুঁকে পড়ে। পাঁচালীর আঙ্গিকে রচিত মর্সিয়া সাহিত্যে পীরের মাহাত্ম্য ও শক্তির প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে এবং ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কারবালার বিষাদময় কাহিনির প্রতি আকর্ষণ ফুটে উঠেছে।

বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। শেখ ফয়জুল্লাহকে এ ধারায় প্রথম কবি বলে মনে করা হয়ে থাকে। তিনি 'জয়নবের চৌতিশা' নামে কাব্যের রচয়িতা। কাব্যটি আকারে ক্ষুদ্র এবং কারবালার কাহিনির একটি ছোট অংশ অবলম্বনে তা রচিত। কবির জীবৎকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ বলে মনে করা হয়। তিনি একজন প্রতিভাশালী কবি ছিলেন।

দৌলত উজির বাহরাম খান 'জঙ্গনামা' কাব্য রচনা করেছিলেন। কারবালা কাহিনি নিয়ে রচিত 'জঙ্গনামা' বা 'মক্তুল হোসেন' কবির প্রথম রচনা। তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 'লায়লী মজনু' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

মুহম্মদ খান

মুহম্মদ খান 'মক্তুল হোসেন' কাব্য রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই কাব্যটি ফারসি 'মক্তুল হোসেন' কাব্যের ভাবানুবাদ। তবে এতে কবির নিজের ভাবনা চিন্তা ও কল্পনা প্রাধান্য লাভ করেছিল। মুহম্মদ খান চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৬৪৫ সালে 'মক্তুল হোসেন কাব্য' রচিত হয়। কবির বৃদ্ধাবস্থায় এটি রচিত। কবি সতের শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়। কাব্যটিতে কবি প্রতিভার উৎকর্ষের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। কবি তাঁর কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের যে বিবরণ উল্লেখ করেছেন তাতে 'আদি পর্বে ফাতেমার বিবাহ কহিব', এবং শেষ পর্ব কেয়ামত ও হাসর বর্ণনা—'একাদশ পর্ব তার পশ্চাতে কহিব/প্রলয় হইতে যথ অনর্থ হইব।' ইমাম হোসেন নিহত হলে কি অবস্থা হয়েছিল কবি তার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন :

স্বর্গমর্ত্য পাতালে উঠিল হাহাকার।
কান্দন্ত ফিরিস্তা সব গগন মাঝার ॥
বিলাপন্ত যতেক গন্ধর্ব বিদ্যাধর।
আর্শকুর্সি লওহ আদি কাঁপে থরথর।
অষ্ট স্বর্গবাসী যত করন্ত বিলাপ।
এ সপ্ত আকাশ হৈল লোহিত বরণ।
কম্পমান সূর্য দেখি হোসেন নিধন ॥
ক্ষীণ হৈল নিশাপতি আমীরের শোকে।
মঙ্গল অরুণ বর্ণ রক্ত মাখি মুখে ॥
বুধে বুদ্ধি হারাইল গুরু এড়ে জ্ঞান।
শুনি কালা বস্ত্র পিন্ধে পাই অপমান ॥
জোহরা নক্ষত্র কান্দে শোকে বিষাদিত ॥
সমুদ্রে উঠিল ঢেউ পরশি আকাশ।
কম্পিত পর্বত ছাড়ে সঘন নিঃশ্বাস ॥
কম্পমান পৃথিবী যতেক বরাবর।
হইল শোণিত বর্ণ দিক দিগন্তর ॥
জল তেজে মীনগণ পক্ষী তেজে বাসা।
সব কান্দে হাসে ইব্লিস অনা আশা ॥

বাংলা ভাষায় পুণ্যকথা প্রচারে সে আমলে যে ভীতি ছিল তা কবির কথায় ফুটে উঠেছে :

হিন্দুস্তানে লোক সবে না বুঝে কিতাব।
না বুঝি না শুণি নিত্য করে পাপ ॥
তেকাজে সংক্ষেপ করি পঞ্চালি রচিলুঁ।
ভালমন্দ পাপপুণ্য কিছু না জানিলুঁ ॥
অবশ্য মোহোরে সবে দিবে আশীর্বাদ।
মহাজন আশীর্বাদে খণ্ডিবে প্রমাদ ॥
বিশেষ পীরের আজ্ঞা না যাএ খণ্ডন।
রচিলুম পঞ্চালিকা তাহার কারণ ॥

'মক্তুল হোসেন' কাব্য সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'মুহম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেন' কাব্যটি বিপুল কলেবর। কারবালা সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠও বটে।' এ কাব্য কারুণ্যের নির্ঝর—

'মুহম্মদ খানে কহে শুনিতে মরম দহে
পাষাণ হইয়া যাএ জল।'

এ কাব্যটি মুহম্মদ খান তাঁর অধ্যাত্মগুরু পীর কবি সৈয়দ সুলতানের অভিপ্রায়ক্রমে তাঁরই 'নবীবংশ' কাব্যের সম্পূরক বা পরিপূরক হিসেবে রচনা করেছিলেন :

শাহ সুলতান পীর কৃপার সাগর॥
নবীবংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান।
রসুলের ওফাত রচিয়া না রচিলা
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা।
তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেতে আকলি
চারি আসব্বার কথা কৈলুঁ পদাবলী।

সেরবাজ

আঠার শতকের কবি শেখ সেরবাজ চৌধুরী 'কাশিমের লড়াই' কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির নিবাস ছিল ত্রিপুরা জেলায়। মহররমের একটি ক্ষুদ্র বিবরণী এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। বিষয়বস্তু গতানুগতিক এবং তাতে কোন নতুনত্ব নেই। এই কাব্য ছাড়া তিনি 'মল্লিকার হাজার সওয়াল' ও 'ফাতিমার সূরতনামা' কাব্য রচনা করেছিলেন।

হায়াত মামুদ

আঠার শতকের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন হায়াত মামুদ। কবি রংপুর জেলার ঝাড়বিশিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'জঙ্গনামা' কাব্য কবির প্রথম রচনা। ফারসি কাব্যের অনুসরণে কাব্যটি রচিত। কাব্যটির রচনাকাল ১৭২৩ সাল। জঙ্গনামা কাব্যে

কবির আত্মপরিচয় আছে। কর্ম জীবনে তিনি কাজীপদে নিযুক্ত ছিলেন। কবির উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসের অনুসরণে কারবালা কাহিনি রচনা করা। সেজন্য কবি লিখেছেন :

যতেক শুনিনু মুঞি পুস্তক বয়াতে
কত আছে কত নাহি কিতাবের মতে।
নাহি জানে আদ্য কথা নাহি পাএ তত্ত্ব
... ...
তাহা শুনি মনে মোর দ্বিধা সর্বক্ষণ
রচিনু পুস্তক তবে জানিতে কারণ।

কবি সতের শতকের শেষে জন্মগ্রহণ করেন এবং আঠার শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর অন্যান্য কাব্যের নাম 'চিত্তউত্থান', 'কামালনসিয়ত', 'ফকিরবিলাস', 'হিতজ্ঞানবাণী' ও 'আম্বিয়াবাণী'।

জাফর

জাফর নামক একজন অজ্ঞাতনামা কবি 'শহীদ-ই-কারবালা' ও 'সখিনার বিলাপ' নামে মর্সিয়া শ্রেণির কাব্য রচনা করেছিলেন। এতে কবির স্বাভাবিক কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। সম্ভবত আঠার শতকের কোন এক সময়ে এ কাব্য রচিত হয়। কবি এ ভাবে তাঁর কাব্য সমাপ্ত করেছেন :

একে একে যত সব ওলিগণ আসিল।
আনিয়া স্বর্গের জল সিনান করাইল ॥
বিহিস্তের কাফন লৈয়া জিব্রিল আসিল।
রসুলেতে হুকুম দিল জিব্রিলে পরাইল ॥
স্বর্গে চলি গেল সবে হোসেনেরে লৈয়া।
ভিহিস্তে রহিল সবে হুর সব লৈয়া ॥

আঠার শতকের আর একজন কবি ছিলেন হামিদ। 'সংগ্রাম হুসন' নামে তিনি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্য রচনা করেন। মোগল আমলে আরও অনেক মর্সিয়া কাব্য রচিত হয়েছিল।

ইংরেজ আমলেও বাংলা সাহিত্যে মর্সিয়া কাব্যের ধারাটি অনুসৃত হয়েছিল। ফকির গরীবুল্লাহ 'জঙ্গনামা' কাব্য রচনা করেছিলেন। পুঁথি সাহিত্যের ভাষায় এই কাব্যটি রচিত। তাঁর অন্যান্য কাব্যের নাম : সোনাভান, আমীর হামজা, ইউসুফ জোলেখা, জঙ্গনামা ও সত্যপীর। মর্সিয়া কাব্য ধারায় রাধারমণ গোপ নামে একজন হিন্দু কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি 'ইমামগণের কেচ্ছা' ও 'আফৎনামা' নামে দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এগুলো আঠার শতকে রচিত হয়েছিল বলে ড. সুকুমার সেন মনে করেন। মর্সিয়া কাব্যের ধারাটি আরও পরবর্তীকাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল।

মর্সিয়া কাব্যগুলো বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কারবালার করুণ কাহিনির সঙ্গে সম্পৃক্ততার জন্যই এই জনপ্রিয়তা। শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের বাইরেও

সামগ্রিক মুসলিম সমাজে কারবালা কাহিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করে আছে। বিষয়বস্তুর জন্যই এ ধরনের সাহিত্য এক সময় পাঠকের রসপিপাসা মিটিয়েছে। মর্সিয়া কাব্যগুলোর মধ্যে সমসাময়িক সমাজজীবনের চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এতে প্রধানত পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের চিত্র লক্ষ করা যায়। কবিগণ চরিত্রচিত্রণে দক্ষতা দেখিয়েছেন। বর্ণনাভঙ্গিতে তাঁরা কুশলতা ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। মধ্যযুগের বাংলা মর্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টির পশ্চাতে তদানীন্তন কালের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশই মূলত দায়ী।—এ সম্পর্কে তোমার মতামত যুক্তিসহ লিখ।

২। বাংলা মর্সিয়া কাব্যগুলির ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ কর।

৩। বাংলা মর্সিয়া কাব্যের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণ কর।

ষোড়শ অধ্যায়
মুসলিম কবিগণের অন্যান্য কাব্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরে মুসলমান কবিগণ কাব্যরচনায় বিষয়বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন। মুসলিম কবিরা দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে বিরাজমান গতানুগতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। আবার ইসলামি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হিসেবেও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে তাঁরা সকল উৎস থেকেই প্রভাবিত হয়েছিলেন। মধ্যযুগের মুসলমান শাসকগণের বাংলা সাহিত্যের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা যেমন সাহিত্যের বিকাশে সহায়ক হয়েছে তেমনি সমৃদ্ধ ইসলামি ঐতিহ্য সাহিত্যসৃষ্টির জন্য সুপ্রচুর উপকরণ যুগিয়েছে। তাছাড়া নিজেদের সমাজে ধর্ম ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রচার ও স্বরূপ উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন ইসলামি বিষয় অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টির আবশ্যকতা সে আমলে ব্যাপক ভাবে অনুভূত হয়। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের জন্য মুসলমান কবিগণ নিজস্ব ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান করেছেন। হিন্দু কবিদের রচনার নিদর্শনও মুসলমান কবিদের স্বতন্ত্র সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করেছে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যই মধ্যযুগের মুসলিম কবিগণকে স্বতন্ত্র ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে কাব্য রচনা মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। মুসলমান কবিগণ তাঁদের বিভিন্ন ধরনের রচনায় ব্যাপকভাবে এই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে এক্ষেত্রেও তাঁদের যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ছিল। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লেখা হলেও তাঁদের কাব্যে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা বহুলাংশে অনুসৃত হয়েছে। মানবিকতার ধারায় প্রবাহিত করে মুসলিম কবিরা যে নতুনত্ব আরোপ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে মুসলমান কবিগণ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের অনুসারী ছিলেন বলে তাঁদের রচনায় প্রণয়কাব্যও গুরুত্ব পেয়েছে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে মধ্যযুগের মুসলিম রচিত বাংলা সাহিত্যকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. কাহিনি কাব্য : ক. মুসলিম কাহিনি কাব্য : যেমন : ইউসুফ-জোলেখা
খ. ভারতীয় কাহিনি কাব্য : যেমন : বিদ্যাসুন্দর

২. ধর্মীয় কাব্য : ক. ইসলামি শরাশরিয়ত সম্বলিত কাব্য : যেমন : নসিয়ৎনামা
খ. মুসলিম ঐতিহাসিক কাহিনি কাব্য : যেমন : রসুলবিজয়
গ. হিন্দু ঐতিহাসিক কাহিনি কাব্য : যেমন : গোরক্ষবিজয়

৩. সংস্কৃতি সমন্বয়-সঞ্জাত কাব্য : ক. সত্যপীর
খ. পদাবলি

৪. শোকগাথা : মর্সিয়া সাহিত্য জঙ্গনামা : যেমন : জয়নবের চৌতিশা

৫. জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় কাব্য : যেমন : নীতিশাস্ত্রবার্তা

৬. সঙ্গীত শাস্ত্রীয় কাব্য : যেমন : রাগমালা

বৈচিত্র্যধর্মী এসব বিষয়বস্তু অবলম্বনে কাব্য রচনা করে মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণ যে বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এসব ক্ষেত্রে আরবি ফারসি হিন্দি প্রভৃতি উৎস থেকে অনুবাদমূলক কাব্যসৃষ্টি যেমন আছে, তেমনই কোথাও কোথাও মৌলিকতার নিদর্শনও বিদ্যমান। অনুবাদমূলক রচনায় ভাবানুবাদের বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পেয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কবিদের মৌলিক রচনারও সংযোজন ঘটেছে। দেশের মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে কবিরা বিচিত্র বিষয় কাব্যে আমদানি করেছিলেন। উপস্থাপনা, বক্তব্য পরিবেশনা, ভাষার প্রকাশভঙ্গিতে সেজন্য কবিগণ দেশজ প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কবিরা ধর্মের পুণ্যকথা বাংলায় প্রচার করতে গিয়ে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

তবে এসব রচনায় কবিপ্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর সহজেই লক্ষ করা যায়। মুসলমান কবিগণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে এভাবে বিষয়বৈচিত্র্যের মাধ্যমে স্বতন্ত্র ও আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। মধ্যযুগের মুসলিম কবি রচিত কয়েকটি শাখার পরিচয় দেওয়া হল।

ক. ধর্মীয় সাহিত্য

বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণের আগমন ঘটেছিল তুর্কি বিজয়ের আগেই। সে সব প্রচারকের প্রচেষ্টায় এদেশে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে এবং তের শতকের প্রথমেই তুর্কি বিজয়ের প্রেক্ষিতে এদেশে মুসলিম শাসনের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ব্যাপকতর হয়। এদেশের মুসলমান সমাজকে নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য প্রথমদিকে মুখে মুখে প্রচারণাই গুরুত্ব পেয়েছে। মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শাস্ত্রশিক্ষার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু ষোল শতকের শেষ পাদের আগে ইসলামি শাস্ত্র বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে বাধা ছিল—ঐশীবাণীর পবিত্রতা, গুরুত্ব, মর্যাদা ও ক্রিয়াশক্তি বিনষ্ট হবে আশঙ্কায়। এরপর থেকে শাস্ত্রকথা অনুবাদের পাপভয় পরিহার করে মাতৃভাষায় শাস্ত্রকথা রচনার শুভযাত্রা শুরু হয়। মাতৃভাষা বাংলার উপযোগিতা সম্পর্কে কবিরা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। জনকল্যাণই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। এই পর্যায়ের কয়েকজন কবির কথা উল্লেখ করা হল।

শেখ পরান

শেখ পরান ইসলাম ধর্ম বিষয়ে দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন। ১. কায়দানী কিতাব ও ২. নুরনামা। কায়দানী কিতাবে ওজু গোসল নামাজ ইমান ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

শেখ পরান তাঁর কায়দানী কিতাবে কাব্যরচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে সমকালীন কবিগণের নাম উল্লেখ করেছেন :

যদি বোল গোর হোন্তে না উঠিব পুনি।
কাফির হৈয়া যাইব নরকেতে জানি ॥
সুরতনামার মধ্যে ইমার সিফত।
কহিছন্ত হাজী মুহম্মদ ভাল মত ॥
তেকারণে এথা মুঞি না কৈলু সমস্ত।
কিঞ্চিত কহিলুঁ মুঞি ইঙ্গিতে বুঝিতে ॥

শেখ মুত্তালিব

শেখ পরানের পুত্র শেখ মুত্তালিব চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'কায়দানী কিতাব' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। 'কিফায়তুল মুসাল্লীন' নামে সুবৃহৎ গ্রন্থটি তাঁর অমর কীর্তি এবং ইসলাম ধর্ম বিষয়ক এ কাব্যের জন্যই তিনি সমধিক পরিচিত হন। তাঁর কাব্যটি ১৬৩৮-৩৯ সালে সমাপ্ত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে আচরণীয় বিষয় এতে স্থান পেয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে লেখা বলে কাব্যটি মুসলমানদের জীবনের নিত্যকর্ম নিয়ন্ত্রণের সহায়ক হয়েছিল। ধর্মীয় বিষয় বাংলা ভাষায় পরিবেশনে সে আমলে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল সে সম্পর্কে কবি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন :

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ।
তেকারণে দেশী ভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ ॥
মুসলমানী শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুঁ।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ ॥
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে।
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে ॥
মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক।
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ খেমিবেক ॥
এসব জানিয়া যদি করএ রক্ষণ।
তবে সে মোহোর পাপ হইবে মোচন ॥

আশরাফ

কবি আশরাফ এদেশে ধর্মীয় শিক্ষাদানের সহায়ক গ্রন্থ 'কিফায়তুল মুসলেমিন' রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন নামাজের ফজিলত বর্ণনা করাই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। কবি আঠার শতকের গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন।

মুজাম্মিল

কবি মুজাম্মিল 'নীতিশাস্ত্রবার্তা' ও 'সায়াৎনামা' কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি লোকহিতার্থে পীরের আদেশে আরবি হাদিস গ্রন্থ অবলম্বনে 'নীতিশাস্ত্রবার্তা' কাব্য রচনা করেন। কাব্য সম্পর্কে কবি লিখেছেন :

নীতিশাস্ত্র বার্তা যেবা পড়এ শুনএ।
আয়ু যশ বাড়ে তার দারিদ্র খণ্ডএ ॥

কবি বাংলা মাস, ঋতু ও বাঙালি সুলভ বহু আচার আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন। এতে তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ড. আহমদ শরীফ মুজাম্মিলকে ষোল শতকের কবি বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, 'মুজাম্মিল যদিও বলেছেন, আরবি হাদিস গ্রন্থই তিনি অনুবাদ করেছেন, তবু তিনিও যে মুফতির আসনে বসে নিজেই বহু ফতোয়া হেঁকেছেন, তার প্রমাণ রচনার সর্বত্রই মিলবে। আসলে কবি বাংলাদেশের মুসলমানের

আচরিক জীবনশাস্ত্রই রচনা করেছেন।' কবি মুজাম্মিল জীবনাচরণে ইসলামি পদ্ধতির কথা লিখেছেন :

রচিলেক মুজাম্মিলে হাদিস দেখিয়া।
নববস্ত্র পরিবেক দরুদ পড়িয়া ॥
আরবী ভাষায় সবে না বুঝে কারণ।
সভানে বুঝিতে কৈলুঁ পয়ার রচন ॥

মহাকবি আলাওল রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান 'পদ্মাবতী' রচনা করে বিস্ময়কর খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ফারসি কবি ইউসুফ গদার কাব্যের অনুবাদ হিসেবে আলাওল 'তোহফা' কাব্যটি রচনা করেন। এতে ইসলামি ক্রিয়াকলাপের বিবরণ আছে। কবি আলাওল ভিখারির প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে লিখেছেন :

কৃপা ভাবে ভিক্ষুকে করিলে এক দৃষ্টি।
তোমা পরে ঈশ্বরে করিব কৃপা বৃষ্টি ॥
নিজ অঙ্গে দুঃখ সহে পর দুঃখ লাগি।
তার সম কেহ নহে প্রভু-কৃপা ভাগী ॥
দ্বারে আসি ভিক্ষুকে মাগিলে এক রুটি।
না দিয়া ফিরাএ যদি নষ্ট পরিপাটি ॥
ঈশ্বরে বোলএ আমি গেলুঁ তোর দ্বারে।
এক গ্রাস ভক্ষ্য তুমি না দিলা আমারে ॥
দ্বার হন্তে কেহ যদি মাগুয়া খেদাএ।
মোকে খেদাইলে হেন বোলএ খোদাএ ॥
গ্রাস এক না দিয়া খেদাএ ভিক্ষুক।
সহস্র বৎসর দোজখেত পাইব দুঃখ ॥

কবি আবদুল হাকিমও প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি ইসলামি তত্ত্ববিষয়ক কয়েকটি কাব্য রচনা করেন। নসিয়ৎ নামা, নূরনামা, চারি মোকাম ভেদ ইত্যাদি তাঁর এ পর্যায়ের কাব্য।

ইসলাম ধর্মীয় বিষয় নিয়ে রচিত কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন : সৈয়দ নূরুদ্দীন, নসরুল্লাহ খোন্দকার, আফজাল আলি, মুহম্মদ ফাসিহ, মুহম্মদ জান, আজমত আলী, শেখ সোলেমান, ফয়জুল্লা, আবদুন নবী প্রমুখ।

খ. সুফি সাহিত্য

ইসলামি বিষয় অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির যে সব নিদর্শন মধ্যযুগে লক্ষ করা যায়, তার মধ্যে সুফি সাহিত্য বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সুফি মতবাদের প্রসার ঘটে এবং সাহিত্যে ধর্মীয় বিষয়ের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সুফিতত্ত্ব নিয়েও সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ড. আহমদ শরীফ 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে প্রায় বিশটি সুফিশাস্ত্র গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। সেগুলো হল :

শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়', অজ্ঞাতনামা কবির 'যোগকলন্দর', সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপ-জ্ঞানচৌতিশা', হাজী মুহম্মদের 'নুরজামাল', মীর মুহম্মদ সফীর 'নূরনামা', শেখচান্দের 'হরগৌরী সম্বাদ' ও 'তালিবনামা', আবদুল হাকিমের 'চারি মোকাম ভেদ' ও 'শিহাবুদ্দীন পীরনামা', আলি রজার 'আগম-জ্ঞানসাগর', বালক ফকিরের 'জ্ঞানচৌতিশা', নেয়াজের 'যোগকলন্দর', মোহসেন আলীর 'মোকাম-মঞ্জিল কথা', শেখ মনসুরের 'সির্নামা', শেখ জাহিদের 'আদ্যপরিচয়', শেখ জেবুর 'আগম', রমজান আলীর 'আদ্যব্যক্ত', রহিমুল্লার 'তনতেলাওত' এবং সিহাজুল্লাহর 'যুগীকাচ'।

সৈয়দ সুলতান

বাংলা সুফি সাহিত্যের ধারায় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি হলেন সৈয়দ সুলতান। 'জ্ঞানপ্রদীপ' তাঁর সুফিচর্যা গ্রন্থ। এই কাব্য সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, 'ইহা একখানি যোগ-কলন্দর শ্রেণির গ্রন্থ। তবে ইহা কবির পরিণত বয়সের রচনা। কবি এখন তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ এবং শাহ হুসেন নামক এক গুরুর শিষ্য। বোধ হয়, অল্প বয়সে লিখিত জ্ঞান-চৌতিশার দোষত্রুটি ও অজ্ঞতার বিষয় অবগত হইয়া কবি সাধক সৈয়দ সুলতান পরিণত বয়সে এই তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে সুফি-সাধন তত্ত্বের সহিত সন্ন্যাসীর যোগ-সাধন-তত্ত্ব মিশিয়া গিয়াছে।'

কাব্যটিতে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে কবি নির্দেশ করেছেন :

প্রথমে জানিব যত দরবেশী বিচার।
দ্বিতীএ জানিব যত এবাদত খোদার ॥
তৃতীএ জানিব সব তনের বিচার।
চতুর্থে জানিব সেই তত্ত্ব আপনার ॥
পঞ্চম প্রকারে কহে দীলের বিচার।
ষষ্ঠ যে প্রকারে কহে জিকির হুঙ্কার ॥
সপ্তম প্রকারে বুঝে পঞ্চ যথা রহে।
অষ্টম প্রকারে কর আত্তমা পরিচয় ॥
নবমে জানিব ব্রহ্মতত্ত্ব কহি যারে।
দশমেত কার্য করিবেক যে প্রকারে ॥

শেখ চান্দ

শেখ চান্দের কাব্যের নাম 'হরগৌরীসম্বাদ' ও 'তালিবনামা'। এদের বিষয়বস্তু অভিন্ন। পার্থক্য এই যে, 'হরগৌরীসম্বাদে' উমার প্রশ্নের উত্তরে শিব জগৎ সৃষ্টি ও জীবতত্ত্ব তথা মহাজ্ঞান কথা বলেছেন, আর 'তালিবনামায়' সে কথাগুলো শেখ চান্দের জিজ্ঞাসার জবাবে পীর শাহদৌলা একটু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন। শেখ চান্দ 'রসুলবিজয়' নামে একটি বিপুল আকারের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

অজ্ঞাতনামা কবির 'যোগকলন্দর' নামক কাব্যটিকে আদি সুফিশাস্ত্র গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়। এটি লোকসাহিত্যের মত কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা লোকশ্রুতিতে রক্ষিত হয়ে পরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাব্যটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

হাজী মুহম্মদ

হাজী মুহম্মদের 'সুরতনামা' বাংলা সুফিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। হাজী মুহম্মদের জীবৎকাল ১৫৬৫ থেকে ১৬৩০ সাল অনুমান করা হয়েছে। তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তত্ত্বকথা বর্ণনায় কবি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। জটিল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা প্রাঞ্জল ও সরস করে বলার স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা তাঁর ছিল। কবির মতে,

সকল মঞ্জিল আছে শরীয়ত ভিতর ॥
শরীয়ত চাপনি সলিতা তরিকত।
হকিকত তৈল যেন অগ্নি মারফত ॥

মীর মুহম্মদ শফী

মীর মুহম্মদ শফী বা শফিউদ্দিন সৈয়দ সুলতানের পৌত্র ছিলেন। কবি মীর মুহম্মদ শফীর কাব্যের নাম 'নুরনামা।' কবির কাল সতের শতকের প্রথমার্ধ বলে অনুমান করা হয়। কবি তাঁর কাব্যের বক্তব্য সম্পর্কে বলেছেন :

কি রূপে হৈল নুর আল্লার দিদার।
কোন মতে হৈল স্বর্গ ক্ষিতি উত্পন
কেমতে হৈল বোল জীবের সৃজন।
আব আতস খাক বাত কোথা হন্তে হৈল
ভিহিস্ত দোজখ বোল কেমতে হইল।

এসব জিজ্ঞাসার জবাব কবি তাঁর কাব্যে দিয়েছেন। কবি সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে চন্দ্র, কুর্সি, হাওজ-ই-কওসর, আব-ই-জমজম, সপ্তনদী, খাক, বাত, আতস, বিশ্বকর্মা, মুনি, দেবতা, হুর, গন্ধর্ব, পরী, নহস, নসরানি, কীটপতঙ্গ, তুবাবৃক্ষ, বেহেস্ত, দোজখ প্রভৃতির সৃষ্টির কথা বলেছেন।

কাজী শেখ মনসুর

কবি কাজী শেখ মনসুর ছিলেন কক্সবাজারের রামুর কাজী ও সেখানকার অধিবাসী। ১৭০৩ সালে তিনি তাঁর 'সির্নামা' কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি ফারসি 'আসরারুল মুসা' কাব্যের বাংলা সার সংকলন। গ্রন্থের উৎপত্তি সম্পর্কে কবি লিখেছেন :

বচন আরবী ভাষে সব শাস্ত্র মূল
বুঝিতে ফারসী ভাষে কিতাব বহুল।
বাঙ্গালে না বুঝে সব ফারসী কিতাব
না বুঝি কিতাব কথা মনে পাএ তাপ।
সবে বোলে বাঙ্গালের ভাষে এ কিতাব।
শুনিতে পারিএ যদি যাএ মনস্তাপ।
তেকাজে বাঙ্গালা ভাষে ফারসী বচন
পদবন্দী করি কৈলুঁ পুস্তক গ্রথন।

কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন :

রোসাঙ্গে আছিল আমি রাষ্ট্রু কৈল বাস।
কহত মনসুর কাজী ঈসার তনয় ॥

আলি রজা

কবি আলি রজা (১৬৯৫-১৭৮০) ছিলেন একজন সাধক। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার ওশখাইন গ্রামে তাঁর বাস ছিল। তিনি কানু ফকির নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সাধক, তাত্ত্বিক কবি ও পীর। আলি রজা 'ধ্যানমালা', 'সিরাজকুলব', 'আগম' ও 'জ্ঞানসাগর' কাব্য রচনা করেছিলেন। তিনি কিছু মারফতি গান ও পদাবলিও রচনা করেছিলেন। 'আগম' ও 'জ্ঞানসাগর' একই গ্রন্থের দুই পর্ব। কবি 'আগমের' শুরুতেই লিখেছেন :

হৃদয় প্রদীপ মোর তুমি গুরু সার।
কৃপা কর গাঁথিবারে 'আগম বিচার' ॥
প্রভুর গোপত তত্ত্ব মারফত যে হয়।
সেই মারফত নাম আগম বলয় ॥
শাহা কেয়ামদ্দি গুরু জ্ঞান-সুধা ধার।
তোমা কৃপা হইতে গতি আগম আমার ॥

কবি 'যোগ'কেই সাধন ও সিদ্ধির একমাত্র পথ বলে বিবেচনা করে লিখেছেন :

যোগ বিনু পুণ্যবলে স্বর্গ যদি পাএ।
দেখা না করিব তার সঙ্গে বিধাতাএ ॥

গ. সওয়াল সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিরা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধর্মীয় শাস্ত্রকথা ও তত্ত্বচিন্তা প্রচারের জন্য এক ধরনের কাব্য রচনা করেছিলেন। এগুলোকে 'সওয়াল সাহিত্য' নামে অভিহিত করা হয়। জ্ঞান বিস্তারের জন্য প্রশ্ন ও উত্তরের প্রয়োগ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী। গুরু ও শিষ্য অথবা জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ঐহিক ও পারত্রিক বিষয় আলোচনার এই প্রাচীন রীতিটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে। মধ্যযুগে মুসলমান কবিগণের আবির্ভাবের কাল থেকে আঠার শতক পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে অনেক কাব্য রচিত হয়েছে। এ ধরনের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত যেসব রহস্যজিজ্ঞাসা মানুষকে চিরকাল আকুল করেছে, সেগুলোর শাস্ত্রীয়, কাল্পনিক ও নীতিজ্ঞানপ্রসূত উত্তর দানের চেষ্টা আছে সওয়াল সাহিত্যে। এই রীতিতে রচিত কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : মুসার সওয়াল, আবদুল্লাহর সওয়াল, মল্লিকার হাজার সওয়াল, গদা-মল্লিকা সম্বাদ, সিরাজকুলব, হরগৌরী সম্বাদ ইত্যাদি। এসব কাব্যে যে জ্ঞান প্রচার করা হয়েছে তাতে আছে

শরিয়তি ও মারফতি জ্ঞান। তবে সবক্ষেত্রে তা ধর্মশাস্ত্র সম্মত নয়, লৌকিক বিশ্বাস ও শ্রুতিস্মৃতি ভিত্তিক বক্তব্যও স্থান পেয়েছে। শাস্ত্রকথার ফাঁকে ফাঁকে এসব কাব্যে অন্যবিধ জ্ঞানেরও সংযোগ ঘটেছে। ভৌগোলিক, পৌরাণিক, প্রাকৃতিক বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গে ধাঁধাঁ-হেঁয়ালীরও অনুপ্রবেশ লক্ষ করা যায়। এসব কাব্যে কবিদের পরিবেশিত সত্য ও শাস্ত্র, তথ্য ও তত্ত্ব, তাঁদের অধ্যাত্মচিন্তা, তাঁদের লব্ধজ্ঞান ও তাঁদের অর্জিত ধারণা তাঁদের কল্পনার ও জীবন ভাবনার প্রসূন মাত্র। সাধারণ সত্য কিংবা বাস্তব তথ্যের সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক পরোক্ষ কিংবা অনির্ণীত। প্রশ্ন ও উত্তরের নমুনা :

প্রশ্ন : তবে পুছে কথা হতে স্বর্গ নরক সৃজন?
উত্তর : আল্লার গজব দৃষ্টে দোজখ হইছে।
কোহ্তুবের দৃষ্টে ভেহেস্ত নির্মিছে ॥

সওয়াল সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'মধ্যযুগের এই গ্রন্থের লেখকরা লোকশিক্ষকের ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। এ দৃষ্টিতে এঁদের সওয়াল সাহিত্যকে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' নামে চিহ্নিত করা অসঙ্গত নয়। সেকালে কথকতার মাধ্যমে অথবা শ্রুতিস্মৃতির মাধ্যমেই নিরক্ষর মানুষ জগৎ ও জীবন, ধর্ম ও সমাজ, নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করত। আর এভাবে লব্ধ জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে মানুষ পারিবারিক, সামাজিক, বৈষয়িক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে হত যত্নবান। সেদিক দিয়ে এ সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিমেয়। কেননা, এতে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ না ঘটলেও সমাজশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়েছিল, একটি স্থূল নীতিবোধ ও ধর্মচেতনা মানুষের পতনপথ রুদ্ধ রেখেছিল।'

সওয়াল সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকজন কবির কথা উল্লেখ করা হল।

মুহম্মদ আকিল

প্রাচীনতম মুসলিম কবিগণের মধ্যে মুহম্মদ আকিল অন্যতম। 'মুসানামা' তাঁর কাব্যের নাম। সতের শতকের প্রথমার্ধ কবির কাল বলে অনুমান করা হয়। হযরত মুসা তুর পর্বতে বসে আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করে জগৎ ও জীবনের নানা তত্ত্ব জেনে নিতেন। এই বিশ্বাসই কাব্যটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রশ্নোত্তরের নমুনা :

যেখানে না ছিল পূর্বে স্বরূপ আকার।
কোহ্ রূপে কথাএ আছিলা করতার।
যেখানে না ছিল কিছু দুনিয়া পত্তন
কথাএ আছিলা প্রভু কহ নিরঞ্জন।

উত্তরে আল্লাহ্ বলেন :

যেখানে আছিলাম পূর্বে জান ব্রহ্ম কায়
অখনেহ আছি তথা জান সর্বথাএ।

সর্বঘটে আছি আমি ভাবি চাহ মন
বাহিরে ভিতরে আক্ষি আছি সর্বক্ষণ।
আঠার হাজার আলম হইব নিধন
কদাচিৎ না টলিব মোর সিংহাসন।

কাব্যটিতে কবি গুণ-জ্ঞান ও পাপপুণ্য সম্পর্কে বর্ণনা দান করেছেন। নারীর মাহাত্ম্য সম্পর্কেও কবির বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে :

শরীরের অর্ধ অঙ্গ ঘরের রমণী।
দুই হস্তে দুনিয়াতে ভাবের ভাবিনী ॥
নারী না থাকিলে পুরুষ কিছু না হএ।
নারী পুরুষ এক জানিঅ নিশ্চিএ ॥

শেখ সাদী

কবি শেখ সাদী ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৭১৫ সালে 'গদা-মল্লিকা' কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি উপাখ্যান হলেও এতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে নানারকম তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে। কাব্যের গল্পটি এরূপ :

রুম-রাজকুমারী মল্লিকা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তার এক হাজার প্রশ্নের উত্তর যে দিতে পারবে তাকেই সে পতিত্বে বরণ করবে। তাকে বিয়ে করার লোভে অনেক রাজকুমার এল, কিন্তু কেউই তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। রাজকুমারী তাদের বন্দী করে রাখল। অবশেষে তুরস্ক দেশ থেকে আবদুল হালীম নামে একজন 'গদা' বা দরবেশ এসে সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং রাজকুমারী মল্লিকাকে বিয়ে করে বহুদিন রুম-রাজসিংহাসনে বসে সুখে রাজ্য শাসন করলেন।

এই কাব্যে রাজকুমারী ভাবী বরের বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন করেছিল। রোমান্সের মোড়কে এখানে ধর্মকথা বর্ণিত হয়েছে। কলি যুগের লক্ষণ সম্পর্কে মল্লিকার প্রশ্নের উত্তরে গদা বলেন :

লোকে মিছাকথা কইব দিনে চারিশত বার
বে-ঈমান হৈব লোক সংসার মাঝার।
অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন
চোর উজ্জ্বল রৈব সাধু হৈব মলিন।

এতিম আলম

কবি এতিম আলমের কাব্যের নাম 'আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল।' কাব্যের পটভূমি হল : নবুয়ত প্রাপ্তির পর খবদেশের ইহুদি রাজা আবদুল্লাহকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য হযরত মুহম্মদ (স) এক পত্র লেখেন। পত্র পেয়ে হযরতের নবুয়তের সত্যতা যাচাই করার জন্য আবদুল্লাহ প্রজা ও সৈন্যসহ মদিনায় আসেন এবং হযরতকে এক হাজার

প্রশ্ন করেন এবং তার জবাব পেয়ে আবদুল্লাহ সপ্রজা ইসলাম গ্রহণ করেন। গ্রন্থটি আরবি ফারসি কাহিনির পল্লবিত বাংলা রূপান্তর। কবির রচনার নমুনা :

প্রশ্ন : চন্দ্র সূর্য আছে কোন আকাশ উপর।
উত্তর : চতুর্থ আকাশ পরে আছে দিবাকর ॥
প্রথম আকাশে চন্দ্র থাকএ নিশ্চিত।

আলি রজা

কবি আলি রজার কাব্যের নাম 'সিরাজকুলব'। সতের শতকের কবি আলি রজা কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। পদাবলি, আগম-জ্ঞানসাগর, ধ্যানমালা এসব তাঁর কাব্য। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার ওশখাইন গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। আলি রজা ছিলেন গৃহী দরবেশ। পীরালি ছিল তাঁর পেশা। তিনি সাধক, তাত্ত্বিক, কবি ও পীর হিসেবে স্বদেশ ও স্বকালে প্রখ্যাত ছিলেন। এক ইহুদির প্রশ্নের উত্তরে রসুল একুশটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন বলে এ কাব্যে বলা হয়েছে। গ্রন্থের উৎপত্তি সম্পর্কে কবি বলেন :

সিরাজ কুলব নামে আছিল কেতাব
উত্তম মসলা তাতে শুদ্ধ পরস্তাব।
গুরু মুখে এসব যে হাদিস পাইলুঁ
সভানে বুঝিতে ভাল বাঙ্গালা করিলুঁ।

কাব্যটির মধ্যে প্রথম সওয়ালে প্রেমতত্ত্ব (অধ্যাত্মপ্রেম) এবং পরে বিভিন্ন সওয়ালে নামাজ, সৃষ্টি, স্বর্গ, ফিরিস্তা, নবী, ইমাম ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়েছে। ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'শাস্ত্রীয় মনের, মতের ও শাস্ত্রশাসিত সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনধারায় ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে এসব রচনার গুরুত্ব কম নয়।'

শেখ সেরবাজ চৌধুরী

সেরবাজ সতের শতকের শেষার্ধের কবি বলে অনুমান করা হয়। কবির ১. ফক্করনামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল, ২. কাশেমের লড়াই ও ৩. ফাতিমার সুরতনামা—এই তিনটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। কবি তাঁর কাব্যের ফারসি উৎস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

ফক্করনামা করি এক আছএ কিতাব
কহিমু যথেক কথা আছে পরস্তাব।
সকলে না বুঝে দেখি ফারসী বচন
কহিমু বাঙ্গালা ভাষে বুঝিতে কারণ।

কাব্যের বক্তব্য বিষয় এ রকম : ফকির আবদুল্লাহ রাজকন্যা মল্লিকার হাজার প্রশ্নের জবাব দিয়ে রুমরাজ্য ও রাজকন্যাকে লাভ করে। ফকিরের ভাগ্যের এই পরিবর্তন সম্পর্কে কবি লিখেছেন :

যাহার আছিল জান মাটিতে শয়ন।
সেই জন যায় নিদ্রা খাট সিংহাসন ॥
ললাট-লিখন জান না যায় খণ্ডন।
সেই সে আবদুল্লা হৈল রুমের রাজন ॥

সওয়াল সাহিত্যের ধারায় আঠার শতকের পীর কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন রচনা করেছিলেন 'মুসার সওয়াল' নামে একটি ক্ষুদ্রকায় তত্ত্বগ্রন্থ। এ পর্যায়ে আবদুল করিম খোন্দকার, নসরুল্লাহ খোন্দকার, মুহম্মদ আলী প্রমুখের নামও উল্লেখযোগ্য।

কবি আবদুল করিম খোন্দকার আঠার শতকে দুল্লামজলিস, তমিম আনসারী, নুরফরামিস নামা ও হাজার মাসায়েল কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার জঙ্গনামা, শরীয়তনামা ও মুসার সওয়াল কাব্যের রচয়িতা। কাব্য রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি লিখেছেন :

মুসার সওয়াল এক কিতাব প্রধান ॥
বাঙ্গালা না বুঝে এই ফারসী কিতাব।
না বুঝি ফারসী ভাষে পাএ মনস্তাপ ॥
তেকারণে ফারসী করিলুঁ হিন্দুয়ানি।
বুঝিবারে বাঙ্গালে সে কিতাব বাণী ॥
আপনে বুঝন্ত যদি বাঙ্গালের গণ।
ইচ্ছাসুখে কেহ পাপে না দেয়ন্ত মন ॥

ঘ. চরিতকথা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণ এক ধরনের চরিতকথা রচনা করেছেন। এগুলো জীবনী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ড. আহমদ শরীফের মতে, 'চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের চরিতকথাগুলো যেমন একাধারে জীবনী, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও রূপকথাজাতীয় কাহিনিকাব্য এগুলোও তেমনি গ্রন্থ। নবীবংশ, রসুলবিজয়, জঙ্গনামা, মক্তুল হোসেন, হানিফার লড়াই, কাসাসুল আম্বিয়া, হাতেম তাই, আমির হামজা প্রভৃতি গ্রন্থকে আমরা সাধারণভাবে জীবনী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি।' মুসলমান কবি রচিত এমন চরিতকথার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্যের সঞ্চার হয়েছে, সেই সঙ্গে এসব কাব্য ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রসারে সহায়তা করেছে। তবে এতে অতিপ্রাকৃত ও অতিমানবীয় কাহিনি স্থান পেয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অভাব ও জীবনকথা রূপায়ণে এদেশীয় আদর্শের প্রভাব এগুলোতে লক্ষ করা যায়। 'অনার্য বাঙালির প্রাচীন সংস্কার, স্থানীয় পরিবেশিক প্রভাব, ইসলামি আদর্শের ও ঐতিহ্যবোধের অভাব এবং পরস্পর প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের উদার মনোভাব আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট করার বাসনা প্রভৃতি এসব বিচিত্র সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে।'

সৈয়দ সুলতান

বাংলার প্রাচীনতম কবিগণের মধ্যে সৈয়দ সুলতানের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চট্টগ্রামের চক্রশালার অধিবাসী ছিলেন। ড. মুহম্মদ এনামুল হক কবির কাল ১৫৫০ থেকে ১৬৪৮ সাল নির্দেশ করেছেন। কবি তাঁর আত্মবিবরণীতে বলেছেন :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
আল্লার মহিমা জান কহিতে অসীম ॥
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরাকার।
আদ্যেত আছিল যাহা করিমু প্রচার ॥
দ্বিতীয়ে প্রণাম করি রছুল খোদার।
নূর মুহম্মদ বলি জগতে প্রচার ॥
তৃতীয়ে প্রণাম করি আছবা সবারে।
চতুর্থে প্রণাম করি পীর পেগাম্বরে ॥
এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুয়ায়।
প্রকাশ্যে সকল কথা মনে নাহি লয় ॥
লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারতকথা কহিল বিচারি ॥
হিন্দু মুসলমান তাএ ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রছুলের কথা কেহ ন সোঙরে ॥
গ্রহ শত রস যোগে অব্দ গোঙ্গাইল।
দেশী ভাষে এহি কথা কেহ ন কহিল ॥
আরবি ফার্ছি ভাষে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে ন বুঝে মূর্খসুত ॥
দুকখ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
রছুলের কথা যথ কহিমু অধিক ॥
লস্করের পুর খানি আলিম বসতি।
মুঞি মূর্খ আছি এক ছৈয়দ সন্ততি ॥
আলিমান পদে আক্ষি মাগি পরিহার।
খেমিবা পাইলে দোষ ন করি গোহার ॥
ছৈয়দ ছুলতানে কহে কেনে ভাবি মর।
সহায় রছুল যার তরিবে সাগর ॥

সৈয়দ সুলতান যেসব কাব্য রচনা করেছিলেন সেগুলো হল :

১. নবী বংশ, ২. শব-ই-মিরাজ, ৩. রসুলবিজয়, ৪. ওফাৎ-ই-রসুল। ৫. জয়কুম রাজার লড়াই, ৬. ইবলিসনামা, ৭. জ্ঞানচৌতিশা, ৮. জ্ঞানপ্রদীপ, ৯. মারফতী গান, ১০. পদাবলী।

কবি সৈয়দ সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল সৃষ্টিপত্তন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামি ধারায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিকথা রচনা করা। এই পরিকল্পনা অনুসারে কবি আদি থেকে ওফাত-ই-রসুল পর্যন্ত সব কিছুর বর্ণনা দিয়ে লেখা শেষ করেন।

নবীবংশ রচনায় কবি পূর্বে রচিত আরবি-ফারসি নবীকাহিনিকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করে স্বাধীনভাবে কাব্যরূপ দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে জীবনচিত্র রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশের পটভূমিকায়। তিনিই সাহস করে প্রথম নবী-রসুলের ইতিবৃত্ত ও ইসলামের মর্মকথা বাংলা ভাষায় প্রচারের উদ্যোগ নেন। একে তিনি আল্লাহ-রসুল ও মুসলিম সমাজের প্রতি আলিম ও পীরের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছিলেন। কবি লিখেছেন :

আল্লাহ বুলিব তোরা আলিম আছিলা।
মনুষ্যে করিতে পাপ নিষেধ না কৈলা।

কবি কাব্যের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকাহিনি প্রচারের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু থেকে ধারণা করা যায়। কাব্যের ক্রমানুসারে তা এরূপ :

১. নবীবংশ কাব্যে সৃষ্টির পত্তন থেকে হযরত মুহম্মদ (স)-এর নবুয়ত পর্যন্ত ঘটনা।

২. শব-ই-মিরাজ কাব্যে হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পর বিশেষ উল্লেখযোগ্য মিরাজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতালাভের ঘটনা।

৩. রসুলবিজয় কাব্যে মিরাজের পর হযরতের ইসলাম প্রচারের কাহিনি।

৪. ওফাৎ-ই-রছুল কাব্যে ধর্মপ্রচারের পরবর্তী হযরতের তিরোভাব থেকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনা।

কবির ইচ্ছা ছিল এর পরে চার আসহাবের কাহিনি, মুহররমের ঘটনা ও কিয়ামত—এই তিন বিষয়ে তিনটি কাব্য রচনা করা। কিন্তু বার্ধক্যবশত তা বাস্তবায়িত করতে পারেন নি। কবির এই অসমাপ্ত কাজ সমাধা করার জন্য তাঁর শিষ্য কবি মুহম্মদ খানকে আদেশ দিয়েছিলেন।

সৈয়দ সুলতানের শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম কাব্য 'নবীবংশ'। নবীবংশ আসলে নবীকাহিনি। নবীবংশ নামে কবি নবী পরম্পরা নির্দেশ করেছেন। কাব্য রচনায় কবির আদর্শ ছিল আরবি ফারসি নবীকাহিনি। কবি ইসলামি তৌহিদবাদ বা নিরাকার আল্লাহ্‌র নিছক একত্ববাদ প্রচারের জন্য এদেশের অবতারবাদকে কাব্যে ব্যবহার করেছেন। কাব্যটি ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল। কাব্য রচনায় কবির সাফল্য সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, 'কবি সৈয়দ সুলতান যে বিষয় লইয়া নবীবংশ রচনা করিয়াছেন তাহা মোটামুটি কবিত্ব প্রদর্শনের পরিপন্থী। ইহা ধর্মীয় কাহিনি, সুতরাং কবির পক্ষে কল্পনার বিলাস ও কবিত্ব দেখাইবার সুযোগ কোথায়? এতদ্‌সত্ত্বেও ভাবের ঔদার্যে, কল্পনার বিলাসে, সৌন্দর্যবোধের চমৎকারিত্বে তাঁহার ভাষা কাব্যখানির সর্বত্র যেরূপ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতিতে নানা ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উৎসারিত হইয়াছে, তাহার তুলনা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একরূপ বিরল।'

শব-ই-মিরাজ কাব্যটিও আকারে সুবিশাল। হযরতের মিরাজের ঘটনা এতে বর্ণিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ভাবে বিচিত্র বিষয় এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'রসুলবিজয়' কাব্যটিও আকারে বেশ বড়। এতে হযরতের ধর্মপ্রচার ও যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। হযরতের মাহাত্ম্য প্রচার করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য।

ইসলামি চরিতকথার ধারায় কবি জনাব আলী 'কিসসাসুল আম্বিয়া' কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যে তেতাল্লিশ জন ওলি দরবেশ ও ইমাম প্রভৃতি শাস্ত্রবিদের জীবন কথা ও কীর্তিকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই পর্যায়ে অন্যান্য কবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুহম্মদ খাতের, শেখ চান্দ, শেখ মনোহর, মুহম্মদ উজির আলী, আবদুল করিম খোন্দকার, নূরুল্লাহ প্রমুখ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। সওয়াল সাহিত্যের পরিচয় দাও।

২। টীকা লিখ : রসুলবিজয়, নবীবংশ, সৈয়দ সুলতান।

সপ্তদশ অধ্যায়
লোকসাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট অংশ লোকসাহিত্য। বৈচিত্র্যে ব্যাপকতায় এবং জীবনের সঙ্গে একাত্মতায় উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে তা যুগ যুগ ধরে সমাদৃত। সুপ্রাচীন কাল থেকে লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টি লোকমুখে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং পুরাতন সৃষ্টি হয়েও আধুনিক মানবসমাজে সমাদৃত হচ্ছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত লোক-সাহিত্যের নিদর্শনগুলো মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে থাকলেও বর্তমানে এদের অনেকগুলো সংগৃহীত হয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে; বিভিন্ন উদ্যোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সে সবের সংগ্রহকাজ চলছে। এ ধরনের সংগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে লোকসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। লোকসাহিত্যের সংগ্রহের ফলে তা দেশের সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছে এবং তার যথার্থ মূল্যায়নেও তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। এতে দেশের লোকসাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সাহিত্যের ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি সম্পর্কেও ধারণা স্পষ্ট হচ্ছে।

লোকসাহিত্যের নাম ও সংজ্ঞা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। ইংরেজিতে Folk-lore কথাটা যে ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয়েছে, বাংলায় তা লোকসাহিত্য বললে তাতে পূর্ণাঙ্গ ভাবের যথার্থ প্রকাশ ঘটে না। Folk-lore কথাটার অনুবাদ বা প্রতিশব্দ হিসেবে লোকসাহিত্য কথাটাকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা না করে বিভিন্ন পণ্ডিত লোকবিজ্ঞান, লোকশ্রুতি, লোকলোর ইত্যাদি বৈচিত্র্যপূর্ণ নামে চিহ্নিত করায় প্রয়াস পেয়েছেন। তবে সুনির্দিষ্ট অর্থবহ নামের ব্যাপারে গবেষকগণের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও সাধারণভাবে লোকসাহিত্য কথাটাই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

লোকসাহিত্য বলতে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথা কাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি বোঝানো হয়। সাধারণত কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠির অলিখিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতির যে সকল সাহিত্য গুণসম্পন্ন সৃষ্টি প্রধানত মৌখিক ধারা অনুসরণ করে অগ্রসর হয় তাকে লোকসাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সাহিত্য সৃষ্টি করার যে প্রবণতা চিরন্তন ভাবে মানবমনে বিদ্যমান থাকে তা-ই লোকসাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের সাহিত্যের সৃষ্টি হয় মানুষের মুখে মুখে এবং পরে তা মুখে মুখেই প্রচলিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে, পূর্ববর্তী কালে অশিক্ষিত সমাজের লোক দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্য লিখে রাখার কোন সুষ্ঠু পন্থার উদ্ভাবন করা সহজ হয় নি বলে তা স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করেই প্রচারিত হয়। আর স্মৃতিনির্ভর ছিল বলেই লোকসাহিত্য কালপরম্পরায় পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং কাল ও অঞ্চলভেদে তার রূপেরও বিভিন্নতা লক্ষযোগ্য ছিল। ভূদেব চৌধুরীর মতে, 'লোক-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য চেতনার বিমিশ্রতায়। অভিজাত চেতনার তুলনায় সুকর্ষিত তত্ত্ববুদ্ধি, অথবা সচেতন-জ্ঞান-প্রকর্ষ লোকমানসে প্রায় অনুপস্থিত। দেহমনের অপেক্ষাকৃত

সহজাত বৃত্তিসমূহের ওপরেই লোকচিত্তের প্রধান নির্ভর। তাই বাংলা লোকসাহিত্য প্রায় সকল পর্যায়েই সহজিয়া পন্থানুসারী।'

আধুনিক কালে মুখে মুখে প্রচলিত লোকসাহিত্য লিখে রাখার চেষ্টা চলছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লোকসাহিত্যকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সে সব লিখে রাখার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির লোকসাহিত্য বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং তার সাহিত্যরস লোকসাহিত্য-রসিকদের মধ্যে পরিবেশিত হচ্ছে। বর্তমানে লোকসাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গরূপে বিবেচনা করে এর বহুমুখী চর্চা চলছে। তাই এখন লোকসাহিত্য আর অজ্ঞতা-অন্ধকারে নিমজ্জিত গ্রাম্য মানুষের অমার্জিত সাহিত্যসৃষ্টি নয়, বিশ্বের জ্ঞানীগুণী রসিকজনের কাছে তা অকৃত্রিম সাহিত্য হিসেবে সমাদৃত। কোন কোন দেশের সংগৃহীত সমৃদ্ধ লোকসাহিত্যের নিদর্শন জাতীয় গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

লোকসাহিত্য সাধারণত কোন ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নয়, তা সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। সংহত সমাজ বলতে সে সমাজকে বোঝায় যার অন্তর্ভুক্ত মানবগোষ্ঠী পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভেতর দিয়ে চিরাচরিত প্রথার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে চলে। লোকসাহিত্যের সমাজ বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণে সমৃদ্ধ হয়ে সাহিত্যসৃষ্টির সহায়ক হয়। সমষ্টির সৃষ্টি বলে লোকসাহিত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের নামের সঙ্গে জড়িত থাকে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের বিক্ষিপ্ত রচনা কালক্রমে একত্রিত হয়ে একটা বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ পরিগ্রহ করে। সমাজবদ্ধ জীবনে মানুষের ব্যক্তি পরিচয় বড় হয়ে ওঠে না বলে লোকসাহিত্য রচয়িতা হিসেবে কোন বিশেষ কবি বা গীতিরচয়িতাকে বিবেচনা না করে সমাজকেই রচয়িতা মনে করতে হয়। প্রথমত তা ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি থাকলেও জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে তা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে এবং পরিণামে সামগ্রিক সৃষ্টি হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'ব্যক্তি বিশেষের মনে যে ভাবটির উদয় হয়, তাহার প্রকাশ অপরিণত ও অপরিস্ফুট থাকিবারই কথা, ইহা দশজনের হাতে পড়িয়াই প্রকৃত সাহিত্যের রূপ লাভ করিয়া থাকে। অতএব ব্যক্তির মনে যে সকল অপরিণত ভাবের উদয় হয়, তাহাই সমষ্টি লোকসাহিত্যের রূপে সমাজকে পরিবেশন করে। অতএব লোকসাহিত্যের বহিরঙ্গগত পরিচয়ের জন্য সমষ্টির দান স্বীকার করিয়া লইলেও, ইহার অন্তর্নিহিত ভাবমূলে যে ব্যষ্টির প্রেরণাই কার্যকরী হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব লোকসাহিত্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমবেত সৃষ্টি; ব্যষ্টির মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার অসম্পূর্ণ রূপায়ণকেই সমষ্টি নিজের আদর্শে সম্পূর্ণ করিয়া লয়।' লোকসাহিত্যের কোন বিষয় ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা রচিত হওয়ার পর তা সমষ্টিগতভাবে পুনরায় রচিত হয়।

লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু সমাজের পরিবেশ থেকে গৃহীত হয়। জনশ্রুতিমূলক বিষয় এর উপাদান। বহুদিন পূর্বের কোন ঘটনা বা কাহিনি লোকপরম্পরায় কল্পনা-রূপক মিশ্রিত হয়ে লোকসাহিত্যে স্থান পায়। সাধারণত সমসাময়িক জীবন তাতে তেমন প্রতিফলিত হয় না। চিরন্তন বিষয়বস্তুই সাহিত্যের উপজীব্য হয় বলে লোকসাহিত্যেও

এর নিদর্শন বিদ্যমান। বহুকাল পূর্বের মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ- বেদনার রসমণ্ডিত পরিচয় লোকসাহিত্যে বিধৃত। অতীতের ইতিহাস ও সমাজচিত্র এই সাহিত্যে রূপায়িত হয়ে ওঠে। মানব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা কোন কাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি আশ্রয় করে মৌলিক আকৃতি ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত হয়ে থাকে। লোকসাহিত্য প্রাচীন জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত হলেও এতে আধুনিক চিন্তাধারার সংযোগ ঘটে। তাই লোকসাহিত্য প্রাচীন হয়েও নতুন, প্রাচীনের সঙ্গে নতুনের যোগসেতু রচনা করতে লোকসাহিত্যই একমাত্র উপায়। এর মধ্যে প্রাণশক্তি আছে বলেই তা অতীতের ভেতর দিয়ে এসে বর্তমানে পৌঁছেছে।

বাংলার লোকসাহিত্যে বাঙালি জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। বর্তমান নাগরিক জীবন থেকে বহু দূরে সেই অতীত কালের সমাজের চিন্তাভাবনা লোকসাহিত্যে স্থান পেয়ে বিচিত্র পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক যুগে এসে উপনীত হয়েছে। এই সঙ্গে অতীত জীবনের রূপটিও বহন করে নিয়ে এসেছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসাহিত্যের পরিবর্তন ঘটলেও অতীতের চিত্র তা থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি। বাঙালির মনে বিচিত্র পরিচয় তার লোকসাহিত্যে লক্ষণীয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ধ্যান-ধারণা নিয়েই এই সাহিত্য রচিত হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়ও লোকসাহিত্য থেকে লাভ করা যায়। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান গাথা-কাহিনি, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদির মধ্যে সহজেই এর নিদর্শন পাওয়া যাবে। ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যবান মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : 'অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোন পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।'

বাংলার লোকসাহিত্যের বিকাশের পশ্চাতে দেশের বিভিন্ন উপজাতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির আগমন ঘটার ফলে তাদের সাংস্কৃতিক উপকরণ এ দেশের জলবায়ুর সঙ্গে মিশেছে এবং তা এখানকার লোকসাহিত্যের বিকাশে সহায়তা করেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকসাহিত্যের নিদর্শনের উৎপত্তি হলেও বাংলা ভাষা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য লোকসাহিত্যেরও মূলগত সামঞ্জস্য দেখা যায়। বিভিন্ন কালে নানা দিক থেকে আগত বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ পল্লীগ্রামের একই প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে যে সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে তাতে যথেষ্ট ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের ওপর লোকসাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। চর্যাপদ থেকে সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যসৃষ্টিতে লোকসাহিত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য লিখিত রূপে থাকলেও তা লোকসাহিত্যের মত মুখে মুখে গীত হত; পরিণামে তাতে নানা ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাংলা লোকসাহিত্যের উৎপত্তি বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তির সমসাময়িক কাল থেকেই। লোকসাহিত্য মুখে মুখে প্রচারিত থাকে বলে তাতে প্রাচীনত্বের নিদর্শন থাকে না। তবে এগুলো অতি প্রাচীন কালের সৃষ্টি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লোকসাহিত্যের কিছু নিদর্শন বৌদ্ধযুগের সৃষ্টি

হিসেবে বিবেচনা করেছেন। দীর্ঘদিনের এই ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের ওপর লোকসাহিত্যের প্রভাব থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিশেষত মধ্যযুগের বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে লোকসাহিত্যের সংযোগ খুবই প্রত্যক্ষ। সে আমলের কবিরা লোকজীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তাঁদের ধার করা কাহিনির সঙ্গে তা সংযুক্ত করেছেন। মধ্যযুগের লৌকিক কাহিনিকাব্যে, প্রণয়োপাখ্যানে, অনুবাদ সাহিত্যে লোকসাহিত্যের উপাদান ছড়িয়ে আছে। মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলা রূপায়ণে পৌরাণিক আদর্শের চেয়ে লোকজীবনে প্রচলিত অপৌরাণিক আদর্শকেই বেশি অনুসরণ করেছিলেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে লোকসাহিত্য মানবিক গুণ সমৃদ্ধ এক অনন্য সৃষ্টি। দীর্ঘদিন ধরে লোকসাহিত্যের উদ্ভব ও প্রচলন থাকার ফলে তা থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে বিভিন্ন কাব্য রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত লোকসাহিত্য বিষয়-বৈচিত্র্যে এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, 'লোকসাহিত্যের মৌখিক ধারার উপর ভিত্তি করিয়াই মঙ্গলকাব্যের লিখিত ধারার সৃষ্টি হয়েছে। লোকসাহিত্যের যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত ব্রতকথা হইলেও লোককথার বিভিন্ন উপাদানও আসিয়া কালক্রমে ইহাতে সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে।' মঙ্গলকাব্য-গুলোতে দেবদেবীর জন্মবৃত্তান্ত লোকসাহিত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুনর্জীবন লাভ লোকসাহিত্যের বিষয়, মঙ্গলকাব্যে তার নিদর্শন রয়েছে। সতী নারীর অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়া লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, মঙ্গলকাব্যে বিশেষত মনসামঙ্গলের বেহুলার চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। লোকসাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ ব্রতকথায় দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনের মত মঙ্গলকাব্যেও দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম প্রভাব-মুক্ত লোকসাহিত্যের প্রভাব পড়েছে ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে রচিত সাহিত্যে।

অনুবাদ সাহিত্যের ওপরও লোকসাহিত্যের প্রভাব আছে। মধ্যযুগের অনুবাদক কবিরা প্রাচীন মহাকাব্য বা পুরাণের আক্ষরিক অনুবাদের দিকে মনোযোগী ছিলেন না, তাঁরা ভাবানুবাদ করতে গিয়ে লোকসাহিত্যের উপকরণ কাব্যে স্থান দিয়েছেন। কৃত্তিবাস সংস্কৃত রামায়ণ থেকে যেভাবে বিচ্যুত হয়েছেন তাতে মনে করা হয় যে কথক ও গায়কদের মুখ থেকে তিনি রামায়ণ শুনেছিলেন। ভাগবতের অনুবাদে দানলীলার মত যে সব অপৌরাণিক কাহিনি আছে তা লোকজীবন থেকে গৃহীত বলে মনে করা হয়ে থাকে।

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্যগুলো সংস্কৃত-হিন্দি-ফারসি কাব্য থেকে অনূদিত। এ সবের অনুবাদেও কবিরা আক্ষরিক অনুবাদের আদর্শ অনুসরণ না করে ভাবানুবাদের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন এবং লোকজীবনে প্রচলিত কাহিনি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, বত্রিশ সিংহাসন ইত্যাদি রচনা প্রধানত লৌকিক কথাকাহিনির উন্নততর কাব্যরূপ। হিন্দি-ফারসি কাব্যের ভিত্তিও অনেক ক্ষেত্রে জনসমাজে প্রচলিত কাহিনি। তবে মধ্যযুগের কবিরা এ সব কাব্য বাংলায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে লোকসাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তা নবরূপে রূপায়িত করেছেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্য আদর্শে প্রভাবিত এবং লোকজীবনের সঙ্গে এর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ নয়। কিন্তু একালের কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টিতে

লোকসাহিত্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের জনজীবনে লোক-সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাবের প্রেক্ষিতে এখানকার সামগ্রিক সাহিত্যে লোকসাহিত্য পরিমণ্ডল থেকে উপাদান সংগ্রহ করার প্রবণতা বিদ্যমান। লোকসাহিত্যের কাহিনি নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির বেশ কিছু নিদর্শন বাংলাদেশের সাহিত্যে লক্ষ করা যায়।

লোকসাহিত্যের শ্রেণিবিভাগ করলে লক্ষ করা যাবে যে, এর বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের প্রেক্ষিতে নানা ধরনের শ্রেণিবিভাগ হতে পারে। লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ নিদর্শন বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় শ্রেণিবিভক্ত। সেগুলো হচ্ছে—ছড়া, গান, গীতিকা, কথা, ধাঁধাঁ, প্রবাদ ইত্যাদি।

ছড়া

লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া। ছড়াগুলো বিশেষ কোন ব্যক্তির সৃষ্টি বলে মনে করা যায় না, এর সৃষ্টির পিছনে সমষ্টিমনের প্রভাব কার্যকর। ভাবের দিক থেকে তেমন কোন পরিণতি ছড়ায় থাকে না, ভাবের অস্পষ্ট আভাস ও দুর্লক্ষ্য ইঙ্গিত তাতে বিদ্যমান। ছড়াগুলোতে রসের প্রাধান্য পায়, ছন্দঝঙ্কারে মন বিমুগ্ধ হয়—বুদ্ধি দিয়ে তাকে বিচার করার প্রয়োজন পড়ে না। ছড়ার সুনির্দিষ্ট কোন রচনাকাল নেই এবং রচয়িতারও কোন পরিচয় মিলে না। চিরপুরাতন হয়েও ছড়াগুলো চিরনতুনের মর্যাদা পায়। ছড়া পরিবর্তনশীল, এরা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত নয়—নিছক আনন্দ সঞ্চারের দিকেই ছড়ার লক্ষ্য। লঘুভার, অর্থহীন, সংক্ষিপ্ত ও বিচিত্র বলে ছড়া সহজেই শিশুমনকে আকৃষ্ট করে।

রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে ছড়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহিরে, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভাল করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনা-বৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যবশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশুমনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।'

ছড়ার বিষয়বস্তু অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। শিশু-জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অবলম্বনে ছড়া, যেমন ছেলেভুলানো ছড়া, খেলাধুলার ছড়া, নানা ধরনের মেয়েলি ছড়া, বিবাহ, প্রকৃতি, ব্যবহারিক জীবন, উৎসব, নীতি, কৃষি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়াবলম্বনে অজস্র ছড়া রচিত হয়েছে।

একই শ্রেণির ছড়ার মধ্যেও নানারকম পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে আছে ঘুমপাড়ানি ছড়া—যার আবৃত্তিকার মা। কিন্তু শিশুরা নিজে আবৃত্তি করে এমন অনেক ছড়া আছে। যেমন—'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে'। খেলাধুলার

ছড়ার মধ্যেও ভিন্নতা আছে। ঘরোয়া খেলায় ও বাইরের খেলায় ব্যবহৃত ছড়ায় পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্য আছে ছেলে ও মেয়েদের খেলার ছড়ায়। নৈসর্গিক ছড়ার মধ্যে খনার বচন জাতীয় ছড়া উল্লেখযোগ্য। কিছু ঐন্দ্রজালিক ছড়াও প্রচলিত আছে। যেমন— সাপের মন্ত্র, বাঘবন্দীর ছড়া, হিরালীর ছড়া, বৃষ্টির ছড়া ইত্যাদি। একই ছড়ায় ভাব ও চিত্রগত বিভিন্নতা দেখা যায়। ছড়ার পদগুলো পরস্পর সুদৃঢ় ভাবে সংবদ্ধ থাকে না। তবে তাতে রসগত অখণ্ডতা অব্যাহত থাকে।

অঞ্চলভেদে একই ছড়ার পাঠে রূপান্তর ঘটে। কিন্তু তার আবেদন থাকে চিরন্তন। ছড়ার একটি নমুনা :

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি যেয়ো,
বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
শান-বাঁধানো ঘাট দেব বেসম মেখে নেয়ো
শীতল পাটি পেতে দেব শুয়ে ঘুম যেয়ো।
আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাবে
চার চার বেহারা দেব কাঁধে করে নেবে।
দুই দুই বাঁদী দেব পায়ে তেল দেবে
উড়কি ধানের মুড়কি দেব বিন্নি ধানের খই
গাছপাকা কলা দেব হাঁড়ি ভরা দই।

ছড়ার ছন্দ বাংলা কবিতার প্রাচীনতম ছন্দ। ছড়ার ছন্দ স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ। পর্বের আদি স্বরে শ্বাসাঘাত পড়ে বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে। একে লৌকিক ছন্দও বলা হয়। আধুনিক কালে এই ছন্দ ছড়ার বিষয়বস্তুর পরিধি ছাড়িয়ে নানা বিষয়ের বাহন হয়ে উঠেছে।

গান বা লোকগীতি

বাংলা লোকসাহিত্যে গান বা গীতি বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে এবং এর বৈচিত্র্যও অত্যধিক। লোকগীতি এক একটি বিষয় অবলম্বনে গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে কোন অজানা লোককবিকর্তৃক রচিত এবং তা লোকসমাজে মুখে মুখে গীত হয়ে চলে এসেছে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে লোকগীতি অপরাপর লোকসাহিত্যের নিদর্শনের চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত।

লোকগীতিতে কোন কাহিনি থাকে না। বিশেষ বিশেষ ভাব অবলম্বনে এই শ্রেণির গান রচিত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলো অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যা গীতির অন্তর্ভুক্ত হয় নি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানবজীবনের প্রতিটি অবস্থাই লোকগীতির মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। গান গাওয়ার প্রণালী বিচার করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকগীতিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করেছেন : ক. যে গীতির তাল আছে এবং যা কোন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত তাকে সক্রিয় সঙ্গীত, আর খ. যে গীতির তাল নেই এবং যা অলস অবসরে গীত হয় তাকে ভাটিয়ালি বলা যায়। কিন্তু বিষয় ও বিস্তারের দিক থেকে লোকগীতি আরও বৈচিত্র্যধর্মী।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী লোকগীতিকে নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণিবিভক্ত করেছেন : ১. আঞ্চলিক গীতি—যা অঞ্চলবিশেষে বিশেষভাবে প্রচলিত, ২. ব্যবহারিক—বিবাহ উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে যা গীত হয়, ৩. হাসির গান—হাসির বিষয় নিয়ে গীত হয়, ৪. কর্মসঙ্গীত এবং শ্রমসঙ্গীত—যা নানা কাজ অর্থাৎ কৃষিকর্ম, নৌকাবাইচ, ছাদ পিটানো ইত্যাদিতে গাওয়া হয়, ৫. প্রেমসঙ্গীত—বিরহিণী নারী ও বিরহী পুরুষের নানা হৃদয়বেদনা ও চিরন্তন প্রেম সম্ভাষণ যাতে প্রকাশিত হয়, ৬. বারমাসী—অপেক্ষাকৃত লম্বা গানে বিরহিণী নারীর বার মাসের বিরহবেদনা যেসব গানে প্রকাশিত হয়।

অঞ্চলভেদে লোকগীতির পার্থক্য দেখা যায়। প্রকৃতি, জাতি ও সম্প্রদায়গত বৈচিত্র্যের জন্য কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ ধরনের লোকগীতির প্রসার ঘটেছে। এদের অনেক গীতি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সমগ্র দেশে তার প্রসার ঘটে নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া, ভাদু, ঝুমুর, উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়া, পূর্ববঙ্গের জারি, ঘাটু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিষয়বস্তুর দিক থেকেও লোকগীতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন, পটুয়া-সঙ্গীতের বিষয়বস্তু—কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও মনসামঙ্গল, ভাদুগানের বিষয়—প্রকৃতি বন্দনা, গম্ভীরার বিষয়বস্তু—শিব, ভাওয়াইয়ার বিষয়বস্তু—প্রেম। সারি, ঘাটু প্রভৃতির বিষয়বস্তুও—রাধাকৃষ্ণপ্রেম।

সিরাজউদ্দিন কাশিমপুরী 'বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি' গ্রন্থে লোকসঙ্গীতকে ক. সাধারণ ও খ. তত্ত্বসঙ্গীত—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। সাধারণ সঙ্গীতের অন্তর্গত প্রেমসঙ্গীত (—ঘাটু গান, চপযাত্রা, উরি বা হোলি গান, ভাওয়াইয়া গান, বিরহ-ভাটিয়ালি, কৃষ্ণলীলা, ঝুমুর, বারমাসী, পালাগান), জারি সারি, গাজীর গীত, কর্মসঙ্গীত, সন্ন্যাস ও শোকসঙ্গীত, গম্ভীরা, জাগ গান, ধুয়া গান, মেয়েলি গীত, পটুয়া গীত, কবিগান, সাপুড়ে গান, ব্রত বা পূজাপার্বণের গান, গোষ্ঠ যাত্রা, রঙ্গরসের গান ইত্যাদি। তত্ত্বসঙ্গীতের মধ্যে বাউল-মুর্শিদা-মারফতি গানই প্রধান। এক্ষেত্রে হাসন রাজা ও লালন শাহের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। লালন শাহের গানের একটি নমুনা :

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে ॥
আপন ঘরে বোঝাই সোনা।
পরে করে লেনা দেনা ॥
আমি হলেম জন্ম কানা না পাই দেখিতে।
রাজি হলে দরওয়ানি।
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি,
তারে বা কৈ চিনি শুনি বেড়াই কুপথে ॥
এই মানুষে আছে রে মন।
যারে বলে মানুষ রতন ॥
লালন বলে পেয়ে সে ধন পারলাম না চিনতে ॥

শেখ মদন বাউলের একটি আধ্যাত্মিক গান :

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।
(তোমার) ডাক শুনি সাঁই চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মোরশেদে।
ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়াই
তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়
বলতো গুরু কোথায় দাঁড়াই
(তোমার) অভেদ-সাধন মরল ভেদে।
তোর দুয়ারেই নানান তালা
পুরাণ কোরান তসবী মালা।
হায় গুরু এই বিষম জ্বালা
কাইন্দ্যা মদন মরে খেদে ॥

আঞ্চলিক সঙ্গীত হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তবর্তী কতিপয় জেলার চিত্রকর বা পটুয়াদের পটুয়া-সঙ্গীতের কথা উল্লেখযোগ্য। তারা দেবদেবীর চিত্র অঙ্কন করে গান গেয়ে তা বিক্রয় করে। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে এই গীতি প্রচলিত। এ দেশে 'গাজীর পট' নামে এক ধরনের পট অঙ্কিত হত এবং তাকে অবলম্বন করে গানও রচিত হয়েছে। পটুয়া-সঙ্গীতের কোন স্থায়ী মূল্য নেই। পট শিল্পের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এরও বিলুপ্তি ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কুমারীদের মধ্যে ভাদুগান নামে এক শ্রেণির আঞ্চলিক গান প্রচলিত আছে। এ গান ভাদ্রমাসে ভাদুপূজার সঙ্গে গীত হয়। সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের ঝুমুর গান, বীরভূম জেলার হাপুগান, উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা, রংপুর ও আশেপাশের জাগ গান, ভাওয়াইয়া গান, পূর্ব ময়মনসিংহের জারি গান, ঘাটু গান ইত্যাদি অসংখ্য আঞ্চলিক গান বাংলার লোকগীতির ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, সুরের মাধুর্যে এই সকল গান সুদীর্ঘ কাল থেকে বাংলার লোকসমাজকে পরিতৃপ্ত করে আসছে।

ব্যবহারিক গীতি বলতে সামাজিক বা পারিবারিক জীবনের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে এক ধরনের মেয়েলি গীত বোঝায়। বিশেষ কোন উপলক্ষে এই গান গাওয়া হয়। বিয়ের গীত এই শ্রেণির লোকগীতি। বিয়ের বিচিত্র আচার এই গানের উপজীব্য। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তিজীবনের প্রায় প্রত্যেকটি সংস্কার অবলম্বন করে নানা ধরনের ব্যবহারিক গান গাওয়া হয়। বিভিন্ন শোকসঙ্গীতের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন পূজাপার্বণ বা মেয়েলি ব্রত উপলক্ষে রচিত গানকে আনুষ্ঠানিক গান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

লোকগীতির মধ্যে প্রেমসঙ্গীত বিস্তৃত স্থান জুড়ে আছে। লোকসঙ্গীতের মধ্যে এই প্রেমের গানের আবেদন সর্বাধিক। দেশকাল নিরপেক্ষ চিরন্তন মানবিক অনুভূতি এই শ্রেণির গানের ভিত্তি বলে তার আবেদন সর্বজনীন। প্রেমসঙ্গীত হিসেবে ঘাটু গান, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদির বিশেষ মর্যাদা আছে।

জর্জ গ্রীয়ার্সন শতাব্দীকাল পূর্বে একটি ভাওয়াইয়া গান প্রথম সংগ্রহ করেছিলেন। গানটি এ রকম :

পরথম যৌবনের কালে না হৈল মোর বিয়া,
আর কতকাল রহিম্ ঘরে একাকিনী হয়া,
রে বিধি নিদয়া।
হাইলা পৈল মোর সোনার যৌবন মলেয়ার ঝড়ে,
মাও বাপে মোর হৈল বাদী না দিল্ পরের ঘরে,
রে বিধি নিদয়া।
বাপক্ না কও সরমে মুই মাও না কও লাজে,
ধিকি ধিকি তুষির আগুন জ্বলেছে দেহির মাঝে,
রে বিধি নিদয়া।
পেট ফাটে তাও মুখ না ফাটে লাজ সরমের ডরে,
খুলিয়া কোলে মনের কথা নিন্দা করে পরে,
রে বিধি নিদয়া।
এমন মন মোর করে রে বিধি এমন মন মোর করে,
মনের মতন চেঙ্গ্ড়া দেখি ধরিয়া পালাও দূরে,
রে বিধি নিদয়া।
কহে কবে কলঙ্কিনী হানি নাইক মোর তাতে,
মনের সাধে করিম্ কেলি পতি নিয়া সাথে,
রে বিধি নিদয়া।

এ সব ছাড়া প্রেমকে বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়ে অসংখ্য গান রচিত হয়েছে। ভাব ও সুরের বৈচিত্র্যে এগুলো বাঙালির মন চিরদিন রসসিক্ত করে রেখেছে।

কর্মসঙ্গীত—কৃষিকর্ম, নৌকা বাওয়া ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কাজের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য এ ধরনের গানের সৃষ্টি। তবে সাহিত্য বিচারে এগুলোর কোন উচ্চাঙ্গ সাহিত্যিক দাবি নেই। কর্মসঙ্গীতগুলো প্রায় সর্বত্রই অসংযত হৃদয়োচ্ছ্বাসের অর্থহীন অভিব্যক্তি মাত্র।

গীতিকা

একশ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতি বাংলা সাহিত্যে 'গীতিকা' নামে অভিহিত হয়। ইংরেজিতে তাকে বলা হয় ব্যালাড। ব্যালাড বলতে আখ্যানমূলক লোকসঙ্গীতকে বোঝায়। Ballad শব্দটি ফরাসি Ballet বা নৃত্য শব্দ থেকে এসেছে। ইউরোপে প্রাচীনকালে নাচের সঙ্গে যে কবিতা গীত হত তাকেই Ballad বা গাথাকবিতা বলা হত। গীতিকার কাহিনিটি হয় দৃঢ়-সংবদ্ধ। একটি মাত্র পরিণতি লক্ষ্য করে গীতিসংলাপ ও ঘটনাপ্রবাহ কাহিনিকে দ্রুত অগ্রসর করিয়ে নেয়। গীতিকা কাহিনিপ্রধান গতিশীল রচনা এবং তা নাটকীয় গুণসম্পন্ন। সুর সহযোগে গীত হলেও গীতিকায় কথাই মুখ্য, সুর গৌণমাত্র।

একটি বিশিষ্ট কাহিনি দৃঢ়বদ্ধ হয়ে এতে স্থান পায় বলে একে কাহিনি-প্রধান রচনা হিসেবে বিবেচনা করা চলে। চরিত্রগুলো সাধারণত নাটকের মত সুস্পষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যযুক্ত না হয়ে বিশেষ আদর্শ অনুযায়ী রূপায়িত হয়। ক্রিয়া বা action-ই গীতিকার মূল আকর্ষণ। এ ধরনের ক্রিয়া গীতিকাকে উচ্চাঙ্গ নাটকের পর্যায়ে উন্নীত করে। অনাবশ্যক ঘটনা বা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা বাহুল্য হিসেবে পরিত্যাজ্য হয়ে মূল ঘটনাপ্রবাহ পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। কাহিনির মধ্য দিয়েই গীতিকার রস শ্রোতার কাছে উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

গীতিকাগুলো গান হিসেবে গাওয়ার জন্যই রচিত। গতানুগতিক সুরে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে এগুলো গাওয়া হয়। কিন্তু এতে গানের সুরের চেয়ে কাহিনিই প্রাধান্য পায়। গীতিকা সাংস্কৃতিক জীবনের উৎকর্ষের পরিচায়ক। অনুন্নত মানসিকতা থেকে তার উদ্ভব হতে পারে না। ছোটগল্পের মত একটি মাত্র কাহিনির ধারা অনুসরণ করে গীতিকা অগ্রসর হয়ে থাকে। উৎপত্তির দিক থেকে এগুলোকে দলগত প্রয়াস বলে বিবেচনা না করে ব্যক্তিগত প্রতিভার ফল মনে করা হয়। কোন প্রতিভাশালী কবিকর্তৃক কোন কাহিনি বা ঘটনা অবলম্বনে গীতিকা রচিত হত এবং লোকপরম্পরায় তা গীত হতে হতে আনুষঙ্গিক বর্ণনা মূলকাহিনির সঙ্গে সংযুক্ত হত।

বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত লোকগীতিকাগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে : ১. নাথগীতিকা, ২. ময়মনসিংহ গীতিকা ও ৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

নাথগীতিকা

স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন ১৮৭৮ সালে রংপুর জেলার মুসলমান কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' প্রকাশ করলে 'নাথগীতিকা' সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইগুলো এক শ্রেণির ঐতিহাসিক রচনা। ইতিহাসের কোন বিস্মৃত যুগে এই গীতিকার নায়ক রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র মায়ের নির্দেশে তরুণ যৌবনে দুই নবপরিণীতা বধূ প্রাসাদে রেখে সন্ন্যাস অবলম্বন করেছিলেন—এই কাহিনি কেন্দ্র করেই নাথগীতিকার উদ্ভব। নাথসম্প্রদায়ভুক্ত গুরুবাদী যোগিগণ তাঁদের গুরুর অলৌকিক মহিমাকীর্তন প্রসঙ্গে এই গীতিকা দেশবিদেশে প্রচার করেছেন। নাথগীতিকার দুটি বিভাগ : প্রথমটি তরুণ রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কাহিনি। এ সম্পর্কিত গীতিকা 'গোরক্ষবিজয়', 'মীনচেতন' নামে পরিচিত। অপর শ্রেণির গীতিকাগুলো 'মাণিক রাজার গান', 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', 'ময়নামতীর গান', 'গোবিন্দচন্দ্রের গান', 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', 'গোপীচাঁদের পাঁচালী' ইত্যাদি নামে খ্যাত।

নাথগীতিকাগুলো বিশেষ সম্প্রদায়ের উচ্চ নৈতিক আদর্শ অবলম্বনে রূপায়িত হয়েছিল বলে মানবমনের স্বাধীন অনুভূতির স্বাভাবিক বিকাশ এতে অনুপস্থিত। এর চরিত্র গোরক্ষনাথ, মীননাথ, শিব, চণ্ডী, যোগিনী, মঙ্গলা, কমলা, কদলী-নারী বাস্তব জগতের অধিবাসী নয়। মাণিকচন্দ্র-গোপীচন্দ্রের গানে তরুণ রাজপুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের বৃত্তান্তে মানবিক আবেদন বিদ্যমান। গোপীচন্দ্রের জন্য দুই স্ত্রী অদুনা আর পদুনার হৃদয় বেদনা সুতীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'গোপীচন্দ্রের গানে'। যেমন :

না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কার লাগিয়া বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর ॥

বান্ধিলাম বাঙ্গালা ঘর নাহি পড়ে কালি।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও, আমার বৃথা গাভুরালি ॥
নিদের স্বপনে রাজা হব দরশন।
পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন ॥

ময়মনসিংহ গীতিকা

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব গীতিকা সংগৃহীত হয়েছিল তা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বিভক্ত সাবেক বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জের বিল, হাওর ও বিভিন্ন নদনদীপ্লাবিত বিস্তৃত ভাটি অঞ্চলে বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার যে শতদলগুলো বিকশিত হয়েছিল তা-ই 'ময়মনসিংহ গীতিকা' নামে দেশবিদেশের মনীষীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পূর্ব ময়মনসিংহের সাধারণ জনসমাজ কোচ, গারো, হাজং, রাজবংশী প্রভৃতি মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি দ্বারা গঠিত। এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রতিফলিত। এই সমাজে নারীর স্বাধীন প্রেমের যে স্বীকৃতি রয়েছে তার অনুসরণে গীতিকাগুলোর নারী চরিত্রের রূপায়ণ লক্ষ করা যায়।

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের গীতিকা সংগ্রহের দুরূহ কাজটি যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন কয়েকজন সংগ্রাহক—যাঁরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে এই শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন—তাঁরা হলেন চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী, বিহারীলাল সরকার, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখ। চন্দ্রকুমার দে এই সংগ্রাহকগণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র পালাগানগুলোর সংগ্রাহক।

ইংরেজি অনুবাদ ও বিস্তারিত আলোচনাসহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর পরই গীতিকাগুলো অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গ্রামীণ নরনারীর সহজ সরল প্রেমের মাধুর্যমণ্ডিত আলেখ্য, অনবদ্য কাব্যগুণ, ঋজু ও স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গি সমৃদ্ধ গীতিকাগুলো লোকসাহিত্যের চমৎকার নিদর্শন বলে বিদেশে বিবেচিত হতে থাকে। তবে প্রাথমিক জনপ্রিয়তার উচ্ছ্বাস ও আবেগ স্তিমিত হয়ে পড়লে এর অকৃত্রিমতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। গায়েনের মুখ থেকে শুনে সংগ্রাহকের লেখায় এবং সম্পাদকের কলমে অনেক পরিবর্তন হয়েছে মনে করাই এই বিতর্কের উৎস। তবে এগুলো সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ লোকচক্ষুর সমক্ষে এসেছে এবং বিদেশি মনীষীদের কাছেও বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, 'পূর্ব ময়মনসিংহের গীতিকাগুলি প্রধানত পরিণত বয়স্কা কুমারীর স্বাধীন প্রেমের অধিকার ও ব্যক্তিগত হৃদয় বেদনা লইয়াই রচিত। ইহাদের এই প্রেরণা হিন্দু-মুসলমান সমাজ-নিরপেক্ষ; ইহা এই মৌলিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি হইতেই আসিয়াছে। উচ্চনীচ হিন্দু সমাজ যেমন বাল্যবিবাহ দ্বারা দূষিত, তেমনই মুসলমান সমাজের একাংশও পর্দা দ্বারা আবৃত। অতএব স্বাধীন প্রেমের অবকাশ ইহাদের

মধ্যে নাই। সুতরাং হিন্দু কিংবা মুসলমান সমাজের আদর্শ দ্বারা যাঁহারা এই গীতিকাগুলির সমাজনীতি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মূল তাৎপর্যের কোনই সন্ধান পান নাই।'

ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনিগুলো প্রেমমূলক এবং তাতে নারীচরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মবোধ, স্বাতন্ত্র্য, সতীত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই সব গীতিকায় প্রকাশমান। এখানকার নায়িকারা অপূর্ব প্রেমশক্তির অধিকারিণী হয়ে তাদের নারীধর্ম সতীধর্ম রক্ষা করেছে। প্রেমের জন্য দুঃখ, তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ, সর্বসমর্পণ করে নারী যে কি অসীম মহিমা লাভ করতে পারে, গীতিকাগুলো তারই পরিচায়ক। পল্লীকবির সহজ সরল দৃষ্টিতে শাশ্বত নারীর অকৃত্রিম রূপ এখানে ফুটে উঠেছে। চরিত্রগুলো যেন সে অঞ্চলের নদনদী-হাওর-অরণ্য বিধৃত প্রাকৃতিক সত্তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের স্বভাবের মাধুর্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে সর্বসংস্কারমুক্ত প্রেমের বিকাশ ঘটেছে।

আদিম সমাজের উপকরণের সঙ্গে বিভিন্ন সমাজের মিশ্র উপাদানের সংমিশ্রণে ময়মনসিংহ গীতিকার সমাজ গঠিত। পল্লীকবিরা তাঁদের নিজেদের পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। পল্লীসমাজের সহজ প্রেম গীতিকাগুলোর উপজীব্য হয়ে তৎকালীন সমাজকে প্রতিফলিত করেছে। রাষ্ট্রীয় কলকোলাহলের বাইরে সাধারণ সমাজের আনন্দবেদনার প্রতিচ্ছবি এই গীতিকাগুলো। ময়মনসিংহ গীতিকায় সাধারণ সমাজ যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বাংলা কাব্যের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে ইতোপূর্বে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে নি। তাই প্রথম সামাজিক কবিতা হিসেবে এগুলোর বিশেষ মূল্য আছে।

ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত পূর্ব-ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলো হচ্ছে : মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ানা মদিনা। এগুলো ছাড়া ড. দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র তিন খণ্ডে প্রকাশিত চুয়াল্লিশটি গীতিকার মধ্যে ত্রিশটি গীতিকাই পূর্ব-ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত।

গীতিকাগুলোর মধ্যে **মহুয়া** পালাটিতে ময়মনসিংহ গীতিকার বৈশিষ্ট্য চমৎকার ভাবে রূপয়িত হয়ে উঠেছে। বেদের এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে মহুয়ার সঙ্গে বামনকান্দার জমিদার ব্রাহ্মণ যুবক নদের চাঁদের দুর্জয় প্রণয়কাহিনি অবলম্বনে পালাটি রচিত। পল্লীকবি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে এই বিষাদাত্মক প্রেমকাহিনি বর্ণনা করেছেন। মানবচরিত্র সম্পর্কে কবির সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রেমের বিচিত্র বিকাশের সহায়ক ছিল। নায়ক-নায়িকার প্রেমানুভূতি কবি নাটকীয় গুণে সমৃদ্ধ করে বর্ণনা করেছেন :

'জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ।'...
'নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভসুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই ॥'...
'কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার প্রাণ।
এমন যইবন তোমার যায় অকারণ ॥
'কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া ॥'

'কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া ॥
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া ॥'
'লজ্জা নাই নিলজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্ধা জলে ডুব্যা মর ॥'
'কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি ॥'

মহুয়া চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয়কল্পে ড. দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, 'এই গীতিকায় জাতিবিচার, কুলশীল, পদমর্যাদা সমস্তই প্রেমরত্নাকরের অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে।...ইহারা মুক্ত গগনের সীমাবিহীন পথের পথিক,—মহার্ণবে ডুবন্ত নৌকার নিমজ্জমান আরোহী যেমন ধ্রুবনক্ষত্রের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি, সেইরূপ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া পৃথিবীকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বর্গীয় পণে অটল।...ইহারা কোন গৃহের সম্পর্কিত নহেন, ইঁহারা পরস্পরের প্রতি উদ্দাম অনুরাগ ভিন্ন অন্য কোন বিধি মানেন নাই,—প্রেম ভিন্ন ইঁহাদের অন্য ধর্ম নাই,—পরস্পরের সাহচর্য ভিন্ন ইঁহারা কোন গৃহসুখ কল্পনা করেন নাই।' প্রেমের অকৃত্রিমতায়, অসাধারণ কূটবুদ্ধিতে, নির্ভীকতা ও তেজস্বিতায় মহুয়ার চরিত্র এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

ড. সুকুমার সেন 'ময়মনসিংহ গীতিকাগুলোর মধ্যে 'মহুয়া' নামিত গাথাটি সবচেয়ে রোমান্টিক ও মনোরম' বিবেচনা করেছেন।

মনসুর বয়াতি রচিত **দেওয়ানা মদিনা** পালাটি ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহের অন্যতম শ্রেষ্ঠগীতিকা হিসেবে সমাদৃত। বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান সোনাফরের পুত্র আলাল ও দুলালের বিচিত্র জীবনকাহিনি এবং দুলাল ও গৃহস্থকন্যা মদিনার প্রেমকাহিনি এই পালার বিষয়বস্তু। দেওয়ান হওয়ার প্রলোভনে দুলাল নিরাপরাধিনী পল্লীবালা মদিনাকে ত্যাগ করায় তার জীবনে যে করুণ মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল কবি অপরিসীম সহানুভূতির সঙ্গে তা বর্ণনা করেছেন। নীরব সহিষ্ণুতার মাধ্যমে নারীজীবনের যে মাধুর্য প্রকাশ পেতে পারে কবি তা বাস্তব ও জীবন্ত করে রূপ দিয়েছেন। গৃহস্থকন্যা মদিনার অনাবিল প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যবোধের মোহ থেকে দেওয়ান দুলালকে পরিত্যক্ত পল্লীর জীর্ণকুটিরে নিয়ে অবশিষ্ট জীবন প্রায়শ্চিত্তে কাটানোর সুযোগ দান করেছিল। মদিনার প্রেমমুগ্ধ মনের অবস্থা কবি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

তালাকনামা যখন পাইল মদিনা সুন্দরী।
হাসিয়া উড়াইল কথা বিশ্বাস না করি ॥
'আমার খসম না ছাড়িব পরাণ থাকিতে।
চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে ॥
দুলালে তালাক দিব নাই সে লয় মনে।
মদিনারে ভালবাসে যেবা জান পরানে ॥
তারে ছাড়িয়া দুলাল রইতে না পারিব।
কতদিন পরে খসম নির্চয় আসিব।'

গীতিকাগুলোর সর্বত্রই নারীহৃদয়ের প্রেমের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সার্থকতা সহকারে রূপায়িত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিয়োগাত্মক প্রেমকাহিনি গীতিকাগুলোর উপজীব্য। প্রেমের গতি যে কত বিচিত্র ও জটিল, অন্তঃপ্রবৃত্তির সঙ্গে বহিঃসংস্কারের সংঘাত যে কত প্রবল ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন নারীচরিত্রে তাঁর নিদর্শন বিদ্যমান। গীতিকায় প্রতিফলিত জীবনের বাস্তবতার কথা বিবেচনা করে সেগুলোকে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের অগ্রদূত হিসেবে মনে করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'ময়মনসিংহ গীতিকা উপন্যাস সাহিত্যের উৎপত্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কাশ্রিত। বাংলাদেশের সাহিত্যের আর কোথাও অবিমিশ্র বাস্তবতার এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র আত্মপ্রকাশ দেখা যায় না। আখ্যায়িকাগুলোর কোথাও কোথাও অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ বা দেবকীর্তি প্রচারের প্রয়াস আছে। কিন্তু মোটের ওপর যে মনোবৃত্তির প্রাদুর্ভাব, তাহা অকৃত্রিম বাস্তবপ্রীতি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, প্রতিবেশ ও সমাজ আবেষ্টনের নিখুঁত চিত্রাঙ্কন। ভাবপ্রকাশে কথ্য ভাষার প্রয়োগ ইহাদিগকে উপন্যাসের আরও নিকটবর্তী করিয়াছে।' ড. আশরাফ সিদ্দিকী 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলোর এভাবে শ্রেণিভুক্ত করেছেন : ১. খাঁটি প্রেমকাহিনিমূলক, ২. ধর্মভিত্তিক প্রেম, ৩. রূপক প্রণয়-গীতিকা, ৪. বিবাহোত্তর প্রেম, ৫. ঐতিহাসিক গীতিকা, ৬. দস্যু লোকনায়ক, ৭. জায়গার নাম ও ৮. অরণ্যভূমির গান।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা

পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে পরিচিত গীতিকাগুলোর কিছু পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে এবং অবশিষ্ট গীতিকা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। শেষোক্ত শ্রেণির গীতিকায় ময়মনসিংহের নিভৃত পল্লীর নিবিড় সমাজজীবন অনুপস্থিত। বরং সে অঞ্চলের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে গীতিকাগুলোর মধ্যে দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ কাহিনি স্থান পেয়েছে। 'নিজাম ডাকাতের পালা,' 'কাফন চোরা', 'চৌধুরীর লড়াই', 'ভেলুয়া', 'নুরুন্নেহা ও কবরের কথা', 'কমল সদাগর', 'সুজা তনয়ার বিলাপ', 'পরীবানুর হাঁহলা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই যথার্থ গীতিকার মর্যাদা পেতে পারে না, নিছক বর্ণনা হিসেবে বিবেচ্য।

পূর্ববঙ্গ গীতিকায় সংকলিত চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত 'ভেলুয়া' পালায় নারীহৃদয়ের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে :

আমির সাধুর কথা শুনি ভেলুয়া সোন্দরী।
কাঁদিতে লাগিল সাধুর দোন পায়ত ধরি ॥
আমারে ছাড়িয়া সাধু ন যাইও তুমি।
হাতের বাজু বেচিয়ারে খাবাইয়ম আমি ॥
ন যাইও ন যাইও সাধু কহি বারে বার।
বেচিয়া খাবাইয়ম তোমায় সপ্তছরির হার ॥
বৈদেশে বিপাকে যাইতে আমি করি মানা।
বেচিয়া খাবাইয়ম তোমায় গলার সোনার দানা ॥

ন যাইও ন যাইও সাধু আমার প্রাণের ধন।
তোমার জন্য বেচিবরে সোনার কঙ্কণ ॥
তুমিত আমার সাধু আসকের পাগল।
বেচিব হাছুলি আর কানের শিকল ॥
ন যাইও ন যাইও তুমি ছাড়ি আমার ঘর।
পিন্ধনের শাড়ি বেচ্যম সোনালী চান্দর ॥
তার পরে ভিক্ষা মাগি খাবাইয়ম তোমারে।
ন যাইও ন যাইও সাধু বৈদেশে বন্দরে ॥

ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলোতে বাঙালি জীবনের সহজ সরল বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মন্তব্য করেছেন, 'এ অঞ্চলের গীতিলেখকেরা কাব্যের বস্তুর জন্য পুরাণের পুঁথি ঘাঁটিতে যান নাই কিংবা কোনও দূর দেশ হইতে নায়ক-নায়িকা আমদানি করেন নাই। নিজেদের বাড়ির চারিপাশে কাব্যের যে অপরূপ সুরভি ফুল ফুটিয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁহারা অম্লান গীতিমাল্য রচনা করিয়াছেন। ময়মনসিংহ গীতিকার এই এক চমৎকার বিশেষত্ব। এই জন্যই সেগুলি এরূপ বস্তুতান্ত্রিক, এরূপ স্বাভাবিক ও এরূপ মর্মস্পর্শী।' বিশেষ কোন সমাজের বক্তব্য গীতিকায় রূপায়িত হয় নি। সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ গীতিকাগুলোতে মানবিকতার ধর্মই বড় হয়ে উঠেছে। বাঙালির সৃষ্টি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ আর প্রকৃতি এখানে প্রতিফলিত। গীতিকাগুলোর এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছিলেন, 'গীতিকাগুলি লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, কিন্তু ফুলের মত তাহাদের বাসি হইবার সম্ভাবনা নাই। রচনার দিন তাহারা যে সুঘ্রাণ দিয়াছে, এখনও তাহাদের সেই সুঘ্রাণ আছে। তাঁহাদের মলয় সমীরণ সকলই আছে। তাহারা খাঁটি বাংলার জিনিষ, এই দেশের শোভা, সমৃদ্ধি।'

কথা

গদ্যের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণিত হলে তাকে 'কথা' বা 'লোককথা' বা 'লোককাহিনি' বলা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে তা folk-lore নামে পরিচিত। মানুষের গল্প শোনার সহজাত ও চিরন্তন প্রবৃত্তি থেকে এগুলোর উদ্ভব এবং সুদূর অতীত থেকে এর যাত্রা শুরু হয়ে পরিমার্জনা ও নতুনতর সংযোজনার মাধ্যমে বর্তমান কালে এসে পৌঁছেছে। কাহিনিগুলো কাব্যে রূপায়িত হলে 'গীতিকা' এবং গদ্যে হলে 'কথা' নামে পরিচিত হয়।

লোককথাগুলোর সুনির্দিষ্ট কোন দেশগত সীমারেখা নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে এগুলোর বিকাশ ঘটেছে এবং এক দেশের কাহিনির সঙ্গে অন্য দেশের কাহিনির আশ্চর্য সামঞ্জস্যও লক্ষ করা যায়। কখনও এক দেশের কোন প্রাচীন কাহিনি নানা উপায়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে বিচিত্র রূপান্তর পরিগ্রহ করে। 'পঞ্চতন্ত্রের গল্প' এমনি ভাবে ভারতবর্ষীয় উৎস থেকে সৃষ্ট হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে। বিশ্বজনীন হয়ে ওঠার মত প্রাণশক্তি লোককথাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান থাকায় তা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে গেছে। লোকসাহিত্যের আর কোন বিষয় এই অপূর্ব প্রাণশক্তির অধিকারী হয়ে এমন বিস্তৃত দিগ্বিজয় করে বিশ্বভ্রমণ করতে পারে নি।

লোককথার উপকরণ এসেছে মানুষের শ্রুতি পরম্পরায় আগত বিষয়বস্তু থেকে। কোন মৌলিক বিষয় এর উপজীব্য হতে পারে না বলে মনে করা হয়। আধুনিক কথাসাহিত্যের সঙ্গে এদিক থেকেই লোককথার মৌলিক পার্থক্য। আধুনিক যুগের গল্প বা উপন্যাস সৃষ্টি হয় লেখকের নিজস্ব মৌলিক কল্পনার ফসল হিসেবে। বিষয় ও চরিত্র লেখকের নিজের উদ্ভাবন করা থাকে। কিন্তু লোককথা এসেছে মৌখিক বা জনশ্রুতি-মূলক ধারা অনুসরণ করে। তবে তাতে আছে সর্বজনীন আবেদন। লোককথার প্রকাশভঙ্গি বৈচিত্র্যধর্মী। মানব জীবনের বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে লোককথাও নানা ধরনের হতে পারে।

লোককথার উপাদান বৈচিত্র্যধর্মী। মানবজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও যেমন এতে রূপায়িত হয়ে ওঠে, তেমনি রোমান্সধর্মী কল্পনার বিকাশও এতে স্থান পায়। কোন কোন কাহিনিতে জীবনের সুখদুঃখ আনন্দবেদনার চিত্র, কোথাও জীবনের ছোটখাট অসঙ্গতি, কোথাও অনাবিল কৌতুকরসের সঞ্চার, কোথাও নীতিপ্রচার—এ ধরনের বক্তব্য লোককথায় লক্ষ করা যায়। বিশ্বের সকল দেশেই রূপকথাজাতীয় কাহিনির প্রচলন রয়েছে। ইংরেজিতে তাকে fairy tale বলা হয়। অবাস্তব, অলৌকিক, অবিশ্বাস্য ঘটনাবলি এর উপজীব্য। কোন কোন কাহিনিতে বাস্তব পৃথিবীর পরিসীমায় অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর গল্পের স্থান দেওয়া হয়েছে। আরব্যোপন্যাসের গল্প এই শ্রেণির। সৃষ্টির অজ্ঞাত লীলারহস্য বর্ণনা করে রচিত লৌকিক বিবরণ সম্বলিত কাহিনিকে লৌকিক পুরাণ বলা হয়। লোককথায় পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বনেও গল্প প্রচলিত আছে। এদের মাধ্যমে রূপকার্থে মানবচরিত্রের বৈশিষ্ট্য চিত্রিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে এসব লোককথাকে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না, একের বৈশিষ্ট্য অন্যের মধ্যে প্রায়ই অনুপ্রবেশ করেছে। মৌখিক বা জনশ্রুতিমূলক ধারায় এগুলো প্রচারিত হওয়াতে এদের মধ্যে পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ স্থানের ব্যক্তি বিশেষের রসবোধ থেকে এ সব কাহিনি সৃষ্টি হলেও কালক্রমে অপরাপর দেশে তা সম্প্রসারিত হয়ে ভাবের দিক থেকে সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রত্যেক লোককথার এক বা একাধিক মৌলিক উদ্দিষ্ট বিষয় থাকে। তাকে ইংরেজিতে মটিফ (motif) বলা হয়। এই মটিফ-ই লোককথার প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ এবং একে অপরিবর্তিত রেখে কাহিনির বহিরঙ্গের বিচিত্র বিকাশ ঘটে। কোন বিশেষ ধর্মমতের প্রভাব লোককাহিনির ওপর পড়ে না। লোককথা জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে আবেদন সৃষ্টি করে থাকে। নিয়তি বা অদৃষ্টের কথা অধিকাংশ লোককথায় বর্ণিত হয়। লোককথার ভেতর দিয়ে অদৃষ্ট-বিড়ম্বিত মানুষ যেন নিজের জীবনের রূপ প্রত্যক্ষ করে।

লোককথা সজীব শিল্প। লোককথা বলার মধ্যে যেমন রসসৃষ্টি হয়, শোনার মধ্যেও তেমনি রসের প্রাচুর্য থাকে।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোককথাকে ১. রূপকথা, ২. উপকথা ও ৩. ব্রতকথা—এই কয় ভাগে বিভক্ত করেছেন।

রূপকথা

অন্যান্য লোককথার চেয়ে রূপকথার কাহিনি দীর্ঘতর হয়ে থাকে। সকল রূপকথার গল্পের মধ্যে একটা ঐক্য লক্ষণীয়। কোন অপুত্রক রাজার দৈববলে পুত্রলাভ, ভাগ্যান্বেষণে রাজপুত্রের দেশান্তরে অভিযান এবং বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সাফল্য লাভ, পরিণামে কোন রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজ্যলাভ করে সুখে কালযাপন—এই ধরনের কাহিনিগত কাঠামোর ওপর রূপকথার ভিত্তি ও বিকাশ। রূপকথার মাধ্যমে এক অজানা রহস্যময় জগতের বিচিত্র কাহিনি শ্রোতার কাছে পরিবেশিত হয়, ভৌগোলিক মাপকাঠিতে সে সব রাজ্যের কোন পরিচয় থাকে না। নানা অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনা এতে ভীড় করে। বাস্তব রাজ্যের সঙ্গে রূপকথার কোন সম্পর্ক নেই। বিশেষ কোন দেশ বা কালের সমাজ, ধর্ম, নীতি, সৌন্দর্যবোধ আশ্রয় না করে তা একটি নির্বিশেষে রসরূপ লাভ করে। রূপকথায় বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষণীয়।

উপকথা

পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বনে যেসব কাহিনি গড়ে উঠেছে সেগুলোর নাম উপকথা। কৌতুকসৃষ্টি ও নীতিপ্রচারের জন্যই এগুলোর সৃষ্টি। এতে মানবচরিত্রের মতই পশুপাখির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মতই পশু- পাখিরা কথাবার্তা বলে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেছে। কেবল পশুপক্ষীর চরিত্রই যে উপকথার বিষয়বস্তু তা নয়, মানবচরিত্রও এগুলোতে স্থান পেয়েছে। পশুপক্ষী অনেক ক্ষেত্রে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পের বর্ণনায় পুনরাবৃত্তি এসে বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। যেমন—'কাক ও চড়ুই পাখি' গল্পে বলা হয় :

'গেরস্ত ভাই, দাও ত আগুন, গড়ব কাস্তে, কাটব ঘাস, খাবে গাই, দিবে দুধ, খাবে কুকুর, হবে তাজা, মারবে মোষ, লব শিং, খুঁড়ব মাটি, গড়ব ঘটি, তুলব জল, ধুব ঠোঁট—তবে খাব চড়ুইর বুক।'

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সংকলিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' রূপকথা গ্রন্থ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রচুর রূপকথার গল্প পরিবেশিত হয়ে শিশুদের কাছে অফুরন্ত আনন্দের উৎস হয়ে আছে।

ব্রতকথা

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েলি ব্রতের সঙ্গে সম্পর্কিত কাহিনি অবলম্বনে ব্রতকথা নামে এক ধরনের লোককথার বিকাশ ঘটেছে। এ সব কাহিনিতে যে ধর্মবোধের কথা বলা হয়েছে তাতে মেয়েদের জাগতিক কল্যাণই নিহিত। ব্রতকথার কাজ গার্হস্থ্য কর্তব্য সাধন। গার্হস্থ্য সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা মিটানো এর লক্ষ্য। ব্রতকথার মধ্যদিয়ে বাংলার সমাজ জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। ব্রতকথার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সেই সঙ্গে আদিম সমাজের উপকরণও এতে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। বাস্তব জীবনাশ্রিত এই ধর্মবোধ সম্বলিত ব্রতকথাগুলো বাঙালির লোকসমাজের পরিচয় প্রকাশক। মেয়েলি ব্রতকথাগুলো লৌকিক দেবদেবী অবলম্বনে রচিত, কিন্তু তাতে কোন পৌরাণিক আদর্শ নেই। বাস্তব জীবনের সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে মেয়েরা এ সব দেবদেবীর ওপর নির্ভরশীল হয়েছে। ব্রতাচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে এই সব ব্রতকথা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে—সাহিত্যিক আবেদন এতে অনুপস্থিত।

ধাঁধাঁ

লোকসাহিত্যে 'ধাঁধাঁ' অন্যতম প্রাচীন শাখা হিসেবে বিবেচিত। রূপকের সাহায্যে এবং জিজ্ঞাসার আকারে কোন একটি ভাব সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও চিন্তার অনুশীলনের মাধ্যমে ধাঁধাঁয় রূপায়িত হয়ে ওঠে। এতে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে তাকে আদিম জাতির সৃষ্টি মনে না করে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানবমনের সৃষ্টি বলে অনুমিত হয়। মানুষ সুপ্রাচীন কাল থেকে ধাঁধাঁর ব্যবহার করে আসছে। প্রত্যেক দেশের প্রাচীন সাহিত্যেই ধাঁধাঁর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধাঁধাঁ বা হেঁয়ালী ব্যবহারের প্রাচুর্য ছিল।

ধাঁধাঁর মাধ্যমে জ্ঞানবুদ্ধির চর্চা হয়ে থাকে। অল্প কয়টি কথায় সাধারণত কবিতার আকারে কাউকে কোন প্রশ্ন করা হলে তা 'ধাঁধাঁ' হিসেবে বিবেচিত হয়। তখন প্রশ্নের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে এর সঠিক উত্তর দিতে হয়। ধাঁধাঁ জিজ্ঞাসা এবং সে সবের উত্তর দানের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় মিলে।

দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র উপকরণ থেকে ধাঁধাঁর বিষয়বস্তু আহরিত হয়। এই ক্ষেত্রে মানবজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রকাশ পায়। প্রশ্নকর্তা নিজে উত্তর গোপন রেখে ধাঁধাঁর মাধ্যমে জবাব আশা করে। জবাব দিতে পারলে চালাক এবং না দিতে পারলে বোকা প্রমাণিত হয়। ধাঁধাঁর উত্তরদানে ব্যর্থ হলে তা হাসির উপকরণ হয়ে ওঠে। ধাঁধাঁর সঙ্গে আছে মানুষের হাস্যরসবোধের সম্পর্ক।

ধাঁধাঁর উত্তর জনশ্রুতিমূলক হয়ে থাকে। সাধারণত উত্তর জানা না থাকলে প্রশ্নকর্তার সম্মুখে বিব্রত হতে হয়। তবে ধাঁধাঁর মীমাংসা জনশ্রুতিমূলক বলেই তার জবাবদান সম্ভবপর। আগে থেকে জানা না থাকলে লোকসাহিত্যের ধাঁধাঁর উত্তর বের করা কঠিন। কারণ ধাঁধাঁর মধ্যে বক্তব্য সাধারণত সঙ্গতিপূর্ণ থাকে না। যেমন :

> একটুখানি পুষ্কুনি কইয়ে ভুর ভুর করে
> রাজা আইলে প্রজা আইলে তুইল্যা সেলাম করে।

এর উত্তর যে 'হুঁকা'—তা আগে থেকে জানা না থাকলে ধাঁধাঁর বক্তব্য থেকে তা উদ্ধার করা চলে না।

> বন থেকে বেরুল টিয়ে
> সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।

—আনারসের সঙ্গে এর তেমন মিল না থাকলেও এর উত্তর 'আনারস'। অনেক সময় ধাঁধাঁর উত্তরের সঙ্গে বক্তব্যের অর্থসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। ধাঁধাঁর মধ্যে অর্থহীন পদও ছন্দের ঝংকার তোলে। যেমন :

> থাল ঝনঝন থাল ঝনঝন থাল নিল চোরে।
> বৃন্দাবনে আগুন লাগল কে নিবাইতে পারে ॥ (—রোদ)

কখনও অর্থহীন পদযোগে চিত্র অঙ্কন করা হয় :

> রাজার বাড়ির মেনা গাই মেনমেনাইয়া চায়।
> হাজার টাকার মরিচ খাইয়া আরও খাইতে চায় ॥ (—শিলনোড়া)

অনেক সময় ধাঁধাঁর মধ্যে উদ্দিষ্ট জিনিসের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। যেমন :

মাটির তলে থাকে বেটি
তেনা পিন্ধে আঁটি আঁটি
নাপিতে না ছোঁয়, ধোপায় না ধোয়
তেও বেটি সাফ রয়। (—রসুন)

ধাঁধাঁগুলোর রূপ এক রকম থাকে না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত থাকার জন্য এর পাঠান্তর ঘটে।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বিষয় অনুসারে বাংলা ধাঁধাঁকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। ভাগগুলো হচ্ছে : ক. প্রকৃতিবিষয়ক এবং খ. গার্হস্থ্য জীবন বিষয়ক। প্রথম শ্রেণির ধাঁধাঁয় কল্পনা ও রসের প্রাচুর্য অনুভব করা যায়; অপরটির মাধ্যমে বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি অভিজ্ঞতার পরিচয় ফুটে ওঠে। ধাঁধাঁর লক্ষ্য রসসৃষ্টি; জ্ঞানের অনুশীলন এর লক্ষ্য নয়। প্রকৃতি বা জীবন যেখান থেকেই উপকরণ সংগৃহীত হোক না কেন তাতে রসের অভাব ঘটে না। ধাঁধাঁর মাধ্যমে ফুটে ওঠে বুদ্ধির দীপ্তি, রসবোধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও আনন্দানুভূতি। মানুষের জীবনধারার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এসব ধাঁধাঁ রচিত ও প্রচারিত হয়ে অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবেও বিবেচনার দাবি রাখে। ধাঁধাঁর বিচরণের সুযোগ এসেছে মুখে মুখে প্রচলনের প্রেক্ষিতে। এর ফলেই এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সঞ্চরণও ধাঁধাঁর পক্ষে সহজ কাজ। ধাঁধাঁর রূপান্তর ঘটে, ঘটে ভাষার পরিবর্তন। এক কালের ধাঁধাঁর আকর্ষণ পরবর্তী কালে হালকা হয়ে যায়। তবু যুগে যুগে ধাঁধাঁর উপযোগিতা কম নয়।

বর্তমান নাগরিক জীবনে এক ধরনের ধাঁধাঁর উদ্ভব ঘটছে, সেগুলোকে 'সাহিত্যিক ধাঁধাঁ' বলা যেতে পারে। 'লৌকিক ধাঁধাঁর' মত এগুলো কোন জনশ্রুতিমূলক বিষয় নিয়ে রচিত হয় না। এতে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব বুদ্ধির অনুশীলন ঘটে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেছেন, 'লৌকিক ধাঁধাঁ গুরুভার নহে,—সেইজন্য স্মৃতির রাজ্যে ইহারা শরতের মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়ায়, ভারাক্রান্ত বলিয়া নতুন 'সাহিত্যিক ধাঁধাঁ' স্থানুর মত অচল হইয়া পড়িয়া থাকে।'

প্রবাদ

'প্রবাদ' লোকসাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট শাখা। প্রবাদ বলতে বোঝায় মানুষের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। ব্যক্তি বা সমাজজীবনের অভিজ্ঞতার ফলে প্রবাদের সৃষ্টি এবং নীতি ও উপদেশ বিতরণ এর লক্ষ্য। জীবনের বিচিত্র পরিসরে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে পরবর্তী পর্যায়ে কাজে লাগানোর জন্য স্বল্প অবয়বে প্রবাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন প্রাচীন কালে কার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে প্রবাদের প্রথম সৃষ্টি তার সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে প্রবাদের ব্যবহার যুগ যুগ ধরে আবেদন ও উপযোগিতা প্রমাণ করে চলেছে।

প্রবাদে আছে জ্ঞান ও সত্য প্রচারের প্রচেষ্টা, আছে বক্তব্যকে রসাত্মক করে প্রকাশ করার জন্য সংযত শব্দবিন্যাস। তাই প্রবাদ হচ্ছে কাব্যের ঘনীভূত নির্যাস বা

কাব্যকণিকা। সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবাদের স্থান এ কারণেই স্বীকৃত। প্রবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, 'বিভিন্নমুখী ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের বহু-পরীক্ষিত উপদেশ ও নীতি প্রচার করাই ইহার লক্ষ্য—রূপক ও বক্রোক্তি প্রধানত ইহার অবলম্বন। ইহা যেমন ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের কতর্ব্য নির্দেশক, তেমনি সম্পাদিত কার্যাবলীরও রূঢ় সমালোচক।'

প্রবাদ ব্যক্তিবিশেষের অবিজ্ঞতাজাত হলেও তা শ্রুতিপরম্পরায় বহু লোকের হৃদয়ে স্থান পায় এবং এর রচয়িতার পরিচয়ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রবাদ বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ফল এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। সর্বজনীন ভাব প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কোন বিশেষ দেশ বা জাতির বক্তব্য হলেও তা সকলের জন্যই প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। তাই কোন ভৌগোলিক সীমানায় প্রবাদ সীমাবদ্ধ নয়। যখন বলা হয় :

নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

অথবা

চিড়া বল পিঠা বল ভাতের মত না,
খালা বল ফুফু বল মায়ের মত না।

অথবা

যদি থাকে বন্ধুর মন গাঙ পারইতে কতক্ষণ।

—এমনি অসংখ্য প্রবাদের মাধ্যমে মানবমনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সর্বজনীন রূপেরই প্রকাশ ঘটে।

একই ধরনের প্রবাদ ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত দেখা যায়। এক দেশে প্রবাদ যেমন অন্য দেশে প্রচারিত হয়, তেমনি একই ভাব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ বিভিন্ন দেশে সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রবাদের মাধ্যমে মানুষের সামাজিক আচরণের কঠোর সমালোচনাও করা হয়।

লোকের মুখে মুখে প্রচলিত প্রবাদ যেমন কবিসাহিত্যকদের রচনায় স্থান পায়, তেমনি সাহিত্যের প্রবাদও লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন প্রবাদসৃষ্টির পেছনে কাহিনি বিদ্যমান থাকে, কোনটির সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনা জড়িত থাকে। জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রবাদের উপযোগিতা অত্যধিক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্যতা ও আকারের সংক্ষিপ্ততা নিয়ে এবং চিরন্তন অভিজ্ঞতার বাণীবাহী প্রবাদ সাহিত্যে সর্বকালেই সমাদৃত।

প্রবাদে আছে সত্য প্রচারের প্রচেষ্টা। ধর্ম, নীতি, সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্য, স্বাস্থ্যরক্ষা, কৃষিকাজ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে প্রবাদ সৃষ্ট হয়ে মানব জীবনের সর্বত্র কল্যাণ সাধন করছে। প্রবাদের সংক্ষিপ্ত আকার, তাৎপর্যপূর্ণ ও শ্রুতিমধুর ভাষা প্রবাদকে আকর্ষণীয় করে রাখে।

বাংলা প্রবাদের উৎস অনেক। এদেশের জীবনধারায় নানা প্রবাদ ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বিদেশি প্রবাদের অনুপ্রবেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। অনুবাদের মাধ্যমে প্রবাদের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে। কবি সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় প্রবাদের গুণসম্পন্ন সৃষ্টি অব্যাহত রেখেছেন। এভাবেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বাংলা প্রবাদের সুবিশাল ভাণ্ডার।

একই বিষয় নিয়ে নানারকম প্রবাদ রচনার নিদর্শন রয়েছে। এখানে 'পর' কথাটি নিয়ে প্রচলিত কতগুলো প্রবাদ উল্লেখ করা হল :

১. পরের ওপর ভাত খায়, আঠার মাসে বছর যায়।
২. পরের খাই, ঘরের গাই।
৩. পরের ঘর, ছিপ ফেলতেও ডর।
৪. পরের ঘরে আগুন দিয়ে টিকে ধরানো।
৫. পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা।
৬. পরের ঘোল খাবার লোভে নিজের গোঁফ কামানো।
৭. পরের চোখে পথ চলা।
৮. পরের মুখে ঝাল খাওয়া।
৯. পরের জন্য গর্ত খোঁড়ে, আপনি তাতে মরে পড়ে।
পরের জন্য ফাঁদ পাতে, আপনি পড়ে মরে তাতে।
১০. পরের দুধে দিয়ে ফুঁ, পুড়িয়ে এলাম নিজের মুখ।
১১. পরের ধন আপন ছালা—যত ইচ্ছে ভরে ফেলা।
১২. পরের ধন নিজের আয়ু—কেউ দেখে না কম।
১৩. পরের ধনে পোদ্দারি।
১৪. পরের পিঠে বড় মিঠে।
১৫. পরের ভাত পাতে পাই, কষি খুলে খাই।
১৬. পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা।
১৭. পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে।
১৮. পরের হাতে ধন রেখে যে কয় আছে,
তার ধন তো খেয়ে গেছে বোয়াল মাছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। 'বাংলার লোকসাহিত্য বাঙালির মন, মনন ও সংস্কৃতির প্রসূন।'—এই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ কর।

২। 'ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম সামাজিক কবিতা।'—স্বীকার কর কি?

৩। পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা ইত্যাদি আলোচনা করিয়া দেখাও যে, পল্লীগীতিকাগুলিতে অকৃত্রিম বাঙালি মানস স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে।

৪। 'কি অনুবাদ সাহিত্যে, কি লৌকিক আখ্যানমূলক কাহিনিকাব্যে, কি মুসলমানদের রোমান্সধর্মী সাহিত্য সাধনায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বত্রই লোকসাহিত্যের উপাদান ছড়াইয়া আছে।'—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা হইতে নিদর্শন উল্লেখ করিয়া এ উক্তির সারবত্তা নির্ণয় কর।

৫। ময়মনসিংহ গীতিকার বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দেশ কর এবং নারী চরিত্র উপস্থাপনে কবিদের কৃতিত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়
কবিওয়ালা ও শায়ের

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল পরিসরের একেবারে শেষ পর্যায়ে কবিগান ও পুঁথি সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছিল। এদেশে ইংরেজ শাসন সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষাদীক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে হিন্দুদের মধ্যে কবিগান ও মুসলমানদের মধ্যে পুঁথি সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে।

মধ্যযুগের পরিধি ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত বলে বিবেচনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৭৬০ সালে এই যুগের সর্বশেষ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান ঘটে। কাব্যের শিল্পগত বৈশিষ্ট্য কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে যে ঐশ্বর্য সহযোগে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল তাতে বিস্ময়কর আকর্ষণীয়তা থাকলেও পরবর্তীকালে তা অনুসরণের কোন উদ্যোগ দেখা যায় নি। বরং এই সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে শূন্যতা বিরাজ করছিল—তখন উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সাহিত্য-নিদর্শন সৃষ্টি হয় নি। পক্ষান্তরে এই সময়ে হিন্দুসমাজে কবিগানের রচয়িতা কবিওয়ালা এবং মুসলমান সমাজে মিশ্র ভাষারীতির পুঁথিরচয়িতা শায়েরগণের আবির্ভাব ঘটে।

অবক্ষয় যুগ

ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর থেকে আধুনিকতার যথার্থ বিকাশকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সময়ের বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টির স্বল্পতা, রচনার পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে এই পর্যায়কে একটা স্বতন্ত্র যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারও কারও মতে এই যুগের পরিধি ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সাল, অর্থাৎ কবি ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব-পূর্বকাল পর্যন্ত নির্ধারণ করার পক্ষপাতী। মধ্যযুগের শেষ আর আধুনিক যুগের শুরুর এই সময়টুকুকে 'অবক্ষয় যুগ' বলা হয়েছে। মধ্যযুগের উজ্জ্বল সাহিত্যসৃষ্টির পরে এই যুগে শিথিল ভাবালুতা, অশিষ্ট কাব্যালাপ, অশ্লীল রসপরিবেশনে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে তাকে 'অবক্ষয় যুগ' বলাই সমীচীন। ড. আনিসুজ্জামান এ সময়কে সাহিত্যের সংকটময় বিপর্যস্ত অবস্থা বিবেচনা করে ক্রান্তিকাল বলে উল্লেখ করেছেন। সাহিত্য নিদর্শনের ন্যূনতম নমুনা বিবেচনা করে সৈয়দ আলী আহসান এ সময়কে 'প্রায় শূন্যতার যুগ' বলেছেন। কারও কারও মতে এই সময়টা 'যুগ সন্ধিক্ষণ' নামে আখ্যাত হওয়া উচিত। মধ্য ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী এই এক শ বছরের সাহিত্যনিদর্শন বাংলা সাহিত্যের দুই যুগের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করেছে। তখন জাতীয় জীবনে যে দুর্দিনের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সাহিত্যসৃষ্টিতে তার যে প্রতিফলন ঘটেছে তাতে 'অবক্ষয় যুগ' তথা যুগসন্ধিক্ষণের ফসল হিন্দু কবিওয়ালাদের কবিগান আর মুসলমান শায়েরদের দোভাষী পুঁথি।

স্বল্পকালের পরমায়ু নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কবিগানের স্থান। এর রচয়িতাগণের পরিচয় কবিওয়ালা নামে। তাঁরা ছিলেন এক ধরনের অশিক্ষিত স্বভাব কবি। তাঁদের রচিত গান বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল এবং সে সব কবিগান বৈচিত্র্যপূর্ণ শাখা-প্রশাখায় রূপ লাভ করে। কবিওয়ালারা যে সকল কবিগান রচনা করতেন তার বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক, সামাজিক বা সমসাময়িক ঘটনা। এ ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়াবলম্বনে রচিত এবং সুর সংযোগে গেয় ছড়াগুলোই 'কবিগান' নামে পরিচিত। হিন্দুসমাজের মধ্যেই এই কবিগানের বিশেষ সম্প্রসারণ ও সমাদর ঘটেছিল। সে আমলে পুরনোর শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক অবস্থায় ইংরেজির প্রতি যে প্রীতি দেখা দেয় তাতে সমাজে এক নতুন রূপের সৃষ্টি হয়। এই সমাজের কাছেই কবিগান সমাদৃত হয়েছিল।

অন্যদিকে মুসলমান সমাজে আরবি-ফারসি-হিন্দি-উর্দু মিশ্রিত ভাষারীতিতে এক ধরনের কাব্য রচিত হয়েছিল। সে সব কাব্য 'দোভাষী পুঁথি' বা 'পুঁথি সাহিত্য' নামে পরিচিত। প্রণয়োপাখ্যান, ইতিহাসাশ্রিত কাল্পনিক কাহিনি ইত্যাদি এই ধরনের কাব্যের উপজীব্য। এই কাব্যের রচয়িতাগণ শায়ের নামে পরিচিত ছিলেন। বস্তুতপক্ষে, কবিওয়ালা ও শায়েরগণের সাধনার নিদর্শন বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ পর্যায়কে চিহ্নিত করে রেখেছে।

কবিওয়ালা ও শায়েরদের আবির্ভাব ঘটেছিল আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে। ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে ১৮৬০ সালে আধুনিকতার যথার্থ বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত এই এক শ বছর বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে উৎকর্ষপূর্ণ কোন নিদর্শন বিদ্যমান নেই। এই সময়ের একমাত্র কবি প্রতিনিধি হচ্ছেন ঈশ্বর গুপ্ত। ১৮০০ সালের দিকে কবি হিসেবে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব। তাঁর পূর্ব পর্যন্ত বাংলা কাব্যজগতে অবক্ষয় যুগ চলছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির যে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছিল তার প্রভাবে জাতীয় জীবনের সর্বত্র এক অসুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ বর্তমান ছিল না।

ড. আনিসুজ্জামান ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের অন্তর্বর্তী 'ক্রান্তিকাল' বলে গণ্য করে মন্তব্য করেছেন, 'এই ক্রান্তিকালের বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের যথার্থ পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে কবিওয়ালা শ্রেণির সাহিত্যকর্মীদের প্রচেষ্টায় এবং আরবি-ফারসি শব্দবহুল বাংলায় কাব্যরচনাকারী শায়েরদের সাধনায়। মধ্যযুগ অপসৃত হবার আগেই এই দুই ধারার সূত্রপাত হয়েছিল এবং আধুনিক যুগের উন্মেষের পরও তার অস্তিত্ব অব্যাহত ছিল, তবু এই ক্রান্তিকালই হচ্ছে এই ধারা দুটির যথার্থ বিকাশ লাভের কাল। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলা কাব্যে মধ্যযুগীয় কাব্যাদর্শ পরিবর্তিত হয়েছিল। ফলে 'প্রথানুগত্য ও পরানুকরণের স্রোতে কাব্যের প্রাণবস্তু যায় হারিয়ে, দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে উচ্চ শ্রেণির ভাগ্যবিড়ম্বনার ফলে প্রতিভাবান কবিরা পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হন এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নরুচিবান জনসাধারণের রসপিপাসা নিবৃত্তি করতে যেয়ে কাব্যধারা অধোগতি লাভ করে।' কাব্যের এই প্রকৃতি বিবেচনা করে এ সময়ের পরিধিকে কেউ কেউ অবক্ষয় যুগ বলে

চিহ্নিত করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবকাল ১৮৩০ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই যুগের সীমানা সম্প্রসারিত। এই সময়ে সৃষ্ট কবিগান ও পুঁথি সাহিত্যের মধ্যে বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যহীন, চিন্তাশক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, প্রকাশভঙ্গি স্থূল ও একঘেয়েমি লক্ষ করে কেউ কেউ তাতে অবক্ষয় যুগের সমর্থন পেয়েছেন।

কবিগান ও পুঁথি সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ আঠার শতকের শেষার্ধ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ—এই বিশেষ যুগের ফসল হিসেবে বিবেচ্য। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৭৯৮ সালে লর্ড ওয়েলেসলির গভর্নর হিসেবে আগমন পর্যন্ত 'চল্লিশ বৎসরের বাংলার রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নীতিভ্রষ্ট জীবনের নিশ্ছিদ্র মেঘান্ধকারে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।' বাংলার ভাগ্যাকাশে যে রাজনৈতিক খেলা চলেছিল তার প্রভাব সে আমলের সাহিত্যসৃষ্টিতে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

প্রথম দিকে ইংরেজরা প্রত্যক্ষ ভাবে সমুদয় শাসনব্যবস্থা নিজেদের হাতে না নিলেও বাংলার তথাকথিত নবাবগণ তাঁদের হাতে ক্রীড়নক ছিলেন। ১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ দিল্লির মোগল বাদশাহ্‌র কাছ থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করলেন। কিন্তু দেশ শাসনের ভার রইল নবাবের ওপর। এই দ্বৈত শাসনের ফলে বাঙালি জীবনে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যেই ১৭৭০ সালে (১১৭৬ সনে) ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙালি জীবনকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দেয়। আঠার শতকের শেষ দিকে ইংরেজ গভর্নরেরা শাসনের নামে অবিচার অত্যাচারের প্লাবন বইয়ে দিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় বাঙালি কর্মচারীর স্থলে ইংরেজ নিয়োগের ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের ওপর দারুণ আঘাত আসে। ১৭৯৮ সালে ওয়েলেসলি সাম্রাজ্যবাদী মন নিয়ে শাসন চালাতে শুরু করেন এবং ক্রমান্বয়ে ইংরেজদের শাসন দৃঢ়মূল করতে সক্ষম হন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ক্রমান্বয়ে কলকাতা ইংরেজ শাসনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এবং মুর্শিদাবাদের প্রভাব নিঃশেষিত হয়ে পড়ে। ১৭৯৩ সালে জমিদারি প্রথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তেরা ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকে পরিণত হয়। ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে আঠার শতকের শেষ পর্যায়ে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য এ দেশে হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রবণতা দেখা দেয়। আঠার শতকের দ্বিতীয় ভাগে অর্থনৈতিক দিক থেকে বাঙালি রায়ত ও ভূস্বামীরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তখনকার মধ্যবিত্ত সমাজও বৃত্তিহীন হয়ে শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। দেশীয় শিল্প তখন বিনষ্ট হয়ে গেল, অনেকের জমিদারি বিকিয়ে গেল। ফলে যে অভিজাত সমাজ শিক্ষা-সংস্কৃতির গোষ্ঠিপতি ছিলেন তাদের জায়গায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'অনভিজাত প্রায়-মূর্খ গোমস্তা মুৎসুদ্দির দল উৎকোচের টাকার বিনিময়ে রাতারাতি জমিদার বনে গেল।' এর ফলে পুরানো শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে গেল। রুজি রোজগারের জন্য ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে কৌতুককর বর্ণনা দিয়েছেন : 'বাঙালি বালকেরা তখন বাঙালি শিক্ষকের কাছে কণ্ঠস্থ করছিল :

ফিলজফর-বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান-চাষা,
পামকিন-লাউকুমড়ো, কুকুম্বার-শশা।'

তখনকার সমাজ গঠনে এই শিক্ষা ব্যবস্থাই কার্যকর ছিল। তাদের রুচিও ছিল তেমনি নিম্নমানের।

ইংরেজ শাসন সম্প্রসারণের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধিত হয় মুসলমানদের। প্রথম থেকে ইংরেজরা তাদের সুনজরে দেখে নি। সেনাবাহিনী, রাজস্বব্যবস্থা, শাসনকার্য ইত্যাদি সকল ব্যাপার থেকেই মুসলমানেরা বিতাড়িত হয়। ইংরেজদের দেওয়ানি লাভ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদি ব্যবস্থার ফলেও সকল শ্রেণির মুসলমানের জীবনে দুর্দিন নেমে আসে। ১৮৩৫ সালে রাজভাষা হিসেবে ফারসির মর্যাদা লুপ্ত হলে মুসলমানেরা আরও সঙ্কটের সম্মুখীন হয়।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায়ও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। স্বার্থপর ইংরেজ বণিকদের পক্ষপাতী আচরণের ফলে প্রথমে দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, পরে এ দেশের যাবতীয় শিল্প প্রচেষ্টা সমূলে বিনষ্ট হয়। কর্নওয়ালিসের সময়ে উচ্চপদ থেকে বাঙালি বিতাড়ন শুরু হলে বাঙালিদের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। মুসলমানেরা ইংরেজদের কাছ থেকে কোন প্রকার সহানুভূতি লাভ করতে না পেরে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজদের শাসনের প্রথম দিকে যে অভিজাত সম্প্রদায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির গোষ্ঠীপতি ছিলেন তাঁদের স্থলে কোম্পানির অনভিজাত প্রায়-মূর্খ গোমস্তা-মুৎসুদ্দির দল অসদুপায়ে উপার্জিত অর্থের বিনিময়ে রাতারাতি জমিদার হয়ে গেল। কলকাতা তখন ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে এক শ্রেণির লোকের আর্থিক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। সে আমলে 'এই সমস্ত মূঢ় মূর্খ অলস লম্পট অর্থগৃধ্নু অত্যাচারীরাই কলকাতা ও গ্রামবাংলার জনসমাজের হর্তাকর্তাবিধাতা হয়ে বসলেন।' সামাজিক জীবনে তখন নৈতিক আদর্শের অবনতি ঘটেছিল। তখন চারদিকে শঠতা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, লোভ-লালসার মত্ততা। নীতি, চারিত্র্য, মনুষ্যত্ব জীবনের মহত্তর আদর্শ তখন ধুলায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে প্রশ্ন তুলেছেন—'অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কে বুঝতে পেরেছিল যে, অস্বাস্থ্যের কেন্দ্র, নৈতিক আদর্শহীন পূতিগন্ধময় নরকসদৃশ কলকাতা ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে অঘটনঘটনপটিয়সী নায়িকারূপে আবির্ভূত হবে?'

শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে এই অধঃপতিত সামাজিক অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'এই সময়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে একশ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসি ও স্বল্প ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ-আকড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনা-দিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাটাইত।' এই অসুস্থ পরিবেশেই কবিওয়ালাদের আবির্ভাব ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ইংরেজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির

আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক-সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।'

দীর্ঘদিন পর্যন্ত কবিগান শিক্ষিত-অশিক্ষিত ইতর-ভদ্র সকল মহলেই জনপ্রিয় ছিল। গান হিসেবেই কবিগানের যথার্থ মর্যাদা। এ কবিগান গানের মতই আশু-আনন্দের নগদবিদায়ের দাক্ষিণ্য পেয়েছে। তাই গান ছাড়া বিশুদ্ধ কাব্যানন্দ এর ফলশ্রুতি নয়। তবে কবিওয়ালা এবং তাঁদের বাঁধনদারদের মধ্যে কারও কারও কলমে কদাচিৎ কবি প্রতিভার স্পর্শ ছিল। তখন তাঁদের রচিত গানে সূক্ষ্ম কারুকাজ ও গীতিপ্রবণতার আমেজ ফুটে উঠত। এ কারণে কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে কবিগানের প্রবেশাধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর এই প্রবেশাধিকারের সঙ্গে জড়িত আছে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও আঙ্গিকের কলাচাতুর্য।

সাহিত্যক্ষেত্রে শূন্যতার পটভূমিকায় কবিওয়ালদের উদ্ভব। মধ্যযুগের সাহিত্যের ধারা ততক্ষণে ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তার ঔজ্জ্বল্য এই সময়ে একেবারেই ম্লান হয়ে পড়েছে, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও সাহিত্য তখন বঞ্চিত। পেশাদার বৃত্তি হিসেবে কাব্যচর্চা গ্রহণপূর্বক কবিয়াল এবং পুঁথিকার উভয়েই লোকমনোরঞ্জক সস্তা ভাবের হালকা রসের ও কদর্য যৌনরুচির আমদানি করে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ঐশ্বর্যমণ্ডিত উজ্জ্বল চূড়ায় দীনতার চিহ্ন লেপে দিলেন। যে গ্রামীণ সমাজ ইংরেজ আগমনের পূর্বে সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিল তা এই সময়ে পরিবর্তিত হয়ে কলকাতা ও ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলের এক নতুন সমাজের ওপর ন্যস্ত হল। এখানকার নতুন জীবনতরঙ্গের সঙ্গে তৎকালীন সাহিত্যের এই নিদর্শন বিজড়িত হল।

মুসলমান সমাজ ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। উপরন্তু ইংরেজদের প্রতি তাদের একটা অসহযোগ মনোভাব বিদ্যমান থাকায় সমকালীন জীবনধারা থেকে তারা দূরে রয়ে গেল। রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাচ্যুত, অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত, ইংরেজি শিক্ষাসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন মুসলমান সমাজ এক অতীতমুখী মনোভাব নিয়ে দোভাষী পুঁথির চর্চায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল। এমনকি তারা ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষার গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ না করে অন্ধ ভাবাবেগে ইসলামি পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করে। কবিগানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'কবিগানের মধ্যে রসের সম্ভোগ ও বুদ্ধির চমক অনেক সময়ে এমন বিস্ময় সৃষ্টি করে যে, প্রায়-অশিক্ষিত কবিওয়ালা ও বাঁধনদারদের প্রশংসা না করে পারা যায় না।...ফেরিওয়ালারা উদরান্ন সংগ্রহের জন্য সস্তা দামের চটকদারী ঠুনকো মাল দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করে। কবিওয়ালারাও জীবিকার জন্য কবিগানকেই বেছে নিয়েছিলেন। শিল্পের সঙ্গে উপযোগিতা বা জীবিকার প্রত্যক্ষ যোগ ঘটলে মানসিক সৃষ্টি প্রবাহ তখন বাইরের বস্তুগত হেতুবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে স্বাভাবিকতা ও স্বতোৎসারিতা হারিয়ে যায়। কবিওয়ালাদের সম্পর্কে এ কথা পুরোপুরি প্রযোজ্য।'

কবিওয়ালা ও শায়েরগণ আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যের শূন্য অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি করতে সক্ষম না হলেও সে সময়কার জনসাধারণের কিছুটা তৃপ্তিদানে সক্ষম হয়েছিলেন। বাঙালির অধঃপতনের দিনে মানসিক বিপর্যয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের সুযোগে নিম্নরুচির জনগণের রসপিপাসা নিবৃত্তির জন্য এই সব সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস চলেছিল। অর্থনৈতিক বিভ্রান্তিতে মানুষ অবসর মুহূর্তের আত্মতৃপ্তির জন্য এ সব কাব্যসৃষ্টির সমাদর করেছে।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের সৃষ্টি হয়েছিল তা ত্যাগ করে বাংলা সাহিত্য নেমে এল কুলীন-ব্রাত্য, ধনী-নির্ধন, রসিক-অরসিক সর্বসাধারণের মধ্যে। কবিওয়ালা ও শায়েররা কাব্যচর্চাকে পেশাদার বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে লোকমনোরঞ্জনের জন্য সস্তা ভাব, হালকা রস ও কদর্য যৌনরুচির আমদানি করতে হয়। বাউলেরা সমাজ থেকে দূরে অবস্থান করে দেহবাদী গুহ্যসাধনতত্ত্বের গানে মগ্ন থাকত। সেখানেও এল অশ্লীলতার ছাপ। মুসলমান সমাজজীবনের পরাজিত হতাশ্বাস ও বঞ্চিত আশা-আকাঙ্ক্ষার বেদনাজনিত অনুভূতি পুঁথিসাহিত্যের উদ্ভবের পেছনে কাজ করেছে। কবিওয়ালারা অনুজ্জ্বল প্রতিভা নিয়ে পরিচর্যাহীন শিল্পকর্মের যে নিদর্শন দেখালেন তাতে বিলাসী ভোগাসক্ত শ্রোতার মনোরঞ্জনে সক্ষম হলেও তা ছিল অশ্লীলতা, অপরিমিত বাচালতা ও ভঙ্গিসর্বস্বতার লক্ষণাক্রান্ত।

কবিগান

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল থেকে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনকাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের সাহিত্যজগৎ কবিগানের জগৎ। অর্থাৎ আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এই কবিগানের রচয়িতা কবিওয়ালাদের কাল। ড. সুশীলকুমার দের মতে সতের শতকে কবিগানের সন্ধান মিললেও কবিগানের বিশেষ গৌরবের যুগ ১৭৩০ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত।

কবিগান দুই পক্ষের বিতর্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হত। দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতাই এর বৈশিষ্ট্য। একদল যে বিষয়ে গান (চাপান) গাইবে সে গান শেষ হলে অপর দল তার গান (উতোর) গাইবে। গান রচনা ও গাওয়াতে যে দল উৎকৃষ্টতর প্রতিপন্ন হবে তারাই বিজয়ী হবে। উপস্থিত বুদ্ধিতে মুখে মুখে তৈরি করে কবিতায় উত্তর দিতে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য এই শ্রেণির গানে পরিলক্ষিত হয়। দর্শকের মনে সাময়িক পরিতৃপ্তির ভাব সৃষ্টি করার জন্য কবিগানে অনুপ্রাস-যমক-অলঙ্কারবহুল ভাষা ব্যবহৃত হত। কবিগানের সার্থকতা নির্ভর করে এর রসসৃষ্টির ওপর। বাক ও সুর—এই উভয়ের ওপর নির্ভর করে শ্রোতার অন্তর জয় করাই কবিগানের কলাবিধির যথার্থ শিল্পকর্ম। তরজা, ঝুমুর, আখড়াই, হাফ আখড়াই প্রভৃতি কবিগানের প্রকারভেদ। কবিগানের চারটি বিভাগ : ক. বন্দনা বা গুরুদেবের গীতি, খ. সখীসংবাদ, গ. বিরহ এবং ঘ. খেউর। প্রত্যেক বিভাগে ধূয়া ও চিতান বা পরধূয়া সহ একটি প্রধান গান এবং দুতিন চরণের একটি ছোট গান থাকত। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শান্তিপুরকে কবিগানের জন্মস্থান বলে নির্দেশ করেছেন। শান্তিপুর থেকে হুগলি চুঁচুড়ার পথ বেয়ে কবিগান কলকাতার নগরজীবনে নিজের স্থান করে নিয়েছিল।

কবিগানের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ। এক শ্রেণির গান ভবানীবিষয়ক। এই শ্রেণির গানে দেবীবন্দনা এবং সেই সঙ্গে 'সপ্তমী' বা উমা-মেনকা-সংক্রান্ত আগমনীবিষয়ক গান স্থান পেত। অপর এক শ্রেণির গান ছিল সখীসংবাদ। এগুলো ছিল রাধাকৃষ্ণবিষয়ক। রাধাকৃষ্ণের বিরহমিলন, কৃষ্ণের মথুরায় প্রস্থান, বৃন্দাবন-বিস্মৃতি, সখীদের মথুরায় গিয়ে রাধার শোচনীয় অবস্থা জ্ঞাপন এবং কুব্জানুরাগের জন্য কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা ইত্যাদি বৈষ্ণব পদাবলির মিলন, মাথুর প্রভৃতি পর্যায়ের ওপর ভিত্তি করেই সখীসংবাদ শ্রেণির গান রচিত। বিরহ পর্যায়ের গানে রাধাকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই, বরং সাধারণ নরনারীর বিরহবেদনা এখানে মানবীয় রসরূপ লাভ করেছে। খেউর শ্রেণির গানে কোন পৌরাণিক আখ্যান বা চরিত্র সরস, কৌতুকপ্রবণ, আদিরসাত্মক ঢঙে প্রশ্নের আকারে পরিবেশন করা হত। খেউরে অশ্লীল, অভব্য ঠাট্টাবিদ্রূপ চলত এবং এর জন্যই প্রধানত কবিগানের বদনাম ছিল। তবে খেউর গানে অশ্লীলতা, অভব্যতা ও অশালীন গ্রাম্যতা থাকলেও অনেক স্থলেই রচনাভঙ্গিমা, ভাবাবেগ ও আবেদনের নির্ভেজাল ঐকান্তিকতারও অভাব ছিল না। মনে রাখা দরকার যে, কবিওয়ালারা মূলত ছিলেন গায়ক, তাঁরা অর্থের বিনিময়ে জনমনোরঞ্জন করতেন। সে আমলের রুচির কথাও তাঁরা অস্বীকার করতেন না। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিগানের কালবিভাগ করেছেন এভাবে :

প্রথম পর্ব : আঠার শতকের পূর্ব যুগ।

দ্বিতীয় পর্ব : আঠার শতকের গোড়ার দিকে থেকে ভারতচন্দ্র বা তাঁর কিছু পরবর্তীকাল পর্যন্ত।

তৃতীয় পর্ব : আঠার শতকের শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত।

চতুর্থ পর্ব : উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ।

উপসংহার পর্ব : বিশ শতকের গোড়ার দিক।

কবিগান বিশেষ আঙ্গিকে রচিত ও গীত হত। ঈশ্বর গুপ্ত কবিগানের সংগ্রহে চিতেন-মহড়া-অন্তরার উপবিভাগ দেখিয়েছেন। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ' সংকলনে আরও অনেক উপবিভাগ নির্দেশ করেছেন। কবিয়াল রাম বসুর একটি বিরহ গানের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন উপবিভাগসহ উদ্ধৃত হল :

১ চিতান ॥ বালিকা ছিলাম, ছিলাম, ভালই ছিলাম সই—ছিল না সুখ-অভিলাষ।
১ পরচিতান ॥ পতি চিনতাম না, ও-রস জানতাম না, হৃদপদ্ম ছিল অপ্রকাশ।
১ ফুকা ॥ এখন সেই শতদল মুদিত কমল, কাল পেয়ে ফুটল।
পদ্মের মধু পদ্মে রেখে ভৃঙ্গ উড়ে গেল।
১ মেলতা ॥ একে মদনের পঞ্চশর, প্রাণনাথের বিচ্ছেদশর,
দুই শরে সারা হল যুবতী,
মহড়া ॥ আমার কুলের নাশক হল রতিপতি,
আমার প্রাণনাশক হল প্রাণপতি,
আমি অবলা বই ত নই, কি করি বল সই,
হয়েছি বিচ্ছেদে নূতন ব্রতী॥
খাদ ॥ উভয়সঙ্কটে পড়ে গো সই, হল একি দুর্গতি।

২ ফুকা ॥ ও তার নামটি মদন, গঠন কেমন দেখতে পাইনা চোখে,
ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ যেমন বাণ মারে কোথা থেকে।
২ মেলতা ॥ একে অর্ধরথী নারী, তার সঙ্গে কি পারি,
তাতে নাই আমার যৌবনরথের সারথি।
অন্তরা ॥ পোড়া মদন ত তাও সই বুঝে না।
দেখে অবলা নারী তাতে যুবতী।
আপন পতি হয়ে যদি বুঝলে না বেদনা,
২ চিতান ॥ জ্বালালে পতি হয়ে যদি নারীর প্রাণ,
দোষ কি দিব মদনে?
২ পরচিতান ॥ ঘুচে সব জ্বালা জুড়ায় অবলা,
ত্যজিলে এ পাপ-জীবনে।
৩ ফুকা ॥ পোড়া যৌবন গেল, জীবন গেলে
প্রাণ জুড়ায় গো সখি।
নইলে জ্বালা জুড়াবার আর উপায় না দেখি।
৩ মেলতা ॥ আমার কুল রক্ষে, মান রক্ষে, সমভাবে দু পক্ষে,
পাছে বিপক্ষে বলে আবার অসতী ॥

কবিওয়ালারা তৎকালীন বিশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থায় যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কবিগান সাধারণের জন্য সাধারণ সুরে সাধারণ পরিবেশে বিস্তার লাভ করেছিল। এই সব কবিতায় রাধাকৃষ্ণের লীলাখেলার অন্তরালে মানব জীবনের সুখদুঃখ, ব্যথাবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিগানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'এ গান একই সঙ্গে গ্রাম্য গান, আবার নাগরিক শিল্প; লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত আবার ভব্য সাহিত্যেরও আত্মীয়; গীতাত্মক আবার কবিতাত্মক; দেবদেবীর লীলারসে পূর্ণ, আবার বাস্তব জীবনের রঙ্গরসে উতরোল; কখনও বিশুদ্ধ ভক্তির গান, কখনও মানবীয় প্রীতিরসে পূর্ণ; কখনও সুস্নিগ্ধ মহত্ত্বব্যঞ্জক, কখনও অতি জঘন্য ইতরতায় পর্যুসিত। এর মূল গ্রামবাংলায়, কিন্তু শাখাবিস্তার শহরে। এর রচনাকার ও গায়ক কখনও বর্ণজ্ঞানহীন অন্ত্যজ ব্যক্তি, কখনও সুশিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়। এর ভাষায় ও রচনায় কখনও নিপুণতা, ছন্দে দক্ষতা; কখনওবা হানিকর অজ্ঞতা, উদাসীন অবহেলা, অশিষ্ট ভাঁড়ামি ব্যাকরণ অভিধানের মুণ্ডপাত।' অনেক কবিওয়ালা নিজের সঙ্গীতরচনার অক্ষমতার জন্য বাঁধনদারের কাছ থেকে গান তৈরি করিয়ে আনতেন। তাই কবিগানের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কবিওয়ালাদের চেয়ে তাঁদের রচনাকার ও বাঁধনদারদের কৃতিত্বই সমধিক বিচার্য। কবিগান জনসমক্ষে গাওয়া হত। গানের সুরে তালে অনেক সময়ে ছন্দের ত্রুটির কথা মনে থাকত না বা কানে ধরা পড়ত না।

কবিগান বিশেষ যুগে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল পর্যায়ের মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। গান হিসেবে এগুলোর মর্যাদা এবং সে কারণে আশু আনন্দের নগদবিদায়ে ঘটে এর পরিসমাপ্তি। বিশুদ্ধ কাব্যানন্দ কবিগানের ফলশ্রুতি না হলেও কবিওয়ালাগণ কখনও কখনও গানের ছড়ার মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য ও গীতিপ্রবণতা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্য সাহিত্যে স্বীকৃতি পেয়েছে কবিগানের প্রবেশাধিকার।

কবিওয়ালাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : গোঁজলা গুঁই, ভবানী বেনে, রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি, শ্রীধর কথক, নীলমণি পাটনী, বলরাম বৈষ্ণব, রামসুন্দর স্যাকরা প্রমুখ। বিশিষ্ট কবিওয়ালাদের কিছু সংখ্যক শিষ্যও কবিগানে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কবিওয়ালাগণের মধ্যে কয়েকজন অভিজাত শ্রেণির ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ এসেছিলেন সমাজের নিম্নপর্যায় থেকে।

গোঁজলা গুঁই

গোঁজলা গুঁই কবিওয়ালাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরানো বলে জানা যায়। তিনি কবিগানের আদিগুরু বলে পরিচিত। কবি ঈশ্বর গুপ্ত গোঁজলা গুঁই সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তা থেকে ধারণা করা যায় যে, তিনি ১৭০৪ থেকে ১৭১৪ সালের মধ্যে জীবিত ছিলেন। তাঁর গান থেকেই ঈশ্বর গুপ্ত কবিগানের প্রথম সূচনা ধরেছেন। তিনি ক্ষমতাবান শিল্পী ছিলেন। তাঁর একটি গান :

এসো এসো চাঁদবদনি।
এ রসে নিরসো কোরো না ধনি ॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ, তুমি আমার রতনমণি ॥
তোমাতে আমাতে একই কায়া আমি দেহপ্রাণ, তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া, মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।

তাঁর গানের যে অল্প কয়টি নমুনা পাওয়া গেছে তাতে তাঁকে ক্ষমতাবান শিল্পী হিসেবে মনে করা চলে। তাঁর তিন জন শিষ্য লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস ও রামজীবন দাস উল্লেখযোগ্য কবিওয়ালা ছিলেন।

ভবানী বেনে

ভবানী বেনে কবিগানের মাধ্যমে খ্যাতি ও অর্থ দুই-ই অর্জন করেছিলেন। সঙ্গীতকুশলতার জন্য তিনি সে যুগে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করতে সক্ষম হন।

রাসু-নৃসিংহ

স্বল্পসংখ্যক গানের জন্য রাসু-নৃসিংহ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রাসু (১৭৩৫-১৮০৭) ও নৃসিংহের জন্ম চন্দননগরে। তাঁরা কবিগানের দল তৈরি করে কলকাতার ধনীগৃহে গান শোনাতেন। সখীসংবাদ ও বিরহ পর্যায়ের গানে তাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রেমানুরাগকে তাঁরা 'কবিওয়ালাদের ইতর কচকচি থেকে উদ্ধার করে হৃদয়াবেগকে সমুন্নত আদর্শলোকে স্থাপন করেছেন।' রাসু-নৃসিংহ ভ্রাতৃদ্বয় একত্রেই কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন।

হরু ঠাকুর

হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮১২) নামে পরিচিত হরেকৃষ্ণ দিঘাড়ী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মহারাজ নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি নিজে ছিলেন রচনাকার, সুরশিল্পী ও গায়ক। কবিওয়ালা হিসেবে তিনি ব্যাপক

প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্তের মতে হরু ঠাকুর ভবানীবিষয়ক,সখীসংবাদ, বিরহ, খেউর প্রভৃতি সকল প্রকার গানেই নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। মানবীকরণের মাধ্যমে হরুঠাকুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। নায়িকার কুটিল চরিত্র চিত্রণের পরিচয় মিলে তাঁর গানে। যেমন :

বুঝেছি মনেতে, রমণীর প্রেম কেবল ধন।
মিছিমিছি সে মিলন।
তাদের ধন লয়ে কথা পিরীতি বা কোথা
কা কস্য পরিবেদন ॥
যদি হৃদয় চিরে প্রাণ নারীরে কর সমর্পণ।
তবুও কেমন চরিত, তাহে কদাচিত
নাহি পাওয়া যায় মন ॥
রূপে কামসদৃশ পুরুষ অর্থহীন যদি হয়।
সেই রসিক জনে নারী নয়নে না ফিরে চায় ॥
অতি নীচ যদি হয়, নিত্য ধন দেয়,
যেচে তারে সঁপে যৌবন।
তাহে কুৎসিত কুজনা নাহি বিবেচনা
স্বকার্য করে সাধন ॥
যার স্বামী অকৃতী তাকে সে যুবতী
নাহি করে মান্যমান।
বলে ধিক ধিক পিতামাতারে, এমন দরিদ্র দিয়েছেন দান।
যদি কপাল গুণে পুনঃ সে জনে
অর্থ করে উপার্জন।
তখন হেসে কয় যুবতী, পেয়েছি এ পতি,
করে হর আরাধন ॥

কেষ্টা মুচি

কেষ্টা মুচির প্রকৃত নাম ছিল কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার। কবি হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। সম্ভ্রান্ত লোকেরাও তাঁর গান শুনতে ভালবাসতেন। তিনি একজন ভাল বাঁধনদার ছিলেন। বড় কবিওয়ালারাও তাঁর কাছ থেকে গান সংগ্রহ করতেন।

নিতাই বৈরাগী

নিতাই বৈরাগী বা নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী (১৭৫৪-১৮২১) কবিওয়ালা হিসেবে সারা দেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং প্রচুর অর্থোপার্জনও করতে সক্ষম হন। বৈষ্ণব কাহিনি ও পুরাণাদিতে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল। সকল শ্রেণির শ্রোতার মনোরঞ্জনের ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি দক্ষ কবিওয়ালা হলেও রচনাকার হিসেবে বিশেষ কৃতী ছিলেন না, গৌর কবিরাজ ও নবাই ঠাকুরের কাছ থেকে গান নিতেন। নিতাই বৈরাগী যেমন সখীসংবাদ, মাথুর ও বিরহের গানে মার্জিতরুচির ভদ্রলোকদের তৃপ্তি দিতে পারতেন, তেমনি আবার প্রয়োজন হলে সাধারণ শ্রোতার মনোরঞ্জনে মোটা

সুরের খেউর ধরতে কুণ্ঠিত হতেন না। তাই সমাজের সর্বস্তরে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁর একটি গানের কিছু অংশ :

মহড়া ॥ প্রেয়সি, তোমার প্রেমধার, আমি শুধিলে কি তাহা শুধিতে পারি।
এমতি মনেতে কেন ভাবো সুন্দরি ॥
তুমি যে ধনো খাতকে, দিয়েছ করজো, পরিশোধে তাহা পরানে মরি
চিতেন ॥ মন বাঁধা রেখে, তোমারো স্থানে, লইলাম প্রেমো করজো করি।
সে ধারো উদ্ধারো হইবে কেমনে, লাভে মূলে হলো দ্বিগুণো ভারি।

রাম বসু

আধুনিক মানসিকতায় লালিত বলে রাম বসু বা রামমোহন বসুর (১৭৮৬-১৮২৮) গানে আধুনিক জীবনের কিছু পরিচয় বিদ্যমান। তিনি অল্প বয়সেই কবিগান রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন; বস্তুত পুরাতন যুগের কবিগানের তিনিই শেষ এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁর কৈশোর কালেই সে যুগের প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভবানী সেন অনেক সাধ্যসাধনা করে গান নিতেন। পরে রাম বসু নিজেই দল করেন। রাম বসু থেকেই কবির লড়াই অকৃত্রিম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়। সব বিষয়েই তিনি গান রচনা করতেন, তবে আগমনী ও বিরহ গানেই তাঁর সবচেয়ে বেশি খ্যাতি ছিল। মানবমুখী বাস্তবতা তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য। তাঁর গানের প্রধান সুর হচ্ছে নায়কের বিরহে বঞ্চনায় প্রত্যাখ্যানে নায়িকার আর্তি। এমনি একটি গানের নিদর্শন :

মনে রৈল সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হল না।
মরমে মরমে কথা কওয়া গেল না ॥

যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জ রমণী বোলে, হাসিত লোকে,
সখি, ধিক থাক্ আমারে, ধিক সে বিধাতারে
নারীজনম যেন করে না।

যজ্ঞেশ্বরী

স্ত্রী-কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বরী কবিগান রচনা করতেন এবং নিজে কবির দল তৈরি করে পুরুষ-কবিওয়ালাদের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করতেন বলে জানা যায়। কোন কোন কবিওয়ালা তাঁর কাছ থেকে গান নিতেন। তিনি কবি প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর রচনায় নারীর মনোব্যথা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে তির্যক ব্যঙ্গের অম্লাক্ত রসসহ পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর গানের একটি নমুনা :

১ চিতান ॥ কর্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান;
১ পরচিতান ॥ হেরে মুখ, গেল দুখ, দুটো কথার কথা বলি প্রাণ।

১ ফুকা ॥ আমার বন্দী করে প্রেমে, এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে,
দিয়ে জলাঞ্জলি দিয়ে আশ্রমে।
১ মেলতা ॥ আমি কুলবতী নারী পতি বই আর জানিনে,
এখন অধীনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও।
মহড়া ॥ ঘরের ধন ফেলে প্রাণ, পরের ধন আগুলে বেড়াও।
নাহি চেন ঘর-বাসা, কি বসন্ত, কি বরষা,
সতীরে করে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও।
খাদ ॥ রাজ্যে থেকে ভার্যের প্রতি কার্য না কুলাও ॥
২ ফুকা ॥ তোমার মন হলো বার বাগে, গেল জন্মটা ঐ পোড়া রোগে,
আমার সঙ্গে দেখা দৈবার্থ যোগে।
২ মেলতা ॥ কথা কহিছ আমার সনে, মন রয়েছে সেখানে, প্রাণ,
মনে কর সখা, পাখা হলে উড়ে যাও ॥

ভোলা ময়রা

ভোলা ময়রা কবিওয়ালা হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। মিষ্টান্ন তৈরি তাঁর পেশা হলেও কবিগানকে নেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁর চটকধারী জবাবের জন্যই তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ভোলা ময়রার প্রকৃত নাম ভোলানাথ নায়ক। জাতিবৃত্তিতে মোদক। কলকাতার বাগবাজারে তিনি ময়রার দোকান করেছিলেন। তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় যৎসামান্য বাংলা শিখেছিলেন। অল্পবয়সেই গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞদের সান্নিধ্যে এসে কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি ছিলেন হরু ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য। বিদ্যা না থাকলেও তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ রসবোধ ছিল, প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে তিনি দক্ষ ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'বাংলা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, হুতোম প্যাঁচার ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।' একটি গানে ভোলা ময়রা তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন :

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা
(ওগো) সর্দিগর্মি নাহি মানি।
ফুরাইলে বার মাস ষড়ঋতুর হয় নাশ,
(ওগো) কেবল এই কথাটি জানি ॥
শীত এলে লেপ লই গম্মি এলে ঘোল মই,
যাহা কিছু হাতে আসে কবির নেশায় দিই ঢালি।
শরতে হেমন্তে বৈশাখে বসন্তে
ভোলার খোলা নাহি খালি ॥
কালো মেঘে বর্ষাকালে বক উড়ে দলে দলে
ময়ূরের পেকমের বাহার।
ষড়ঋতু বার মাসে মাঘের মেঘের শেষে
পেটের দায়ে জাতির ব্যাপার ॥

নহি কবি কালিদাস বাগবাজারে করি বাস
পূজো এলে পুরিমিঠাই ভাজি।
বসন্তের কুহু শুনে ভক্তিচন্দন সনে
মনফুল রামচরণে করি বাজি ॥
তবে যদি কবি পাই হঠে কভু নাহি যাই
হোক বেটা যতই মন্দ।
জাহাজ ডোঙ্গা সোলা নাও যাহাতে মিলাইয়া দাও
ভোলা নহে কিছুতেই জব্দ ॥

ড. দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, 'ভোলার যে সমস্ত গান প্রসিদ্ধ সেগুলি এন্টনি সাহেব অথবা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে কুরুচিপূর্ণ গালাগালি। ভোলার নির্ভীকতার কিংবা প্রগলভতার সীমা ছিল না। দেশের বড় ভূস্বামীদের সম্মুখে অম্লানবদনে নিঃসঙ্কোচে ভোলা অশ্লীল খেউড়ের সহিত এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকেও দুকথা শুনাইয়া দিত।'

এন্টনি ফিরিঙ্গি

এন্টনি ফিরিঙ্গি জাতিতে পর্তুগিজ খ্রিস্টান হলেও বিধবা ব্রাহ্মণী বাঙালিনী বিয়ে করে বাঙালি হয়ে যান। তিনি সম্ভবত আঠার শতকের শেষভাগে ফরাসি অধিকৃত ফরাসডাঙায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৬ সালে মারা যান। প্রথম দিকে সখের কবিওয়ালা হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও পরে তিনি পেশাদার কবিওয়ালায় রূপান্তরিত হন। তাঁর রচনায় ভক্ত বাঙালির মানসিকতা গভীর ছায়াপাত করেছে। একবার ভোলা ময়রা এন্টনি সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

সাহেব মিথ্যে তুই কৃষ্ণ পদে মাথা মুড়োলি
ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চুনকালি।

এন্টনি তখন জবাব দেন :

খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিন্তু ভিন্ন নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই ॥
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে
—আমার মানবজনম সফল হবে যদি রাঙা চরণ পাই।

নিধু বাবু

কবিগানের সমসাময়িককালে কলকাতা ও শহরতলীতে টপ্পাগান নামে রাগ-রাগিণীসংযুক্ত এক ধরনের ওস্তাদি গানের প্রচলন ঘটেছিল। হিন্দি টপ্পাগান এর আদর্শ। বাংলা টপ্পাগানের জনক ছিলেন নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯)। তাঁর নাম এক সময় বাঙালি সঙ্গীত-রসিক-সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হত। টপ্পা থেকেই আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সূত্রপাত বলে অনেকের ধারণা। নিধু বাবুর প্রতিভার স্পর্শে

এই টপ্পাগান বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই গানে সঙ্গীতকলা ও কবিত্বের কোন অভাব ছিল না। টপ্পাগানে রাধাকৃষ্ণের নাম উল্লেখ থাকলেও তার অধিকাংশই লৌকিক প্রেমের গীত। ড. তারাপদ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, 'নিধুবাবুর টপ্পার প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার মননশীলতা। এই মননশীলতা তাৎকালিক নাগরিক জীবনের ফল। এইখানে টপ্পা আধুনিক। ইহা প্রেমের কবিতা বটে, কিন্তু ভাবসর্বস্ব সরল ও কোমল কবিতা নহে। ইহা জটিল চিন্তায় সবল এবং বুদ্ধির দ্বারা সুসংহত। আধুনিক মনের কবি বলিয়া নিধুবাবুর দৃষ্টিও রিয়ালিস্টিক—তাঁহার কবিতা প্রাচীন রোমান্টিক মনোবিলাসের প্রবল প্রতিবাদ।' তাঁর একটি গান ভাষা বন্দনার চমৎকার নিদর্শন :

নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষে পুরে কি আশা ॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ॥

টপ্পাগানের ক্ষেত্রে কালী মির্জা ও শ্রীধর কথক খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

দাশরথি রায়

কবিগানের যুগে পাঁচালী গান নামে এক ধরনের গান প্রচলিত ছিল এবং এই ধারায় দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৭) শক্তিশালী কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। 'দাশু রায়' নামে তিনি খ্যাত ছিলেন। বর্ধমানরাজের অধীনে বাঁদমুড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি নিজেই পাঁচালীর দল বেঁধে গান গাইতেন। তাঁর পাঁচালী-পালা দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে পাঁচালী রচনার সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক বিষয় নিয়েও গান রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, মঙ্গলকাব্যের পালা ও বিভিন্ন পৌরাণিক লীলা অবলম্বনে পালা রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সামাজিক ব্যাপারে নকশা রচনায়ও দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক ও তত্ত্বসঙ্গীতও রচনা করেছেন। তাঁর লৌকিক পালায় তৎকালীন কলকাতা ও গ্রাম্যসমাজের চিত্র পাওয়া যায়। দাশরথি রায়ের আবির্ভাবের পরবর্তী দেড় শ বছর কবিত্ব ও রচনানৈপুণ্যের জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছড়িয়েছিল। ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'যমক-অনুপ্রাসের গুঞ্জনের ও সুরের সহজ লালিত্যের জন্য দাশরথির গান সর্বত্র সমাদৃত হয়েছিল।...দাশরথির রচনা অলঙ্কৃত হইয়াও অনায়াসসরল। ছন্দে তাঁহার কান ছিল সূক্ষ্ম। চলিত শব্দভাণ্ডারে তাঁহার অধিকার ছিল অবারিত।' দাশরথি রায়ের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা :

হৃদিবৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তপ্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধাসতী ॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে, বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
আমার, ধর ধর জনার্দন! পাপ-ভার গোবর্ধন,
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদিগোষ্ঠে, পুরাও ইষ্ট, এই মিনতি ॥

কবিওয়ালাগণ একটা বিশেষ সময়ের প্রয়োজনে যে সাহিত্যরসের সঞ্চার করেছিলেন তার প্রভাব দীর্ঘকাল বর্তমান থাকলেও পরবর্তীকালে ইংরেজি শিক্ষিত মন কবিওয়ালাদের রচনায় কোন প্রকার পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে নি। কবিওয়ালাদের শেষ পর্যায়ের রচনায় আধুনিকতার কিছু কিছু লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। কবি ঈশ্বর গুপ্তের ওপর কবিওয়ালাদের বিশেষ প্রভাবও ছিল। পরে পাশ্চাত্য সাহিত্যের রস উপভোগ করায় কবিওয়ালাদের প্রতি শিক্ষিত লোকের আকর্ষণ একেবারেই কমে যায় এবং বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিওয়ালাদের সম্পর্কে বলেছেন, 'বাংলা প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান, ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় স্বল্প। একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি-আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্বেও তাহাদের কোন পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না।' তবে কবিগানের ক্ষীণধারার অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান।

কবিগানকে দুর্যোগ দুঃস্বপ্নের দুর্দিন ও দুর্ভাগ্যের সাক্ষ্য বলে বিবেচনা করা হলেও এবং সমজদার হিসেবে স্বল্পবিদ্যা ও স্থুলরুচির তৎকালীন নতুন ধনী বেনে ফড়ে-দালাল দেওয়ানকে লক্ষ করা গেলেও সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কবিগানের অস্তিত্বের নিদর্শন বিদ্যমান। কবিওয়ালাদের মধ্যে কবির কল্পনা, আবেগ, রচনাকৌশল—সর্বোপরি স্বাভাবিকতা ছিল না, তাঁরা সবাই ছিলেন সুদক্ষ গায়ক, কেউ কেউ ছিলেন রচনাকার। কবিগান ছিল জীবিকা নির্বাহের উপায়। শিল্প জীবিকানির্ভর হলে তাতে উৎকর্ষের অভাব ঘটে। তাঁদের কারও কারও অশিক্ষিত পটুত্ব ছিল, ছিল না শিক্ষাদীক্ষা ও মার্জিত রুচি। তাই তাঁদের প্রচেষ্টা সস্তা বিনোদনেই পর্যবসিত হয়েছে। তবু কোন কোন গানে চকিতের মত কবিপ্রতিভার ক্ষণদীপ্তি ফুটে উঠেছিল। কবিওয়ালা ও কবিগান সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'তাঁদের সর্ববিষয়ক জ্ঞান তথা সর্ববিদ্যায় ব্যুৎপত্তি, তাঁদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তাঁদের ন্যায়-প্রয়োগ পটুতা, তাঁদের তর্কনিষ্ঠা, বাকপটুতা, বাকপ্রতিমা নির্মাণে আশ্চর্য কৌশল এবং পদ রচনার বিস্ময়কর দ্রুততা আমাদের অভিভূত করে। দুই প্রতিপক্ষের বিতর্কে ও যোটকে সত্য উদ্ভাসনের আশ্চর্য কুশলতা আমাদের বিস্ময়ের বিষয়। যদিও রেডিও সিনেমা ও সংবাদপত্র জনপ্রিয় হয়েছে তবু কবিয়াল ও কবিগানের উপযোগ আমাদের দেশে আজও কম নয়। তাঁরা কেবল ঘরের ও ঘাটের কথাই জানান না, শুধু জীবনের সমাজের ও ধর্মের কথাই বলেন না, বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ের যথা শিক্ষা সংস্কৃতি অর্থনীতি বিজ্ঞান রাজনীতি প্রভৃতি সমস্যাও আলোচনা করেন। জগতের হেন বিষয় কমই আছে, যাতে তাঁদের বলার অধিকার নেই। এই নিরক্ষরের দেশে কবিয়ালরা তাই আজও লোকশিক্ষক, জনজীবনের চারণ কবি।'

পুঁথিসাহিত্য

আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ ভাষারীতিতে যে সব কাব্য রচিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পুঁথি সাহিত্য নামে চিহ্নিত। ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ক্রান্তিকালে বাংলা সাহিত্যের যথার্থ পরিচয় কবিওয়ালাদের কবিগানের পাশাপাশি মিশ্র ভাষারীতির কাব্যরচনাকারী শায়েরদের অবদানে বিধৃত। মধ্যযুগের অবসানের আগেই এই ধারার সূচনা এবং আধুনিক যুগের সূত্রপাতের পরও এর অস্তিত্ব অব্যাহত ছিল। এক সময় গ্রামীণ মুসলমান সমাজে এর জনপ্রিয়তাও কম ছিল না। পুঁথিপাঠ চিত্তবিনোদনের আকর্ষণীয় উপায় হিসেবে বিরাজমান ছিল। আজকের দিনেও তা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি।

পুঁথিসাহিত্য প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, 'ইংরেজ-আমলের গোড়া হইতে রাজনৈতিক কারণে মুসলমানেরা বিমাতাসুলভ ব্যবহার পাইতে থাকে এবং হিন্দুরা ইংরেজদের হাতে প্রাধান্য লাভ করে। ফলে, নিম্নবঙ্গের সাধারণ মুসলমানেরা তাঁহাদের বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের প্রতিবাদ স্বরূপ ফারসি ও উর্দু ভারাক্রান্ত করিয়া এক স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি করিতে থাকেন। এই ভাষা ওহাবী বা ফরায়েজী আন্দোলন হইতে শক্তি সঞ্চয় করে এবং এক বিরাট ধর্মীয় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পায়। কলিকাতার বটতলার কল্যাণে হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগনার মুসলমানেরা এই সাহিত্য মুদ্রিত করিয়া দেশে ছড়াইতে ছড়াইতে ভাল ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসে। ...ইহাতে সাহিত্য আছে, রস আছে, শিল্পও আছে তবে, তাহার বেশির ভাগই মোগলাই।'

পুঁথিসাহিত্য নামে চিহ্নিত এই সাহিত্যের নামকরণে যথেষ্ট মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত রেভারেন্ড জে. লং-এর পুস্তক তালিকায় এই শ্রেণির কাব্যকে মুসলমানি বাংলা সাহিত্য এবং এর ভাষাকে মুসলমানি বাংলা বলা হয়েছে। ১৮৮৫ সালে এক গ্রন্থ তালিকায় ব্লুমহার্ট একই নাম অনুসরণ করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. সুকুমার সেনের মত পণ্ডিতেরা এই নামই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কথ্য ভাষারীতি হিসেবে এই ভাষার সমাদর সম্পর্কে সন্দেহ আছে। ড. আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে এই শ্রেণির কাব্যের নাম সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা উল্লেখ করা হল :

'কলকাতার সস্তা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়ে এই ধারার কাব্য দেশময় প্রচারিত হয়েছিল বলে বটতলার পুঁথি নামেও একে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চলেছে। সেটাকে সুভাষিত করতে যেয়েই বোধ হয় পুঁথিসাহিত্য কথাটির উদ্ভব হয়। পুঁথি-সাহিত্য বা পুথিসাহিত্য বলে একে যথার্থ ভাবে চিহ্নিত করা চলে না। কেননা, আধুনিক কালে বই বলতে আমরা যা বুঝি আগে পুথি বা পুঁথি বলতে তাই বোঝাত। সুতরাং 'বইসাহিত্য' কথাটার মত 'পুঁথিসাহিত্য' কথাটাও অর্থহীন। পুঁথি শব্দটাকে সংকীর্ণ অর্থে Manuscript বলেও গণ্য করা হয়। এই প্রয়োগ সন্তোষজনক কিনা, সে বিতর্কে প্রবৃত্ত না হয়েও বলা যায় যে, পুঁথি শব্দের এই সীমাবদ্ধ ব্যবহারও আমাদেরকে পুঁথিসাহিত্য কথাটির অর্থ গ্রহণে কোন সাহায্য করে না। কেননা, ছাপা হবার পরই এই কাব্যগুলো সারা দেশে ছড়িয়ে গিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।'

কেউ কেউ এই শ্রেণির কাব্যকে আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য 'দোভাষী পুঁথি' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই ভাষায় দুটি ভাষামাত্র নয়, বাংলা হিন্দি ফারসি আরবি তুর্কি ভাষার শব্দের সংমিশ্রণ এতে ঘটেছে। তাই ড. আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, 'বিদেশি শব্দবাহুল্যের কথা বিবেচনা করে একে মিশ্র ভাষা বলা অসংগত নয় এবং তার অনুসরণে এই কাব্যধারাকেও মিশ্র ভাষারীতির কাব্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে।' কিন্তু ড. আহমদ শরীফ এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ না করে বলেছেন যে, আরবি শব্দ ফারসির মাধ্যমে এসেছে, আর ফারসি ও তুর্কি শব্দ মিলে হয়েছে উর্দু ভাষা যার প্রভাব আছে হিন্দি ভাষায়। এ দুটোর আদি ও সাধারণ নাম ছিল হিন্দুস্থানি। তাঁর মতে, 'এই হিন্দুস্থানি তথা উর্দুর সঙ্গে বাংলার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে আমাদের দোভাষী রীতি। অতএব, দোভাষী রীতিই এর যোগ্য ও যথার্থ অভিধা।'

মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণের রচিত কাব্যগুলো স্থূল কলেবর, পরিশ্রুত ও সংস্কৃতঘেঁষা ভাষা ইত্যাদির জন্য জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেললে দোভাষী পুঁথি তার সংক্ষিপ্ত আকার, সহজ ভাষা ও স্থূল রসিকতার গল্পের জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সেই সঙ্গে প্রশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ছাপাখানার বদৌলতে সহজলভ্য হয়ে ওঠে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে দোভাষী পুঁথিতে শতকরা বত্রিশটি শব্দ হিন্দুস্থানি হওয়ায় তার জনপ্রিয়তা লাভ সহজ হয়েছিল।

পুঁথি সাহিত্যের ভাষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের বাহুল্যপূর্ণ ব্যবহার, আরবি-ফারসি শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার এবং হিন্দি ধাতুর প্রয়োগ, অনুসর্গ ও উপসর্গরূপে বাংলা ও আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের প্রয়োগ, ফারসি বহুবচনের ব্যবহার, পুংলিঙ্গে বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি। এতে আরবি ফারসি হিন্দি শব্দ, প্রত্যয়, বাক্য বা বাক্যাংশ বাংলার সঙ্গে মিশিয়ে একটা কৃত্রিম ভাষারীতি হিসেবে রূপ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়বস্তু অনুসারে পুঁথি সাহিত্যকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্য : ইউসুফ-জোলেখা, সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল, লায়লী- মজনু, গুলে-বকাওলী ইত্যাদি। ২. যুদ্ধ সম্পর্কিত কাব্য : জঙ্গনামা, আমীর হামজা, সোনাভান, কারবালার যুদ্ধ ইত্যাদি। ৩. পীর পাঁচালি : গাজী-কালু চম্পাবতী, সত্যপীরের পুঁথি ইত্যাদি। ৪. ইসলাম ধর্ম, ইতিহাস নবী-আউলিয়ার জীবনী ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কাব্য : কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকিরাতুল আউলিয়া, হাজার মসলা ইত্যাদি। এসব বিষয়বস্তু থেকে লক্ষ করা যাবে যে, বিচিত্র ধরনের উপকরণ পুঁথি সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছিল।

মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে এই কাব্যধারার উৎপত্তির পশ্চাতে যুগপ্রভাব বিশেষ কার্যকরী ছিল। আঠার শতকের প্রারম্ভে মোগল শাসনের শেষদিকে এ দেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এ সময়ে ইরান থেকে এ দেশে আগত শিয়াদের মাধ্যমে ফারসি সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটে। বাংলাদেশে আগত ধর্মনেতা ও পীরফকিরগণের শিক্ষা ও প্রেরণায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলে। তখন ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ-অনুকরণ, ইতিহাসের পটে কাল্পনিক কাফের দলনকাহিনি, পীরের

কাছে দেবদেবীর পরাজয়বরণ ও পীরের প্রতিষ্ঠালাভের উপাখ্যান বাংলায় রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ফারসির প্রভাব নগর-বন্দরেই বেশি ছিল। হুগলি বন্দর এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। আর এখান থেকেই পুঁথি সাহিত্যের উদ্ভব। আঠার শতকে হুগলি সীমান্ত অঞ্চলে ভুরসুট-মান্দারনে বড়-খাঁ গাজী বা ইসমাইল গাজীর পীঠস্থানকে কেন্দ্র করে এই সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।

এই ধারায় প্রথম কাব্য রচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার কবি কৃষ্ণরাম দাস ১৬৮৬-৮৭ সালে। 'রায়মঙ্গল' তাঁর কাব্যের নাম। তবে সমগ্র কাব্যে মিশ্র ভাষারীতির প্রথম প্রয়োগের কৃতিত্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি ফকির গরীবুল্লাহ্‌র। তিনি খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তাঁর মত সৈয়দ হামজাও যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী হন। এরপর মালে মুহম্মদ, জনাব আলী, মুহম্মদ খাতের, আবদুর রহিম, মনিরুদ্দিন, আয়েজুদ্দিন, মুহম্মদ মুনশী, তাজউদ্দিন, দানেশ, আরিফ, রেজাউল্লাহ্, সাদ আলী, আবদুল ওহাব প্রমুখ প্রায় আড়াই শ শায়ের আজ অবধি কয়েক শ কাব্য রচনা করেছেন।

উনিশ শতকের শেষ দিকে কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি অঞ্চলের বাইরের কবিরাও এই শ্রেণির কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং এই ধারা সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে গতানুগতিকতা ও নিম্নমানের জন্য তার জনপ্রিয়তা খুবই সীমিত হয়ে পড়েছে।

ফকির গরীবুল্লাহ্

পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন ফকির গরীবুল্লাহ্। তিনি হুগলি জেলার বালিয়া পরগনার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি। গরীবুল্লাহ ছিলেন পীরের খানদান। তিনি বড় খাঁ গাজীর ভক্ত ছিলেন এবং গাজী অনুগ্রহ করে গোপনে তাঁকে সাক্ষাৎ দান করেছিলেন বলে কবি উল্লেখ করেছেন। কবির রচনায় 'ফকির গরীব', 'গরীব' ও 'গরীব ফকির' প্রভৃতি ভণিতা ব্যবহার করেছেন। তিনি আঠার শতকের মধ্যভাগে (কারও মতে ১৭৬০-৮০) কাব্য সাধনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। মিশ্র ভাষারীতিতে তাঁর রচিত কাব্যগুলো হচ্ছে : ১. ইউসুফ-জোলেখা, ২. আমীর হামজা (প্রথম অংশ) ৩. জঙ্গনামা, ৪. সোনাভান এবং ৫. সত্যপীরের পুঁথি। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ছদ্মঐতিহাসিক যুদ্ধ কাহিনি এবং লৌকিক দেব বা পীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পাঁচালি—মিশ্র ভাষারীতির এই তিনটি প্রধান ধারাই তিনি পুষ্ট করেছেন।

'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যে ফকির গরীবুল্লাহ্ কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কুরআন শরীফ ও বাইবেলে ইউসুফ-জোলেখার কাহিনি নৈতিক উপাখ্যান হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে। ফারসি সাহিত্যে ও বাংলায় এই কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনাও বিদ্যমান। কবি ফারসি কাব্যের অনুসরণে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তবে তাতে তাঁর নিজস্ব কৃতিত্বের পরিচয় মিলে। কাব্যে আল্লাহ্‌র মহিমা ও ফকিরীর মাহাত্ম্য প্রচার কবির উদ্দেশ্য ছিল। তবে প্রণয়কাব্য হিসেবে এর মূল্যও কম নয়। বাংলার লৌকিক প্রভাব এ কাব্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। প্রণয়াবেগ রূপায়ণে তাঁর বিশিষ্টতা ছিল।

রূপবর্ণনায় কবি মধ্যযুগের প্রণয়কাব্যের রীতি অনুসরণ করেছেন। এমন কি ভাষা ব্যবহারেও মিশ্র ভাষারীতির সীমানা অনেকাংশে ছাড়িয়ে গেছেন। যেমন :

পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মুখের ছুরাত।
ত্রিভুবন জিনে দেখি রূপের মুরাত ॥
ময়ূরের পর জিনে কেশ মাথা পরে।
রাহু যেন গ্রাসিল আসিয়া চাঁদেরে ॥
ত্রিভঙ্গ নয়ন যেন খঞ্জনের আঁখি।
ভুবন ভুলাতে নারে সেই রূপ দেখি ॥
দুই খানি ঠোঁট যেন কমলের ফুল।
তাহার বদন যেন চাঁদ সমতুল ॥
বত্রিশ দন্ত দেখি যেন মুক্তার হার।
বিদ্যায় পণ্ডিত যেন সরস্বতী পার ॥

'আমীর হামজা' গরীবুল্লাহ্‌র অপর কাব্য। কবি এই কাব্যের প্রথমাংশ মাত্র রচনা করেছিলেন। পরে সৈয়দ হামজা তা সমাপ্ত করেন। ফারসি ও উর্দুতে আমীর হামজার কাহিনি কাব্যাকারে রূপায়িত হয়েছিল। কবি ফকির গরীবুল্লাহ্ সে সবের অনুসরণে তা বাংলায় রূপ দান করেন। আমীর হামজা কাব্যটিতে ইরানের শাহ্ নওশেরওয়ানের সঙ্গে হযরত মুহম্মদ (স) এর চাচা আমীর হামজার যুদ্ধকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। অলৌকিক ঘটনা পুঁথি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই এ কাব্যে স্থান পেয়েছে।

'জঙ্গনামা' ফকির গরীবুল্লাহ্‌র অন্যতম বিশিষ্ট কাব্য। কারবালার বিষাদময় কাহিনি এই কাব্যের উপজীব্য। কবি ফারসি কাব্য অবলম্বনে জঙ্গনামা রচনা করেছিলেন। কবি এ কাব্যে একদিকে যেমন যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি গভীর বেদনার সুর ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিকল্পনা বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে নানা অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করেছে। অলৌকিকতা কেবল নয়, অসাধারণ অস্বাভাবিক বীরবিক্রম এ কাব্যে বড় হয়ে উঠেছে। কারবালার এই একই কাহিনি অবলম্বনে 'জঙ্গনামা' জাতীয় আরও অনেক কাব্য রচিত হয়েছিল। কবি মোহাম্মদ খানের 'মকতুল হোসেন' এই ধরনের অপর কাব্য। কবি হায়াত মামুদ, শফিউদ্দীন প্রমুখেরা জঙ্গনামা কাব্য রচনা করেছিলেন, তবে কবি গরীবুল্লাহ্ এই ধারায় সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। 'সোনাভান' নামে গরীবুল্লাহ্ যুদ্ধকাহিনি সম্বলিত অপর একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। বীর হানিফার সঙ্গে সোনাভানের লড়াইয়ের কাহিনি এতে বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রণয়ের কথাও বাদ পড়ে নি। 'সত্যপীরের পুঁথি—মদন কামদেবের পালা' নামে অপর একটি কাব্য ফকির গরীবুল্লাহ্‌র রচিত। ড. আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, 'গরীবুল্লাহর প্রতিভা ছিল, পর্যাপ্ত শিক্ষা ছিল না। কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা তাঁর ছিল, কিন্তু লোকমনোরঞ্জন ছিল তাঁর আশু লক্ষ্য। তাই গরীবুল্লাহ জনপ্রিয় হলেন, কিন্তু একজন প্রথম শ্রেণির কবি হতে পারলেন না। তবে একটি বিশেষ কাব্যধারার পদকর্তা হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করবেন, এইটুকু আমাদের সান্ত্বনা।'

সৈয়দ হামজা

পুঁথি সাহিত্যের ধারায় কবি ফকির গরীবুল্লাহ্‌র অনুসারী হিসেবে কবি সৈয়দ হামজার আবির্ভাব। তিনি ১৭৩৩-৩৪ সালে হুগলি জেলার ভুরসুট পরগনার উদনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবিতা, পাঁচালি ও ছড়া রচনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। আনুমানিক ১৭৮৮ সালে তিনি 'মধুমালতী' নামে একটি প্রণয়কাব্য রচনা করেন। তবে কাব্যটি পুঁথি সাহিত্যের ধারার অনুসারী নয়, এর ভাষা পুঁথি সাহিত্যের মত মিশ্র ভাষারীতি ছিল না। কবি সম্ভবত ফারসি কাব্য থেকে বঙ্গানুবাদ করে এ কাব্যের রূপ দেন। এই কাব্যে মনুহর ও মধুমালতীর যে প্রেমকাহিনি বর্ণিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং রোমান্টিক রসাশ্রিত। কবির ভাষার নিদর্শন :

সহজে রূপের ভারে আপনি চলিতে নারে
নবীন যৌবন তাহে ভার।
রূপের মুরারি বালি ক্ষীণমধ্যা পড়ে হেলি
কেমনে বহিবে অলঙ্কার ॥
চন্দ্রের জিনিয়া রূপ সূর্যের জিনিয়া ধূপ
আভরণ কিবা প্রয়োজন।
আয়তির চিহ্ন যত দেশের চলন মত
আনিল কিঞ্চিৎ আভরণ ॥

মধ্যযুগের রোমান্টিক কাব্যের অবাস্তবতা এবং রহস্য স্বীকার করেও সৈয়দ হামজার মধুমালতী বাঙালির সংস্কার, আচারনিষ্ঠা, রীতিনীতি, গৃহগত সৌজন্য, কৌতুক ও আনন্দ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। সৈয়দ হামজা কবি গরীবুল্লাহ্‌র অসামপ্ত কাব্য আমির হামজা সমাপ্ত করতে গিয়ে পুঁথি সাহিত্যের ভাষারীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সে ভাষায় তিনটি কাব্য রচনা করেন। 'আমীর হামজা' কাব্যের দ্বিতীয় অংশ তিনি বিরাট আকারে রূপ দেন। কাব্যরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি বলেছেন :

লোগের খায়েশ দেখি ভাবি মনে মনে।
আখেরি শায়েরি পুঁথি হইবে কেমনে ॥
না পারিনু এড়াইতে লোকের নেহেরা।
এ খাতেরে কবিতার খাহেশ হৈল মেরা ॥
পীর শাহা গরীবুল্লা কবিতার গুরু।
আলমে উজালা যার কবিতার শুরু ॥
আমার শায়েরি নয় কেতাব সমান।
কেবল বুঝিবে লোগ কেচ্ছার বয়ান ॥

'আমির হামজা' কাব্যে কবি অসংখ্য যুদ্ধের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য পুঁথির মত এই কাব্যেও অলৌকিকতা বিদ্যমান। 'জৈগুনের পুথি' নামে সৈয়দ হামজা অপর একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। ১৭৯৭ সালে এ কাব্য রচিত। এরেমের বাদশাজাদী অসাধারণ বীর্যবতী বিবি জৈগুনের সঙ্গে হানিফার যুদ্ধ এবং পরিণামে

তাদের পরিণয় বর্ণনা এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইসলামের জয় ঘোষণা এ কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। জৈগুনের যে সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কাহিনি রূপলাভ করে তা এ রকম :

জৈগুন নামে বাদশাজাদী এরেম সহরে।
কারার করেছে বিবি বাপের হুজুরে ॥
মহিমে যে কেহ মোরে পাছাড়িবে জোরে।
সাদী বেহা কবুল করিব আমি তারে ॥
আমার মহিমে যদি হারে পাহালওয়ান।
করিবে খেদমতগারি হইয়া গোলাম ॥

সৈয়দ হামজার চতুর্থ রচনা 'হাতেম তাই' কাব্য। কাব্যটি উর্দু 'আরায়েশ মহফিল' কাব্যের অনুবাদ। সওদাগরজাদী হুসনাবানুর রূপমুগ্ধ মনীর শামীর মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য সাতটি দুরূহ প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে পরোপকারী হাতেম তাইয়ের বিচিত্র অভিযান এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। সৈয়দ হামজার কবি প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে ড. আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, 'গরীবুল্লাহর মত হামজারও শ্রেষ্ঠরচনা তাঁর প্রণয়কাব্য। মনে হয় উভয় কবিরই স্বাভাবিক প্রতিভা এই জাতীয় কাব্যরচনার অনুকূল ছিল। কিন্তু সমসাময়িককালে ফারসি যুদ্ধকাহিনি কাব্যের জনপ্রিয়তায় বিভ্রান্ত হয়ে এঁরা 'জঙ্গনামা' শ্রেণির কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁদের শ্রোতারাও এতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মুহূর্তের জন্য কবিরা তাঁদের নিরুত্তাপ ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে উত্তেজনার সঞ্চার করেছিলেন, তাঁদের মূঢ় কল্পনার খোরাক জুগিয়েছিলেন। সেই বিশেষ মুহূর্তের, বিশেষ পরিমণ্ডলের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই কবিদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে। কেবল সেখানে চিরন্তন সুর ধ্বনিত হয়েছে, তাঁদের সেই প্রণয়কাব্যই হয়ত কালের আঘাত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।'

সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষা এবং আকর্ষণীয় আবেগ এই দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে বিশেষ সময়ে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুঁথিসাহিত্যের ধারায় অনেক কবিই কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু কৃতিত্বের নিদর্শন ফকির গরীবুল্লাহ্ ও সৈয়দ হামজার কাব্যেই লক্ষ করা যায়। এই দুজন কবিই স্বাভাবিক কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন, প্রণয়কাব্য রচনায় তা সার্থক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তবে সমকালীন বিশেষ কাব্যরসিকের জন্য তাঁরা জঙ্গনামা-জাতীয় কাব্য রচনা করেছিলেন।

পরবর্তীকালে পুঁথিসাহিত্যে অনেক শায়েরই নিজ নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মোহাম্মদ দানেশ 'চাহার দরবেশ' কাব্য রচনা করেন। সম্ভবত উর্দুর মাধ্যমে ফারসি 'কিসসা-ই-চাহার দরবেশ' গ্রন্থের অনুবাদ হিসেবে এ কাব্যের রূপ দেওয়া হয়। 'চারজন প্রণয়ী তাঁদের বাঞ্ছিতা নারীর সন্ধানে বেরিয়ে ফকির হয়ে গেছেন। ভগ্নহৃদয়ে দরবেশরা যখন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন, তখন হযরত আলী আবির্ভূত হয়ে তাঁদের ভবিষ্যতের আশা দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। এই আশায় উজ্জীবিত হয়ে দরবেশরা আবার প্রণয়িনীদের অনুসন্ধানে বের হলেন—এই-ই কাহিনির চুম্বক। বাংলায় এই কাহিনি পরিবেশনের কারণ সম্পর্কে কবি বলেছেন :

কেতাব করিল মর্দ ফারসি জবানে।
ফারসি লোক যারা তারা খুসি হালে শুনে ॥

বাঙ্গালার লোক সবে নাহি জানে ভেদ!
যে কেহ শুনিল তাহা দেলে করে খেদ ॥...
এ খাতেরে ফকিরে হইল সওক।
আফছোছ না করে যেন বাঙ্গালার লোক ॥
চলিত বাঙ্গালায় কেচ্ছা করিনু তৈয়ার।
সকলে বুঝিবে ভাই কারণে ইহার ॥
আসল বাঙ্গালা সবে বুঝিতে না পারে।
এ খাতেরে না লিখিলাম শোন বেরাদরে ॥

'চাহার দরবেশ' ছাড়া মোহাম্মদ দানেশ 'গোলবে ছানুয়ার', 'নুরুল ইমান' ও 'হাতেম তাই' কাব্য রচনা করেছিলেন।

পুঁথি সাহিত্যে পীরফকিরদের প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায় 'গাজী কালু ও চম্পাবতী' পুঁথির মধ্যে। বৈরাট নগরের রাজা সেকান্দর শাহের দ্বিতীয় পুত্র গাজী ও তাঁর সহচর কালুর সংসার বিরাগের কাহিনি এবং গাজীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ নগরের রাজকন্যা চম্পাবতীর প্রণয়কাহিনি এই শ্রেণির কাব্যের বিষয়বস্তু। গাজীর ব্যাঘ্র-বাহিনীর সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধের কাহিনিও এতে স্থান পেয়েছে। গাজীর মাহাত্ম্যকাহিনি কবির অন্যতম প্রেরণার উৎস ছিল। এই কাহিনি অবলম্বনে আবদুল গফুর, আবদুল হাকিম প্রমুখ কবিগণ কাব্য রচনা করেন। আবদুল হাকিম 'গাজী কালু ও চম্পাবতী' রচনায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন।

পুঁথিসাহিত্য 'সম্পূর্ণত ইসলাম সম্মত না হয়েও অশিক্ষিত মুসলমান সমাজে তার আবেদন সীমাবদ্ধ হয়ে রইল।' তবে এই কাব্যধারায় চিন্তার মত রচনাভঙ্গির দৈন্যও বিদ্যমান ছিল। মিশ্র ভাষারীতির কাব্য শুধু গতানুগতিক ও জৌলুসহীন নয়, ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্নও স্পষ্ট। কারণ এতে আছে বাস্তব জীবন থেকে সরে থাকার চেষ্টা, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অভাব, আদর্শবাদের অভাব এবং সমকালীন জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ।

আধুনিক যুগে পুঁথিসাহিত্যে কেউ কোন আবেদনের সৃষ্টি করতে পারে নি। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসান এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'উনিশ শতকের দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের কাব্যগত কোন মূল্য নেই, তার কারণ, প্রথমত এবং প্রধানত প্রতিভাবান কবির অভাব; দ্বিতীয়ত, ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্রের ফলে বাংলা সাহিত্যের যে পরিবর্তন এল, সে পরিবর্তনের সঙ্গে পুঁথি রচয়িতাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তৃতীয়ত, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার অভাব কাব্যকে প্রাণহীন করেছিল।' তবু একটি ক্ষীণ ধারা এখনও অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুসমাজে 'কবিওয়ালা'র এবং মুসলিম সমাজে 'শায়ের'-এর উদ্ভবের রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ নিরূপণ কর।

২। কোন সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু সমাজে 'কবিওয়ালা'র ও মুসলিম সমাজে 'শায়ের'-এর উদ্ভব হইয়াছিল, বল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য কবিওয়ালা ও পুঁথিকারদের পরিচয় দাও।

৩। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় অবক্ষয় যুগের বাংলা সাহিত্যের একটি পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

৪। সামাজিক ও রাজনৈতিক কোন প্রতিবেশে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে দীর্ঘ সাত দশকে কোন উল্লেখযোগ্য কবির আবির্ভাব হয় নাই, তাহার আলোচনা কর।

৫। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে দোভাষীপুঁথি হিসাবে পরিচিত যে বিশেষ ধরনের কাব্যকলার উদ্ভব, তাহার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

৬। অষ্টাদশ শতাব্দীর কলিকাতায় 'দোভাষী সাহিত্য' ও 'কবিগান'-এর উদ্ভবের ও জনপ্রিয়তার কারণ নিরূপণ কর এবং প্রধান কয়েকজন শায়ের ও কবিওয়ালার নামোল্লেখ কর।

৭। বাংলা 'দোভাষী রীতি'র উদ্ভব ও বিকাশের ধারা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৮। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত হিন্দু সমাজে কবিওয়ালার এবং মুসলিম সমাজে শায়েরের উদ্ভবের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণ নিরূপণের চেষ্টা কর।

৯। কবিগানের উদ্ভব ও বিকাশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য বিচার কর।

১০। বাংলা দোভাষী রীতির উদ্ভব ও বিকাশের ধারা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা কর।

১১। দোভাষী সাহিত্য বলিতে কি বুঝ? উক্ত ধারার কয়েকজন বিশিষ্ট কবির কাব্য আলোচনা করিয়া প্রশ্নটির মীমাংসা কর।

১২। দোভাষী পুঁথির প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? কয়েকজন শায়ের এবং উল্লেখযোগ্য কবিকৃতির বিবরণ দিয়া বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝাইয়া দাও।

১৩। দোভাষী সাহিত্যের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি নির্দেশ করিয়া একটি নিবন্ধ লিখ।

১৪। 'দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের পটভূমি সম্পূর্ণই সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। ঐ জাতীয় সাহিত্য চর্চার পশ্চাতে সামাজিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল।'—এ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া লিখ।

১৫। দোভাষী পুঁথি নামে এক ধরনের কাব্য মধ্যযুগের শেষে বহুল পরিমাণে রচিত হইয়াছিল। এসব কাব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা কর।

১৬। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'অবক্ষয় যুগের' অস্তিত্ব মেনে নেয়া যায় কি? পণ্ডিতদের মতামতসহ তোমার মত ব্যক্ত কর।

১৭। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিওয়ালা এবং শায়েরের উদ্ভবের কারণসমূহ নিরূপণ করে উভয়ধারার প্রধান প্রধান রচয়িতার পরিচয় দাও।

১৮। টীকা লিখ : দাশরথি রায়, দোভাষী পুঁথি, ফকির গরীবুল্লাহ, জঙ্গনামা, মকতুল হোসেন, মধুমালতী, জৈগুনের পুঁথি, চাহার দরবেশ, গাজী কালু চম্পাবতী।

দ্বিতীয় পর্ব
আধুনিক যুগ

প্রথম অধ্যায়
আধুনিক যুগের লক্ষণ

বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাসে তিন যুগ—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। আঠার শ সাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আধুনিক যুগের পরিধি। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র গৌরব নিয়ে এই আধুনিক যুগের শুরু। উপমহাদেশে ইংরেজ আগমনের ফলপ্রসূ প্রভাবের সঙ্গে এ যুগের সম্পর্ক জড়িত। পাশ্চাত্য প্রভাবে এদেশের সমাজজীবনে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ভাবের জগতেও আসে সংঘাত। আর তা সাহিত্যের প্রবাহে সৃষ্টি করে নতুন বেগ। বৈদেশিক শাসনে বাঙালির চোখের ঠুলি খুলে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে জাগ্রত হল রসানুভূতি। তাই সাহিত্যে ঘটল আধুনিকতার সমুজ্জ্বল প্রতিফলন। বিদেশি শাসন-শোষণের বাইরে এ ছিল এক কল্যাণকর ফলশ্রুতি।

আধুনিক যুগের শুরুতেই প্রতিষ্ঠিত হল বইপত্র মুদ্রণের জন্য ছাপাখানা। এর আগে এর কোন কল্পনাও কেউ করেন নি। মুদ্রিত হতে শুরু হল পাঠ্যপুস্তক, ধর্মগ্রন্থ, জ্ঞানবিজ্ঞানের বই, পত্রপত্রিকা। একের পর এক স্থাপিত হতে থাকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি সংগঠন, আলোচনা সভা—ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি বিষয়ে—শুরু হল বাংলা গদ্যের জয়যাত্রা। পাশ্চাত্য ভাবস্রোত দেশে নিয়ে এল বুদ্ধির মুক্তি। অচল অনড় পল্লীসভ্যতার বুনিয়াদ ধ্বসে গিয়ে চলন্ত বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ ঘটল বাংলাদেশের। ফলে বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতিতে লাগল নতুনের স্পর্শ—সাহিত্যে তার প্রতিফলন অনিবার্য হয়ে উঠল। এই পটভূমিতেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুভ সূচনা। প্রধানত ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা চিন্তায়, কাজে ও সৃষ্টিতে এক নতুনত্ব অনুভব করেন, তাকেই নাম দেওয়া হয়েছে নবজাগৃতি বা রেনেসাঁ। আর এই নবজাগৃতিই আধুনিক যুগকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মধ্য যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

এক যুগের সাহিত্যের সঙ্গে অন্য যুগের সাহিত্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সুনির্দিষ্ট সন-তারিখের সীমারেখায় সাহিত্যের যুগবিভাগ চিহ্নিত করা সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না, আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে; কারণ তা যতটা কালের কথা নয়, ততটা ভাবের কথা। যুগান্তরের কোন একটা সাল সাধারণভাবে নির্দেশিত হলেও তার পূর্বাপর সময়ে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ একান্তই স্বাভাবিক। তাই ১৮০০ সাল থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ ধরা হলেও এই যুগের বিশেষ লক্ষণ পূর্ব থেকে কিছুটা পরিস্ফুটিত হতে দেখা যায়। ১৭৬০ সালে পরলোকগত মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে মানবিকতার সুরটি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত কবিগান, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি সাহিত্যসৃষ্টিও মধ্যযুগীয় অলৌকিকতা পরিহার করে অনেকাংশে বাস্তবধর্মী হয়ে দেখা দিয়েছিল।

সাহিত্যকে জীবনমুখী করার এই ইঙ্গিতময় মুহূর্তে ইউরোপীয় ভাবধারার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত এবং সগৌরব অগ্রযাত্রা।

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিণামে উনিশ শতকের প্রথম থেকে এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা ও সম্প্রসারণ ঘটে। উনিশ শতকে বাঙালি জীবনে এল ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্তন এল চিন্তাধারায়। তার প্রভাবে সাহিত্যসৃষ্টিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। ইংরেজ বণিক যখন স্থায়ী রাজত্বের অধিকারী হয় তখন আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের জন্য ইংরেজ-সান্নিধ্য বাঙালিরা অভিপ্রেত বলে বিবেচনা করে। সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষালাভের উদ্যোগও ইংরেজ-বাঙালির ঘনিষ্ঠতার সুযোগ আনে। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে উন্নতশ্রেণীর ইংরেজি সাহিত্যের রসের স্বাদ পেয়ে শিক্ষিত বাঙালি নিজেদের সাহিত্যের প্রতি সচেতন হয় এবং স্বীয় সাহিত্যের অপূর্ণতা দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করে। ইংরেজ শাসন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যতই অনভিপ্রেত বলে বিবেচিত হোক না কেন, এ দেশের শিক্ষাসংস্কৃতির ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার গুরুত্ব ও অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃত। পাশ্চাত্য জ্ঞানে প্রবুদ্ধ রাজা রামমোহন রায় সংস্কারবিমুক্ত অন্তরে প্রথমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অসীম মূল্য ও প্রয়োজন অনুভব করেন। ইংরেজদের পথরেখা অনুসরণ করেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ধর্মালোচনার প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, মুদ্রণযন্ত্র প্রভৃতি এ দেশে স্থাপিত হয় এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চার ব্যাপক সুযোগ আসে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা সৃষ্টির জন্য এই পরিবেশ বিশেষ কার্যকরী প্রমাণিত হয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায় যে, এই সাহিত্যের উদ্ভব নগরকেন্দ্রিক, ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও বিকাশের সঙ্গে একান্তভাবে বিজড়িত। শিক্ষা-সংস্কৃতির নগরমুখিতা, চাকরিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণীর গুরুত্ব বাংলার সামাজিক জীবনের নতুন সত্য হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবির 'বাঙলার কাব্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'নবাবি আমলে রাষ্ট্রশাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় হিন্দুমধ্যবিত্ত শ্রেণির যে স্থান ছিল, রাষ্ট্রবিপ্লবে তারা সে স্থান হারাল না, বরং ঐতিহাসিক পরিবর্তনে সমাজে তাদের গুরুত্ব আগের চেয়ে বেড়ে গেল। নবাবি আমলে ধনোৎপাদন ও রাষ্ট্রশাসন ক্ষেত্রে তারা ছিল রাষ্ট্রশক্তির অপরিহার্য সহকারী, বর্তমানেও তাই। ইংরেজ আমলে একমাত্র সৈনিকবৃত্তি ভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য এবং সরকারি ও সওদাগরি চাকরির ক্ষেত্রে তাদের পূর্বেকার প্রায় প্রত্যেকটি জীবিকাই আজও অব্যাহত রয়েছে।...হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক এ ইতিহাসের ফলে যে কেবল তাদের আর্থিক ও ঐতিহাসিক স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ন রয়েছে তা নয়,—ফারসির বদলে ইংরেজিকে তারা সহজে এবং সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করায় বাংলা কাব্যের রূপান্তরের সম্ভাবনাকেও তারাই সার্থক করে তুলেছে।' মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিক প্রসার ও গ্রহণশক্তির উৎকর্ষ বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর বিকাশের মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের সংঘাতে বাংলার সামন্ততন্ত্র ভেঙে যায় এবং সে স্থান অধিকার করে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। আর এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল বরাবরই আত্মসচেতন, চঞ্চল ও চিন্তাবিলাসী। ইংরেজ শাসকের সক্রিয় সহায়তায় সৃষ্ট এবং ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রতিফলিত আলোকে শিক্ষিত বাঙালিমানস

নির্বিচারে পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিবিলাস তাই বাংলার আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মর্মকথা, মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তির বিকাশ তার স্বধর্ম।

১৮০০ সাল থেকে বাংলার ইতিহাসে যে যুগের সৃষ্টি হল তাতে বাঙালি জীবন আগের চেয়ে অনেক বেশি গতিমান ও পরিবর্তনমুখর হয়ে উঠল। আধুনিক যুগের প্রধান লক্ষণ এই গতি। আর এ গতি ক্রমেই ক্ষিপ্রতর হয়ে ওঠে। জটিল ও বিচিত্র ঘটনা ও ভাবধারায় এদেশের জীবন ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে থাকে। সেই ঔপনিবেশিক পরিবেশেও এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এ সময়কার সাহিত্যের প্রধান কৃতিত্ব সৃষ্টিতে নয় নতুন জীবনযাত্রার জন্য জাতিকে প্রস্তুত করাতে, নতুন জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা করাতে এবং নতুন সাহিত্যাদর্শ আবিষ্কার করাতে। রসবিচারে তার অনেকটাই সাহিত্য নয়, কিন্তু জীবন-বিচারে তাকে শিক্ষা ও ভাব-সংঘাতের সাহিত্য বলাও প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির মনের আগল ঘুচে গেল, সে যুগের বাংলা সাহিত্যে বিশাল বিশ্বের ছায়া পড়ল, বিচিত্র জীবনের কল্লোল ধ্বনিত হল, পশ্চিম সমুদ্রপার থেকে মুক্তির ঝড়ো হাওয়া এসে খাঁচার পাখির দুর্বল পাখার মধ্যে সাগরসঙ্গীত শুনিয়ে গেল। তারপর খাঁচার শলা ভেঙে গেল; হংসবলাকা পাখা মেলে নীল আকাশের বুকে উড়ে গেল। ...এক কথায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শুধু দেবদেবীর কথা নয়, জীবনের বিশাল প্রত্যয় বিচিত্র বর্ণসুষমায় ফুটে উঠল। যাকে আমরা মডার্ন বলি। উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সেই আধুনিকতার বাণী সঞ্চারিত হল, বাঙালির জীবন থেকে মধ্যযুগ স্খলিত হয়ে পড়ল, বাংলা সাহিত্য থেকে তার পদচিহ্ন মুছে গেল।'

হিন্দু কলেজ ও ইয়ং বেঙ্গল

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাতে যাঁরা স্বীয় প্রতিভা নিয়োজিত করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত। উনিশ শতক শুরুর আগেই এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত। রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, নীতি ও জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় বিবেচনা করে এদেশবাসীর মুখ পাশ্চাত্যের দিকে ফিরিয়ে দেন। তাঁর ধ্যানধারণাই হিন্দু কলেজের শিক্ষার মধ্যে রূপায়িত হয়। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে যে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার হিন্দু কলেজ উল্লেখযোগ্য। এই কলেজের মাধ্যমে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের সন্তানেরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের যথার্থ সুযোগ লাভ করে। সে আমলে যাঁরা এ দেশে সাহিত্যচর্চায়, শিক্ষা সম্প্রসারণে, সমাজ ও ধর্মসংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের অনেকেই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। বাংলাদেশের ইয়ং বেঙ্গলের মন্ত্রগুরু হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) ছিলেন হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক। তিনি ছিলেন একজন ফিরিঙ্গি—পিতা ইটালিয়ান এবং মা ছিলেন এদেশীয় মহিলা। এদেশেই তাঁর জন্ম। এদেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করতেন। তিনি ছিলেন 'সেদিনকার উদীয়মান বাংলার অতিদীপ্ত এক অগ্নিশিখা।' ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'অপরাপর শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মত ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন-বিজ্ঞানের সঠিক পরিচয় সহযোগে তরুণ বাঙালি পড়ুয়াদের চিত্তকে সঞ্জীবিত করে তোলাই তাঁর একমাত্র আদর্শ ছিল না। সমুচিত জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে পতিত দেশজননীর পুনরুদ্ধারের উদ্যমই ছিল বয়সে

তরুণ নবীন বাঙালি ডিরোজিওর জীবনব্রত।' তিনি ছাত্রদের নিয়ে 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী এ সম্পর্কে বলেছেন, 'এই সভার অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন অসংকুচিতভাবে বিচার করা হইত। তাহার ফলস্বরূপ ডিরোজিওর শিষ্যদিগের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং তাঁহারা অসংকোচে দেশের প্রাচীন রীতিনীতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন।' ডিরোজিওর শিষ্যরাই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত। তাঁর চরিত্র ও দর্শনের বিপুল প্রভাব শিষ্যদের ওপর পড়ে এবং তা সমাজ জীবনে ভালমন্দ উভয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পায়। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত ইয়ং বেঙ্গল ছাত্রগোষ্ঠী সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় ইউরোপীয় ভাবনাচিন্তাকে আত্মস্থ করেন। ধর্মের সকল গোঁড়ামিকে মুক্তবুদ্ধির আলোকে বিশ্লিষ্ট করে নিরীক্ষণের মন্ত্র তিনি তাঁর শিষ্যদের শুনিয়েছিলেন।

সমাজ ও ধর্মবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েও ইয়ং বেঙ্গলেরা জ্ঞানসাধনা ও সংস্কার কাজে অপ্রতিরোধ্য ধারায় অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের বহুমুখী জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও পরোপচিকীর্ষার পরিচয় অনেকের মধ্যে সুস্পষ্ট ছিল। ডিরোজিওর শিক্ষা ছিল—আস্তিকতা হোক, নাস্তিকতা হোক, কোন জিনিসকে পূর্ব থেকে গ্রহণ না করা; জিজ্ঞাসা ও বিচার—এ-ই ছিল মূলমন্ত্র। ১৮২৬ থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত হিন্দু কলেজে শিক্ষকতাকালে ডিরোজিওর মনীষা ও সত্যনিষ্ঠার প্রভাবে ইয়ং বেঙ্গলের উন্মেষ ঘটে এবং ১৮৩১ সালে ইয়ং বেঙ্গলের প্রকাশ্য আত্মঘোষণা করা হয় প্রথমে ইংরেজি 'এনকোয়ারার' পত্রে এবং পরে বাংলা 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রে। পত্রিকা দুটির নামে ও লেখায় তাঁদের স্পষ্ট পরিচয় বিধৃত। গুরু ডিরোজিওর অকালমৃত্যুতে তাঁর সুযোগ্য শিষ্যরা বিদ্রোহের বাণী প্রচার করেন। বিবিধ সংবাদপত্র পরিচালনায়, পুস্তিকা রচনায়, শিক্ষা বিস্তারে, বিতর্কে, আলোচনায়, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারান্দোলনে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ শিষ্যরা যুক্তি ও মানবাধিকারের দীপ্ত বাণী ঘোষণা করেছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬-৫৫) সাংবাদিক, কোষকার, সরকারি কর্মচারী ও দেশের প্রথম রাজনৈতিক চেতনাসৃষ্টিকারী। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫) পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানাহরণে, সাধারণের হিতৈষণায় এবং পাদ্রি হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়া জাতীয় গ্রন্থ 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' রচয়িতা। দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮১২-৮৭) অর্থে, কুলে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বাক্যকৌশলে সুপটু। তিনি ছিলেন 'জ্ঞানান্বেষণের' প্রথম সম্পাদক। রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮) ইংরেজি বক্তৃতার জন্য 'ডিমোস্থিনিস' নামে খ্যাত, বাঙালির প্রথম রাজনৈতিক বাগ্মী। রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৭) বিদ্যায়, বাগ্মিতায় সততায় আদর্শ ব্যক্তি। ডিরোজিওর ছাত্র না হয়েও ছাত্রতুল্য শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র(১৮১৪-৮৩) বাংলা ও ইংরেজি লেখায় দক্ষ। রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০) এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গের প্রথম আবিষ্কারক, মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩- ৯৮) ভাবুক, ভক্ত ব্রাহ্মরূপে এবং অনাড়ম্বর শিক্ষক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। শিবচন্দ্র সিংহ (১৮১১-৯০) এবং হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১১-৯০) ছিলেন সেকালে ব্রাহ্মসমাজের স্তম্ভবিশেষ।

বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'সমাজ-চেতনার পুরোগামী মুখপাত্র ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দল। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের চোরাগলিতে তাঁদের নবীন উদ্যমের অনেকটা অপচয় হলেও, সমাজসংস্কার আন্দোলনের আবশ্যকতাও তীব্রভাবে তাঁরা অনুভব করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের সমস্ত উচ্ছৃংখলতা ও অসংযমের কথা স্বীকার করেও তাঁদের এই যুগোপযোগী মনোভাবকে অস্বীকার করা যায় না। একদিকে তাঁরা যেমন ভেঙেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে নতুন করে গড়ে তোলার মতন ভিত রচনা করতেও চেষ্টার ক্রটি করেন নি। তাঁদের এই মনোভাবটাই ছিল ঐতিহাসিক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, যুক্তি ও বুদ্ধির অগম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের মনোভাবকে বাইরে সাহস করে প্রকাশ করার মতন চারিত্রিক দৃঢ়তা ইয়ং বেঙ্গলের ছিল।' প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকে ইংরেজির সান্নিধ্যে এদেশে প্রগতি চিন্তার যে উদ্দাম স্রোত প্রবাহিত হয়ে গেছে তার একটা বড় ঢেউ ছিল ইয়ং বেঙ্গল।

ইয়ং বেঙ্গলের গুরু ডিরোজিওর শিক্ষা পুঁথির শিক্ষা ছিল না, ছিল সত্যজিজ্ঞাসার শিক্ষা। ডিরোজিও একটি চিঠিতে তা যেভাবে ব্যক্ত করেছিলেন তার বঙ্গানুবাদ এ রকম : 'আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার নিয়ে তাদের মন থেকে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর করতে তৎপর হলাম। আমি এই একটি বিষয় নিয়ে তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কী কী যুক্তি থাকা সম্ভব, তা বুঝিয়ে দিতাম। মনে একটি সন্দেহের পরে সন্দেহের উদয় হবে, ফলে সকল বিষয়েই অবিশ্বাস জন্মাবে।'

নাস্তিকতা ও আস্তিকতা দু বিষয়েই সন্দেহসঙ্কুল জিজ্ঞাসায় সমান উৎসাহ দিতেন ডিরোজিও। সত্য ও নির্ভীকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ডিরোজিওর শিষ্যদের বিদ্রোহ-স্ফুলিঙ্গ দেখে তৎকালীন হিন্দু নেতারা যেমন চমকিত হয়েছিলেন, তেমনি ইংরেজরাও বিস্মিত হন। ডিরোজিওর উদ্যোগের পরিণামে সমকালীন রক্ষণশীল সমাজে অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে তিনি নিন্দিত হয়েছিলেন এবং হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা থেকে পদত্যাগও করতে হয়েছিল।

১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার আবির্ভাবকালে ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহ ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যায়। 'মদ্য ও নিষিদ্ধ মাংস ও ইংরেজি বই দিয়ে ইয়ং বেঙ্গল প্রকাশ্যে নিজেদের বলিষ্ঠ বিশ্বাস ঘোষণা করেছিলেন'—তা পরবর্তীকালে বিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়। ফলে ইয়ং বেঙ্গল অপবাদের কলঙ্কভাগী হয়ে পড়ে। ইয়ং বেঙ্গলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গোপাল হালদার লিখেছেন, 'ইয়ং বেঙ্গরের নাম কতকটা অন্যায়রূপেই পরবর্তীকালে মসীলিপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁরা ধূমকেতু নন, আশ্চর্য জ্যোতিষ্ক। এঁদের মধ্যে ফরাসি বিপ্লবের প্রেরণা ও ব্রিটিশ র‍্যাডিকেলদের ধারণা একসঙ্গে জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু সে অগ্নিশিখাকে বিপ্লবের মশালে বা সংস্কারের প্রদীপে প্রায় কেউ ধরে রাখতে পারে নি।' ইয়ং বেঙ্গল হিসেবে যাঁরা পরিচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে যে বিদ্রোহী মনোভাব কার্যকরী ছিল তা বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিল। হিন্দু কলেজের এই শিক্ষাদর্শের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার মুক্তমনের ক্ষেত্রে যে নতুন জীবনধর্মের বীজ বপন করেছিলেন, সেই মুক্তমনের

ক্ষেত্রটি সৃষ্টি করেছিল হিন্দু কলেজ, আর তার প্রধান স্রষ্টা ছিলেন ডিরোজিও। উনিশ শতকের বাংলার সমাজ বিপ্লবের ইতিহাসে এখানেই ডিরোজিওর যথার্থ স্থান।

বস্তুতপক্ষে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালি জ্ঞানবিজ্ঞানের এক নতুন জগতের সন্ধান লাভ করে। এই শিক্ষার আলোকে বাঙালি মধ্যযুগীয় আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং নিজেদের সম্পর্কেও পর্যালোচনা করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় জীবনের অনগ্রসরতার স্বরূপ উপলব্ধি করা ইংরেজি শিক্ষার মাপকাঠিতেই নির্ণীত হয়েছিল। নিজেদের পশ্চাদপদ অবস্থা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সচেতন হয়ে ওঠে। তখন বাঙালির মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয় এবং স্বীয় জাতীয় গৌরব প্রকাশে তৎপরতা দেখায়। আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পরবর্তীকালেও এর সম্প্রসারণ ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ করা যায় : 'পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা আমাদের রুদ্ধ জীবনের ক্ষেত্রে বাতায়নের মত কাজ করিয়াছিল,—এদিক ওদিক চাহিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি, আমাদের সীমাবদ্ধ পরিধির বাহিরে চলিয়াছে বিশ্বজীবনের কি বিরাট ঘূর্ণাবর্ত, এক মুহূর্ত তাহার বিরাম নাই,—কত সংঘর্ষ, সংগ্রাম এবং মিলনের ভিতর দিয়া রচিত হইয়া চলিয়াছে বিশ্বজীবনের ইতিহাস,—তাহার আবর্ত হইতে পাশ কাটাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার কাহারও অধিকার নাই,—সে চেষ্টাও আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র। এই সুদূর প্রসারী দৃষ্টি লইয়া গড়িয়া উঠিতে লাগিল আমাদের জাতীয় জীবন—তাহারই ছায়া পড়িল আমাদের জাতীয় সাহিত্যে।'

বাঙালির মনে দেশের প্রতি ভালবাসা অনুভূত হয় ইংরেজি সাহিত্যের সান্নিধ্যে এসে। মাতৃভূমির মর্যাদা সম্পর্কে বাঙালির হৃদয়ে আগ্রহ জাগে এবং পরিণামে দেশের বিভিন্নমুখী কল্যাণব্রতে তারা উদ্দীপ্ত হয়। ইংরেজি সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করে বাঙালি শিক্ষিতেরা আত্মপ্রকাশের জন্য উদগ্রীব হয়; ফলে তাদের মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা আসে। ইংরেজি সাহিত্যের রূপগত বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে।

ইংরেজি শিক্ষার ফলে এ দেশে এক রেনেসাঁর বিকাশ ঘটে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজি শিক্ষার ফলে বাঙালি জীবনে মহৎ ভাবের প্রেরণা আসে। ইংরেজির মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষিত বাঙালি নিজেদের জীবনকে এক নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়। সমাজে ধর্মে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে নবরূপায়ণের যে বিস্ময়কর প্রচেষ্টা চলে তাতে রেনেসাঁর বৈশিষ্ট্য নিহিত। ইংরেজি শিক্ষাই বাঙালিকে অতীতের জীবনের সংস্কারমুক্তির প্রেরণা দান করে এবং আধুনিক জীবনের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। বাঙালিজীবনের এই ব্যাপক পরিবর্তন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে।

মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য বলতে কাব্যই বোঝায়। তখন পর্যন্ত গদ্যের প্রয়োগ সাহিত্যে হয় নি। ১৮০০ সালের পর গদ্যের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যমুখী করে তোলে। কাব্যের পাশাপাশি গদ্যনির্ভর সাহিত্যের বিকাশের ফলে এর পরিধি ব্যাপক হয় এবং অসংখ্য কবিসাহিত্যিক সাহিত্য রচনায় তৎপরতা প্রদর্শন করেন। তবে ১৮০০ সাল থেকে আধুনিক যুগ ধরা হলেও ঠিক এই সময় থেকেই আধুনিকতার সমুদয় লক্ষণ ফুটে ওঠে নি; বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কবিসাহিত্যিকের রচনায় তা ছড়িয়ে আছে।

কালগত যুগবিভাগ সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাধান্য পেলেও প্রকৃতিগত লক্ষণের মাধ্যমেই যথার্থ যুগবিভাগ চিহ্নিত হতে পারে। সাধারণত যুগধর্ম সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে কিছু স্বাতন্ত্র্যসূচক চিহ্ন দান করে। এই চিহ্নই এক যুগ থেকে আরেক যুগকে পৃথক মর্যাদা দেয়। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের কতকগুলো বিশেষ লক্ষণ রয়েছে, সে সব মধ্যযুগের ভাবপরিমণ্ডল থেকে আধুনিক যুগকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। ক্রমান্বয়ে সে সব লক্ষণ উল্লেখ করা গেল।

মানবিকতা

মানবিকতা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় লক্ষণ বলে বিবেচিত। আধুনিক সাহিত্য মানবজীবনের সুখদুঃখ আনন্দবেদনাময় অনুভূতির প্রকাশরূপ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় বিষয় ছিল একমাত্র উপজীব্য। তখনকার সাহিত্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্যপ্রকাশক মঙ্গলকাব্যগুলো ব্যাপক পরিসর অধিকার করে রেখেছিল। পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর সেসব কাহিনিতে মানুষের কথা নেই। বৈষ্ণব পদাবলিও ধর্মমূলক সাহিত্য। জীবনী সাহিত্যে ও অনুবাদ সাহিত্যে ধর্মের বিষয়ই রূপায়িত হয়েছে। মানুষের কাহিনি এই সমস্ত কাব্যে স্থান পায় নি। অলৌকিকতার অবতারণায় মধ্যযুগের সাহিত্যসৃষ্টি ছিল বাস্তবতাহীন—অসংখ্য দেবদেবীর মহিমার আড়ালে মানুষের জীবন ঢাকা পড়েছিল। অনুকরণপ্রিয়তার জন্য মানবজীবনের কথার অনুপ্রবেশ ঘটার কোন সুযোগ সেখানে ছিল না। উনিশ শতকের প্রারম্ভে ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের সান্নিধ্যে এসে যখন বাঙালির মানসিক পরিবর্তন ঘটল তখন মানুষের প্রতি কবিসাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে তখন মানুষ হয়ে ওঠে সাহিত্যের উপজীব্য। নবযুগের মানুষ নিজের সৃষ্টিশক্তিতে বিশ্বাসী, জীবনের অভাবনীয় সম্ভাবনায় মানুষ এখন আস্থাশীল। আধুনিক যুগে এই মানবধর্মই সাহিত্যের ধর্ম হয়ে উঠল। আধুনিক যুগে মানুষের মহিমা ঘোষণার মাধ্যমে বিধাতা থেকে দৃষ্টি ফিরে এল মানুষের দিকে। মানব জীবন আর ভাগ্যই হল সাহিত্যের আলোচনার বিষয়। মানুষ এখন দেবত্বের স্থান অধিকার করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল সাহিত্যের আঙিনায়। মানুষকে মানুষের প্রাপ্ত মর্যাদা এযুগে দেওয়া হল, সমস্ত মিথ্যা ভয় ও দুর্বলতা থেকে মানুষকে রেহাই দেওয়া হল। তাই মধুসূদনের কাছে অবতার রামচন্দ্রের চেয়ে রাবণ ও মেঘনাদ শ্রেষ্ঠ। নবীনচন্দ্র সেনের শ্রীকৃষ্ণ, অমিতাভ, খ্রিস্ট মানুষ হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে মানবিক গুণের পূর্ণতার আদর্শ মানুষ বলে বিবেচনা করেছেন। ক্রমে ক্রমে সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। কাব্যে-মহাকাব্যে, গল্পে-উপন্যাসে, নাটকে-প্রবন্ধে ব্যাপক ভাবে মানুষকে স্থান দেওয়া হল। মানুষের আনন্দ বেদনার রূপায়ণ আধুনিক সাহিত্যের সর্বত্র বিরাজমান। মাধুর্যময় মানব-জীবনযাত্রা আর জীবনের সহজ সরল সৌন্দর্য মর্যাদা লাভ করে তা সাহিত্যের অঙ্গনে সাদর আমন্ত্রণ পেল। সাহিত্যের কোন কোন ক্ষেত্রে পৌরাণিক কাহিনি আনয়ন করা হলেও সেখানকার দেবদেবীর চরিত্র মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হয়েছে। এই মানবিকতা বা লৌকিক জীবনচিত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে।

ব্যক্তিচেতনা

ব্যক্তিচেতনা আধুনিক যুগের অপর লক্ষণ। ব্যক্তি হিসেবে মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগের কাব্যে পরিদৃষ্ট হয় নি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে ব্যক্তির অধিকার এখন শ্রদ্ধার বস্তু। ব্যক্তির মর্যাদা, ব্যক্তিগত প্রেমভালবাসা এখন সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে। আধুনিক সাহিত্যে মানুষের গোষ্ঠিগত পরিচয় গুরুত্ব পায় নি, গুরুত্ব পেয়েছে ব্যক্তিসত্ত্বা। একজন বিশেষ ব্যক্তি তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে সাহিত্যে রূপ লাভ করেছে। মানুষের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আনন্দবেদনা, তার ব্যক্তিগত অনুভূতি এই পর্যায়ের সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে। আলাদাভাবে পরিচিত হওয়ার প্রবণতা এ যুগের বৈশিষ্ট্য। এ সময়ের সাহিত্যে নিজেকে যেমন দেখা যায়, তেমনি চারপাশের মানুষের স্বতন্ত্র পরিচয়ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাইকেল মধুসূদনের কাব্যে তা সর্বপ্রথম দেখা দেয়। তাঁর পূর্ববর্তী রচনায় পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য অবর্তমান ছিল, চরিত্রগুলো ছিল টাইপ জাতীয়। মেঘনাদবধকাব্যে ও চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে মধুসূদন এই নতুন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন।

আত্মচেতনা ও আত্মপ্রসার

আত্মচেতনা ও আত্মপ্রসার আধুনিক সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত। কবিহৃদয়ের যথার্থ প্রতিফলন বাংলা কাব্যে আধুনিক যুগের পূর্বে পরিলক্ষিত হয় নি। এযুগে কবিদের ভাবনা কল্পনার পরিসীমায় বাইরের বস্তুর চেয়ে অন্তরের অনুভূতির মূল্য অনেক বেশি। কবিমনের নিজস্ব অনুভূতি উপলব্ধির নিদর্শন এতদিন অবর্তমান ছিল। নিজের হৃদয়কে দেখার সম্ভাবনা এই সময়ে প্রবল হয়। গীতিকবিতার পরিসীমায় এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সহজে পাওয়া যায়। কবিমনের বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুভূতি গীতিকবিতায় রূপ লাভ করে। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলা কবিতায় এই বৈশিষ্ট্যের প্রথম পরিচয় দেন। আত্মকেন্দ্রিকতার লক্ষণ তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে। কবির নিজের হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের মধ্যে অথবা নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বিহারীলালের কবিপ্রতিভা বিকাশের মূলে তা কার্যকরী ছিল। কবিহৃদয়ের উপলব্ধ অনুভূতিকে পাঠকসমাজের জন্য পরিবেশনার মধ্যে কবির আত্মপ্রসারের বৈশিষ্ট্য নিহিত। কবির বক্তব্যের সর্বজনীনতা এই যুগেই প্রথম বারের মত প্রকাশ পায়। কবিসাহিত্যিকের নিজের কথা এখন সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য। সর্বজনীনতার জন্য সাহিত্য এখন সকলের কাছে আবেদনশীল। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় কবির ভাবনা আত্মকেন্দ্রিকতা ছাপাইয়া রূপরসের বিশ্বে সম্প্রসারিত হইয়া দ্যুলোক-ভূলোককে একাকার করিয়াছে, প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের সুর একতারে গাঁথিয়া গিয়াছে।'

সমাজচেতনা

সমাজচেতনা আধুনিক যুগের অপর লক্ষণ। ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সান্নিধ্যে এসে বাঙালির যে মানসিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয় তার প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখা দেয়। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গকবিতাগুলো এর নিদর্শন। বিজাতীয় আচার ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতে সমাজচেতনার প্রকাশ—সে সময়কার পাঠ্যপুস্তক ও সামাজিক নাট্যরচনায় তার পরিচয় স্পষ্ট। বাংলা নাট্যসৃষ্টির আদিপর্বে

সমাজচেতনাই বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ লেখকের রচনাতেও এর নিদর্শন মিলে। সমাজ সম্পর্কে চিন্তা এবং এর কল্যাণব্রতে আধুনিক যুগের লেখকগণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে উনিশ শতকের সকল শ্রেণির সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটেছে।

দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ

দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। পাশ্চাত্য প্রভাবে স্বদেশের সঙ্গে এদেশীয় লোকের নতুন পরিচয় সাধিত হয়। স্বাধীনতাচেতনা ও স্বদেশভক্তি রেনেসাঁর ফসল। মধ্যযুগের রাজানুগত্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চেতনাবোধের উদ্ভব ও দেশীয় ঐতিহ্যচর্চার বিকাশ ঘটে। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রমুখ কবির রচনায় এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উজ্জ্বল।

রোমান্টিকতা

আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে রোমান্টিকতার কথাও উল্লেখযোগ্য। নতুন যুগের সাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্যের রোমান্টিক কাব্যের আদর্শে প্রভাবান্বিত হয়েছে। কল্পনা-প্রবণতার অসাধারণ বিকাশই হচ্ছে রোমান্টিক কবিতার লক্ষণ। বাংলা গীতিকাব্যে রোমান্টিসিজম প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজ কবি শেলীর স্বাধীন চিত্তবৃত্তি অতীন্দ্রিয়তা ও ভাবোন্মত্ততা, কীটসের সৌন্দর্যচেতনা, ব্রাউনিঙের মিস্টিসিজম, ওয়ার্ডসওয়ার্থের অতি সাধারণ বস্তুতে গভীর আনন্দ উপলব্ধি, টেনিসনের শব্দশিল্পের সৌষ্ঠব—পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য কবি বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে বাংলা গীতিকবিতার ধারায় অনুসৃত হয়েছে। রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্যানুসারে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যসম্ভার কবির দৃষ্টিতে নতুনভাবে ধরা পড়ে কাব্যকে রসমণ্ডিত করে তুলেছে। এ যুগে এসে কবিরা প্রকৃতির অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্যকে নতুন করে প্রত্যক্ষ করলেন, তাঁরা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনকে মিলিয়ে নিলেন।

মৌলিকতা

মৌলিকতা আধুনিকতার অন্য একটি লক্ষণ। মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ছিল অনুবাদ ও অনুকরণমূলক। সে আমলে একই বিষয়াবলম্বনে বহু কবি কাব্যরচনা করে গতানুগতিকতা ও মৌলিকতাহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্যে, বৈষ্ণব পদাবলি প্রভৃতি কাব্যের সুবিস্তৃত ধারায় অসংখ্য কবিকণ্ঠ একই বাণী উচ্চারণ করেছে। কিন্তু আধুনিক যুগে মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা আসে। এই যুগে ইতিহাস বা পুরাণের কাহিনিরও নবরূপায়ণ হয়েছে। সর্বোপরি, জগৎ ও জীবনের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে গৃহীত হয়ে মৌলিকতার পরিচয়টি বড় করে তুলেছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা, রঙ্গলালের কাব্যে গতানুগতিকতা পরিহার করে ভাবের নতুনত্ব ফোটানো হয়েছে। এমন কি মধুসূদন পুরাণকে নতুন রূপদান করেছেন। মধ্যযুগে যে ক্ষেত্রে এই ধরনের ধর্মীয় বিষয়বস্তু অবলম্বনে অসংখ্য কবি কাব্য রচনা করেছিলেন, আধুনিক যুগে তা অনুসৃত না হয়ে বিষয়বৈচিত্র্য সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে।

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন প্রমুখ কবিসাহিত্যিকগণের সৃষ্টিতে বিষয়ের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় এই লক্ষণটি প্রথমবারের মত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মুক্তবুদ্ধি

মুক্তবুদ্ধি আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ হিসেবে বিবেচ্য। গতানুগতিকতার ধারায় এ যুগের কবিসাহিত্যিকগণ সাহিত্যসৃষ্টি না করে মুক্তবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছেন। তাই গতানুগতিক বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়ে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। যা কিছু পুরাতন তাই সত্য—এই প্রবণতা পরিত্যক্ত হয়ে তা যুগোপযোগী জ্ঞানের আলোকে যাচাই করার বৈশিষ্ট্য এ যুগে প্রকাশমান। যুক্তি ও বিচার দ্বারা সব ধ্যানধারণা যাচাই করার প্রবণতা এ সময়ে দেখা যায়। যুক্তিবাদ এ সময়ের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। এই সময়ে পুরাতন ভাবধারার নবমূল্যায়নও হয়েছে। মধুসূদনের চরিত্রসৃষ্টিতে এই লক্ষণ দেখা যায়।

নাগরিকতা

সাহিত্যে নাগরিকতা প্রবেশ করে এই সময়ে। আধুনিক যুগে শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রস্থল হল নগরগুলো। সেখানকার জীবন অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস এযুগে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। নগরকেন্দ্রিক সাহিত্যের বিকাশ এই যুগের বৈশিষ্ট্য। নাগরিকতা মধ্যযুগে ছিল না। এই গুণের জন্যই পাশ্চাত্য ভাবধারা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। তাই বাংলা সাহিত্য এখন নাগরিকতার মাধ্যমে বিশ্বপথিক। দেশবিদেশের বহু চিন্তাভাবনার কলোল্লাস এখন বাংলা সাহিত্যে।

আঙ্গিকের রূপান্তর

আঙ্গিকের রূপান্তর আধুনিক যুগের অন্যতম লক্ষণ। প্রাক-আধুনিক কাল পর্যন্ত সাহিত্য বলতে শুধু কাব্যই বোঝাত। বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যময় রূপ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। গদ্যভিত্তিক উপন্যাস ছোটগল্প নাটক প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনারীতির আদর্শ এই সময়ে বিকশিত হয়। এমনকি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী কাব্যধারার মধ্যেও বৈচিত্র্য আসে। মহাকাব্য গীতিকবিতা খণ্ডকবিতা ইত্যাদি আঙ্গিকগত রূপান্তর এই সময়কার বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যের বিচিত্র প্রজাতি সম্পর্কে লেখকেরা এ সময়ে সচেতন হয়ে ওঠেন। এ যুগের লেখকেরা শিল্প সচেতনতার বিষয়ে তৎপর হন। শব্দ ব্যবহারের বিচিত্র কৌশলও এই সময়ে আবিষ্কৃত হয়। ছন্দের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য ঘটে এই সময়ে। চরিত্রচিত্রণ পাশ্চাত্য আদর্শানুযায়ী ঘটে এবং কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাব পাশ্চাত্য কাব্যের প্রেরণায় রূপায়িত হতে থাকে। সভ্যতা-সংস্কৃতির সম্প্রসারণে মানবজীবনের যে সহস্রমুখী প্রসার ঘটেছে তাকে রূপায়িত করার জন্য গ্রহণ করতে হয়েছে এসব বিচিত্র পন্থা—গদ্য পদ্যের নানা ধারা, ছন্দ ও রীতির নানা কৌশল। চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নানা দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল তাতে কবিতার ভাষা অপর্যাপ্ত বিবেচিত হয় এবং গদ্য ভাষারীতির উপযোগিতা অনুভূত হয়। সাহিত্যিক গদ্যের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যকে বহুমুখী বৈচিত্র্য দান করে। সেই সঙ্গে সাময়িক পত্র ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

মুদ্রণযন্ত্র

মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন-আধুনিকের ভেদরেখা টেনে দিয়েছে। 'প্রাচীন সাহিত্য হাতে-লেখা, কণ্ঠ-আশ্রিত ও পুঁথিবাহিত, অপ্রাচীন সাহিত্য ছাপা বই-সম্প্রসারিত।' ছাপাখানার আনুকূল্যে সাহিত্যসৃষ্টিতে গতিশীলতার প্রেরণা এসেছে। স্বল্পসংখ্যক পাঠকের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে সাহিত্য সকল মানুষের সম্পদ হয়ে ওঠার সুযোগ মুদ্রণযন্ত্রেরই দান। এর ফলেই সাময়িক পত্রের প্রকাশ হয়েছে ত্বরান্বিত। মুদ্রণযন্ত্রের জন্যই বিপুল পরিমাণ সাহিত্যসৃষ্টি বিচিত্ররূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সুসমৃদ্ধ করেছে।

আধুনিক যুগের এই সমস্ত লক্ষণের পশ্চাতে ইংরেজদের সংস্পর্শে লব্ধ প্রভাব ব্যাপক ভাবে প্রকাশমান। বলা বাহুল্য, আধুনিক যুগের সকল লক্ষণ কোন একজন কবি বা সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে নির্ভর করে নি—বিভিন্ন জনের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় তা ফুটে উঠেছে। তাই ১৮০০ সাল থেকে আধুনিক যুগ ধরা হলেও, ১৮৬০ সাল থেকে অর্থাৎ মধুসূদনের সময় থেকেই যথার্থ আধুনিক যুগের প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

আধুনিক যুগের সাহিত্য স্বল্প সময়ের মধ্যেই স্বকীয়তা অর্জন ও বৈশিষ্ট্য বিকাশে সমর্থ হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের উন্মেষের পর হাজার বছরে যে সমৃদ্ধি ঘটেছে, তার চেয়ে বহু বেশি গুণ সমৃদ্ধ হয়েছে আধুনিক যুগের এক শ বছরে। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা লাভ সম্ভব হয়েছে। ছাপাখানা, পত্রপত্রিকা ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সাহিত্যের সম্প্রসারণে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। আধুনিক যুগে ব্যাপক ভাবে সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্যের পাঠক। এ যুগে বইপত্র হয়েছে সহজলভ্য। পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ ঘটেছে। অসংখ্য পাঠকের বৈচিত্র্যপূর্ণ রুচির দাবি মিটাতে রচিত হয়েছে নানা ধরনের সাহিত্য। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব এসেছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হাতে। ফলে মানসম্পন্ন রচনার যে কোন লেখকই জীবিকার জন্য তেমন উদ্বিগ্ন নয়। লেখাকে পেশা হিসেবে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার সুযোগ এসেছে আজকের যুগে।

সাহিত্যের পরিধি বিস্তারের মধ্যে আধুনিকতার পরিচয় নিহিত। সাহিত্যরূপের যেমন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি ঘটেছে উৎকর্ষের পরিচয়। সাহিত্য এখন নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। এককেটি শাখারও নানা উপশাখা সৃষ্টি হয়ে সাহিত্যকে করে তুলেছে বৈচিত্র্যধর্মী।

আধুনিক যুগে পাঠকের মন ও রুচি দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। এই রুচি পরিবর্তনের জন্য অজস্র সৃষ্টি যেমন সহায়তা করেছে, তেমনি পরিবর্তিত রুচির জন্যও সাহিত্য সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের সৃষ্টি হয়েছে।

ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব নানা ভাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা আনয়নে সহায়ক হয়েছে। আধুনিকতার বাণী ইংরেজি সাহিত্যে অনেক আগেই অনুরণিত হয়ে উঠেছিল। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিকতায় অবগাহন করা বাঙালির জন্য সহজ হয়। সাহিত্যের আদর্শ, রূপকাঠামো, শব্দ সৃষ্টি ও ব্যবহার, ভাব ও ভাষার অবয়ব নির্মাণে ইংরেজি শিক্ষা সহায়তা দিয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত সাহিত্যের অবদানও ইংরেজির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এসেছে।

পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞান সাধনার সুফল, ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের প্রভাব জ্ঞানচর্চার নতুন নতুন দিগন্ত ইত্যাদি আধুনিকতার নির্মাণে বাংলা সাহিত্যে অবদান রেখেছে। সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠ ভাবধারা পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। ফলে আধুনিক যুগের লেখকদের জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে এবং সাহিত্য মানব জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হয়। মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে সাহিত্যে এসেছে দেশপ্রেম, মানবপ্রীতি, প্রকৃতিচেতনা, জীবনবোধ, বুদ্ধির মুক্তি। সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে মানব কল্যাণধর্মিতা। সাহিত্য হয়ে উঠেছে মানব মাহাত্ম্যের পরিচয় বাহক, সাহিত্যে এসেছে বস্তুতান্ত্রিকতা। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মানববাদ আর সাংস্কৃতিক জাগরণ আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করেছে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথমেই পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাবে বাঙালি কবিসাহিত্যিকদের চিন্তাচেতনায় যে পরিবর্তন এল তাতে জগৎ ও জীবনকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা, ঐতিহ্যে পুনরুজ্জীবন, প্রচলিত ধ্যানধারণার প্রতি উপেক্ষা, প্রকৃতি ও জীবনকে নতুন করে দেখা, জীবনে কর্মে ও সাহিত্যে দেশাত্মবোধের প্রতিফলন প্রভৃতি সম্ভব হয়েছিল। এর ফলেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মনোধর্মের পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশে ইংরেজদের অধিকার বিস্তারের ফলে জনগণের মনে নিজেদের বিষয়ে যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছিল তা মধ্যযুগ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি পাশ্চাত্য প্রভাব নতুন যুগসৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করেছে।

আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে কবিসাহিত্যিকগণের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যের জন্য সাহিত্যসৃষ্টি স্বকীয়তায় ও বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগের কবিরা গোষ্ঠীভুক্ত থেকেই ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেন। ফলে প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য দেখালেও গোষ্ঠীর বাইরে যেতে পারেন নি। মধ্যযুগে কবির সংখ্যা অনেক, কিন্তু বিষয়বৈচিত্র্য কম। বিষয়ের বৈচিত্র্যের অভাবে বড় প্রতিভাশালী কবিগণও সৃষ্টির সর্বোত্তম নিদর্শন দেখাতে পারেন নি। কিন্তু আধুনিক যুগের লেখকদের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রেক্ষিতে তাঁদের অবদান হয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ, উজ্জ্বল শিল্পাদর্শযুক্ত, স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যের জন্যই অসংখ্য গল্পে উপন্যাসে নাটকে ঐক্য নেই—বিষয়ে, চরিত্রে, বর্ণনায়, শব্দ ব্যবহারে কোথাও মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আলোকের পাশেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখকে চিনতে কোন অসুবিধাই হয় না। ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের প্রাধান্যের ফলে নতুন নতুন ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিভার স্বতন্ত্র স্বাক্ষর রাখার সুযোগ ঘটেছে কবিসাহিত্যিকদের। আধুনিক যুগের লেখকরা অধিকাংশই এসেছেন মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে। ফলে মধ্যবিত্ত সমাজচিত্রের প্রতিফলনে এ যুগের সাহিত্য বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলা গদ্যের সূচনার মাধ্যমে যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল সেখান থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের বাংলা গদ্য, গল্প উপন্যাস নাটক কাব্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টিতে আধুনিক যুগের পরিচয় স্পষ্ট করে তুলেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিস্ময়কর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যে মর্যাদাপূর্ণ আসন দান করেছে।

পরবর্তী পর্যায়েও আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রয়েছে। আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেই পরবর্তী কালের সাহিত্যসৃষ্টির গুরুত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করা হয়েছে এবং

তা অতি-আধুনিক যুগের বা সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সাহিত্য গতিশীল বলে কোন বিশেষ যুগে এসে থেমে যায় না। সেজন্য আজকের দিনেও সাহিত্যসৃষ্টির উজ্জ্বল নিদর্শন সহজেই লক্ষ করা যায়। সমকালীন সাহিত্যের এই উজ্জ্বলতা পাঠককে আধুনিক মানসিকতার প্রতিফলন বলে আকৃষ্ট করছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের লক্ষণ কি? এই লক্ষণ কখন হইতে এবং কিভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা প্রকাশ কর।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক যুগের আরম্ভ কোন সময় হইতে ধরা হইয়া থাকে এবং কেন? পূর্ববর্তী কালের তুলনায় এ যুগের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি কি?

৩। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ হইল সমাজ ও ব্যক্তিসচেতনতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা ও তাহার প্রসার।'—বাংলা কাব্যে এই লক্ষণগুলি কিভাবে পাওয়া যায় দেখাইয়া আধুনিক যুগের কাব্যেতিহাস আলোচনা কর।

৪। 'ইংরেজি সাহিত্যের রসগ্রাহী শিক্ষিত বাঙালির চিত্তে যে আত্মসম্মানবোধ দেশপ্রীতি ও আত্মপ্রকাশেচ্ছা জাগ্রত হইল তাহাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রেরণার মূলে রহিয়াছে।'—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ধারা বর্ণনায় উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার কর।

৫। ইংরেজি সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা উপলক্ষে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

৬। 'ইয়ং বেঙ্গলেরা ধূমকেতু নন, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশ তাঁরাই ত্বরান্বিত করেছিলেন।'—আলোচনা কর।

৭। 'ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতাই সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশ ত্বরান্বিত করেছিল।'—ইয়ং বেঙ্গল বলিতে কি বুঝ?

৮। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যুগচেতনা কিভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, কতিপয় কবি ও সাহিত্যিকের রচনা হইতে প্রমাণসহ সে বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখ।

৯। মূলত পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষ করিয়া ইংরেজি সাহিত্য হইতে আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রাণশক্তি লাভ করিয়াছে। কাব্যের ক্ষেত্রে এই প্রাণশক্তি অর্জনে কোন কোন কবির অবদান সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য এবং কেন আলোচনা কর।

১০। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব নগরকেন্দ্রিক ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও বিকাশের সঙ্গে একান্তভাবেই সম্পর্কিত।'—আলোচনা কর।

১১। 'একটি নূতন নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব এবং বিকাশের ফলেই উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে।'—একজন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই মন্তব্য বিশ্লেষণ কর।

১২। 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি জীবনে যে রেনেসাঁ আসিয়াছিল, আধুনিক বাংলা সাহিত্যেই উহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।'—উক্তিটি কতদূর গ্রহণযোগ্য?

১৩। মধ্যযুগের সাহিত্যের তুলনায় আধুনিক যুগের সাহিত্য অধিকতর সমৃদ্ধ কিনা তাহা যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে পর্যালোচনা কর।

১৪। আধুনিকতার লক্ষণ কি? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূত্রপাত কখন ও কি ভাবে হইল সে সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

১৫। টীকা লিখ : ইয়ং বেঙ্গল।

দ্বিতীয় অধ্যায়
গদ্যের উৎপত্তি ও বিকাশ

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের পূর্বে সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ কোন গদ্যরচনার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। দৈনন্দিন জীবনে বাঙালির কথাবার্তায় চিরদিন গদ্যরীতি ব্যবহৃত হলেও উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্যে তার অনুপ্রবেশ ঘটে নি এবং এর লিখিত রূপ চিঠিপত্র, দলিলদস্তাবেজ, বৈষ্ণব কড়চা ও বিদেশি খ্রিস্টানকর্তৃক লিখিত ধর্মবিষয়ক গ্রন্থের সঙ্কীর্ণ সীমানায় আবদ্ধ ছিল। ১৫৫৫ সালে আসামরাজকে লেখা কোচবিহারের রাজার একটি পত্রকে বাংলা গদ্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়। ষোল শতক থেকে গদ্যরীতির সূচনা হলেও উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে নিতান্ত প্রয়োজনের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে ভাষাগত দিক থেকে গদ্যের উৎকর্ষসাধন মোটেই সম্ভবপর হয় নি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছুসংখ্যক দৃষ্টান্ত অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হলেও বাণিজ্যসম্ভারের পশ্চাতে খ্রিস্টধর্মের পসার সাজিয়ে আগত পর্তুগিজ পাদ্রিদের হাতেই বাংলা গদ্যের ব্যাপক ব্যবহারের সূত্রপাত হয়।

ড. সুকুমার সেন বাংলা গদ্যরীতির চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন। সে স্তরগুলোর পরিধি :

প্রথম স্তর : সূচনা—ষোল শতক থেকে ১৮০০ সালের পূর্ব পর্যন্ত।

দ্বিতীয় স্তর : উন্মেষ—১৮০০ (শ্রীরামপুর মিশন) থেকে ১৮৪৭ সালের (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের) পূর্ব পর্যন্ত।

তৃতীয় স্তর : অভ্যুদয়—১৮৪৭ (বিদ্যাসাগর) থেকে ১৮৬৫ সালের (বঙ্কিমচন্দ্রের) পূর্ব পর্যন্ত।

চতুর্থ স্তর : পরিণতি—১৮৬৫ (বঙ্কিমচন্দ্র) থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

পুরানো গদ্য

বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে যে সব গবেষণা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে সুদূর ষোল শতক থেকেই গদ্যের ঐতিহ্যের যথেষ্ট প্রমাণ মিলে। ড. আনিসুজ্জামান তাঁর 'পুরানো বাংলা গদ্য' গ্রন্থে এ বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। সে আমল থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত নিদর্শনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে সে ঐতিহ্য সম্পর্কে আকর্ষণীয় ধারণা দান করেছেন। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন, 'ষোল শতক থেকে মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে বাংলা গদ্যের—কাজের গদ্যের এবং ভাবের গদ্যের—নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এই সময় থেকে এমন নিদর্শন পাওয়ার একাধিক ঐতিহাসিক কারণ আছে। ইলিয়াস শাহি সুলতানেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, একথা সর্বজনবিদিত। তাই শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়, রাজরাজড়ার চিঠিপত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, দলিল-দস্তাবেজে বাংলার যথেষ্ট ব্যবহার

ঘটেছিল।... ষোল সতের শতকে আসাম, কাছাড়, কোচবিহার, ত্রিপুরা ও মল্লভূমির মত রাজ্যে সরকারি কাজের ভাষাও ছিল গদ্য।'

রাজনৈতিক পরিসরের বাইরে ষোল শতকে বৈষ্ণব মহাজনেরা গৌড়ীয় ধর্ম প্রচারে গদ্যের ব্যবহার করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। যোগ্য নেতৃত্বের অবর্তমানে বৈষ্ণব সাধনার প্রকট সমস্যা সমাধানের ভাষা হিসেবে গদ্যের মাধ্যমে বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের ব্যাখ্যা দান করা হয়। ধর্মীয় বিষয়বস্তু অবলম্বনে গদ্যের বিচিত্র বিকাশের এই ধারাটি পরবর্তী পর্যায়ে খ্রিস্টীয় ধর্মসাধকদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।

ধর্মের বিষয়ের বাইরেও পুরানো আমলের বাংলা গদ্যের পদচারণা হয়েছে। সে আমলের বিভিন্ন পত্রে ও অনুশাসনে এসবের নিদর্শন বিদ্যমান। বিভিন্ন সময়ে শাসকদের মধ্যে আদান-প্রদান হয়েছে এমন পত্রের সংখ্যাও কম নয়। ব্যক্তিগত পত্র, ফর্দ, দলিল, চুক্তিপত্র ও আরজি—এ সবের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কালের বিবর্তনে এ সবের পরিসরও বৃদ্ধি পেয়েছে। নেপালে পাওয়া কোন কোন নাটকে বাংলা ভাষার নিদর্শন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

পুরানো বাংলা গদ্যের এই বৈচিত্র্যময় নমুনা সৃষ্টির পিছনে বাস্তব প্রয়োজনই প্রাধান্য লাভ করেছিল। পরবর্তী কালে গদ্যের বিচিত্র ব্যবহার তথা বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টির পেছনেও বাস্তব প্রয়োজনের একই কারণ বর্তমান ছিল বলে বিবেচনা করা চলে। প্রয়োজনের নিরিখে গদ্যের বিকাশ হওয়ায় তাতে প্রাঞ্জলতা এসেছে। তবে বিষয়বস্তুর প্রকারভেদে এই প্রাঞ্জলতার হেরফের ঘটেছে। যেখানে তত্ত্বকথা ব্যক্ত হয়েছে সেখানে তা সকল শ্রেণির পাঠকের কাছে সহজবোধ্য হবে এমন আশা করাও অনুচিত।

ষোল শতক থেকে বাংলা গদ্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ করে ড. আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, 'ষোল থেকে আঠার শতক অবধি বাংলা গদ্যের নিদর্শন প্রধানত চিঠিপত্রে ও দলিল-দস্তাবেজে আবদ্ধ, এই প্রচলিত ধারণা এখন সংশোধনের যোগ্য। ধর্মবোধকে আশ্রয় করে সে যুগে যেমন কাব্য সৃষ্টি হচ্ছিল তেমনি, পরিমাণে অপেক্ষাকৃত কম হলেও, গদ্যচর্চা চলছিল ধর্মসাধনার তত্ত্বগত দিক দিয়ে। এরই ফলে বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বঘটিত নিবন্ধ ও খ্রিস্ট ধর্মমতের ব্যাখ্যা এবং শ্রাদ্ধবিধি, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা বিষয়ক রচনা থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, গদ্যচর্চা শুধু ধর্মবিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। আইনের অনুবাদ ও ভাষা শিক্ষার বই এই সীমাকে আরও প্রসারিত করেছিল। নাটকের সংলাপে যেমন বাংলা গদ্য পাই, তেমনি গদ্যে কাহিনি পরিবেশনের নিদর্শনও পাওয়া যায়। পুরানো বাংলা গদ্য সর্বত্রগামী না হলেও বিচিত্র পথে যাত্রা যে করেছিল, সে সম্পর্কে তাই সন্দেহের অবকাশ নেই।'

ইংরেজ শাসনের সূত্রপাতে বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক চর্চার পূর্বে পুরানো গদ্য যে নিতান্ত অবহেলার ব্যাপার ছিল না তা উক্ত মন্তব্য থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। আর সে পটভূমিকায় ড. আনিসুজ্জামান বলেছেন, 'তিন শ বছরের সচল ধারা ফেলে রেখে নতুন অভিভাবকতায় এভাবে বাংলা গদ্যের নবযাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শুরুতে। এ যাত্রার অনেক বিত্ত সংগৃহীত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘরের অনেকদিনের সঞ্চয়ও হারিয়ে গিয়েছিল।'

ড. গোলাম মুরশিদ প্রাথমিক পর্যায়ের বাংলা গদ্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তাঁর 'আঠারো শতকের গদ্য : ইতিহাস ও সংকলন' গ্রন্থে। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বেশ আগে থেকে বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'অষ্টাদশ শতকে বাংলা গদ্যের যথেষ্ট বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কয়েকজন মুন্সি মিলে রাতারাতি একটা গদ্যরীতির জন্ম দিতে পারেন নি। তার জন্য দীর্ঘদিনের অনুশীলন দরকার ছিল।'

গদ্যের পরবর্তী ধারা

বাংলা গদ্যের পরবর্তী প্রচেষ্টার নিদর্শনস্বরূপ সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায় সতের শতকের শেষভাগে ঢাকার ভূষণার জমিদারপুত্র দোম আন্তনিও নামক একজন দেশীয় পাদ্রি রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থটির কথা। ভূষণার জমিদারপুত্র ১৬৬৩ সালে মগ দস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়ে আরাকানে নীত হন। একজন পাদ্রি তাঁকে উদ্ধার করে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। পরে তিনি নিজেই একজন পাদ্রি হিসেবে খ্যাত হন। শোনা যায়, তাঁর প্রচেষ্টায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ গ্রন্থে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন রোমান-ক্যাথলিকের মধ্যে ধর্মবিচারচ্ছলে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই ছিল উদ্দেশ্য। গ্রন্থটি পর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে ১৭৪৩ সালে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। সাধুভাষার ছাঁদে গ্রন্থটি লিখিত এবং এতে ফারসি শব্দের বাহুল্য বর্জন করার চেষ্টা আছে। গ্রন্থের ভাষায় তৎসম শব্দের আধিক্য পরিলক্ষিত না হলেও রচনা সহজবোধ্য হয় নি। দোম আন্তনিওর ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ গ্রন্থের ভাষার নমুনা :

'ব্রাহ্মণ।— তুমি কারে ভজো?

রোম।— পরমেশরের পূর্ণো ব্রমেরে।

ব্র।— তবে তোমোরা বরো উতম ভজোনা ভজো, আমোরা তাহারে ভজি।

রো।— যদি তোমোরা সেই পূর্ণো ব্রমেরে ভজো তবে কেনো এতো কুবিত কুধরাণ নানা অধর্ম্মো ভজোনা দেখি?

ব্র।— তুমি এমত গিয়ামোন্তো হইয়া আমারদিগের পরমেশরেরে নিন্দা করহ? এহাতে তোমারদিগের শাস্ত্রে অপারনিমান নাহি?

রো।— আমারগোর শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে জন ধর্ম্মো নিন্দা করে, সে বড়ো নারোকী এবং যে জন অধর্ম্মেরে ধর্ম্মো বলে সে মহা নারোকী।

ব্র।— তবে তো তোমারদিগের শাস্ত্রে * * যে নিন্দা করিলে মহা নারোকী হএ; তবে কেনো নিন্দা করিলা?

রো।— আমিতো ধর্ম্মো নিন্দা করি না, ধর্ম্মেরে ধর্ম্মো কহি অধর্ম্মেরে অধর্ম্মো কহি; পুণ্যোরে পুণ্যো কহি জননীরে জননী কহি স্ত্রীরে স্ত্রী কহি; ব্রমেরে ব্রম কহি; চণ্ডালেরে চণ্ডাল কহি; ধুগদেরে ধুগদো কহি; গোচোনেরে গোচোনা কহি; অমেরতেরে অমেরতো কহি; বিষেরে বিষ কহি; এমত কথাএ পুণ্যো বাদে পাপ নাহি; এহাতে প্রত্যক্ষ্যে না

জানিলে ধর্ম্মাধর্ম্মো জানিতে না পারে; পরিণামে মুক্তি না হএ এহা না জানিলে, এ কারোণ এহারে নিন্দা না কহি।

ব্র।— এতো যে তুমি কহিলা, এহা আমারে প্রথক্ষ্যে বুঝাইবা; কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মো তিনি লওয়াএন, ধর্ম্মো তিনি অধর্ম্মো তিনি।

রো।— এ সকোল প্রতক্ষ্যে বুঝাইবো যেমত জিজ্ঞাসা করহ; ধর্ম্মাধর্ম্মো তিনি লওয়াএন না, ধর্ম্মো কার্য্য করিতে শাস্তোর দিয়াছেন তাহান ক্রেপাএ; আমোরা (অ) ধর্ম্মো কার্য্য করিয়া তাহান শাস্ত্রে লঙ্গনা করিয়া আমোরা পাপ করি; তিন শাস্ত্রেতে বেমতি দেন, পিশুন্যো, ভূত আর শরীর; এই সকোল ভ্রমিয়া তাহান অধর্ম্মো আমোরা করি, এই যে ধর্ম্মাধর্ম্মতোনুসারে ভোগ দিবেন; সৎ কার্য্যো করি, তবে মুক্তি দিবেন; অসৎ কার্য্যো করি, তবে কুমতি দিবেন, অসৎ কার্য্যো করি তবে মহা নরোকে যোম তারোণা দিবেন, তিনি অধর্ম্মো নহেন তিনি কেবোল পরমো ধর্ম্মো রাজ, তাহান ঠাই অযোথার্থ নাই।'

রোমান ক্যাথলিক পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁও কর্তৃক ১৭৩৪ সালে রচিত এবং ১৭৪৩ সালে লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ' গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলের নাগরী (বর্তমান গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার একটি গ্রাম) নামক স্থানে লিখিত। এই গ্রন্থের বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষায় এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় পর্তুগিজ ভাষায় গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মের মহিমা এবং খ্রিস্টানদের আচার-অনুষ্ঠানের কথা আলোচিত হয়েছে। মূল পর্তুগিজ অংশ মানোএল দা আসসুম্পসাঁও-এর লেখা; তিনি সম্ভবত কোন দেশীয় খ্রিস্টান দ্বারা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রকে কৃপা বা দয়ার শাস্ত্র মনে করে এর অর্থ রহস্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা আলোচ্য গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে পাদ্রি হিসেবে ধর্মপ্রচারে রত ছিলেন এবং সে অঞ্চলে থাকাকালীন গ্রন্থটি রচিত বলে তাতে স্থানীয় উপভাষার প্রভাব আছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ' গ্রন্থের ভাষার নমুনা :

> ফ্লান্দিয়া দেশে এক শিপাই বড় তেজোবন্ত আছিল; লড়াই করিতে করিতে বড় নাম তাহার হইল; এবং রাজায় তাহারে অনেক ধন দিলেন। ধন পাইয়া তাহার পিতামাতার ঘরে গেল। তাহার দেশে রাত্রে পৌছিল; তাহার এক বইন্ আছিল; তাহারে পন্থে লাগাল পাইল; ভাইয়ে বইনেরে চিনিল, তাহারে বইনে না চিনিল। তখন সে বইনেরে কহিল : তুমি নি আমারে চিন? না ঠাকুর, বইনে কহিল। সে কহিল, আমি তোমার ভাই। ভাইয়ের নাম শুনিয়া, উনি বড় প্রীত হইল : ভাইয়ে ঘরের খবর লইল; জিজ্ঞাসা করিল : আমার দিগের পিতা মাতা কেমত আছেন? বইন্ কহিল, কুশল। দুই জনে কথা বার্তা কহিল। পরে বইন্ আপনের ঘরে গেল, ভাইয়েও পিতা মাতার ঘরে যাইতে লাগিল। তাহার পিতা লাগাল পাইয়া, পুত্র অচিনা হইয়া পিতার কাছে বাসা চাহিয়া কহিল, ঠাকুর, তুমি নি এহি রাত্রে আমারে বাসা দিবা? যে খরচ হয়,

তোমারে দিবাম। পিতার অচিনা পুত্ররে বাসা দিল, তাহার ধন দেখিয়া ধনের লালসে তাহারে রাত্রে বধিল, এবং তাহারে মাটি দিল, ধন লুকাইয়া রাখিল। আর দিন বড় প্রাতঃকাল পিতা মাতার বাড়িতে বইনে গেল। পিতার ঠাঁই জিজ্ঞাসা করিল, আমার ভাইয়ে কোথায় গেল? পিতায় উতর দিল, তোমার ভাই আসিল না, আমরাও দেখিলাম না তাহারে। ঝীয়ে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিল, তবে কোথায় গেল? আমি কইল্ল রাত্রে তাহারে দেখিলাম হাঁটিয়া যাইতে; তাহার লাগাল পাইলাম, আমার লগে কথা বার্ত্তা কহিল। এহা শুনিয়া পিতা কান্দিতে লাগিল; মাগেরে কহিল, করিয়াছি আমরা? আমারগো পুত্র বধিলাম; অভাগিয়া হইয়াছি পৃথিবীর মধ্যে! এমত ধরাণ কান্দিতে কান্দিতে দুই জনে মাগ ভাতার অভরসা হইল : অভরসা হইয়া, যেন পাতকে আর পাতক জর্ম্মে, পিতা আপনে আপনেরে গলায় ফাঁসি দিয়া মরিল, মাতায় ছুরি দিয়া আপনে মরিল, এবং দুই জনে নরকে গেল। এহি কথাতে দেখ, পরের ধনের লালসে পুত্রের বধ জর্ম্মিল, এবং অভরসা জর্ম্মিয়া দুই জনের বধ হইল।'

মানোএল দা আসসুম্পসাঁও-এর রচনাপদ্ধতি দোম আন্তনিওর মত সাধুরীতির অনুসারী নয়। গ্রন্থটি পর্তুগিজ পাদ্রি কর্তৃক পর্তুগিজ ভাষায় ধর্মনিবন্ধের বঙ্গানুবাদ বলে বাক্য বিন্যাসে বিপর্যয় ঘটেছে। এর ফলে গ্রন্থের ভাষায় দুর্বোধ্যতা লক্ষ করা যায়। পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁও পর্তুগিজ ভাষায় একখানি বাংলা ব্যাকরণ এবং একখানি পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ প্রণয়ন করেছিলেন। ১৭৪৩ সালে লিসবন থেকে প্রকাশিত ব্যাকরণটি প্রাচীনতম বাংলা ব্যাকরণ হিসেবে বিবেচিত। মানোএল দা আসসুম্পসাঁও- এর নামে প্রচলিত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ বইটির নাম 'Vocabulario em Idiomae Bengalla'e Portuguez'। এটি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও শব্দকোষ। 'অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে তথ্যসিদ্ধ অনুমানে নিশ্চিত প্রতিবাদিত হয়েছে যে, উক্ত মূল্যবহ রচনাটি দোম আন্তনিওর মৌলিক পরিকল্পনা এবং দুরূহ শ্রমের ফসল।' এই সমস্ত গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ছিল পর্তুগিজ পাদ্রিদের দেশীয় ভাষা শিক্ষাদান, যাতে এ দেশে খ্রিস্টধর্মের প্রচার সহজতর হতে পারে।

পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারক রচিত এই সব গ্রন্থে যে গদ্যরীতি অনুসৃত হয়েছে তা পরবর্তীকালে বিকশিত বাংলা গদ্যরীতিতে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কারণ পর্তুগিজ পাদ্রিদের সঙ্গে পরবর্তীকালের ইংরেজ পাদ্রিদের কোন যোগাযোগ ছিল না এবং ধর্মীয় আদর্শের দিক থেকে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ইংরেজ পাদ্রিদের হাতে ১৮০০ সাল থেকে বাংলা গদ্যের যে অনুশীলন হতে থাকে তা সম্পূর্ণ তাদের স্বতন্ত্র ও ঐতিহ্যরহিত প্রচেষ্টা হিসেবেই বিবেচ্য।

বাংলা গদ্যের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টায় ধর্মপ্রচার ও ধর্মকলহ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। অবশ্য পরবর্তীকালের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির জ্ঞানচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা গদ্যের বিকাশ সহজ হয়ে ওঠে। ১৮০০ সালের পূর্ববর্তী প্রচেষ্টায় ধর্মীয় প্রভাবের প্রমাণ হিসেবে 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' ও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ' গ্রন্থদ্বয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মপ্রচারের এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালের গদ্যসৃষ্টিতেও লক্ষ

করা যায়। শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রিদের প্রধান প্রচেষ্টা ছিল বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করে এবং খ্রিস্টচরিত বিষয়ে কাব্য ও নিবন্ধ লিখে এ দেশে ধর্মপ্রচার। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠী পাঠ্যপুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করলেও তাঁদের কারও কারও রচনায় বিশেষত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গ্রন্থে ধর্মীয় বিষয় স্থান পেয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায় ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচার ও ধর্মকলহ উপজীব্য হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায়ের রচনায় ধর্মীয় বিষয়ের প্রাধান্য বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে নিয়ে আসে। আর বিদ্যাসাগরের রচনায় ফুটে ওঠে প্রথম সাহিত্যিক গদ্যের সার্থকতার নিদর্শন। ধর্মের বিষয়াবলম্বনে গদ্যরচনার প্রচেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েও দেখা যায়। এমন কি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ধর্মীয় বিষয়বস্তু বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু অংশ জুড়ে আছে।

সাহিত্যে গদ্যের ব্যাপক প্রয়োগের উপযোগিতা প্রমাণিত হলে বাঙালির আত্ম-জিজ্ঞাসার পরিচয়ও গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারের সঙ্গে বাঙালির যে পরিচয় ঘটেছিল তার ফল এদেশে সম্প্রসারণের জন্য বাংলা গদ্যকে বাহন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কাব্যে জ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়। তাই এই অপরিণত গদ্যই অত্যল্পকালের মধ্যে বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং প্রয়োজন সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধিত হয়। গদ্যে জ্ঞানচর্চার প্রথম নিদর্শন অক্ষয়কুমার দত্তের বিবিধ রচনায় বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র ও পরবর্তী লেখকগণের রচনায় তা ব্যাপকাকারে দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের ব্যবহারের কথাও উল্লেখযোগ্য। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর রচনার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা শিক্ষাদান। এভাবে বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশে নানা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

১৮০০ সাল থেকে বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক চর্চার পূর্বে কয়েকজন ইংরেজ পণ্ডিতব্যক্তি বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দশিক্ষা প্রণয়নে এবং কয়েকটি আইনগ্রন্থের বঙ্গানুবাদে তাঁদের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় বিদ্যমান। নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ সালে ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। জোনাথান ডানকান কর্তৃক ১৭৮৫ সালে দেওয়ানি কার্যবিধির অনুবাদ মুদ্রিত হয়। আইন বিষয়ক এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষার ইতিহাসে একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। এন. বি. এডমনস্টোন নামে জনৈক সিবিলিয়ান ১৭৯১ সালে ফৌজদারি কার্যবিধির অনুবাদ করেন। তাঁর ভাষা ছিল ফারসি ঘেঁষা।

হেনরি পিট্স ফরস্টার ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিস কোড-এর বঙ্গানুবাদ এবং ১৭৯৯ সালে 'শব্দকোষ' প্রথম খণ্ড, ১৮০১ সালে 'শব্দকোষ' দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় আঠার শতকের শেষপাদে বাংলা ভাষা কিঞ্চিৎ মর্যাদা অর্জন করে। ফরস্টার তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির টাঁকশালে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেখানে তহবিল তসরুপের অপরাধে তিনি জরিমানাসহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বাংলাকে আরবি-ফারসি শব্দের প্রভাব থেকে রেহাই দিয়ে সংস্কৃতঘেঁষা করে তোলায় তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বাংলা বানানকেও সংস্কৃতের নিয়মানুবর্তী করে তোলার প্রয়াস পান।

১৭৯৩ সালে এ আপজন 'ইঙ্গরাজি ও বাঙালি বোকেবিলারি' প্রকাশ করেন। জন মিলার ১৭৯৭ সালে 'শিক্ষাগুরু' নামে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের রচয়িতা। বাংলা গদ্যের ভিত্তিপত্তনে এই কয়জন ইংরেজের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অধ্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে আমলে প্রচলিত বিশৃঙ্খল বাংলা ভাষাকে তাঁরাই ব্যাকরণ অভিধানের গণ্ডির মধ্যে এনে সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করতে চেষ্টিত হন। এসব ইংরেজ তাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য, অকৃত্রিম আন্তরিকতা এবং সীমাহীন সদিচ্ছা যেভাবে নিয়োজিত করেছিলেন তাতে বাংলা গদ্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে ব্যবহারের পথ সুগম হতে থাকে। জীবিকার্জন বা প্রশাসনের বাইরে তাঁদের মনীষার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে বাংলা ভাষা অবলম্বনে। পাদ্রিরাও ধর্মপ্রচারকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, কিন্তু গদ্যগঠনে তাঁদের অবদান কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ইংরেজদের এসব প্রচেষ্টা নানা বিষয়ের সার্থক বাহন হিসেবে বাংলা গদ্যের যোগ্যতাই প্রতিপন্ন করেছে। তবে ১৮০০ সাল থেকে গদ্যচর্চার যে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয় তাতেই ক্রমান্বয়ে গদ্য বাংলা সাহিত্যের যথার্থ বাহন হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

শ্রীরামপুর মিশন (প্রতিষ্ঠা : ১৮০০ সাল)

বাংলা গদ্যের অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রথম সার্থকতা লক্ষ করা যায় খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টার মধ্যে। বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করে এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন উইলিয়াম কেরি ও জোশুয়া মার্শম্যান। উইলিয়াম কেরি(১৭৬১-১৮৩৪) কলকাতায় আগমন করেন ১৭৯৩ সালে। তাঁর জীবনের পরবর্তী একচল্লিশ বৎসর তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্যের প্রাথমিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তখন এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসাগত স্বার্থের প্রতি বিশেষ সচেতন ছিল বলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কোন সমর্থন কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। তাই উইলিয়াম কেরি ডেনমার্কের শাসনাধীন শ্রীরামপুরে উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জোশুয়া মার্শম্যানের সহযোগে ১৮০০ সালে ব্যাপটিস্ট মিশন এবং মিশনের মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। অবশ্য ১৮০৮ সালে শ্রীরামপুর ডেনিশদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে আসে।

শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রচেষ্টার প্রথম সার্থকতার নিদর্শনস্বরূপ ১৮০০ সালে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের Gospel of St. Mathews অংশের অনুবাদ 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৮০১ সালে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অংশটি এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশ লাভ করে। ১৮০৯ সালের মধ্যে উইলিয়াম কেরিকৃত সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এর পূর্বেই কলকাতায় চার্লস উইলকিন্সের নির্দেশানুযায়ী পঞ্চানন কর্মকার মুদ্রণোপযোগী বাংলা অক্ষর তৈরি করেছিলেন। বাইবেলের অনুবাদ মুদ্রণে তা ব্যবহৃত হয়। 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' গ্রন্থের ভাষা কথ্যরীতি অনুযায়ী এবং তদ্ভব শব্দবাহুল্যপূর্ণ। এর বাক্যবিন্যাসপ্রণালী বাংলা ভাষার রীতিবিরুদ্ধ হলেও ভাষা ছিল সহজ। বাইবেলের অনুবাদের ভাষা উৎকর্ষের পরিচায়ক না হলেও পরবর্তীকালে উইলিয়াম কেরির ভাষারীতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। খ্রিস্টধর্মের রহস্য এ দেশবাসীর নিকট সহজবোধ্য করার জন্য এই সব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে এদের ভাষা সারল্যের অধিকারী। এই ভাষার মধ্যেই বাংলা গদ্যের ভবিষ্যৎ মুক্তির সম্ভাবনা নিহিত ছিল।

মিশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন জন টমাস (১৭৫৭-১৮০১) নামে বাংলাদেশে আগত প্রথম ব্যাপটিস্ট পাদ্রি। তিনি ১৭৮৩ সালে জাহাজে চিকিৎসকের চাকরি নিয়ে প্রথম এ দেশে আগমন করেন এবং ১৭৮৭ সালে পাদ্রি হিসেবে ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত হন। রামরাম বসুকে তিনি মুনশী হিসেবে নিয়েছিলেন; উইলিয়াম কেরিকে এ দেশে আনয়ন করার কৃতিত্বও তাঁর ছিল। পরে উন্মাদ অবস্থায় তিনি মারা যান। জোশুয়া মার্শম্যান(১৭৬৮-১৮৩৭) শ্রীরামপুর মিশনে উইলিয়াম কেরির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। মিশনারি রূপে তিনি এ দেশে আসেন এবং শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকেন। উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩) ছাপাখানার কাজে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাইবেলের বঙ্গানুবাদ মুদ্রণের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে এ দেশে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে পরবর্তীকালে রামায়ণ, মহাভারত, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮১৮ সালে এই মিশন থেকে 'দিগদর্শন' ও 'সমাচারদর্পণ' নামক পত্রিকা দুটি প্রকাশিত হয়। এর ফলে গদ্যের সম্প্রসারণের জন্য সাময়িক পত্রের আপাত প্রয়োজন মিটে। উনিশ শতকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যে নবজাগরণ পরিলক্ষিত হয়েছিল তাতে শ্রীরামপুর মিশনের যথেষ্ট অবদান ছিল। বস্তুতপক্ষে পরবর্তীকালে গদ্যের উন্নয়নের ভিত্তি এখানেই স্থাপিত হয়। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলা গদ্যের প্রাথমিক ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশনের নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এই মিশনের সঙ্গে জড়িত থেকে পরবর্তীকালে ফেলিক্স কেরি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, উইলিয়াম ইয়েটস, ক্যাপ্টেন জেমস স্টিওয়ার্ট, জন ম্যাক প্রমুখ বিদেশি বাংলা গদ্যের বিকাশে সাহায্য করেছেন। এছাড়া ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে মিশনারিদের অবদানও কম নয়। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার আগে যে কয়জন ইংরেজ পণ্ডিত বাংলা গদ্যে নিজেদের কৃতিত্ব রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে উদারতার অভাব ছিল না; কিন্তু ধর্মপ্রচার প্রধান লক্ষ্য ছিল বলে মিশনারিরা সে উদারতার পরিচয় দেন নি। ফলে এদেশের ধর্ম ও সমাজের প্রতি তাঁদের বিরুদ্ধ সমালোচনামুখর মনোভাব ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রেরণা দিয়েছিল। এদেশের কতিপয় বীভৎস কুসংস্কার দূরীকরণে মিশনারি সম্প্রদায়ের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

বাংলাদেশে কর্মরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য তৎকালীন ইংরেজশাসিত ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ঠা মে কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবস হলেও ২৪শে নভেম্বর থেকে কলেজের কাজ শুরু হয়েছিল। ওয়েলেসলি অনুভব করেছিলেন যে কোম্পানির দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে বিলাত থেকে যারা আসে, তারা অধিকাংশ চৌদ্দ থেকে আঠার বৎসরের নাবালক, স্বদেশে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নি, এ দেশেও তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়ে এই সিবিলিয়ানদের উপযুক্ত করে তোলার জন্যই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা। এই কলেজে ১৮০১ সালে বাংলা বিভাগ প্রবর্তিত হলে অধ্যক্ষ হিসেবে আসেন শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রি এবং বাইবেলের অনুবাদক বাংলায় অভিজ্ঞ উইলিয়াম কেরি। তিনি তাঁর

অধীনস্ত দু জন পণ্ডিত এবং ছয় জন সহকারী পণ্ডিতের সহযোগিতায় বাংলা গদ্যে কলেজের পাঠোপযোগী পুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলাফল দিয়েই বাংলা গদ্যের অনুশীলনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা নিরূপণ করা হয়।

ফোর্ট উইলিয়ামের পর্বে ১৮০১ থেকে ১৮১৫ সালের এই সময়ের মধ্যে ৮ জন লেখক ১৩ খানি বাংলা গদ্যপুস্তক লিখেছিলেন :

কেরি রচিত	১। কথোপকথন (১৮০১)
	২। ইতিহাসমালা (১৮১২)
রামরাম বসু রচিত	৩। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১)
	৪। লিপিমালা (১৮০২)
গোলোকনাথ শর্মা রচিত	৫। হিতোপদেশ (১৮০২)
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত	৬। বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)
	৭। হিতোপদেশ (১৮০৮)
	৮। রাজাবলি (১৮০৮)
	৯। প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩)
তারিণীচরণ মিত্র রচিত	১০। ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩)
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত	১১। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)
চণ্ডীচরণ মুন্‌শী রচিত	১২। তোতা ইতিহাস (১৮০৫)
হরপ্রসাদ রায় রচিত	১৩। পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)

উইলিয়াম কেরি

উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) ভারতের বহু ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, বহু বিচিত্র ধরনের গ্রন্থ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সুশৃঙ্খল গদ্যের পথিকৃৎরূপে বিদেশীর ব্যবহারের ও শিক্ষার উপযোগী করে ১৮০১ সালে 'কথোপকথন' গ্রন্থটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশ করেন। গ্রন্থে গৃহীত কথোপকথনগুলো সে আমলের কলকাতা-শ্রীরামপুর অঞ্চলের সকল স্তরের স্ত্রীপুরুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম ও আচারব্যবহার নিয়ে রচিত। এই গ্রন্থে চাকর ভাড়াকরণ, সাহেবের হুকুম, সাহেব ও মুনশীর পরামর্শ, ভোজনের কথা, যাত্রা, পরিচয়, ভূমির কথা, মহাজন, আসামি, বাগান করার হুকুম, ভদ্রলোকে ভদ্রলোকে কথাবার্তা, প্রাচীনে প্রাচীনে কথাবার্তা, সুপারিশ, মজুরের কথাবার্তা, খাতক মহাজনি, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, জেলেদের কথাবার্তা, ভিক্ষুকের কথা, কাজের চেষ্টার কথা, কোন্দল বা ঝগড়া, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে কথাবার্তা, 'মাইয়া কন্দল', জমিদার রায়তের কথা ইত্যাদি বিষয়াবলম্বনে কথোপকথন রচিত হয়েছে। উইলিয়াম কেরি সহজ ও বাস্তব ভঙ্গিতে বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থের কোথাও অবিমিশ্র সাধু আবার কোথাও কথ্য ভাষাশ্রিত রচনারীতি স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষার কথ্যরীতির প্রথম নিদর্শন এই গ্রন্থে বিধৃত। সে যুগের সামাজিক ও ব্যবহারিক রীতিনীতির বিশেষ পরিচয় হিসেবেও এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কথোপকথন গ্রন্থটি ছিল দ্বিভাষিক—এক পৃষ্ঠায় বাংলা, অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজি।

উইলিয়াম কেরির ভাষার নমুনা : স্ত্রীলোকের কথোপকথন—

আসগো ঠাকুর ঝি নাতে যাই।
ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।
আমরা মাচ আর কলাইর ডাইল আর বাগুন ছেঁচকি করেছিলেম।
তোরদের কি হইয়াছিল।
আমারদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘণ্ট সুক্তনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাচের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।
কে রেন্ধেছিল বড় বৌ না মেঝে বৌ।
বড় বৌই বান্ধিয়াছিল। তিনি কুটনা বাটনা করে দিয়াছেন।
তোদের বৌ কেমন। রান্ধিতে বাড়িতে পারে।
হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রান্ধে মেয়েরা কেহ এখানে নাই আপনি কাঁচা বাচা নিয়া লড়িতে পারি না। সকল কামি বড় বৌ করে ছোট বৌডা বড় হিজল দাগুড়া অঙ্গ লাড়ে না আর সদায় তার ঝকড়া কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দেখিতে পারে না কিন্তু বুন কালা হাঁড়ি পানে চেয়ে বড় বৌটি অতি ভাল এ সংসারের কায কাম করে আর ছেলে পিলে খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় আর আমারদের সেবা সুস্থ করে তাহার জন্য আমার কোন ব্যামহ নাই।

প্রায় দেড় শ ইতিহাসাশ্রিত গল্প অবলম্বনে ১৮১২ সালে 'ইতিহাসমালা' নামক অন্য একটি গ্রন্থ উইলিয়াম কেরি প্রকাশ করেন। এ দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থটি প্রথম গল্পসংগ্রহ হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ স্থান পাওয়ার যোগ্য। সংগৃহীত গল্পগুলোর অধিকাংশই ব্যঙ্গপ্রধান। এতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় উৎস থেকে গল্প সংগৃহীত হয়েছিল। 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের গল্প থেকে শুরু করে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধনপতি-খুল্লনা-লহনা, রূপ সনাতন গোস্বামির কথা এতে স্থান পেয়েছে। অনুবাদে যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাঞ্জলতা সঞ্চারিত হতে পারে ইতিহাসমালা তার বিশিষ্ট নিদর্শন। সুষম ও প্রাঞ্জল রচনারীতির জন্য এই কলেজ থেকে প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে তা শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারী। এই গ্রন্থের ভাষা ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাথমিক যুগের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গদ্য রচনার একটা স্টাইলও এতে পরিলক্ষিত হয়।

বাংলা-সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি উইলিয়াম কেরি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। ফারসি মিশ্রণের প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন। ইতিহাসমালায় এ বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন বিদ্যমান। তাঁর রচনা প্রাথমিক পর্যায়ে সহজ সরল থাকলেও পরবর্তীকালে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাবে সংস্কৃতঘেঁষা হয়ে ওঠে। ফলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যান্য গ্রন্থেও এর প্রভাব পড়ে। উইলিয়াম কেরির গ্রন্থরচনায় স্বকীয়তা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও বলা যায় বাংলা গদ্যরীতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রদানপূর্বক তিনি বাংলা গদ্যের উন্মেষ যুগে যে অবদান রেখে গেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। বিশেষত উইলিয়াম কেরির মত পণ্ডিতের

প্রীতি ও পরিচর্যা না পেলে বাংলা গদ্যের বুনিয়াদ এত দ্রুত গড়ে উঠতে পারত না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর গদ্যসৃষ্টির প্রচেষ্টার পশ্চাতে তাঁর ভূমিকার তাৎপর্য-অনুধাবনে এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা, বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ব্যবহার উপযোগিতা সৃষ্টিতে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা কার্যকরী ছিল। ভারতের বহু ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য এবং গ্রন্থরচনা তাঁর সীমাহীন অধ্যবসায়েরই পরিচায়ক। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি জ্ঞানসাধনায় অতিবাহিত করেছেন; নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে যে বিপুল নিদর্শন রেখে গেছেন তা তাঁকে বিরল প্রতিভাধর বলে চিহ্নিত করেছে।

উইলিয়াম কেরি ছিলেন বিচিত্র কর্মময় জীবনের অধিকারী। বহু ভাষায় বিচিত্র গ্রন্থ রচনা করা ছাড়াও বহু প্রতিষ্ঠান ও সংস্কারান্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা যায়, 'অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার গুণে তিনি একাকী যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা পৃথিবীতে ক্বচিৎ মিলে।' বাংলা সাহিত্যে উইলিয়াম কেরির অবদানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'বাংলাদেশে কেরির অপর সকল কীর্তিও যদি কোনও দিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বাংলা সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিলে তিনি স্বমহিমায় চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম প্রভূত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্যাদা দান করিয়াছিলেন।'

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

উইলিয়াম কেরির অধীনস্থ প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯) বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), রাজাবলি (১৮০৮), হিতোপদেশ (১৮০৮), বেদান্তচন্দ্রিকা(১৮১৭) ও প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩)—এই পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার শুধু অধ্যাপক পণ্ডিতই ছিলেন না, তিনি সে যুগের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সে আমলে প্রবাদ বাক্যের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি ছিলেন ভাষাবিদ ও ভাষাশিল্পী। প্রয়োজনানুসারী ভাষারীতির প্রবর্তনে তিনি যুগোপযোগী সার্থকতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর বাক্যগঠনে ত্রুটি থাকলেও বাক্যের প্রাঞ্জলতা ও গাল্পিক কৌতূহল অক্ষুণ্ন রয়েছে। সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে অনূদিত 'হিতোপদেশ' গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃতানুগ। কিংবদন্তি ও লোকপ্রসিদ্ধির ওপর নির্ভর করে রচিত 'রাজাবলি' গ্রন্থে গদ্যরীতি আরও সুষ্ঠু রূপ নিয়েছে। আরবি ফারসি শব্দবাহুল্যপূর্ণ এই গ্রন্থটি প্রাঞ্জল ভাষারীতির জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। 'বেদান্তচন্দ্রিকা' গ্রন্থের নামপত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের নামোল্লেখ না থাকলেও তা তাঁর নিজের রচনা বলে অনুমিত। এর মধ্যে বহু সংস্কৃত গ্রন্থের এবং বেদান্ত সূত্র-ভাষ্যাদির অংশবিশেষ অনূদিত হওয়ায় তাকে স্বাধীন রচনা বলে মনে করা যায় না। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ১৮১৩ সালে রচিত হলেও প্রকাশিত হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর। গ্রন্থটি মূলত দার্শনিক নিবন্ধ। সংস্কৃত বিদ্যাভাণ্ডারের পরিচয় দেওয়ার জন্যই গ্রন্থটি রচিত। এতে কথ্য সাধু ও সংস্কৃত রীতির ভাষা অনুসৃত হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যে

সংস্কৃতরীতির প্রয়োগে দোষত্রুটি থাকলেও বিষয়বস্তু ও রচনাপদ্ধতিতে একটা সুষম রূপ ফুটে উঠেছিল। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে ভাষাকে উদ্দেশ্যানুগ ও বিষয়োচিত করে তোলার অলিখিত সংস্কার তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সহজ ভাষায় যেমন বক্তব্য পরিবেশন করতেন তেমনি পণ্ডিতি গদ্যের রচনাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। আবার সংস্কৃতরীতিতেও তিনি লিখে গেছেন। তাঁর রচনার নিদর্শন :

> **সংস্কৃতরীতি** : অনভিব্যক্তবর্ণা পনিমাত্ররূপা পরা নাম্নী ভাষা প্রথমা যেমন অভিনব কুমারেরদের ভাষা। তদনন্তর অভিব্যক্তবর্ণমালা পশ্যন্তী নামক ভাষা দ্বিতীয়া যেমন প্রাপ্ত যৎকিঞ্চিদ্বয়স্ক বালক ভাষা।'
>
> **সাধুরীতি** : নবাব সিরাজদ্দৌলা পলাইলে পর মহারাজ দুর্লভরাম সশঙ্ক হইয়া থাকিলেন কিন্তু জাফরালী খাঁ সাহেব লোকেরদের সহিত মিলিয়া নবাবের কিল্লা ও আর ২ আসবাব সকল অধিকার করিয়াছিলেন।
>
> **কথ্যরীতি** : 'ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে একজন থাকে তাহার ভার্যার নাম গতিক্রিয়া পুত্রের নাম ঠক। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাই ধুলা আঙ্গার পূরিয়া উপরে এক আধ সের ঘি দিয়া দেশে ২ শহরে ২ নগরে ২ গ্রামে ২ অনিয়ত বেগে ভ্রমণ করিয়া ঘড়াশুদ্ধ তোলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়।'

মৃত্যুঞ্জয়ের কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'তিনি একদিকে যেমন সাধু ভাষার আদি লেখক—অপরদিকেও তিনি তেমনি চলতি ভাষারও আদর্শ লেখক।'

রামরাম বসু

রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) ছিলেন উইলিয়াম কেরির সহযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনাকারীদের অন্যতম অগ্রণী। তাঁর জীবন ছিল বৈচিত্র্যধর্মী। প্রথমে তিনি ফারসি-নবিস মুনশী এবং পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রতি বাহ্যিক অনুরাগ দেখিয়ে পাদ্রিদের বিভ্রান্ত করলেও খ্রিস্টধর্ম প্রচারে প্রভূত সাহায্য করেছেন, কিন্তু নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করেন নি। নৈতিক অধঃপতনের জন্য বিতাড়িত হলেও উইলিয়াম কেরি তাঁর বদান্যতা দয়াধর্ম শাস্ত্রীয় বিচারবুদ্ধির বারংবার প্রশংসা করেছেন এবং ধর্মপ্রচারে ও গ্রন্থরচনায় বিশেষ সাহায্য নিয়েছেন। রামরাম বসুর গদ্যগ্রন্থ দুটি—রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) ও লিপিমালা (১৮০২)। ফারসি-নবিস মুনশী বলে সেকালের চলতি রীতিতে বাংলা গদ্যপদ্য রচনায় তাঁর অবিসংবাদিত দক্ষতা ছিল। বাঙালি রচিত এবং বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম একটানা দীর্ঘ মৌলিক রচনা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থে রাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে জ্ঞাত কাহিনিগুলো স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা' ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের চলিত ভাষা ও দেশীয় লোকের বৈষয়িক ব্যবহারের পরিচয়দানের জন্য পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধ। গ্রন্থের রচনারীতি সহজ সরল ও মৌখিক রীতির কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তার রচনাশৈলী সাধুভাষার অনুগত হলেও তা কথ্যরীতির অনুসারী ছিল। মৌলিক লেখক হিসেবে রামরাম বসুর স্বতন্ত্র পরিচয় বিদ্যমান। রামরাম বসুর ভাষার নমুনা :

> 'ক্রমে ২ তিন চারি মাসে আসিয়া যশহর পৌঁছিলেই এক কালিন বন্দুকের দেহড়ও মারিয়া ডঙ্কা দিয়া দপ্তর ও মালখানা সমস্ত বন্ধ করিলেক নগরে ডঙ্কা

দিল রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা হইয়া আসিযাছেন রাজবাটীর বাহির ভাগেই রহিলেন বাটীর মধ্যে আইসেন না ইহাতে মহারাজা বিক্রমাদিত্য আপনি বাহিরে আসিয়া রাজা বসন্তরায় ও আর ২ মন্ত্রী লোকেরদিগকে সাতে করিয়া প্রতাপাদিত্যের সান্নিধ্য আইলে রাজা প্রতাপাদিত্য আপনি উত্থান করিয়া ও পিতা ও খুল্লতাতের পদে নত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল ইহারাও তাহার শিরে চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে করিলেন পরে সমস্তই একাসনে বসিয়া আলাপ বিলাপ করিতেছেন।'

গোলোকনাথ শর্মা

গোলোকনাথ শর্মা (মৃত্যু ১৮০৩) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক না হয়েও মিশনারিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর 'হিতোপদেশ' ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বইটি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। লেখকের সংস্কৃতজ্ঞানের স্বল্পতার জন্য এর অনুবাদ আক্ষরিক হয় নি। তাই এতে স্বাধীন রচনার সুগম্যতা লক্ষণীয়। গ্রন্থের কোথাও কোথাও কথ্যরীতির অনুসরণের ফলে রচনায় প্রাঞ্জলতা সঞ্চারিত হয়েছে।

চণ্ডীচরণ মুনশী

চণ্ডীচরণ মুনশীর 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫) ফারসি থেকে অনুবাদ। পাঠ্যপুস্তক ও গল্পগ্রন্থ হিসেবে গ্রন্থটি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) গ্রন্থে ইতিহাসের বিষয়বস্তু স্থান পেলেও কাহিনির ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য। গ্রন্থটি বর্ণনামূলক সাধুভাষায় লেখা, বাক্য সরল ও সংক্ষিপ্ত।

হরপ্রসাদ রায়

হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' (১৮১৫) সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। গ্রন্থের রচনারীতি সরল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। শিক্ষাপ্রদ উপদেশাত্মক গল্পসমষ্টি এই গ্রন্থখানার মধ্যে তেমন কোন নতুনত্ব নেই।

মুনশী তারিণীচরণ মিত্র

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দুস্থানি বিভাগের দ্বিতীয় মুনশী তারিণীচরণ মিত্র ইংরেজি থেকে 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩) বাংলায় অনুবাদ করেন। 'নীতিকথা' (১৮১৮) নামক অন্য একটি অনুবাদ গ্রন্থের সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িত। কলেজের উদ্যোগে আরও গ্রন্থ রচনার সংবাদ পাওয়া গেলেও তার কোন নিদর্শন নেই।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রাখলেও প্রথম দিককার পনের বছর বাংলা গদ্যের বিকাশের জন্য বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। ১৮১৫ সালের পর থেকে বাংলা সাহিত্যের ওপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তথা শ্রীরামপুর মিশনারিদের প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসে এবং বাঙালিরা সাহিত্যের প্রতি সচেতন হতে আরম্ভ করে।

শুধু পাঠ্যপুস্তক রচনাতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠী প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তবু বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ হিসেবে তাঁদের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার লেখকসম্প্রদায় কোন মহৎ বা স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম না হলেও বাংলা গদ্যের রাজপথের পত্তন তাঁরাই করেছিলেন। বাংলা ভাষায় দুরূহ বিষয়ের আলোচনা এই লেখকগোষ্ঠী দ্বারাই শুরু হয়।

বাংলা ভাষার সংস্কৃতীকরণ

বাংলা গদ্যের সূচনাতেই এর রূপের পরিবর্তন ঘটেছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে যে লেখকগোষ্ঠী গদ্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরাই বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতঘেঁষা করে তোলেন। এতদিন পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় তদ্ভব, আরবি-ফারসি ও দেশজ শব্দমিশ্রিত যে ভাষা প্রচলিত ছিল তা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রভাবে সংস্কৃত শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং গদ্যরীতির মধ্যে কৃত্রিম গাম্ভীর্য আনীত হয়। এমনিভাবে বাংলা গদ্য একটা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। তবে বাংলাকে সংস্কৃতীকরণের ব্যাপারে বিদেশি পাদ্রিদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সজনীকান্ত দাস এ প্রসঙ্গে বলেছেন, '১৭৭৮ সালে হ্যালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি পিটস্ ফরস্টার ও উইলিয়াম কেরি বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবি-ফারসি অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলন্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ সালে এই আরবি-ফারসি-নিসূদন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ সালে আইনের সাহায্যে কোম্পানির সদর মফস্বল আদালত সমূহে আরবি ফারসির পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজি প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।' সে আমলে আরবি- ফারসিকে অশুদ্ধ ধরে শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য কতিপয় ব্যাকরণ-অভিধানও রচিত হয়েছিল। সাহেবরা সুবিধা পেলেই আরবি-ফারসি ভাষার বিরোধিতা করে বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন। ফলে দশ-পনের বছরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আঠার শতকের অষ্টম ও নবম দশকে হ্যালহেড ও চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ও বাংলা শব্দসংগ্রহে মনোনিবেশ করে সংস্কৃত রীতিতে বাংলা শব্দকোষ সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ধারণা, 'বাংলা গদ্যের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা লিখিত ভাষা প্রয়োজনমত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার আহরণ করত বলেই ভাষার রীতি ও প্রকৃতি অকৃত্রিম ও সরল ছিল। কিন্তু মুসলমান শাসনকর্তাদের অত্যাচারে সকল ব্যাপারে ফারসি ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়াতে চলতি ভাষার শুদ্ধতা নষ্ট হয়েছে এবং কেবলমাত্র অভ্যাসের দোষে বহু ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গ হয়ে পড়েছে। যে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা বাংলাদেশ পীড়িত হয়েছে সেগুলো দেশের ভাষার সারল্যও নষ্ট করেছে এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্নদেশবাসী ও পৃথক রীতিনীতিসম্পন্ন লোকদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী লেনদেনের ফলে বাঙালির কানে বৈদেশিক শব্দ আর অপরিচিত ঠেকে না। মুসলমান, পর্তুগিজ ও ইংরেজ পর পর ধর্ম আইন কারুশিল্প ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু শব্দসম্ভার বাংলা ভাষার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে।' এই ধরনের মনোভাব হেনরি পিটস্ ফরস্টার

১৭৯৯ সালে তাঁর সুবিখ্যাত ইংরেজি-বাংলা অভিধান সংকলনকালেও ব্যক্ত করেছেন। উইলিয়াম কেরিও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। আঠার শতকের বাংলা গদ্যের ইতিহাসে বাঙালির দান নেই বললেই চলে, সাহেবদের দ্বারাই তার পরিচর্যা হয়। বর্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বলে যা খ্যাত, আঠার শতকের নীহারিকা অবস্থা থেকে সাহেবদের সম্মিলিত চেষ্টাতেই তা প্রথম নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছিল। আধুনিক যুগের পূর্বে বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কিন্তু গদ্যরীতির উদ্ভবের যুগে মুসলমানদেরও কোন অবদান ছিল না। বরং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রভাব ছিল ব্যাপক। এভাবেই বাংলা সংস্কৃতঘেঁষা হয়ে ওঠে।

রাজা রামমোহন রায়

বাংলা গদ্যরীতিকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। তাঁর বলিষ্ঠ হাতে বাংলা গদ্য বিচার-বিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তাধারার প্রকাশের বাহন হিসেবে অপরিসীম গুরুত্ব লাভ করে। বাংলাদেশে আধুনিকতার অগ্রদূত হিসেবে তিনি এক দিকে ছিলেন সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষা-সম্প্রসারক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকারী; অন্যদিকে তিনি ধর্ম ও দর্শনতত্ত্বাদির মত জটিলতর বিষয়বস্তুকে বাংলা গদ্যে আলোচনা করে গদ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ—বাংলা সংস্কৃত আরবি ফারসি ইংরেজি ইত্যাদি ভাষায় তাঁর অপরিসীম দক্ষতা ছিল। ইসলামি ও খ্রিস্টীয় শাস্ত্রচর্চার ফলে তাঁর মন একেশ্বরবাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয় এবং তিনি পৌত্তলিকতার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈদিক শাস্ত্রে একেশ্বরবাদের মহিমা উপলব্ধি করে হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনে অবতীর্ণ হন। একেশ্বরবাদের ওপর ভিত্তি করে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এই লক্ষ্য অর্জনে তাঁর সংগ্রাম একদিকে দেশীয় লোকদের অন্ধ সংস্কার, অন্যদিকে বিদেশাগত ধর্ম প্রচারকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে পরিচালিত।

রামমোহন তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী, ইংরেজ কালেক্টরের দেওয়ান, কোম্পানির শেয়ারের ব্যবসায়ী, ভুটানরাজের কাছে প্রেরিত ইংরেজের দূত, ধর্মশিক্ষা প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক ইত্যাদি বহুবিধ কাজে জড়িত ছিলেন। ১৮১৭ সালে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আসেন এবং ঐশ্বর্যশালী গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদা পান। তাঁর গৃহে সে আমলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সমাগম ঘটত, অনেক বিদেশী পরিব্রাজক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। ১৮৩০ সালে তৎকালীন নামমাত্র দিল্লিশ্বর মোগল বাদশা দ্বিতীয় আকবর তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে ইংলন্ডের রাজার নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। বিলাতেই তিনি মারা যান।

অগাধ পাণ্ডিত্য ও হৃদয়ের উদারতা রাজা রামমোহন রায়ের চরিত্রকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাই ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র ভাষা সাহিত্য প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্ষেত্রে তিনি সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন। তবে ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলনই প্রাধান্য পেয়েছিল এবং সেখানে সাহিত্যকে বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় আরবি ফারসি বাংলা সংস্কৃত ও ইংরেজিতে বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় যে ত্রিশখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্ত সার (১৮১৫), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৯), পথ্যপ্রদান (১৮২৩) ইত্যাদি। তিনি কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত এবং গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামে ইংরেজিতে লেখা একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। রামমোহন রায় ১৮২১ সালে 'Brahmunical magazine' নামে ইংরেজিতে এবং 'ব্রাহ্মণসেবধি' নামে বাংলায় এবং পরবর্তী বৎসর 'মীরাতুল আখবার' নামে ফারসিতে পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর কতিপয় ইংরেজি গ্রন্থ বিলাত থেকেও প্রকাশিত হয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায় বাংলা রচনায় যে গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন তাতে কোন প্রকার স্টাইলের প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করেন নি। যে যুগে বাংলা গদ্যে প্রাঞ্জলতা ছিল একান্ত দুর্লভ, তখন তিনি প্রাঞ্জল ভাষারীতি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য ব্যবহৃত তাঁর গদ্যরীতিতে সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও তাতে বক্তব্য প্রকাশের সার্থকতর উপযোগিতা ছিল। তাই বলা যায়, তাঁর গদ্যরীতি সাহিত্যরসমণ্ডিত না হলেও তাতে কার্যোপযোগিতা থাকায় অপরিসীম গুরুত্ব লাভ করে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর ভাষারীতির সমালোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।' বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন রায়ের রচনা বিসদৃশ মনে হলেও তৎকালীন গদ্যরীতিতে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। রাজা রামমোহন রায়ের ভাষার নমুনা, বেদান্ত গ্রন্থ থেকে :

> প্রথমত বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা বুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতি শব্দ তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ

> করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় এহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন।

রামমোহন রায়ের রচনাসম্ভারের সমস্ত কিছুকেই বাংলা সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করা না হলেও তিনি ছিলেন পরবর্তী যুগে বিকশিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথপ্রদর্শক। বেদান্ত সার, বেদান্ত গ্রন্থ প্রভৃতি রচনায় দার্শনিক বিচারে অবতীর্ণ হয়ে তিনি যে রীতিতে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তাতে শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে কোন কলাকৌশল ফুটে ওঠে নি সত্য, কিন্তু বক্তব্য সরলতা সহকারে প্রকাশলাভ করেছে। 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থে বিপক্ষের কটূক্তির জবাবে তিনি নিজস্ব রুচিবোধ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলা ভাষায় উপনিষদচর্চার প্রথম সূত্রপাত করেন রাজা রামমোহন রায়—কঠ, বাজসনেয়িসংহিতা, তলবকার, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদের গদ্যানুবাদের মাধ্যমে। তাঁর অন্যান্য রচনার মতই এই সমস্ত অনুবাদ সহজ সরল ভাষারীতিতে সম্পন্ন হয়েছে।

ধর্মের বিষয় আলোচনায় রামমোহন রায় যে গদ্যরীতি অবলম্বন করেছিলেন তার জন্য তিনি তৎকালীন রচনারীতি থেকে বিশেষ কোন সাহায্য লাভ করতে পারেন নি। তাই তাঁর ভাষা তিনি নিজেই তৈরি করে নিয়েছিলেন। ধর্মের বাদানুবাদে ব্যবহৃত বলে তাঁর ভাষা বিবৃতিসর্বস্ব ও প্রচারধর্মী। পরমতখণ্ডন ও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য শাস্ত্রের আলোচনা উদ্ধৃতি ও অনুবাদ করতে গিয়ে ভাষায় শিল্পরূপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর হয় নি। তাঁর রচনা যুক্তিনিষ্ঠ বলে তাতে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, কিন্তু সাহিত্যগুণ প্রকাশ পায় নি। তাঁর কোন কোন রচনায় পণ্ডিতি-বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। সে ক্ষেত্রে তাঁর গদ্যরীতি মূলত সংস্কৃত গদ্যরীতির আদর্শে গঠিত। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অপরিসীম বুৎপত্তি, শাস্ত্রানুবাদ ও ধর্মালোচনায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে শাস্ত্রদ্বন্দ্ব প্রভৃতি কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর রচনারীতি সংস্কৃতানুসারী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, 'রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।' সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে এদেশীয় চিন্তাধারা সমন্বয় সাধন করে তিনি আধুনিক যুগের প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেই পরবর্তী কালের মনীষীগণ ধর্মে সমাজে সাহিত্যে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালান।

বিপুল মনীষা ও লোকোত্তর প্রতিভা দিয়ে রাজা রামমোহন রায় একদিকে যেমন বাঙালি জীবনে জাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি অন্যদিকে বাংলা গদ্যকে বলিষ্ঠ চিন্তা ও যুক্তিতর্কের বাহন করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাংলা গদ্যের চর্চার ধারায় এ পর্যন্ত কতিপয় লেখকের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সেকালে প্রকাশিত কতিপয় সাময়িক পত্র বাংলা গদ্যের ব্যবহারকে বিচিত্র

বিষয়াভিমুখী করেছিল। ফলে গদ্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা গদ্যের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশি মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা গদ্য সংসারের নিত্য চলাচলের ওপর এসে পড়েছে। এতকাল যা মন্থর ভাবে চলছিল, কয়েকজন বলবান মাল্লার গুণের টানে বা সরকারি সাহায্যের পালের বাতাসে, এবারে তা হাজার বৈঠার ক্ষিপ্র তাড়নে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বৈঠাওয়ালাদের প্রধান ঈশ্বর গুপ্ত, আর হালে অবশ্যই আছেন মনীষী রামমোহন। গদ্য সাহিত্য ব্যাপক মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রকাশের বাহন। এই সব মাঝিমাল্লাদের সকলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, দিল্লির বাদশার খেতাব প্রাপ্তি সত্ত্বেও রামমোহন মধ্যবিত্ত ছাড়া কিছু নয়। বহুজন কর্তৃক বহুতর প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভাষায় এসেছে নমনীয়তা, তাতে ঢুকেছে নতুন শব্দসম্ভার তাদের ইঙ্গিত ও স্মৃতির পরিমণ্ডল দিয়ে; বেশ বুঝতে পারা যায় যে অনেকগুলো কলমের প্রচেষ্টায়, তাদের মধ্যে আনাড়ির কলমের সংখ্যাও কম নয়, ভাষার কর্দম উত্তমরূপে মথিত হয়েছে, এবারে মূর্তি গড়ে তুললেই হয়, এলেই হয় শিল্পী। এলেন 'বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী বিদ্যাসাগর।'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। পাণ্ডিত্যের গভীরতায়, মানসিকতার উদারতায়, সমাজ সংস্কারের তৎপরতায় তাঁর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা এদেশের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রাহ্য। যে কর্মবহুল সফল জীবন তিনি অতিবাহিত করেছিলেন তা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিশিষ্টতার অধিকারী।

বাংলা গদ্যের অবয়ব-নির্মাণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। গদ্যের অনুশীলন পর্যায়ে বিদ্যাসাগর সুশৃঙ্খলতা, পরিমিতিবোধ ও ধ্বনিপ্রবাহে অবিচ্ছিন্নতা সঞ্চার করে বাংলা গদ্যরীতিকে উৎকর্ষের এক উচ্চতর পরিসীমায় উন্নীত করেন। তাঁরই বলিষ্ঠ প্রতিভার যাদুস্পর্শে বাংলা গাদ্য কৈশোরকালের অনিশ্চয়তাকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করে পূর্ণ সাহিত্যিক রূপের নিশ্চয়তার মধ্যে স্থান পায়—গদ্য তার অস্থির গতির কাল অতিবাহিত হয়ে স্থিরতার পর্যায়ে উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগরের পূর্বে ও সমসাময়িক কালে বাংলা গদ্যচর্চার পরিসীমা ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈশিষ্ট্য ব্যতীত এইসব প্রচেষ্টায় অন্য কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। তৎকালীন সমস্ত গদ্যরচনাকারীর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান গদ্যের কাঠামো গঠনে এবং বাক্যের ভারসাম্য স্থিরীকরণে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। সমকালীন গদ্যলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গদ্যের জটিলতা দূর করে তাকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর বিদ্যাসাগর সেই গদ্যরীতির মধ্যে লালিত্যসঞ্চার ও নমনীয়তা আনয়নপূর্বক ভাষারীতি হিসেবে গদ্যের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে গৌরবময় অগ্রগতি সাধন করেন। তিনি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত ধ্বনিপ্রবাহ অনুধাবন করে বাক্যে স্বাভাবিক শব্দানুবৃত্তির রূপ প্রদান পূর্বক গদ্যরীতিতে পরিমিতিবোধ সৃষ্টি করলেন। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী গদ্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন লেখকদের মধ্যে যে সুষম বাক্যগঠনরীতির নিদর্শন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে না তা নয়, কিন্তু

এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগর যেমন সচেষ্ট ছিলেন তেমন আর কারও মধ্যে দেখা যায় না। সেজন্য বাংলা গদ্যশৈলীর উদ্ভবের পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে লেখনী ধারণ করা সত্ত্বেও তাঁকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলা হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে, বিদ্যাসাগরের সৃষ্ট গদ্যরীতির প্রভাবেই পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা গদ্যের পরিণত রূপের সৃষ্টি হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পশ্চিমবঙ্গের হুগলি, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বীয় সাধনার দ্বারা তিনি অপরিসীম জ্ঞান অর্জন করেন। মাইকেল মধুসূদনের মতে, 'প্রাচীন ঋষির জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজের কর্মশক্তি এবং বাঙালি মায়ের হৃদয় দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠিত।' রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি মুক্তমনের অধিকারী ছিলেন। ইংরেজদের সান্নিধ্যে ইংরেজি শিক্ষায় ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে তাঁর মনে উদারতার সহযোগে মানবতাবোধের বিকাশ ঘটেছিল। ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিতের পদে নিযুক্তির মাধ্যমে বাংলার সর্বপ্রধান এই শিক্ষাগুরুর কর্মজীবনের আরম্ভ হয় এবং ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত কলেজের কৃতী অধ্যক্ষের পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর চাকরি জীবনের বাইরে সরকারি ও বেসরকারি অসংখ্য শিক্ষাসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

সেকালের বাংলাদেশের পণ্ডিতকুলের অগ্রগণ্য হলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রগতিশীল আধুনিক মন নিয়ে শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে ব্রতী হন। তিনি ছিলেন নিয়মনিষ্ঠ, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাঁর পোষকতা ছিল, তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেছেন, বিধবাবিবাহের জন্য সর্বস্ব পণ করেছিলেন এবং নিজের আদর্শকে চিরদিন সমুন্নত রেখেছেন। তাঁর এ ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, '১৮২৯ হইতে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত পূর্ণ এক যুগ কাল সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, বেদান্ত, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান হইয়া তিনি যে কেমন করিয়া এই সংস্কারমুক্ততা অর্জন করিলেন, তৎকালে প্রচলিত জ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে এই উদারতার বীজ কোথায় কেমন ভাবে তাঁহার মনে উপ্ত হইল, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও তাহার রহস্য আমাদিগকে অভিভূত করে।'

প্রকৃতপক্ষে, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতাদর্শ তাঁর মনের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে তাঁকে মানবতাবাদের অনুসারী করেছিল। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিদ্যাসাগর সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাই তাঁর সাহিত্যসাধনার পশ্চাতে সমাজসেবকের মনোবৃত্তি কার্যকরী ছিল। একদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সহস্র কুসংস্কারের পরিবেষ্টনে হিন্দুদের জাতীয় জীবন তখন ভয়ানক সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়েছিল, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজদের সাহচর্যে ইয়ং বেঙ্গল দলীয় লোকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যাপক ভাবে পরিবর্ধিত হয়ে উঠেছিল। সমাজের এই চিত্র বিদ্যাসাগরের মনকে বেদনায় পীড়িত করে তোলে। এর পরিণামে তাঁর সমাজ-সংস্কারক মনোবৃত্তি প্রবল হয়। হিন্দুসমাজের আবহমান কালের অনুসৃত হৃদয়বিদারক অনাচারগুলো দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের মনকে সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল। তাঁর রচনাবলীতে সে নিদর্শন বিদ্যমান।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনাবলি : বিদ্যাসাগরের রচনাবলী বিষয় ও আদর্শের দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ। সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার ও সাহিত্য সৃষ্টির যৌথ প্রচেষ্টা তাঁর রচনাবলীর পেছনে কাজ করেছে, সে সব বিষয়ের ওপর তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ : বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১), ঋজুপাঠ (১৮৫১), সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), ব্যাকরণকৌমুদী (১৮৫৩), শকুন্তলা (১৮৫৪), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বর্ণপরিচয় (১৮৫৫), কথামালা(১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬), মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ) (১৮৬০), সীতার বনবাস (১৮৬০), আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩), শব্দমঞ্জরী (১৮৬৪), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১), নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস(১৮৮৮), পদ্যসংগ্রহ (১৮৮৮), সংস্কৃত রচনা (১৮৮৯), শ্লোকমঞ্জরী (১৮৯০), বিদ্যাসাগর চরিত (১৮৯১), ভূগোল খগোল বর্ণনম (১৮৯২); বেনামী রচনা : অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪), বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা (১৮৮৪), রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)।

সমাজসংস্কারের মনোবৃত্তি বিদ্যাসাগরের রচনায় সহজেই লক্ষণীয়। 'ভাবাকাশ সঞ্চারী কল্পস্বর্গ পরিক্রমা স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করে তিনি বাঙালির শিক্ষারীতিকে ফলপ্রসূ করবার জন্য' শিশু-বালক-কিশোর-পাঠ্য কতগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, শিশুশিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করলেই জাতীয় জীবনে মননশীলতা বিকাশের সুযোগ আসবে। এই জন্য তিনি 'মণিহর্ম্যে শিল্পসৌকুমার্য ও অলঙ্করণ স্থগিত রেখে শিক্ষার ভিত্তিমূলে হাত লাগিয়েছিলেন।' বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয়, ঋজুপাঠ, বর্ণপরিচয়, কথামালা, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি। সংস্কৃত শিক্ষার জন্যও তাঁর উদ্যোগ কতিপয় গ্রন্থে রূপ লাভ করেছে। এই সব গ্রন্থের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে বাঙালি জাতিকে চক্ষুষ্মান করতে চেয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসম্পর্কিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' এবং 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ দুটি প্রত্যেকটির দুটি করে খণ্ডের মাধ্যমে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা এবং বহুবিবাহ প্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করার জন্য তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ বলিষ্ঠ মতবাদ প্রকাশ করেছেন। এ সব গ্রন্থের অনুসারী হিসেবে বেনামীতে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য' রচিত 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণ' প্রণীত 'বিধবা বিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা' এবং 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো-সহচরষ্য' প্রণীত 'রত্নপরীক্ষা' উল্লেখযোগ্য। সমাজসংস্কারে নিযুক্ত বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে গোঁড়াপন্থী পণ্ডিতসমাজ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল। উক্ত গ্রন্থগুলোতে তিনি বেনামীতে প্রতিবাদের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন। এই সকল গ্রন্থে কৌতুকাবহ হাসিতামাশার অবতারণা দ্বারা উচ্চাঙ্গের রসিকতা সৃষ্টি করাতে বিদ্যাসাগর সার্থকতা লাভ করেছেন। এই রচনা 'পাণ্ডিত্যের বর্মমণ্ডিত এবং

বহুকাজে নিরতিশয় ব্যস্ত হলেও একটি সহজ-সরল কৌতুকতরল প্রসন্ন মনোভাব বিদ্যাসাগরের মানবসত্তাকে আরেক মূর্তিতে উপস্থাপিত করে।'

বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি প্রকাশক গ্রন্থগুলো হল তাঁর অনুবাদমূলক রচনা। দেশের শিক্ষিত লোকদের সম্মুখে সৎসাহিত্যের আদর্শ তুলে ধরতে পারলে জাতীয় জীবন সুন্দররূপে গড়ে তোলা সহজতর হবে বিবেচনায় তিনি অন্য ভাষার সাহিত্য থেকে কয়েকটি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। সুপ্রসিদ্ধ হিন্দি গ্রন্থ 'বৈতাল পচ্চিসী' থেকে অনুবাদ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নামক সংস্কৃত নাটক থেকে অনুবাদ 'শকুন্তলা', মহাভারতের কিছু অংশের অনুবাদ 'মহাভারত' (উপক্রমণিকা ভাগ), ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' নাটকের অংশবিশেষ এবং বাল্মীকির 'রামায়ণ' অবলম্বনে রচিত 'সীতার বনবাস', সেক্সপীয়রের Comedy of Errors অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে মৌলিক রচনা হিসেবে 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' ক্ষুদ্র নিবন্ধ এবং স্বরচিত 'বিদ্যাসাগর চরিত' গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগর বাংলা সাধুভাষার গদ্যরীতিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। জড়তা ও দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বাংলা গদ্য প্রথম বারের মত তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে প্রকাশ পেয়েছে। এর পরবর্তী রচনাবলীতে তাঁর ভাষা ক্রমে ক্রমে সরলতা ও স্নিগ্ধতা লাভ করেছে। সাহিত্যের বাহন হিসেবে গদ্যের রসালো উপযোগিতা বিদ্যাসাগরের রচনায় প্রথম লক্ষ করা যায়। পদ্যের মত গদ্যেরও যে একটা নিজস্ব তাল বা ছন্দ আছে বিদ্যাসাগর তা আবিষ্কার করেন। তিনি সুষম বাক্যগঠনরীতি প্রবর্তন করে তাতে উপযুক্ত স্থানে সুললিত তৎসম শব্দ এবং তদ্ভব ক্রিয়াপদ ও বাগধারা ব্যবহারপূর্বক বিশেষ শব্দকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বাংলা গদ্যের বিশৃঙ্খল ও নিয়মহীন জনতাকে কমা চিহ্নের দ্বারা সুবিভক্ত এবং উপবাক্যের দ্বারা সুবিন্যস্ত ও অন্বয়ীভুক্ত করে, ভাবানুসারে বাক্যের বহর বাড়িয়ে কমিয়ে গদ্যরীতির অঙ্গে লাবণ্য এবং চলনে সুসমঞ্জস ছন্দের পরিমিতি নির্দেশ করেছেন।

বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর মধ্যে অনুবাদজাতীয় গ্রন্থ প্রাধান্য লাভ করেছে। বিশেষত তাঁর সাহিত্যকীর্তি প্রকাশক গ্রন্থগুলো অনুবাদ মাত্র। তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন, কিন্তু সেখানে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা প্রকাশের যথার্থ অবকাশ ছিল না। বরং হিন্দি সংস্কৃত ইংরেজি থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলী অনুবাদ হলেও তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আসলে ভিন্ন ভাষার কাব্য ও নাটককে উপাখ্যানে রূপান্তরিত করতে গিয়ে তিনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যশিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাঁকে নিছক অনুবাদক হিসেবে মনে করা যায় না। অনুবাদের বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে তাঁর মৌলিকতা পরিদৃশ্যমান। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে সাহিত্যিক গদ্যের সূত্রপাত বিদ্যাসাগরের সময় থেকে তাঁর হাতেই হয়েছে। তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে সাহিত্যিক গদ্য বিচিত্র রূপে ক্রমপরিণতির পর্যায়ে উন্নীত হয়। অমার্জিত বঙ্গভাষাকে বিদ্যাসাগরই সুসংগত মার্জিত রূপ দান করেন। রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম শিল্পী এবং তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।'

বিষয়ানুসারে ভাষারীতির প্রবর্তনা বিদ্যাসাগরের হাতে সার্থকতা লাভ করেছে। এক দিকে 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি অনুবাদমূলক গ্রন্থ বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যানুসারে সংস্কৃত শব্দবহুল এবং অন্য দিকে বিতর্কমূলক গ্রন্থগুলোতে ভাষার সরলতা প্রকাশ পেয়েছে। সীতার বনবাস গ্রন্থে বিদ্যাসাগরী রীতির নমুনা :

> 'লক্ষণ বলিলেন আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা, কুটীরে থাকিতাম; লক্ষণ ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফলমূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন; গোদাবরী তীরে মৃদুমন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া আমরা প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।'

'বিদ্যাসাগর চরিত' ও 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' রচনায় বিষয়ানুযায়ী সরল ভাষা রূপলাভ করেছে। 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা' ও অন্যান্য বেনামী রচনার ভাষায় কথ্য ভাষারীতির মত হালকা রূপ ফুটে উঠেছে। এ ধরনের ভাষায় এমন একটি সরল রসিকতা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রখরতা বিদ্যমান যা বিদ্যাসাগরকে কাছের মানুষ করে তুলেছে। এগুলোতে যুক্তির ধার যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি পরিহাসের তীব্রতাও উপভোগ্য। সাহিত্যের বাহন হিসেবে সরল ও সহজরীতির ভাষাও গৃহীত হতে পারে এ সব রচনা তারই নিদর্শন। 'আবার অতি অল্প হইল' গ্রন্থের ভাষা :

> 'খুড়কে কত লোকে কত গালি দেয়, কত উপহাসন, কত তিরস্কার করে, তাতে খুড়র মনে বিকার মাত্র জন্মে না; কিন্তু আমি, তাঁর জন্য পরিহাসচ্ছলে, দুই একটি উপদেশ দিয়াছিলাম, খুড়র তাহা নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে। খুড় আমার সদাশিব; তাঁর নির্ব্বিকার চিত্তে অকস্মাৎ এত অসন্তোষবিষের সঞ্চার হইল কেন, বুঝিতে পারা যায় না।'

সমাজবিষয়ক রচনাগুলোর মধ্যে বিদ্যাসাগর নিজস্ব বক্তব্য যেমন বলিষ্ঠতা সহকারে প্রকাশ করেছেন, তেমনি আনুষঙ্গিকরূপে এসব রচনার ভাষায় ওজস্বিতা ফুটে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রাদর্শ, সংস্কারমুক্ত নির্মোহ দৃষ্টি, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ যুক্তি ও মানবপ্রেম এসব রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। 'বোধোদয়', 'কথামালা' প্রভৃতি পাঠ্যগ্রন্থের ভাষা সরস ও স্পষ্ট। 'বিদ্যাসাগর চরিত'-স্বরচিত গ্রন্থের ভাষার নিদর্শন :

> প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধারাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন। তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন,

ও শিল নয়, উহার নাম মাইল স্টোন। আমি বলিলাম, বাবা, মাইল স্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইঙ্গরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; স্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোতা আছে; উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে; এই পাথরের অঙ্ক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ, সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।
নামতায় "একের পিঠে নয় উনিশ" ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎপরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এইটি ইঙ্গরেজীর এক, আর এইটি ইঙ্গরেজীর নয়। অনন্তর বলিলাম, তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সতর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্য্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, আজ দুই পর্য্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইল স্টোন যেখানে পোতা আছে, আমরা সেদিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, একদিন দেখাইয়া দিব। আমি বলিলাম, সেটি দেখিবার আর দরকার নাই; এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই, আমি ইঙ্গরেজীর অঙ্কগুলির চিনিয়া ফেলিব।

বাংলা গদ্যের মধ্যে ছন্দবোধ ও ছন্দ আবিষ্কার করে বিদ্যাসাগর ভাষাকে নবরূপে গড়েছিলেন। তাছাড়া, বাংলা প্রবাদপ্রবচনের সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবহার বিদ্যাসাগরের রচনা তথা প্রাথমিক পর্যায়ের গদ্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। প্রবাদের ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গরচনাকে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব হয়েছিল। বাংলা গদ্যে স্বাভাবিক যতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি সুষম বাক্যগঠনরীতির প্রবর্তন করেন। দাঁড়ি কমা প্রভৃতি বিরামচিহ্ন তিনিই প্রথম ব্যবহার করে বাংলা গদ্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনলেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিভার সার্থক সমঝদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথার্থ মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : 'ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারের কতকগুলি বক্তব্য বিষয় পুরিয়া যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। বাংলা ভাষাকে পূর্ব প্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর হইতে মুক্ত করিয়া তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন কলিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।'

তাই বলা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের অনেক আগেই বাংলা গদ্যের উদ্ভব হয়েছিল, তথাপি বিদ্যাসাগরই 'বাংলা গদ্যের জনক' হিসেবে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। বস্তুতপক্ষে শিল্পরসসমন্বিত ভাষাভঙ্গিমা প্রথম প্রয়োগকর্তার গৌরব তাঁরই

প্রাপ্য। বাংলা পরিণত গদ্যরীতির উন্নয়নে বিদ্যাসাগরের প্রভাব অনস্বীকার্য। বিদ্যাসাগরী রীতি অবশ্য স্থায়ীভাবে বাংলা সাহিত্যে আসন লাভ করতে পারে নি। এই রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা 'আলালী রীতি' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র ভাষা 'হুতোমী রীতি'র সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত 'বঙ্কিমী রীতি'র উদ্ভব ঘটে। বঙ্কিমী রীতিই বাংলা গদ্যের পরিণত রূপ। এই পরিণত বাংলা গদ্যসৃষ্টির ভিত্তি রচনায় বিদ্যাসাগরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'বিভিন্ন বাংলা শব্দের পরস্পর সমাবেশে অভিধানগত অর্থ ব্যতিরেকেও যে আর একটি অবর্ণনীয় রসের সৃষ্টি হইতে পারে এই অপূর্ব সত্য তিনিই সর্বপ্রথম মনে মনে অনুভব করিয়া লেখনীর মুখে তাহার সম্ভাবনাও তাঁহার স্বদেশবাসীকে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহার ফলেই শতাব্দীপাদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং অর্ধশতাব্দীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।'

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) পরিচয় একদিকে যেমন 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, অন্যদিকে বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে একজন বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও উল্লেখযোগ্য। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অন্যতম লেখকরূপে তাঁর আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। রাজা রামমোহন রায়ের অনুসারী রূপে ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনায় তিনি প্রথমত আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-অনুভূতি প্রকাশ পেয়ে রচনাকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা হিসেবে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী এবং ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা অবলম্বনে 'ব্রাহ্মধর্ম' (১৮৫২), 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২), 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা' (১৮৬৯-৭২) ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যাত্মচিন্তামগ্ন সংযমসমৃদ্ধ ভক্তিপ্রবণ মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের ভাষায় বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে দেখা যায়, তাতে ভাবপ্রকাশের স্পষ্টতা ও সারল্য প্রকাশমান। তিনি 'ঋগ্বেদে'র প্রথম বঙ্গানুবাদের সূত্রপাত করেন এবং গদ্যে প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮৯৮ সালে রচিত এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর 'স্বরচিত জীবনচরিত' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তাঁর ১৮ থেকে ৫১ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবনকাহিনি স্থান পেয়েছে। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর বিশেষ পরিচয় সার্থক ভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে তাঁর চিঠিপত্রে। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের নিকট লেখা এই সমস্ত পত্রে তাঁর রচনার একটা নিজস্ব রীতি বিরাজমান। তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের রূপায়ণ লক্ষ করা যায় এই শ্রেণির রচনায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় নমুনা :

> 'আবার সেই শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মেঘ বিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল এবং ঘন ঘন ধারা পর্ব্বতকে সমাকুল করিল। সেই অক্ষয় পুরুষেরই শাসনে পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে. তাঁহার শাসনকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। এই সময়ে আমি কন্দরে কন্দরে নদী প্রস্রবণের নব নব

বিচিত্র শোভা দেখিয়া বেড়াইতাম। এই বর্ষাকালে এখানকার নদীর বেগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়। কেহই এ প্রমত্ত গতির বাধা দিতে পারে না। যে তাহাকে বাধা দিতে যায়, নদী তাহাকে বেগমুখে দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়। একদিন আশ্বিন মাসে খাদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখনে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জ্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে, তবে কেন এ সেই দিকেই প্রবল বেগে ছুটিতেছে? কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা!'

অক্ষয়কুমার দত্ত

বাংলা গদ্যের মননশীল ও পরিমার্জিত রূপ প্রদানকারী লেখক হিসেবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক এবং তৎকালীন বিশিষ্ট লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-৮৬) নাম উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বাংলা গদ্যরীতি প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানানুশীলনকারী এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আলোচনাকারী সুলেখক। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠাভ্যাসে বঞ্চিত অক্ষয়কুমার দত্ত নিজের প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য রীতিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করতে সক্ষম হন। সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। তাঁর প্রথম রচনা 'অনঙ্গমোহন' একটি কাব্যগ্রন্থ। পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্তের নির্দেশে তিনি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদে প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমান্বয়ে গদ্যরচনায় দক্ষতা অর্জন করেন।

বাংলা সাহিত্যে বিচার বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধরচনার সূত্রপাত করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়; কিন্তু তাতে সার্থকতার বলিষ্ঠ ইঙ্গিত বর্তমান ছিল না। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রচেষ্টায় এই ধারাটি সাফল্যজনকভাবে অগ্রসর হয়। বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলম্বনে রচিত প্রবন্ধ সাহিত্যে রসসৃষ্টির স্বল্পতা ঘটলেও জ্ঞানসাধকের পরিচয় তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনোবৃত্তি এবং অপূর্ব শ্রমশীলতা সহকারে তিনি বাংলা গদ্যরচনায় আত্মনিয়োগ করে তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষকরূপে তাঁর প্রথম গদ্যরচনা একখানি ভূগোল গ্রন্থ পাঠশালা ও তার বাইরে ব্যবহারের জন্য লিখিত। ১৮৪৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হলে অক্ষয়কুমার দত্ত এর প্রথম সম্পাদক ও প্রধান লেখক হিসেবে খ্যাতিমান হন। একাদিক্রমে বার বৎসর পত্রিকাটির সম্পাদনাকালে বিবিধ গদ্যরচনায় তিনি তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন।

জর্জ কুম্ব রচিত Constitution of Man গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত অক্ষয়কুমার দত্তের উল্লেখযোগ্য পুস্তক 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' প্রথম ভাগ ১৮৫২ এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন ইয়ং বেঙ্গল দলের নৈতিক মান

উন্নয়নের জন্য লিখিত এই গ্রন্থ শারীরবৃত্তির মিতাচার এবং জীবনযাত্রার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বিচার প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের পরিপূরক হিসেবে ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত 'ধর্মনীতি' গ্রন্থে কর্তব্যাকর্তব্য, ধর্মাধর্ম নিরূপণ, বিদ্যাশিক্ষা, শারীরিক সুস্থতা রক্ষার নিয়মাদি এবং সংসারজীবনের প্রয়োজনীয় ও আচরণীয় বিধিসমূহের আলোচনা করেছেন। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থটিও উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মত ইংরেজি মূল অবলম্বনে রচিত, কিন্তু স্বকীয় চিন্তাধারারও প্রকাশক। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম খণ্ড ১৮৭০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩) নামক সুবৃহৎ ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থটি হোরেস হেম্যান উইলসন কর্তৃক রচিত Sketch on the Religious Sects of the Hindus নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থের প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় মূল-আর্য (ইন্দো-ইউরোপীয়), আর্য (ইন্দো-ইরানীয় ও ভারতীয় আর্য) (বৈদিক ও সংস্কৃত) ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা এবং দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় প্রাচীন ভারতীয় অর্থাৎ বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম-দর্শন-সাহিত্যের আলোচনা করা হয়েছে। এ সব আলোচনা শুধু যে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান তা নয়, বরং ভাষাবিজ্ঞানের এই আলোচনাকে ভারতবাসী কর্তৃক প্রথম বলে অভিহিত করা যায়। গ্রন্থটি গবেষণামূলক সাহিত্যের সূচনাকারী, এতে ভারতবর্ষের ১৮২টি ধর্ম সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই গ্রন্থে লেখকের বৈশিষ্ট্য সমাজতত্ত্ববিদ ও পুরাতত্ত্ববিদ হিসেবে প্রকাশমান। 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' (১৮৫৫) নামক ক্ষুদ্রগ্রন্থের পরিচয় এর নামেই প্রকাশ পেয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্তের সর্বাপেক্ষা সমাদৃত পাঠ্যগ্রন্থ 'চারুপাঠ' (প্রথম ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয় ভাগ ১৮৫৯) বাঙালির ভাষাশিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিল। তাঁর বিচারবুদ্ধি ও তথ্যনিষ্ঠার পরিচায়ক এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্যবিস্তার মানসে রচিত এই গ্রন্থে তাঁর স্বরচিত প্রবন্ধও স্থান পেয়েছে। জ্ঞানানুসন্ধিৎসু মনোবৃত্তির ফাঁকে ফাঁকে যে কল্পনাবিলাসের বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় চারুপাঠের অন্তর্ভুক্ত স্বপ্নদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে। রূপক কল্পনার নিপুণতার নিদর্শনও গ্রন্থে বিদ্যমান। অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যুর পরে ১৯০১ সালে প্রকাশিত 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার' গ্রন্থে পুরাতত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় এবং হিন্দু সমাজে প্রচলিত গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য একে মূল্যবান রচনা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া চলে। অক্ষয়কুমার দত্তের রচনার নমুনা :

> নদীর স্রোত স্নিগ্ধ হইয়া তাহার উৎপত্তিস্থল অন্বেষণ করিলে যে প্রকার পর্বতশিখরের প্রতি দৃষ্টি হয়, বায়ু প্রবাহে সৌগন্ধের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাহার আকার অন্বেষণ করিলে যে প্রকার মনোহর পুষ্পোদ্যানের স্মরণ হয়, তদ্রূপ এই বর্তমান জ্ঞানের বৃদ্ধি ও তৎফল সৌভাগ্যের উপক্রম আলোচনা করিয়া সেই পরম হিতৈষির নাম ও সেই পরম দয়াল ব্যক্তির চরিত্র স্মরণ হইতেছে, যাঁহার উপকার দ্বারা এ দেশ পূর্ণ রহিয়াছে, যাঁহার দয়াকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতবর্ষের লোক কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র রহিয়াছেন, যাঁহার নামকে স্থায়ী করিবার জন্য এই সাম্বৎসারক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যাঁহার গুণানুবাদ করিবার জন্য আমরা অদ্য এই অট্টালিকাতে একত্র হইয়াছি—এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত

ডেভিড হেয়ার সাহেব। তাঁহার এই সত্যজ্ঞান ছিল, যে পরের উপকার জন্য তাঁহার জন্ম, এবং পরের উপকার তাঁহার জীবনের সমুদয় কার্য; এবং শরীর, বুদ্ধি সম্পত্তি সমুদয় তিনি পরের হিতের জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাবলি আধুনিক বাংলা গদ্যরীতির বিকাশ ও উৎকর্ষসাধনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য নিয়মানুসারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার করে তিনি বাংলা গদ্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই বাংলা গদ্যরীতিতে জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার পথ সুগম হয়। দেশবাসীকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করানোর ইচ্ছা প্রবল ছিল বলে তত্ত্ব ও তথ্য বিশ্লেষণে তাঁর যে মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্য পরিবেশন ও আলোচনার জন্য তিনি তাঁর রচনারীতিতে সাহিত্যরসের মাধুর্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। তিনি প্রকাশক্ষম ও বাহুল্যবর্জিত রচনারীতি প্রয়োগ করে তাঁর বক্তব্যবিষয় পরিবেশন করেছেন। বাংলা গদ্যের সংশোধনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগী হিসেবে অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গদ্যরীতির জটিলতা বিদূরিত করে তাকে বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তুর জন্য ব্যবহারোপযোগী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর বিষয়গত পার্থক্য ছিল অনেক। বিদ্যাসাগর যেখানে সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, অক্ষয়কুমার দত্ত সেখানে গদ্যের মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রচেষ্টা চালান। এখানেই তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বাংলা গদ্যরীতির সমৃদ্ধি সাধন করেছে।

প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর

বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণে এবং বিবর্তনের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের (১৮৪১-৮৩) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্যের যে সাধুরূপ গড়ে উঠেছিল, প্যারীচাঁদ মিত্র তা অনুকরণ না করে বাংলা গদ্যের ধারায় এক অভিনব লঘু ভঙ্গির প্রবর্তন করেন। বিদ্যাসাগরের ভাষার পদবিন্যাসে কিছু মন্থরতা ছিল, অসংখ্য উপবাক্য ব্যবহারে গতি ছিল শিথিল এবং সংস্কৃতের অতিপ্রাধান্যের ফলে সৃষ্ট গাম্ভীর্য সাধারণ পাঠকের বোধগম্যের অন্তরায় সৃষ্টি করে।

বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বাংলা গদ্যের যে সাধুরীতির উদ্ভব ঘটেছিল তা কেবল লিখিত রূপেই ব্যবহৃত হত; এ দেশের কোন অঞ্চলের নিজস্ব কথ্যরীতি হিসেবে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না বলে বিশেষ চর্চা ব্যতীত তা আয়ত্ত করাও সম্ভব ছিল না। প্যারীচাঁদ মিত্র উপলব্ধি করেছিলেন, 'বিদ্যাসাগরী ভাষা বড় বেশি সংস্কৃতঘেঁষা; ক্লাসিক বর্মেচর্মে আবৃত হওয়ার জন্য ভাষায় সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ছবিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে না।' তাঁর মতে, বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ বঞ্চিত, বিশেষত সেকালের অন্তঃ-পুরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা এই ভাষারীতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারত না। তাছাড়া বিদ্যাসাগরী সাধুরীতির মধ্যে মহৎ ও কোমল ভাবপ্রকাশের যথেষ্ট উপযোগিতা এবং শ্রুতিমাধুর্য ও ধ্বনিময়তা থাকলেও তাকে জীবনের লঘুতর বৈশিষ্ট্য প্রকাশের বাহন হিসেবে গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে প্যারীচাঁদ মিত্র বিদ্যাসাগরী সাধুরীতির

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাপূর্বক লেখ্য ও কথ্যরীতির সংমিশ্রণে তৎকালীন কলকাতা অঞ্চলের মুখের ভাষা অবলম্বনে একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ভাষারীতির সূচনা করলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন হিন্দু কলেজের লেখকগোষ্ঠীর প্রধান এবং ডিরোজিওর আদর্শস্নাত। হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসেবে এবং ইয়ং বেঙ্গলের মন্ত্রদাতা ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ প্রভাবে তাঁর মন নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল। শিক্ষা, সংস্কৃতি, গ্রন্থাগার, কৃষিবিদ্যা, সাংবাদিকতা, অধ্যাত্মবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকে তিনি তৎকালীন কলকাতার সুধীসমাজে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদা পেয়েছিলেন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তিনি কৌতুকরস-সঞ্চিত গল্পকাহিনি, নীতিমার্গীয় আখ্যান এবং আধ্যাত্মিক রূপক উপন্যাস রচনা করার মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে স্বীয় কৃতিত্ব রেখে গেছেন। তিনি অল্প শিক্ষিত জনসাধারণকে, বিশেষ করে অন্তঃপুরবাসিনীদের শিক্ষাচ্ছলে সাহিত্যরসের যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় ১৮৫৪ সালে ক্ষুদ্রাকৃতির 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেন। প্রতি সংখ্যা বার পৃষ্ঠার বেশি হত না। পত্রিকার শীর্ষে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপা থাকত : 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।' তবে এই উদ্দেশ্যের বাইরেও চলতি ভাষা শিক্ষার্থীদের কাছে এই পত্রিকার আবেদন ছিল। এই পত্রিকার ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য ছিল—কথ্যভাষার রীতিতে বাক্য রচনা, তদ্ভব ও ফারসি শব্দের ব্যবহারের প্রাচুর্য এবং সাধু ও কথ্য ভাষার মিশ্রিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার। প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের রচনাগুলো এই মাসিক পত্রিকা অবলম্বনেই প্রকাশিত হয়েছিল। আধুনিক কালে বাংলা গদ্যে কথ্যরীতি যে গৌরবজনক স্থান লাভ করেছে তার ভিত্তি প্যারীচাঁদ মিত্রের হাতে এই পত্রিকা কেন্দ্র করেই স্থাপিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। লোকহিতৈষণার বশেই যে তিনি কলম ধরেছিলেন এ পত্রিকা তার সাক্ষী।

প্যারীচাঁদ মিত্রের রচিত প্রথম গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল' পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। নকশা জাতীয় এই গ্রন্থের কাহিনির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে একটি পরিবারের উত্থানপতন দেখাতে গিয়ে তৎকালীন কলকাতার জীবনযাত্রার বিচিত্র বৈশিষ্ট্য—বিদ্যাশিক্ষা, বিচার-আচার, ব্যবসা-বাণিজ্য, মোসাহেবপরিবৃত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসবহুল জীবনালেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। সাধারণত উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হিসেবে কাহিনি, চরিত্রচিত্রণ, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, বাস্তবতা, সংলাপ, লেখকের জীবনদর্শন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থে লেখকের শিক্ষাত্মক মনোভাবের প্রকাশ ঘটলেও তৎকালীন উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষীণ প্রচেষ্টার মধ্যে এই গ্রন্থকে উপন্যাসের সর্বাধিক লক্ষণাক্রান্ত বলে বিবেচনা করা চলে। তবে এই গ্রন্থে উপন্যাসের লক্ষণানুযায়ী কাহিনির ধারাবাহিকতা অনুসৃত হলেও তাকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রূপে গণ্য করা চলে না। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পর্যায়ের প্লট, অবান্তর ঘটনায় আচ্ছন্ন মূলকাহিনি, নায়কের অপরিণত ভূমিকা, অবহেলিত নারীচরিত্র, প্রণয়রসহীনতা প্রভৃতি ত্রুটির জন্য আলালের ঘরের দুলালকে প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া

যায় না। বরং তৎকালীন জীবনধারার যথার্থ দর্শনে এবং কৌতুকবর্ণনায় উৎকৃষ্ট নকশাকার হিসেবেই প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রতিষ্ঠা।

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে তৎকালীন কলকাতার একশ্রেণীর বিলাসী মানুষের চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে প্যারীচাঁদ মিত্র ব্যঙ্গবিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কাহিনির উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি প্রধান চরিত্র মতিলালকে অবলম্বন করে রূপায়িত হয়েছে। বাবুরামবাবু, ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম ইত্যাদি চরিত্র টাইপ জাতীয় হলেও তাতে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুনীতি, চারিত্রিক আদর্শ ইত্যাদি ব্রাহ্মসমাজের উচ্চমার্গীয় নৈতিক আদর্শের প্রচার নীতিমার্গীয় লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্যরচনার মৌল অনুপ্রেরণা ছিল। তবে তিনি নিম্ন সমাজের ইতরচরিত্রের স্ফূর্তিযুক্ত রূপায়ণেই সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ঠকচাচার চরিত্রটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'উহার মধ্যে কূটকৌশল ও স্তোকবাক্যে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতার এমন চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে যে, পরবর্তী উন্নত শ্রেণির উপন্যাসেও ঠিক এইরূপ চরিত্র মিলে না।' ঠকচাচার প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে ঠকচাচীর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> ঠকচাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও—তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফয়দা? তুমি হর ঘড়ি বলো যে বহুত কাম, এতনা বাতে কি মোদের পেটের জ্বালা যায়। মোর দেল বড়ো চায় যে জরি জর পিনে দশজন ভালো ভালো রেণ্ডির বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কড়ি কিছুই দেখি না, তুমি দেয়ানার মত ফের—চুপচাপ মেরে হাবলিতে বসেই রই। ঠকচাচা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি যে কোশেশ করি তা কি বলব, মোর কেত্না ফিকির—কেত্না ফন্দি—কেত্না প্যাঁচ—কেত্না শেস্ত তা জবানিতে বলা যায় না, শিকার দস্তে এল এল হয় আবার পেলিয়ে যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র এ ধরনের জীবন্ত ও খল চরিত্র চিত্রণে অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

তৎকালীন জীবনের চিত্র হিসেবে আলালের ঘরের দুলালের ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও এ গ্রন্থে ভাষারীতির যে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয়েছে তার জন্য বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। আলালের ঘরের দুলালের ভাষা 'আলালী ভাষা' নামে পরিচিত। এই ভাষাকে বিদ্যাসাগরী ভাষারীতির বন্ধনমুক্তির অগ্রদূত হিসেবে বিবেচনা করা চলে। এই গ্রন্থে সর্বসাধারণের বোধগম্য সরল ভাষার যুক্ত ক্রিয়াপদের পরিবর্তে চলিত ভাষার ধাতুর ব্যবহার, তদ্ভব ও দেশি শব্দের প্রচুর প্রয়োগ, সমাসযুক্ত পদের অব্যবহার, কথ্য ভাষার প্রচলিত ফারসি শব্দ এবং বাংলা প্রবাদের প্রয়োগ এর ভাষাকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছে। হালকা চটুল গতিশীল ভাষার পরিচয় গ্রন্থের সর্বত্র বিদ্যমান। এই ভাষার নমুনা :

> রবিবারে কুঠিওয়ালারা বড়ো ঢিলে দেন—হচ্ছে হবে—খাচ্ছি খাব—বলিয়া অনেক বেলায় স্নান আহার করেন—তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন—কেহ বা তাস পেটেন—কেহ বা মাছ ধরেন—কেহ বা তবলায় চাঁটি দেন—কেহ বা

সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন—কেহ বা শয়নে পদ্মনাভ ভালো বুঝেন—কেহ বা বেড়াতে যান—কেহ বা বহি পড়েন।

চরিত্রের উপযোগী ভাষা ব্যবহারের নিদর্শনও সহজলভ্য। যেমন :

ঠকচাচা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে—মোদের নসিব বড়ো বুরা—মোরা একেবারে মেটি হলুম—ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে—মোকান বি গেল—বিবির সাতে বি মোলাকাত হল না—মোর বড়ো ডর তেনা বি পেল্টে শাদি করে। বাহুল্য বলিল—দোস্ত! ওসব বাত দেল থেকে তফাত করো—দুনিয়াদারি মুসাফিরি সেরেফ আনা যানা—কোই কিসিকা নেহি—তোর এক কবিলা, মোর চেট্টে—সব জাহানম্মে ডাল দেও আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয় তার তদ্বির দেখো।'

আলালী ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষপাতহীন মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : 'আমি এমন বলিতেছি না যে আলালের ঘরের দুলালের ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু, উহাতেই প্রথম এ বাংলাদেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাংলা সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত তাহাতে গ্রন্থ রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্বজনহৃদয় গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়ী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ।' আলালী ভাষারীতি বাংলা গদ্যের বাহন হিসেবে টিকতে পারে নি। কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যে আদর্শ গদ্যরীতির উদ্ভব ঘটেছিল তার পশ্চাতে এই রীতির যথেষ্ট অবদান আছে। বিদ্যাসাগরী রীতির গুরুগম্ভীর পরিসরের বাইরে এই হালকা কথ্যরীতির প্রবর্তন হয়। এর লঘু ভঙ্গির জন্য তা আদর্শ গ্রহণযোগ্যরীতি হিসেবে স্থান করে নিতে পারে নি। ফলে বঙ্কিমী রীতির আবির্ভাব ঘটে। বিদ্যাসাগরী ও আলালী রীতির সম্মিলন ঘটিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যের আদর্শ রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বাংলা গদ্য অবলম্বনে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের ভাষারীতি তাঁর পরবর্তী রচনাসমূহে অনুসৃত হয় নি। আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থে নীতি উপদেশ ও তত্ত্বকথা থাকলেও কৌতুকরস একে আকর্ষণীয় করেছিল। কিন্তু পরবর্তী রচনাবলীতে প্যারীচাঁদ নীতিশিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা প্রচারে বেশি মনোযোগী হওয়ায় বাকরীতির চপলতা ও কৌতুকরস নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। আলালী রীতি ছিল মুখের বুলি, কিন্তু তা বাংলা গদ্যের আদর্শরীতি হতে পারে নি। তবে পরবর্তীকালে কথ্যরীতির যে সার্থকতর ব্যবহার হয়েছে তার পটভূমিকা হিসেবে এই রীতির দান গুরুত্বপূর্ণ। আলালী রীতিতে প্যারীচাঁদ যে বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন তা বিদ্যাসাগরী রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্বরূপ এবং তা পরবর্তীকালে বঙ্কিমী রীতির উদ্ভাবনে পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। আলালী ভাষায় বিদ্যাসাগরী রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়ে মুখের ভাষা কাছাকাছি হয়ে উঠলে তার লঘু ভঙ্গির জন্য তা বাংলা গদ্যে স্থান করে নিতে পারে নি। এর পরিণামে হুতোমী ভাষার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাতেও গদ্যের গ্রহণযোগ্য রীতি প্রবর্তিত হয় নি। অবশেষে বাংলা পরিণত গদ্যরীতি হিসেবে বঙ্কিমী রীতির প্রবর্তনার মাধ্যমের এই সমস্যার সমাধান হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির মধ্যে তৎকালীন গোঁড়া শ্রেণির ব্যক্তিদের চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। আলালের ঘরের দুলালের ভাষার মতই সহজ সরল এর ভাষা, কিন্তু কিছু পরিমাণে সাধুভাষা ঘেঁষা বলে বিশুদ্ধতর। সমসাময়িক কোন কোন লেখকের ওপর এই গ্রন্থ বেশ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। প্যারীচাঁদের অন্যান্য গ্রন্থ 'রামারঞ্জিকা'(১৮৬০) স্ত্রীশিক্ষামূলক গ্রন্থ। 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮) প্রভৃতি তাঁর প্রবন্ধ পুস্তক। 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) ইত্যাদি গ্রন্থ সংলাপপ্রধান গল্পমূলক রচনা এবং মূলত নীতিবিষয়ক। 'গীতাঙ্কুর' (৩য় সংস্করণ, ১৮৭০) ব্রহ্মবিষয়ক গানের সমষ্টি। 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৮) গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের নারীদের শিক্ষা ও মহত্ত্বের পরিচয় উপলক্ষে পৌরাণিক নারীচরিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'বামাতোষিণী'(১৮৮১) প্যারীচাঁদ মিত্রের সর্বশেষ রচনা—নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটির রচিত।

প্যারীচাঁদের রচনায় সমকালীন জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সর্বকালের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সত্য উদঘাটনে ও প্রচারের দিকেই এ সব রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একদিকে যেমন তিনি রঙ্গপরিহাসে উতরোল ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করে পাঠককে কৌতুকরসে বেসামাল করে তুলেছেন, আবার অন্যদিকে সমাজ ও ব্যক্তির জীবননীতি, উচ্চতর চারিত্র্যধর্ম, সজ্জীবন প্রভৃতি নৈতিক ব্যাপার নিয়েও খুব গম্ভীর ধরনের আলোচনায় মগ্ন হয়েছেন। নীতিপ্রচারের দিকে প্যারীচাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকার ফলে তাঁর সমগ্র রচনায় এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা চলে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

বাংলা গদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে প্যারীচাঁদ মিত্র গদ্যের ভাবে ও ভাষায় যে নতুন রীতির পরিচর্যা আরম্ভ করেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০) কর্তৃক তা অনুসৃত হয়ে পূর্ণতার পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরী রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে আলালী রীতির আবির্ভাব। আর একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের অনুসারী হয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশায়' হুতোমী ভাষারীতির প্রবর্তন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্কিমী রীতির মত পরিণত বাংলা গদ্যরীতির উদ্ভাবনে এই রীতির ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ধনবান ও সংস্কৃতিপোষক সিংহ পরিবারের সন্তান কালীপ্রসন্ন সিংহ তরুণ বয়সেই সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। মাত্র ত্রিশ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়েই তিনি সাহিত্য, সমাজসংস্কার প্রভৃতি নানা প্রগতিশীল ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকে এক বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তির বিশিষ্ট নিদর্শন ১৮৬২ সালে প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতাবাসী ধনীসমাজের ব্যঙ্গরসাত্মক চিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে। কলকাতায় উৎসব ও সমাজের বিবিধ বৈশিষ্ট্য রসপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা উপলক্ষে অল্পদিনে ঐশ্বর্যশালী এক শ্রেণির লোকের উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র এখানে রূপ লাভ করেছে। কলকাতার হুজুগপ্রিয় ধনী মধ্যবিত্ত ও সাধারণ সমাজ, উৎসব অনুষ্ঠানের বিকৃত রূপ, শিক্ষিত যুবক, ঘোর ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব বাবাজী, স্থূলাঙ্গিনী বারবধূ, চড়ক, গাজন, দুর্গোৎসব, মাহেশের রথ, চাকুরে বাবু, মোসাহেব পরিবৃত

জমিদার, পথের ভিখারি, কেরানি, দোকানি, হাটুরে, পুরুতঠাকুর, নবীন নাগর ইত্যাদি 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের জনৈক জীবনীকারের মতানুসারে, 'ইহা কেবল নকশা বলিয়াই তৎকালে আদৃত হয় নাই, অনেক ভণ্ড সমাজদ্রোহীর পৃষ্ঠে ইহা যে তীব্র কশাঘাতপূর্বক তাঁহাদিগকে সৎপথে প্রবৃত্ত করিয়া সমাজসংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যও ইহা কম প্রশংসা লাভ করে নাই।' গ্রন্থটিতে তৎকালীন কলকাতার ঐশ্বর্যশালী সমাজের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বলে এর ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতে হয়।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মত ভাষারও বিশিষ্টতা বিদ্যমান। গ্রন্থে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা কথ্যরীতি আশ্রিত এবং এতে কলকাতা অঞ্চলের উপভাষার প্রভাব ব্যাপকতর। এতে আলালী রীতির মত সাধু ও কথ্যরীতির মিশ্রণ ঘটে নি। শুধু কথ্যরীতি ব্যবহৃত হওয়ায় তা ব্যাকরণ অনুযায়ী বিশুদ্ধতর। ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিষয়ের উপযোগী ভাষার জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ মুখের কথাকে গ্রহণ করেছেন এবং বাস্তবতার জন্য ভাল-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল, গ্রাম্য-নাগরিক সব রকম শব্দের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। এই ভাষারীতির জন্য গ্রন্থের নকশাগুলো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। হুতোমী ভাষা নামে এই রীতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। সরসতা এ ভাষার বিশেষ গুণ। তবে তা মার্জিত না হলেও কৃত্রিমতারহিত। এই ভাষার নমুনা :

> এদিকে দনুবাবুর বাপ চণ্ডীমণ্ডপে বসে আলা ফিরাচ্ছিলেন, ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চিৎকার ও রৈ রৈ শুনে গিয়ে দেখলেন বাবুরা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চিৎকার ও হৈ চৈ কচ্চেন, সুতরাং বড়ই ব্যাজার হয়ে উঠলেন ও দনুবাবুকে যাচ্ছেতাই বলে গালমন্দ দিতে লাগলেন। কর্তার গালাগালে একজন ফ্রেণ্ড বড়ই চটে উঠলেন ও দনু তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে কর্তাকে একটা ঘুষি মাল্লেন। কর্তার বয়স অধিক হয়েছিল, বিশেষতঃ ঘুষোটি ইয়ংবেঙ্গলী (বাদুরের বাড়া), ঘুষি খেয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেন। বাড়ির অন্য অন্য পরিবারেরা হা! হা! করে এসে পড়লো, গিন্নী বাড়ির ভেতর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কত্তে লাগলেন। তিরস্কার, কান্না ও গোলযোগের অবকাশে ফ্রেণ্ডরা পুলিশের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন; এদিকে বাবুর করুণা উপস্থিত হলে ও মার কাছে গিয়ে বললেন 'মা, বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক। তোমার ভয় কি! ও ওল্ড ফুল মরে যাক্ না কেন, ওকে আমরা চাইনি; এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে তুমি, বাবা ও আমি একত্রে তিনজনে বসে হেল্‌থ (ড্রিঙ্ক) করবো, ও ওল্ড ফুল মরে যাক, আমি কোয়াইট রিফর্মড বাবা চাই।

সহজ সরল ভাবে অবলীলায় বক্তব্য পরিবেশনের দৃষ্টান্ত হুতোম প্যাঁচার নকশার সর্বত্র বিদ্যমান। লেখকের গতিশীল ভাষার দৃষ্টান্ত হিসেবে আরও কয়টি পংক্তি উল্লেখ করা যায় :

> অমাবস্যার রাত্রি—অন্ধকার ঘুরঘুট্টি—গুড়গুড় করে মেঘ ডাকচে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্ছে—গাছের পাতাটি নড়ছে না—মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে—পথিকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্চেন—আর হন হন করে চলচেন। কুকুরগুলো খেউ খেউ করচে—দোকানীরা ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে;—গুড় ম করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো।

এই ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন, 'লেখক ছুটছেন, ভাষা ছুটছে, বর্ণনীয় বিষয় একটার পর আর একটা ঘাড়ে হুড়মুড় করে এসে পড়ছে, ঘনায়মান আকাশের নিচে ভাষার সঙ্গে পাঠক ছুটছে—হঠাৎ সম্বিৎ হল যখন 'গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো।'—কালীপ্রসন্ন সিংহ ত্রিশ বৎসর পরমায়ুর গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগের মধ্যে আশি বৎসরের কর্মজীবন ভরে দিয়ে দ্রুত ছুটে চলে গিয়েছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হুতোম প্যাঁচার নকশা বহন করছে সেই অনিবার্য দ্রুত গতির চিহ্ন।'

হুতোম প্যাঁচার নকশা গ্রন্থের মূল্য সাহিত্যরসের চেয়ে ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং কলকাতা সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থে ব্যঙ্গরসের অবতারণার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে যে রঙ্গরসসৃষ্টির নতুন রীতি প্রবর্তিত হয়েছে তার জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'সাতজনকৃতবিদ্য সদস্য' পণ্ডিতের সহযোগিতায় ব্যাসের সমগ্র মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করিয়ে প্রচার করেছেন। তিনি কয়েকটি নাটক রচনা করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সমাজ সংস্কারক ও দেশপ্রেমিক হিসেবে তাঁর বিশেষ পরিচয় বিদ্যমান। 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ও 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা এবং 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সাহিত্যপত্রের পুনরায় প্রবর্তনে কালীপ্রসন্ন সিংহের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

গদ্যের পরিণত রূপ

বিদ্যাসাগরী আলালী ও হুতোমী রীতির মাধ্যমে বাংলা গদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অগ্রগতি সাধিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে উদ্ভূত গদ্যের মধ্যে যথার্থ পরিণতরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশ নন্দিনী'র (১৮৬৫) ভাষায় লেখকের নিজস্বতার পরিচয় স্পষ্ট। প্রথমত বিদ্যাসাগরের পথ অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্য লেখা শুরু করেছিলেন। প্রচুর তৎসম শব্দের ব্যবহার, সমাসের আড়ম্বর, সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী বাক্যগঠন প্রভৃতি বিদ্যাসাগরীয় বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনায় স্পষ্ট হলেও 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) উপন্যাসের ভাষা থেকেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছে। তবে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্গদর্শনের যুগের আরম্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব রীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বাক্যের ছোট বহর, সরল বাক্য, বাগভঙ্গির বৈচিত্র্য, বর্ণনাভঙ্গির অন্তরঙ্গতা, নাটকোচিত আকস্মিকতা প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার বৈশিষ্ট্য। তাঁর উপন্যাসের ভাষা যেমন রসের বাহন, তাঁর প্রবন্ধের ভাষা তেমনি মনীষার বাহন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে প্রবন্ধে নতুন জটিল সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশের উপযোগী বিচিত্র ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন, 'বিদ্যাসাগর ভাষাদেহ থেকে পণ্ডিতি বর্বরতা ও গ্রাম্য বর্বরতা মোচনের কাজ শুরু করেছিলেন, বঙ্কিম তা প্রায় শেষ করে আনলেন, আর সেই সঙ্গে ভাষায় দিলেন রসের ঐশ্বর্য ফুটিয়ে তুলবার ক্ষমতা। বিদ্যাসাগরের প্রতিভায় ভাষাবৃক্ষের সরল সবল সতেজ কাণ্ডটি উন্নীত হয়ে উঠেছিল, বঙ্কিমের প্রতিভায় তাতে শ্যামল শোভন সরস শাখা-প্রশাখা ও পত্রপল্লব দেখা দিল।' ড. সুকুমার সেনের মতে, 'বিদ্যাসাগরের সুললিত গদ্যভঙ্গিতে নমনীয়তা ও সরসতা সঞ্চার করিয়া বঙ্কিম সাধুভাষার গদ্যকে সকল বিষয় ভাব এবং রসের বাহন করিয়া তুলিলেন।'

বঙ্গদর্শন সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে কতিপয় প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব ঘটান। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির অনুসরণে তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে অনেক গদ্যলেখকই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার স্পর্শে বাংলা গদ্যের এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন। বাংলা ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের হাতে অসাধারণ ভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রাণের গভীরতর অনুভূতিকে নাড়া দেওয়া রবীন্দ্র-বাকরীতির অনন্যসাধারণ মৌলিক গুণ। রসাত্মক বাক্যই যে যথার্থ সাহিত্য হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের রচনা তার উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে গদ্যরচনার পরিসর সবচেয়ে বেশি স্থান জুড়ে আছে। আর সেখানে তাঁর গদ্যপদ্ধতির বাকভঙ্গির রসসৃষ্টির ও ভাববৈচিত্র্যের বিস্ময়কর অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। দীর্ঘদিনের বৈচিত্র্যধর্মী গদ্যরচনার মাধ্যমে যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তাতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবির কলমের গদ্য, তার ধর্ম কাব্যধর্ম। তাঁর সকল রচনায় কবিপ্রতিভার স্পর্শ লেগে রয়েছে। যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্য ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি, কল্পনার ঐশ্বর্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে অলঙ্কারের প্রাচুর্য। প্রমথনাথ বিশীর মতে, 'বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে গদ্য লাভ করেছিল দার্ঢ্য, যুক্তিনিষ্ঠা এবং লাবণ্য। রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ করে দিলেন নমনীয়তা, কমনীয়তা ও কাব্যশ্রী, যার ফলে অন্তর্লোকে ও বহির্বিশ্বে সঞ্চরণের ক্ষমতা হঠাৎ বেড়ে গেল ভাষার।'

প্রমথ চৌধুরী কর্তৃক সবুজপত্র (১৯১৪) নামে প্রখ্যাত সাহিত্যপত্র প্রকাশের ফলে বাংলা গদ্যে এক যুগান্তকারী রূপ প্রত্যক্ষ করা গেল। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতার ফলে বাংলা গদ্যের কথ্যরীতি সাহিত্যের অন্যতম বাহন হয়ে উঠল। অবশ্য প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যের একটি বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তক। তিনি বীরবল ছদ্মনামে লিখতেন বলে এই স্বতন্ত্র রীতি 'বীরবলী' রীতি নামে চিহ্নিত। এই অভিনব রীতিতে তিনি কথ্যভাষাকে এর মূলরূপে গ্রহণ করেছেন।

বাংলা গদ্যের বর্তমান রূপে সাধু ও কথ্য উভয় রীতিই গৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে গদ্যের যে অত্যাশ্চর্য রূপটি ফুটে উঠেছিল সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের লেখকগণের সাহিত্যপ্রচেষ্টায় তারই অনুবর্তন লক্ষ করা চলে।

কথ্যভাষার সূত্রপাত ও বিকাশ

বাংলা গদ্যের লেখ্যরূপটিতে বর্তমান কালে যেমন সাধু ও কথ্যরীতি পাশাপাশি অবস্থান লক্ষ করা যায়, গদ্যের সূচনা ও বিকাশের প্রাথমিক পর্যায় তেমন পৃথক রূপ ছিল না। গদ্যের লেখ্যরূপ তথা সাহিত্যে ব্যবহার্য সাধুরীতি নামে এক কৃত্রিম ভাষারীতির উদ্ভব ঘটিয়ে সাহিত্যের ভাষা ও মুখের ভাষার মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করা হয়। দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তার উর্ধ্বে এক মার্জিত রূপ সৃষ্টি করে প্রথম থেকেই বাংলা গদ্যকে এক কৃত্রিমতার পরিসীমায় স্থান দেওয়া হয়েছিল।

গদ্যের এই কৃত্রিম রূপ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা প্রথমবারের মত দেখা দেয় আলালী ভাষায়। অবশ্য এর অনেক আগেই উইলিয়াম কেরি তাঁর 'কথোপকথন' গ্রন্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মুখের ভাষা স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা গদ্যের পরবর্তী প্রচেষ্টায় এর কোন প্রভাবের নিদর্শন দেখা যায় নি। বাংলা গদ্য প্রথবারের মত 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের মাধ্যমে প্যারীচাঁদ মিত্র কথ্য বা চলতি ভাষারীতির প্রয়োগ করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বাংলা গদ্যের সাধুরীতি কেবল লিখিত রূপেই প্রচলিত। কোন অঞ্চলেই তা কথ্য রূপে ব্যবহৃত হয় না বলে চর্চা ব্যতীত তা আয়ত্ত করা অসম্ভব। তিনি আরও লক্ষ করেছিলেন, বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ বঞ্চিত লোকেরা, বিশেষত অন্তঃপুরচারিণীরা এই ভাষারীতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই ধরনের অসুবিধা দূরীকরণার্থে প্রথমত 'মাসিক পত্রিকার' মাধ্যমে যে প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছিল তারই ফলস্বরূপ 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটি রচিত। এর মাধ্যমে বাংলা গদ্যরীতিতে এক অভিনব লঘুভঙ্গি প্রবর্তিত হয় এবং তা কথ্যরীতির বহুল ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত করে। বিদ্যাসাগরী রীতির মধ্যে মহৎ ও কোমল ভাবপ্রকাশের যথেষ্ট উপযোগিতা এবং শ্রুতিমাধুর্য ও ধ্বনিময়তা থাকলেও যে তাকে জীবনের লঘুতর বৈশিষ্ট্য প্রকাশের বাহন হিসেবে গ্রহণ করা যায় না তা প্যারীচাঁদ মিত্র অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগরী রীতিতে প্রচুর সংস্কৃত ও সমাসবদ্ধ শব্দ ব্যবহারের ফলে তাতে কৃত্রিমতার ভাব ছিল। তাই প্যারীচাঁদ মিত্র বিদ্যাসাগরী সাধুরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাপূর্বক লেখ্য ও কথ্যরীতির সংমিশ্রণে তৎকালীন কলকাতা অঞ্চলের মুখের ভাষা অবলম্বনে একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ভাষারীতির সূচনা করেন। এই রীতিতে সাধু ভাষার যুক্ত ক্রিয়াপদের পরিবর্তে চলিত ভাষার ধাতু, তদ্ভব ও দেশি শব্দের প্রচুর প্রয়োগ, সমাসযুক্ত পদের অব্যবহার, কথ্য ভাষায় প্রচলিত ফারসি শব্দ এবং বাংলা প্রবাদের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই রীতিও স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে নি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে কলকাতা অঞ্চলে প্রচলিত উপভাষার প্রভাবজাত কথ্যরীতি সাহিত্যে প্রয়োগ করেন। বিদ্যাসাগরী রীতির বিরুদ্ধে আলালী রীতির মাধ্যমে যে বিদ্রোহ সূচিত হয়েছিল তার পরিণাম হিসেবে হুতোমী রীতির আবির্ভাব ঘটে। হুতোম প্যাঁচার নকশার ভাষা একেবারে কথ্যভাষার ঢঙে লেখা। এতে সাধুভাষার অযথা মিশ্রণ নেই। এ দিক থেকে হুতোমী ভাষা আলালের ঘরের দুলালের ভাষার চেয়ে ব্যাকরণ মতে বিশুদ্ধতর। কিন্তু একেবারে উপভাষা ঘেঁষা কথ্যভাষায় লেখা বলে রচনা জমে না। প্যারীচাঁদ মিত্র তা উপলব্ধি করেছিলেন বলে তিনি রচনারীতিতে নিছক কথ্যভাষা ব্যবহার না করে সাধু ও কথ্য উভয় রীতির ব্যবহার করেছিলেন। ব্যাকরণগত দিক থেকে তা ত্রুটিযুক্ত হলেও তাতে রসসৃষ্টির উপযোগিতা ছিল। একান্ত লঘু ভঙ্গির জন্য হুতোমী ভাষারীতিও অনুসৃত হতে পারে নি। বঙ্কিমী রীতিতে মুখের ভাষা ও মনের কথার ব্যবধান দূর হয়ে বাংলা গদ্যে আদর্শ সাধুরীতির প্রতিষ্ঠা হল। বঙ্কিমী রীতিতে আলালী রীতিকে মার্জিত ও উন্নত করে ব্যবহার করা হয়। এ থেকে অনুধাবন করা চলে যে, মুখের বুলি হওয়া সত্ত্বেও হুতোমী ভাষাও টিকে নি, আলালী ভাষাও টিকে নি, কিন্তু তা সুষ্ঠু গদ্যশৈলী উদ্ভবের দিশা দিয়ে গেছে।

পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা গদ্যরীতিতে কথ্যভাষার যে ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তার প্রথম প্রকাশ 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থদ্বয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তবে এর দীর্ঘদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরীর যৌথ প্রচেষ্টায় কথ্য ভাষারীতি সাহিত্যে উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে। প্রমথ চৌধুরীর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রমণবৃত্তান্ত ও পত্র সাহিত্যে কথ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন লেখকের কোন কোন রচনার মধ্যে এই রীতির ব্যবহার দেখা যায়। আলালী ও হুতোমী ভাষা অপেক্ষা তাঁদের চলিত ভাষা অধিকতর সুকর্ষিত ও সংযত শোভন হলেও তা সাধারণ পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদৃত হয় নি এবং উল্লেখিত লেখকগণের মধ্যেও চলিত ভাষা রীতির ব্যাপক প্রচলনের কোন অদম্য ঐকান্তিক প্রয়াস বা সুগভীর সাহিত্যনিষ্ঠার পরিচয় লাভ করা যায় নি। তাঁদের চলিত ভাষায় সাহিত্যচর্চার সাময়িক উত্তেজনা বা খেয়ালজাত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাও নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। আলালী ও হুতোমী রীতির সাহায্যে কথ্যভাষার শিল্পরূপ রচনায় কোন সতর্ক অনুশীলন অথবা কলাশিল্পসম্মত উন্নত কোন প্রয়োগকৌশল লক্ষ করা যায় না।

প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' প্রকাশের পর থেকেই এবং প্রধানত তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথ্যভাষারীতি নিয়মিত ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রনাথের চলিত ভাষাভিত্তিক সুমার্জিত গদ্যরূপ ও রীতির মূলে প্রমথ চৌধুরীর প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। বীরবলী চলিত ভাষা প্রমথ চৌধুরীর একনিষ্ঠ সাধনা ও সৃজনধর্মী মনের আন্তরিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি, দৃঢ়প্রকৃতিস্থ ও বহিরবয়ব আঙ্গিক বিন্যাসে সমৃদ্ধ বীরবলী রীতি বাংলা সাধু গদ্যরীতি অপেক্ষা কোন অংশেই অপকৃষ্ট বা দুর্বল নয়। অতএব বাংলা সাহিত্যে বীরবলী গদ্যরীতিই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক চলিত ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে।

পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যে কথ্যরীতির প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যবহার অতি সহজেই লক্ষণীয়। কথ্যরীতিকে বাংলা গদ্যের অন্যতম বাহন হিসেবে ব্যবহার করে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপক সার্থকতা দেখিয়েছিলেন তারই সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সাহিত্যে কথ্যরীতি মর্যাদা সহকারে গৃহীত হচ্ছে। এমন কি বর্তমানে সাধুরীতির কৃত্রিমতার চেয়ে মুখের বুলি তথা কথ্যরীতির স্বাভাবিকতা অধিকতর সমাদৃত হতে দেখা যায়। এ থেকে মনে হয়, সাধুরীতি যেমন এক সময় সাহিত্যে একচ্ছত্র আধিপত্যে বিরাজ করেছিল, তেমনি এমন কোন সময় আসা অসম্ভব কিছুই নয় যখন কথ্যরীতি সাহিত্যে একমাত্র রীতি হিসেবে বিদ্যমান থাকবে।

বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক মর্যাদা লাভের পর সাধু রীতির যে বিকাশ ঘটেছিল তা থেকে গদ্যের ধরন পরিবর্তিত হয়ে চলিত রীতির বিকাশ ঘটে। চলিত রীতির বিকাশের ধারায় বিদ্যাসাগরী রীতি থেকে বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে আলালী রীতি ও হুতোমী রীতির মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে চলিত রীতির যে মর্যাদা স্বীকৃত হল তার ভাষার নমুনা উল্লেখ করা হল।

ক. বিদ্যাসাগরী রীতি

সীতা, চিত্রপটের আর এক অংশে দৃষ্টিযোজনা করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ঐ যে পর্বতে কুসুমিত কদম্ব তরুর শাখায় ময়ূর ময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্যপুত্র তরুতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি গলদশ্রু নয়নে উহারে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি? লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে! ঐ পর্বতের নাম মাল্যবান; মাল্যবান বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান; দেখুন, নবজলধর মণ্ডলের সহযোগে শিখরদেশে কি অনির্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে আর্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়া, পূর্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম একান্ত আকুল হৃদয় হইয়া বলিলেন, বৎস! বিরত হও, বিরত হও; আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না, শুনিয়া আমার শোকসাগর অনিবার্য বেগে উথলিয়া উঠিতেছে, জানকীয় বিরহ পুনরায় নবীভাব অবলম্বন করিতেছে।

—সীতার বনবাস

খ. আলালী রীতি

বেলেল্লা ছোঁড়াদের আয়েসে আশ মেটে না, প্রতিদিন তাহাদের নূতন নূতন টাটকা টাটকা রং চাই। বাহিরে কোন রকম আমোদের সূত্র না পাইলে ঘরে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসে। যদি প্রাচীন খুড়া জেঠা থাকে তবেই বাঁচোয়া, কারণ বেসম্পর্ক ঠাট্টা চলে অথবা জো সো করে তাঁহাদিগের গঙ্গা যাত্রার ফিকিরও হইতে পারে, নতুবা বিষম সঙ্কট—একেবারে চারিদিকে সরিষাফুল দেখে।

মতিলাল ও তাহার সঙ্গীরা নানা রঙ্গের রঙ্গী হইয়া অনেক প্রকার লীলা করিতে লাগিল কিন্তু কোন লীলা যে শেষ লীলা হইবে, তাহা বলা বড় কঠিন। তাহাদিগের আমোদ প্রমোদের তৃষ্ণা দিন ২ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক ২ রকম আমোদ দুই এক দিন ভাল লাগে তাহার পরেই বাসি হইয়া পড়ে, আবার অন্য কোন প্রকার রং না হইলে ছটফটানি উপস্থিত হয়। এই রূপে মতিলাল দলবল লইয়া কাল কাটায়।

—আলালের ঘরের দুলাল

গ. হুতোমী রীতি

এদিকে দুইয়ের নম্বরের বাড়ীতে অনেকে এসে জমতে লাগলেন। অনেকে সখের অনুরোধে ভিজে ট্যাপট্যাপে হয়ে এলেন। চারডেলে দিয়ালগিরিতে বাতি জ্বলছে— মজলিশ জক জক কচ্চে—পান, কলাপাতের এঁটো নল ও থেলো হুঁকোর কুরুক্ষেত্তর। মুখুয্যেদের ছোটবাবু লোকের খাতির কচ্চেন—'ওরে' 'ওরে' করে তাঁর গলা ছিরে গ্যাচে। তেলি, ঢাকাই কামার ও চাষা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফিনি, মেটো, ঘন্টো ও আটা নেকড়ান লুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট হয়ে বসে আছেন—অনেকের চক্ষু বুঁজে এসেছে—বাতির আলো জোনাকি পোকার মত দেখচেন ও এক একবার ঝিকিমিকি ভাংলে মনে কচ্চেন যেন উড়চি। ঘরটি লোকারণ্য—খাতায় খাতায় ঘিরে বসে আছেন—থেকে থেকে কক্কুড়িটে টপ্পাটা চলচে—অনেক সেয়ানা ফরমেসে জুতো জোড়াটি হয় পকেটে নয় পার নীচে চেপে রেখে বসেচেন—জুতো এমন জিনিস যে দোয়ার দলের পরস্পরে বিশ্বাস নেই।

—হুতোম প্যাঁচার নকশা

ঘ. বীরবলী রীতি

পরের ধনে পোদ্দারি করা হচ্ছে যখন বাংলা ভাষার চিরকেলে বদ অভ্যাস, তখন এ যুগে তা অসংখ্য ইংরেজি শব্দ শুধু মুখস্থ নয় উদরস্থও করবে সে তো ধরা কথা। এতে বাংলা তো তার স্বধর্মই পালন করে চলেছে। তবে আমাদের ভাষার পরকে আপন করার স্বভাবের বিরুদ্ধে আজ কেন আপত্তি উঠছে? এর একটি কারণ, পূর্বে বাংলা ভাষা বিদেশি শব্দ বেমালুম আত্মসাৎ করেছে; অপরপক্ষে আজ তার এই চুরি-বিদ্যেটা এক ক্ষেত্রে সহজেই ধরা পড়ে। সেকালে বাংলা মুসলমানদের কাছ থেকে কর্মের ভাষা নিয়েছিল, পর্তুগিজ-ফরাসিদের কাছ থেকে নিয়েছিল শুধু জিনিসের নাম আর আজ আমরা ইংরেজি থেকে ও দুই জাতীয় কথা তো নিচ্ছিই, উপরন্তু তার জ্ঞানের ভাষাও আত্মসাৎ করছি।

—বাংলা ভাষার কথা

ঙ. রবীন্দ্ররীতি

আমাদের মণিভূষণ চশমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্ন করলে, 'সাহিত্য থেকে লয়ালটি উঠিয়ে দিতে চান?'

'একেবারেই। এখন থেকে কবি-প্রেসিডেন্টের দ্রুতনিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরে মকশো-করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো; ফুলের মতো নয়; বিদ্যুতের রেখার মতো ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো—খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, গথিক গির্জের ছাঁদে; মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়; এমনকি, যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিলডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।...এখন থেকে ফেলে দাও মন ভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল।

—শেষের কবিতা

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পত্তনিযুগে ধর্মপ্রচার ও ধর্মকলহ সক্রিয় ছিল বলিয়া বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা এত ত্বরান্বিত হইয়াছিল।'—এ কথার যাথার্থ্য বিচার কর।

২। 'প্রশাসনিক প্রয়োজন ও ধর্মীয় বিতর্কই বাংলা গদ্যের চর্চা ও বিকাশ ত্বরান্বিত করেছিল।'—এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রমাণ কর।

৩। 'প্রশাসনিক প্রয়োজন নয়, ধর্মীয় কোন্দলও নয়, প্রতীচ্যপ্রভাবে উদ্ভূত বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসাই বাংলা গদ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত করেছিল।'—ঐতিহাসিক তথ্যযোগে এই উক্তি সম্পর্কে তোমার মতামত লিখ।

৪। 'বাংলা গদ্যের উদ্ভব অন্তরের প্রেরণায় হয় নাই, হইয়াছে বাহিরের প্রভাব ও প্রয়োজনে।'—বুঝাইয়া দাও।

৫। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা-সাহিত্যে যে নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল, তাহাতে শ্রীরামপুর মিশনের ও হিন্দু কলেজের দান কতখানি ছিল,—বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর।

৬। 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সুষ্ঠু গদ্যরীতি কিংবা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি না হলেও ভাষা-সাহিত্যের অনুশীলনে বাঙালিকে পরোক্ষ প্রবর্তনা দান এর অন্যতম গৌরব।'—সমকালীন কলিকাতার বাঙালি সমাজের ভাষা-সাহিত্য চর্চার বর্ণনাদান সূত্রে এ মন্তব্য পরীক্ষা কর।

৭। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মিশনারি দলের ও পণ্ডিতগণের সাহিত্য সাধনার পরিচয় দিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের ভূমিকা এবং তাঁহাদের রচিত সাহিত্যের গুরুত্ব নির্ণয় কর।

৮। বাংলা গদ্যের বিবর্তনে কেরি, রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয়ের দান কোন ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ বুঝাইয়া দাও।

৯। ফোর্ট উইলিয়াম যুগ বলিতে কি বুঝ? ঐ যুগের প্রধান লেখকগণের অবদান বিচার করিয়া প্রশ্নটির উত্তর লিখ।

১০। 'প্রকৃতপক্ষে হ্যালহেড, হেনরি পিটস ফরস্টার ও উইলিয়াম কেরি, এই তিন ইংলন্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।'— আলোচনা কর।

১১। উনিশ শতকের দাপটে আঠার শতকের মিলিত হিন্দুমুসলমানের প্রয়াসপুষ্ট বাংলার জনভাষা সাহিত্যের আসর হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হয়। হেতু পরিচয়ে বিশ্লেষণ কর।

১২। 'সাহিত্যের ভাষা প্রতিদিনকার সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত মৌখিক ভাষারই নির্বাচিত ও কতকটা ঊর্ধ্বায়িত রূপ।'—এই উক্তি কতটা সত্য? এ প্রসঙ্গে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও তার অল্পপরবর্তী বাংলা গদ্য প্রয়াসে এই মূলনীতি কতটা রক্ষিত হইয়াছে, কিংবা হয় নাই এবং সেজন্য বাংলা গদ্যের বিকাশের ধারা কোনক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত, অথবা ব্যাহত হইয়াছে কিনা আলোচনা কর।

১৩। বাংলা গদ্যশৈলীর উদ্ভবের পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে লেখনী ধারণ করা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

১৪। 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।'—এই উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

১৫। বাংলা গদ্যের বিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানের পরিমাপ কর।

১৬। বাংলা গদ্যের কোন কোন ঐতিহাসিক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বহাল থাকা সত্ত্বেও ১৮১৫ সালের পরবর্তী সময়কে রামমোহনের যুগ বলিয়া চিহ্নিত করেন। অপরপক্ষে, সুশীলকুমারের মত পণ্ডিত বাংলা গদ্যে রামমোহনের অবদানকে নগণ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই দুই উক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রকৃত অবদানের মূল্যায়ন কর।

১৭। বাংলা গদ্যের বিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা প্যারীচাঁদ মিত্রের অবদানের পরিমাপ কর।

১৮। বাংলা গদ্যের উন্মেষ যুগে শ্রীরামপুর মিশনারিদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখ।

১৯। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় ও প্যারীচাঁদ মিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলা গদ্যের বিকাশ তরান্বিত করিয়াছেন।'—আলোচনা কর।

২০। 'পাঠ্য বইয়ের সীমাবদ্ধতা থেকে রামমোহন বাংলা গদ্যকে উদ্ধার করলেন বটে, কিন্তু তার সাহিত্যিক সম্ভাবনা সৃষ্টি করলেন বিদ্যাসাগর।'—বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাঁহার সমসাময়িক কালের গদ্য লেখকদের পারস্পরিক তুলনার সাহায্যে তদানীন্তন কালের গদ্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

২২। 'প্রাক-বঙ্কিম গদ্য রচনাবলীতে সংস্কারমূলক মনের পরিচয় আছে তবু সে সব রচনা একেবারে সাহিত্যরস বহির্ভূত এ কথা বলা যায় না।'—উক্তিটির স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণসহ আলোচনা কর।

২৩। 'রামমোহন থেকে বঙ্কিম' এই পর্বে বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা কর।

২৪। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের ধারার পরিচয় দিয়া একটি নিবন্ধ রচনা কর।

২৫। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্যের বিকাশ'—এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করে বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর অবদান কতটুকু মূল্যবহ তাৎপর্যময় তা বিশ্লেষণ কর।

২৬। 'বাংলা গদ্যের দুই রূপ—একটি সাধু অপরটি চলিত। একটির উৎসমুখে অবস্থান করিতেছেন বিদ্যাসাগর, অপরটির প্যারীচাঁদ।'—আধুনিক বাংলা গদ্যের বিবর্তন ধারা নির্দেশ প্রসঙ্গে সমালোচকের এই উক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য, আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

২৭। জনগণের বুলি-ঘেঁষা হওয়া সত্ত্বেও 'আলালী ভাষা' কিংবা 'হুতোমী ভাষা' জনপ্রিয় হইল না কেন, তথ্য নির্ভর আলোচনার দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২৮। 'মুখের বুলি হওয়া সত্ত্বেও হুতোমী ভাষা টেকেনি, আলালী ভাষাও টেকেনি, কিন্তু আলালী ভাষা সুষ্ঠু গদ্যশৈলীর দিশা দিয়ে গেছে।'—কি দোষে হুতোমী ভাষা অনুসৃত হয় নাই, আর কি ভাবে আলালী ভাষা বাংলা গদ্যের বিকাশে সহায়তা করিয়াছে, বিশদভাবে আলোচনা কর।

২৯। আধুনিক বাংলা গদ্যে কথ্য ভাষা অর্থাৎ চলিত ভাষার সূত্রপাত ও বিকাশ দেখাইয়া একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখ।

৩০। বাংলা গদ্যরীতির বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদের অবদানের স্বরূপ নির্ণয় কর।

৩১। বাংলা গদ্যের বিকাশে রামমোহন রায়ের অবদান কোন অর্থে কতটা তাহা বুঝাইয়া দাও।

৩২। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩৩। গদ্যসাহিত্য আধুনিক বাংলার বলিষ্ঠ বাহন হিসাবে কতখানি সার্থক এবং এ সার্থকতার পথে কোন কোন শিল্পী পথ নির্মাতার কাজ করিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া লিখ।

৩৪। বাংলা গদ্যের বিকাশে কেরি, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন ও অক্ষয় দত্তের ভূমিকা আলোচনা কর।

৩৫। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কবে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকার মূল্যায়ন কর।

৩৬। বাংলা গদ্যের উন্মেষ ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য গদ্য শিল্পীদের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩৭। বাংলা গদ্যের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দানে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৩৮। বাংলা গদ্যের উন্মেষযুগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩৯। টীকা লেখ : অক্ষয়কুমার দত্ত, আলালের ঘরের দুলাল, উইলিয়াম কেরি, কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ, জে. সি. মার্শম্যান, টেকচাঁদ ঠাকুর, দোম আন্তনিও, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ, ভ্রান্তিবিলাস, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, মাসিক পত্রিকা, মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, রামরাম বসু, রাজা রামমোহন রায়, সীতার বনবাস, হুতোম প্যাঁচার নকশা, হ্যালহেড।

তৃতীয় অধ্যায়
সাময়িক পত্র

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই গদ্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। পুরানো গদ্যের মধ্যে যে বিষয়-বৈচিত্র্য ছিল না এমন কথা বলা যাবে না। তবে আধুনিক যুগে এসে গদ্য আরও বেশি উপযোগিতা দেখিয়েছে। সাহিত্যকে বৈচিত্র্যমুখী করার জন্য গদ্যের বিকাশের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। গদ্য অবলম্বনে নানা বিষয়ে গ্রন্থরচনার প্রবণতা প্রথম থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশে সাময়িক পত্রের প্রচলনও গদ্যের বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত। ঊনিশ শতকে বাংলা গদ্যের গঠনে তৎকালীন সাময়িক পত্রাদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান।

বাংলা গদ্যের বিকাশে এবং তাকে বহুমুখী প্রয়োগ করার পশ্চাতে এ দেশের সাময়িক পত্রগুলোর দান অপরিসীম। সাময়িক পত্র প্রচলিত রাখার জন্য রচনার প্রয়োজনীয়তা মিটাতে গিয়ে যেমন লেখকের সৃষ্টি ও অনুশীলনের সুযোগ ঘটেছে, তেমনি পত্রপত্রিকার সান্নিধ্যে পাঠকেরা জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যরসের স্পর্শ পেয়েছে। এগুলো একদিকে বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন সাধন করেছে, অন্যদিকে গদ্যের পরিণতিতে সাহায্য যুগিয়েছে। সাময়িক পত্রাদির লেখকের সঙ্গে পাঠকের যে সম্পর্ক তা প্রয়োজন বা কৌতূহলের নিরিখে নির্ধারিত। কিন্তু সে প্রয়োজন সাধনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় নতুন শব্দ, ভাষায় আসে নিত্যনতুন ভঙ্গি। প্রয়োজনের টানে আভিধানিক শব্দাবলী হয়ে ওঠে মসৃণ, কেটে যায় ভাষার আড়ষ্টতা। তাই সাময়িক পত্রের ব্যাপক প্রচলনের ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলা গদ্যসাহিত্যে এসেছে নমনীয়তা, বৃদ্ধি পেয়েছে শব্দসম্ভার এবং সকল কাজে ব্যবহারযোগ্যতা দেখা দিয়েছে। গদ্যের বিকাশের জন্য যেমন ছিল সাময়িক পত্রের আবশ্যকতা, তেমনি সাময়িক পত্রের জন্য দরকার ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ গদ্যনির্ভর সাহিত্যসৃষ্টি।

বাংলা গদ্যরীতিকে সাহিত্যিক গদ্যে উন্নীত হওয়ার জন্য মাঝখানে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের যুগকে অতিক্রম করা অপরিহার্য ছিল। সাময়িক পত্রে গদ্যের চর্চার ফলে গদ্যসাহিত্যের নমনীয়তা বেড়েছে, বেড়েছে শব্দসম্ভার, বেড়েছে সবক্ষেত্রে ব্যবহার যোগ্যতা। বাংলা গদ্যগঠনে যাঁরা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা প্রায় সবাই সাময়িকপত্র বা সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

সাময়িক পত্রের মাধ্যমে সাংবাদিকগণ গদ্যগঠনে যে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন তা যথার্থই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রয়োজন বা কৌতূহলের তাগিদে সাংবাদিকগণ পাঠক সমাজের কাছে যা তুলে ধরেন তা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য নয়, কিন্তু সাংবাদিকতার ভূমিকা ছাড়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয় না।

প্রমথনাথ বিশীর একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে সাহিত্যের ওপর সাংবাদিকদের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। তিনি লিখেছেন, 'এক হাতে 'কপি' অন্য হাতে কলম, এক

চোখ ঘড়ির কাঁটায় অন্য চোখ কাগজে এমন অবস্থা উচ্চাঙ্গ সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল নয় কিন্তু 'সরস্বতীর দিনমজুর' বলে যাঁরা অযথা নিন্দিত সাহিত্যের ওপর তাঁদের অপরিসীম প্রভাব। ঈশ্বর গুপ্তের আমল থেকে অদ্যাবধি সাংবাদিকগণ কত নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই, বাংলা গদ্যের কত নতুন ঢং সৃষ্টি করেছেন তারও হিসেব হয় নি। এসব গবেষণার বিষয় বলে গণ্য হওয়া উচিত। 'বাধ্যতামূলক' ও 'সম্পাদকীয় স্তম্ভ' শব্দ দুটোকে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করেছেন, তবু বাধ্যতামূলক শব্দটাই চলল, 'আবশ্যিক' চলল না। 'পরিবেশ' ও 'অবস্থা' মিলিয়ে সে 'পরিস্থিতি' শব্দ, যা এখন সকলেই ব্যবহার করছেন তা সংবাদপত্রের দান। এশিয়া শব্দ থেকে কোন নিয়ম অনুসারে 'এশীয়' পদ নিষ্পন্ন হয় না, কিন্তু এ বিচিত্র শব্দটিকে হাত পেতে নিতে হচ্ছে সংবাদপত্রের কাছ থেকে। এমন শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আর প্রধান প্রধান সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র ভাষাকে কখনও একদিকে কখনও আর একদিকে নিত্য মোচড় দিচ্ছে, কখনও ব্যঙ্গ কখনও ওজস্বিতা বিচিত্র রস আদায় করে নিচ্ছে, সাহিত্যে গিয়ে পড়ছে তার প্রভাব। সাহিত্যিক ইন্সপিরেশন বা প্রেরণার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারেন, কিন্তু যে সাংবাদিককে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে বা বিশেষ একটা সময়ে কপি দিতে হবে, তীর্থের কাকের মত তারও বসে থাকা চলে না। ঠিক শব্দটি কলমে না এলে কাছাকাছি শব্দ তাকে বানিয়ে নিতে হয়, কিংবা এক শব্দকে অন্য অর্থে প্রয়োগ করতে হয়, কিংবা ইংরেজি শব্দকে বাংলা ছাঁচে ঢালাই করে নিতে হয়। এমন করে অনেক অপসৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন অনেক সৃষ্টি হয় বা গ্রহণ করে ভাষা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্রোতের টানের নুড়িগুলো বন্ধুরতা হারায়, সচল হয়ে ওঠে, প্রয়োজনের টানে আভিধানিক শব্দগুলো সচল হয়ে উঠছে, গ্রাম্য শব্দগুলো বন্ধুরতা হারিয়ে বেশ মসৃণ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রধান দান নিত্য নতুন শব্দ সম্ভার। এইসব শব্দের কতক তাঁরা সৃষ্টি করেছেন আর কতক বা প্রয়োগের দ্বারা সিদ্ধ করে স্থায়িত্ব দিচ্ছেন। আর তাঁদের অন্য একটি দান হচ্ছে ভাষাকে সর্ববিষয়ে প্রকাশক্ষম করে তুলছেন। রামমোহনের কলম শাস্ত্রানুবাদ করতে পারে, গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করতে পারে; মৃত্যুঞ্জয়ের কলম বিদেশী ছাত্রের পাঠ্যপুস্তকের জন্য বিভিন্ন রীতির গদ্য রচনা করতে পারে। কিন্তু সাংবাদিকের কলমকে হংসের মত জলস্থল অন্তরীক্ষ সর্বত্র বিচরণ করতে হয়।'

বাংলা গদ্যকে সর্বজনের ব্যবহারোপযোগী করার পেছনে সাময়িক পত্রের ভূমিকার তাৎপর্য অবশ্যই স্বীকার্য।

সাময়িক পত্রের দুটি প্রধান উদ্দেশ্যের কথা গোপাল হালদার উল্লেখ করেছেন : 'এক, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য। বাংলা সংবাদপত্র জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্য বাংলা ভাষায় জুগিয়ে সমাজের চেতনাকে প্রসারিত করেছে। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বড় দান প্রথম সমাচারদর্পণের; পরে জ্ঞানান্বেষণের, জ্ঞানোদয়ের, শেষে তত্ত্ববোধিনীর। দুই, ভাষা ও সাহিত্য গঠন। যে আটপৌঢ়ে বাংলা গদ্য গড়ে না উঠলে সামাজিক চেতনা আত্মপ্রকাশের পথ পায় না সে গদ্যগঠনে সংবাদপত্রই সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। সংবাদের সঙ্গে শুধু তথ্য জুগিয়ে সংবাদপত্রের চলত না; সেই সঙ্গে লোকের মনোরঞ্জনেরও চেষ্টা করতে হত। সরস লেখা যোগাবার চেষ্টায় সাহিত্যিক রচনারও তাই প্রয়োজন হয়। সমাচার চন্দ্রিকার পরেই এ ক্ষেত্রে প্রভাকরের উদয় হয়। অবশ্য পরযুগে তত্ত্ববোধিনীর পরে

সাময়িক পত্র সাহিত্যেরই উর্বর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে—আর আজও তা আছে।' বাংলা সাময়িক পত্রগুলো প্রকাশে প্রথম থেকেই এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সফল করে চলেছে।

বাঙালিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে ও সংস্কৃতিতে দীক্ষাদানের ব্যাপারে সাময়িক পত্রগুলোর দান ছিল যথেষ্ট। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সাময়িক পত্র সম্পর্কে তা বিশেষ ভাবে সত্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এ দিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র তথ্য প্রচার করে যেমন সমসাময়িক লোকের মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ঘটিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে ভাষা ও সাহিত্য গঠনে সাময়িক পত্রপত্রিকা বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এদের কার্যক্রম শুধু তথ্য সরবরাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এতে শিক্ষিত মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য বিচিত্র উপকরণের সমাবেশ ছিল। মানবহৃদয়ের বহুমুখী ভাব-ভাবনার বিচিত্র প্রকাশ ও পরিতৃপ্তির দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে সাময়িক পত্র অবলম্বনে সাহিত্যিক গদ্যের উন্মেষ। ড. আনিসুজ্জামান এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা গদ্যের বিকাশে, সাহিত্যের নতুন আঙ্গিক-প্রবর্তনে সামাজিক ভাব-আন্দোলনের সৃষ্টিতে রাজনৈতিক চেতনা-সঞ্চারে এবং সাহিত্য সংস্কৃতিগত রুচি-নির্মাণে সাময়িক পত্রের দান অপরিসীম।'

প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা সাময়িক পত্র ছিল সংবাদাশ্রিত। ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা ও বিতর্ক তৎকালীন সকল পত্রপত্রিকার উপজীব্য ছিল। সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। পরবর্তী পর্যায়ে বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন চলে। রাজনৈতিক চেতনার নিদর্শনও বাংলা সাময়িক পত্রিকায় বিদ্যমান। দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের ফলে তা সংবাদ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে এবং সাময়িক পত্র সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। অবশ্য এখনও সংবাদপত্রের পাতায় সাহিত্যের আসর আর সাময়িক পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন লক্ষ করা যায়। বাঙালি সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশের বাহন হিসেবে সাময়িক পত্র বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রকাশের বাহন হচ্ছে গদ্যসাহিত্য। আর গদ্য অবলম্বনে প্রচারিত বলে সাময়িক পত্রগুলো মধ্যবিত্ত সমাজের কণ্ঠ হিসেবেও বিবেচিত।

এ দেশে সংবাদপত্রের প্রচার পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' (Bengal Gazettee or Calcutta General Advertiser)। এই ইংরেজি সাময়িক পত্রটি জেমস অগাস্টাস হিকি কর্তৃক ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ বেসরকারি ইউরোপীয়দের মালিকানার এসব সংবাদপত্র কোম্পানির কঠোর সমালোচক হিসেবে 'কোম্পানির বিঘোষিত নীতি ও শাসনপদ্ধতি এবং কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের কার্যকলাপকে এঁরা ক্রমাগত আক্রমণ' করে চলেছিল। ফলে লর্ড ওয়েলেসলি সংবাদপত্র শাসনের উদ্দেশ্যে ১৭৯৯ সালে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচন করে কঠোর সেন্সর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থায় সকল সংবাদ সেক্রেটারি কর্তৃক পরীক্ষিত হয়ে প্রকাশিত হত এবং নিয়ম লঙ্ঘনকারীকে ইউরোপে নির্বাসন দেওয়া হত। গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস ১৮১৮ সালের আগস্ট মাসে এই ব্যবস্থা রহিত করেন। এর চার মাস পূর্বে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয়।

বাংলা সাময়িক পত্রের সমগ্র ইতিহাসকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করা যায়।

১৮১৮ সালে প্রকাশিত 'দিগদর্শন' থেকে ১৮২৯-এ প্রকাশিত 'বঙ্গদূত' পর্যন্ত প্রথম যুগ।

১৮৩১ সালে প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে ১৮৪৩-এ প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পূর্ব পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে ১৮৭২ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শনে'র পূর্ব পর্যন্ত তৃতীয় যুগ।

বঙ্গদর্শন থেকে ১৮৭৭-এ প্রকাশিত 'ভারতী'র পূর্ব পর্যন্ত চতুর্থ যুগ।

ভারতী থেকে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত 'সবুজ পত্র' পর্যন্ত পঞ্চম যুগ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই পর্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্র যে উৎকর্ষ লাভ করেছিল পরবর্তীকালে তারই অনুসরণ লক্ষ করা যায়।

দিগদর্শন

বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন' মাসিক হিসেবে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পদনায় শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যের সূচনায় যেমন মিশনারিদের নামই প্রধান, তেমনি সাময়িক পত্রের ইতিহাসের সূচনায় তাঁরাই প্রাধান্য লাভ করেছেন। 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' এই পত্রিকায় অন্তর্ভুক্ত হত। এতে ভূগোল, ইতিহাস, দেশবিদেশের জ্ঞাতব্য তথ্য, কৌতুককর অথবা বিস্ময়জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনি সহজ ভাষায় পরিবেশিত হত বলে তা স্কুল বুক সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য- পুস্তকরূপে প্রচলিত ছিল।

সমাচার দর্পণ

দিগদর্শন প্রকাশের কিছু পরেই ১৮১৮ সালের মে মাসে জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে সাপ্তাহিক 'সমাদার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। পরবর্তী-কালে এই পত্রিকাটি সপ্তাহে দুবার করে প্রকাশিত হতে থাকে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বাংলা সংবাদ রচনা ও সঙ্কলনে সম্পাদকের সহায়ক ছিলেন বলে তা উন্নতমানের সংবাদপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। সংবাদ, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়াদির বিবরণ এই পত্রিকায় স্থান পেত। সে আমলে প্রগতিশীল পত্রিকা হিসেবে এর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সমাচার দর্পণের ভাষায় সরলতা ছিল, লেখায় তথ্য-বোধ ও মাত্রাজ্ঞান দেখা যায়। ১৮৪১ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। তবে পরেও কয়েক বার এই পত্রিকা পুনঃপ্রকাশিত হয়। সমাচার দর্পণের ভাষার নমুনা :

> 'অস্মদ্দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন বিষয়ক বার্তা শ্রবণে এবং যাত্রা কি পর্যন্ত প্রশংসা ও উৎসাহরূপে হইয়াছে তৎশ্রবণে নাট্যাসক্ত ব্যক্তিরা অত্যন্তামোদী হইয়াছেন। ব্রিটন দেশজাত আমারদের ভ্রাতৃবর্গেরা যেরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন হিন্দুগণও তদ্রূপ সভ্যতা যে এইক্ষণে প্রাপ্ত হন ইহা আমরা শ্লাঘ্য করিয়া মানি। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাভিমানি ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে

তাঁহারা যাদৃশ সভ্য তাদৃশ কখন হিন্দুরা হইতে পারিবেন না অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড দেশজাত তাবল্লোকের মনোমধ্যে যে গুণ স্থাপিত হইয়াছে তাদৃশ গুণ কদাচ হিন্দুরদের মধ্যে নাই কিন্তু এ কেবল হাস্যাস্পদ কথা যেহেতুক অতিশয় হ্রস্বদর্শি ব্যক্তিরাও দেখিতেছেন যে ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন।'

বাঙালি পরিচালিত প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক 'বাঙ্গাল গেজেটি' গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়; পত্রিকাটি দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারে নি।

সম্বাদ কৌমুদী

খ্রিস্টান মিশনারিরা সমাচার দর্পণ পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দু ধর্মমতের প্রতি কটাক্ষপাত করত বলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মিলিত ভাবে ১৮২১ সালে 'সম্বাদ কৌমুদী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখিত ছিল, 'লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রকাশের প্রধান লক্ষ্য। দেশবাসীর অভাব-অনুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে আলোচিত হইবে।' রাজা রামমোহন রায় পত্রিকাটির জন্য নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ সরবরাহ করতেন। হিন্দুদের কতিপয় প্রচলিত প্রথা—বিশেষত সহমরণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় জনসাধারণ সম্বাদ কৌমুদীর প্রতি বিরাগভাজন হয়। পত্রিকাটি পরিচালনা করতে গিয়ে সমাজসংস্কার বিষয়ে আদর্শগত দিক থেকে সংস্কারমুক্ত রাজা রামমোহন রায় এবং গোঁড়াপন্থী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তখন ভবানীচরণ ১৮২২ সালে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং গ্রাহক সংখ্যাও অন্য সাময়িক পত্রের চেয়ে বেশি ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে আমলের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খলতা তিনি তাঁর কতিপয় ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনায় চিত্রিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি সাধনে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকায় ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত 'বুলবুলাখ্য পক্ষীর যুদ্ধ' নিবন্ধের বর্ণনা থেকে সে আমলের বড়লোকের বিলাসের চিত্র এবং পত্রিকায় ব্যবহৃত ভাষার নমুনা পাওয়া যাবে :

'বহুকালাবধি এতন্নগরে একটা মহামোদের ব্যাপার আছে বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ ঈক্ষণে অনেকেই সুখি হইয়া থাকেন এজন্য ধনবান এবং সুরসিক বিচক্ষণগণের মধ্যে কেহ ২ ঐ সুখ বিলক্ষণাস্বাদন কারণ সম্বৎসরাবধি উক্ত পক্ষি পালনকরণ বহু ধন ব্যয় করিয়া থাকেন শীতকালে এক দিবস যুদ্ধ হয়...যাহারা ঐ যুদ্ধ সেনার শিক্ষক অর্থাৎ খলীপা রণভূমিতে উপস্থিত হইলে শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর জয় পরাজয় বিবেচনানিমিত্ত শালিস হইলেন। পরে উভয় দলের পক্ষিরা ঘোরতর সমর করিল দর্শকেরা মল্লিকবাবুর সেনা শিক্ষক খলীপাদিগকে বার ২ ধন্যবাদ করিলেন কিন্তু সর্বশেষে অর্থাৎ দুই প্রহর দুই ঘণ্টার পর মল্লিক বাবুর পক্ষ পক্ষি পরাজিত হইলে সভা ভঙ্গ হইল।'

রাজা রামমোহন রায় ১৮২১ সালে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশ করেন। নীলমণি হালদারের সম্পাদনায় ১৮২৯ সালে সাপ্তাহিক 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হয়। রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর অনুসারীরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সংবাদ প্রভাকর

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসের এক নতুন যুগের উন্মেষ ঘটায়। এই পত্রিকাটি ১৮৩১ সালে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৩৯ সালে দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। এটি বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক পত্রিকা। তৎকালীন অনেক কবিসাহিত্যিকের প্রতিভার স্ফুরণ এই পত্রিকা অবলম্বনেই ঘটেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত অতীতের লুপ্তপ্রায় কবি ও কাব্য আলোচনার সূত্রপাত করেন সংবাদ প্রভাকরে। এক সময় প্রতিমাসে এর একটি মাসিক সংস্করণ প্রকাশ পেত। এতে 'সর্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, নীতিকাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবন বৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য পদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্বশেষে—মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম প্রকটিত' হয়ে বিশিষ্ট পত্রিকা হিসেবে গুরুত্ব লাভ করতে পেরেছিল। এই পত্রিকা কেন্দ্র করে সেকালে একটি লেখকচক্র গড়ে ওঠে। ঈশ্বর গুপ্তের স্বাজাত্যবোধের পরিচয় এই পত্রিকা অবলম্বনেই প্রথম প্রকাশ পেতে থাকে। সংবাদ পরিবেশনে, রাজনৈতিক মন্তব্য প্রকাশে, ইংরেজ শাসনের সমালোচনায় এবং আধুনিক শিক্ষাপ্রচারের ব্যাপারে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পত্রিকায় বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। স্বদেশ, সমাজ ও সাহিত্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা এই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটিতে সামাজিক ও সাময়িক আন্দোলনের খবরাখবর থাকলেও তার সঙ্গে সাহিত্যরসের কোন অভাব ছিল না। ড. আনিসুজ্জামান এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'সংবাদ প্রভাকরের প্রভাবে শুধু বাংলা গদ্যরীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নি; এই পত্রিকার পাতায় সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষার সূত্রপাত এবং বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব ঘটে।'

সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গদ্যরীতির নমুনা পাওয়া যাবে :

> 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতা হইতে কৃষ্ণ নগরে গমন করিলে পর ভারতচন্দ্র তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাকে পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া ৪০ টাকা মাসিক বেতন নির্দিষ্ট করত বাসা প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন 'তুমি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পর আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবা।'—তিনি তদনুসারে তন্নগরে থাকিয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হন, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখান, নবদ্বীপাধিপতি প্রফুল্লিত হইয়া কবিশ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করত আজ্ঞা করিলেন 'ভারত! তোমার প্রণীত কবিতায় আমার মনে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি না।' ভারত বলিলেন 'মহারাজ! কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন।' রাজা কহিলেন 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত ছিলেন,) তিনি যে প্রণালীক্রমে ভাষা কবিতায় 'চণ্ডী'

> রচিয়াছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতিক্রমে 'অন্নদামঙ্গল' পুস্তক প্রস্তুত কর।' সেই আজ্ঞা পালনপূর্বক কবিকেশরী অন্নদামঙ্গল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়া তৎসমুদয় লিখিতে লাগিলেন এবং নীলমণি সমাদার নামক একজন গায়ক সেই সকল পালাভুক্ত গীতের সুর, রাগ এবং পাঁচালী শিক্ষা করিয়া প্রতিদিন গান করিতে লাগিলেন। রচনা সমাধার পূর্বে রাজা তদৃষ্টে অনির্বচনীয় সন্তোষ পরবশ হইয়া কহিলেন 'বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করত ইহার সহিত সংযোগ করিতে হইবে।' পরে তিনি অতি কৌশলে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। নৃপতি তদ্দর্শনে আহ্লাদ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হইলেন না।'

'জ্ঞানান্বেষণ' এই সময়ের অন্য একটি পত্রিকা, ১৮৩১ সালে তা প্রকাশিত হয়। উদারপন্থী তরুণদের পত্রিকা হিসেবে সে সময়ে এর বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এর সম্পাদক। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এই পত্রিকাটি নবযুগের সূত্রপাত করতে সক্ষম হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র হিসেবে এর প্রকাশ। সভার দূরবর্তী সদস্যদের ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন ও উন্নতি সাধন, রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থে বিধৃত ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ের প্রচার, ব্রহ্মের উপাসনা পদ্ধতি অবহিতকরণ, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য কুকর্ম থেকে নিবৃত্তি করার উপদেশ বিতরণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে এই পত্রিকা প্রচারিত হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র রূপে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকার প্রকাশ ঘটলেও বাংলা সাহিত্যে এর পরোক্ষ প্রভাবই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। ভাষার সুষমা, গাম্ভীর্য, বাকসংযম প্রভৃতি গুণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য ছিল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় অক্ষয়কুমার দত্ত যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছিলেন তার সার্থকতর প্রকাশ ঘটেছিল এই পত্রিকায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সে আমলের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই পত্রিকা কেন্দ্র করে সৃষ্ট বাংলা গদ্যরীতি ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব প্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।' এই পত্রিকার আদর্শ পরে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্যসন্দর্ভ' প্রভৃতি পত্রিকার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতী'তে নবরূপ লাভ করে।

বিবিধার্থ সংগ্রহ

১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় বাংলায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। এতে বিবিধ গবেষণামূলক আলোচনা স্থান পেত বলে পত্রিকাটি সেকালের উচ্চাঙ্গের পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। 'পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্যদ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ

উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নতুন গ্রন্থের সমালোচনা প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনায়' এই পত্রিকার কলেবর পূর্ণ হত। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি সেকালের বাঙালির জ্ঞানবৃদ্ধি ও মনোরঞ্জনের বিশেষ সহায়ক ছিল। সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত, মনস্বী ও বাগ্মী। বাংলা রচনায় তাঁর দক্ষতার প্রকৃষ্ট পরিচয় রয়েছে বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদকীয় নিবন্ধে। এসব সাময়িক পত্র বাঙালির মনকে যেমন নাড়া দিয়েছিল, তেমনি সচল করে তুলেছিল বাঙালির কলমকে।

মাসিক পত্রিকা

তৎকালীন একটি বিশিষ্ট পত্রিকা ছিল 'মাসিক পত্রিকা'। ১৮৫৪ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।' পত্রিকাটি আকারে খুবই ছোট ছিল, সাধারণত বার পৃষ্ঠার এবং মাত্র চার বৎসর তা চলে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা গদ্যের বিকাশে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কথ্য ভাষার রীতিতে বাক্যরচনা, প্রচুর তদ্ভব এবং চলতি ফারসি শব্দের ব্যবহার এবং ক্রিয়াপদের তৎসম ও চলতি পদের মিশ্রণ—মাসিক পত্রিকার রচনারীতির এই ছিল বৈশিষ্ট্য। প্যারীচাঁদ মিত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ আলালের ঘরের দুলাল ১৮৫৫ সাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এই গ্রন্থের ভাষারীতিই পত্রিকায় অনুসৃত হত।

বাংলা সাময়িক পত্রের এই প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসে বাংলা গদ্য গঠনে ও জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারে বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। তখন পর্যন্ত বাংলায় রচিত গ্রন্থের ভাষার জড়তা দূর হয় নি। কিন্তু এসব সাময়িক পত্রের গদ্যরীতিতে স্বাভাবিকতা ও সরলতার সৃষ্টি হয়েছিল। সে আমলের পত্রপত্রিকার পাঠক ছিল স্বল্পশিক্ষিত বাঙালি; তাদের পরিতৃপ্তির জন্য ভাষাকে সরল ও আকর্ষণীয় রূপে রূপায়িত করা হত। তাছাড়া তৎকালে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে নানা বাদানুবাদেরও সৃষ্টি হয়েছিল। স্বভাবতই সে সব বিতর্কের ভাষা সহজ সরল ছিল। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্প্রসারণও এই সব পত্রিকার মাধ্যমে হয়। কোন কোন পত্রিকার এই ধরনের উপযোগিতা থাকায় তা বিদ্যালয়ে পাঠ্য হিসেবেও গৃহীত হয়েছিল। তাই বলা যায়, প্রথম দিককার বাংলা সাময়িক পত্র জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও ভাষাগঠনে বিশেষ সহায়তা করেছে।

বাংলা গদ্যের এই প্রাথমিক অবস্থায় একদিকে ছিল পণ্ডিতি বাংলা এবং অপরদিকে ছিল আদালতি বাংলা। সাময়িক পত্র নতুন একটি পথ খুলে দিয়েছিল, সেটি হল সরল সুগম বিষয়ী বাংলার পথ।

বঙ্গদর্শন

বাংলা সাময়িক পত্রের পরবর্তী ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সৃষ্টি সম্ভাবনা নিয়ে ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বিখ্যাত সাহিত্যপত্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। সাহিত্যিক হিসেবে বঙ্কিম-চন্দ্রের ব্যাপক প্রতিভা এই সাহিত্য মাসিকটি অবলম্বনে বিকাশ লাভ করে। প্রথম দিকে

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি উপন্যাস রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর তাঁর প্রতিভা বৈচিত্র্যধর্মী হয়ে ওঠে। তাঁর উপন্যাস, রসরচনা, সমালোচনা, ধর্মালোচনা প্রভৃতি বঙ্গদর্শন পত্রেই প্রকাশ পায়। এ ভাবে তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে পত্রিকাটির যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন, 'যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।' বঙ্গদর্শন প্রচারের পশ্চাতে এই মনোভাব কার্যকরী ছিল। পত্রিকাটিকে যে কেবল মাসিক পত্রের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা চলে তা নয়, বরং এর মাধ্যমে বাঙালি সমাজ আত্মদর্শনের বীজমন্ত্র খুঁজে পেয়েছিল। সমকালীন চিন্তাধারার যথার্থ প্রতিচ্ছবি বঙ্গদর্শন। তৎকালীন সকল প্রখ্যাত লেখক এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে একটা লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন সম্পর্কে বলা হয়, তাঁর আগে মাসিক পত্র বের হয়েছে কিন্তু বঙ্গদর্শন বের হওয়ার আগে মাসিক পত্র শিকড় চালিয়ে দিতে পারে নি বাঙালির রসলোকে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ অনেকেই বঙ্গদর্শনের লেখক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ বিধানে বঙ্গদর্শনের যে সীমাহীন অবদান তার স্বরূপ উপলব্ধি করে বলা যায়, বাংলা গদ্যের ইতিহাসকে এ সাহিত্যপত্রটি ব্যতীত অন্য কোন পত্রপত্রিকা এত সমৃদ্ধিশালী করতে পারে নি। বাংলা গদ্য সাহিত্য এই পত্রিকাটি অবলম্বনে বিচিত্র পথে পরিভ্রমণ শুরু করে এবং বাংলা গদ্য পরিণত স্তরে উন্নীত হয়।

ভারতী

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত ১৮৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্রযুগের সূত্রপাত। বিভিন্ন সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর ভাইবোন আত্মীয় পরিজনেরা মিলে এই পত্রিকা কেন্দ্র করেই সাহিত্যের আসর জমিয়েছিলেন। তবে এই পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর আবির্ভাব এর বিশিষ্ট দিক। পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে 'ভারতী গোষ্ঠী' নামে সাহিত্যিক চক্র গড়ে ওঠে—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক কবিসাহিত্যিক এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই পর্যায়ের লেখকগণ চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে মৌলিকতার তেমন পরিচয় দিতে পারেন নি, রবীন্দ্র ছায়াতেই তাঁদের বিকাশ ঘটেছিল। জীবেন্দ্র সিংহ রায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ভারতী নিঃসন্দেহে উঁচু জাতের পত্রিকা; দীর্ঘদিন তা বাঙালি পাঠকের সেবা করেছে, বহু নবীন লেখক সৃষ্টি করেছে, অপরিমিত সাহিত্যসম্ভার পরিবেশন করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, ফলে বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে ভারতী বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।'

সাধনা

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি প্রকাশ পায় 'সাধনা' নামে প্রখ্যাত সাহিত্যপত্রের মাধ্যমে। ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ঘটে। চতুর্থ বৎসরে সম্পাদনার ভার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিজেই গ্রহণ করেন। অনেক কথা স্পষ্ট করে বলার জন্য এবং একটি আদর্শ স্থানীয় মাসিক পত্রের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সাধনার আবির্ভাব ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনাই এতে বেশি প্রকাশ পেত। তাঁর এবং ঠাকুর বাড়ির লেখকদের প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন ছিল সাধনা পত্রিকা। তবে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন এর প্রধান লেখক—অজস্র গল্প কবিতা প্রবন্ধ সমালোচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। সাধনার মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল তাঁর তৎকালীন সাহিত্যশ্রমের বিচিত্র ইতিহাস। সাধনার সম্পাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ 'গদ্য-পদ্যের জুড়ি' হাঁকিয়ে চলেছিলেন। একটি খাঁটি সাহিত্য পত্রের বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান ছিল।

সাহিত্য

'সাহিত্য' সে আমলের একটি বিশিষ্ট পত্রিকা। ১৮৯০ সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। নতুন ধরনের উপন্যাস এবং বিদেশি গল্পের অনুবাদ এতে প্রকাশিত হয়েছিল।

সবুজ পত্র

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৪ সালে সবুজ পত্রের প্রথম প্রকাশ ঘটে। সবুজ পত্র প্রকাশকালে সম্পাদকের উদ্দেশ্য ছিল, 'আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখিরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজ পত্র মণ্ডিত সাহিত্যের নব শাখার ওপর এসে অবতীর্ণ হন, তাহলে আমরা বাঙালি জাতির সবচেয়ে যে বড় অভাব, তা কতকটা দূর করতে পারব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা, তারি জ্ঞান।' 'একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালির জীবনে যে নতুনত্ব এসে পড়েছে, তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করবার জন্য সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা।' রবীন্দ্রনাথ সবুজ পত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী বীরবলী রীতি নামে যে মৌখিক ভাষারীতি সাহিত্যে প্রচলন করে যুগান্তর এনেছিলেন তার প্রচারের মাধ্যম ছিল এই সবুজ পত্র। পত্রিকাটি বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকদের কেন্দ্রস্বরূপ বিবেচিত হয়। সবুজ পত্রকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীও তখন গড়ে উঠেছিল। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, বিশ্বপতি চৌধুরী প্রমুখ অনেকেই সবুজ পত্রে লিখতেন। সবুজ পত্রের সান্নিধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যশিল্পের দিক-পরিবর্তন ঘটে। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ গদ্যরীতিতে কথ্যভাষার বাচনভঙ্গি স্বীকার করে নেন।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষার বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন, 'প্রমথ চৌধুরীর জগতের নাম দেওয়া যেতে পারে চায়ের টেবিলের জগৎ। সেখানে কথাবার্তা চাপা গলায়, সেখানে হাসি পরিমিত, বাণী পরিমিত, ভাষার পদক্ষেপ পরিমিত আর সেখানে ভাষার সঙ্গীত পেয়ালার চামচের টুংটাং ধ্বনি। বাংলা সাহিত্যের এসব লক্ষণ নতুন ও যুগচিত্তের বাহন।'

প্রমথ চৌধুরী নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী গদ্য লেখক ও নতুন একটি রীতির স্রষ্টা। সবুজ পত্র এই নতুন গদ্যরীতির বাহন ছিল।

প্রবাসী ও ভারতবর্ষ

এই সময়কার অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'প্রবাসী' (১৯০১) ও 'ভারতবর্ষ' (১৯১৩) ছিল গণসেব্য পত্রিকা—'নানা রকমের পাঠকের বিচিত্র চাহিদা মেটানোর প্রয়াসে তাদের আয়তন বিপুল, সূচি বিচিত্র, আদর্শ পাঁচমিশালী, সাধনা প্রসারমুখী, সিদ্ধি অর্থঘটিত।' প্রবাসীর সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ সম্পাদনা করেছেন জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রকাশে এই পত্রিকার অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

কল্লোল

'কল্লোল' সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট পত্রিকা। দীনেশরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে এই মাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি অতি আধুনিক লেখকগোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎকালীন তরুণ লেখক রবীন্দ্র বিরোধিতার নাম করে এখানে সমবেত হয়েছিলেন। কল্লোল প্রায় সাত বছর চলেছিল, কিন্তু এই অল্প সময়েই একটা প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটাতে পেরেছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে এই সময়কার সাহিত্যচক্রের উপাদেয় বর্ণনা দিয়েছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ অনেকেই কল্লোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'কল্লোল পত্রিকায় একদল নব্য তরুণ সাহিত্যিক ও কবি নতুন সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করলেন যুদ্ধোত্তর ইউরোপের, বিশেষত রুশ ও ফরাসি সাহিত্য থেকে। তাঁরা এমন সমস্ত সঙ্কীর্ণ গলিপথে যাতায়াত করতে লাগলেন যে, যাঁরা সনাতনী পন্থায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা এতে প্রমাদ গুণলেন।' এই লেখকেরা তৎকালীন ইউরোপীয় আদর্শে বাস্তব জীবন, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয়কে তাঁদের রচনার উপজীব্য করলেন।

কালিকলম

কল্লোলের আদর্শে কলকাতা থেকে ১৯২৬ সালে 'কালিকলম' এবং ঢাকা থেকে ১৯২৭ সালে 'প্রগতি' সাহিত্য পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্র প্রভাব থেকে দূরে থেকে বাস্তবতাপ্রধান সাহিত্যসৃষ্টির দিকে এসব পত্রিকার লেখকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কাজী নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু' (১৯২২) এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'শিখা' (১৯১৭) সে আমলের দুটি বিশিষ্ট পত্রিকা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পরবর্তীকালে অসংখ্য সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যসৃষ্টির জন্য এদের ভূমিকা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নতুন ভাষারীতি, রচনারীতি ও সাহিত্যাদর্শ সৃষ্টিতে সাময়িক পত্রের অবদান চিরদিন স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসের প্রথম থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভাষা ও সাহিত্য গঠনে এদের গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাধনা, সবুজ পত্র, কল্লোল প্রভৃতি সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। তাই দেখা যায় সাময়িক পত্রের

পথরেখা অতিক্রম করেই বরাবর সাহিত্যস্রষ্টারা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের যেমন প্রসার ঘটেছে, তেমনি সৃষ্টি হয়েছে রসসমৃদ্ধ সাহিত্যের সম্ভার, শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে সাহিত্যের। আর ভাষারীতির দিক থেকে সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতি বাংলা এবং ফারসিবহুল আদালতি বাংলার পাশে যে তৃতীয় একটি পথ সাময়িক পত্রের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছিল তাই বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্য নিয়ে বিরাজমান।

মুসলমান পরিচালিত সাময়িক পত্র

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে মুসলমানদের সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলো নানা দিক থেকে গুরুত্বের অধিকারী। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিসাহিত্যিকগণের আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষায় অনগ্রসরতাই এর প্রধান কারণ। পরে মুসলমানেরা সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করে জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধনের দিকে মনোযোগী হয়ে ওঠে। তাই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক—ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে লেখকেরা সচেতনতার পরিচয় তাঁদের রচনায় প্রদান করেছেন। জাতীয় কল্যাণব্রতের প্রচেষ্টা সাময়িক পত্রিকাগুলো অবলম্বনেই ব্যাপক ভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত 'কোহিনুর' পত্রিকায় সম্পাদকের আবেদন পত্রে মুসলমানদের সাময়িক পত্রাবলীর উদ্দেশ্য সার্থকভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'নানা কারণে সাহিত্যচর্চা বিষয়ে বঙ্গীয় মোসলেম সমাজের ঘোর অবনতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সমাজের দুর্গতিস্রোত অবরোধ না করিতে পারিলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব না। আবার নূতন নূতন পত্রিকার প্রচার ভিন্ন সমাজের অবনতিস্রোত অবরোধ সুদূরপরাহত। স্বার্থপরতা এবং একতাহীনতাই সমাজের সাহিত্যিক দুর্গতির মূলীভূত কারণ। আবার সাহিত্যিক দুর্গতিই আমাদিগকে অবনতির দিকে লইয়া যাইতেছে। এইরূপে মোসলেম সমাজের মূলে অলক্ষিতে কুঠারাঘাত হইতেছে। জাতীয় উন্নতি সাহিত্যের প্রচার সাপেক্ষ।' জাতীয় জীবনের মঙ্গলের লক্ষ্যে সকল মুসলমান কবিসাহিত্যিক পত্রপত্রিকার সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন।

মুসলমানদের এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে ড. কাজী আবদুল মান্নান 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'তখনকার দিনে অসীম নিষ্ঠা, ধৈর্য ও আগ্রহ নিয়ে গুটিকয়েক মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের জাগাতে চেয়েছিলেন। 'হীনপ্রভ বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের' মধ্যে 'পবিত্র ধর্মের বিমল জ্যোতি' বিকীরণের জন্য 'তাঁরা চেয়েছিলেন ধর্মগ্রন্থের অভাব' মোচন করতে; ঐতিহ্য সম্বন্ধে সাহায্য' করতে পারে 'এমন ঘটনা অনুসন্ধান ও প্রচার' করতে; জাতীয় জীবনের 'স্বার্থপরতা এবং একতাহীনতা' দূর করে 'সাহিত্যচর্চার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত' করতে এবং প্রাণপণ প্রয়াসে 'অনুশীলন ও গবেষণা-প্রবৃত্তির স্ফূর্তি সাধন' করতে, এক কথায় তাঁরা চেয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ সাধন করতে এবং পত্রিকা প্রকাশকে মনে করেছিলেন 'সামাজিক কার্য'। আর 'নূতন নূতন পত্রিকার প্রচার' করে তাঁরা সে 'সামাজিক কার্য সম্পাদন করেছিলেন।'

সাময়িক পত্রের আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মুসলিম ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ, ভাষা সমস্যা, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি। ইতিহাসের ব্যাপারে লেখকদের দৃষ্টি সমগ্র মুসলিম জগতের ইতিহাসের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছিল। তবে তুরস্কের ইতিহাসই

প্রাধান্য পেয়েছিল। খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে এই ইতিহাসচেতনার বিশেষ যোগ ছিল। আরবের ইতিহাস, রাসূলুল্লাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস নিয়ে সে সব পত্রপত্রিকায় সাহিত্যচর্চা হয়েছে। ভারতে মুসলমানদের শাসনের কথাও কখনও প্রেরণা যুগিয়েছে। বাংলাদেশের সমাজের অনগ্রসরতা ও কুসংস্কার তৎকালীন লেখকদের আলোচনার বিষয় ছিল। মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা ও ধর্মজীবনে প্রত্যাবর্তনের কথা অনেকেই ভেবেছেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্যও সকলে মত প্রকাশ করেছেন। ধর্ম সম্পর্কে লোকের অজ্ঞতা দূরীকরণ এবং ধর্মবোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টাও অনেক পত্রপত্রিকার মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূর করার চেষ্টাও অনেকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ শাসনের প্রতি প্রীতিপূর্ণ মনোভাব থাকলেও ইংরেজ বিরোধী চেতনা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ভাষা সমস্যাও সে আমলের পত্রপত্রিকায় আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল। বাঙালি মুসলমানদের ভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদাকে প্রতিপন্ন করার ব্যাপক চেষ্টা তৎকালীন সাময়িক পত্রে লক্ষণীয়। এই সব পত্রপত্রিকায় বঙ্গীয় মুসলমান কবিসাহিত্যিকগণের সাহিত্যসাধনার মূল্যায়ন হয়েছে; নানা আলোচনা-সমালোচনায় তৎকালীন সাহিত্য প্রচেষ্টায় গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা চলেছে। এভাবে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়বস্তু মুসলমান পরিচালিত সাময়িক পত্রগুলোর উপজীব্য হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

বাংলাদেশের মুসলমান-সম্পাদিত পত্রপত্রিকার বিবরণ দিতে গিয়ে ড. আনিসুজ্জামান 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' গ্রন্থে ১৪০টি পত্রপত্রিকার উল্লেখ করেছেন।

মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্র হিসেবে ১৮৩১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত শেখ আলীমুল্লাহ্ সম্পাদিত সাপ্তাহিক সমাচার সভারাজেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটি বাংলা ফারসি দ্বিভাষিক পত্র। পত্রিকার অর্ধেক ছাপা হত বাংলায়, অর্ধেক ছাপা হত ফারসিতে। পত্রিকাটি সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হত। পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রথম তরঙ্গস্পর্শে হিন্দু সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়, সম্পাদক আলীমুল্লাহ তার বিরোধী ছিলেন বলে মনে হয়।

মুসলিম বাংলার দ্বিতীয় সাময়িক পত্রের নাম 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' (The Indian sun)। কলকাতা থেকে ১৮৪৬ সালে মৌলবী রজব আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত এই পত্রিকায় ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, ফারসি ও হিন্দি—এই পাঁচ ভাষায় রচনা প্রকাশিত হত। পঞ্চভাষায় সাময়িক পত্র প্রকাশের এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষী দৃষ্টান্ত পরিকল্পনার বিরাটত্বের কারণে দুই মাসের মধ্যেই তার স্বাভাবিক বিলুপ্তি ঘটে।

১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'আজীজন নেহার'। সম্পাদক ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন। সম্পাদক তাঁর প্রথমা স্ত্রীর নামে পত্রিকাটির নামকরণ করেন। হুগলি কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবকের উদ্যোগে চুঁচুড়া থেকে মাসিক হিসেবে এর প্রচার হয়েছিল। কাঙাল হরিনাথ পরিচালিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় আজীজন নেহার সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল, 'ইহাতে যে কয়েকটি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অতি উপাদেয় ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ভাষা অতি মনোরম। মুসলমান লিখিত বলিয়া মনে হয় না; এমন কি অনেক আধুনিক হিন্দু লেখকের লিপিচাতুর্যকে ইহার নিকট বলিদান দিতে পরামর্শ দি।'

সুধাকর

'সুধাকর' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। পরে মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ এর সম্পাদক হন। পত্রিকা পরিচালনার কাজে জড়িত ছিলেন মৌলভী মেয়রাজউদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশহাদী, ডা. হাবিবুর রহমান, কবি মোজাম্মেল হক, শেখ আবদুর রহিম ও মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ। সুধাকর পত্রিকাকে জাতীয় সংবাদপত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। স্বধর্মী ও স্বজাতির কল্যাণের জন্য পত্রিকাটিকে নিয়োজিত করা হয়েছিল। সমাজের অধঃপতন রোধ করার জন্য সুধাকরের পরিচালকগণ সংবাদপত্র প্রচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই সুধাকর পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল মুসলমান লেখক জাতীয় কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা 'সুধাকর দল' নামে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত।

ইসলাম প্রচারক

মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ ১৮৯১ সালে 'ইসলাম প্রচারক' সাহিত্য মাসিক প্রকাশ করেন। ধর্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক এই পত্রিকাটি প্রকাশের সময় এর আদর্শ সম্পর্কে যে দীর্ঘ সূচনা লিখিত হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল, 'ইসলাম প্রচারক যাহাতে প্রকৃত ইসলাম প্রচারকের কার্য করিতে পারে তৎসম্বন্ধে যত্ন-চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।' তৎকালীন শিক্ষিত-অশিক্ষিত মুসলমানেরা নিজেদের ধর্মসম্পর্কে অজ্ঞতাবশত নানা অনাচারে মগ্ন হয়েছিল। ইসলাম প্রচারক ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইসলামের অতীত ঐতিহ্য এতে প্রতিফলিত হয়েছিল। লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মৌলভী আলাউদ্দীন আহমদ, মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন, মৌলভী ওসমান আলী, নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী, শেখ ফজলল করিম, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মোহাম্মদ নজিবর রহমান, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ এমদাদ আলী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ। ইসলাম প্রচারকে উগ্র রক্ষণশীল মনোভাব প্রাধান্য পেয়েছিল। এতে গল্প উপন্যাস বা নিছক শিল্পধর্মী গীতিকবিতার স্থান ছিল না।

মিহির

'মিহির' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। এর সম্পাদক ছিলেন শেখ আবদুর রহিম। সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত চর্চার দিকে পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল; রাজনীতি বিষয়ে ছিল উদাসীন, তবে সামাজিক কল্যাণ সাধনের দিকে মনোযোগী ছিল। পত্রিকার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা বিষয়ে বলা হয় : আমরা দেশীয় ভাষায় যতদুর পর্যন্ত পারি, তাপ, তড়িৎ, উষ্ণতা, আলোক, গতি, বল, রসায়ন, আকর্ষণ প্রভৃতি এবং তৎসহ অন্যান্য বিজ্ঞানসম্মত বিষয় সর্বদা প্রকাশে যত্নবান থাকিব। তবে আমাদের গবেষণাপরায়ণ পাঠকবর্গ ব্রাহ্মণের অন্ন যবনে স্পর্শ করিলে তাহাতে কি রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, বিবাহের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যুবক-যুবতীর শরীরের বৈজ্ঞানিক গঠন, নবমী তিথিতে অলাবুর গোমাংস প্রাপ্তি, ব্যক্তিবিশেষের প্রাণদানে কিরূপে জগতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সে সকল অতি গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের নিকট প্রত্যাশা করিবেন না।'

মিহিরে প্রকাশিত রচনার বিষয়ের মধ্যে ছিল ঐতিহাসিক কাহিনি, সমকালীন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের জীবনী, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, গল্প-উপন্যাস, অনুবাদ, খণ্ড কবিতা, সাহিত্য সমালোচনা ইত্যাদি। পত্রিকার প্রধান প্রধান লেখক ছিলেন শেখ আবদুর রহিম, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মির্জা ইউসুফ আলী, কবি মোজাম্মেল হক, হবিবর রহমান, ডাক্তার আবদুল মাজেদ খাঁ, ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগচি, মধুসূদন সরকার প্রভৃতি। পত্রিকার প্রকাশ ছিল অনিয়মিত এবং বেশি দিন তা টিকে থাকে নি।

মিহির ও সুধাকর

শেখ আবদুর রহিম সুধাকরের সঙ্গে মিহিরের নাম সংযুক্ত করে ১৮৯৫ সালে 'মিহির ও সুধাকর' প্রকাশ করেন। ১৯০৮ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটির অস্তিত্ব ছিল। শেষ বছর সৈয়দ ওসমান আলী সম্পাদনা করেছিলেন। ড. কাজী আবদুল মান্নান এই পত্রিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'মুখ্যত সাহিত্যচর্চার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এ পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছিল; কিন্তু তখন মুসলমান সমাজে ধর্ম ও জাতির জন্য যে দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এবং সে ভাবনার যে উচ্চকিত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, তাতে নিছক সাহিত্যচর্চার বাসনা বিঘ্নিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। ইসলাম ধর্মের পবিত্র আদর্শ প্রচার ও মুসলমান জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই ছিল এই পত্রিকায় প্রধান ব্রত। বাংলায় মুসলমানকে জ্ঞানে ও ত্যাগে, শিক্ষায় ও সাহিত্যে সমৃদ্ধিবান ও সংঘবদ্ধ করে তোলার জন্য এ পত্রিকার পরিচালক ও লেখকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন।

হাফেজ

'হাফেজ' মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন শেখ আবদুর রহিম। পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন কেদারনাথ রায়। ১৮৯৭ সালে পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল 'বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্র'। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, 'বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ ঘোর আলস্য-শয্যায় শায়িত হইয়া যেরূপ ভোগ বিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতে অচিরে তাঁহারা যে একেবারে ধ্বংস-সাগরে নিমজ্জিত হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।' তাই 'ভোগ বিলাস সুখাভিলাষী নিদ্রিত' বঙ্গীয় মুসলমানদের পূর্বপুরুষদের 'অতীত গৌরব ও ধর্মভক্তি কাহিনি এবং পবিত্র ধর্মের পবিত্র রীতিনীতি' অবহিত করার জন্য এই পত্রিকার প্রকাশ। ইসলাম ধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে পত্রিকার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা চলে। পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন, কবি মোজাম্মেল হক, কবি কায়কোবাদ, শেখ ওসমান আলী প্রমুখ। মীর মশাররফ হোসেনের অনেক রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছিল। হাফেজ পত্রিকা ও তাঁর লেখকগোষ্ঠী ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং হিন্দু মুসলমানদের মিলনকামী। স্বীয় ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সচেতনতা থাকলেও পরধর্ম বা প্রতিবেশীর প্রতি তাঁদের কোন বিদ্বেষ ছিল না। পত্রিকাটি এক বছরের বেশি চলে নি।

কোহিনুর

'কোহিনুর' প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ সালে। সম্পাদক ছিলেন এস. কে. এম. মহম্মদ রওশন আলী। কুষ্টিয়া থেকে এই মাসিকটি প্রকাশিত হত। সম্পাদকের নিবেদন ছিল, 'হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতার অনাথ

আশ্রমের সাহায্যার্থে কোহিনুর প্রচারে ব্রতী হইয়াছিল।' প্রথম সংখ্যায় 'আমাদের উদ্দেশ্য' শিরোনামে বলা হয়েছে, 'মাঝে মাঝে আমরা যে হিন্দু ও মুসলমানে নিদারুণ সংঘর্ষণ ও অন্তর্বিবাদের কথা শুনিতে পাই, ইহা দেশের পক্ষে—এবং কোন সমাজের পক্ষে শুভকর নহে।...যদি অন্তর্বিবাদে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্নভাব প্রবল থাকে, তাহা হইলে কোনও সমাজই যে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না, তাহা বহুদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।' প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়েছিল,'... 'বঙ্গদর্শনে'র তীক্ষ্ণধার কুঠারে, 'আর্যদর্শনে'র নিড়ানীতে যে ক্ষেত্রের আবর্জনা উৎপাটিত হইয়াছিল, 'প্রচারে'র সার সংগ্রহে যাহার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, 'প্রভাকরে'র বিমল জ্যোতিতে যাহার সুধারস সঞ্চিত হইয়াছিল, বর্তমানে 'প্রদীপে'র আলোকে যে ক্ষেত্র উদ্ভাসিত, 'নব্য-ভারতে'র নবীন উৎসাহে যথায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতেছে, সুবাসিত কুসুম'মালা'য় যাহার বক্ষ পরিশোভিত, আজ তাহারই ললাটে এই ক্ষুদ্র 'কোহিনুর'-খণ্ড দিয়া সজ্জিত করিতে বসিলাম। জানি না ইহাতে ক্ষেত্রের শোভা বর্ধিত হইবে কি না।'

সর্বসম্প্রদায়ের সাহিত্যামোদীদের নিয়ে পত্রিকার জন্য একটি পরিচালক সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই পত্রিকার বিশিষ্ট লেখকগণের মধ্যে ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন, কবি মোজাম্মেল হক, মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, কবি কায়কোবাদ, মৌলভী আবদুর রহিম, শেখ জমিরুদ্দিন, মুনশী মেহেরুল্লাহ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, অক্ষয়কুমার মৈত্র, পরিব্রাজক চন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিস্টার অবিনাশচন্দ্র দাস প্রমুখ। এই পত্রিকায় ধর্মচর্চা ও সমাজসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয়ও প্রকাশ পেয়েছে। পত্রিকাটি বিভিন্ন পর্যায়ে দীর্ঘদিন চলেছিল।

প্রচারক

'প্রচারক' মাসিক পত্র মধু মিয়া কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৮৯৯ সালের মাঘ মাসে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই মধু মিয়া ছিলেন বিভিন্ন গ্রন্থপ্রণেতা মুনশী ময়েজউদ্দিন আহমদ। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার ও মুসলমান সমাজের হিত চিন্তা, এই দুটি মূল উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রচারকের প্রচার হয়েছিল। প্রচারকের নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন কবি মোজাম্মেল হক, রেয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদী, নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ফজলল করিম, মতিয়র রহমান খান, কাজী ইমদাদুল হক প্রমুখ। প্রচারক সম্পর্কে সমসাময়িক হিন্দু পরিচালিত পত্রিকায় যেসব মন্তব্য করা হত তা থেকে মুসলমান লেখকদের সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন : 'মুসলমান ভ্রাতাগণ বঙ্গভাষায় শিক্ষিত হইয়া বিশুদ্ধরূপে প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন ও সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেছেন, ইহা কম আহ্লাদের বিষয় নহে। অনেক প্রবন্ধে নাম না থাকিলে বা প্রবন্ধমধ্যে বিশেষ পরিচয় না থাকিলে বুঝিতে পারা যায় না যে, উহা বিভিন্ন ধর্মী বা বিভিন্ন ভাষাধিকারী লোকের লেখনীনিসৃত।' প্রচারক-সম্পাদক মানুষের জন্য বিবেকের বিকাশের প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তাঁর কাম্য ছিল জ্ঞানের মুক্তি। সেজন্য তিনি লিখেছিলেন, 'যতদিন আরবী ও ফারসী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধান বঙ্গভাষায় লেখা না হইবে, ততদিন চিন্তায় কোন ফল হইবে না। যেদিন মাদ্রাসার শিক্ষকেরা আরবী ও ফারসী ভাষা বিশুদ্ধ

বঙ্গভাষায় অর্থ করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবেন, সেই দিন বঙ্গীয় মুসলমানদের শিক্ষার পথ পরিষ্কার হইবে। যেদিন মাদ্রাসাসমূহে আধুনিক পদার্থবিদ্যা, ভূগোল এবং ইতিহাস নিয়মিত শিক্ষা দিবেন, সেইদিন আমরা দ্রুতগতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব।'

লহরী

'লহরী' নামক 'নানা বিষয়িনী কবিতাময়ী সমালোচনী পত্রিকা' মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় ১৯০০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটিতে কেবল কবিতাই প্রকাশিত হত। সম্পাদক হিন্দু কবিগণের কবিতা স্থান দিতেন। 'লহরী'তে প্রকাশিত কবিতাগুলোর যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে, কবির আত্মগত ভাবকল্পনাকে আশ্রয় করে খণ্ড কবিতা, মুসলমানদের জাতীয় গৌরব, তুরস্কের মহিমা প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে এবং সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে অবলম্বন করে কবিতা দেখা যায়।' পত্রিকাটি কিছুকাল পরেই অকালমৃত্যুর অধীন হয়েছিল।

নবনূর

'নবনূর' ছিল তৎকালীন সবচেয়ে উন্নত মুসলমান সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ এমদাদ আলী। পত্রিকাটি ১৯০৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক পত্রিকার সূচনাতে বলেছিলেন, 'মুসলমানগণ সকল বিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের জাতীয় জীবনে অবসাদই যেন একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।...পতিত মুসলমানকে উন্নত করিবার, উদ্ধার করিবার, একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য।' সম্পাদক এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মুসলমান, হিন্দু এবং অন্তঃপুরস্থ প্রত্যেক মহিলাকে সাহিত্য সাধনার জন্য নবনূরে আহ্বান জানিয়েছিলেন। 'নবনূর' পত্রিকার পরিচালকগণ লিখেছিলেন, 'নবনূর যদি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সাহিত্যচর্চার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিতে পারে, তবেই তাহার প্রচার সার্থক হইবে এবং ইহার পরিচালকগণ ধন্য হইবেন।' পৌনে চার বৎসর নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমান সমাজে নবনূর বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছিল। এই পত্রিকার লেখকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি কায়কোবাদ, শেখ ফজলল করিম, কাজী ইমদাদুল হক, মতীয়র রহমান, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, শেখ জমিরুদ্দীন, রেয়াজউদ্দীন আহমদ, মিসেস আর. এস. হোসেন।

বাসনা

'বাসনা' নামে সাহিত্য মাসিকটি প্রকাশিত হয়েছিল রংপুরের কাকিনা থেকে ১৯০৮ সালে। শেখ ফজলল করিম ছিলেন এর সম্পাদক। পত্রিকাটি প্রায় দুই বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। নিয়মিত লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রিয়াজউদ্দীন আহমদ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, তসলিমুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নুরুল হোসেন, মুনসী হামেদ আলী, খগেন্দ্রনারায়ণ দাস, ললিতমোহন সেন প্রমুখ। ধর্ম ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান জীবনী সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ এবং গল্প কবিতা এতে প্রকাশিত হত।

লেখকগণ নিজ নিজ সমাজ ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 'হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণির লেখকই তাঁদের স্বীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে নিজেদের ভাবনা পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি চর্চা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ঐক্য কামনা করেছেন।' এই পত্রিকাটির সমালোচনা বিভাগ ছিল বেশ সমৃদ্ধ।

আল-এসলাম

'আল-এসলাম' ছিল আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার মাসিক মুখপত্র। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পদনায় কলকাতা থেকে ১৯১৫ সালে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় আভাষ দেওয়া হয়েছিল এই বলে 'স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশ ও সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা করিবার নিমিত্তই আল-এসলামের প্রচার।' ধর্মীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত একদল মুসলমানের দ্বারা পত্রিকাটি দীর্ঘদিন পরিচালিত হয়েছিল। পত্রিকাটিতে 'গল্প বা উপন্যাস প্রকাশের নিদর্শন না থাকলেও চিন্তামূলক এবং অনুসন্ধান ও পরিশ্রম সাপেক্ষ প্রবন্ধ ও আবেগপ্রবণ কবিতা এতে প্রকাশ করা হত।' লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল বাকী, ইসলামাবাদী, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মুজাফ্‌ফর উদ্দীন, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, আব্দুল লতীফ, মোহাম্মদ কে. চাঁদ, মুজফ্‌ফর আহমদ, শেখ হবিবর রহমান, কায়কোবাদ, সিরাজী, মোজাম্মেল হক, মিসেস আর. এস. হোসেন প্রমুখ। পত্রিকাটিতে মুসলমানদের ধর্ম ইতিহাস দর্শন সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা হত। সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল।

সওগাত

'সওগাত' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতায় ১৯১৮ সালে। সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। পরবর্তীকালে পত্রিকাটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এখনও এর অস্তিত্ব টিকে আছে।

মোসলেম ভারত

১৯২০ সালে কলকাতা থেকে মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় 'মোসলেম ভারত' মাসিক সাহিত্যপত্র হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিখ্যাতি লাভের পশ্চাতে এই পত্রিকার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। সমকালীন খ্যাতিমান কবিসাহিত্যিকগণের রচনা এতে প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল : 'ভগ্নোদ্যম যোদ্ধৃবৃন্দকে উত্তেজনাপূর্ণ বীরত্ব গাঁথা শ্রবণ করাইলে যেমন সুফল লাভ হইয়া থাকে—তাহারা উত্তেজনা বশে অপার উৎসাহে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমর-সাগরে অকাতরে ঝাঁপ দিয়া তীরে উঠিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে, যেরূপ ভূতলাবলুণ্ঠিত প্রহৃত ব্যক্তি আত্মক্ষমতায় দণ্ডায়মানক্ষম অবস্থায় একগাছি যষ্টি পাইলে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেই উঠিতে পারে। তদ্রূপ আমাদের এই উত্থান-প্রয়াসী পতিত সমাজের কর্ণে এই সময়ে মোসলেমের গৌরব কাহিনি, মোসলেমের প্রজ্ঞা, প্রভাব, পুণ্যকথা প্রভৃতির সুরলহরী ঢালিয়া দিতে পারিলে, এক কথায় মুসলমানদের অতীতের সম্বল, বর্তমানের

সঙ্কট এবং ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমুজ্জ্বল ছবি তাহাদের নয়ন-সমক্ষে ধরিতে পারিলে, অথবা দুটা উৎসাহের কথা বলিলেও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে। সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়াই সেই শুভ উদ্দেশ্যের কামনা করিয়াই আজ আমরা আমাদের বড় সাধের 'মোসলেম ভারত'কে আমাদের সাহিত্যিক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি।'

ধূমকেতু

'ধূমকেতু' পত্রিকা অর্ধ সাপ্তাহিক হিসেবে ১৯২২ সালে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ধূমকেতুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল : '...এ দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে অস্থি-মজ্জায় যে পচন ধরেছে তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না।...দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামী, মেকি তা সব দূর করতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী।' পত্রিকাটির জন্য আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বারীণ ঘোষ প্রমুখ অনেকে। কবিগুরুর আশীর্বাণীটি ছিল এ রকম :

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন।
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতনা।

সে যুগের উত্তাপ উত্তেজনা ধূমকেতুতে প্রতিফলিত হয়েছিল বলে পত্রিকাটি আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। এর জ্বালাময়ী সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলী একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, অন্যদিকে তেমনি তৎকালীন ইংরেজ শাসকের রোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক কবিতা প্রকাশের জন্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। নজরুল ইসলামের নিজস্ব অবদানের জন্য সে যুগে ধূমকেতু ছিল একটি অনন্য পত্রিকা।

শিখা

'শিখা' ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' মুখপত্র হিসেবে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন আবুল হোসেন। ঢাকার সাহিত্যিক গোষ্ঠী 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। 'শিখা' ছিল বার্ষিক পত্র। পর পর পাঁচ বৎসর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। আবুল হোসেনের পরবর্তী সম্পাদক ছিলেন ড. কাজী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ আবদুর রশীদ ও

আবুল ফজল। প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছিল, 'শিখার প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তনসাধন।' পত্রিকার পরিচালকেরা মনে করতেন, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' শিখার রচনাবলীতে এই আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল বলে পত্রিকাটি সে আমলে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত।

মুসলমান পরিচালিত সাময়িক পত্রের তালিকা দীর্ঘতর হতে পারে। জাতীয় জীবনের কল্যাণের ব্রত নিয়ে তাঁরা পত্রিকা প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশিষ্ট মাধ্যম হিসেবে সাময়িক পত্রিকার অবদান কম ছিল না। বিশেষ যুগের প্রয়োজনের পটভূমিকায় অগণিত পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এদের অধিকাংশ সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে খুব বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হয় নি, তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সাহিত্য পত্রিকা হিসেবেও অনেকগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে মুসলমানদের অনগ্রসরতা দূরীকরণে এই সব পত্রপত্রিকার ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। 'পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রচারে উনিশ শতকের সংবাদ ও সাময়িকপত্রের দানই সবচেয়ে বেশি।' গত শতাব্দীর প্রধান প্রধান পত্রিকার পরিচয় দান সূত্রে এই উক্তি যাচাই কর।

২। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস কতদিনের পুরাতন? ১৮৫০ সাল পর্যন্ত প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রগুলির ইতিহাস আলোচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের বিশেষত গদ্যের পরিণতি সাধনে ইহাদের অবদানের উল্লেখ কর।

৩। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের গঠনে বাংলা সাময়িক পত্রাদি কতখানি অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, বাংলা সাহিত্য বনাম বাংলা সাময়িক পত্র—এই তুলনামূলক আলোচনায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বল।

৪। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাহা উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৫। সাহিত্য-সংগঠনে সংবাদপত্র অন্যতর প্রধান অংশ গ্রহণ করে। বাংলা গদ্য সাহিত্য গঠনে সংবাদ পত্রের যে ভূমিকা ছিল তাহার পরিচয় দাও।

৬। 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠী বাংলা গদ্যের বিকাশের জন্য যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালে সাময়িক পত্রপত্রিকার বলিষ্ঠ সমর্থন পেয়েছিল বলেই অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা গদ্য এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রকাশ মাধ্যমে পরিণত হতে পেরেছিল।'—এ সিদ্ধান্ত কতটা সত্য, তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৭। ১৮৯০ সাল পর্যন্ত প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রগুলির ইতিহাস আলোচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া গদ্যের পরিণতি সাধনে ইহাদের অবদানের উল্লেখ কর।

৮। আধুনিক যুগের সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রের ভূমিকা কতটা ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলির সাহায্যে বিশ্লেষণ কর : তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, ইসলাম প্রচারক, কল্লোল।

৯। মুসলিম বাংলায় সাময়িক পত্র আন্দোলনের উদ্ভবের ইতিহাস বর্ণনা কর।

১০। মুসলমানদের পরিচালিত উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাময়িক পত্রগুলি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

১১। 'বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাময়িক পত্রের দান কোন ক্রমেই নগণ্য নয়'—এ উক্তি অবলম্বন করিয়া বর্তমান শতাব্দীর পূর্বকালীন প্রধান প্রধান বাংলা সাময়িক পত্রের ঐতিহাসিক পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

১২। 'বাংলা গদ্যের রীতি নির্ধারণে ও বিকাশে উনবিংশ শতাব্দীর সাময়িক পত্রাদি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।'—আলোচনা কর।

১৩। বঙ্গদর্শনের প্রকাশকাল অবধি বাংলার প্রধান সাময়িক পত্রগুলির পরিচয় দাও ও অবদান আলোচনা কর।

১৪। টীকা লিখ : আল-এসলাম, আজীজন নেহার, ইসলাম প্রচারক, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দিগদর্শন, ধূমকেতু, নবনূর, বঙ্গদর্শন, মিহির ও সুধাকর, মাসিক পত্রিকা, লহরী, শিখা, সুধাকর, সবুজ পত্র, সমাচার দর্পণ, সংবাদ প্রভাকর।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ বলতে কোন বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত লেখকের বুদ্ধিবৃত্তিমূলক গদ্যরীতির সাহিত্যসৃষ্টি বোঝায়। বুৎপত্তিগত অর্থে প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনাকেই প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু সম্বন্ধযুক্ত ধারাবাহিক পারম্পর্য সহযোগে আলোচনাকে প্রবন্ধ নামে চিহ্নিত করা যায়। জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন-ইতিহাস, সমাজ-রাজনীতি সাহিত্য-শিল্পকলা—প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে যে সমস্ত তত্ত্বকেন্দ্রিক ও বস্তুগত চিন্তামূলক গদ্যনিবন্ধ রচিত হয় তাকে বলা যেতে পারে প্রবন্ধ সাহিত্য। এ ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিতে যুক্তির সাহায্যে কোন বক্তব্য প্রকাশ করে তাতে লেখককে সাহিত্যরসের সঞ্চার করতে হয়। সে জন্য তাতে লেখকের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। প্রত্যেক প্রবন্ধে কোন কিছু প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে। যথার্থ তথ্যপ্রমাণের সমাবেশে, ভাবে, ভাষায়, চিন্তার প্রয়োগে সেই প্রতিপাদ্য বিষয়কে রূপদান করাই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

নিবন্ধ, সন্দর্ভ, রচনা প্রভৃতি প্রতিশব্দ প্রবন্ধ অর্থে সাধারণত প্রয়োগ করা হয়। প্রবন্ধ আকৃতির দিক থেকে সংক্ষিপ্ত হবে, তবে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধের আয়তন দীর্ঘ হতে পারে। প্রবন্ধের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত চিন্তাধারার সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর সীমানায় 'গুরুগম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বালোচনা, দুর্দান্ত ঐতিহাসিক গবেষণা, রাজনৈতিক মসিযুদ্ধ আর সমাজনৈতিক ঘোঁট, সাহিত্যিক বিতর্ক এবং সমালোচনা, আর গদ্যিচ্ছন্দে লেখকের আত্মপ্রকাশ' এসবই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে জগৎ ও জীবনের বিচিত্র বিষয় প্রবন্ধের উপজীব্য।

প্রবন্ধ সাহিত্যকে বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য থাকে; ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তিহৃদয় প্রাধান্য পায়। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ পাঠকের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত' করে তোলে এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধে 'জ্ঞানের বিষয়কে হাস্যরসমণ্ডিত পুষ্পপেলবতা' দান করে পাঠককে বিমুগ্ধ করে। প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকারভেদের মধ্যে সমালোচনা সাহিত্য, রম্যরচনা, জীবনচরিত, আত্মচরিত, পত্রসাহিত্য, ভ্রমণবৃত্তান্ত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের উৎপত্তি হয়েছে গদ্যের প্রচলনের ফলে, উনিশ শতকের প্রথম থেকে ইংরেজি সাহিত্যের সান্নিধ্যে। ইংরেজি শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির যে যোগাযোগ ঘটে তারই ফল হিসেবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ হয়েছে। প্রবন্ধ সাহিত্যের ব্যাপারেও একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। উনিশ শতকের পূর্বেই ইংরেজি সাহিত্যে প্রবন্ধের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য প্রভাব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ওপর সঞ্চারিত হয়। এই উনিশ শতকের প্রথম থেকেই বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের সূত্রপাত হলেও দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই

এর যথার্থ বিকাশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতা ও মননশীলতার আঘাতে মধ্যযুগীয় বাঙালি, বিশেষত নাগরিক বাঙালি যেন জন্মান্তরের অকূল-অতল বারিধির তটে নিক্ষিপ্ত হল। আধুনিক জীবনের নব নব জিজ্ঞাসা, চিন্তা, সমাজ কথা, পরিবার ও ব্যক্তির জীবনাদর্শ—সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিকে কোন-না-কোন দিক দিয়ে অভিভূত করল। এর ফল হল—প্রবন্ধ-নিবন্ধ সাহিত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রয়োগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের তরল সামাজিক অবস্থার সাময়িক প্রতিফলন হয়েছে তৎকালীন সাময়িক পত্রিকার পত্রমর্মরের মধ্যে—সমাজ, রীতিনীতি ও ধর্মান্দোলন- সম্পর্কিত দু চারটি নিবন্ধে। কিন্তু চিন্তাশীল প্রবন্ধসাহিত্য, যা যুগপৎ চিন্তাকে তীক্ষ্ণ করে, নবজাগ্রত জাতিকে সাবালকত্ব দেয়, তাঁর যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই প্রবলভাবে আরম্ভ হয়েছে।'

উনিশ শতকে বিচিত্র বিষয়াশ্রয়ী প্রবন্ধরচনার বান ডেকেছিল। গদ্যের উন্মেষ ও পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে গদ্যকে বাহন হিসেবে পেয়ে নানা ধরনের বিষয়বস্তু প্রবন্ধের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে ওঠে। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির আত্মানুসন্ধান ও আত্মজিজ্ঞাসার তীব্রতাই এর কারণ হিসেবে বিবেচ্য। ইংরেজি শিক্ষাসংস্কৃতির সান্নিধ্যে এসে বাঙালি তখন আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল। জাতীয় জীবনের নবরূপায়ণের জন্য তারা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে তার স্বাক্ষর বর্তমান। গদ্যের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ব্যাপক প্রবণতা এ দেশের লেখকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সাময়িক পত্রের প্রকাশের সঙ্গেও জ্ঞানস্পৃহা বিজড়িত ছিল। তাছাড়া পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে বাঙালি জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে প্রবল সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে আত্মরক্ষার জন্যও সে আমলে সাহিত্যের মাধ্যমে চেষ্টা চালানো হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায়ের প্রবন্ধের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য প্রথমবারের মত প্রকাশ পায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও অপরাপর প্রবন্ধকারের অবদানে তা সম্প্রসারিত হয়। প্রথম দিককার প্রবন্ধে যথার্থ সৃজনশীল রচনার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, তাতে বাঙালির মন-বুদ্ধি আত্মার বিকাশের দিকেই বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসামান্য প্রতিভাস্পর্শে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যরসের আকর হয়ে ওঠে।

বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও বিকাশের মতই প্রবন্ধ সাহিত্যের উৎপত্তির সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা জড়িত রয়েছে। তৎকালীন পাদ্রি, পণ্ডিত ও মুনশীরা বিদ্যালয়পাঠ্য যেসব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা যুবজনের হিতার্থে রচিত হয়েছিল বলে তাতে প্রবন্ধের লক্ষণ ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গদ্যে লিখিত প্রথম জীবনচরিত। এতে প্রকৃত সাহিত্যরসের সঞ্চার করা না গেলেও প্রবন্ধের লক্ষণ আছে। লেখকের অপর গ্রন্থ 'লিপিমালা' চিঠির আকারে লেখা কতিপয় প্রবন্ধের সংগ্রহ। রাজীবলোচনা মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' জীবনচরিত হিসেবেই বিবেচ্য। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'প্রবোধচন্দ্রিকা' গ্রন্থে নীতিউপদেশমূলক এবং জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের নিদর্শন দেখান। তাঁর অপর গ্রন্থ 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' প্রবন্ধগ্রন্থ হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধ সাহিত্য গড়ে তোলার পিছনে ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত 'দিগদর্শন' নামক সাময়িক পত্রের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এই মাসিক পত্রটি মূলত তৎকালীন যুবকগণের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের জন্যই প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত। এতে জ্ঞানগর্ভ নীতিমূলক ও কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধাবলী স্থান পেয়েছিল এবং তা কেবল জ্ঞানবিজ্ঞানের নীরস বাহন মাত্র ছিল না, তাতে বক্তব্যকে সরস করে প্রকাশ করার চেষ্টা ছিল। বাংলা প্রবন্ধ যে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের অবলম্বন হতে পারে প্রাথমিক পর্যায়ের লেখকগণ তাঁদের রচনায় তার নিদর্শন দেখিয়েছেন।

শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তন হলেও তাঁদের রচনার কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল না। মৌলিক চিন্তার পরিচয় না দিয়ে দেশি বিদেশি উপকথা, ঐতিহাসিক কাহিনি, খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থাদির অনুবাদ, ছাত্রদের পাঠোপযোগী গ্রন্থরচনা সে সময়ের বৈশিষ্ট্য ছিল। এর পরে প্রয়োজন নিরপেক্ষ অথচ ভাষানিপুণ যুক্তিনিষ্ঠ বিচারপ্রধান রচনা তথা প্রবন্ধ সাহিত্যের সূচনা হয় এবং তা প্রবর্তন করেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর যুগান্তকারী প্রতিভাচিহ্নিত রচনাকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিচারতর্কাশ্রয়ী প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ,' 'বেদান্তসার', 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' প্রভৃতি গ্রন্থে চিন্তার বলিষ্ঠতা ও নৈয়ায়িক সুস্পষ্টতা বিদ্যমান ছিল। ভাষার অনাড়ম্বর পারিপাট্য তাঁর আগে আর দেখা যায় নি। ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল বলে তাতে সাহিত্যরসের অভাব ঘটাই স্বাভাবিক; কিন্তু তিনি গদ্যে প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভাষা গঠনে রামমোহন রায়ের অবদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, 'রামমোহন যখন এদেশে এলেন তখন পণ্ডিতদের কাছে বাংলার কোন স্থান নেই। সাধুজনের যোগ্য বাংলা রচনার নিয়মকানুনটি পর্যন্ত তৈরি করে তাঁকে পণ্ডিতদের কাছে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হল।...তারপর যে সব পণ্ডিতেরা বাংলা ব্যবহার করলেন তাঁদের ভক্তি ছিল সংস্কৃতেরই ওপরে। বাংলাকে তাঁরা 'নোকর-চাকরের' মত ব্যবহার করেছেন।...এই সব নোকর-চাকরদের ওপরে তাঁরা বৃহৎ কোন কর্মের ভার কখনও দেন নি।' রামমোহনের আমল থেকে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, দেশবিদেশের কাহিনি, ভূগোল, জ্যোতিষ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় প্রবন্ধ সাহিত্যের উপজীব্য হয়। এ ধরনের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়াবলম্বনে প্রবন্ধগ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নেয় ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুল বুক সোসাইটি। উইলয়াম কেরি, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন এই সোসাইটির সদস্যভুক্ত ছিলেন। নীতিগ্রন্থ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানা বিষয়ে রচিত গ্রন্থ এই প্রতিষ্ঠানকর্তৃক প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে সাময়িক পত্রপত্রিকা কেন্দ্র করে প্রবন্ধজাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সমাচার দর্পণ, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, জ্ঞানান্বেষণ, জ্ঞানোদয়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি সাময়িক পত্র বাংলা প্রবন্ধের প্রাথমিক ইতিহাসে

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। এই প্রসঙ্গে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক মাসিক পত্রের অবদানের কথাও স্বীকার্য। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৮৪৬-৫০) তের খণ্ডের মাধ্যমে নানা জ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের নিদর্শন দেখান।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) ভিন্ন ভাষার সাহিত্য থেকে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের ভাষান্তর করে উপাখ্যান রূপায়িত করলেও তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলো মৌলিক প্রতিভার সার্থক নিদর্শন হিসেবে গ্রহণযোগ্য। সমাজসংস্কারমূলক প্রবন্ধাবলী এবং বেনামীতে রচিত গ্রন্থসমূহ বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট ভাষারীতির পরিচায়ক। তাঁর প্রবন্ধের কোন কোনটিতে যেমন যুক্তিতর্ক বিচার বিশ্লেষণের পরিচয় আছে, তেমনি কতকগুলোতে হাস্যপরিহাসময় মনোভাবেরও বিকাশ ঘটেছে।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক কালের লেখক হিসেবে **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮১৭-১৯০৫) ও **অক্ষয়কুমার দত্ত** (১৮২০-৮৬) প্রমুখ প্রবন্ধকারের নাম উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মীয় এবং অক্ষয়কুমার দত্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই সব লেখকের রচনার মাধ্যমে বাংলা প্রবন্ধে একদিকে যেমন বিষয়বৈচিত্র্যের আগমন হয়, তেমনি অন্যদিকে বাংলা গদ্যের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়।

ভাষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রবন্ধকার হিসেবে **প্যারীচাঁদ মিত্র** (১৮১৪-৮৩) ও **কালীপ্রসন্ন সিংহের** (১৮৪০-৭০) নাম উল্লেখ করা যায়। কথ্য ভাষারীতি প্রয়োগের প্রচেষ্টা তাঁদের রচনায় প্রথমবারের মত ফুটে উঠেছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁদের ভাষারীতি অনুসৃত না হলেও বাংলা গদ্যের পরিণত রূপসৃষ্টিতে তা সহায়ক ছিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

পরবর্তী প্রবন্ধকারগণের মধ্যে সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধের রচনাকার হিসেবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি শিক্ষার গভীরতার সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির উদার সম্মিলন ভূদেবচরিত্রে দৃঢ় ও উজ্জ্বল রূপ পেয়েছিল। তার পরিচয় তাঁর রচনায় সহজলভ্য। 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' রচনা করে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা হলেও ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থের মাধ্যমে শিক্ষা-সমাজ- ধর্ম-ইতিহাস-সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যের অধিকারী। এ সব গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি হিন্দু সমাজনেতা উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেছেন। আচার প্রবন্ধে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও লোকাচারসম্মত নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য, পারিবারিক প্রবন্ধে গৃহকল্যাণী নারীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা, সামাজিক প্রবন্ধে হিন্দু সমাজের বিশেষত্ব ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'ভূদেব ছিলেন প্রাকটিক্যাল—রক্ষণশীল, কিছু প্রগতিপন্থী, তথ্যদর্শী। এই তথ্যদৃষ্টিই ভূদেবের রচনায় বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ভূদেবের প্রবন্ধগুলি যুক্তিযুক্ত এবং সারবান। বিশেষ কোন সাহিত্যিক গুণ না থাকিলেও এগুলির কিছু উপযোগিতা এখনও স্বীকার করিতে হয়।'

রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) এই সময়কার একজন বিখ্যাত প্রবন্ধকার। সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যের বিষয় অবলম্বনে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। 'সেকাল আর একাল,' 'ব্রহ্মসাধন,' 'বিবিধ প্রবন্ধ' ইত্যাদি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁর আত্মচরিত বিখ্যাত গ্রন্থ। 'বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ব্রহ্ম-উপাসনায় প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হত। তিনি ছিলেন প্রগতিপন্থী, উদার মতাবলম্বী ও তত্ত্বদর্শী। তাঁর রচনায় পরিহাসকুশলতা ও মার্জিত সরসতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় বিরাট প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হন। বঙ্গদর্শন (১৮৭২) নামে বিখ্যাত সাহিত্য পত্রের প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি সাধন করেন। জাতীয় সংস্কৃতি ও সমাজজীবন অবলম্বনে তিনি অজস্র প্রবন্ধ রচনা করে সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় পরিবেশনের গুণে সুস্পষ্ট ও মননদীপ্ত হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়ই তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। এই সব প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বহুদর্শী অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি, গভীর ধ্যান ও ধারণালব্ধ তীক্ষ্ণ বোধিদৃষ্টি এবং গবেষণা ও রসবোধের সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তিন ধরনের প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছিলেন : ক. ব্যঙ্গাত্মক ও সরস—যেমন 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'; খ. জ্ঞান বিজ্ঞান ও সমালোচনাবিষয়ক—যেমন 'বিজ্ঞানরহস্য', 'সাম্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'বিবিধ সমালোচনা' এবং গ. দর্শন ও শাস্ত্রচর্চাবিষয়ক—যেমন, 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব'।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গরসাত্মক রচনাগুলো বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় সংযোজন। 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) গ্রন্থের প্রস্তাবগুলো প্রথমে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন সমাজ, শিক্ষাদীক্ষা ও চারিত্র্যনীতির অসঙ্গতি কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন। এতে গুরুতর তত্ত্বকথাও সরল ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে পড়েছে। 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল', 'ইংরাজস্তোত্র', 'বাবু', 'গর্দ্দভ', 'দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন' ইত্যাদি কতকগুলো ব্যঙ্গরচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। লোকরহস্যের অধিকাংশ প্রবন্ধে মানবচরিত্র সম্বন্ধে লঘুকৌতুকের মাধ্যমে বিদ্রূপবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা। কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামক এক কাল্পনিক আফিমখোর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উক্তির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পারিপার্শ্বিকতার ব্যঙ্গাত্মক চিত্রাঙ্কন করেছেন। বইটি ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমালোচক ডি-কুইনসির Confessions of an English Opium Eater গ্রন্থের অনুসরণে লেখা। লেখক সোজাসুজি সজ্ঞানে যে কথা বলতে সঙ্কোচবোধ করতেন অর্ধোন্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হয়ে এক আধারে 'শর্করামণ্ডিত কাব্য, পলিটিক্স, সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি' করেছেন। চারপাশের

মানুষ ও সমাজের নানা প্রকার অন্যায়, ত্রুটি, অসঙ্গতি এই গ্রন্থের উপজীব্য। 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থে 'হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার সহিত মর্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার' সমন্বয় ঘটেছে।

'মুচিরাম গুড়ের আত্মচরিত' (১৮৮৪) গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র পরিহাস সহযোগে ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় আমলার ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছেন। রাজপদে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি সৌভাগ্যবলে অনুচিত সম্মান লাভ করে—এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দানের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরাম গুড় নামক ডেপুটির চরিত্র অঙ্কন করেন। তিনি হয়ত নিজের কর্মজীবনে চারপাশে এ ধরনের লোক প্রত্যক্ষ করেছিলেন—তাদের ক্রিয়াকলাপ হয়ত তাঁর মনে হাস্যরসের উদ্রেক করেছিল। হাস্যরস পরিবেশনের সঙ্গে তিনি বিদ্রূপের বিষজ্বালা মিশিয়েছেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) গুরুগম্ভীর ভাষারীতিতে চিন্তামূলক প্রবন্ধ লিখে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরীয় ভাষারীতি বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন বলে তাঁকে 'পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর' এবং ইংরেজ লেখক ইমার্সন ও কার্লাইলের লেখার সঙ্গে তাঁর লেখার মিল ছিল বলে তাঁকে 'বঙ্গের ইমার্সন বা বঙ্গের কার্লাইল' নামেও অভিহিত করা হত। তিনি ঢাকা থেকে 'বান্ধব' নামে একটি উন্নত ধরনের সাহিত্যপত্র প্রকাশ করেন। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে 'নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব' ও 'সমাজ শোধনী' সমাজ সংস্কার সম্পর্কিত; 'প্রভাতচিন্তা', 'নিভৃতচিন্তা', 'নিশীথচিন্তা', 'ভক্তির জয় অথবা হরিদাসের জীবনযজ্ঞ', 'মা না মহাশক্তি' গুরুগম্ভীর বিষয় সম্পর্কে আলোচনা এবং 'ভ্রান্তিবিনোদ' ও 'প্রমোদলহরী' হালকা ধরনের রচনা। 'জানকীর অগ্নি পরীক্ষা' তাঁর অপর প্রবন্ধগ্রন্থ। 'ছায়াদর্শন' নামে তিনি একটি প্রেততত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন ইংরেজি শিক্ষিত ছিলেন বলে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে সাহিত্য সাধনা করেন। সংস্কৃতেও তাঁর ভাল দখল ছিল। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষায় তিনি সংস্কৃতের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯) বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কতিপয় উপন্যাসেরও তিনি রচয়িতা। কিন্তু 'পালামৌ' (১২৮৭-৮৯) নামে অনবদ্য ভ্রমণকাহিনি রচনা করে তিনি অপরিসীম খ্যাতি লাভ করেন। ছোটনাগপুরের আদিম শৈলমালা অরণ্যানী ও আরণ্যক অধিবাসীর প্রাণবান চিত্র এই গ্রন্থে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। লেখকের দেখা প্রকৃতি ও মানুষের চিত্রগুলো অত্যন্ত সহানুভূতি সহকারে এবং রসমধুর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লেখকের বিস্ময়কর লিপিচাতুর্যে আখ্যানহীন ভ্রমণকাহিনিও কাব্যউপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পালামৌ' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিষ সজীব কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায়

সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।' পালামৌ সঞ্জীবচন্দ্রের লিপিচাতুর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে বিবেচ্য। 'নির্মল ও গভীর রসবোধ, ব্যাপক সহানুভূতি ও সূক্ষ্ম কৌতূহল দৃষ্টি' পালামৌর ভাষায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে বলে তা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনি হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

শিবনাথ শাস্ত্রী

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) দেশের তৎকালীন সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং দেশের সাহিত্য ও সমাজ সংগঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। সাহিত্যসেবার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর কতকগুলো উপন্যাস বিদ্যমান। উপন্যাসগুলো শিক্ষাপ্রদ হলেও তা চমৎকারিতাবিহীন ছিল না। তাঁর কতিপয় উপন্যাসে গার্হস্থ্য চিত্র আছে। তবে প্রবন্ধ জাতীয় গ্রন্থ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৮৯৭) জ্ঞানগর্ভ সমাজবিজ্ঞানমূলক মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে রামতনু লাহিড়ীর কাহিনি বর্ণনা সহযোগে তৎকালীন বাঙালি জীবনের চিত্র রূপায়িত করা হয়েছে। 'আত্মচরিত' (১৯১৮) শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী। এতে তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনকাহিনি স্থান পেয়েছে। ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য অনুসারে এটি 'অসাধারণ চমৎকার বই। বিষয়বস্তুর মত রচনাভঙ্গিও সরস, প্রাঞ্জল এবং উপাদেয়।'

মীর মশাররফ হোসেন

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমান লেখক হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের অপরাপর শাখায় তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেলেও তিনি ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম ও জীবন অবলম্বনে যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তার মূল্য কম নয়। তাঁর প্রবন্ধে সহজ বুদ্ধিমত্তা ও নিরপেক্ষ বিচারশক্তির নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর রচনায় বঙ্কিমপ্রভাবিত ভাষারীতির ব্যবহার করলেও তাতে স্বকীয়তা বিদ্যমান ছিল। 'গো-জীবন', 'হযরত বেলালের জীবনী', 'আমার জীবনী', 'আমার জীবনীর জীবনী' ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) উপন্যাসাকারে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনিতে পূর্ণ। এতে তাঁর পারিবারিক জীবনের কথাও বলা হয়েছে। 'গাজী মিঞার বস্তানী' (১৮৯৯) রসরচনাজাতীয় গ্রন্থ। জমিদারিকে কেন্দ্র করে জীবনের যে বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হতে লেখক দেখেছেন তারই রসমণ্ডিত ব্যঙ্গাত্মক চিত্র হিসেবে এই গ্রন্থের গুরুত্ব।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২) রচিত শোকোচ্ছ্বাসনিবন্ধ 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'(১৮৭৬) একসময় বাঙালি পাঠককে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল। সংস্কৃত, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট অধিকার অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচনায় তাই মননশীলতার পরিচয় মিলে। তিনি নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে পুস্তক সমালোচনা করতেন, প্রবন্ধলেখক হিসেবেও তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' গ্রন্থে

স্ত্রীবিয়োগ- ব্যথাজনিত হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বাসময় ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। আবেগবাহুল্যের জন্য গ্রন্থটি প্রবন্ধ হলেও কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম গ্রন্থের ভাষার নমুনা :

> 'একবার স্বর্গ দেখিব মা! স্বর্গের সুখের জন্য বলি না, কেননা, হৃদয়ের পরতে পরতে যার নরকানল জ্বলিতেছে, মনে যার সুখ নাই, তার স্বর্গেও সুখ নাই,—স্বর্গের সুখের জন্য নহে, কেবল হারান ধনের অনুসন্ধানের জন্য। সংসার খুঁজিয়া দেখিয়াছি, কোথাও পাই নাই,—তাই একবার স্বর্গ খুঁজিব— একবার দেখিব, তেমন ফুল নন্দনকাননে ফুটে কি না। তোমার জলে চন্দ্ররশ্মির নৃত্যের ন্যায় সুকুমার, নিদাঘ-সায়াহ্ন গগন-বৎ কোমল, প্রণয়িনীর প্রথম সপ্রেম আলিঙ্গনের ন্যায় সুখময়, পরদুঃখকাতর মানবহৃদয়ের ন্যায় পবিত্র, যে কুসুম এ অধমের গৃহকুঞ্জে ফুটিয়াছিল, দেখিব, তাহা দেবোদ্যানে ফুটে কি না। যে সাগরসেচিত অমূল্য রত্ন এ দরিদ্রের কুটিরে ছিল, দেখিব তেমন রত্ন দেবরাজভবনে আছে কি না, যে সংগীত অতৃপ্ত-হৃদয়ে দিবানিশি কর্ণে শুনিতাম—যে সংগীত এখন কেবল এই ঘুমে-ঢুলু-ঢুলু জ্যোৎস্নালোকে দেখিতেছি, যে সংগীত এই স্বপ্নমাখা মৃদুপবনে অনুভব করিতেছি; শুনিব, তেমন সংগীত, অমরাবতীতে আছে কিনা।'

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) 'ভারত মহিলা', 'প্রাচীন বাংলার গৌরব', 'বৌদ্ধধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থে মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক রচনাশৈলীর পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর সুললিত রচনাভঙ্গি, সুচিন্তিত সিদ্ধান্তমুখী মানসিকতা এবং রচনার মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ কৌতুকোজ্জ্বল রসের বিচ্ছুরণে প্রবন্ধগুলো উপভোগ্য ও বৈশিষ্ট্যময় হয়েছে। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনা পাণ্ডিত্যভারে পীড়িত ছিল না। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে রচিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধাবলী রচনাগুণে সুখপাঠ্য। তাঁর লিপিভঙ্গি সরল, সরস ও নিজস্ব।

স্বনামধন্য ঐতিহাসিক **অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়** (১৮৬২-১৯৩০) কবি ও সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর 'সমরসিংহ', 'সিরাজদ্দৌলা', 'সীতারাম রায়', 'মীরকাশিম' ইত্যাদি গ্রন্থে ইতিহাসের বিষয় রূপায়িত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) আবির্ভাবের ফলে সাহিত্যের সমস্ত শাখার সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ শাখায়ও যুগান্তর এসেছে। তাঁর যাদুস্পর্শে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যে আন্তর্জাতিক গৌরবময় স্তরে উন্নীত হয়েছে। তাঁর রোমান্টিক ভাবধর্মী সৃজনকুশলী কবিমনের পরিচয় তাঁর বিপুল প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যেও প্রকাশমান। তাই তাঁর প্রবন্ধ নিছক বস্তুধর্মী রসহীন তত্ত্ব বা তথ্যবিশ্লেষণ নয়, তা অনুভূতিস্নিগ্ধ কবিমনের মধুর স্পর্শে রসসমৃদ্ধ সাহিত্যকর্মে রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র বিষয়াবলম্বনে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সাহিত্যতত্ত্ব, সমালোচনা, ধর্ম, দর্শন, সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, শিক্ষা, চরিতকথা, আত্মস্মৃতি, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, ভ্রমণকাহিনি, চিঠিপত্র প্রভৃতি নানা বিষয় অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের বিপুলাকার প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশ

ঘটেছে। 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রভৃতি তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ। এসব প্রবন্ধ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যবিচার ও বিভিন্ন কবিসাহিত্যিক সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। 'শব্দতত্ত্ব', 'ছন্দ', 'বাংলা ভাষা পরিচয়' প্রভৃতি গ্রন্থে ভাষাতত্ত্বমূলক রসহীন বিষয়কে সাহিত্য-বিচারবুদ্ধি দ্বারা রমণীয় করে তুলেছেন। 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'রাজাপ্রজা', 'স্বদেশ', 'পরিচয়', 'কালান্তর', 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর রাজনীতি বিষয়ক মতবাদ প্রকাশক। দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ এসব গ্রন্থ থেকে লাভ করা যায়। 'শিক্ষা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নানা সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেছেন। 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি তাঁর ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ। 'চারিত্র্যপূজা', 'পঞ্চভূত', 'লিপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর বিচিত্র ব্যক্তিমানসের প্রকাশ ঘটেছে। চিঠিপত্র, ডায়েরী, ভ্রমণ কাহিনির মধ্যেও তাঁর ব্যক্তিজীবন বিধৃত। 'য়ুরোপযাত্রীর পত্র', 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী', 'জাপানযাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পথের সঞ্চয়', 'ছিন্নপত্র', 'চিঠিপত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা' তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিস্ময়কর প্রতিভা দ্বারা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করেছেন। তিনি বিচিত্র রসামৃত দানে বাংলা প্রবন্ধকে সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। সমালোচকের মতে, 'যে ভাষায় প্রবন্ধ সাহিত্যে কেবলমাত্র হীনধ্বনি একতারার সুর বাজিত, তাহাতে কবি বীণাযন্ত্রের বিচিত্র সুর সংযোগ করিয়া বিশ্বজগতে পরিবেশনযোগ্য ক্ষমতা দান করিয়াছেন।' প্রবন্ধকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে তাঁর অপরাপর অবদানের মতই নিঃসন্দেহে এক অসামান্য গৌরবের অধিকারী।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে সমসাময়িক কালে প্রতিভাশালী প্রবন্ধকারের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই আমলের প্রবন্ধ লেখকগণের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯৩৩) উল্লেখযোগ্য। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের চিন্তাশীল আলোচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'শব্দকথা', 'বিচিত্রজগৎ', 'চরিতকথা', 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা', 'জগৎকথা' ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁর প্রবন্ধে বিজ্ঞানের নীরস জটিল বিষয়কে সহজ চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে ও মনোজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ একদিকে গভীর মননশীলতায় দীপ্তিময়, অন্যদিকে কৌতুকরসের প্রসাদগুণে সরস ও উপভোগ্য।

প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) 'বীরবলী' ভঙ্গি অর্থাৎ এক প্রকারের শুষ্ক, ব্যঙ্গবিদ্রূপের তির্যক দ্যোতনাবিশিষ্ট বিদগ্ধ মনের পরিচয়বাহী রচনারীতির প্রয়োগে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কথ্য ভাষারীতির অভিনব প্রয়োগে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর গদ্যরীতিই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক চলতি ভাষায় মর্যাদা লাভ করে। 'সবুজ পত্র' নামে বিখ্যাত সাহিত্যপত্র সম্পাদনার মাধ্যমে তাঁর অবদান সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কবিতা ও গল্প রচনায় তাঁর কৃতিত্ব বিদ্যমান থাকলেও তাঁর

প্রতিভার বৈশিষ্ট্য কতিপয় প্রবন্ধগ্রন্থে প্রকাশমান। ‘তেল নুন লকড়ী’, ‘বীরবলের হালখাতা’, ‘নানাচর্চা’ ইত্যাদি প্রবন্ধগ্রন্থে তাঁর ঋজু, যুক্তিনিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় ফরাসি বাগবৈদগ্ধ্যসহ রূপলাভ করেছে। বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও শাণিত ব্যঙ্গ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-৯৯) সাহিত্য, সমাজ, ধর্মমূলক অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ‘চিত্র ও কাব্য’ প্রবন্ধ সংকলনে তাঁর যথার্থ শিল্পী মনের পরিচয় বিধৃত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) ‘বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী’, ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’, ‘ঘরোয়া’, ‘আপন কথা’ প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর নিজের কথা সরস পরিহাস সহকারে রূপায়িত করেছেন। শিল্পী ও কলারসিক হিসেবে তাঁর ব্যাপক খ্যাতি থাকলেও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর অবদান স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬০) খুব বেশি না লিখলেও প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর অবদান স্থায়ী মূল্যের অধিকারী। তাঁর ‘কাব্যজিজ্ঞাসা’ গ্রন্থে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের জটিল সিদ্ধান্ত আধুনিক কালের পাঠকের উপযোগী করে সহজ সরল ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে।

মোহিতলাল মজুমদার

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করলেও প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর অবদান কম নয়। ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্য’, ‘শ্রীমধুসূদন’, ‘বঙ্কিমবরণ’, ‘সাহিত্য বিতান’, ‘সাহিত্য বিচার’, ‘বাংলার নবযুগ’ প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থে চিন্তার ও সাহিত্য বিচারের প্রতিফলন ঘটেছে।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) ভাষাবিজ্ঞানী ও ভারততত্ত্ববিদ হিসেবে বিশ্ববিশ্রুত ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধাবলীর বিষয়বস্তুতে অগাধ পাণ্ডিত্য ও ভাষায় নিজস্ব রীতি ফুটে উঠেছে।

অজিতকুমার চক্রবর্তী

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) ‘রবীন্দ্রনাথ’, ‘কাব্যপরিক্রমা’ প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থের মাধ্যমে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার পথ নির্দেশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ড. নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-৮১), ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০), ড. সুকুমার সেন (১৯০১-৯২), ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-৮৪), ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন। আধুনিক জীবনে বিষয়ের ব্যাপকতার জন্য প্রবন্ধ সাহিত্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং পত্রপত্রিকার প্রাচুর্যপূর্ণ আবির্ভাবের ফলে প্রবন্ধ সৃষ্টিতে এসেছে প্রাচুর্য। সাম্প্রতিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য অগণিত লেখকের প্রতিভাস্পর্শে বৈচিত্র্যমুখী হয়ে উঠেছে।

প্রবন্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা

আধুনিক যুগে বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও বিকাশের প্রেক্ষিতে বাংলা গদ্যনির্ভর সাহিত্যসৃষ্টি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারাটি বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। বৈচিত্র্যপূর্ণ এই প্রবন্ধ সাহিত্যের বিষয় সংগ্রহে লেখকগণ মানব জীবনের বহুবিচিত্র দিককেই উপজীব্য করেছেন। ফলে মানুষের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি সব কিছুই প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠেছে। আর এসব অবলম্বন করেই বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। ছাপাখানার আনুকূল্য এবং পত্রপত্রিকার ব্যাপক প্রচার প্রবন্ধচর্চার সুযোগ করে দিয়েছে। তাই আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের সব কবিসাহিত্যিকই প্রবন্ধ রচনায় কিছু না কিছু হাত দিয়েছেন।

বৈচিত্র্যই প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রধান ধর্ম। নানা বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যেসব প্রবন্ধ সৃষ্টি হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তাকে বিন্যস্ত করা চলে। প্রবন্ধ লেখকগণ বিষয়বস্তু নির্বাচনে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের রচনাকে যদি বিভিন্ন শাখায় বিন্যস্ত করা যায় তাহলে বাংলা সাহিত্যের সেসব বিষয়ে সৃষ্টিমুখরতা সম্পর্কে অনুধাবন করা যাবে।

সমালোচনা

সাহিত্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষমূলক আলোচনাকেই সাধারণ ভাবে সমালোচনা বলে অভিহিত করা হয়। সাহিত্যের ভাববস্তু, রীতি, অলঙ্কার ও লেখক-মানস এ আলোচনার উপকরণ। সহৃদয়তা, কল্পনাশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি ও উদারতা নিয়ে সমালোচনা করা হলে সাহিত্যের শিল্পমাধুর্য অনুধাবনের সুযোগ ঘটে। সমালোচককে রসবোধসম্পন্ন হতে হবে এবং তিনি পাঠককে লেখকের মনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবেন। শ্রীশচন্দ্র দাশ 'সাহিত্য সন্দর্শন' গ্রন্থে সমালোচনার যেসব পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন সেগুলো হল : আলঙ্কারিক পদ্ধতি, ঐতিহাসিক পদ্ধতি, সনাতনবিধিসম্মত পদ্ধতি, মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতি, ব্যক্তিগত সমালোচনা পদ্ধতি, তত্ত্বসন্ধানী পদ্ধতি, তুলনামূলক সমালোচনা পদ্ধতি, পরিসংখ্যান পদ্ধতি ও বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি।

তবে পদ্ধতি যাই হোক না কেন, শ্রেষ্ঠ সমালোচক লেখকের রূপসৃষ্টি ও সৌন্দর্য কল্পনাকে পাঠকসমাজের কাছে প্রতিভাত করেন। সমালোচক অপরের সৃষ্টির আলোচনার মাধ্যমে তার সৌন্দর্য উদঘাটন করে নিজের ধ্যানধারণা ও রসবোধকে স্পষ্ট করে তুলেন। তাই তিনি নিজেও হয়ে ওঠেন সাহিত্যিক।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) মাসিক পত্রে প্রথম সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত ঘটে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যথার্থ সাহিত্য সমালোচনার বিকাশ হয়। তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সমালোচনাকে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে উন্নীত করেন। তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার তিনি ছিলেন অগ্রণী। 'উত্তরচরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব', 'দীনবন্ধুর কবিত্ব' প্রভৃতি আলোচনায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, বিচারবুদ্ধি ও রসগ্রাহিতার যথার্থ পরিচয় মিলে। সে আমলের

সমালোচকগণের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর পাণ্ডে প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমালোচনা সাহিত্যে বিস্ময়কর অবদান রেখেছেন। তাঁর কবিমন ও আত্মগত অনুভূতির পরিচয় তাঁর এ ধরনের সৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে আছে। বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর সাহিত্যচিন্তার বিকাশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রযুগের সমালোচকগণের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অজিত চক্রবর্তীর নাম করা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে সমালোচকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুবোধ সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, ড. নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ অনেকেই। আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে সাহিত্য সমালোচনার এই ধারাটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটেছে।

সাহিত্যের ইতিহাস

বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন রামগতি ন্যায়রত্ন। 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩) তাঁর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রচনা। গ্রন্থটিতে মধ্যযুগ ও উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করা হয়েছে। ড. দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) বইটিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে আরও বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করা হয়। লেখক সাহিত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনা করে কয়েকটি যুগে বাংলা সাহিত্যকে ভাগ করেন। ড. সুকুমার সেন চার খণ্ডে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৪০) রচনা করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' (১৩৪১) বইটিতে ড. সুকুমার সেন বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁর 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' (১৩৫৮) বইটিতে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১৯৩৯) বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গ্রন্থের নাম 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১৯৫৯)। গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে রচিত। তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত আরও কতিপয় গ্রন্থ রয়েছে। ভূদেব চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (৪ খণ্ড) ও 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' বিশিষ্ট গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটিয়েছেন যেসব গ্রন্থের মাধ্যমে সেগুলো হল : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', 'বাংলার লোকসাহিত্য' প্রভৃতি। গোপাল হালদার 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' ২ খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্যসাধক চরিতমালায়' বাংলা সাহিত্যের বহু লেখকের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেছেন। অজিতকুমার ঘোষের 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', ড. অধীর দের 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ

সাহিত্যের ধারা', উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা', 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' প্রভৃতি গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের নানাদিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক ভাবে আলোচনা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে।

জীবনচরিত

জীবনচরিতের মাধ্যমে কোন খ্যাতিমান ব্যক্তির জীবনের যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায়। জীবনীকার কোন ব্যক্তির জীবনের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্যের গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে শ্রদ্ধান্বিত মন নিয়ে পরিপূর্ণ লোকচরিত্র সন্ধানের প্রয়াস পান। জীবনচরিতে ব্যক্তিজীবনের আদর্শ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সমকালীন যুগ ও সমাজের চিত্র বিধৃত হয় এবং পাঠকের কাছে ব্যক্তিবিশেষ জীবন্ত হয়ে উঠেন। ফলে জীবনী থেকে শিক্ষাও গ্রহণ করা যায়।

উৎকৃষ্ট জীবনচরিতে উপন্যাসের গুণাবলী বিদ্যমান থাকে। জীবনচরিতে থাকে ব্যক্তিগত জীবনের কথা। সেজন্য তা ইতিহাস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। জীবনের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে এবং তাতে একটি জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। খ্যাতিমান ব্যক্তিরই জীবনচরিত হতে পারে। 'মানব চরিত্রের ও কীর্তির ধারা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং উত্তমপুরুষকে নিজেদের ভাবে ভাবুক রাখার জন্য জীবনচরিত রচিত হয়। পুরাতনকে সজীব রাখাই চরিতাখ্যানের মূলতত্ত্ব।'

বাংলা গদ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনচরিত রচনার উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম রামরাম বসুর 'রাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) বাংলা গদ্যে প্রথম জীবনচরিত হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। প্যারীচাঁদ মিত্র রচনা করেছিলেন 'ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮)। 'আর্যদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ পাশ্চাত্য মনীষীর জীবনবৃত্তান্ত রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হল : 'জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত', 'ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত', 'গ্যারিবলডীর জীবনবৃত্ত', 'ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত', 'প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা।' এসময়ে ভারতীয় ইতিহাস কাহিনি থেকে চরিত্র নিয়ে সত্যচরণ শাস্ত্রী রচনা করেন 'ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত', 'মহারাজ নন্দকুমার চরিত', 'ক্লাইভচরিত' প্রভৃতি। এ সময়ে বাঙালি মনীষীর জীবনী নিয়ে যে কয়টি জীবনচরিত রচিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (১৮৮১) মহেন্দ্রনাথ রায়ের 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৮৫), যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত'(১৮৯৩), বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫) ইত্যাদি। অজিত চক্রবর্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', নগেন সোমের 'মধুস্মৃতি', শিশির ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত', মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ভূদেবচরিত', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' (চার খণ্ড), অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', 'রত্নাকর গিরিশচন্দ্র' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত হিসেবে বিবেচনার যোগ্য।

আত্মচরিত

আত্মচরিত জাতীয় রচনায় লেখক নিজের কথা বর্ণনা করেন। আত্মচরিতে অনেক সময় দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়, আবার কখনও লেখকের লজ্জা ও বিচারবুদ্ধির প্রভাবে অনেক কথা গোপন থেকে যায়। তবে এ ধরনের গ্রন্থে জীবনের অভিজ্ঞতা অকপটে রসমণ্ডিত রূপে বিবৃত হলে তা যথার্থ সাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে। আত্মচরিতের মাধ্যমে লেখক নিজেকে যথাযথ রূপে পাঠকের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস পান।

আত্মচরিতের রচনাকারী নিজেই দ্রষ্টা ও স্রষ্টা বলে তা সত্যমূলক হতে হবে। লেখকই নিজেকে ভাল করে জানেন, বাইরের লোকের পক্ষে সবটুকু জানা সম্ভব নয়। কিন্তু স্মৃতিশক্তি প্রবল না হলে বাল্যজীবনের ঘটনা যথাযথ নাও হতে পারে। সেজন্য বার্নাড শ বলেছেন, সকল আত্মজীবনী মিথ্যা। অপ্রীতিকর বা অমর্যাদাকর ঘটনা স্মৃতি থেকে বিলুপ্তির প্রবণতার জন্য সত্য সর্বাংশে প্রতিফলিত হয় না। আবার আত্মগৌরব প্রচারের আগ্রহ অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে। আত্মজীবনীকে সাহিত্য করার জন্য অনেকসময় জীবনের প্রয়োজনীয় ঘটনা বাদ যায়। তবে জীবনের সব খুঁটিনাটিই যে আত্মচরিতে আসবে এমনও নয়।

বাংলা সাহিত্যে আত্মচরিত রচনার শুরু গদ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্বরচিত 'বিদ্যাসাগর চরিত' (১৮৯১) এ ধরনের প্রথম গ্রন্থ। নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' (পাঁচ খণ্ড), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার সাহিত্য জীবন', সজনীকান্ত দাসের 'আত্মচরিত', আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'আত্মচরিত', রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত', কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'আত্মজীবন চরিত' ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য আত্মচরিত। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' বইটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মকাহিনি—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকে শুনে লেখা একটি মূল্যবান রচনা।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আত্মকাহিনি লিখেছেন ভাগে ভাগে। 'দ্বীপান্তরের কথা', 'আত্মকাহিনি', 'বোমার যুগের কথা', 'আমার আত্মকথা' ইত্যাদি তাঁর আত্মচরিত।

স্মৃতিকথা

স্মৃতিকথা জাতীয় গ্রন্থে লেখক জীবনের সুসংবদ্ধ কাহিনি দাঁড় না করিয়ে বিচ্ছিন্ন ঘটনার স্মৃতিচর্চা করেন। ডায়েরি বা দৈনন্দিন ঘটনা-পরিক্রমার মাধ্যমে লেখক বাইরের ঘটনাপ্রবাহকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। লেখকের ব্যক্তিমানসের পরিচয় এ ধরনের গ্রন্থে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সহজ সরল বর্ণনাভঙ্গিতে লেখকের চোখ আর মন যেন এতে কথা বলে। স্মৃতিকথায় সমসাময়িক কালের বিবরণ স্থান পায়। লেখকের দেখা দৃশ্যের বর্ণনায় মনের রংও মিশে থাকে। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির স্মৃতিকথা ইতিহাস বা ইতিহাস-সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। সমসাময়িক সমাজ-জীবন সম্পর্কে স্মৃতিকথা যথেষ্ট আলোকপাত করে। স্মৃতিকথার রচনাভঙ্গি উপন্যাসের মত উপভোগ্য হতে হবে। স্মৃতিকথায় স্থান পায় সমসাময়িক কাল আর সেই সঙ্গে লেখকের মানস-পরিচয় ও হৃদয়ের উত্তাপ।

বাংলা সাহিত্যে স্মৃতিকথামূলক রচনার সংখ্যা অনেক। এখনও এ ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শনের অভাব নেই। অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতার

রসালো বর্ণনা লেখকের মনমানসিকতাকে যেমন সুস্পষ্ট করে তোলে, তেমনি তাঁর কালের ছবিও এতে প্রত্যক্ষ করা যায়। চারুচন্দ্র দত্তের 'পুরানো কথা', কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্যের 'পুরাতন প্রসঙ্গ', চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটাধারীর রোজনামচা' প্রভৃতি স্মৃতিকথার নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মপরিচয়', 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' অনবদ্য সৃষ্টি হিসেবে সমাদৃত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ঘরোয়া' রচনাশৈলীর দিক থেকে অনন্য। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্মৃতি কথা', সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যাত্রা', ভুপেন গাঙ্গুলীর 'স্মৃতিকথা', উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্মৃতিকথা', প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', সীতাদেবীর 'পুণ্যস্মৃতি', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তৃণাঙ্কুর' প্রভৃতি গ্রন্থ স্মৃতিকথা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে।

ভ্রমণকাহিনি

সাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণীয় শাখা হিসেবে ভ্রমণকাহিনি পাঠকের কাছে বরাবর প্রিয় হয়ে আছে। বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিতি লাভের আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। নিজের জীবনের সীমিত পরিসরে সে আগ্রহ মিটানোর সুযোগ না ঘটলেও ভ্রমণকাহিনি পাঠের মাধ্যমে কিছুটা পরিতৃপ্তি ঘটে। লেখকের চোখ দিয়ে পাঠক তখন অনেক কিছুই দেখতে পান। লেখক একজন পর্যটক হিসেবে নানাদেশ, জাতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করে তথ্য ও রসের সংযোগে ভ্রমণকাহিনি রচনা করেন। ভ্রমণকাহিনির লেখককে অনুসন্ধিৎসু হতে হবে, তাঁর দৃষ্টি হবে পক্ষপাতিত্বহীন, সহৃদয়তা হবে তাঁর বৈশিষ্ট্য।

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনির সংখ্যা অনেক। বিশেষত আধুনিক যুগে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভ্রমণকাহিনি রচনার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' গ্রন্থটি ভ্রমণকাহিনি হিসেবে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' গ্রন্থে গঙ্গাতীরস্থ প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণনা, প্রধান প্রধান ব্যক্তি বস্তু ও বিষয়ের উপাদেয় বর্ণনা থাকায় তা একাধারে ভূগোল ইতিহাস ও জীবনচরিতের লক্ষণাক্রান্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জাপানে পারস্যে', 'যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি' ইত্যাদি ভ্রমণকাহিনি হিসেবে অনবদ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের কিছু ভ্রমণকাহিনি পত্রের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এগুলোকে পত্রসাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। এগুলোতে কবির অন্তরঙ্গ মনের পরিচয়টি যেমন বিদ্যমান, তেমনি তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যিক রসরোধের চমৎকার পরিচয় এতে ফুটে উঠেছে। জলধর সেনের 'হিমালয়', প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'দেবতাত্মা হিমালয়', কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চীনযাত্রী', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বোম্বাই প্রবাস', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'দুয়ার হতে অদূরে', 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'ইংল্যান্ডের ডায়েরি', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'পশ্চিমের যাত্রী', মনোজ বসুর 'চীন দেখে এলাম', 'সোভিয়েতের দেশে দেশে', যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' ভ্রমণকাহিনি হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

পত্রসাহিত্য

পত্রসাহিত্য বলতে চিঠিপত্রের আকারে লেখা সাহিত্য গুণসমৃদ্ধ রচনাকে বোঝায় যা দুটি মনের সংযোগ সাধনে সহায়তা করে। কোন কোন চিঠিতে লেখকের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্যবিষয় সম্পর্কে নিজস্ব ধ্যানধারণার প্রকাশ ঘটে। পত্রসাহিত্যে একদিকে লেখকের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আবার কোথাও দোষগুণে মানুষের পরিচয় মিলে। কবি সাহিত্যিকগণের পত্ররচনায় ব্যক্তিগত সংবাদকে উপেক্ষা করে সর্বজনীন কাব্যের স্বভাব ধরা পড়লে তা হয়ে ওঠে পত্রসাহিত্য। পত্রসাহিত্য গীতিকবিতার সামিল অথবা মননধর্মী প্রবন্ধের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে থাকে। মমতা ও মননের শাসন পত্রসাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'ভর্তি মনের অবস্থায় জরুরী কথা ছাপিয়েও উদ্বৃত্ত থাকে মুখরতা। যাঁরা মজলিসি স্বভাবের লোক তাঁদের সেই উদ্বৃত্ত প্রকাশ পায় বৈঠকে; যাঁরা অন্তর্নিবিষ্ট তাঁরা স্বগত-উক্তি লেখেন ডাইরীতে, আমার মত যাঁদের রচনার মৌতাত, তাঁরা বকুনি চালান করেন এমন কারোর কাছে যাঁদের দিকে চিঠির রাস্তা সহজ হয়ে গেছে।'

বাংলা সাহিত্যে পত্রসাহিত্যের যথেষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান। বাংলা গদ্যের সূচনালগ্নে রামরাম বসু পত্রাকারে 'লিপিমালা' (১৮০২) রচনা করেছিলেন। বাংলা পত্রসাহিত্য হিসেবে নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রবাসের পত্র', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিলাতের পত্র', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্নপত্রাবলী' ও 'চিঠিপত্র', স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রসাহিত্য যেমন সুবিপুল তেমনি কল্পনা প্রসারতায় তা দিগন্ত বিস্তারী। তাঁর প্রত্যেকটি পত্রে একটি অপরূপ সৃজনশীল মন আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ যাত্রীর পত্র' সর্বপ্রথম পত্রসংকলন। 'পথে ও পথের প্রান্তে' দেশভ্রমণের বৃত্তান্ত নয়, চলমান জীবনের পথ যাত্রার ক্ষীণ ভি রেখাটুকু এই পত্রগুচ্ছে ফুটে উঠেছে। তাঁর 'জাপানযাত্রী', 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি' ইত্যাদি পত্রসংকলন হিসেবেও বিবেচ্য।

রম্যরচনা

রম্যরচনা বলতে এক ধরনের হালকা কল্পনাময় হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধকে বোঝায়। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বিভিন্ন অসংগতি এই শ্রেণির রচনার উপজীব্য। হাস্যরসের মাধ্যমে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করাই রম্যরচনার উদ্দেশ্য। কখনও নিছক রঙ্গ বা হাস্যরসের মাধ্যমে, আবার কখনও ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। ব্যঙ্গরচনার মাধ্যমে ব্যক্তিচরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করা হয়, আবার সমাজজীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে। রম্যরচনার বৈশিষ্ট্য পরিহাসের মধ্যে নিহিত, কিন্তু তাতে তীব্র শ্লেষ বা বিদ্রূপ প্রকাশেরও সুযোগ থাকে।

বাংলা গদ্যের উদ্ভবের সঙ্গে রম্যরচনার সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারের ফলে এদেশের সমাজব্যবস্থায় যে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়েছিল তা অবলম্বনে আধুনিক যুগের প্রথম থেকেই কবিতা গল্পে উপন্যাসে নাটকে প্রবন্ধে ব্যঙ্গরচনার সৃষ্টি হতে থাকে। বাংলা গদ্যসাহিত্যে রাজা রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কার বিষয়ক রচনার মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি ছদ্মনামে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন

সেগুলোতে ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নববাবু বিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়' প্রভৃতি গ্রন্থে সে আমলের সমাজকে বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গরচনা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' প্রভৃতি রচনা থেকে সমকালীন সমাজজীবন সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চানন্দ' নামে একটি ব্যঙ্গরসাত্মক পত্রিকা প্রকাশ করে এবং গদ্যে পদ্যে ব্যঙ্গরচনার মাধ্যমে পাঠকসমাজে মত্ততার সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র প্রবন্ধ রচনাগুলোতে আছে বিদ্রূপের প্রাধান্য। প্রমথ চৌধুরীর ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধে ব্যঙ্গরসের স্পর্শ আছে। বাংলা রম্যরচনার ক্ষেত্রে বীরবল বা প্রমথ চৌধুরীর স্থান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর 'চার ইয়ারী কথা'য় রম্যরচনার আসন সর্বদাই জমজমাট বলে বিবেচনা করা যায়। সতীশচন্দ্র ঘটক এক সময় ব্যঙ্গাত্মক কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। অতিআধুনিক সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালে 'শনিবারের চিঠি' সাপ্তাহিক হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি আশ্রয় করে একদল ব্যঙ্গরচয়িতার উদ্ভব হয়। এই দলে ছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্র সেন প্রমুখ। প্রমথনাথ বিশী কিছু সরস প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সৈয়দ মুজতবা আলী কৌতুকাশ্রিত লঘু নিবন্ধ রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'চাচাকাহিনি', 'পঞ্চতন্ত্র' ইত্যাদি তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থ। শিবরাম চক্রবর্তী কৌতুকরসাশ্রিত প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখ অনেকে ব্যঙ্গরসাত্মক রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। 'উনবিংশ শতাব্দীতে বিচিত্র বিষয়াশ্রয়ী প্রবন্ধ রচনার যেন বান ডাকিয়াছিল। বাঙালির আত্মানুসন্ধান এবং আত্মজিজ্ঞাসার তীব্রতাই তাহার মূল কারণ।'—এই উক্তির আলোকে গত শতাব্দীতে রচিত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

২। 'উনিশ শতকে প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রাচুর্য, প্রাণময়তা ও ঔজ্জ্বল্য বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানস্পৃহারই সাক্ষ্য।'—এই উক্তির সমর্থনে উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিচয় দাও।

৩। 'সৃজনশীল রচনা নয় প্রবন্ধ সাহিত্যই উনিশ শতকে বাঙালির মন-বুদ্ধি আত্মার বিকাশ ঘটিয়েছিল।'—এই উক্তির সমর্থনে উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। বঙ্কিমী যুগ হইতে বীরবলী যুগ—এই কাল পর্বে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশের পরিচয় দাও।

৫। 'উনিশ শতকে প্রবুদ্ধ বাঙালির জীবন-জিজ্ঞাসা, জ্ঞান-পিপাসা ও আত্মসম্মানবোধ সাময়িক পত্রকে অবলম্বন করে প্রবন্ধের মাধ্যমেই চরিতার্থতা খুঁজেছিল।'—এই মন্তব্যের আলোকে প্রধান সাময়িক পত্রগুলির নামোল্লেখ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন প্রধান প্রবন্ধকারের পরিচয় দাও।

৬। 'বাংলা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অবদান' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

৭। টীকা লিখ : কমলাকান্তের দপ্তর, ছিন্নপত্র, পালামৌ, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, রাশিয়ার চিঠি, লোকরহস্য, সাম্য।

পঞ্চম অধ্যায়
উপন্যাস

উপন্যাস বলতে এমন একটি বিশেষ সাহিত্যসৃষ্টি বোঝায় যাতে লেখকের জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি কোন বাস্তবকাহিনি অবলম্বনে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়। সমগ্র জীবনের প্রতিচ্ছবি এতে ফুটে ওঠে বলে এর পটভূমি থাকে বিস্তৃত। ব্যাপকতর আকৃতি, সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনাবিন্যাস, আকর্ষণীয় গল্পরস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রসৃষ্টি, মনোমুগ্ধকর বর্ণনাভঙ্গি, সাবলীল সংলাপ ইত্যাদি লক্ষণ সার্থক উপন্যাসে অভিপ্রেত। উপন্যাসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এতে কোন একটি কাহিনির বর্ণনাই প্রধান হয়ে থাকে। মানব জীবনের ঘটনাবলির বর্ণনাদানের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ ও জীবনসম্পর্কিত লেখকের বিচিত্র উপলব্ধি উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশ পায়।

উপন্যাস রচনায় ঘটনাকেই অনেকে প্রাধান্য দান করেন, কারও মতে চরিত্রসৃষ্টিই গুরুত্বপূর্ণ। মূল ঘটনা কেন্দ্র করে উপন্যাসে যেমন গল্পরস জমে ওঠে, তেমনি ঘটনারও লক্ষ্য চরিত্রসৃষ্টি। আর এই চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে লেখকের জীবনদর্শনের প্রকাশ ঘটে। ঔপন্যাসিক তাঁর বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে নাটকের মত মানবজীবন ও চরিত্র রূপায়িত করেন, তাই উপন্যাসকে 'পকেট থিয়েটার' বলে অভিহিত করা হয়। লেখক নিজের কথায় বা পরের উক্তিতে উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা করেন।

কথাসাহিত্যের পরিসীমায় রূপায়িত উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিশেষ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। উপন্যাসে যেখানে বৃহত্তর পরিসরে জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রূপলাভ করে, সেখানে ছোটগল্পে থাকে কোন চরিত্রের একটিমাত্র দিকের প্রতিফলন। 'উপন্যাস একটি আদ্যন্ত জীবনের মধ্যে অতলান্ত অন্তহীন জীবনকে প্রতিফলিত করেছে,—ছোটগল্প একটি মানবজীবনের যে কোন একটিমাত্র মুহূর্তের অভিভবতার গহনে অখণ্ড জীবনকে করে বিম্বিত।'

গল্পের প্রতি মানুষের চিরন্তন অনুরাগের মধ্যে উপন্যাসের বীজ নিহিত। তাই দেখা যায়, প্রাচীন কালের সমস্ত সাহিত্যই আখ্যানমূলক। প্রাচীন মহাকাব্যগুলোকে এই বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলোতেও এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে। সুসম্পূর্ণ ও শক্তিশালী গদ্যভাষা সৃষ্টি না হলে উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারে না। বাংলা গদ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আঙ্গিকের নানা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। উপন্যাস গল্প নাটক প্রবন্ধ এই পরিবর্তনেরই ফল।

আধুনিক কালের উপন্যাসে প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এখনকার উপন্যাসে একক নায়ক-নায়িকার উপযোগিতা কমে গেছে, এখন সমগ্র সমাজ বা গোষ্ঠীজীবন আধুনিক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। তাই আগের মত এখনকার উপন্যাসে ব্যক্তি পরিচয় প্রাধান্য পায় না, বর্তমান কালের উপন্যাস একটি সম্পূর্ণ সমাজ, গোষ্ঠী বা

দেশকে পরিচিত করতে চায়। এ জন্য কারও কারও ধারণা বর্তমান উপন্যাসে নায়কের মৃত্যু হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সম্পূর্ণ রূপে আধুনিক কালের সৃষ্টি। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেও উপন্যাসের আবির্ভাব আধুনিক কালে আঠার শতকের শেষ পর্যায়ে। বাংলা উপন্যাস পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাবেই রূপলাভ করেছে। উনিশ শতকের পূর্বে আধুনিক ইংরেজি নভেলের সংস্পর্শহীনতা এবং বাংলা গদ্যের অনুন্নত রূপের জন্য বাংলা উপন্যাস সৃষ্টি বিঘ্নিত হচ্ছিল।

উপন্যাসের গল্প ব্যক্তিজীবন বিশ্লেষণ করে। সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি না থাকায় তখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন বিশ্লেষণের সুযোগ ছিল না। সে কারণে তখন উপন্যাসের সৃষ্টি হয় নি। গণতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন ঘটে। সে জন্য গণতন্ত্রের সঙ্গে উপন্যাসের সংযোগ আছে। সমাজজীবনে এসব পরিবর্তনের অবর্তমানে প্রাচীন সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভব হয় নি। প্রাচীন কালে মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলনের অভাবে সাহিত্য ছিল স্মৃতিনির্ভর। তাই পদ্যের বাহনে সাহিত্য তখন মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। মনোরহস্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে বিশ্লেষণ উপন্যাসে অভিপ্রেত তা গদ্য ছাড়া সম্ভব ছিল না। তাই ছাপাখানা উদ্ভাবনের জন্য উপন্যাসকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে মানব মনে আবেগ উচ্ছ্বাস ছিল প্রবল—তার বাহন হল পদ্য। বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন মানসিকতার বাহন হিসেবে যুক্তিনির্ভর গদ্যের প্রচলন হয়েছে বহু পরে। তখন সাহিত্যে এসেছে উপন্যাসের ধারা। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্য যুগের বিপুল সাহিত্য সম্ভার সৃষ্টি হলেও উনিশ শতকের শুরু থেকে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পরে এবং বিদেশী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে উপন্যাসের সূত্রপাত হয়।

ইংরেজদের আগমনে ইংরেজি শিক্ষায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ সাধনের ফলে বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির সূত্রপাত। অন্যদিকে উপন্যাসের উপযুক্ত বাহন গদ্যের অভাব বিদূরিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠী কর্তৃক গদ্যরীতির চর্চায় প্রবর্তনায়। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্যায়ে গদ্যসৃষ্টির শুরু হলে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির পথ সুগম হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত গদ্যরীতির মধ্যে প্রথম সাহিত্যিক গদ্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং তা পরবর্তী পর্যায়ে উপন্যাসের উপযুক্ত বাহনের রূপ লাভ করে।

উপন্যাসের শ্রেণি বিভাগ

বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় উপন্যাসের উপজীব্য বলে উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগেও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে।

১. **ঐতিহাসিক উপন্যাস** রচিত হয় ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে। ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য রেখে শিল্পসৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে এই শ্রেণির উপন্যাস।

২. **সামাজিক উপন্যাসে** প্রতিফলিত হয় সমাজজীবন। সমাজের চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমস্যা এতে স্থান পেতে পারে।

৩. **হাস্যরসপ্রধান উপন্যাসে** একটি অসাধারণ দৃষ্টিকেন্দ্র থেকে জীবনের পর্যবেক্ষণ এবং তার প্রচলিত গতির মধ্যে বক্ররেখা ও সূক্ষ্ম অসংগতির কৌতুককর আবিষ্কার করা হয়।

৪. **কাব্যধর্মী উপন্যাসে** আখ্যানভাগ নিয়ন্ত্রণকুশলতা বা চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য অপেক্ষা লেখকের কবিদৃষ্টি জীবনদর্শনকে স্নিগ্ধ ও মধুর করে তোলে এবং গীতিধর্মিতা প্রাধান্য পায়।

৫. **ডিটেকটিভ বা রহস্য উপন্যাসে** অপরাধমূলক ঘটনা স্থান পায় এবং পুলিশী তৎপরতার মাধ্যমে কূটবুদ্ধির প্রখরতা প্রকাশ পায়।

৬. **আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে** লেখকের ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলন ঘটে।

৭. **পত্রোপন্যাসে** পত্রের আকারে উপন্যাসের বক্তব্য পরিবেশিত হয়।

৮. **সমস্যাপ্রধান উপন্যাসে** সমাজ ও হৃদয়-সমস্যার আলোচনা যুক্তিতর্কে তীক্ষ্ণতা ও গভীর চিন্তাশীলতার প্রকাশ ঘটে।

৯. **রোমান্সপ্রধান উপন্যাসে** লেখকের অতীতপ্রীতি ও কল্পনাভিসারী মনের পরিচয় রূপলাভ করে।

১০. **রোমাঞ্চকর উপন্যাসে** ভীতিপ্রদ কাহিনি স্থান লাভ করে।

উপন্যাসের প্রাথমিক প্রচেষ্টা

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের লক্ষণ প্রথম ফুটে ওঠার প্রয়াস পায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত এ দেশীয় সমাজের ব্যঙ্গরসাত্মক চিত্রপ্রকাশক গ্রন্থগুলোর মধ্যে। উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আগমন করে এ দেশে সুদীর্ঘকাল অনুসৃত রীতিনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয় এবং নব্যশিক্ষিত বাঙালির মধ্যে যথেষ্ট উচ্ছৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিকে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার আলোকে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং যা কিছু পুরাতন তারই প্রতি তাঁদের বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেতে থাকে। এর পরিণামে দেশের ধর্মে ও সমাজে ঘোরতর দুর্দিনের সৃষ্টি হয়। সমসাময়িক সাহিত্যে এই উচ্ছৃঙ্খল অবস্থার বাস্তব চিত্রায়ণ সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির পূর্বে নানা শ্রেণির রূপকথা উপকথার প্রচলন ছিল। সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণে দেবদেবীর অলৌকিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মানবসমাজ ও জীবনের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, দশকুমার চরিত, কাদম্বরী ইত্যাদির মধ্যেও বিশেষত্ববর্জিত, প্রথাবদ্ধ বর্ণনা বাহুল্যের অন্তরালে উপন্যাসের মৌলিক উপাদান বিক্ষিপ্ত রয়েছে বলে ধারণা করা সম্ভব। পঞ্চতন্ত্রের গল্প এবং বৌদ্ধ জাতকে বাস্তবতার চিত্র ছিল স্পষ্টতর। এ দেশে প্রচলিত রূপকথার মধ্যে উপন্যাসের পূর্বাভাস সহজেই লক্ষ করা যায়। অদ্ভুতরসাত্মক উপকথার অস্তিত্বের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'আরব্য উপন্যাস', 'হাতেম তাই', 'লায়লীমজনু', 'চাহার দরবেশ', 'গোলে বকাওলী' প্রভৃতি গল্পকাহিনি বাঙালি পাঠকের সম্মুখে এক অচিন্তিতপূর্ব রহস্য ও সৌন্দর্যের জগৎ উন্মুক্ত করেছিল। তা ছাড়া বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে ঐতিহাসিক কাহিনি উপজীব্য করার প্রবণতা দেখা গেছে। এই সব বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়ে থাকে যে, বাংলা উপন্যাসের পত্তনি ও প্রস্তুতি যুগের ইতিহাসে লোকরঞ্জক নকশা, অদ্ভুতরসাত্মক উপকথা এবং ঐতিহাসিক কাহিনির প্রভাব দেখা দিয়েছিল।

বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবের অব্যবহিত পূর্বের স্তর হিসেবে সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার ব্যঙ্গচিত্রগুলোর কথা উল্লেখযোগ্য। বাস্তব জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র কাহিনির ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েই উপন্যাসের অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে এদেশের সমাজব্যবস্থায় যে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিফলন সমকালীন সাহিত্যে লক্ষণীয়।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু বিলাস' ও 'নববিবি বিলাস' গ্রন্থের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩) গ্রন্থে তৎকালীন কলকাতার জীবন ও অনাচারের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। কলকাতায় সদ্য আগত কোন পল্লীবাসীর সঙ্গে নগরবাসীর কথোপকথনচ্ছলে সেখানকার হালচাল বর্ণনাই ছিল এ গ্রন্থের লক্ষ্য।

গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে লেখক যে উপভোগ্য মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য : 'কলিকাতা সাগরের সহিত সাদৃশ্য আছে তৎপ্রযুক্ত কলিকাতা কমলালয় নাম স্থির হইল, কমলা লক্ষ্মী তাঁহার আলয় এই অর্থদ্বারা কমলালয় শব্দে যেমন সমুদ্রের উপস্থিতি হইতেছে তেমন কলিকাতার উপস্থিতিও হইতে পারে অতএব কলিকাতা কমলালয় শব্দের যোগার্থ রহিল।...কলিকাতা মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে পরিপূরিতা হইয়াছে বৃহৎ কর্মকালে নির্গত হইয়া নানাদিগ দেশগামী হইতেছে নানাবিধ মুদ্রানদীর নিরন্তর গমনাগমন হইতেছে বিবিধ বিদ্যা ও বিদ্বানরূপ বহু রত্ন আছে ইংরাজ নবাব সংগ্রামকালে কলিকাতা মন্থন হইয়াছিল তাহাতে বিষাদরূপ হলাহল ও হর্ষরূপ অমৃত উঠাইয়াছিল কলিকাতা নিরূপমা ও সর্ব্ব দেশ খ্যাতা হইয়াছে পরনিন্দা পরায়ণ অনেকজন হাঁগর কলিকাতা বাস করিতেছে ও মূর্খ রূপ ভয়ানক কুম্ভীর অনেক ব্যাড়াইতেছে লক্ষ্মী সর্বদা বিরাজ করিতেছেন তদ্দর্শনে ভগবান নারায়ণও বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন সর্বদা তুরঙ্গাদি বাহন ও ধনমত্তাদি তরঙ্গ হইতেছে এবং তরঙ্গে কোলাহলেরো বাহুল্য হইয়াছে ইত্যাদি অতএব উভয়ের ধর্ম্ম সাম্যে সমান সংজ্ঞা হইল ইতি।'—এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে লেখকের লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। গ্রন্থটির গুরুত্ব তৎকালীন কলকাতার সমাজচিত্র হিসেবেই; এতে ঘটনার প্রবাহ বা চরিত্র না থাকাতে উপন্যাস হিসেবে ত্রুটি বিদ্যমান। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫) গ্রন্থে কলকাতার বাবু সমাজের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজদের অধীনে নানা বৃত্তি ও ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থোপার্জন করে এক নতুন ধনবান শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। তাদের পোষ্যেরা বিনা ক্লেশে অপরিমিত ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে 'বাবু' নামে আখ্যাত হয়। এদের চরিত্রে 'উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচার, খেয়ালী অস্থিরমতিত্ব, সৌজন্য ও সুরুচির অভাব' ছিল। এই বাবুদের নিষ্কর্মা নীতিহীন জীবন গ্লানিকর ব্যাধির মত সমাজদেহকে দূষিত ও দুর্বল করে তুলেছিল। 'প্রমথনাথ শর্মা' এই ছদ্মনামে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রথমবারের মত এই সামাজিক দোষত্রুটি ব্যঙ্গরস সহযোগে চিত্রিত করেন। গ্রন্থটি সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র হলেও উপন্যাসের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি নায়ক চরিত্র এতে স্থান পেয়েছে।

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতানুসারে, 'নববাবু বিলাস—গদ্যে পদ্যে, ছড়ায়-অনুপ্রাসে, সংস্কৃত গুরুগম্ভীর শব্দসমাবেশের ব্যঙ্গানুকৃতিতে ও চটুল কথ্যরীতিতে, নানা ভঙ্গির সংমিশ্রণজাত বর্ণসঙ্কর ভাষা বিন্যাসের মাধ্যমে ও কৌতুকোচ্ছল, ব্যঙ্গসরস মেজাজে লিখিত।' সে আমলে পুরুষের মত নারীদের মধ্যেও অনাচার প্রবেশ করেছিল। এ ধরনের রুচিহীন নীতিভ্রষ্টতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ভবানীচরণের 'নববিবি বিলাস'(১৮৩০) নামক ব্যঙ্গরসাত্মক অপর রচনায়। সেকালের বড়লোকেরা অনেকেই রক্ষিতা নিয়ে বাইরে রাত্রি যাপন করত। এর ফলে তাদের বঞ্চিতা স্ত্রীদের যে পদস্খলন ও শোচনীয় পরিণতি হত তা এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। এতে আগাগোড়া অশ্লীলতায় ভরা; অশ্লীলতম অংশগুলো পদ্যে লেখা। গ্রন্থে ঔপন্যাসিক কাহিনিগুণ কিছুমাত্র নেই এবং রুচির দিক দিয়েও নিন্দনীয়। তবে সামাজিক পটভূমিকায় রচিত বলে গ্রন্থের গুরুত্ব আছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সব রচনার মাধ্যমে সমাজ ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন। সার্থক উপন্যাসসৃষ্টি তাঁর হাতে সম্ভবপর হয় নি সত্য, কিন্তু তিনি উপন্যাসের আভাস দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স

কালগত দিক থেকে উপন্যাস হিসেবে প্রথম গ্রন্থের দাবি খ্রিস্টান বিদেশিনী হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স (১৮২৬-৬১) রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) গ্রন্থের। খ্রিস্ট ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এই গ্রন্থ রচিত। খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করায় ফুলমণির সুখ এবং যথার্থ খ্রিস্ট ধর্মাচরণ না করায় করুণার দুঃখভোগ, পরে মেম সাহেবের ঈশ্বর প্রেরিত সুপরামর্শে করুণার সুমতি ও সুখের মুখদর্শন এই গ্রন্থের মূল কাহিনি। লেখিকার একমাত্র লক্ষ্য খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের মনে এই ধর্ম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপন। খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে মানুষের নৈতিক উন্নতি ও সদাচার- নিয়ন্ত্রিত, প্রলোভনজয়ী জীবনযাত্রা নির্বাহের রুচিকর চিত্র অঙ্কিত করাই তার প্রধান কাম্য ছিল।

লেখিকা কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ভবানীপুর মিশন স্কুলে খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখাতেন। তাই বাঙালি সমাজের আচরণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, বাংলা ভাষার ওপরও তাঁর ভাল দখল জন্মেছিল। তবে গ্রন্থে কাহিনির কোন ধারাবাহিকতা ছিল না, ঘটনার সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্যস্ত পরিণতিও এতে বিশেষ নেই, চরিত্রগুলোও নিতান্ত নির্জীব ও নিষ্প্রভ। বইটি 'দি উইক' নামে একটি গল্পগ্রন্থ অবলম্বনে লেখা বলে অনুমান করা হয়। চরিত্রগুলো ইংরেজি আদর্শে চিত্রিত এবং ধর্মতত্ত্ব ও আদর্শের গুরুভারে সেসব জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। তবে পরিচ্ছন্ন ভাষায় রসসৃষ্টির চেষ্টা আছে। কিন্তু প্রচারকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে লেখিকার সাফল্য সর্বাংশে সূচিত হয় নি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'ঔপন্যাসিকের মানসদৃষ্টি, বিস্তৃত জীবনপটে অভিজ্ঞতার বিন্যাস ও উপন্যাসোচিত সমস্যা—একটি উপন্যাসের এই প্রধান ত্রি-শর্তের একটিও এ পুস্তকে রক্ষিত হয় নি।' ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই উপন্যাসের মূল্য ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে, প্রাণরসোচ্ছল জীবন কথা রূপে নয়। তাই বলা চলে ফুলমণি ও করুণার বিবরণ গ্রন্থটি যতখানি ইতিহাসগত কৌতূহল নিবৃত্ত করতে সক্ষম ততখানি সাহিত্যিক রসপিপাসা চরিতার্থ করতে সক্ষম নয়। বইটি ভারতের

সব অঞ্চলে দেশীয় খ্রিস্টানদের বিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়েছিল এবং সে কারণে ইংরেজি কানাড়ি মারাঠি তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে লিখিত বলে বইটি বাঙালি পাঠকের কাছে তেমন প্রচারিত হয় নি।

প্যারীচাঁদ মিত্র

উপন্যাসের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। নীতিঘেঁষা এই বাস্তব কাহিনিটিতে কুশিক্ষা, সঙ্গ, অভিভাবকের প্রশ্রয় ও অমনোযোগিতায় ধনীর সন্তানের জীবনের দুঃখজনক পরিণাম এবং দুঃখ দুর্দশা ভোগের পর পুনরায় ভাল মানুষ হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধনীর আদুরে সন্তান মতিলালের অধঃপতনের কাহিনি বর্ণনার সঙ্গে সে আমলের কলকাতার শিক্ষাদীক্ষা আচার অনুষ্ঠানের ব্যঙ্গাত্মক চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলালের ঘরের দুলালে লক্ষ করেছেন, 'ক. উপন্যাসোচিত একটি সমস্যার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল এই রচনায়। খ. একটি বিস্তৃত দেশজ জীবনপটের, প্রকৃতির এবং মানুষের প্রথম ব্যবহার এখানে পাওয়া গেল। গ. ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত সর্বগ্রাহী মনের প্রথম পরিচয় এই রচনায় মিলল। ঘ. সর্বোপরি জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট একটা মানসদৃষ্টির সাক্ষাৎও প্রথম এই রচনায় লাভ করা গেল।'

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির তৎকালীন প্রচেষ্টার নিদর্শনের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে মন্তব্য করেছেন, 'এই শ্রেণির রচনার মধ্যে আলালের ঘরের দুলালই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমধিক উপন্যাসের লক্ষণবিশিষ্ট। এই শ্রেষ্ঠত্ব—বাস্তব বর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ ও মননশীলতা—সমস্ত দিকেই পরিস্ফুট।' তাঁর মতে আলালের ঘরের দুলালই বোধ হয় বঙ্গভাষায় প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটি কেবল বাস্তববর্ণনাতেই পর্যবসিত এবং তাতে অন্তর্জগতের গভীরতর সংঘাতের কোন চিহ্ন না থাকায় একে খুব উচ্চ শ্রেণির উপন্যাসের মধ্যে স্থান দিতে পারেন নি। আলালের ঘরের দুলালের বিসদৃশ্য কাহিনি, ক্রমপরিণতিহীন ঘটনাবিন্যাস, অবিকশিত চরিত্র, ব্যক্তিত্বহীন নায়ক, অবাস্তব নারীচরিত্র এবং প্রণয় রসহীনতার জন্য একে সার্থক উপন্যাস বলা চলে না। উপন্যাসে মূল কাহিনি ও প্রধান চরিত্র যেখানে গুরুত্ব সহকারে রূপায়িত হয়ে ওঠার কথা, সেখানে সেসব হয়েছে নিষ্প্রভ, বরং শাখা কাহিনি ও উপচরিত্র পরিস্ফুটনে লেখক বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে প্যারীচাঁদ মিত্র মানব চরিত্রকে উদার পটভূমিকা থেকে দেখতে চেষ্টা করেন নি—বরং নীতিবাগীশ লেখক হিসেবেই বৈশিষ্ট্য বেশি ফুটে উঠেছে। নীতিকথা প্রচারে সচেতন না হলে ঔপন্যাসিক হিসেবে যথার্থ সার্থকতা লাভ করা অসম্ভব হত না।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) গ্রন্থের কথাও উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে কোন ধারাবাহিক কাহিনি নেই; সে আমলের কলকাতার কতকগুলো চিত্র ব্যঙ্গরস সহযোগে এতে পরিবেশিত হয়েছে। লোকরঞ্জক নকশা হিসেবেই এ গ্রন্থের গুরুত্ব।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ইতিহাস থেকে উপকরণ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাসজাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) গ্রন্থে 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এই দুটি আখ্যান রয়েছে। কন্টারের লেখা ঐতিহাসিক গালগল্প Romance of History—India গ্রন্থের কোন কোন কাহিনি ভিত্তি করে এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজপুত মারাঠা জাতির অতীত বীরত্ব বাঙালি লেখককে উদ্বুদ্ধ করে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক, তাঁর আদর্শবাদিতা এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঐতিহাসিক কাহিনি পরিবেশনে প্রেরণা দেয়। তাঁর সফল স্বপ্নের চেয়ে অঙ্গুরীয় বিনিময়ের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস জাতীয় রচনার আঙ্গিক ও মূল সুর অধিকতর পরিস্ফুট। তিনি চরিত্র রূপায়ণে ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার সংযোজন ঘটিয়েছেন। মারাঠাদের ঐতিহাসিক কাহিনি পরিবেশনে তিনি মানব চরিত্রজ্ঞান ও জীবনসত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে ভূদেব মুখ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসের প্রতি যত আগ্রহ ছিল, ঔপন্যাসিকের প্রতিভা তত ছিল না, যথার্থ রসশিল্পীও তিনি ছিলেন না। তাই তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনভ্যস্ত রচনার আড়ষ্টতা লেখকের স্বচ্ছন্দ গতির অন্তরায়। বর্ণনাপ্রথাও মন্থর গতি।' ইতিহাসের বিষয়বস্তু অবলম্বনে উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা পরবর্তী পর্যায়ে আরও বিস্তার লাভ করে।

সার্থক বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির পটভূমিকায় রচিত এই সব গ্রন্থের মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ যে সম্পূর্ণ রূপে অনুপস্থিত তা নয়, কিন্তু সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে এগুলোকে সার্থক উপন্যাসের পর্যায়ে স্থান দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে এই সমস্ত উপন্যাসজাতীয় গ্রন্থে যে সংস্কার প্রচেষ্টা রূপায়িত হয়ে উঠেছে তাতে এই সময়কে সংস্কার পর্বের যুগ বলে অভিহিত করা চলে।

ড. সুকুমার সেন বাংলা উপন্যাসের মূলে চারটি স্বাধীন ধারা লক্ষ করেছেন : ১. লোকরঞ্জক নকশা, ২. অদ্ভুতরসাত্মক রূপকথা, আদিরসাত্মক পুরানো রোমান্টিক আখ্যায়িকা এবং নীতিমূলক কাহিনি, ৩. ঐতিহাসিক কাহিনি এবং ৪. খ্রিস্টান প্রচারকদের লেখা অনুবাদ ও মৌলিক নীতিকাহিনি। উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে গদ্যের বিকাশ ঘটলে বাঙালি পাঠক লৌকিক ও পৌরাণিক গল্প আখ্যায়িকার প্রতি আগ্রহশীল হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের মধ্যে গল্পকাহিনি পরিবেশনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। ইংরেজি থেকে আরব্য উপন্যাস এবং এ জাতীয় গল্প বাংলায় অনূদিত হয়ে কথাসাহিত্যের প্রসার ঘটাতে থাকে। বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক নিদর্শনগুলোতে উপন্যাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ক্রমান্বয়ে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সূচনা করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উপন্যাসের প্রাথমিক প্রচেষ্টার বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষার কালাতিক্রমের পর বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) প্রাপ্য। সেদিক থেকে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল ১৮৬৫ সাল

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। বস্তুতপক্ষে, এই উপন্যাস থেকেই বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের ধারার সূত্রপাত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট রূপে বের হয়ে সমগ্র জীবন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে ইংরেজ সরকারের চাকরি করেন। তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি লেখকের মতই তিনি প্রথমে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই প্রচেষ্টার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ Rajmohan's Wife (১৮৬২) নামক উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিদেশি ভাষায় সাহিত্যচর্চায় কোন পরিতৃপ্তি লাভ করতে না পেরে, তৎকালীন কিছু সংখ্যক ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মনীষীর বাংলা সাহিত্যচর্চার দৃষ্টান্ত অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং স্বল্প সময়েই উপন্যাস শিল্পে সীমাহীন দক্ষতার পরিচয় দেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন তাঁর মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথের সন্ধান লাভ করলেন, অন্যদিকে তেমনি বাঙালির মন এক অভিনব সাহিত্যশিল্পের রসাস্বাদন করতে সক্ষম হল। ইংরেজি শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য 'নভেল' এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বলে তাঁর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে এই নতুন ধারার প্রবর্তন করা সম্ভবপর হয়েছিল। অবশ্য একালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে জীবন-উপাদানের তুলনায় নীতি, ধর্মাদর্শ ও সম্প্রদায় গৌরবের প্রাধান্য সম্পর্কে অনুযোগ উঠেছে। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকলায় তাঁর ব্যক্তি-হৃদয়ার্তি প্রতিফলিত হয়েছে। সৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্য-স্রষ্টার হৃদয়ের স্বরূপ সম্পর্কিত থাকাই স্বাভাবিক। সেজন্য বঙ্কিম সাহিত্যে নীতির প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বাইশ বৎসরে চৌদ্দটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সেগুলোর নাম : দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), রাধারাণী(১৮৭৫), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রাজসিংহ (১৮৮১), আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) ও সীতারাম (১৮৮৭)।

উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের রোমান্স-আশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন; আবার তিনি সামাজিক-পারিবারিক কথাসাহিত্যের আদর্শেও কতিপয় উপন্যাস রচনা করেন। এ সব উপন্যাসে বাঙালির অতীত ইতিহাস যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি ব্যক্ত হয়েছে সমকালীন সমাজজীবনের কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তব জীবনকে ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করে বিস্ময়কর ও অলৌকিকের প্রতি প্রবণতা প্রকাশমান। এতে রোমান্সের বৈশিষ্ট্য নিহিত। রোমান্স রচনায় ইতিহাস ও দৈবশক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে রহস্যময় দৃঢ় ব্যক্তিত্বশালী মনুষ্যচরিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ করলে কতকগুলো ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বলে উল্লেখ করা যায়। অতীত ইতিহাসের কাহিনি কিছু সংখ্যক উপন্যাসে বিধৃত। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজে একমাত্র 'রাজসিংহ'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে আখ্যাত করেছেন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র

লিখেছিলেন, 'আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।...ব্যায়ামের অভাবে মানুষের সর্বাঙ্গ দুর্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।' রাজস্থানের চঞ্চলকুমারীকে মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেবের বিয়ের ইচ্ছার ফলে রানা রাজসিংহের সঙ্গে তাঁর বিরোধ এবং বিরোধে রাজসিংহের জয় ও চঞ্চলকুমারী লাভ—এই মূল ঘটনাবলম্বনে উপন্যাসটি পরিকল্পিত। কিন্তু মূল ঘটনা ও প্রধান চরিত্রের রূপায়ণে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সত্য অনুসরণ করেন নি বলে তা যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা পেতে পারে না। এই প্রকার উপন্যাসের ঐতিহাসিক ঘটনায় কল্পনার রং ছড়ানোর সুযোগ থাকলেও ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতিসাধন সমর্থনযোগ্য নয়। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাল্পনিক চিত্রের সাহায্যে ইতিহাসের শূন্য রন্ধ্র পূরণ করে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তবু তাঁর সংগৃহীত চরিত্রগুলো বিশেষ আদর্শের ক্রীড়নকমাত্র। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'স্থূলঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে প্রায় তেমনি রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেবউন্নিসা, উদিপুরী ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহাদের চরিত্র ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ ছাড়া আরও কতিপয় উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার সংযোগ সাধন করেছেন। তবে সেই সব ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনাভিত্তিক পরিবেশ রচনা করা হলেও মানবজীবনের বিচিত্রতর বৈশিষ্ট্য দেখানোই এগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনীর' সঙ্গে ইতিহাসের সংস্পর্শ সামান্য। খ্রিস্টীয় ষোল শতকের শেষ পর্যায়ে উড়িষ্যার অধিকার নিয়ে মোগল ও পাঠানদের মধ্যে যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তাকেই এ উপন্যাসের পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। উপন্যাসে যুদ্ধবিগ্রহের কলকোলাহলের স্থান দেওয়া হলেও এতে প্রেমের সূচনা, বিকাশ ও পরিণতির পরিচয় দান করা হয়েছে। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে তের শতকের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানকর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের কাহিনি উপজীব্য। তবে এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর যতটুকু আশ্রয় করা হয়েছে তার চেয়ে ঔপন্যাসিকের কল্পনাশ্রয়ী মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে বেশি। এর ইতিহাসের ঘটনার অন্তরালে দুটি প্রেমের কাহিনি আছে—একটি হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর, অপরটি পশুপতি- মনোরমার। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ঐতিহাসিকতার খানিকটা স্পর্শ থাকলেও গার্হস্থ্যজীবন তাতে প্রধান স্থান অধিকার করেছে। যে নিগূঢ় ভাবসঙ্গতি শ্রেষ্ঠ রোমান্সের লক্ষণ, যে অনিবার্য ঘটনাপরিণতির একমুখিনতা মহৎ ট্র্যাজেডির প্রাণশক্তি সেই উভয়বিধ উৎকর্ষই কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে উদাহৃত হয়েছে। এই উপন্যাসে নায়িকার অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনই প্রধান বিষয়। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের পটভূমিকা ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা

এবং মীর কাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংগ্রাম। এতে আছে ইতিহাসাশ্রয়ী ঘটনার সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনির সংমিশ্রণ। উপন্যাসের একদিকে যেমন চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনি স্থান পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মীর কাসিম-দলনী বেগমের কাহিনি রূপ লাভ করেছে। ফলে এই দুটি কাহিনির একত্র সম্মিলন উপন্যাসটিতে লক্ষণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কতিপয় উপন্যাসকে সামাজিক উপন্যাস হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা যায়। 'বিষবৃক্ষ', 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বিশুদ্ধ পারিবারিক জীবনের সংঘাত ও সমস্যাসম্বন্ধীয় কাহিনি রূপায়িত হয়ে উঠেছে বলে এগুলো সামাজিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের লোক ছিলেন, এই সমস্ত উপন্যাসে তাঁর নিজস্ব সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বাঙালি হিন্দুজাতির আদর্শের অনুসারী হয়ে তাঁর শিল্পী মনের অভিব্যক্তি ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'হিন্দুসমাজ পার্বত্য শহরের মত আদর্শের উচ্চশৃঙ্গে নির্মিত ছিল—উহার স্বাভাবিক চলাফেরা সমতলভূমির মধ্যে, দূরারোহ চড়াই-এর কৃচ্ছ্রসাধনের পথই অনুসরণ করিত। বাংলাদেশে নরনারীর স্বাধীন প্রেম প্রবৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতা সমাজচিত্তের বিশেষ গঠনের জন্যই, মানস সংস্কৃতির বিপরীত প্রভাবের ফলেই এমন একটা সংকোচ অনুভব করিবে, যাহাতে ইহার শুধু বাহিরের সাফল্য নহে, অন্তরের আত্মপ্রসাদেও ব্যবহৃত হইবে।' বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলোর চরিত্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের যথাযোগ্য সমর্থন পাওয়া যাবে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে রোহিণী এবং 'বিষবৃক্ষে' বালবিধবা কুন্দনন্দিনীর স্বাভাবিক প্রেম উপভোগাকাঙ্ক্ষাকে কোন প্রকারেই সমর্থন জানানো হয় নি। পাত্র-পাত্রীর এই প্রকার মনোভাবকে সমাজের পবিত্রতার প্রতিবন্ধক বলে মনে করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বক্তব্যে জীবনধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। 'কৃষ্ণকাণ্ডের উইল' উপন্যাস উপলক্ষে এ বিতর্ক তীব্রতর হয়। উপন্যাসের নায়িকা রোহিণীর হত্যার ঘটনাটির শৈল্পিক ও নৈতিক বিচারমান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন, 'অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'রোহিণীকে মারিলেন কেন? অনেক সময়ই উত্তর দিতে বাধ্য হইয়াছি, 'আমার ঘাট হইয়াছে।' কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য জীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্তৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস না পড়িলেই বাধ্য হই।' বঙ্কিমচন্দ্রের এ ধরনের মনোভাবের প্রেক্ষিতে অনেকে মনে করেন নীতিবাদী বঙ্কিমের কাছে শিল্পী বঙ্কিমের পরাজয় ঘটেছে। 'রজনী' উপন্যাসে অন্ধ মেয়ের প্রেমের বিকাশ দেখাতে গিয়ে একদিকে অবিশ্বাস্য ঘটনার পরিবেশ অঙ্কিত হয়েছে, অন্যদিকে উপন্যাসটির বিভিন্ন চরিত্রের আত্মকথার মাধ্যমে কাহিনি বর্ণনায় লেখক আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গার্হস্থ্য জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলোর উৎকর্ষের প্রধান নিদর্শন এদের মধ্যে জীবনসংঘাত মহৎ প্রকৃতির তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মহিমান্বিত প্রকাশে। এই শ্রেণির উপন্যাসে যে নীতিবাদের বিকাশ ঘটেছে তা ধর্মের বহুবিধ সংস্কারযুক্ত হিন্দুজীবনের বৈশিষ্ট্যমাত্র।

'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামকে' রাজনৈতিক উপন্যাসের পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই ত্রয়ী উপন্যাসে দেশাত্মবোধ স্বাজাত্যবোধ এবং গীতায় উক্ত নিষ্কাম ধর্মমতের প্রচারক। হিন্দুজাতিকেন্দ্রিক হয়ে এই পর্যায়ের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান। এ দেশের অধিবাসীদের জীবনে ছিয়াত্তরের ভয়াবহ মন্বন্তরের ঐতিহাসিক ঘটনা যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল তারই কাহিনি সহকারে উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ উপজীব্য করা হয়েছে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। ইতিহাসের নিরূপিত তথ্যসীমায় লেখকের ধ্যানকল্পনা কতদূর প্রসার লাভ করতে পারে, সন্ন্যাসের গেরুয়া আংরাখায় আধুনিক স্বদেশপ্রেমের ইউনিফর্ম কতটা তৈরি হতে পারে, অতীতের ছায়াপটে ভবিষ্যতের অস্ফুট সম্ভাবনা কতখানি সুস্পষ্টভাবে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস রচনার মাধ্যমে তারই পরীক্ষা করেছেন। এ দেশের সমাজ, পরিবার ও তৎকালীন রাষ্ট্রবিশৃঙ্খলার বাস্তবানুযায়ী চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের মধ্যে স্থান পেয়েছে। সমাজ ও সংসারের সীমানার বাইরে কঠোর সাধনায় রত দেবী চৌধুরাণী লেখকের আদর্শানুসারে আদর্শ হিন্দু স্ত্রী। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারামে' ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের উত্থানপতনের ইতিহাস, পারিবারিক জীবনের সমস্যা এবং বিপর্যস্ত ব্যক্তিচরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। উপন্যাস তিনটির মধ্যে দেশাত্মবোধের বিশেষ আদর্শের প্রচার করা হয়েছে বলে তাতে শিল্পগত অপকর্ষ বিদ্যমান।

'ইন্দিরা', 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত আকারের উপন্যাস। সম্ভবত ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না, তাই এগুলো ছোটগল্প হতে পারে নি—সংক্ষিপ্ত উপন্যাস হিসেবেই এদের পরিচয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলো উপন্যাসে দ্বন্দ্বহীন অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। 'দুর্গেশ-নন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী', 'ইন্দিরা', 'রাজসিংহ' প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। এগুলোর মধ্যে গল্পরসের প্রাধান্য বিদ্যমান। তাঁর কতকগুলো উপন্যাসে 'প্রণয়দ্বৈধমূলক মানসিক দ্বন্দ্ব' স্থান লাভ করেছে। 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি উপন্যাস এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। সনাতন হিন্দু আদর্শই এই পর্যায়ে শিক্ষারূপে প্রকাশমান। বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলো উপন্যাস 'দেশপ্রীতিমূলক উপদেশাত্মক'—'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এই শ্রেণির অন্তর্গত। গীতার নিষ্কাম কর্ম ও দেশাত্মবোধ এই সব উপন্যাসে প্রচারিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রগুলোর ভাগ্য যেন নিরন্তর অদৃশ্য কোন নিয়তির হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। নারীর রূপের প্রবল আকর্ষণে পুরুষের জীবনে ট্র্যাজেডি ফুটে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসে নিয়তির লীলার বিচিত্র প্রকাশ ঘটলেও মানব প্রবৃত্তিকেই তার পরিণামের জন্য দায়ী করেছেন। মানবহৃদয়ের দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিশ্লেষণও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য ছিল ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির সদ্য অঙ্কুরিত জীবন সমস্যা। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে পুরাতন বাঙালির কথা বলতে গিয়েছেন, সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলো বড় বড় মানুষ এঁকেছেন কিন্তু বাঙালি আঁকতে পারেন নি।'

পূর্বরাগের প্রকাশ, দ্বন্দ্বহীন প্রেম, সাধুসন্ন্যাসীর অলৌকিক কার্যকলাপ, সমান্তরাল প্রেমকাহিনি, অবাস্তব পরিবেশের নায়িকা—এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লক্ষণীয়। তাঁর উপন্যাসসৃষ্টির পশ্চাতে স্যার ওয়াল্টার স্কটের আদর্শের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে দেশি আখ্যায়িকার আদর্শও তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। ওয়াল্টার স্কট যেমন ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করে জাতীয় জীবনে ইতিহাস চেতনা আনয়ন করেছিলেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের কাহিনি উপন্যাসে প্রতিফলিত করে হিন্দুজাতির অতীতের গৌরবান্বিত চিত্র দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে দেখা যায় যে, তিনি এমন এক আদর্শ রূপায়ণে সচেষ্ট ছিলেন যা অবাস্তব বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। তিনি হিন্দুয়ানি আদর্শ রূপায়ণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তবে জীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগের অভাব ছিল। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র বঙ্কিমী উপন্যাসে তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণ দেখেছেন :

'ক. বিষয়বস্তু বা theme-এর গুরুত্বের বা অসাধারণত্বের ওপর প্রাধান্য আরোপের প্রবণতা। খ. উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা। গ. মননশীলতাজনিত সুষমতার প্রয়োগ।' ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'বঙ্কিমের হাতে বাংলা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ' করেছে।

উপন্যাস ব্যতীত প্রবন্ধ সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্র সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তরে' (১৮৭৫) কৌতুকহাস্যের স্নিগ্ধচ্ছটা ও ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে। হাস্যরসের মাধ্যমে সমাজের দোষত্রুটি নির্দেশ করার বৈশিষ্ট্য এই রচনায় লক্ষণীয়। 'লোকরহস্য' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' তাঁর অপর ব্যঙ্গরচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রকে বহুদূর সম্প্রসারিত করেছে। তিনি বুদ্ধিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। প্রামাণ্য তথ্যসমাবেশে ও নিস্পৃহ যুক্তির সুতীক্ষ্ণতায় তাঁর সর্ববিধ প্রবন্ধই সমুজ্জ্বল। 'বিজ্ঞান রহস্য', 'বিবিধ সমালোচনা', 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী', 'সাম্য', 'প্রবন্ধপুস্তক', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'ধর্মতত্ত্ব' তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষাদীপ্ত প্রবন্ধসম্পদের ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট হয়ে অধিকতর সমৃদ্ধি ও গৌরবের পথে অগ্রসর হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব রচনারীতির মধ্যে অসাধারণ মৌলিকতা অনবদ্য বৈশিষ্ট্য সহকারে প্রকাশ পেয়েছে—তাই তাঁর জন্য এনেছে বাংলা সাহিত্যে 'সাহিত্য সম্রাটের' আসন। একান্ত সহৃদয়তা সহকারে পাঠকের মনোরঞ্জনের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি গল্পরস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ভাষা ভাবের উপযোগী ও অনুগত, ভাবকে ছাড়িয়ে স্বাধীনভাবে প্রকাশের নিদর্শন তাতে নেই। তিনি বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত সুললিত গদ্যভঙ্গিতে নমনীয়তা ও সরসতা সঞ্চার করে বাংলা গদ্যকে সকল বিষয় ভাব রসের বাহন করে তুলেছেন। তাঁর আমল থেকেই মুখের ভাষা ও মনের কথার মধ্যে আর বড় বেশি ব্যবধান থাকে নি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের চেতনার যথার্থ সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি 'প্রতীচ্য-প্রভাবিত রাজনৈতিক বিপ্লব-বুদ্ধিকে ভারতীয় হিন্দু মননের সর্বাত্মক মূল্যবোধের সূত্রে গেঁথে বাঙালির অবিনাশী নবজীবনের স্বপ্ন' দেখেছিলেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে। ইতিহাসের আনাচে

কানাচে জাতীয় গৌরবের যে উপকরণ ছড়িয়েছিল তা নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রহ করে তিনি সাহিত্যের সম্পদ হিসেবে পরিবেশনের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রতীচ্যের সাহিত্যাদর্শের রূপকার হিসেবে তিনি বাংলা সাহিত্যকে গৌরবমণ্ডিত পরিস্থিতিতে উন্নীত করেছেন। তাঁর কল্পনা-প্রবণতার বাহন হিসেবে এসেছে তাঁর অনবদ্য ভাষা—বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক কাঠামো উৎকর্ষপূর্ণ রূপ। ফলে বাংলা সাহিত্য সগৌরব অগ্রগতির দিকনির্দেশনা লাভ করল এখান থেকেই।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আসন সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'বঙ্কিম ভারতবর্ষের জীবনকে, তার বহুকালগত জীবনাচরণকে নবকালের ঘাত-প্রতিঘাত সমেত উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন ও করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসের সমস্যারম্ভের মূলে রয়েছে জীবনযাপনের মূলসূত্রগুলোতে কোন না কোন প্রকার ব্যত্যয়। বঙ্কিমের কালে এই বিষয়বস্তুর যে মূল্য ছিল তার সীমার বাইরে এসেও যে বঙ্কিমের সাহিত্যকর্মের মূল্যহানি হয় নি এর কারণ, জীবনকে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম দু-হাতে ছুঁয়েছিলেন। মানুষের যন্ত্রণাকে, বাসনাকে, বাসনার অচরিতার্থতাজনিত অশ্রুকে বঙ্কিম কখনও ছোট করে দেখেন নি। বরং মানুষের জীবনযাপনে, কর্মে, ধ্যানে এদের প্রভাব কতখানি বস্তুত অপরিহার্য সে-কথাই বলেছেন তাঁর সৃজিত চরিত্রের মাধ্যমে। জীবনই সত্য এবং জীবনাতীত জীবনাতীতই থাকে তা নিয়ে জীবনের কোন সান্ত্বনা নেই—সচেতন ভাবে বঙ্কিম এ-কথা বলেছিলেন।'

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩-৯১) অন্যতম রচনা **স্বর্ণলতা** (১৮৭৪) বঙ্কিমপর্বের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। এতে দরিদ্র ভদ্র বাঙালির ঘরের পরিচিত সুখদুঃখের চিত্র স্থান পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সাধারণ বাঙালি জীবনের প্রতিদিনের কথা চিত্রিত হয় নি। তাই পুরাপুরি বাস্তবকাহিনি অবলম্বনে লেখা উপন্যাস এটিই প্রথম। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে তা লেখা। সে আমলের একান্নবর্তী পরিবারে ভ্রাতৃবধূদের স্বার্থপরতা ও কলহের ফলে ভাইদের সংসারে কীভাবে ভাঙন ধরে তারই চিত্র এ উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী প্রমদার নীচতা এবং কনিষ্ঠের স্ত্রী সরলার সহিষ্ণুতা উপন্যাসের বর্ণিত বিষয়। জীবনের কোন জটিল সমস্যা এতে বিধৃত হয় নি, প্রতিদিনের সহজ জীবনযাত্রার কাহিনি করুণরস সহযোগে পরিবেশিত হয়েছে। উপন্যাস লেখক উদার ভাব বা সুগভীর তত্ত্ব ব্যক্ত না করে আমাদের এই চিরপরিচিত, ধর্মশীল, স্বজনবৎসল বাস্তুভিটা অবলম্বী প্রচণ্ড কর্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালি জীবনের কাহিনি রূপায়িত করে তুলেছেন। তারকনাথ রোমান্সের পরিসীমা থেকে পাঠকের দৃষ্টি প্রতিদিনের তুচ্ছতার ওপর টেনে এনে সেকালের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পেয়েছিলেন। তারকনাথ ডাক্তারি পড়ে সরকারি চিকিৎসা বিভাগে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের বাহুল্য ছিল। তাঁর উপন্যাসে বাংলার নিভৃত পল্লীর চিরচেনা জীবনের অপরূপ আলেখ্য যেভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল তাতে বাঙালির গল্প-পিপাসা পরিতৃপ্তি লাভ করেছে। তাঁর উপন্যাসের ভাষা ছিল সহজ সরল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমকালেই ধীরে ধীরে অসাধারণ মানুষের অসাধারণ ঘটনা সমন্বিত ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং সামাজিক ঘটনাবহুল উপন্যাস সম্বন্ধে যে প্রতিক্রিয়া পাঠকসমাজে দেখা দিয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে স্বর্ণলতা উপন্যাসের মর্যাদা।

রমেশচন্দ্র দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে অনুবর্তী ঔপন্যাসিক সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) তাঁদের অন্যতম। রমেশচন্দ্র ছিলেন আই. সি. এস.—কর্মক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত এবং তারই উৎসাহে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব। তিনি সাহিত্যসাধনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেছিলেন; তবু তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অবিমিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসসৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত অর্থনীতি ও ইতিহাসে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করে সুপণ্ডিত হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় ছদ্মনামে তিনি কবিতাও লিখতেন। বাংলা উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগের ফলে তিনি ইতিহাসকেই গুরুত্ব প্রদান করেন এবং তাঁর সকল রচনাই উপন্যাসের সরস আবরণে উপস্থাপিত ইতিহাস। শুধু ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে বঙ্কিমচন্দ্র যে ক্ষেত্রে উপন্যাস রচনা করতে পারেন নি, সেক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র দত্ত ইতিহাসের যথার্থ সত্য অবলম্বনে উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব দেখান। তাঁর শিল্পীসত্তায় কোন কল্পনাবিলাস ছিল না বলে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'কল্পনাকুশলতার অভাবই সাধারণত তাঁহার ভাবদৈন্যের কারণ ও জীবনসমস্যার গভীর আলোচনার পক্ষে অন্তরায় হইলেও, অধিকতর সত্যনিষ্ঠার হেতু হইয়াছে। রমেশচন্দ্র কল্পনার আতিশয্য বা আদর্শবাদের দ্বারা ইতিহাসকে রূপান্তরিত করিতে চাহেন নাই, পরন্তু যথাসাধ্য সত্যচিত্রণেরই প্রয়াসী হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের প্রতিকূল আকাশ বাতাসের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যতদূর বৃদ্ধি ও পরিণতি হওয়া সম্ভব রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।'

রমেশচন্দ্র দত্ত চারটি ঐতিহাসিক উপন্যাস—বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবী কঙ্কণ(১৮৭৭), (মহারাষ্ট্র) জীবনপ্রভাত (১৮৭৮) ও (রাজপুত) জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯) এবং দুটি সামাজিক উপন্যাস—সংসার (১৮৮৬) ও সমাজ (১৮৯৩) রচনা করেছিলেন।

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস কয়টিকে দু শ্রেণিতে বিভক্ত করা চলে। এক শ্রেণির অন্তর্গত 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে লেখকের শিল্পগত দক্ষতা ফুটে ওঠে নি, কিন্তু 'মাধবী কঙ্কণে' উচ্চাঙ্গের উপন্যাসশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যা' উপন্যাসদ্বয়কে অন্য শ্রেণিতে স্থান দেওয়া চলে। এই পর্যায়ে লেখকের মন ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। তবে এগুলোতে কল্পনার যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা ইতিহাসের ভিত্তি থেকে উৎপন্ন। সেজন্য শেষোক্ত উপন্যাসদ্বয় তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইতিহাস উপলক্ষ করে যেখানে লেখকের কল্পনা

ব্যাপকতর হয়ে উঠতে পারত, প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাস দুটিতে তা না করে কল্পনার প্রাধান্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। প্রথম শ্রেণির উপন্যাসে ইতিহাস ছিল অপ্রধান, আর অপর শ্রেণির উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার প্রাধান্য বিদ্যমান।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে শিবাজীর সংগ্রাম ও সাফল্য 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' উপন্যাসটির উপজীব্য। ইতিহাসের তথ্যসম্ভার অনুসরণ করে এই উপন্যাসের নায়ক শিবাজী এবং প্রতিনায়ক আওরঙ্গজেবের চরিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। ইতিহাস এখানে গল্পরসের সৃষ্টি করেছে। এই উপন্যাসে ইতিহাসের প্রতি ঔপন্যাসিক যে আনুগত্য দেখিয়েছেন তাতে সহজেই বলা যায় যে, বিষয়-বিন্যাস বা চরিত্রচিত্রণে কোথাও ঐতিহাসিক তথ্য বা ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার কোন অপলাপ ঘটে নি। তাহলেও লক্ষ করা যাবে যে, উপন্যাসের পক্ষে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর ইতিহাস-নির্ভর ভূমিকাই সব নয়, মানব-জীবনের সুখদুঃখ আনন্দবেদনার সাধারণ অভিজ্ঞতা নিয়ে অসাধারণেরাও পরিচিত জীবনের পটভূমিতে এসে উপনীত হয়েছে। 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' গ্রন্থে রাজপুত জাতির গৌরবহীন অবস্থার চিত্র বিধৃত। এই উপন্যাসেও লেখকের ইতিহাসনিষ্ঠ মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' উপন্যাসটি গভীর রসদৃষ্টিতে তথ্যবহুল, বাস্তবানুসরণে 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' উপন্যাস থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে।

কল্পনাপ্রবণতাকে গুরুত্ব না দিয়ে যদি ঘটনা ইতিহাসাশ্রয়ী হয় এবং তাকে যদি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের নিদর্শন মনে করা যায়, তবে রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতার মর্যাদার অধিকারী। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যানুসারে পাত্রপাত্রীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, কল্পনার প্রসার জীবনজিজ্ঞাসার পরিচয় উপন্যাসে থাকা প্রয়োজন, কিন্তু রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তা অবর্তমান। ঐতিহাসিক ঘটনাবস্তু ভিত্তি করে ঔপন্যাসিকের বিচিত্র কল্পনা রূপায়িত হয়ে ওঠা যেক্ষেত্রে ছিল সহজতর, রমেশচন্দ্রের বেলায় তা সম্ভবপর হয় নি। ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার দিক থেকে লেখকের কৃতিত্বের জন্য শেষোক্ত উপন্যাস দুটিকে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

রমেশচন্দ্র দত্ত সামাজিক উপন্যাস 'সংসার' ও 'সমাজ' গ্রন্থ দুটিতে বাংলাদেশের শান্তস্নিগ্ধ রূপ ফোটাতে চেয়েছেন। ইতিহাসের সুবৃহৎ ঘটনার ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পল্লীর একান্ত সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রণের প্রতি অনুরাগ দেখানোর ফলে এখানে লেখকের প্রতিভার বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। এদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অনৈক্য বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিত্তশালী পরিবারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, আর রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রণ দেখা যায়। তবে এই ক্ষেত্রেও মানবহৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। 'সংসার' নামক উপন্যাসটিতে পশ্চিমবঙ্গের পল্লীর সুখদুঃখভরা জীবনযাত্রার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'সমাজ' উপন্যাসটির মধ্যে লেখক বিধবাবিবাহের প্রতি নিজের সমর্থন প্রকাশ করেছেন। সহানুভূতিশীল লেখক হিসেবে এই উপন্যাসে রমেশচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতেই তিনি পাঠক হৃদয়ে সমাদৃত হন।

রমেশচন্দ্র দত্ত সামাজিক উপন্যাস রচয়িতা হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাকারী হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অধিকতর গুরুত্বের অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বিপুল প্রতিভা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর একক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছে। সাহিত্যের বৈচিত্র্যধর্মী শাখা-প্রশাখায় তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার স্বচ্ছন্দ বিকাশ ঘটেছিল। একমাত্র মহাকাব্য ব্যতীত সাহিত্যের অপরাপর সকল ক্ষেত্রেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ ছিল এবং সর্বত্রই তাঁর কৃতিত্ব তুলনাহীন।

বাংলা উপন্যাসের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা তাঁর অপরাপর সাহিত্যকৃতির মতই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন সহকারে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস একদিকে যেমন কাব্যসৌন্দর্যসমৃদ্ধ, সুকুমার কবিকল্পনা ও কবিসুলভ সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতিতে মনোজ্ঞ ও রমণীয় হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি সেসব তীক্ষ্ণ মননশক্তি ও জটিল মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যার আলোচনায় আধুনিক যুগের নিগূঢ় অভিজ্ঞতার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বাংলা উপন্যাসের নতুনতর ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর বিবর্তনের সূচনা করে। শুধু উপন্যাস নয়, সাহিত্যের প্রায় সব ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্টির বিরাজমান ধারাকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সে অনুসরণ কখনই গতানুগতিক ছিল না এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা স্বকীয় গৌরবোজ্জ্বল অবদানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের আগেও উপন্যাস রচিত হয়েছে এবং তাঁর পরেও উপন্যাস রচনার ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অবদান স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সমসাময়িক সাহিত্যের আঙিনায় বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে তাঁর 'চোখের বালি' আর 'নৌকাডুবি' উপন্যাস দুটি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ভিত্তি সুদৃঢ় করে স্থাপন করেছিলেন বলে তাঁর সাধনার পরিবেশ জটিলতর ছিল। তিনি বঙ্কিম প্রবর্তিত আদর্শবাদের ধারাটি অনুসরণ না করে বাস্তবতার প্রবর্তনে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথই প্রতিভার পূর্বজ্ঞান বলে বঙ্কিমপ্রবর্তিত উপন্যাসের ধ্বংসোন্মুখতা উপলব্ধি করিয়া উপন্যাসের ভিত্তিকে রোমান্স ও ইতিহাসের চোরাবালি হইতে সরাইয়া বাস্তব জীবনের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাহাকে অসাধারণের অনুসন্ধান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া প্রাত্যহিক জীবনের সূক্ষ্ম রসপূর্ণ বিশ্লেষণের কাজে লাগাইয়াছেন।' প্রথম দিকের উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঘটনার প্রাচুর্য এবং শেষ দিকের রচনায় চরিত্র বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ঘটনানির্ভর ঔপন্যাসিক পদ্ধতি তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৃতীয় উপন্যাস 'চোখের বালি' থেকেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকৃত যাত্রার সূচনা।

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী উপন্যাসে ঘটনার প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। ব্যক্তি ও ঘটনার পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উপন্যাসের গতি ছিল নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দুটি উপন্যাসে সে বৈশিষ্ট্যের কিছু অনুসরণ করলেও 'চোখের বালি' উপন্যাস থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চোখের বালি'র ভূমিকায় মন্তব্য রেখেছেন, 'সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাঁদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল 'চোখের বালিতে।'

রবীন্দ্রনাথের মানুষ মনোময় নয়, দেহময় নয়, অন্নময় নয়—এমন কি মানুষ আত্মা-সর্বস্বও নয়। কোন নাম-উপাধির আবরণে মানুষকে খণ্ড করে দেখা তাঁর শিল্পী স্বভাবে ছিল না। তিনি অখণ্ড মানুষকে উপন্যাসে বিধৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে কেটে নিয়ে তা থেকে একটা টুকরার ওপরে উপন্যাসের শিল্পকর্মকে দাঁড় করান নি। তাই তাঁর নায়ক-নায়িকা পরিকল্পনা গতানুগতিকতা রহিত এবং তা স্বতন্ত্র পদ্ধতির। চোখের বালি, গোরা, চতুরঙ্গ ও যোগাযোগ এই চারটি প্রধান উপন্যাসে এ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মিলবে।

রবীন্দ্রনাথ রচিত উপন্যাসের সংখ্যা মোট বার। সেগুলো হল : বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), রাজর্ষি (১৮৮৭), চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬), গোরা(১৯০৯), ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৩) ও চার অধ্যায় (১৯৩৪)।

বাংলা সার্থক উপন্যাসের সূত্রপাতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের উপকরণের যে সহায়তা অবলম্বন করেছিলেন তা প্রাথমিক অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনের উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' আত্মরক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু এগুলো ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত হলেও ইতিহাসের বিচিত্র ও বর্ণবহুল শোভাযাত্রা তখনকার এই নবীন ঔপন্যাসিকের মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে অসংখ্য উপকাহিনির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। 'রাজর্ষি' উপন্যাসেও গোবিন্দমাণিক্য-রঘুপতির কাহিনির সঙ্গে অজস্র কাহিনি স্থান পেয়েছে। এই পর্যায়ে ইতিহাসের আলোড়নের মধ্যে শান্তির নিবিড় আনন্দরসে মগ্ন হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিজীবনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণই মুখ্য ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন। তাই এসব ক্ষেত্রে কবিমানসের পরিচয়ই বেশি ফুটে উঠেছে। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রথম যুগের গল্পপ্রধান উপন্যাস।

'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী যুগের উপন্যাস। এগুলোতে ঘটনার সঙ্গে মানবমনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার রহস্য নির্ধারণের প্রতি লেখক ছিলেন বিশেষ মনোযোগী। এসব উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণের স্বরূপ পর্যালোচনায় লক্ষ করা যাবে যে, তিনি অখণ্ড মানুষকে উপন্যাসে ধারণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। মানুষের এই পরিচয় ফুটিয়ে তোলার জন্য ঘটনার ঘনঘটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না, বরং খুব সাধারণ ঘটনার মাধ্যমেই চরিত্রকে স্পষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। সামাজিক উপন্যাসের সূক্ষ্ম বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, ঘটনাবিন্যাস আর চরিত্র বিশ্লেষণে অনন্যপূর্ব গভীরতা ও কৌশলের নিদর্শন পাওয়া যায় 'চোখের বালি' উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চোখের বালি' উপন্যাস রচনা করে বাংলা উপন্যাসকে নতুন খাতে প্রবাহিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত উপন্যাসের ধারাটি যে দীর্ঘ অনুসরণের উপযোগী নয় এবং বাংলা উপন্যাসকে গতিশীল করার যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা 'চোখের বালি' উপন্যাস থেকেই প্রথম অনুধাবন করা সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'চোখের বালি' রবীন্দ্রনাথের প্রথম শক্তিমান সৃষ্টি। এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সমাজের পাত্রপাত্রীকে ব্যবহার করলেন। এই

উপন্যাসেই তিনি প্রথম কাহিনির ভার পরিহার করে ব্যক্তিত্বের ফলস্বরূপ নানা সংকটকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে ব্যবহার করলেন। এই উপন্যাসেই তাঁর শক্তি ও শক্তির সীমা দুয়েরই আভাস পাওয়া গেল। অথচ এর জন্য রবীন্দ্রনাথকে আগাগোড়া নতুন হতে হয় নি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসিকতম লেখাও নয় চোখের বালি। সেদিক দিয়ে বরঞ্চ 'নষ্টনীড়' অনেক সাহসিক পদক্ষেপ। তথাপি চোখের বালিতেই জানা গেল রবীন্দ্রনাথ আর 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি' লিখবেন না। জানা গেল যে বাংলা উপন্যাসের তখনও পর্যন্ত প্রচলিত ছক ভেঙে তিনি এবার এগোবেন।' এই উপন্যাস থেকে যে নতুন আদর্শের প্রবর্তন হয় তা আজ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে অনুসৃত হচ্ছে। মহেন্দ্রের সঙ্গে বালবিধবা বিনোদিনীর আকর্ষণলীলার প্রকাশের মাধ্যমে 'চোখের বালি' উপন্যাস গতানুগতিকতারহিত বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে নৈতিক বিচার অপেক্ষা তথ্যানুসন্ধান ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকেই বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ। এখানে বর্ণিত প্রেম সমাজ বিগর্হিত—কিন্তু তাকে নীতির দ্বারা পরিমাপ করা হয় নি। মানসিক অনুভূতির ক্রমপরিণতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এতে পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবতার পরিবেশে নরনারীর মনোভাব বিশ্লেষণই এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। তিনি কুশলী শিল্পীর মত প্রতিটি নরনারীর প্রতিটি পদক্ষেপের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শের ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচ্য। সমালোচকের মতে, 'বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের চরিত্রসৃষ্টিতে প্রথম মৌলিক পার্থক্য সামাজিক আদর্শবাদ প্রচারে। বঙ্কিম পাপকর্মের ফলস্বরূপ রোহিণীকে অপমৃত্যু দান করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ বিধবার এই প্রেমকে পাপ বলে ভর্ৎসনা করেন নি। তিনি দেখিয়েছেন সংসারে এটা হওয়া উচিত না হলেও এটা হয়, বিধবারও মন আছে, সে মনও অন্যের ভালবাসার জন্য কাঙালি হয়, আর ভালবাসতেও চায়। এই পাপের প্রতি পক্ষপাতশূন্যতাই রবীন্দ্রনাথকে বঙ্কিম থেকে অনেকখানি পৃথক করেছে।' ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'চোখের বালি' বাংলা উপন্যাসের এক নতুন দিগন্ত কেবল এই কারণে নয় যে, এখান থেকেই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার সার্থক সূচনা; তার চেয়েও বড় কথা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক—'আধুনিক' বাঙালির সমাজ-বিচ্ছিন্নতা ততদিনে নিঃসমাজ ব্যক্তিত্বের গভীর হতে সমাজ-চেতনা-বিচ্ছুরিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এক নতুন মাত্রান্বিত জীবন-বলয় গড়ে তুলেছে। সেই নতুন জীবনকে চিনে, তারই হাত ধরে, চালিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসকে এক নতুন খাতে।' চোখের বালির মত নৌকাডুবিকেও রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নতুন ধরনের বাস্তবতাপ্রধান উপন্যাস বলে অভিহিত করা যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথ চরিত্র বিশ্লেষণ অপেক্ষা ঘটনাবৈচিত্র্যের প্রতিই অধিক দৃষ্টি দিয়েছেন। রমেশ ও কমলার ভুল পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে এই উপন্যাসের কাহিনি রূপায়িত হয়েছে।

'গোরা' উপন্যাসখানি প্রসার ও পরিধির দিক দিয়েই শুধু নয়, বিবিধ বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে আছে। এর গল্পের সীমারেখায় পাত্রপাত্রীদের পদক্ষেপের তালে তালে বহুবিধ আলোড়ন আর আন্দোলনের ঝঙ্কার বেজে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে প্রথমবারের মত রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক পটভূমিকার মধ্যে আখ্যায়িকার সন্নিবেশ করেছেন। অনাথ আইরিশ

গোরা নিজের প্রকৃত পরিচয় অবগত না হয়ে হিন্দু হিসেবে নিজেকে মনে করে এবং হিন্দুসমাজ রক্ষণে আত্মনিয়োগ করে। তার সামাজিকতা হিন্দুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত—মহাকল্যাণের ওপর নয়। পরে নিজের প্রকৃত পরিচয় অবগত হয়ে মতের পরিবর্তন ঘটালে ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি তার আপন হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে একটি বিশেষ যুগের সন্ধিক্ষণের ব্যাপক বিক্ষোভ আলোড়ন, দেশাত্মবোধের পরম স্ফুরণের চাঞ্চল্য, ধর্মবিপ্লবের সমস্ত একাগ্রতা ও উদ্দীপনা এই উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে। ধর্মের ব্যাপারে সনাতন ও নব্যপন্থী, রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী এই উভয়বিধ মনোবৃত্তি এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর কথাবার্তায় পরিস্ফুট।

রবীন্দ্র প্রতিভার শেষ যুগের উপন্যাস 'ঘরে বাইরে'। এই পর্যায়ে ঘটনা অপেক্ষা ভাবের মূল্য বেশি। শেষ যুগের উপন্যাসের মধ্যে 'ঘরে বাইরে' আর 'চতুরঙ্গ' এক বিশেষ আঙ্গিকে রচিত। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত সমস্যাটি এই ক্ষেত্রে আলোচনায় ভাবগভীরতা পায় নি, পক্ষান্তরে একান্তভাবে লঘু দ্রুতসঞ্চারী চটুলতার রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। জ্যাঠামশায়, শচীন, দামিনী ও শ্রীবিলাস—এই চারটি চরিত্র চতুরঙ্গ উপন্যাসের ভিত্তি। চতুরঙ্গে নায়কনায়িকার পরিবর্তনের বাহুল্য বুদ্বুদের ক্ষণিকতা নিয়ে জীবনে রূপায়িত হয়েছে; আর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রাজনৈতিক মতবাদের লীলাচাঞ্চল্য ফুটে উঠেছে। রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক এই দুই বিষয়াবলম্বনে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি রচিত। বিমলা, নিখিলেশ, সন্দ্বীপ প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে এর কাহিনির রূপায়ণ ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলাদেশে জাতীয় উন্মাদনার যে মত্ততা স্থির বিচারদৃষ্টিকে আবিল এবং ধ্রুব কল্যাণবুদ্ধিকে বিচলিত করেছিল, তারই বিচার এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে ভাবগত ঐক্যের নিবিড়তা না পেলেও হৃদয়ধর্মের সঙ্গে সমাজের সংঘাত ও মানবমনের পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তিগুলোর অশ্রান্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে জীবনে যে নিষ্ঠুর ট্যাজেডির রূপ ফুটে ওঠে তারই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। উপন্যাসটিতে দাম্পত্য সম্পর্কে বিসদৃশতা দেখান হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক মধুসূদন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও নির্মম শাসন শৃঙ্খলার প্রয়োগে বড় মানুষ হয়ে এই লৌহকঠিন মনোবৃত্তি দাম্পত্যজীবনের সম্প্রসারিত করতে চেয়েছে। তার স্ত্রী কুমুদিনী স্ত্রীর প্রাপ্য স্বাধীনতা এবং ন্যায্য অধিকারের দাবিতে শেষ পর্যন্ত পতিগৃহ ত্যাগ করেছে। অবশেষে সন্তানসম্ভাবিতা জেনে কমুদিনী স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এই উপন্যাসে সন্তানস্নেহ আত্মসম্মানবোধকে অভিভূত করেছে।

রবীন্দ্রজীবনের শেষ পর্যায়ের উপন্যাস 'শেষের কবিতা', 'মালঞ্চ', 'দুইবোন' প্রভৃতি প্রধানত গীতিধর্মী উপন্যাস। শেষের কবিতা উপন্যাসটি সমন্বয়সুষমা ও কবিত্বমণ্ডিত বিশ্লেষণশক্তির দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাসগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দাবি করতে পারে। বিষয়ের ঐক্য ও আলোচনার সমগ্রতায়, অবান্তর বস্তুর প্রায় সম্পূর্ণ বর্জনে অন্যান্য উপন্যাস থেকে 'শেষের কবিতা' যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছে। কোন পুরুষ বা নারীর পক্ষে এক সঙ্গে দু জনকে অবিরোধে ভালবাসা সম্ভব এবং সে ভালবাসা এক পাত্রসম্পর্কিত (স্বামী বা স্ত্রী), অপর পাত্র নিঃসম্পর্ক হতে পারে—এটিই শেষের কবিতা উপন্যাসের আখ্যানবস্তুর ভাববীজ। এখানে লাবণ্য-অমিতরায়-কেতকী-শোভনলালের চরিত্রের মাধ্যমে প্রেমের বিচিত্র বিকাশ দেখানো হয়েছে। 'শেষের

কবিতা' উপন্যাসের ভাষা যে কেবল কবিত্বময় তা নয়, উপন্যাসের বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য অনেক কবিতাও ব্যবহার করা হয়েছে। উপন্যাসের কাঠামোগত এই অভিনবত্ব রবীন্দ্রনাথ খুব সার্থকতা সহকারে এ উপন্যাসে রূপায়িত করে তুলেছেন।

ক্ষুদ্রতর উপন্যাস 'দুই বোন'-এ পুরুষের ওপর মাতৃজাতীয়া ও প্রিয়াজাতীয়া স্ত্রীলোকের প্রভাবের পার্থক্য উপজীব্য। শর্মিলা ও ঊর্মিমালা দুই ভগ্নী নারীর মাতৃত্ব ও প্রেয়সীত্বের প্রতীকরূপে পরিকল্পিত। 'মালঞ্চ' উপন্যাসে মৃত্যুশয্যাশায়িনী নীরজার ঈর্ষাবিকার, প্রতিদ্বন্দ্বিনীর বিরুদ্ধে স্বামীপ্রেম এবং ফুলবাগানের ওপর তার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

'চার অধ্যায়' উপন্যাসও ঘরে বাইরের মত রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্বদেশি আন্দোলনের অঙ্গীভূত একটি বিশেষ প্রচেষ্টা—বিপ্লববাদ এতে আলোচিত হয়েছে। দেশের কাজ যত মহতই হোক না কেন তাতে যদি মানুষের আত্মপ্রসার বাধাগ্রস্ত হয় এবং আত্মমর্যাদা বিনষ্ট হয় তবে ব্যক্তিজীবনের পক্ষে তা নিতান্ত অমঙ্গলজনক। মহৎ ব্যক্তিজীবনের মূল্য সবার ওপরে। এটাই 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের মর্মকথা।

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভা যা স্পর্শ করেছে তাই হয়ে উঠেছে দ্যুতিমান—প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে বাংলা উপন্যাসের পরিবেশ। মানবজীবনের নির্জনতায় তাঁর ছাড়পত্র, সৌন্দর্যপ্রিয় কবিপ্রকৃতিই তাঁর বলিষ্ঠ প্রকাশ। তাই তাঁর উপন্যাসের আঙিনায় সবকিছুর ফাঁকে একটু অসাধারণত্বের ছোঁয়াচ রয়ে গেছে। কিন্তু চরিত্রসৃষ্টি আর প্রকাশভঙ্গিতে অপরূপ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করে যে মনস্তত্ত্বমূলক কথাসাহিত্যের ধারা প্রবর্তন করলেন সেখানেই রবীন্দ্রনাথ অমর হয়ে আছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যেখানে শেষ হতে যাচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের সেখানে আরম্ভ, আর শরৎচন্দ্রের সেখান থেকেই অনুসরণ। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি। রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভার যে স্বাতন্ত্র্য ও ব্যাপকতা তাঁকে তুলনারহিত করে রেখেছে সে সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত, 'তাঁর বাকসম্পদের অনুকারী অনেক, তাঁর নায়ক-নায়িকাদের মত ভঙ্গিও অনেক, কিন্তু এগুলোকে বাদ দিয়েও যা থাকলে বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রসাধনা সম্পূর্ণ হত, নেই সেই বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত গরীয়ান উত্তরাধিকার।'

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাপক প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সৃষ্টি হয়—তাকে এক কথায় 'রবীন্দ্রযুগ' বলে অভিহিত করা চলে। রবীন্দ্রনাথের মত ও পথ অনুসরণে সাহিত্য সৃষ্টি করা এই যুগে তাঁর অনুসারীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই অনুসারীগণের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৮৩-১৯৩২) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে গুরুত্বের অধিকারী। বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর বিশেষত্ব এবং এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে তিনি স্বীকৃতি না জানিয়ে পারেন নি। প্রধানত উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ হলেও তিনি অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ছোটগল্প রচনায়।

প্রভাতকুমার রচিত উপন্যাসগুলোর নাম হল : রমাসুন্দরী (১৯০৮), নবীন সন্ন্যাসী (১৯১২), রত্নদীপ (১৯১৫), জীবনের মূল্য (১৯১৭), সিঁদুর কৌটা (১৯১৯), মনের মানুষ (১৯২২), সত্যবালা (১৯২৫), সতীর পতি (১৯২৮) ইত্যাদি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসগুলোতে যে সব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে তাতে তাঁর পক্ষে জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভবপর হলেও প্রথম শ্রেণির ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্ধারণ করা চলে না। তাঁর উপন্যাসে গভীর আবেগের চিত্র অথবা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ কুশলতার পরিচয় অনুপস্থিত। মানবজীবনের কোন জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত হয় নি। লঘু হাস্যতরল ভাবকল্পনা, জীবনের সরল স্বচ্ছন্দ বিকাশ, শেষ পর্যন্ত অনুকূল দৈবদাক্ষিণ্যে সমস্ত অল্পস্থায়ী দুর্ভাগ্যের মধুর অবসান, ঘটনার একটানা প্রবাহ—এগুলো প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপকতর— স্বদেশ ও বিদেশের বহু বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তাঁর সংযোগসাধন সম্ভব হয়েছিল। সেই সমস্ত পরিচয়ের সফল চিত্র তাঁর উপন্যাসে বিদ্যমান। কিন্তু জীবনের কোন প্রকার গভীরতর রহস্য উদ্ঘাটন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সাধারণত দেবনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়হীন ও নমনীয় মনোভাবসম্পন্ন বাঙালির জীবনচিত্রই তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য।

মানবজীবনকে গভীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করার মত ক্ষমতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে ছিল না বলে তাঁর উপন্যাসে শিল্পচাতুর্য ফুটে উঠতে পারে নি। চরিত্র অনুসারে ধারাবাহিকতা এবং চরিত্রের দিক দিয়ে ঘটনার নিয়ন্ত্রণ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ তাঁর উপন্যাসে অবর্তমান বলে সেসব উচ্চ শ্রেণির উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পায় নি। অসংখ্য ঘটনার সংস্থাপনা, বিচিত্র ভূমিকার সমাবেশ, রোমান্টিক প্লট, চিত্রবহুল কাহিনি, চমকপ্রদ ঘটনা—এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রভাতকুমারের উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর উপন্যাসের পাতায় যে জীবনযাত্রার সন্ধান পাওয়া যায়, তার লঘু তরল প্রবাহ, সরল নির্দোষ হাস্যপরিহাস, সমস্যাভারমুক্ত স্বচ্ছন্দগতি সহজেই পাঠককে বিমুগ্ধ করে। ফলে জীবনের যে আর একটা জটিল ও দুর্ভেদ্য সমস্যাসঙ্কুল দিক আছে তা পাঠকেরা সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হয়।

গঠনশিল্পের দিক থেকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উপন্যাসে যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করতে না পারলেও তার ছোটগল্পগুলোতে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেন। একান্ত আকস্মিকতা সহকারে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর সগৌরব আবির্ভাব এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর পক্ষে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভবপর হয়েছিল। নিষিদ্ধ সমাজ বিগর্হিত প্রেমানুভূতির বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র যে অপরিসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তিনি বাঙালিসুলভ সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি অতিক্রম করে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় সংযোগসাধন করেছিলেন। সিদ্ধহস্ত জীবনরসিক হিসেবে তিনি বাঙালি জীবনের উপেক্ষিত বৈশিষ্ট্য চিত্রিত করেছেন তাঁর

উপন্যাসে। তাঁর প্রতিভার প্রধান শক্তি হল জীবনপ্রেম ও মানবিক অনুভূতি এবং মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা তাঁর উপন্যাসে সহজ সরল ভাবে রূপ লাভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। বাল্যকাল থেকে তাঁর সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত হলেও রচনার প্রকাশ সে সময়ে হয় নি। তাঁর পূর্বপুরুষদের রক্তধারার মধ্যে বৈরাগ্যভাব বর্তমান ছিল, তাঁর মধ্যেও সে সন্ন্যাসী মনোবৃত্তির পরিচয় লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এর ফলে জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি সন্ন্যাসীবেশে ভারতের বহুস্থান পর্যটন করেন। চাকরির উদ্দেশ্যে ১৯০৩ সালে শরৎচন্দ্র বার্মা বা বর্তমান মায়ানমার যান। সেখানে থাকাকালীন তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মন্দির' (১৯০৫) এক আত্মীয়ের নামে কুন্তলীন গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়। তাঁর দ্বিতীয় গল্প 'বড়দিদি' ভারতী নামক সে আমলের প্রখ্যাত সাহিত্য পত্রিকায় ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর কিছুকাল পর থেকে বাংলা সাহিত্যকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অজস্র দানে সমৃদ্ধ করতে থাকেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সাধনাকেই জীবনের একমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। লেখালেখি করার উদ্দেশ্যেই তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং কলকাতার উপকণ্ঠে নির্মিত বাসস্থানে অকৃতদার জীবনযাপন করে কথাশিল্পী হিসেবে সৃষ্টিমুখর হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : বড়দিদি(১৯১৩), বিরাজবৌ, (১৯১৪), বিন্দুর ছেলে (১৯১৪), পরিণীতা (১৯১৪), পণ্ডিতমশাই (১৯১৪), মেজদিদি (১৯১৫), পল্লীসমাজ (১৯১৬) চন্দ্রনাথ (১৯১৬), বৈকুণ্ঠের উইল(১৯১৬), অরক্ষণীয়া (১৯১৬), শ্রীকান্ত, (প্রথম পর্ব ১৯১৭, দ্বিতীয় পর্ব ১৯১৮, তৃতীয় পর্ব ১৯২৭, চতুর্থ পর্ব ১৯৩৩), দেবদাস (১৯১৭), নিষ্কৃতি (১৯১৭), কাশীনাথ(১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), স্বামী (১৯১৮), দত্তা (১৯১৮), ছবি (১৯২০), গৃহদাহ(১৯২০), দেনাপাওনা (১৯২৩), পথের দাবী (১৯২৬), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১), বিপ্রদাস(১৯৩৫) ইত্যাদি।

বাংলা উপন্যাসের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চোখের বালি' উপন্যাস, 'নষ্টনীড়' গল্প প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে সমাজচেতনার অভিনব রীতির যে পরিচয় দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে তারই বিকাশ ঘটেছে। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসসৃষ্টির যে বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় শরৎচন্দ্র তারই অনুসরণ করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়েছেন। বরং বলা যায়, উপন্যাসের ক্ষেত্রে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করে গতানুগতিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন অভিনব পথের পথিকৃত হিসেবে শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের পথরেখা থেকে শরৎচন্দ্র সরে দাঁড়িয়েছিলেন, কারণ বর্তমানের সমস্যাজর্জর জীবনে অতীতের গৌরবকাহিনি কোন আবেদনের সৃষ্টি করতে পারে না বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসগুলোতে মানবমনকে সামাজিক আদর্শের অনুবর্তী করে রূপায়িত করেছেন; কারণ সেই বিশেষ আদর্শের প্রাণশক্তি ও কল্যাণময় প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়। মানবমন থেকে অবৈধ প্রবৃত্তির দমন এবং বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন—হিন্দুধর্মের এই শ্রেষ্ঠ সাধনা বঙ্কিমচন্দ্রের

বিপরীতধর্মী মতে আস্থাশীল। শরৎচন্দ্র যে নতুন সমাজনীতি অনুসরণ করেছিলেন তাতে আত্মঘাতী পাপীর প্রতিও সহানুভূতি ছিল। তাঁর মতে পাপীর মধ্যেও যদি সদগুণ থাকে তবে তা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে, অবস্থাচক্রে যে অসতী তারও চরিত্রগৌরব ও সতীত্ব মর্যাদা স্বীকার করতে হবে। তিনি সমাজকে মনে করেছেন ব্যক্তি জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণের প্রেরণাদাতা হিসেবে। শরৎচন্দ্র এদেশের পরিবার জীবনে সাধারণ আবেগ ও বৃত্তি সম্বন্ধে এক আশ্চর্য সূক্ষ্ম সত্যানুভূতি উপলব্ধি করে তাঁর উপন্যাসে তা স্থান দিয়েছেন। মানব মনের বিচিত্র অনুভূতি যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সহকারে প্রকাশ পেতে পারে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তারই নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস শরৎচন্দ্রের ওপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্বন্ধে সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'যে সমস্ত নারী চরিত্রের সৃজনকর্তা হিসেবে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বাংলা সাহিত্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়ে থাকে তারা সকলেই হয় বিনোদিনীর ভগ্নাংশ, আর নয় বিনোদিনীর কাঠামোয় অন্য শরীরের রূপান্তর।'

শরৎচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মৌলসত্তাকে আলোকিত করার জন্য নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন। মনে রাখা দরকার, ব্যক্তিমানসের দ্বিধাদীর্ণতাই উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমকে উপলব্ধি করার প্রধান সূত্র। প্রেমের নিবিড়তা দেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে নিষিদ্ধ প্রেম আসে না। বিভিন্ন সম্পর্ক, সমস্যা, পরিবেশের চাপে ব্যক্তিমানসের যে স্বরূপ প্রকাশ পায় নিষিদ্ধ প্রেম তা পরিস্ফুটনে সহায়ক। তাই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়টিকে তাঁর উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছেন।

প্রেমের বিচিত্র রহস্য উদঘাটনে শরৎচন্দ্র যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। বাঙালি জীবনের সঙ্কীর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটন করা যে ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত ছিল, শরৎচন্দ্রের হাতে তা প্রকাশের অপূর্ব সুযোগ লাভ করে। তাই তাঁর উপন্যাসের প্রেমকাহিনিগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে স্বাভাবিকতা বর্তমান। বাঙালি সমাজের একটি অবহেলিত দিক—নারীজাতির দুঃখ দুর্দশা শরৎচন্দ্রের মনে প্রবল বেদনাবোধের সৃষ্টি করেছিল। এর ফলেই তাঁর উপন্যাসে নারীজীবনের বিবিধ বৈশিষ্ট্য পরম সার্থকতা সহকারে রূপায়িত হয়েছে। নারীহৃদয়ের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় প্রেমের ক্ষেত্রে। ভালবাসার আকর্ষণ প্রবলতর, প্রত্যাখ্যান দুর্বার—উভয়ের প্রবল দ্বন্দ্ব নারীহৃদয়ে গভীরতর ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে। 'দেবদাস' উপন্যাসের পার্বতী, 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের ষোড়শী, 'বড়দিদি'র মাধবী—প্রভৃতি নারী চরিত্রের হৃদয়ের প্রবৃত্তির সঙ্গে সমাজ ও প্রচলিত সংস্কারের দ্বন্দ্বই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। কেবল দেহধর্মগত নীতিবোধ মেনে চললেই চরিত্রবান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া যায়, শরৎচন্দ্র একথা মোটেই বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁর মতানুসারে দেহধর্মকে কেন্দ্র করে নীতিবোধের প্রাধান্য লাভকেই সতীত্বের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করা চলে না। তাঁর দৃষ্টিতে প্রেম সতীত্বের চেয়েও মহত্তর। শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসে এই মতবাদের সমর্থন মিলে। এ ধরনের বাস্তবপ্রিয়তা, গভীর সমাজ সচেতনতা এবং ব্যাপক মনস্তত্ত্বজ্ঞান ভিত্তি করে গড়ে ওঠার জন্য তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো জীবন্ত বলে প্রতীয়মান হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্রগুলো বাঙালির চিরপরিচিত পরিবেশ থেকে সংগৃহীত বলে তা পাঠকের কাছে একান্ত আপনজন হিসেবে

মর্যাদা পেয়েছে। বাঙালি জনজীবনের নিস্তরঙ্গ অঙ্গনে কত বিপুল রহস্য যে লুকিয়ে ছিল শরৎচন্দ্র তাঁর চরিত্রচিত্রণে উপভোগ্য রূপে উপস্থাপন করেছেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলোর মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক হিসেবে বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাস তিনটি। এই উপন্যাস কয়টিতে শরৎচন্দ্র এমন এক প্রকার প্রেমের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন যাকে সমাজবিগর্হিত বা সমাজ অননুমোদিত বলা চলে। অবশ্য এদেশের সমাজের দৃষ্টিতে তা সমর্থনযোগ্য না হলেও মানবমানবীর হৃদয়ের প্রবৃত্তি হিসেবে তাকে নিষিদ্ধ বলা চলে কিনা তা-ই শরৎচন্দ্র এই পর্যায়ে ব্যক্ত করেছেন। মানুষের মনোবৃত্তি সকল সময়ে সমাজের বিধিনিষেধ মেনে চলে না—মানুষের বিচিত্র মন নিজস্ব পথরেখা ধরে অগ্রসর হয়ে থাকে। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সতীশ-সাবিত্রীর প্রেমলীলা প্রাধান্য লাভ করলেও, উপেন্দ্র-দিবাকর-কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও প্রকাশমান। এদের চরিত্রের মাধ্যমে সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্রাঙ্কন করে কী অবস্থায় তা সংঘটিত হয়েছে তা নিপুণ ভাবে বিবৃত করেছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পাঠকের স্বাধীন বিচারের সুযোগ দিয়েছেন। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'চরিত্রহীন বঙ্গ-উপন্যাস-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—ইহার পাতায় পাতায় জীবনসমস্যার যে আলোচনা, যে গভীর অভিজ্ঞতা, যে স্নিগ্ধ উদার সহানুভূতি ছড়ান রহিয়াছে, তাহা আমাদের নৈতিক ও সামাজিক বিচারবুদ্ধির একটা চিরন্তন পরিবর্তন সাধন করে।'

'গৃহদাহ' উপন্যাসের মধ্যেও এমনি এক সমাজবহির্ভূত প্রেমের চিত্র চমৎকার ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। নিজের স্বামী মহিম এবং স্বামীর বন্ধু সুরেশের প্রতি নায়িকা অচলার যে দোলাচল মনোবৃত্তি তাই এই উপন্যাসটির আলোচ্য বিষয়। অচলা স্বামীকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিল, কিন্তু সুরেশকেও দূরে ঠেলে দেওয়া তার পক্ষে মোটেই সম্ভব হয় নি। স্বামীগৃহ ত্যাগ করে সে সুরেশের সঙ্গে চলে গিয়ে গতানুগতিক সামাজিক আদর্শে চরম আঘাত হানে। দিগদর্শন যন্ত্রের কাঁটার মত স্ত্রীর মন অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামীর দিকেই যে ফিরে থাকতে পারে না, বাস্তব জীবনের অবস্থা বিশেষে অন্যের প্রতি মন যেমন আকৃষ্ট হতে পারে—তাই এ উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মধ্যেও একই বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ ঘটেছে। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের যে প্রেমের সম্পর্ক তা সব সময় সামাজিক আদর্শের অনুসারী ছিল না। অসংখ্য কাহিনি ও চরিত্র এতে সন্নিবেশিত হয়েছে বলে উপন্যাসের নিবিড় ঐক্য এতে নেই। কিন্তু দৃশ্যাবলীর অসাধারণ বৈচিত্র্যে তা অনবদ্য। উপন্যাসটি লেখকের আত্মকাহিনির মত। শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শন উপরোক্ত উপন্যাস তিনটির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। সমাজের প্রেমের চিত্র সহানুভূতি সহকারে অঙ্কন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র সমসাময়িক উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন তারই সাক্ষ্য বহন করছে এই সব উপন্যাস।

শরৎচন্দ্রের কতগুলো উপন্যাসে প্রেমবর্জিত পারিবারিক বিরোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পরিবারের অন্তর্গত কতিপয় মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধের কৌতুকপূর্ণ কাহিনি এগুলোর উপজীব্য। প্রেমবর্জিত এসব কাহিনিতে প্রধানত ভ্রাতৃবিরোধ ও মাতৃস্নেহ স্থান পেয়েছে। 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি', 'মামলার ফল', 'নিষ্কৃতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'একাদশী বৈরাগী' প্রভৃতি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পরিবারভিত্তিক কতগুলো উপন্যাসে নরনারীর স্বাভাবিক প্রেমের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সম্পূর্ণ সাধারণ সামাজিক বিধিনিষেধের অনুবর্তী এই সব প্রেম শরৎচন্দ্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নয়। 'চন্দ্রনাথ', 'পণ্ডিতমশাই', 'দেবদাস', 'বড়দিদি', 'কাশীনাথ', 'বিরাজ বৌ', 'স্বামী', 'পরিণীতা', 'অরক্ষণীয়া', 'শুভদা', 'বামুনের মেয়ে', 'দেনাপাওনা' প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। সাধারণ অবস্থায় মানবমনে প্রেমের বিচিত্র লীলাখেলার প্রকাশই এই উপন্যাসগুলোকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

সমাজ-সমালোচনামূলক উপন্যাস হিসেবে 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে', 'পল্লী সমাজ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমাজে অনুষ্ঠিত অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে এসব উপন্যাসে। সমাজের নিষ্ঠুরতার জন্য স্বাভাবিক প্রেমের বিকাশ ব্যাহত হওয়ার চিত্রও এগুলোতে দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম চাঞ্চল্যকর উপন্যাস।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'বস্তুতপক্ষে যখন বাংলা উপন্যাস-পাঠক সমাজ পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবল জিজ্ঞাসা সে বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলীর অ্যাভারেজ অংশকে স্পর্শ করতে পারছে না, অথচ তখনও তিরিশের যুগে রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকারকে নানাভাবে গ্রহণ করে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের বিস্তার ও গভীরতার সূচনা হয় নি এই রকম ধরনের অবস্থায়, দুই অঙ্কের মাঝখানে বিরতির সময়টুকুতে শরৎচন্দ্র বাঙালি পাঠকমণ্ডলীকে অধিকার করেছিলেন। মানুষের সম্বন্ধে গভীর ভালবাসার বোধ শরৎচন্দ্রের নৈতিক সম্পদ বলে, কোন জীবনদর্শন ব্যতিরেকেই, কোন গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় না দিয়েও শরৎচন্দ্র পাঠকের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হন নি। এ ভালবাসা কতকাংশে শিল্পমূল্যের প্রতিদান কতকাংশে শরৎচন্দ্রের করুণাময় মনের মূল্যশোধ।'

বাঙালি সমাজের পটভূমিকায় রচিত বলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। বাঙালি জীবনের সুখদুঃখ আনন্দ ব্যথাবেদনা এই সমস্ত উপন্যাসে চিত্রিত হয়ে বাঙালির মনের ভাবধারাকে সার্থকতা সহকারে প্রকাশ করেছে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের উপেক্ষিত মানুষের জীবন্ত ছবি অঙ্কনে শরৎচন্দ্র দরদী শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন। চিরাচরিত আদর্শের মাপকাঠিতে মানবমনের ভাবধারার বিচার না করে যে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল, তেমনি মানুষের নবমূল্যায়নের দিক থেকে তা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

শরৎচন্দ্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত জীবনরসিক। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বিরাজমান। ছোট ছোট পটে ব্যক্তিচরিত্রের অসামান্যতা পরিস্ফুটনে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। জীবনপ্রেম ও মানবিক অনুভূতি এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে। মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসাকে প্রধান উপাদান হিসেবে রূপায়িত করে শরৎচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে গৃহ ও সমাজের মধ্যে স্থাপন করেছেন। তাঁর অপরিসীম জনপ্রিয়তার পিছনে এই বৈশিষ্ট্য কাজ করেছে।

প্রাঞ্জলতা, সহজবোধ্যতা ও মাধুর্য শরৎচন্দ্রের ভাষার বৈশিষ্ট্য। গল্পরস সৃষ্টি করার একটা অপূর্ব দক্ষতা তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। রচনারীতির দিক থেকে শরৎচন্দ্রের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও তাঁর স্বকীয়তা সহজে স্বীকার্য। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহজ

সরল, কিন্তু আকর্ষণীয় ভাষায় তাঁর কাহিনি পরিবেশন করেছেন। রসের প্রাচুর্য থাকলে সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি যে কত আকর্ষণীয় হতে পারে তা তাঁর সমুদয় রচনায় সহজলভ্য।

শরৎচন্দ্র কিছু সংখ্যক ছোটগল্পও রচনা করেছিলেন। তবে এদের অধিকাংশই উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। 'মহেশ' নামক ছোটগল্পটির মধ্যে তিনি যথেষ্ট সার্থকতার পরিচয় দান করেছেন।

মহিলা ঔপন্যাসিক

বাংলা উপন্যাসের ধারায় মহিলা ঔপন্যাসিকগণের আগমন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচিত হতে পারে। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য প্রেমভালবাসার পরিস্ফুটনে নরনারী উভয়ের ভূমিকা থাকলেও পুরুষ ঔপন্যাসিকগণই নরনারীর উভয়েরই মনমানসিকতার চিত্র অঙ্কন করেন। অথচ নারী-হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্য উদঘাটনের ব্যাপারে মহিলা ঔপন্যাসিকের ভূমিকাই বেশি অর্থবহ হওয়ার কথা। কিন্তু পুরুষ-শাসিত সমাজব্যবস্থায় নারী সমাজের ওপর পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা, বিয়ের ব্যাপারে বণিকবৃত্তি, সামাজিক নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশের জন্য মহিলাদের বক্তব্য থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু পুরুষ ঔপন্যাসিকগণ এ ব্যাপারে নারীর পক্ষে কথা বলেছেন। মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচনায় বিদ্রোহের বাণী প্রকাশিত হলেও সেখানে করুণরসের প্রাধান্য ঘটেছে। তাঁরা নিজস্ব জীবন ও বাণীকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। তবে বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবারের বিলুপ্তি ঘটছে, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির দ্বার ক্রমে উন্মোচিত হচ্ছে—এই পরিস্থিতিতে সাহিত্যে নারীর আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা অনেকাংশে বাড়ছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

বাংলা সাহিত্যে মহিলা ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে প্রথমেই স্বর্ণকুমারী দেবী(১৮৫৫-১৯৩২) উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। দীর্ঘকাল বিখ্যাত সাহিত্য মাসিক 'ভারতী'র সম্পাদিকারূপে দায়িত্ব পালনে এবং কবিতা ও নাটক রচনায় খ্যাতিলাভ করলেও গল্পউপন্যাসের ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার সার্থক বিকাশ ঘটেছিল। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো ঐতিহাসিক ও সামাজিক—এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। পৃথিরাজ-সংযুক্তার কাহিনি অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) অল্প বয়সের রচনা বলে তাতে দক্ষতার পরিচয় দান সম্ভব হয় নি। 'ফুলের মালা' (১৮৯৪) উপন্যাসে বাংলাদেশে পাঠান রাজত্বকালীন দিনাজপুরের রাজবংশের সঙ্গে বঙ্গেশ্বরের এবং বঙ্গরাজ পরিবারের পিতাপুত্রের বিরোধ বর্ণিত হয়েছে। 'মিবার রাজ' (১৮৭৭) ও 'বিদ্রোহ'(১৮৯০) উপন্যাসদ্বয়ে রাজপুত ইতিহাসের কাহিনি স্থান পেয়েছে। এই সব ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় স্বর্ণকুমারী দেবী বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ না করে রমেশচন্দ্র দত্তের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসে কল্পনাবিস্তারের চেয়ে সত্যানুসন্ধিৎসা বেশি বিদ্যমান। তাঁর সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯) বাংলা রোমান্সের ক্ষেত্রে নতুনত্ব সৃষ্টি করে। 'মালতি' (১২৮৬) উপন্যাসেও সে বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান। হাজী মুহম্মদ মহসীনের জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত 'হুগলীর ইমামবাড়ী'

(১২৯৪) উপন্যাসটি রচিত। 'কাহাকে' (১৮৯৮) উপন্যাসে রোমান্টিক প্রেমকাহিনি স্থান পেয়েছে। 'স্নেহলতা' (১২৯৯) বাঙালি-সমাজের আধুনিকতার সমস্যা অবলম্বনে রচিত। 'বিচিত্র' (১৯২০), 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১) ও 'মিলনরাতি' (১৯২৫) উপন্যাসগুলো লেখিকার শেষ বয়সের রচনা।

অনুরূপা দেবী

স্বর্ণকুমারী দেবীর পর মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে অনুরূপা দেবীর (১৮৮১-১৯৫৮) নাম উল্লেখযোগ্য। 'ভারতী' সাহিত্য পত্রিকা কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ। 'পোষ্যপুত্র', 'জ্যোতিঃহারা', 'বাগদত্তা', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা', 'মা' প্রভৃতি পঁচিশখানিরও বেশি উপন্যাস তিনি রচনা করেছিলেন। গল্প ও নাটক রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। অনুরূপা দেবী ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার মাধ্যমে উনিশ শতকের ধারা অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। হিন্দুধর্মীয় সংস্কারকে তিনি গৌরবদানের সাধনা করেছিলেন। সেকারণে আধুনিক পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা তাঁর উপন্যাসে মর্যাদা পায় নি।

নিরূপমা দেবী

নিরূপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১) 'আলেয়া' গল্পগ্রন্থ, 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'দিদি', 'বিধিলিপি', 'শ্যামলী', 'বন্ধু', 'উচ্ছৃঙ্খল', 'পরের ছেলে' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে হিন্দু সংস্কার প্রাধান্য পেয়েছে। আবেগের অতিশয্য তাঁর উপন্যাসের জনপ্রিয়তার পেছনে কাজ করেছিল, শিল্পগত উৎকর্ষ সাধনে তাঁর তেমন কৃতিত্বের পরিচয় মিলে না।

ইন্দিরা দেবী

ইন্দিরা দেবী (১৮৮৯-১৯২২) অন্য একজন মহিলা ঔপন্যাসিক। 'নির্মাল্য', 'কেতকী', 'ফুলের তোড়া' তাঁর গল্পগ্রন্থ এবং 'সৌধরহস্য', 'স্পর্শমণি' তাঁর উপন্যাস।

সীতা দেবী

সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৭) ও শান্তা দেবী (১৮৯৬-১৯৮৪) উপন্যাসের বিষয়বস্তু, ভাষা ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনা ও মন্তব্য অভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেছেন বলে তাঁদের দু বোনের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। তাঁরা দুজন ছিলেন নারী-সমাজে আধুনিক মনোবৃত্তির উদ্গাতা। 'নারীমনের সন্তর্পণে ঘরোয়া আমেজটুকু তাঁদের অনাড়ম্বর কাহিনিধারাতে নতুন হৃদ্যতা সঞ্চার করেছিল।' তাঁদের দুজনের উপন্যাসেই নারীসমাজের আধুনিক মনোবৃত্তির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। সীতা দেবী 'পথিকবন্ধু', 'রজনীগন্ধা', 'পরভৃতিকা', 'বন্যা', 'মাতৃঋণ' ও 'জন্মস্বত্ব' এই কয়টি উপন্যাস এবং কতিপয় গল্প রচনা করেছিলেন। শান্তা দেবীর রচনা 'উষসী', 'স্মৃতির সৌরভ,' 'সিঁথির সিঁদুর', 'চিরন্তনী', 'জীবনদোলা' ইত্যাদি।

শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪) উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর 'সেখ আন্দু' বিখ্যাত উপন্যাস। এখানে নায়ক মুসলমান ড্রাইভার, নায়িকা হিন্দু মনিব কন্যা। এ ধরনের কাহিনি রূপায়ণে তিনি কলাকুশলতার বৈশিষ্ট্য নয়, বৈপ্লবিক

দৃষ্টির দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন। 'মিষ্টি সরবৎ' ও 'অবাক' মুসলমান ঘরের কাহিনি নিয়ে রচিত বিশিষ্ট উপন্যাস। এছাড়া তিনি আরও উপন্যাস রচনা করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫) অনেক উপন্যাসের রচয়িত্রী। 'মিত্তির বাড়ী', 'বলয়গ্রাস', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'কল্যাণী', 'নির্জন পৃথিবী', 'শশীবাবুর সংসার', 'অতিক্রান্ত', 'উন্মোচন', 'জনম জনম কি সাথী', 'নেপথ্য নায়িকা', 'আংশিক', 'ছাড়পত্র', 'সমুদ্র নীল আকাশ নীল', 'যোগ বিয়োগ', 'নবজন্ম' ইত্যাদি উপন্যাসে তিনি পরিবার-জীবনের ছবি এঁকেছেন। তাঁর লেখনীতে নারীচরিত্রের শক্তি ও সৌন্দর্য রূপায়িত হয়েছে। শিশুদের জন্য লেখা ও বড়দের জন্য গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা তিন শ-রও বেশি।

প্রতিভা বসু 'মনের ময়ূর', 'বিবাহিতা স্ত্রী', 'মেঘের পর মেঘ', 'সমুদ্র-হৃদয়', 'বনে যদি ফুটল কুসুম' ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করেছেন।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য 'নটী', 'মধুরে মধুর', 'প্রেমতারা', 'এতটুকু আশা', 'তিমির লগন', 'তারার আঁধার' ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করে বিষয়বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাণী রায় 'প্রেম', 'শ্রীলতা ও শম্পা', 'কনে দেখা আলো', 'আরও কথা বলো', 'সুন্দরী মঞ্জুলেখা' প্রভৃতি বিশিষ্ট উপন্যাস রচনা করেছেন।

লীলা মজুমদার 'চীনে লণ্ঠন', 'শ্রীমতী', 'জোনাকি' প্রভৃতি উপন্যাসে ইঙ্গবঙ্গ, মহিলাশাসিত সমাজের উপভোগ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর সব কটি উপন্যাসে নারী প্রাধান্য বিদ্যমান, এই সব নারীর বেশির ভাগ বৃদ্ধা বা পৌঢ়া, নিঃসঙ্গতায় করুণ, স্মৃতিভারে অবসন্ন, জীবনের শূন্যতা বোধে নৈরাশ্যক্লিষ্ট।

উপন্যাসের পরবর্তী ধারা

বাংলা উপন্যাসের পরবর্তী ধারা পর্যালোচনায় লক্ষ করা যায় যে, সেখানে উপন্যাসের গতিপথ অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এতদিনকার রীতিনীতি অনুসরণ না করে অতিআধুনিক কালের ঔপন্যাসিকগণ নানাবিধ বৈচিত্র্যের প্রবর্তন করছেন। শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল তার অনুসরণে কয়েকজন ঔপন্যাসিক খ্যাতিমান ছিলেন। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৬৪), প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬), চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০) প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা গতানুগতিক ধারার উপন্যাস রচনার বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছিলেন। এরপর অতিআধুনিক ঔপন্যাসিকদের আবির্ভাব ঘটে। তিরিশ দশকের লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার যে অভিনবত্ব সঞ্চার করেছিলেন উপন্যাসেও তার স্পর্শ বিদ্যমান। এই সময়ের লেখকেরা নানা পরীক্ষামূলক নতুন পরিকল্পনার পথ অনুসরণ করেছিলেন। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে এবং দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে তাঁরা ছিলেন বিশিষ্ট। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'একদিকে বিপ্লব ও রূপান্তরের বিশ্ববোধ, অপর দিকে ঘন ঘন জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের নিষ্ফল আলোড়ন; একদিকে ফ্রয়েডের অবচেতন লোকের আবিষ্কার, অপর দিকে এঙ্গেলস মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নবীন জ্ঞান—তিরিশের উপান্তে এই জট-পাকানো বাস্তব জীবনে গ্রন্থিমোচনের জন্য দুষ্পাঠ্য বাস্তবকে ব্যাখ্যা করার দায় ছিল ঔপন্যাসিকদের।'

বুদ্ধদেব বসু

অতিআধুনিক উপন্যাসের ধারায় গীতিকাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদ সব মিলিয়ে তাঁর ১৫৩টি গ্রন্থের কথা জানা গেছে। এর মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা পঞ্চাশ। রচনার অজস্রতা এবং অভিনব লিখনভঙ্গির দিক দিয়ে তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে যে ঘাতপ্রতিঘাত ও মানসিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন তাতে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের পরিবর্তে কাব্যোচ্ছ্বাসের প্রাধান্য বিদ্যমান। 'অকর্মণ্য', 'রডোড্রেনড্রন গুচ্ছ', 'যেদিন ফুটল কমল' প্রভৃতি উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু কাব্যপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। 'তিথিডোর', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'শেষ পাণ্ডুলিপি' ইত্যাদি উপন্যাস নতুন জীবন-সমীক্ষা- রীতির পরিচয়বাহী।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬) বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। তাঁর আধুনিকতা অত্যন্ত প্রবল। কিছু সংখ্যক রচনায় তিনি 'জীবনের কুৎসিত, বীভৎস, দারিদ্র্যপিষ্ট, বিদ্রোহক্ষুব্ধ, পাপপিচ্ছিল দিকের প্রতি একটা অস্বাস্থ্যকর প্রবণতা' দেখিয়েছেন। 'বেদে', 'ঊর্ণনাভ', 'আসমুদ্র', 'কাকজ্যোৎস্না','প্রচ্ছদপট', 'অন্তরঙ্গ', 'রূপসী রাত্রি' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮) উপন্যাসের বুদ্ধিপ্রধান জীবন সমালোচনার অবতারণা করেছেন। তাঁর উপন্যাসে কল্পনা বিলাসের নিদর্শন নেই। জীবন সম্পর্কে এক প্রকার শুষ্ক, আবেগহীন সমালোচনা তাঁর উপন্যাসে রূপলাভ করেছে; বাঙালি সুলভ ভাবার্দ্রতার সম্পূর্ণ বর্জন এবং আবেগপ্রবণতার কঠোর নিয়ন্ত্রণই তাঁর মুখ্য বিশেষত্ব। 'পাঁক', 'মিছিল' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা উপন্যাসের চেয়ে বেশি।

প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-৮৩) গল্প উপন্যাস ভ্রমণকাহিনি স্মৃতিকথা রচনা করেছেন। 'মহাপ্রস্থানের পথে' নামক ভ্রমণকাহিনির জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতিমান। তাঁর লেখনীতে জোর ছিল স্বতঃস্ফূর্ত; প্রকৃতির আপন গদ্যলেখক ছিলেন তিনি। অন্তরের অদম্য উচ্ছ্বাস তাঁর লেখার পেছনে কাজ করেছে। 'যাযাবর', 'দুই আর দুয়ে চার', 'বাতাস দিল দোল', 'কাজললতা', 'কলরব', 'প্রিয়বান্ধবী', 'আলো আর আগুন', 'আকাবাঁকা', 'নদ ও নদী', 'জনম অবধি মে', 'জলকল্লোল', 'তুচ্ছ', 'নগরে অনেক রাত', 'নববোধন', 'বনহংসী', 'পিয়া মুখচন্দা' ইত্যাদি তাঁর রচিত উপন্যাস।

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) সমস্যাপ্রধান উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি তীক্ষ্ণ মননশক্তির অধিকারী লেখক। তিনি সহজ সরল কথায়, তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে দুরূহ আলোচনার মর্মভেদ করতে পারেন। 'অসমাপিকা', 'আগুন নিয়ে খেলা', 'পুতুল নিয়ে খেলা', 'সত্যাসত্য', 'রত্ন ও শ্রীমতী', 'ক্রান্তদর্শী' প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর উপন্যাসের পীঠভূমি গড়েছেন বৈশ্বিক জীবন প্রচ্ছদে; ইউরোপ

ইংলন্ডের জীবনবৃত্ত থেকে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের পরিসর পর্যন্ত তার প্রসার। গদ্যের স্রষ্টা হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ভাষার স্বাতন্ত্র্য তাঁর এক অনুপম সৃষ্টি। অন্নদাশঙ্কর উপন্যাস ছাড়াও গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, রম্যকথা, ছড়া, নাটক ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬) জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ করে উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর জীবনে অভিজ্ঞতার পরিধি ছিল ব্যাপক। বিজ্ঞানের ছাত্র, কমিউনিজমের অনুসারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভদ্র আভিজাত্যের সচেতন গৌরববোধ থাকলেও সমাজের নিম্নতম প্রত্যন্ত গণ্ডীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাই সাধারণ বাস্তব মানুষ তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুল নাচের ইতিকথা' প্রভৃতি উপন্যাসে উদ্ভট কল্পনাবিলাস ও সূক্ষ্ম বাস্তব পর্যালোচনা লক্ষগোচর হয়। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে লেখক আশ্চর্য সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে : 'জননী', 'শহরতলী', 'শহরবাসের ইতিকথা', 'চতুষ্কোণ', 'অহিংসা', 'সোনার চেয়ে দামী', 'হরফ', 'ইতিকথার পরের কথা', 'পরাধীন প্রেম', 'হলুদ নদী সবুজ বন' ইত্যাদি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) সমকালীন উপন্যাসে সবচেয়ে সমাজ-সচেতন শিল্পীমনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল রাঢ় প্রত্যন্তবর্তী আপন জন্ম-মাটি বীরভূম-লাভপুরের গ্রামজীবন-নির্ভর। অশিক্ষা, সামাজিক উপেক্ষা, আর্থিক রিক্ততা ও অন্ধকুসংস্কার জড়ানো সে জীবনের সংকট সমস্যা তাঁর রচনায় বিধৃত হয়েছে। তিনি ব্যক্তির ওপর সমাজকে স্থান দিয়ে সার্থক সামাজিক উপন্যাসের সৃষ্টি করেছেন। 'চৈতালি ঘূর্ণি' তাঁর প্রথম উপন্যাস। 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' এই প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। মানবজীবনকে গভীরভাবে দেখার ক্ষমতার ফলে তাঁর উপন্যাসে মানুষের অমর প্রাণশক্তির জয়গান উচ্চকিত হয়েছে। 'রাইকমল' ও 'কবি' উপন্যাসে বৈষ্ণব ও কবিয়ালের জীবনের রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। বিচিত্র জীবনধারার পরিচয় তাঁর উপন্যাসে সহজলভ্য। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় রাঢ়ের নিম্ন শ্রেণি হিন্দুর জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পরচনায়ও তাঁর অপরিসীম কৃতিত্ব বিদ্যমান ছিল। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে 'কালিন্দী', 'চাঁপা ডাঙার বৌ', 'মন্বন্তর', 'আগুন', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'বিপাশা', 'একটি চড় ই পাখি ও কালো মেয়ে', 'উনিশ শ একাত্তর', 'নবদিগন্ত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে স্বীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর মৌলিকতা বাংলা উপন্যাসের ধারায় গতানুগতিকতার মধ্যে পরম বিস্ময়। প্রকৃতিবর্ণন, শৈশবচিত্র ও বাস্তবতার স্তর বেয়ে আধ্যাত্মিকতার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গারোহণ—এই ত্রিবিধ প্রভাবের অনবদ্য ভাব-পরিণতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসকে বরণীয় করেছে। 'আরণ্যক' উপন্যাসটি

পরিকল্পনার অভিনবত্বে বিস্ময়কর। বিভূতিভূষণ গ্রাম-লালিত শিল্পী। গ্রামের প্রকৃতি, গ্রামের জীবন তাঁর সার্থক সৃষ্টির প্রায় একক প্রেরণা। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'দৃষ্টি প্রদীপ', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিপিনের সংসার', 'দুই বাড়ি', 'অনুবর্তন', 'দেবযান', 'কেদার রাজা', 'অথৈ জল', 'ইছামতী', 'দম্পতি', 'অশনি সংকেত' ইত্যাদি।

বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) উপন্যাসে আঙ্গিক বা রূপরীতির নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষায় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। বিচিত্র মানুষের চরিত্র চিত্রণে তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। 'তৃণখণ্ড', 'কিছুক্ষণ', 'দ্বৈরথ', 'মৃগয়া', 'জঙ্গম', 'স্থাবর', 'পঞ্চপর্ব' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেলেও একষট্টিটি উপন্যাস রচনায় তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। চিকিৎসা বিদ্যা তাঁর পেশা হলেও সাহিত্য ছিল নেশা। তাঁর সব লেখাই তাঁর ব্যক্তিজীবন, জীবন-অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধের সঙ্গে জড়িত।

মনোজ বসু

মনোজ বসু (১৯০১-৮৭) রোমান্টিক ধরনের উপন্যাসের রচয়িতা। তাঁর লেখা সহজ সরল স্বচ্ছন্দ ও দ্রুতগতিসম্পন্ন। মেজাজে মনোজ বসু ছিলেন স্বপ্নাবেশে উদ্বেল রোমান্টিক, স্বভাবে জলজঙ্গলার্দ্র জন্মভূমি দক্ষিণপূর্ব বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতি ও জীবন যাত্রার অনুসারী। 'জলজঙ্গল', 'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'আমার ফাঁসি হল', 'রক্তের বদলে রক্ত', 'মানুষ গড়ার কারিগর', 'রূপবতী', 'বন কেটে বসত', 'নিশিকুটুম্ব', 'মৃত্যুর চোখে আগুন', 'রাজকন্যার স্বয়ম্বর', 'স্বর্ণসজ্জা', 'ছবি আর ছবি', 'সাজবদল', 'রানী', 'প্রেমিক' ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করে তিনি নতুন নতুন বিষয়ের সাহায্যে বাংলা উপন্যাসের পরিধি বিস্তার করেছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০২-৭৬) সাধারণত পরিচিত সংসার নিয়ে গল্প উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রোমান্স নয়—সংসার বা সমাজচিত্রই তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য। কয়লাকুঠির কুলি মজুর-সাঁওতালদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, উৎসব অনুষ্ঠান, প্রণয়লীলা প্রভৃতি তিনি তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। তাঁর আসল নাম ছিল শ্যামলানন্দ, ডাক নাম শৈল। গল্প ছাপাবার আগ্রহে মেয়েলি নাম নিলেন শৈলজা। পরে স্বরূপ প্রকাশ করলেন শৈলজানন্দ নামে। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সমকালীন জীবনানুভবের শিল্পী শৈলজানন্দ ছোট মানুষের ভেতরকার মানুষকে অনাবৃত করে তুলতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লিখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই।' তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে : 'ঝড়ো হাওয়া', 'রাঙা শাড়ী', 'বাংলার মেয়ে', 'জোয়ার ভাঁটা', 'পূর্ণচ্ছেদ', 'খরস্রোতা', 'অপরাধী', 'অরুণোদয়', 'গঙ্গাযমুনা', 'আকাশ-কুসুম', 'শোভাযাত্রা', 'বিজয়া' ইত্যাদি।

প্রমথনাথ বিশী

প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-৮৫) কবিতা নাটক প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে সঙ্গে গল্প উপন্যাস রচনায়ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কালের দমকা হাওয়ায় হালকা চালে ভেসে বেড়ানোই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাই তাঁর সব রকমের লেখাতেই চতুর চমক যত, গাঢ়-গভীরতা তত পরিস্ফুট নয়। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক কবিতার বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন মুখর। 'কেরি সাহেবের মুন্সী', 'দেশের শত্রু', 'পদ্মা', 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'ডাকিনী', 'চলনবিল', 'অশরীরী', 'গল্পের মত', 'লালকেল্লা', 'গালি ও গল্প', 'ধনে পাতা' ইত্যাদি তাঁর উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের চারপর্ব শ্রীকান্ত-র প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছিলেন 'শ্রীকান্ত' পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্ব।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭৭) বাংলা উপন্যাসে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিখ্যাত 'উপনিবেশ' গ্রন্থের মাধ্যমে। বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেন, সমকালীন বাংলা কথা শিল্পীদের মধ্যে উপন্যাস-রচনার সহজ সামর্থ্য একমাত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরই ছিল। তাঁর অপরাপর উপন্যাস হচ্ছে 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'মন্ত্রমধুর', 'মহানন্দ', 'স্বর্ণসীতা', 'ট্রফি', 'লালমাটি', 'ভাঙাবন্দর', 'সূর্য সারথি' প্রভৃতি।

বিমল মিত্র

বিমল মিত্র (১৯১২-৯১) সুবৃহৎ উপন্যাস রচনার মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের বাঙালি জীবনের জটিলতা তাঁর উপন্যাসে বিধৃত। তাঁর 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম। 'সাহেব বিবি গোলাম', 'একক দশক শতক' ইত্যাদি উপন্যাসে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব বিদ্যমান। বিমল মিত্রের জীবন-দৃষ্টিতে ছিল ইতিহাস-সন্ধানী ঔৎসুক্য এবং প্রসার, তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল সেদিনের মধ্যবিত্ত বাঙালির স্ববিরোধ, বিক্ষেপ এবং সংকটও। এই দুয়ে মিলেই তাঁর কথাসাহিত্যের—বিশেষ করে উপন্যাসের পরিকাঠামো।

অবধূত

অবধূত (১৯১০-৭৮) প্রধানত বিষয়বস্তুর নতুনত্বের জন্য খ্যাতিমান। তাঁর 'মরুতীর্থ হিংলাজ' উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত জনপ্রিয় ভ্রমণকাহিনি। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'দুর্গম পন্থা', 'ভূমিকালিপি পূর্ববৎ' ইত্যাদি তাঁর উপন্যাস। 'উৎকট তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভীষণতা, শ্মশান-সমাগত শোক-বিহ্বল নরনারীর আকস্মিক মানস প্রতিক্রিয়া, মৃত্যুসম্মুখীন মানবের উদাস বৈরাগ্য ও বেপরোয়া মনোবৃত্তি' তাঁর রচনায় চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

জরাসন্ধ

জরাসন্ধ 'লৌহকপাট', 'তাপসী', 'ন্যায়দণ্ড' ইত্যাদি উপন্যাসে কয়েদীজীবনের কাহিনি বর্ণনা করেছেন।

সমরেশ বসু

সমরেশ বসুর (১৯২৪-৮৮) 'জি. টি. রোডের ধারে', 'শ্রীমতি কাফে' প্রভৃতি উপন্যাসে গণজীবনের ছবি আঁকা হয়েছে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে মৎস্যজীবী সমাজের পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'বাঘিনী' তাঁর অপর বিশিষ্ট উপন্যাস। 'বিবর', 'প্রজাপতি' প্রভৃতি উপন্যাস বিচিত্র অভিজ্ঞতার ধারক।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস বিষয়ের বৈচিত্র্যে, আঙ্গিকের রূপান্তরে, দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে বিশিষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের সৃজ্যমান উপন্যাস সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন—শক্তিপদ রাজগুরু, বিমল কর, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, দেবেশ দাস, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, প্রফুল্ল রায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, চাণক্য সেন, দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অসীম রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ ঘোষ, অমিয়ভূষণ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, মতি নন্দী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। আরও অগণিত ঔপন্যাসিকের অবদানে বাংলা উপন্যাসের সাম্প্রতিক ধারা বৈচিত্র্যধর্মী হয়ে উঠেছে।

সমকালীন ঔপন্যাসিকেরা এখনকার জীবনকে তাঁদের সৃষ্টিতে প্রতিফলিত করবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'আশা করব তরুণ ঔপন্যাসিকেরা অতীতের ঔপন্যাসিকদের মতই সমাজ ও ব্যক্তির জটিল গ্রন্থির পাঠোদ্ধার করবেন। বর্তমানে আমাদের চারপাশে বহু শব নানা ভগ্নমূর্তির ছড়াছড়ি। এই জটিলতর বর্তমানে ঔপন্যাসিকেরা নিশ্চয় মনে রেখেছেন যে তাঁদের দায়িত্ব গভীরতর।'

বৈচিত্র্যের পথ ধরেই সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের ধারা সগৌরবে প্রবহমান। বিশ্বের যেখানে যা কিছু নতুন জীবনভাষ্য রচিত হচ্ছে তার প্রভাব এসে পড়ছে বাংলা উপন্যাসে। তাই উপন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টি-সম্ভাবনা ব্যাপকতর হচ্ছে। উপন্যাসের সৃষ্টি-প্রাচুর্যের পটভূমিকায় এর সংজ্ঞা ও বিচারের মানদণ্ডেরও পরিবর্তন ঘটছে। মানুষের অন্তর্লোকের জটিল প্রবৃত্তির স্বরূপ অনুসন্ধানের মাধ্যমে সাম্প্রতিককালের উপন্যাস হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যধর্মী।

উপন্যাসে মুসলমানদের অবদান

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নানা কারণে মুসলমানদের আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করার প্রবণতা এবং বিদেশি সাহিত্য সংস্কৃতির বিমুখতার কারণে মুসলমানদের মধ্যে যে পশ্চাদপদতা দেখা দিয়েছিল, বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা গদ্যের উন্মেষের যুগে মুসলমানদের কোন ভূমিকা না থাকায় গদ্য ভিত্তিক সাহিত্যসৃষ্টিতে তাদের অবদান রাখা সম্ভব হয় নি। তবে বিলম্বিত পদক্ষেপ হলেও পরবর্তী পর্যায়ে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মুসলমান লেখকেরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখাতে সক্ষম হন। আধুনিক যুগে মুসলমান সাহিত্যিকেরা সমাজ সচেতনতার যে পরিচয় দান করেছিলেন তার স্বাক্ষর উপন্যাসের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে কারণে মুসলমান সমাজের চিত্র সন্ধানে মুসলিম ঔপন্যাসিকগণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

নিজেদের সমাজের অনগ্রসরতা ও দুঃখদুর্দশা তাঁদের পীড়িত করেছিল। তাই সমাজচিত্র সন্ধান ও সমাজ সংস্কার মানসে তাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন।

মীর মশাররফ হোসেন

আধুনিক যুগে বিলম্বিত হলে মুসলমানদের মধ্যে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল সেই নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)। উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' (১৮৬৯) বাংলা সাহিত্যে মুসলিমরচিত প্রথম উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে 'বিষাদসিন্ধু', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিঞার বস্তানী', 'এসলামের জয়', 'রাজিয়া খাতুন', 'তাহমিনা', 'বাঁধাখাতা', 'নিয়তি কি অবনতি'। এর মধ্যে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ এবং 'গাজী মিঞার বস্তানী' ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা। 'বিষাদসিন্ধু'ই তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। কারবালার বিষাদময় ঘটনা অবলম্বনে তা রচিত। মুহম্মদ আবদুল হাই এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'বিষাদসিন্ধু খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, জীবনচরিতও নয়, তেমন আটঘাঁট বাঁধা বিধিবদ্ধ organic plot-এর উপন্যাসও নয়। এ ইতিহাস, উপন্যাস, সৃষ্টিধর্মী রচনা ও নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ববিধ সংমিশ্রণে রোমান্টিক আবেগ মাখানো এক সঙ্কর সৃষ্টি।' কারবালার বিষাদময় ঘটনা যুগ যুগ ধরে মুসলমান-হৃদয়ে বেদনার যে উৎস হয়ে আছে তা আবেগময় প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে মীর মশাররফ হোসেন ফুটিয়ে তুলেছেন। বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে ঘটনার তেমন মিল না থাকলেও কল্পিত ঘটনাবলী পাঠকহৃদয়কে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। কল্পনার আতিশয্য ও আবেগধর্মী প্রকাশভঙ্গির জন্য বিষাদসিন্ধু এখন পর্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে আছে।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী (১৮৫৮-১৯০৩) 'রূপজালাল' নামে আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। রূপজালাল গদ্যে পদ্যে লেখা বিশিষ্ট উপন্যাস। উপন্যাসটির কাহিনি হিসেবে আছে শীমাইল-অধিপতি জামাল রাজার পুত্র জালালের সঙ্গে সাধুতনয়া রাক্ষস-পালিতা রূপবানুর প্রণয়। রূপবানুর সন্ধানে জালাল মর্ত্য, পাতাল ও সমুদ্র তলদেশ পরিভ্রমণ কালে দৈত্য-দানব, গন্ধর্ব, রাক্ষস ও পরীর সান্নিধ্যে এসেছে।

আর্জুমন্দ আলী চৌধুরী (১৮৭০-১৯৪১) 'প্রেমদর্পণ' নামে একটি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। উপন্যাসটিতে হিন্দু কন্যার সঙ্গে মুসলিম যুবকের প্রণয়কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বহু কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন। 'হৃদয়-সঙ্গীত' তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি করে কৃতিত্ব দেখান। তিনি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। তাঁর 'জোহরা' উপন্যাস মুসলমান সমাজের বেদনাঘন চিত্র অঙ্কনে বিশিষ্ট। 'দরাফ খাঁ গাজী' তাঁর ধর্মপ্রেরণামূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'শান্তিপুরের কবি' হিসেবে পরিচিত মোজাম্মেল হক মুসলিম জীবনাদর্শ, ইসলামের নবজাগরণ ইত্যাদি অবলম্বনে কাব্য রচনা করলেও জীবনী ও উপন্যাস রচনায় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। জোহরা উপন্যাসে সে আমলের মুসলমান সমাজের

অন্যায় অনাচার রূপ দিয়েছেন। কন্যার মতামত অগ্রাহ্য করে আত্মীয়স্বজনেরা বিয়ে দিতে গিয়ে মেয়েদের জীবনে যে দুর্ভোগের সৃষ্টি করে তা-ই এ উপন্যাসের উপজীব্য।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩) 'আনোয়ারা', 'প্রেমের সমাধি', 'গরীবের মেয়ে', 'পরিণাম', 'চাঁদতারা বা হাসান গঙ্গা বাহমনি', 'দুনিয়া আর চাই না', 'মেহেরউন্নিসা' প্রভৃতি জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) 'তারাবাঈ', 'নূরউদ্দিন', 'ফিরোজা বেগম' ও 'রায়নন্দিনী' এই চারটি উপন্যাসের রচয়িতা। তাঁর উপন্যাসগুলো বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় লিখিত। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যে অবদান রেখেছেন, উপন্যাসের বেলায়ও একই আদর্শের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে মুসলিম গৌরব প্রকাশের চেষ্টা আছে। প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করে স্বজাতির কৃতিত্ব প্রদর্শনই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য।

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) বিখ্যাত 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি রচনা করেন। সে আমলের মুসলমান সমাজের চিত্র হিসেবে এর বিশিষ্টতা। ধর্মীয় গোঁড়ামি আর সামাজিক কুসংস্কার যে মুসলমান সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল এবং ইংরেজি শিক্ষায় সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে যে ধ্বংসকে প্রতিরোধ করা যায় তা এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। উপন্যাসের কাঠামোগত বাঁধুনির চেয়ে সমাজচিত্র অঙ্কনই এ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। কাজী ইমদাদুল হক উপন্যাসটি অসমাপ্ত রেখে গেলেও তাতে তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান। আবদুল্লাহ উপন্যাসে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি সমাজ জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার গভীরতাও প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিকতার লক্ষ্যে আবদুল্লাহর চরিত্রের বিবর্তন এই উপন্যাসের উপজীব্য।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) 'সুলতানার স্বপ্ন', 'অবরোধবাসিনী' প্রভৃতি গ্রন্থে অবহেলিত নারীসমাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৯৩-১৯৫৩) 'বাসর উপহার', 'প্রীতি উপহার', 'রায়হান', 'সরলা' প্রভৃতি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস রচনা করেন।

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) কবি পরিচয়ে খ্যাতিমান থাকলেও ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীয় অবদান রেখেছেন। তিনি চৌদ্দটি উপন্যাসের রচয়িতা। সেগুলো হল : 'মরুর কুসুম', 'হিরণরেখা', 'পারের পথে', 'স্বামীর ভুল', 'ঘরের লক্ষ্মী', 'খেয়াতরী', 'সোনার কাঁকন', 'রিক্তা', 'যুগের আলো', 'পথের দেখা', 'কাঁটাফুল', 'শিরি ফরহাদ', 'লায়লী মজনু' ও 'ইউসুফ জুলেখা'।

নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী সাহিত্য-সরস্বতী (১৮৯৪-১৯৭৫) 'স্বপ্নদ্রষ্টা', 'জানকী বাঈ', 'আত্মদান', 'ভাগ্যচক্র', 'বিধিলিপি', 'নিয়তি' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নূরুন্নেসা ছিলেন বঙ্গীয় মোসলেম্ মহিলা সঙ্ঘের সভানেত্রী।

সকল প্রকার গোঁড়ামি ও অন্ধ সংস্কারের বাইরে এসে মুক্তি-পিপাসার নিদর্শন ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর উপন্যাসে।

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) 'নদীবক্ষে' ও 'আজাদ' নামে দুটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। 'নদীবক্ষে' উপন্যাসে গ্রামবাংলার কৃষক সমাজের সহজ সরল চিত্র আকর্ষণীয় ভাবে রূপলাভ করেছে।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) উপন্যাস রচনা করে স্বীয় বিশিষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। 'বাঁধনহারা', 'কুহেলিকা' ও 'মৃত্যুক্ষুধা' তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে সাধারণ মানুষের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৫-৭৪) রসরচনা জাতীয় রচনার লেখক হিসেবে বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। উপন্যাস রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব ছিল। 'অবিশ্বাস্য', 'শবনম' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁর প্রতিভার নিদর্শন। সহজ, মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যধারার প্রবর্তক সৈয়দ মুজতবা আলী ব্যঙ্গ-রসিকতায় তাঁর গদ্যরচনাকে প্রদীপ্ত করে তুলেছিলেন।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান পরবর্তীকালে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সাহিত্যে তার পরিচয় বিধৃত।

বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস দিনবদলের পালাগানে মুখরিত। সমকালীন জগৎ ও জীবন উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে উঠেছে বরাবরই। সে কারণে সাম্প্রতিক উপন্যাসের বিষয় ও বৈশিষ্ট্যের পরিধি নির্ধারণ সম্ভবপর নয়। তাই ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থের এই বলে সমাপ্তি টেনেছেন :

'বাংলা উপন্যাসের ধারা ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যের শাখাপথ বাহিয়া অগ্রসর হইতেছে। আজ ইহার অন্তঃপ্রেরণা কেবল ইহার নিজের দেশের প্রত্যক্ষ সমাজবিবর্তনের ভিতর সীমাবদ্ধ নহে। আজ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে যেখানে নূতন জীবনপরীক্ষা চলিতেছে, যেখানে বিজ্ঞান ও দর্শন নূতন জীবনভাষ্য রচনার চেষ্টা করিতেছে, সেখানে পুরাতন অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রান্ত হইতেছে, তাহারই সম্মিলিত প্রভাব এই বঙ্গভূমির উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। অধুনা নূতন সৃষ্টি সম্ভাবনা অভাবনীয় রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। ইহারই অনিবার্য ফলস্বরূপ উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা আজ আর কোথাও সমাপ্তিরেখা টানিবার ভরসা পাইতেছেন না। উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিচারের মানদণ্ড দিনে দিনে রূপ বদলাইতেছে—সুবলয়িত সুষমার পরিবর্তে এখন জীবন অসমশীর্ষ অগ্নিশিখার ন্যায় সমস্ত রেখাবন্ধনী অস্বীকার করিয়া ছোটবড় নানা আকারের জিহ্বায় উহার প্রতিবেশকে লেহন করিতেছে। এখন প্রতিবেশ আত্মার আরামের বাসগৃহ নহে, শ্বাসরোধী কারাগার; উহা মানুষের শক্তির উৎস নহে, শোষণের যন্ত্র। মানুষের অন্তরলোকের জটিল, পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তিসমূহের একক মূল কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা উহার সমগ্র মানচিত্রকে বদলাইয়া দিতেছে। উপন্যাস-সাহিত্য আজ এই রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া অন্তরে ও বাহিরে সংশয়াবিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।'

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। বাংলা উপন্যাসের পত্তনি ও প্রস্তুতি যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখাও যে ইহার মূলে লোকরঞ্জক নকশা, অদ্ভুতরসাত্মক উপকথা ও ঐতিহাসিক কাহিনি—এই তিনটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ধারার প্রভাব কতদূর বিদ্যমান ছিল।

২। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রথম সার্থক বিকাশের ইতিহাস বিবৃত কর।

৩। বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত লিখ।

৪। 'বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম ভাগ এক সংস্কার পর্বের যুগ।'—বঙ্কিম-পূর্ব যুগে উপন্যাস সৃষ্টির যে প্রয়াস ছিল, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া এই উক্তির সার্থকতা যাচাই কর।

৫। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ধারার সম্যক পরিচয় দাও।

৬। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে টেকচাঁদ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের অবদান কেন অমরতার দাবিদার ঐতিহাসিক সূত্র রক্ষা করিয়া আলোচনা কর।

৭। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বিকাশধারায় বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের স্থান নির্দেশ কর।

৮। 'উপন্যাস এবং নাটক উভয় শ্রেণির রচনায় সমাজজীবন চিত্রিত হয়, কিন্তু বাংলা উপন্যাসের বিস্তার ও সার্থকতা কোনভাবেই বাংলা নাটকের সঙ্গে এক অথবা সমতুল্য বলিয়া মনে হয় না। সমালোচকের বক্তব্য সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

৯। 'বাংলা উপন্যাস-রচনার প্রাথমিক যুগে সামাজিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাসই অধিক সংখ্যায় রচিত হইয়াছিল।' উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার কারণ ও স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

১০। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ধারা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকের অবদান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর।

১১। বাংলা উপন্যাসের আদি যুগ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর।

১২। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বিকাশধারায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থান নির্দেশ কর।

১৩। টীকা লিখ : আনন্দমঠ, কলিকাতা কমলালয়, দুর্গেশনন্দিনী, নববাবু বিলাস, পথের দাবী, পদ্মানদীর মাঝি, ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, ভবানীচরণ, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণলতা, রাজসিংহ।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ছোটগল্প

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছোটগল্পের আগমন অপরাপর সাহিত্যসৃষ্টির তুলনায় বিলম্বিত হলেও পাঠকহৃদয় জয় করার ব্যাপারে এর কৃতিত্ব অধিকতর। বর্তমানকালের জীবনের জটিলতায় সাহিত্যে রসপিপাসা নিবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ছোটগল্পের উপযোগিতা অন্যান্য সাহিত্যশাখা ছাড়িয়ে গেছে।

এক কথায় ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করা অসম্ভব। অনেকে অনেক ভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেছেন। আমেরিকার প্রখ্যাত গল্পকার ই. এ. পো-র মতানুসারে, যে গল্প অর্ধ থেকে এক বা দু ঘণ্টার মধ্যে এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করা যায়, তাকে ছোটগল্প বলে। ইংরেজ গল্পকার এইচ. জি. ওয়েলস বলেন, ছোটগল্প দশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রমথ চৌধুরীর মতে ছোটগল্প 'ছোট ও গল্প' হতে হবে। আয়তনের ক্ষুদ্রত্ব ছোটগল্পের একটি প্রত্যক্ষ শারীর-লক্ষণ। আসলে প্রকৃতির দিক থেকে গল্প এবং আকৃতিতে ছোট হলেই তা ছোটগল্প নামে অভিহিত হতে পারে। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিগত ও মর্মগত কতগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান—যার আলোচনায় ছোটগল্পের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভবপর। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে ছোটগল্পের যে সগৌরব বিকাশ তাতেই এর অনন্য পরিচয়। গীতিকবিতার মতই ছোটগল্প ব্যঞ্জনাধর্মী এবং জীবনের ঘটনাপ্রবাহের ক্ষণমুহূর্তের ওপর তীর্যক আলোকপাতেই এর গুরুত্ব।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে জীবনের একটা খণ্ডাংশমাত্র ছোটগল্পে রূপায়িত হয়। মানবের প্রবহমান জীবনের শত শত বৈচিত্র্যময় মুহূর্তের কোন একটি মাত্র রূপ ছোটগল্পের উপজীব্য। কোন একটি চরিত্রের বিশেষ একটি দিক অবলম্বনে ছোটগল্পকারের বক্তব্যের প্রকাশ ঘটে। সেই একটি মাত্র দিক রূপায়ণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর সমাবেশ থাকবে। এতে অনাবশ্যক কথা, অনাবশ্যক ভাষা, অনাবশ্যক চরিত্র ও ঘটনা প্রভৃতি নিষ্ঠুরভাবে বর্জন করে লেখক শুধু একটি রসঘন নিবিড় মুহূর্তের রূপায়ণ ঘটাবেন। ছোটগল্পের আরম্ভে ও উপসংহারে নাটকীয়তা থাকবে। স্বল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত ঘটনার সাহায্যে ইঙ্গিতপূর্ণ পরিণতি লাভই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য। নাটকীয় আকর্ষণীয়তা থাকবে ছোটগল্পে, একটি উৎকণ্ঠা ও চরম মুহূর্ত উপস্থিত হবে অনিবার্য হয়ে।

ছোটগল্পে জীবনকে বিন্দু-বদ্ধ করে একটি মাত্র কেন্দ্রে সুস্থির করে তোলা হয়। সেই অবিচল স্থিরতার অতলে ডুব দিয়ে অনন্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করাই ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। 'আসলে একটি মাত্র চরিত্র, ঘটনা, আবেগ বা অবস্থানের বৃন্তমূলে শিল্পীর অনুভবকে কুসুমসম অনির্বাচ্যতা দানই ছোটগল্পের শিল্প-বৈশিষ্ট্য।'

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মন্তব্য করেছেন, 'কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোটগল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনা বর্ণনার চেষ্টা করে। একখানা উপন্যাস হয়ত সে ক্ষুদ্র ঘটনাটি কয়েকছত্র মাত্র অধিকার করিতে পারে, ছোটগল্পে তাহাই পাঁচ সাত পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়া বসে। চতুর্দিকব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে 'বুলস আই' লণ্ঠনের আলো যেমন একস্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানটুকুর সকল খুঁটিনাটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোটগল্প রচনার কৌশল তেমনি জীবনের একটা ঘটনার উপর পতিত হইয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে। সেই চতুর্দিক ব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে একটা স্থানের উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নাও হইতে পারে। কিন্তু তাহাই সেই লণ্ঠনের আলোর কার্য। তেমনি বিচিত্র সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, উত্থান, পতন, সংঘাতময় জীবনের একটা ছোট ঘটনাই অধিক প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে সেই প্রাধান্যদান করাই গল্প রচনা কৌশলের কার্য।'

ছোটগল্পকে সনেটের মত গাঢ়বদ্ধ এবং গীতিকবিতার মত ভাবাত্মক হতে হবে। শিশিরকুমার দাসের মন্তব্য অনুসারে, 'ছোটগল্পের চরিত্র সংখ্যা কম : একটি দুটি; ঘটনাও কম, একটি দুটি এবং সবশেষে একটি চরিত্র বা একটি ঘটনা বা একটি ভাব প্রাধান্য লাভ করে। এইখানেই তার যোগ গীতিকবিতার সঙ্গে, বা তার চেয়েও বেশি যোগ একাধিক বার নাটিকার।' ছোটগল্প বলতে শুধু কাহিনি বর্ণনা বোঝায় না, ছোটগল্প শুধু আখ্যান রচনা নয়, শুধু চরিত্রসৃষ্টিও নয়—ছোটগল্প একটি বিশিষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি—একটি বিশেষ 'রূপসৃষ্টি।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মত। তার আয়তন, তার আকৃতি সুঠাম। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফলে ওঠে, সে নিটোল, সে সুডৌল, বাইরে তার রং রাঙা কিংবা কাল, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা কটু। সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটগল্প।'

প্রমথ চৌধুরীর মতে, 'ছোটগল্প হওয়া উচিত ঠিক একটি ফুলের মত, বর্ণনা ও বক্তৃতার লতাপাতার তার ভেতরে কোন স্থান নেই।...যা নিত্য ঘটে, তার কথা কেউ শুনতে চায় না। ঘরে যা নিত্য খাই তাই খাবার লোভে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়? যা নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান।' ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'একটি ক্ষুদ্র আখ্যানখণ্ডে সমগ্র জীবন-তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত করাই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য ও শিল্পরূপের প্রেরণা।' এই সমস্ত মন্তব্যের মাধ্যমে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া চলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যে 'বর্ষাযাপন' নামক কবিতায় ছোটগল্প সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তাতে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে :

ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।

নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্তির ধুলা
কত ভাব কত ভয় ভুল
সংশয়ের দশদিশি মরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মত॥
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই সব হেলা ফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতি বৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণ-নিশার॥

প্রকৃতপক্ষে, বিশেষ প্রকারের গঠনরীতি, বিষয়নির্বাচন, চরিত্রসৃষ্টি, কথোপকথন, পরিবেশসৃষ্টি, বাণীভঙ্গি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ রেখে ছোটগল্পের যথার্থ পরিচয় ফুটে ওঠে।

ছোটগল্পের আকারে আছে বৈচিত্র্য। একেবারে ছোট আকারের—এক পৃষ্ঠা, অর্ধ পৃষ্ঠার গল্প যেমন আছে, তেমনি ছোটখাট উপন্যাস হয়ে গেছে এমনও ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে।

ভূদেব চৌধুরী ছোটগল্পের তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন :

'প্রথমত, অপার-বিস্তৃত রহস্য-জটিল আধুনিক জীবন-ভূমি,—যার প্রতি মুহূর্তে প্রতি বিন্দুতে জমে আছে অতলান্ত রহস্য গভীরতা। তার যে কোন একটি বিন্দুর গহনে তলিয়ে পূর্ণজীবনের একটি অখণ্ড ছায়ারূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

ছোটগল্পের দ্বিতীয় উপাদান শিল্পী-ব্যক্তির ঘন-নিবিড় অনুভব-তন্ময়তা,—চলমান জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানীজনোচিত আত্মস্থতা। সেই সুস্থির চেতনার মুকুরে জীবনের যে কোন মুহূর্ত যেন পূর্ণজীবনের ছায়া ফেলতে পারে।

তৃতীয়ত, চাই রচনার ব্যঞ্জনাধর্মিতা। যেন একটি জীবনের বিশেষ মুহূর্তের অবস্থান, অভিঘাত বা আবেগ সর্বদেশকালের জীবন-ভূমিতে উৎক্রমণ করতে পারে।

এই উপাদান-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ছোটগল্পের অনন্যতুল্য স্বাতন্ত্র্য। মুহূর্তের বিন্দুমূলে জীবনসিন্ধুর পূর্ণচেতনা যে গল্পের পরিণামে ব্যঞ্জিত হয় না, সে গল্প আকারে ছোট হলেও ছোটগল্প নয়;—আখ্যান, উপাখ্যান, উপকথা বা যা-খুশি হতে তার বাধা নেই। অতএব সীমায়িত জীবনের ক্ষণবৃন্তে অনন্ত জীবনের ব্যঞ্জনা রচনাতে ছোটগল্পের রূপশৈলীয় বিশিষ্টতা।' ছোটগল্প জীবনের খণ্ড অংশ। তবে এই খণ্ডতার মধ্যে শ্রীহীনতা নেই। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'গাছের ফল। গাছেরই সৃষ্টি। কিন্তু সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।'

ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাগ

ছোটগল্প জীবনের যে কোন বিষয় অবলম্বনেই রচিত হতে পারে। বিচিত্র বর্ণে ও পথে জীবনের প্রকাশ ঘটে বলে ছোটগল্পও হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যধর্মী। তাই কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণিতে ছোটগল্পকে বিন্যস্ত করা যায় না। তবু ছোটগল্পকে মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা চলে।

১। **রোমান্টিক বা প্রেমের গল্প :** মানব মানবীর বিচিত্র প্রেমানুভূতির রূপায়ণ ঘটে এ ধরনের গল্পে।

২। **সামাজিক গল্প :** কোন বিশেষ সমাজের চিত্র এ ধরনের গল্পে অঙ্কিত হয়।

৩। **দার্শনিক গল্প :** লেখকের জীবনদর্শন এই শ্রেণির গল্পের উপজীব্য।

৪। **প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কিত গল্প :** প্রকৃতি ও মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিক এই ধরনের গল্পে স্থান পায়।

৫। **রূপক বা সাঙ্কেতিক গল্প :** এ ধরনের গল্পে রূপকের আড়ালে কোন সর্বজনীন সত্যের প্রকাশ ঘটে।

৬। **অতিপ্রাকৃত গল্প :** অতিপ্রাকৃত বিষয়ের কল্পনা এই শ্রেণির গল্পে স্থান লাভ করে।

৭। **ব্যঙ্গ গল্প :** সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সমস্যা বা রুগ্ন মানসিকতাকে বিদ্রূপ করার জন্য এই শ্রেণির গল্প রচিত হয়।

৮। **হাসির গল্প :** জীবনের নানা অসঙ্গতি নিয়ে হাসি সৃষ্টি করার জন্য এ ধরনের গল্প রচিত হয়।

৯। **ঐতিহাসিক গল্প :** ইতিহাস থেকে উপকরণ নিয়ে এ ধরনের গল্প রূপলাভ করে।

১০। **মনস্তাত্ত্বিক গল্প :** নরনারীর মনস্তাত্ত্বিক বিষয় এ ধরনের গল্পে স্থান পায়।

১১। **ডিটেকটিভ, গোয়েন্দা বা রহস্য গল্প :** অপরাধ ও গোয়েন্দা তৎপরতা নিয়ে রচিত হয় এই শ্রেণির গল্প।

১২. **বৈজ্ঞানিক গল্প :** বিজ্ঞানের কাহিনি নিয়ে রচিত গল্প এই পর্যায়ভুক্ত। এ ছাড়া পশুপাখি নিয়ে গল্প, বিদেশি পটভূমিকায় রচিত ইত্যাদি শ্রেণিও হতে পারে।

গল্পের উৎস সন্ধান করলে প্রাচীন কালে এর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের গল্পবলা ও গল্পশোনার প্রবৃত্তি চিরন্তন। তাই বহু প্রাচীন কাল থেকেই গল্পের উৎপত্তি হয়েছে। সবদেশের রূপকথা গল্পের অফুরন্ত উৎস। এ দেশের পুরাণে, বৌদ্ধজাতকে, পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ গ্রন্থে, বিদেশের ঈশপের গল্পে, আরব্যোপন্যাসে অজস্র গল্পের সমারোহ গল্পের প্রতি মানুষের আদি ও চিরন্তন আগ্রহের প্রমাণ করে। ইউরোপীয় সাহিত্যে আধুনিক অর্থে ছোটগল্পের লক্ষণ প্রথম ফুটে ওঠে ইটালির লেখক বোক্কাচিও-র (১৩১৩-৭৫) 'ডেকামেরন'-এর কাহিনিগুলোতে। ষোড়শ শতকে ইংলন্ডের চসার 'ক্যান্টারবেরি টেলস'-এ ইংরেজি গল্পের প্রাথমিক রূপ ফুটিয়ে তুলেন। ফরাসি সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম লেখক র‍্যাবলে। ফ্রান্সের মোপাসাঁ, আমেরিকার এলেন পো এবং রাশিয়ার গোগোল—এই তিনজন গল্পকার তিন দেশের ছোটগল্পের জনক হিসেবে বিবেচ্য। তবে বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের নবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন ফ্রান্সের

মোপাসাঁ। তাছাড়া ফরাসি সাহিত্যে এমিল জোলা, আলফাস দোঁদে, আনাতোল ফ্রাঁস; রুশ সাহিত্যে পুশকিন, গোগোল, টলস্টয়, চেকভ, তুর্গেনিভ, গোর্কি; ইংরেজি সাহিত্যে গলসওয়ার্দি, সমারসেট মম, পি. জি. ওডহাউস, ও হেনরি; বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

ছোটগল্পের প্রাথমিক পর্যায়

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প কনিষ্ঠতম সন্তান। পৃথিবীর অপরাপর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে ছোটগল্পের ইতিহাসের সূত্রপাত বহু পূর্বেই হয়েছিল, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবে যে আধুনিকতার সৃষ্টি হয় তার ফলেই ছোটগল্পেরও জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে। বাংলা গদ্য যখন সাহিত্যের বাহন হিসেবে যথার্থ উপযোগিতা লাভ করে তখন গদ্যাশ্রয়ী বিচিত্র আঙ্গিকের সাহিত্যসৃষ্টির পথ সুগম হয় এবং এর পরিণতিতে বাংলা সাহিত্যে গল্পের আমদানি ঘটে। শিশিরকুমার দাস বাংলা ছোটগল্পের উৎপত্তি সম্পর্কে নিজস্ব ঐতিহ্যের ইঙ্গিত দিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা ছোটগল্প রূপতত্ত্বের দিক থেকে যেমন বাংলা গল্প ধারার বিবর্তনের ফল, তেমনই তার প্রাণের দিক থেকেও স্বতস্ফূর্ত আনন্দে আপনাতে আপনি বিকশিত হয়েছে।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) ও 'রাধারাণী' (১৮৭৫) গ্রন্থের মধ্যে ছোটগল্পের প্রয়াস প্রথমবারের মত ফুটে উঠলেও আধুনিক ছোটগল্পের শিল্পসৃষ্টির পরিচয় এগুলোতে লক্ষণীয় নয়। এগুলো আকৃতিতে ছোট হলেও তা উপন্যাসধর্মী। এই সময় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' এবং সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', 'দামিনী' প্রভৃতি গল্পজাতীয় রচনা উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। এই সময়ের পরে স্বর্ণকুমারী দেবী(১৮৫৫-১৯৩২) কিছু গল্প লেখার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর গল্প গ্রন্থের নাম 'নবকাহিনি'। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম সচেতন ছোটগল্প শিল্পী। তবে তিনি গল্পরচনায় যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) প্রাথমিক পর্যায়ের অন্যতম গল্পকার। তিনি বিভিন্ন মাসিক পত্রপত্রিকায় অজস্র গল্প রচনা করেছিলেন। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল প্রথমত প্রেম ও রোমান্স। বিষয়বৈচিত্র্য ও রোমান্স-প্রবণতা তাঁকে বিশিষ্টতা দান করলেও পরবর্তীকালে তাঁর গল্পে যুগোপযোগী বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত ছিল।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

এই প্রস্তুতি পর্বে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) স্বতন্ত্র প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর 'কঙ্কাবতী' নামক উপন্যাসে উদ্ভট কল্পনাসংবলিত ভৌতিক ও মানবিক ঘটনার যদৃচ্ছ সংমিশ্রণে কৌতুককর কাহিনি পরিবেশন করেন। তাঁর 'ভূত ও মানুষ', 'মুক্তামালা', 'মজার গল্প', 'ডমরুচরিত' গল্পগ্রন্থে এ ধরনের উদ্ভট কাহিনি রূপায়িত করেছেন। তাঁর রচনায় বাস্তবতার সুর নেই; তিনি বাস্তবতার জগৎ এড়িয়ে গেছেন অসম্ভব কল্পনার জগতে বিচরণ করতে। তাঁর গল্প শ্লথগতি, সম্ভব-অসম্ভবের জগতে স্বেচ্ছাবিহারী বলে তিনি এদেশের চিরাগত গল্পকথকের সহজ উত্তরাধিকারী হিসেবে উল্লেখযোগ্য। তিনি রূপকাশ্রয়ী মাধ্যমে সমাজনীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। এদিক থেকে তিনিই বাংলা গল্পের প্রথম

কৌতুকরসের অবতারণা করেন। ত্রৈলোক্যনাথের রচনাবলীতে বৈঠকীরীতি বা মৌখিক গল্পধারার অনুসরণ লক্ষণীয়। এ সব কারণে তাঁর গল্প রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের সমকালীন হয়েও ব্যতিক্রম এবং রবীন্দ্রপূর্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) বিপুল প্রতিভার যাদুস্পর্শে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা স্বল্প সময়ে সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সৃষ্টির অপরিমিত আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠেছিল সত্য, কিন্তু তিনি সেসব প্রচলিত পথরেখা অবলম্বনে যে সীমাহীন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতেই বাংলা সাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমপর্যায়ে স্থান পেয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের আগে ছোটগল্পের সূত্রপাত হলেও তাতে উৎকর্ষের নিদর্শন সুস্পষ্ট ছিল না। রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার।

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে তাতে একদিকে যেমন সাহিত্যিক বিচারে সর্বপ্রথম সার্থক ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়েছে তেমনি অন্যদিকে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনও সেখানে বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' ভারতী পত্রিকায় ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৮৪-৮৫তে 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' ও 'মুকুট' নামে গল্পগুলো প্রকাশিত হলেও ১৮৯০ সালে 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেনাপাওনা' গল্পটিই রবীন্দ্রনাথের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প। এরপর তাঁর গল্পরচনার ধারা অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়।

ছোটগল্প নামে আখ্যায়িত রবীন্দ্রনাথের গল্পের সংখ্যা 'গল্পগুচ্ছের' আশিটি। তাছাড়া 'সে' নামক গল্পগ্রন্থের চৌদ্দটি অনুচ্ছেদের মধ্যে পাত্র-পাত্রীর ধারাবাহিকতা বর্তমান থাকলেও গল্পের কাহিনির ধারাবাহিকতা নেই বলে এই চৌদ্দটিকে গল্পের পর্যায়ে স্থান দেওয়া যায়। 'তিন সঙ্গী' গ্রন্থের তিনটি অধ্যায় সম্পর্কেও একই বৈশিষ্ট্যের সমর্থন মিলে। 'মুকুট' গল্পে উপন্যাসের লক্ষণ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ একে গল্প বলে অভিহিত করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিত্যক্ত 'ভিখারিণী' গল্পটি গণনায় আনলে সব মিলিয়ে তাঁর গল্প সংখ্যা দাঁড়ায় এক শ উনিশে। সাহিত্যিক জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে গল্প রচনায় হস্তক্ষেপ করলেও তার স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল যে সমস্ত ছোটগল্প তার সূত্রপাত হয় ১৮৯১ সাল থেকে। কবির বয়স তখন ত্রিশ—তখন তাঁর ওপর জমিদারি তদারকির ভার অর্পিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার সঙ্গে বাংলাদেশে জমিদারি তদারকির কাজের সম্পর্ক রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. গোলাম মুরশিদের মন্তব্য উল্লেখ করা যায় : 'ভদ্র চাকরি বা উপার্জনের একেবারে অনুপযুক্ত বিবেচনায় যখন পৈতৃক জমিদারি তদারকির দায়িত্ব আসে তাঁর ওপর, তখন খুশি হওয়া দূরে থাক, তিনি তাকে গণ্য করেন দুর্ভাগ্য এবং প্রায়-নির্বাসন হিসেবে। কিন্তু ভাগ্যে শাপে বর হল। পরিবারের বাইরে, আদি সমাজের বাইরে, এমন কি কলকাতার বাইরে এই প্রথম তিনি একটা জগৎ প্রত্যক্ষ করেন, যেখানকার নিসর্গ এবং মানুষ তাঁর এক কালের পরিচিত কৃপণ নিসর্গ আর নীরস মানুষ থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। তা দৃষ্টে তাঁর এতদিনের ঢাকনা দেওয়া নজর হঠাৎ ব্যাপ্তি পেল। বৃহত্তর বাঙালি সমাজ, জীবিকার সুকঠোর প্রয়াস, লৌকিক সহজ ধর্ম, নিসর্গের

সূক্ষ্ম ও বিশাল বৈচিত্র্য—সবই নতুন ঠেকে তাঁর কাছে। সবই তাঁর গণ্ডিকে প্রসারিত করে। বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে ঔদার্য দান করে।' শিলাইদহের জমিদারিতে, নদীর তীরে তীরে, লোকালয়ের মধ্যে বিচিত্র মানুষের খণ্ড ছিন্ন ক্ষুদ্র সুখদুঃখের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রবেশ করলেন তখন ছোটগল্পের উপাদানের প্রাচুর্য এল তাঁর লেখনীতে। তিনি নিজের জীবনের অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে খুঁজে পেলেন ছোটগল্পের অনিঃশেষ উপাদান। তাঁর গল্পরচনার প্রেরণা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশের বিস্ময় থেকে তাঁর ছোটগল্পের জন্ম।

জমিদারি তদারকি উপলক্ষে কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়াতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। নদী-নালা-খাল-বিল সৃষ্ট এই বিস্তৃত জলভাগ, বর্ষাজলের স্ফীতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত এই অঞ্চলের মায়াময় গ্রামগুলো—সীমাহীন শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ এই স্থলভাগ—পদ্মা যমুনা ব্রহ্মপুত্র আত্রেয়ী নাগর বড়াল গৌরী ইছামতী প্রভৃতি নদীবিধৌত এই বিচিত্র ভূখণ্ডের মধ্যে মানবজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। এরই ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে তাঁর ছোটগল্প। সহজ সরল গ্রাম্যজীবনের পটভূমিকায় অপূর্ব রূপ ও রসের পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পগুলোর মধ্যে। তাঁর এই সৃষ্টিতে মিলে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাস অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। মনগড়া কল্পনার মানুষ নয়—বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি পেয়েছেন এই সমস্ত মানুষের পরিচয়—সে বাস্তব অভিজ্ঞতা মূল উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের লীলাবৈচিত্র্যের রূপটি প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের মানুষ আর প্রকৃতি তাঁকে বিমুগ্ধ করেছিল। পল্লীর মানুষের জীবনযাত্রা তাঁর মনে কৌতূহল ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তাঁর নিজের দেখা সেই সব মানুষের ছোট খাট সুখদুঃখের কথাকেই নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় আপন মনের সৌন্দর্য মিশিয়ে ছোটগল্পে রূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই দেখার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে একসময় লিখেছিলেন, 'পোস্ট মাস্টারটি আমার বজরায় এসে বসে থাকত। ফটিককে দেখেছি পদ্মার ঘাটে। ছিদামদের দেখেছি আমাদের কাছারিতে। ওই যারা কাছে এসেছে তাদের কতকটা দেখেছি, কতকটা বানিয়ে নিয়েছি।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে জনপদের কলরব এবং বিশাল উদার প্রকৃতির নীরবতাকে জাদুকরের মত আশ্চর্য কৌশলে মিলিয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পর্কে শিশিরকুমার দাস 'বাংলা ছোটগল্প' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য অসাধারণ। তিনি শহর নিয়ে লিখেছেন, গ্রাম নিয়ে লিখেছেন। তাঁর গল্পে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বারবার এসেছে, তাঁর গল্পে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্ট হয়েছে। তাঁর গল্পের চরিত্রশালায় রাজরানী আছে, লুব্ধচিত্ত জমিদার আছে, মধ্যবিত্ত সমাজ আছে। দরিদ্র কৃষক আছে। তাঁর গল্পে প্রেম যেমন বিরাট স্থান অধিকার করেছে, তেমনই করেছে প্রকৃতি, তেমনই করেছে ভ্রাতৃস্নেহ, প্রভুর প্রতি আনুগত্য, মায়ের প্রতি ভালবাসা। তিনি বর্তমান জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন, অতীত কাল নিয়ে লিখেছেন।'

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গল্পের একশ্রেণীর কাহিনি ঘটনাবিরল, চরিত্রবিরল এবং অনুভূতি বা আবেগ প্রধান। যেমন : ক্ষুধিত পাষাণ বা পোস্টমাস্টার। দ্বিতীয় শ্রেণির গল্পের কাহিনিগুলো চরিত্র প্রধান। যেমন : কাবুলিওয়ালা বা খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন। তৃতীয় শ্রেণির গল্পের কাহিনিগুলো পরিকল্পনা প্রধান। এসব গল্পের চরম বিস্ময় থাকে গল্পের শেষে। যেমন : সমস্যাপূরণ বা অধ্যাপক। চতুর্থ শ্রেণির গল্পের কাহিনিগুলোতে আছে নিতান্তই গল্প। যেমন : ঠাকুরদাদা বা দালিয়া। এই চার ধরনের গঠনই রবীন্দ্রগল্পে প্রাধান্য পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে আঙ্গিকেরও বৈচিত্র্য আছে। তিনি যেসব আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন সেগুলো এ রকম : ১. গল্পের কাহিনিটি নিজে বর্ণনা করেছেন। ২. কাহিনিটির আরম্ভ করেছেন লেখক—পরে গল্পের নায়ক কাহিনি উত্তমপুরুষে বলে গেছেন। যেমন : নিশীথে। ৩. সম্পূর্ণ কাহিনি উত্তমপুরুষে বর্ণিত। যেমন : অধ্যাপক। ৪. গল্পের কাহিনি চিঠির আকারে লেখা। যেমন : স্ত্রীর পত্র। ৫. কিছু অংশ বর্ণনা এবং কিছু অংশ চিঠি। যেমন : দর্পহরণ। ৬. নাট্যাকারে বর্ণিত। যেমন : কর্মফল। ৭. রূপকথা বা রূপকথার ছলে বর্ণিত গল্প। যেমন : একটি আষাঢ়ে গল্প।

বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করলে রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রেম, সামাজিক জীবনে সম্পর্কবৈচিত্র্য, প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গযোগ ও অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ—এই কয়টি শ্রেণিবিভাগ পরিলক্ষিত হয়।

প্রেমের গল্প হিসেবে 'একরাত্রি', 'মহামায়া', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', 'মধ্যবর্তিনী', 'শাস্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'মানভঞ্জন', 'দুরাশা', 'অধ্যাপক', 'নষ্টনীড়', 'স্ত্রীর পত্র', 'পাত্র ও পাত্রী', 'রবিবার', 'শেষকথা', 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সব গল্পের কতগুলোর মধ্যে প্রেমের কোমল-মধুর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। কতগুলো গল্পে বুদ্ধির খরপ্রবাহ মিশ্রিত প্রেমের ব্যক্তিত্বপ্রকাশী দীপ্তলীলা ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলো গল্পে সামাজিক জীবনের বিচিত্র সম্পর্কের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে 'ব্যবধান', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'পণরক্ষা', 'দিদি', 'কর্মফল', 'দান প্রতিদান', 'দেনাপাওনা', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'হৈমন্তী', 'ছুটি', 'পুত্রযজ্ঞ', 'পোস্ট মাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা' ইত্যাদি। এই সমস্ত গল্পের মাধ্যমে সমাজের বিচিত্র মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিবিড় যোগাযোগের কথা কয়েকটি গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। এই শ্রেণির গল্পের মধ্যে 'শুভা', 'অতিথি', 'আপদ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলো গল্পের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ রয়েছে। 'গুপ্তধন', 'জীবিত ও মৃত', 'নিশীথে', 'মণিহারা', 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি গল্পের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

বাস্তব জীবন থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুলোর উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনও ঘটে নি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।' এ ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করে তিনি আরও উক্তি করেছেন, 'আমি একটা কথা বুঝতে পারি নে, আমার গল্পগুলোকে কেন গীতিধর্মী বলা হয়। এগুলো নেহাত বাস্তব জিনিস।

যা দেখেছি, তাই বলেছি। ভেবে বা কল্পনা করে আর কিছু বলা যেত, কিন্তু তা তো করি নে আমি।' বাস্তবের এই স্পষ্টতা আছে বলেই তাঁর গল্প অনন্যসাধারণ।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের দুয়েকটি চরিত্র ছাড়া আর সব চরিত্রই সাধারণ নরনারীর। এই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল। বালকবালিকার চরিত্রগুলোও বিশেষ সার্থকতার পরিচায়ক। 'গল্পগুচ্ছে' সংগৃহীত গল্পগুলোর মত তাঁর অপরাপর গল্পও পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়। 'সে' নামক গ্রন্থটি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য গল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে লিখিত। তবে তাতে বয়স্কদের উপযোগী সামগ্রীও যথেষ্ট বিদ্যমান। কবির বাল্যস্মৃতি মূল হিসেবে ধরে রচিত 'গল্পসল্প' নামক গ্রন্থটির রস আহরণ বয়স্কদের পক্ষেও সম্ভব। 'তিন সঙ্গীর' তিনটি গল্পই বিবিধ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ছোটগল্পের বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে গল্পগুচ্ছের বিভিন্ন চরিত্রের তালিকা থেকে। গল্পগুচ্ছের বিচিত্র মানুষগুলো ছিল এ রকম : অধ্যাপক, উকিল, এজেন্ট, কবিরাজ, কাবুলিওয়ালা, কায়স্থ, কুলীন, কৈবর্ত, খাজাঞ্চি, খানসামা, খালাসি, গণক, গোমস্তা, গোয়ালা, ঘাসিয়াড়া, চাষী, জেলে, তাঁতি, দারোয়ান, দারোগা, দালাল, দেওয়ান, ধোপা, নাজির, নাপিত, নায়েব, ডাক্তার, ডোম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পণ্ডিত মশাই, পাইক, পুরাতন বোতল সংগ্রহকারী, পুলিশ, বরকন্দাজ, বাউল, ব্রাহ্ম, বেদে, বোষ্টুমি, বৈষ্ণব, ভালুক নাচওয়ালা, ভৈরবী, ময়রা, মাস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যানেজার, মেছুনি, মেথর, মুটে, মুদি, মুন্সেফ, যাত্রাওয়ালা, যোগী, রাখাল, রানার, রায়বাহাদুর, সিপাহি, সিরিস্তাদার, স্যাকরা, সোফার, হরকরা, হাঁড়ি।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো কাব্যধর্মী। কল্পনার প্রাচুর্য অলঙ্কারবহুলতা প্রভৃতি কাব্যগুণ তাঁর গল্পে দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর ছোটগল্পকে দোষযুক্ত করে নি, পক্ষান্তরে এমন এক বৈশিষ্ট্য দান করেছে যা অন্য লেখকদের মধ্যে দুর্লভ। তিনি গল্প সরাসরি আরম্ভ করেন এবং মুহূর্তের মধ্যে পাঠকের মনকে ঘটনাস্রোতে মগ্ন করেন, ভূমিকা করেন না, দম নেবার জন্য থামেন না, পরোক্ষভাবে উপদেশ দেন না, ঠিক মুখে বলা গল্পের মত সহজ স্বচ্ছন্দ স্রোতে বয়ে চলে তাঁর কাহিনি। অনায়াসলব্ধ ভঙ্গিতে লেখার হাত ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রে' মন্তব্য করেছেন, 'আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোনটা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয় আমি ছোট ছোট গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।'

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রস্তাবনা, উপস্থাপনা, পরিণতি ও উপসংহার কলাকৌশলের দিক থেকে যেমন বিচিত্র, তেমনি বিষয় ও রসস্ফুরণের দিক থেকেও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই রচনারীতির মাধ্যমে তিনি যে ছোটগল্পের ধারার প্রবর্তন করেছেন তাই বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হয়েছে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্প পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার প্রসার ও বৈচিত্র্যে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের পুরাতন ব্যবস্থা ও অতীত জীবনযাত্রার সমস্ত রসধারা অগস্ত্যের মত তিনি এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া নিঃশেষ করিয়াছেন—বাংলার জীবন ও বহিঃপ্রকৃতি তাহাদের সৌন্দর্যের কণামাত্রও তাঁহার আশ্চর্য স্বচ্ছ অনুভূতির নিকট হইতে গোপন করিতে সমর্থ হয় নাই। অতীতের শেষ শস্যগুচ্ছ ঘরে তুলিয়া তিনি ভবিষ্যতের ক্রমসঞ্চয়ীমান ভাবসম্পদের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়াছেন।'

ভূদেব চৌধুরী 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, 'রবীন্দ্ররচনার আশ্রয়ে বাংলা ছোটগল্প প্রথম পূর্ণতা পেয়েছিল। কিন্তু এইটেই বড় কথা নয়। গল্পগুচ্ছের প্রাথমিক যুগের রবীন্দ্রগল্পের মধ্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জীবনভূমি পরিবর্তিত হয়েছে—শিল্পীর জীবনদৃষ্টি পেয়েছে এক অনাবিষ্কৃতপূর্ব জগতে প্রথম প্রবেশাধিকার। সাহিত্যের ইতিহাসে এইটেই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি—কেবল নতুন রূপকল্প নয়, নবতর জীবনের স্বাদ ও সন্ধান।'

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রযুগে উপন্যাস সাহিত্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করলেও তাঁর সার্থকতা ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই অধিকতর। ১৯০০ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ত্রিশ বৎসরাধিক কাল ধরে শতাধিক ছোটগল্প তিনি রচনা করেছেন। 'নবকথা', 'ষোড়শী', 'গল্পাঞ্জলি', 'গল্পবীথি', 'পত্রপুষ্প', 'গহনার বাক্স', 'হতাশ প্রেমিক', 'বিলাসিনী', 'যুবকের প্রেম', 'নতুন বই' ও 'জামাতা বাবাজী'—এই সকল গল্পগ্রন্থের মাধ্যমেই গল্পকার হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব অপরিসীম। তাঁর ছোটগল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও পরবর্তীকালে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। বাঙালি জীবনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসের ব্যাপকতর প্রকাশের চেয়ে ছোটগল্পের সঙ্কীর্ণ রূপটি সহজে রূপায়ণ সম্ভবপর বলে প্রভাতকুমারের এত বেশি সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের হাতে সার্থক বাংলা ছোটগল্প রচনার ধারা প্রবর্তিত হয় এবং তাঁর হাতেই ছোটগল্প চরমোৎকর্ষের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলোতে অসাধারণ সৌন্দর্য কল্পনার স্পর্শ পরিদৃশ্যমান। কিন্তু প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে সাধারণ বাঙালি জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি বহু স্থানে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে নিজ জীবনকে দেখেছেন—তাঁর অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে বিহারে কাশীতে বিলাতে ছড়ানো।এই ব্যাপক অভিজ্ঞতার নিদর্শন তাঁর গল্পে সহজলভ্য। বিদেশী চরিত্রের সহযোগে গল্পরচনায় প্রভাতকুমার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছেন। বিলাতের জীবন বা বিলাতে বাঙালির কাহিনি নিয়ে গল্পরচনা বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রভাতকুমার দ্বারাই সম্পন্ন হয়। তাঁর গল্পে ভাবাবেগ কম এবং সেগুলোতে কাহিনির আকর্ষণ বেশি। গল্পগুলোতে একদিকে ফুটে উঠেছে সরল ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ রচনাভঙ্গি অন্যদিকে যথাযোগ্য কৌতুকরস পরিবেশনেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর গল্পের স্বাচ্ছন্দ্য ও মাধুর্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, 'হাসির হাওয়ায়, কল্পনার ঝোঁকে পালের ওপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।'

শিশিরকুমার দাস তাঁর 'বাংলা ছোটগল্প' গ্রন্থে প্রভাতকুমারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যবর্তী সাহিত্যিক—এই কথাটি শুধু ঐতিহাসিক দিক থেকেই সত্য নয়, সাহিত্যরসের দিক থেকেও সত্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে আছে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের প্রতি বন্দনা, বিশ্ব ব্যাপী আনন্দের বিস্তৃতি আর শরৎচন্দ্রের মধ্যে আছে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক

জীবনজিজ্ঞাসা ও তার জটিলতা, ভাবালুতা, কাঠিন্য ও অশ্রুসজলতা। প্রভাতকুমারের সাহিত্যে কোন চিরন্তন সৌন্দর্যসন্ধান নেই—তেমনই শরৎচন্দ্রের মত সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা বা অশ্রুসজলতা নেই। অতুল ঐশ্বর্য প্রভাতকুমারের নেই—আবার জীবনের জটিলতায় তিনি উৎসাহী নন—তিনি মধ্যপন্থী।'

গঠনের দিক থেকে প্রভাতকুমারের গল্প সুগঠিত। তাঁর গল্প আখ্যানপ্রধান। তাঁর গল্পের সুগঠিত রূপের জন্য এক সময় তাঁকে 'বাংলার মোপাসাঁ' বলা হত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রভক্ত হয়েও আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। তিনি চিরপথিকের শিল্পদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। ছোটগল্পে তিনি চোখে দেখা ভাসমান ঘটনার ছবি এঁকেছেন। পথ চলতে দুহাতের মুঠো ভরে তিনি জীবনের যতটুকু পেয়েছেন গল্পে ততটুকু তুলে দিয়েছেন। ছবি দেখে ছবি আঁকার বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। জগদীশ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রগল্পের সঙ্গে প্রভাতকুমারের বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের রচনায় কবিধ্যেয় ভাব-সত্যই গল্পদেহে বিরাজমান, প্রভাতকুমারের গল্পে প্রাথমিক আবেদন গল্পের মধ্যেই। ভাবাত্মা তার গল্পদেহে অনুবিষ্ট নয়, গল্পদেহেই তার উদ্ভব।'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) প্রধানত ঔপন্যাসিক; তাঁর ছোটগল্পের সংখ্যা খুবই কম। তবু সেই স্বল্পসংখ্যক গল্পে তাঁর বিশেষ প্রতিভার পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। 'মন্দির' গল্প নিয়ে তিনি সাহিত্যসমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সম্ভবত শরৎচন্দ্র ছোটগল্প রচনার শিল্পগত কুশলতার অধিকারী ছিলেন না, তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তাই বেশি কার্যকর ছিল। সেই জন্য 'কাশীনাথ', 'একাদশী বৈরাগী', 'মামলার ফল', 'পরেশ', 'বিলাসী' ইত্যাদি রচনা ঠিক ছোটগল্পের প্রকৃত সীমানায় আসে নি। প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় গল্পের জন্যই তাঁর কৃতিত্ব। সে দিক থেকে 'অভাগীর স্বর্গ' ও 'মহেশ' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। 'মহেশ' গল্পটি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এক কালে এই গল্পে গো-হত্যা আছে বলে গল্পটির বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছিল।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পগুলোর বিষয়-বৈচিত্র্য খুবই কম। পারিবারিক বা সামাজিক দ্বন্দ্ব তাঁর কাহিনির প্রধান বিষয়। তাঁর উপন্যাসের মতই তাঁর ছোটগল্পে পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য বেশি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর গল্পে হাস্য, ব্যঙ্গ বা নিষ্ঠুর বেদনার চিহ্ন নেই, আছে কারুণ্য বা পরিণামী মিলন। তাঁর গল্পের আঙ্গিক বিবৃতিমূলক। শরৎচন্দ্র গল্পরচনায় চরিত্রসৃষ্টির দিকে বেশি মনোযোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন জীবন-সন্ধানী শিল্পী। আশ্চর্য সুন্দর প্লট পরিকল্পনায় তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। কিন্তু তাঁর বিশুদ্ধ ঔপন্যাসিক প্রতিভার পক্ষে অতুল্য প্লটের ছোটগল্পায়ন ছিল অসম্ভাব্য। তাই তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সার্থক গল্পশিল্পী হলেও সিদ্ধকাম ছোটগাল্পিক ছিলেন বলে মনে করা যায় না।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গগল্পের ধারায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর গল্পে ব্যঙ্গবিদ্রূপ থাকলেও গল্পের আবেদন সহৃদয় জীবনরসে স্নিগ্ধ। ভূদেব চৌধুরীর মতে, 'শরৎচন্দ্রের মত কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রতিপাদনের জন্য

কেদারনাথ গল্প রচনায় লেখনী ধারণ করেন নি। তাঁর সৃষ্টি গহনে অনতি-উচ্চারিত যে জীবনবাণী অন্তর্লীন হয়ে আছে, সে ছিল শিল্পীর চোখেদেখা জীবনেরই এক অপরিচ্ছেদ্য মহৎ সম্পদ।' কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থগুলো হল : 'আমরা কি ও কে', 'কবুলতি', 'পাথেয়', 'দুঃখের দেওয়ালী', 'মা ফলেষু', 'সন্ধ্যা শঙ্খ' ও 'নমস্কারী।'

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশুদ্ধ হাস্যরসিক নন। হাসির সঙ্গে অশ্রুর কিংবা তাপজ্বালাহীন বেদনার সূত্রে অনতিলঘু হাসির মালা গাঁথাই তাঁর শিল্পী স্বভাব।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) মৌলিক গবেষণা এবং প্রবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত থাকলেও কথাশিল্পী হিসেবে সমধিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা আটাশ এবং গল্পসংকলন ষোলটি। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভের ফলে গল্প রচনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গল্প রচনার ব্যাপারে তাঁর একটি নিজস্ব প্রবণতা ছিল বলে তাঁর গবেষণাধর্মী রচনার পাশে কথাসাহিত্যও সহজেই আসন করে নিয়েছে। কথাশিল্পী হিসেবে তাঁর সৃজনপ্রেরণার অনেকখানিই ছিল রবীন্দ্র সান্নিধ্যের ফল। চারুচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল একটি রুচি-সূক্ষ্ম কাব্য-সাহিত্য-রসিক মন,— রবীন্দ্রচেতনার আলোকস্পর্শে তা সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। এই পুঁজি নিয়েই তিনি রসস্নিগ্ধ গল্প রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'পুষ্পপত্র', 'ধূপছায়া', 'বরণডালা', 'চাঁদমালা', 'মণিমঞ্জরী' ইত্যাদি তাঁর গল্পসংকলন। কবিত্বময় সূক্ষ্ম ভাবানুভূতিসম্পন্ন জীবনবীক্ষণই তাঁর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্পই ভাবালুতা দুষ্ট। তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের মত কল্পনাভঙ্গি বা জীবনের জটিল দ্বন্দ্বের মধ্যে কাহিনি গাঁথার শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর একশ্রেণীর গল্পে আছে রূপকথার প্রভাব এবং তাতেই তাঁর সার্থকতা বেশি প্রকাশ পেয়েছে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'চারুচন্দ্র আমাদের এই দুঃস্বপ্ন-বিড়ম্বিত চিত্তে প্রাচীন আস্বাদের বাণী বহন করিয়া আনেন, চিরন্তন শান্তি ও স্নিগ্ধতার সুরটি পরিবেশন করেন।'

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

'ভারতী' সাহিত্যপত্র কেন্দ্র করে যে সকল গল্পকারের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯) উল্লেখযোগ্য। তিনি শেষের দিকে বছর দশেক ভারতীর সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি ছোটদের জন্য অনুবাদমূলক গল্প লিখেছেন। 'জাপানী ফানুস', 'কল্পকথা' ইত্যাদি তাঁর অনুবাদ। মণিলাল স্বল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প রচনা করলেও তাঁর কোন কোন গল্প বাস্তব জীবন চিন্তায় সেকালে পথ-প্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। বাস্তব জীবন-চিত্রণের দুঃসাহসিকতার পরিচয় তাঁর কিছু গল্পে বিদ্যমান। রসকাহিনি সৃষ্টিতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। তাঁর গল্পগ্রন্থ হচ্ছে : 'ঝাঁপি', 'পাপড়ি', 'জলছবি' ও 'খেয়ালের খেশারৎ'। মণিলালের রচনারীতিতে সূক্ষ্মতা আছে, শিল্পবোধ আছে, নেই অভিজ্ঞতা। গল্পরচনায় তাঁর স্বাভাবিক নিপুণতা ছিল। তাঁর গল্পের রস যতটা বাস্তব তার অপেক্ষা বেশি

রোমান্টিক। তাঁর লেখায় বস্তুভার কম, কল্পনা বেশি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর গল্প সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'যথার্থই আপনার লেখার ঢংটা কবির মত। টুইন্‌টুইন্‌ ভাবের কবিতা যেমন লোকের ভাল লাগে না তাদেরই আপনার লেখা ভাল লাগে না।'

সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এই সঙ্গে সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের (১৮৮৪-১৯৬৬) নাম করা যায়। তিনিও 'ভারতী'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর কিছু অনুবাদ আছে। প্রচুর উপন্যাসও তিনি রচনা করেছেন। 'শেফালি', 'নির্ঝর', 'পুষ্পক', 'মৃণাল', 'যৌবরাজ্য', 'পিয়াসী' ইত্যাদি তাঁর গল্পগ্রন্থ। তিনি প্রেম, সাধারণ সুখদুঃখ, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনি গল্পে স্থান দিয়েছেন। বহু জনপ্রিয় ও বহু পঠিত লেখক হিসেবে সৌরিন্দ্রমোহন তাঁর কালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সমকালীন জীবনচিত্রণের জন্যই তাঁর এই খ্যাতি। তাঁর রচনারীতি সরস, ফেনানোর চেষ্টা নেই।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪) ভারতী গোষ্ঠীর লেখক। তাঁর গল্পে আছে রসের সমারোহ। তাঁর গল্পরসিক স্বভাবের মধ্যে ছিল এক অনায়াসমুক্ততা। তিনি গল্পের বিষয়বস্তুর বাস্তবতা, চরিত্রের অমোঘতা, বিন্যাসের পারিপাট্য—কোন কিছুর দিকেই মনোযোগী ছিলেন না। তিনি যে কোন বিষয় নিয়েই সার্থক গল্প রচনা করতে পারতেন। 'বাজীকর', 'অচলপথের যাত্রী', 'ঝড়ের পাখী', 'চাষার মেয়ে', 'অরুণা', 'দুই রাত্রি', 'কল্পনা দেবী', 'স্বর্গের চাবি' প্রভৃতি তাঁর গল্পগ্রন্থ। তাঁর 'কাহিনি প্রায়ই অভিজ্ঞতাশ্রিত, বাস্তবনিষ্ঠ অথবা বাস্তবঘেঁষা।' ব্যঙ্গাত্মক রচনারীতির পরিচয়ও তাঁর গল্পে বিদ্যমান।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) ভারতী পরিচালনায় জড়িত ছিলেন। 'পসরা', 'মধুপর্ব', 'সিঁদুর চুপড়ী', 'মালাচন্দন', 'বেনোজল', 'শূন্যতার প্রেম' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থে গল্পকার হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। ভাবালুতার আতিশয্য তাঁর গল্পে স্পষ্ট।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭) ছেলেভুলানো গল্পকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবেশন করেছিলেন। 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'ঠানদিদির থলে', 'দাদামহাশয়ের থলে' ইত্যাদি গ্রন্থে রূপকথা ব্রতকথার গল্প স্থান দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) রচিত 'টুনটুনির বই' ছেলেভুলানো গল্পের বিশিষ্ট সংগ্রহ হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) গল্পরচনার ক্ষেত্রে কিছুটা দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। ফরাসি সাহিত্যের রসজ্ঞ হিসেবে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র রুচি ও মেজাজের অধিকারী। বাংলা ছোটগল্পে প্রমথ চৌধুরীর অবদানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচক ভূদেব চৌধুরী

মন্তব্য করেছেন, 'বিচিত্রভঙ্গিতে গল্প লিখেছিলেন চৌধুরী মশায় নানা অ-সদৃশ বিষয়বস্তু নিয়ে। কিন্তু তাঁর সকল গল্পেরই আঙ্গিক ও রসপরিণামগত ফলশ্রুতি প্রায় অভিন্ন। অর্থাৎ, কোন গল্পই পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারে নি কেবল একান্ত রূপ-সংহতির অভাবে;—বস্তুত তাঁর সব গল্পেই ছোটগল্প, প্রবন্ধ বা ব্যক্তিত্বধর্মী রচনা এবং কথিকার রূপ-মিশ্রতা রয়েছে। গল্পের এক দেহে অনেক আঙ্গিকের যৌথ মণ্ডনের কলাকৌশলে শিল্পের অভিনব এক রমণীয় মূর্তি গড়ে তোলার 'সাহিত্যিক খেলা' খেলে গেছেন তিনি বাংলা গল্পের ইতিহাসে।' 'চার ইয়ারী কথা', 'আহুতি', 'নীললোহিত' ইত্যাদি তাঁর গল্পগ্রন্থ। কৌতুকসৃষ্টিতে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল, গল্পে সে নিদর্শন আছে।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন ফরাসি সাহিত্যের রসজ্ঞ। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। ফরাসি সাহিত্যের ক্ষিপ্রতা ও লঘুতার প্রভাব যেমন আছে, তেমনি সংস্কৃত ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের বলিষ্ঠতা ও সৌন্দর্যের প্রতি আসক্তি তাঁর রচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি ব্যঙ্গ ও আঘাতে ছিলেন সুনিপুণ। তাঁর ভাষা শাণিত। বাঙালির স্বভাব কোমল গীতিবিলাসিতা, অশ্রুপ্রিয়তা ও আবেগের আতিশয্যের প্রতি তিনি তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। তাঁর উপভোগ্যতা ছিল কৌতুক সৃষ্টির ক্ষমতায়। তিনি উজ্জ্বল ভাষায় ও শাণিত ভঙ্গিতে গল্প রচনা করেছেন। তবে তাঁর বহু রচনাকেই ভাবের দিক থেকে অগভীর এবং কথার মারপ্যাঁচে ভরা বলে মনে করা হয়। 'তাঁর গল্পগুলো লঘু চপল। কখনও মেঘের মত গভীর, মনের ওপর ছায়া ফেলে কিন্তু বারিবর্ষণ করে না। তাঁর গল্প হাসিতে ঝলমল করে, অশ্রু তাঁর সখা নয়।'

রাজশেখর বসু

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) পরশুরাম ছদ্মনামে বাংলা সাহিত্যে হাসির গল্পের বিপুল সম্ভার আনয়ন করেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানে পণ্ডিত এবং কর্মসূত্রে বৈজ্ঞানিক শিল্পশালার পরিচালক। ১৯২২ সালে 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্প নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব এবং তখন থেকেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। সংযমস্নিগ্ধ রসিকতা ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। ধর্মের মিথ্যাচার, অলস ভাববিলাস, ভণ্ডামি প্রভৃতিকে তিনি জ্বালাহীন কৌতুকের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করে সমাজ ও জীবনের বিচিত্র অসঙ্গতি উন্মোচন করেছেন। তাঁর গল্পসৃষ্টির রসমধুর রূপের পরিচয় মিলে 'গড্ডালিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'ধুস্তুরী মায়া', 'কৃষ্ণকলি ও অন্যান্য গল্প', 'গল্পসল্প', 'নীলতারা' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থে।

বেগম রোকেয়া

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) নারী-জাগরণের উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁর 'মতিচুর' গ্রন্থে কতগুলো গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কল্লোল পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিক গোষ্ঠী বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিরেন। বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে তাঁরা বিশিষ্ট ছোটগল্প রচনা করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮) এই পর্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

ছোটগল্পকার। 'প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এ দেশে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, যে সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল, সেই কদর্যতা, লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীরুতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, মানুষের হিংসা, কদাকার অহঙ্কার, বুদ্ধিজীবীর মানসিক বিকার ও নৈরাশ্য—সবকিছুই অনবদ্য আঙ্গিকের আশ্রয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের উপাদান হয়েছে।' প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগ্রন্থগুলো : 'বেনামীবন্দর', 'পুতুল ও প্রতিমা', 'অফুরন্ত', 'পঞ্চশর', 'মহানগর', 'ধূলিধূসর', 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে', 'সামনে চড়াই', 'সপ্তপদী', 'ডাল পায়রা', 'প্রেমই ধন্বন্তরী', 'নানা রঙে বোনা' ইত্যাদি। তাঁর গল্পের ভাব গভীর এবং অচঞ্চল, ভাষা সহজ এবং ধীরগতি। কবিতা ও কথাসাহিত্যে একই সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল অপ্রতিরোধ্যভাবে। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা ছোটগল্পকার হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালে রূপে-গুণে নিটোল ছোটগল্প রচনায় তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬) বাংলা ছোটগল্প রচনায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। গল্পরচনার বাহুল্যে তিনি সমগোষ্ঠী লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর গল্পে রূঢ় বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। কল্লোল যুগ-বাসনার অন্যতম সুনির্দিষ্ট লক্ষণ নবজীবনের যৌবনক্ষুধা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ব্যক্তিচেতনায় অনুভূত হয়েছিল এবং তাঁর গল্পে তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। আকর্ষণীয় ভাষায় তিনি তাঁর গল্পের ঘটনা বর্ণনা করে গেছেন। ফলে কথার ঝোঁকে কথার ফুলঝুরি খেলা জমে উঠেছে কখনও হয়তবা অজান্তেই; গল্পের রস ছড়িয়ে পড়েছে,—গল্পের শরীরেও অনেক সময় রেখায়িত হয়ে ওঠে নি সুঠাম রূপের গড়ন। তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার পুঞ্জিত সঞ্চয় ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে। 'টুটাফাটা', 'ইতি', 'অধিবাসী', 'অকাল বসন্ত', 'কাঠ-খড়-কেরোসিন', 'হাড়ি-মুচি-ডোম' ইত্যাদি পঁচিশটিরও বেশি গল্পগ্রন্থ তাঁর রয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'তাঁহার লেখায় 'আধুনিকতা' অত্যন্ত প্রবল এবং প্রায় কনভেনশনের মত। গোড়ার দিকে রচনায় যৌনবিষয়ে যে উৎকট বে-আব্রু মনোভাব দেখা যায় তাহা এই কনভেনশনেরই দায়ী। এ বিষয়ে ইঁহার সহযোগী বুদ্ধদেব বসুও অনুৎসাহী ছিলেন না। অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব শক্তিশালী লেখক, তাই সহজেই ইঁহারা সাহিত্যের এই শক ট্রিটমেন্ট ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।'

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) সাহিত্যের অপরাপর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ছোটগল্প প্রধানত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ এবং রোমান্টিক মাধুর্যে মণ্ডিত। তাঁর গল্প নিটোল পূর্ণাঙ্গ কবিতাধর্মী—তার শরীরে কাব্যাড়ম্বর নেই, অথচ রূপে ও স্বভাবে ছড়িয়ে আছে কবিতার সুস্পষ্ট স্বাদুতা। তাঁর গল্পের রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা-মেদ, মায় প্রাণ পর্যন্ত অনেক সময়ে কবিতার ধর্মে গড়া,—তাই তার শরীরে কাব্য গড়ে তোলার অতিসচেতন আড়ম্বর নেই। তাঁর দুর্লভ ঝঙ্কার স্পন্দিত সুপ্রযুক্ত ভাষার শৈলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্লটের মধ্যে আর কিছু এমন বস্তু থাকে না যাকে

দু হাত দিয়ে ধরা যায়। 'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প', 'এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে', 'অসামান্য মেয়ে', 'ঘরেতে ভ্রমর এল', 'নতুন নেশা', 'খাতার শেষ পাতা' ইত্যাদি অনেক গল্পগ্রন্থ তাঁর রচিত। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন সমকালীন সাহিত্য-শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টির অধিকারী। তিনি অসংখ্য গল্প লিখে গেছেন। তাঁর গল্পে রূপের প্রকরণে সচেতন বৈচিত্র্য-বিলাসের পরিচয় বিদ্যমান। তাঁর গল্পের কোথাও পত্র-প্রধান, কোথাও সুরের মত সংলাপ, কোথাও কথা, বিবৃতি, মনস্তত্ত্ব। তাঁর সকল সফল রচনাতেই আছে একটানা কবিতার আবহ। তাতে সুরের রেশও আছে। তিনি নিজেই বলেছেন, 'এমন গল্প কিছু লিখেছি যাকে গল্পাকারে প্রবন্ধ বললে দোষ হয় না।'

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) কথাসাহিত্যিক হিসেবে যথেষ্ট স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত কবিতার মত ছোটগল্পের জগতেও এক অনন্যপূর্বতার স্বাদ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর প্রথম গল্পসংকলন 'ব্যথার দান' গদ্যকাব্য নামে প্রশংসা অর্জন করেছিল। তাঁর গল্পে বিচিত্র চেনা রূপের আভাস থাকলেও বিশেষ রূপসৃষ্টির কোন পূর্বসংস্কার গভীর ছাপ ফেলতে পারে নি। 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' ও 'শিউলিমালা' গ্রন্থে তাঁর গল্পগুলো সংগৃহীত। তাঁর রচিত গল্পসংখ্যা আঠার, তার মধ্যে ষোলটিই প্রেমের গল্প। ভূদেব চৌধুরী 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'গল্প হিসেবে এরা অবিস্মরণীয় নয়,—না শৈলীতে, না বিষয়বিন্যাসে; কিন্তু ইতিহাসের দরবারে এই সংস্কারমুক্ত অন্য রূপরচনার প্রসঙ্গ অবান্তর নয়, বিশেষ করে অপর সকল নজরুল-রচনার মত এদের অদ্ভুত অভিব্যক্তি ও স্বাদুতার বৈশিষ্ট্য।' কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পের মূল উপকরণ যৌবন—যৌবনের অমিতবীর্য ও যৌবনের ভীরুমন্থরতা। বাংলা ছোটগল্পে তাঁর আবির্ভাব এই যৌবনের জয়গান গেয়েই। তাঁর গল্পের ঐতিহাসিক মূল্য এখানে যে, রবীন্দ্রলালিত ও বাংলা গল্পের অন্যান্য ঐতিহ্যপুষ্ট লেখক গোষ্ঠীর থেকে তাঁর গল্প পৃথক ও বিশিষ্ট।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-৭৬) তাঁর গল্পে কয়লা খনির আদিম জীবনরূপ, মহানগরীর জৌলুস ও উজ্জ্বলতার অন্তরালে শিল্পশহরের স্বাভাবিক ক্ষুধা আর লালসা, আর একদিকে বাংলার গ্রামীণ জীবনের রাঢ়পল্লীর শান্তস্নিগ্ধ ক্ষয়িষ্ণু রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অতসী', 'বধূবরণ', 'মারণমন্ত্র', 'নারীমেধ', 'দিনমজুর' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ তাঁর প্রতিভার নিদর্শন। বাংলা গল্পে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য নিয়ে এলেন শৈলজানন্দ। রানীগঞ্জে ধানবাদের কয়লা খাদের পটভূমিতে রচিত গল্পগুলো এর সাক্ষ্য। সাঁওতাল ও কুলির রুক্ষ জীবনের বিরোধ অপমান, ভালবাসা, সাঁওতালি পুরুষের মাতোয়ারা মন, দীপ্ত স্বাস্থ্য, সাঁওতাল নারীর চঞ্চল হাসি তাঁর গল্পে এক বিচিত্র মাধুর্য দিয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনের ব্যথা, বেদনা, সামাজিক বৈষম্য ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতির চিত্র তাঁর গল্পে সহজেই দেখা যায়।

শৈলজানন্দ সমকালীন জীবনানুভবের শিল্পী হিসেবে ছিলেন অনন্য। তিনি ছোট মানুষের ছোটতাকে, তাদের অভাব-অভিযোগ দৈন্যকে পাশ কাটিয়ে যান নি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সমকালীন কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) আসন ছিল অত্যুচ্চ শীর্ষবর্তী। তিনি তাঁর দেশ দক্ষিণপূর্ব বীরভূমের সাধারণ মানুষের জীবন—পুরানো জমিদার ঘর থেকে মাল-বেদে পাড়ার পর্যন্ত পরিচয় গল্পে রূপায়িত করেছেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচয় তাঁর গল্পে সহজলভ্য। বৈষ্ণববৈষ্ণবী, বেদেবেদেনী ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের চরিত্র অবলম্বন করে তাঁর গল্পগুলো রচিত। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের পরিচয়ও তাঁর গল্পে পাওয়া যায়। 'পাষাণপুরী', 'নীলকণ্ঠ', 'ছলনাময়ী', 'জলসাগর', 'রসকলি', 'তিন শূন্য' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, 'তারাশঙ্করের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা, সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্যঘোষণার কৃত্রিমতায় তাঁর বিষয়গুলো সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকে নি।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬) 'অতসীমামী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'মিহি ও মোটা কাহিনি', 'আজ কাল পরশুর গল্প' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থের গল্পের মাধ্যমে যে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছেন তাতে তাঁকে প্রথম শ্রেণির গল্পলেখকের পর্যায়ভুক্ত মনে করা চলে। কল্লোল যুগের বাস্তবধর্মিতার আদর্শ তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক জীবনদৃষ্টির মাধ্যমে জীবনের ক্লেদ-গ্লানি-নিষ্ঠুরতার অন্তরালবর্তী সত্য রূপটিকে খুঁজেছেন। অকল্পনীয় দক্ষতায় জীবনের অমৃতস্বাদ আর বিষাক্ত লাভাস্রোতকে একই পাত্রে ঢেলে তিনি পান করেছেন। তাঁর গল্প সে নিদর্শনের বাহক।

তিনি ছিলেন আদর্শ বিজ্ঞানীর মত তথ্যনিষ্ঠ। তিনি তীব্র বিচ্ছুরিত বিশ্লেষণী দৃষ্টির ছুরিকাঘাতে জীবনের ক্লেদ-গ্লানি-নিষ্ঠুরতার অন্তরালবর্তী সত্যরূপটিকে টুকরো টুকরো করে খুঁজে দেখেছেন। কোন উচ্ছ্বাস কোন বিহ্বল পক্ষপাত তাঁর কঠিন অনুসন্ধিৎসাকে বিন্দুমাত্র কম্পিত বা পথভ্রষ্ট করতে পারে নি। তিনি মনে করতেন, 'এ যুগে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অসম্ভব—তাতে শুধু পুরনো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে।'

প্রমথনাথ বিশী

প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-৮৫) ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। 'ডাকিনী', 'অশরীরী', 'গল্পের মত' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান। প্রমথনাথ বিশীর সাহিত্যসাধনা ছিল সর্বতোমুখী। আকৃতি ও প্রকৃতিতে তাঁর রচনা বিচিত্র স্বাদের। স্বনামে, বেনামে ও সংক্ষিপ্ত নামে তিনি লিখেছেন প্রচুর। গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধে, ভাবগম্ভীর ও পরিহাস কুটিল রচনায় তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। ছোটগাল্পিক প্র. না. বি. রুক্ষকঠিন পরিহাস-শিল্পী রূপেই সবিশেষ জনপ্রিয়। হাসি আর গল্প মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্পের ভাবরূপ রচনার সাফল্য নিয়ে প্রমথ বিশী স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়ে স্মরণীয়। তাঁর গল্প চটুল, সরস, কখনওবা ব্যঙ্গ শাণিত চমকপ্রদ কাহিনির সমষ্টি। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

'তাঁহার প্রকৃতি-পরিবেশের সহিত তুলনায় তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি রিক্ত ও নির্জীব। কবিত্বপূর্ণ অনুভূতির ও গভীর চিন্তাশীল মন্তব্যের সংমিশ্রণে ও ভাষা প্রয়োগের অদ্ভুত নিপুণতায় তিনি যে বিচিত্র কারুকার্যখচিত রাজপরিচ্ছদ বয়ন করিয়াছেন, তাঁহার স্বভাবদরিদ্র নরনারীর অঙ্গে তাহা মোটেই শোভন হয় নাই।'

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭) 'রানুর প্রথম ভাগ', 'রানুর দ্বিতীয় ভাগ', 'রানুর তৃতীয় ভাগ, 'রানুর কথামালা', 'বরযাত্রী', 'নাটক নয় নভেল', 'কন্যা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী এবং', 'বসন্তে', 'শারদীয়া', 'চৈতালী', 'লাজবতী', 'হাসি ও অশ্রু' 'আনন্দপট', 'কবি ও অকবি' ইত্যাদি ছোটগল্প গ্রন্থের মাধ্যমে কাব্যধর্মের উৎকর্ষ ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বিভূতিভূষণের গল্পগুলো প্রধানত হাস্যরসমূলক হলেও তাঁর হাস্যরসিকের লঘু দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে যে কবিসুলভ সৌন্দর্যবোধ ও দার্শনিকের সূক্ষ্মদর্শিতা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা সহজেই লক্ষ করা যায়। তাঁর গল্পগুলো ব্যক্তিজীবন অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে গঠিত। তিনি বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ ধরনের হাসির গল্পের রূপকার হিসেবে বিশ্রুত হয়ে আছেন। তাঁর জীবন-পরিবেশ, তথা তাঁর স্বতন্ত্র জীবন-চেতনার বৈশিষ্ট্য তাঁর গল্পের মুখ্য উপাদান হয়ে আছে। তিনি নিজেদের বৃহৎ যৌথ পরিবারের ভিতর থেকে প্রধানত হাসির গল্পের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর হাসির গল্পগুলো নিছক হাসিভরা নয়, কোন এক অধরা বেদনার প্রচ্ছন্নতায় আবিষ্ট। অনেক সময়েই সেসব গল্পের মুখে হাসি, চোখে জল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ছোটগল্প রচনায় কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয় রেখেছেন। 'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল', 'যাত্রাবদল', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'কিন্নর দল', 'বেনীগীর ফুলবাড়ি', 'বিধু মাস্টার', 'অসাধারণ', 'নবাগত', 'কুশল পাহাড়ী', 'রূপহলুদ', 'ছায়াছবি' ইত্যাদি তাঁর গল্পের বই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন, 'বর্তমান বাঙালি লেখকগণের সকলেরই রচনা স্বকাল ও স্বসমাজ দ্বারা চিহ্নিত, কিন্তু বিভূতিভূষণের অধিকাংশ রচনায় যেন দেশকালের কৈবল্য ঘটিয়াছে, সে-সব যে আজকার ঘটনা, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিবার উপায় নাই। তাঁহার রচনায় কোকিল ডাকিতেছে তাহা শুনিয়া মনে পড়ে 'বাংলাদেশে ছিলাম যেন তিন শ বছর আগে।' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাম-লালিত শিল্পী। গ্রামের প্রকৃতি, গ্রামের জীবন তাঁর সার্থক সৃষ্টির প্রায় একক প্রেরণা। তাঁর মুক্ত ভাবনার পক্ষপুটাশ্রয়ে বাংলার অশিক্ষা-দারিদ্র্য লাঞ্ছিত রোগাচ্ছন্ন গ্রামীণ জীবন আপন স্বভাবকে অতিক্রম না করেও এক বৈশ্বিক মাত্রা অর্জন করেছিল।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) বৈচিত্র্যধর্মী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইতিহাস থেকে কাহিনি এবং সাধারণ জীবন থেকে ঘটনা নিয়ে তিনি কতকগুলো ভাল গল্প

লিখেছিলেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম : 'জাতিস্মর', 'ডিটেকটিভ', 'চুয়াচন্দন', 'কাঁচামিঠে', 'কালকূট', 'গোপন কথা', 'দন্তরুচি', 'পঞ্চভূত', 'ছায়া পথিক', 'কানু কহে রাই' ইত্যাদি।

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী গল্পলেখক। তাঁর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য 'কাহিনির কঠোর দুঃখময়তায় এবং রচনারীতির বিদ্রূপ ইঙ্গিতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত স্পষ্টতায়।' মনোবিকৃতির ঘটনা তাঁর গল্পগুলোর বিশেষত্ব। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে : 'বিনোদিনী', 'রূপের বাহিরে', 'পাইক শ্রীমিহির প্রামানিক', 'শ্রীমতি', 'উপায়ন', 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী', 'গতিহারা জাহ্নবী', 'মেঘাবৃত অশনি', 'নন্দা আর কৃষ্ণা' ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যে জগদীশ গুপ্ত অবচেতন মনের গতির প্রথম শক্তিমান শিল্পী। তাঁর রচনার প্রধান গুণ নির্মম নিরাসক্তি। তাঁর কাহিনির নায়কেরা সাধারণ জাতির নিচু শ্রেণির মানুষ। এক দুর্বার, অনিবার্য নিয়তিবাদ তাঁর কাহিনির মূল সুর। এক অন্ধশক্তি মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করে। তাঁর গল্পে মানুষ যেন এক অন্ধশক্তির পুতুল।

বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭৯) রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তুর সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবিনী শক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা এবং নানারূপ পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানবচরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে। বনফুলের লেখা ছোটগল্পগুলোকে বাংলা সাহিত্যে এক অপরূপ বিস্ময় বলে মনে করা যায়। এই বিস্ময় কেবল আশ্চর্য বাকসংক্ষিপ্তির কল্যাণেই নয়,—শৈলী ও ভাবানুষঙ্গে এমন অনির্বচনীয় রহস্যময়তা বিদ্যমান, যার অদৃশ্য প্রভাবে স্বল্পকথার সর্বাঙ্গ ঘিরে বচনাতীতের এক মৌন স্পর্শ যেন গুঞ্জন করে। গল্পে তাঁর আঙ্গিক চিন্তা ছিল নিয়ত নতুন। 'বৈতরণী-তীরে', 'বনফুলের গল্প', 'বনফুলের আরো গল্প', 'বাহুল্য', 'বিন্দু- বিসর্গ', 'অদৃশ্য-লোকে', 'তন্বী', 'উর্মিমালা', 'রঙ্গনা', 'করবী', 'মনিহারী', 'অদ্বিতীয়া' ইত্যাদি তাঁর গল্পগ্রন্থ। বনফুলের গল্পে এমন রচনা সুলভ, যেখানে আপন জীবন অথবা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন। সকল সার্থক সৃষ্টির মতই তাঁর সকল লেখা আত্মকথারই ফসল। নতুন কথার সঙ্গে নতুন ধরনের কথা বলার আগ্রহ তাঁর শিল্পীচেতনায় প্রবল ছিল।

মনোজ বসু

মনোজ বসু (১৯০১-৮৭) প্রচুর লিখেছেন। তাঁর গল্পের বই 'বনমর্মর', 'নরবাঁধ', 'দেবী কিশোরী', 'পৃথিবী কাদের', 'একদা নিশীথ কালে', 'দুঃখ নিশার শেষে', 'উলু', 'খদ্যোত', 'কাঁচের আকাশ', 'দিল্লি অনেকদূর', 'কুসুম', 'কিংশুক', 'মায়াকান্না', 'গল্পপঞ্চাশৎ', 'কনকলতা', 'ওনারা' ইত্যাদি। সমালোচকের মতে, 'রোমান্সপ্রিয় লেখক তিনি, কিন্তু তাঁর রোমান্সে মিশিয়ে আছে গ্রামবাংলার একেবারে মাটি মাখানো আকৃতি; বিদেশী ফেস-পাউডারের গন্ধ জড়ানো অন্য জগতের রোমান্স। এই তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি। এইখানেই তাঁর সিদ্ধি, প্রাকৃতিক পরিবেশ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন

বারবার, বারবার মানবিক জগতে ফিরে আসতে; যে মানুষ মাটির মানুষ, মনোজ বসু তাদেরই কাছাকাছি লেখক।' মনোজ বসুর গল্পশিল্প কালের নিরিখে কল্লোল যুগের তটবর্তী। বয়ঃসন্ধিমথিত স্বভাবকিশোর মনের আহত-স্বপ্ন অস্ফুট কান্না, ভারহীন জীবন-মমতাবোধের এক স্বভাবকরুণ যাদুস্পর্শই মনোজ বসুর গল্পরসের উৎসমূল।

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছোটগল্প রচনা করেছেন। 'প্রকৃতির পরিহাস', 'মনপবন', 'যৌবনজ্বালা', 'কামিনী কাঞ্চন' ইত্যাদি তাঁর গল্পগ্রন্থ। অন্নদাশঙ্কর তাঁর রচনায় সচেতন দৃঢ়তায় প্রগাঢ় বর্ণে আত্মপ্রক্ষেপ করে চলেছেন। তাঁর বর্ণনার বিষয় অথবা প্রকরণের কোন ক্ষেত্রেই সৃষ্টিরহস্যের মূল তাৎপর্যটি নিহিত নেই; স্রষ্টার একান্ত ব্যক্তি-ভাবনার প্রেক্ষাপটে প্রতিফলিত করে দেখতে পারলে, তবেই তাঁর সৃষ্টির শরীরে প্রাণের দীপ্তি সমুচিত বর্ণাঢ্যতায় বিচ্ছুরিত হয়। অন্নদাশঙ্করের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি কেবল সুন্দরের লোভে সৃষ্টি করেন না,—শিল্প-সাহিত্যের সৌন্দর্যলোকে তিনি কঠিন সত্যান্বেষী, সত্যের দৃঢ় ভিত্তির ওপরে সৌন্দর্যের বেদী রচনার প্রয়াস তাঁর। অন্নদাশঙ্কর নিজের ভাষায় নিজের মত করে গল্প লিখেছেন। তিনি গল্প লিখেছেন চোখে-দেখা ক্ষয়শীল অব্যবহিত জীবনের প্রেক্ষাপটে। তাতে গল্পের পরিধি বড় হয়েছে, কিন্তু সংগতি বা সংহতির অভাব ঘটে নি।

সৈয়দ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৫-৭৪) রসালো গল্প রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সুরসিক সাহিত্যিকের দুর্লভ প্রতিভার বিস্ময়কর সম্মিলন ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। জীবনের ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পে রূপায়িত হয়েছে। 'পঞ্চতন্ত্র', 'ময়ূরকণ্ঠী', 'চাচাকাহিনি' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ তাঁর প্রতিভার সার্থকতার নিদর্শন।

প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭-৮৩) গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণকাহিনি-স্মৃতিকথা সবই লিখেছেন। তাঁর গল্পের রীতি সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী। 'চেনা ও জানা', 'নিশিপদ্ম', 'অবিকল', 'অঙ্গরাগ', 'কয়েক ঘণ্টা মাত্র', 'দিবাচল', 'গল্পসঞ্চয়ন', 'নওরঙ্গী', 'মধুকর', 'মাস', 'নীচের তলায়', 'অঙ্গার', 'কাদামাটির দুর্গ', 'সায়াহ্ন', 'পঞ্চতীর' ইত্যাদি তাঁর গল্পগ্রন্থ। নিজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রবোধকুমার লিখেছেন, 'আমি ভাবলুম মানুষের হৃৎপিণ্ডের রক্তের ধারা যে লেখায় ছোটে নি, তাকে কিছুতেই সাহিত্য বলা চলবে না। আমি সে জন্য পথ-ঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছি—স্টীমার ঘাটে, চটকলের ধারে, রেল স্টেশনে, বিদেশের ধর্মশালায়, মফঃস্বলে ওয়েটিংরুমে, তীর্থপথের মেলায়—আমি গল্পের বিষয়বস্তু খুঁজে পেতুম।' প্রবোধকুমার সান্যালের ছিল গল্পলেখার শক্তির অমিত প্রাচুর্য। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল অন্তহীন। তার চেয়েও অনেক বেশি ছিল সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতারাজিকে নিজের অমোঘ কল্পনাশক্তির তাতে পুড়িয়ে যেমন-খুশি রূপমূর্তি গড়ে তোলার অনায়াস দক্ষতা।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-৭২) 'দেহযমুনা', 'মনের গহনে', 'ক্ষুধা', 'বহ্ন্যুৎসব', 'রমণীর মন', 'সন্ধ্যারাগ' ইত্যাদি ছোটগল্পগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন দেশ-কাল সচেতন শিল্পী। তিনি লিখেছিলেন, 'গল্পলেখকের কাছে সমাজও বড় নয়, রাজনীতিও বড় নয়, অর্থনীতিও বড় নয়। সেগুলো রসসৃষ্টির উপাদান মাত্র। বিচিত্র ঘটনার সংঘাত অথবা একটা বিশেষ পটভূমিকার সামনে মানবমনের যে অপরূপ প্রকাশ, আসলে তাই তাঁকে আকর্ষণ করে। সেইটেই হচ্ছে গল্পের চিরন্তন আবেদন, রাজনীতি নয়, অর্থনীতিও নয়।' সরোজ রায়চৌধুরী তাঁর গল্পে সেই চিরন্তন আবেদনের সন্ধান করেছেন।

সুবোধ ঘোষ

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-৮০) ছোটগল্পের আসরে অবতীর্ণ হন 'ফসিল' নামক গল্পের মাধ্যমে এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যেই দুঃসাহসী ও অভূতপূর্ব মেজাজের নিদর্শন দেখিয়ে এক অনড় আসন অধিকার করলেন। তাঁর দুরন্তগতি আবির্ভাবের পেছনে কাজ করেছে জীবনের চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। পুরাতত্ত্ব, সামরিক বিদ্যা ইত্যাদি অনেক বিদ্যায় তিনি মনোযোগী ছিলেন। জীবনযাপনের অনিবার্য দায়ে নানা ধরনের জীবিকা তিনি অবলম্বন করেছিলেন। বিহারের আদিবাসী অঞ্চলের বাসের কন্ডাক্টর, সার্কাসের ক্লাউন, বোম্বাই পৌরসভার ঝাড় দার, পূর্ব আফ্রিকায় ঠিকাদারি ইত্যাদি কাজে তিনি নিয়োজিত হয়েছিলেন। পরিশেষে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছিলেন। রুচি ও মেজাজে তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম স্পর্শাতুর মধ্যবিত্ত জীবনবোধের এক বিরল প্রতিনিধি। গদ্যের শরীরে তিনি কবিতার লাবণ্য বিস্তার করেছিলেন। মানুষের অবনমন, মানুষের নিগ্রহ তাঁর শিল্পীসত্তাকে সচেতন করে তুলেছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলো হল : 'পরশুরামের কুঠার', 'ফসিল', 'শুক্লাভিসার', 'শতভিষা', 'একটি নমস্কারে' ইত্যাদি। 'সুবোধ ঘোষ সংঘাত-সংঘর্ষ প্রখর আদিম জীবন চরিত্রের সহজ প্রতীতিসিদ্ধ দুঃসাহসী শিল্পী এবং সুবোধ ঘোষ তত্ত্ব-চেতনা প্রণোদিত আধুনিক জীবন ভাবনার মোহসঞ্চারী কলাকুশলী রূপকার।'

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭০) রচিত ছোটগল্প গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 'বীতংস', 'ভাঙ্গাবন্দর', 'দুঃশাসন', 'ভোগবতী', 'সাপের মাথার মণি', 'স্বনির্বাচিত গল্প,' 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'গল্প সংগ্রহ' ইত্যাদি। নাটকীয় ব্যঞ্জনায় তাঁর ছোটগল্প সমৃদ্ধ। উপন্যাস রচনায় তিনি যেমন বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি ছোটগল্প রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। তিনি ছিলেন ছোটগল্পের সিদ্ধহস্ত শিল্পী। তাঁর ছোটগল্পে যেন রোমান্টিক গীতিকবির মানসিকতা ফুটে উঠেছে। এখানে গল্প-কল্পনার কিংবা করণ-কৌশলে নয়, কিন্তু মনঃপ্রবণতায় তাঁকে রবীন্দ্রনাথের দোসর বলে মনে করা হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পে গল্পকথা কবির অন্তঃসমীক্ষণে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বহু ভাষায় অনেক পড়াশোনা করেছিলেন। অসাধারণ দ্রুতগতি ও তীক্ষ্ণধী ছিল তাঁর প্রতিভা। তিনি চলমান জীবনের সঙ্গে আপন মনের মিল খুঁজে পেয়ে নিজের সৃষ্টির পসরা সাজিয়েছেন। বাইরের জগতের সঙ্গে মনোজগতের মিল ঘটিয়েছেন তাঁর ছোটগল্পে।

সমরেশ বসু

সমরেশ বসু (১৯২৪-৮৮) ছোটগল্প রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন মধ্যবিত্ত অস্তিত্বটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মাধ্যমে। তাঁর লেখাপড়া ছিল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। দুরন্তপনা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত নিরীখে উচ্ছৃঙ্খল। জীবিকার জন্য তাঁকে অকাতরে যুদ্ধ করতে হয়েছে। জীবিকার জন্য বাড়ি বাড়ি ডিম ফেরি করা, রাইফেল কারখানায় দিন মজুর প্রভৃতি কাজ যেমন করেছিলেন, তেমনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে জেলও খেটেছেন। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির করুণ পরিণতি, রাজনৈতিক দলের লালিত হিংসা ও হত্যা মানুষকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সমাজের বিকৃতরূপ উন্মোচনের জন্য যৌনতা ইত্যাদির নিখুঁত চিত্র অঙ্কনে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'আদাব' ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত। সে সময়ের দাঙ্গা ছিল গল্পের উপজীব্য।

বিমল মিত্র

বিমল মিত্র (১৯১২-৯১) সুবৃহৎ উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে খ্যাতিমান হলেও ছোটগল্প রচনায় তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। ছোটগল্প রচনাতে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। তাঁর জীবনদৃষ্টিতে ছিল ইতিহাস-সন্ধানী ঔৎসুক্য এবং প্রসার। তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল সেদিনের মধ্যবিত্ত বাঙালির স্ববিরোধ্য বিক্ষেপ এবং সংকটও। এই দুয়ে মিলেই তাঁর কথাসাহিত্যের কাঠামো গড়ে উঠেছে।

এই সমস্ত গল্পলেখক ছাড়া আরও অগণিত গল্পকার সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনায় দক্ষতা অর্জন করেছেন। বাংলা ছোটগল্পের বয়স কম হলেও সাম্প্রতিক কালে এর বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে। এখনকার গল্পের ধারায় যে আঙ্গিক ও শিল্পরীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে তাতে দেখা দিয়েছে আমূল পরিবর্তন। এখন প্রতীকধর্মী শব্দপ্রয়োগ, বাক্যের সংক্ষিপ্ততা, কাব্যিক ভাষার ব্যবহার এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রাধান্য বাংলা গল্পকে নিয়ে যাচ্ছে অধিকতর সমৃদ্ধির অভিলক্ষে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। 'বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই সার্থক ছোটগল্প রচনার পথ প্রদর্শক।'—এ মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার কর।

২। বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৩। বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা কর।

৪। বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত রচনা কর।

৫। টীকা লিখ : পরশুরাম, ব্যথার দান।

সপ্তম অধ্যায়
নবীন কবিতা

আধুনিক যুগের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যময় বাংলা কাব্যধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং পাশ্চাত্য আদর্শ প্রভাবিত নতুন কবিতার ধারার উন্মেষ ঘটে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। মধ্যযুগের ধ্যানধারণা থেকে অব্যাহতির সুযোগ ইংরেজদের আগমনে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে বাঙালিদের পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর হয়েছিল। জাতীয় জীবনে তখন যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার স্পর্শ লাগে এবং বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়।

তবে নবীনতার ব্যাপক পরিচয় আধুনিক যুগের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু হয় নি। এর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য কিছুটা সময় লেগেছিল। কালগত দিক থেকে আধুনিক যুগের সীমানায় প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু তাঁর মধ্যে আধুনিকতার কিছুটা বৈশিষ্ট্য থাকলেও তিনি মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ইংরেজ শাসনামলে এবং ইংরেজি শিক্ষার পরিসরে তাঁর জীবন অতিবাহিত হলেও সেসবের কার্যকর ফল তাঁর রচনায় ছিল অনুপস্থিত। পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের কালান্তর ঘটেছিল তার সগৌরব উপস্থিতি ঘটেছে আরও কিছুটা পরে। পরবর্তী কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিকতার পরিচয় স্পষ্ট করে তুললেও তাঁর কাব্যে নতুন যুগের বাণীর পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষণীয় নয়। এই ধরনের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় আধুনিকতার আভাস তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছিল। বস্তুতপক্ষে পাশ্চাত্য প্রভাব সম্প্রসারণের জন্য কিছুটা সময়ের প্রয়োজন ছিল এবং সে কারণেই আধুনিকতার যথার্থ বিকাশ বিলম্বিত হয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আমল থেকেই লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাই নবীন কবিতার পরিধি ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা কাব্যের ধারা মহাকাব্য ও গীতিকবিতায় দ্বিধাবিভক্ত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলা সাহিত্যের এই আধুনিক যুগেই কাব্যরচনা বৈচিত্র্যধর্মী হয়ে উঠেছিল। এই সৃষ্টি বৈচিত্র্য আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ। আঙ্গিক ও বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে কবিতাকে, ১. মন্ময় বা গীতিকবিতা এবং ২. তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ কবিতা—এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠা বা গীতিকবিতাকে ভক্তিমূলক, স্বদেশপ্রীতিমূলক, চিন্তামূলক, প্রেমমূলক, শোক বিষয়ক, প্রকৃতি বিষয়ক, সনেট, লঘুবৈঠকি, স্তোত্র ইত্যাদি উপবিভাগে ভাগ করা যায়।

অন্যদিকে তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ কবিতাকে গাথা কবিতা, মহাকাব্য, নীতিকবিতা, রূপক কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা, লিপিকবিতা ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়।

গদ্যকবিতা সৃষ্টি হয়েছে ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এবং উপজীব্য বিষয়ের বৈচিত্র্যে। আধুনিক বাংলা কাব্যধারা এইসব বিচিত্র আঙ্গিকের পরিচয় বহন করছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

উনিশ শতকের প্রথম থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত। এই যুগের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯)। তিনি যুগসন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে পরিচিত। বাংলা সাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি সব্যসাচীর মত দু হাতে দু দিকের নির্দেশ দিয়েছেন। মধ্যযুগের অবসানের পর এবং আধুনিক যুগের যথার্থ সূত্রপাতের পূর্বে কবি ঈশ্বর গুপ্ত কাব্য সাধনায় খ্যাতিলাভ করেন। মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে ১৭৬০ সালে, আবার আধুনিক যুগ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সহকারে প্রকাশ পায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যসৃষ্টির মাধ্যমে—মোটামুটি ১৮৬০ সাল থেকে। এই দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তেমন কোন উৎকর্ষপূর্ণ সৃষ্টি বা সৃষ্টিসম্ভারের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয় না। তখন বাংলা গদ্যরীতির উদ্ভবের কাল; সাহিত্যের যথার্থ বাহনের উপযোগিতা বাংলা গদ্য তখনও অর্জন করতে পারে নি। তাই যুগসন্ধির বৈশিষ্ট্য এই সময়ের সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যেই বিরাজমান ছিল। এই সময়েই ঈশ্বর গুপ্তের কবিপ্রতিভার বিকাশ।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৯ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কলকাতায় তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ থেকে তিনি বিরত ছিলেন। তাঁর সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত হয় ১৮৩১ সাল থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রধান লেখক।

উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই কলকাতাকেন্দ্রিক জীবনে ইংরেজি শিক্ষা নবজীবন লাভ করে। এই সময়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নতুনত্ব দেখা দেয়। তখন দেশীয় সমাজ ও জীবন অবলম্বন করে সাহিত্যসাধনার প্রেরণা আসে। সাময়িক পত্রিকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাহিত্যে আধুনিকতার সৃষ্টি করা সহজতর হয়। সাময়িক পত্র অবলম্বন করে বাংলা গদ্য যেমন একটা উৎকর্ষের পর্যায়ে অগ্রসর হয়, তেমনি বাংলা কবিতাও একটা নতুন পথের সন্ধান লাভ করে। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার মাধ্যমে কবি ঈশ্বর গুপ্ত এই যুগচেতনা রূপায়িত করেন। কিন্তু তাঁর নিজের পক্ষে এই পথরেখায় বিচরণ করা সম্ভবপর হয় নি। কবিওয়ালাদের অনুবর্তন করে তিনি কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য এবং তৎকালীন অতীতমুখী পরিবেশ তাঁর পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় নি। পক্ষান্তরে ইংরেজি শিক্ষাসভ্যতাকে তিনি স্বাগত জানাতেও ব্যর্থ হন।

ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিনয় ঘোষ 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'বাংলার নবযুগের এই দ্বন্দ্বমুখর সন্ধিক্ষণে যুবক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা প্রকাশ করেন...তখন রক্ষণশীল, উদারপন্থী ও চরম বামপন্থী—হিন্দু সমাজের এই তিনটি প্রধান দলের মধ্যে স্বভাবতই তাঁর পক্ষে প্রথমটির দিকে বেশি ঝুঁকে পড়া নিরাপদ ছিল।...ব্রহ্মসভাপন্থী বা হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল দল—সমাজের এই দুই গোষ্ঠীর কোনটিতেই প্রবেশাধিকার লাভের যোগ্য শিক্ষা বা আর্থিক সঙ্গতি তাঁর ছিল না। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি বৈদ্যপরিবারে তাঁর জন্ম এবং আবাল্য গ্রাম্য পরিবেশেই তিনি প্রতিপালিত। তাই ১৮৩১

সালে সামাজিক ঘূর্ণাবর্তে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ বা পাশ্চাত্য ভাবোন্মত্ততা, কোনটাই তাঁর পক্ষে সহজপাচ্য ছিল না। সহজ ছিল হিন্দু সমাজের সাধারণ জনস্রোতে (যা অবশ্যই রক্ষণশীল) কিছু দূর ভেসে যাওয়া। প্রভাকরের প্রথম পর্যায়ে দেখা যায়, বেশ খানিকটা এই জনস্রোতে তিনি ভেসে গিয়েছিলেন। তবে অচৈতন্যের মতন একেবারে যে তিনি গা ভাসিয়ে দেন নি, তা অল্পকালের মধ্যে সামাজিক মতামতের ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায়।..তিরিশের গোড়ার দিক ব্রহ্মবাদী ও পাশ্চাত্যবাদীদের শ্লেষাত্মক সমালোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং তাতে সনাতনবাদীরা হয়ত লাভবান হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে একেবারে উদরসাৎ করতে পারেন নি।..চল্লিশ থেকে প্রভাকর স্বতন্ত্র উদারপন্থী হিন্দু মধ্যবিত্তের মুখপত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।'

ঈশ্বর গুপ্ত অজস্র কবিতা রচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিতা সংগ্রহ' দীর্ঘ ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন। তবে অশ্লীলতার কারণে সমুদয় কবিতা তিনি সংগ্রহ করেন নি। তাঁর অন্যান্য রচনা হচ্ছে : ১. কালীকীর্তন—গ্রন্থটি রামপ্রসাদ সেন লিখিত, ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত; ২. কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত; ৩. প্রবোধ প্রভাকর—নিজস্ব কবিতার সঙ্কলন; ৪. হিত-প্রভাকর— হিতোপদেশের গল্প গদ্যপদ্যে রচিত; ৫. মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সারসংগ্রহ—কবিভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সংবাদ প্রভাকর থেকে সংগৃহীত কবিতার খণ্ড খণ্ড সঙ্কলন; ৬. বোধেন্দুবিকাশ—নাটক; ৭. সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। পত্রিকা সম্পাদনা : ১. সংবাদ প্রভাকর, ২. সংবাদ-রত্নাবলী, ৩. পাষণ্ড পীড়ন ও ৪. সংবাদ সাধুরঞ্জন।

রচনার এই বৈচিত্র্য থাকলেও ঈশ্বর গুপ্ত কবি হিসেবেই পরিচিত। তাঁর কবিতার সংখ্যা যেমন অগণিত, তেমনি বিষয়ের বৈচিত্র্যও কম নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে কবিতাগুলোকে বিষয়ানুযায়ী নিম্নলিখিত কয়টি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন : ১. পারমার্থিক ও নৈতিক বিষয়ক কবিতা, ২. সামাজিক ও ব্যঙ্গপ্রধান কবিতা, ৩. রসাত্মক কবিতা, ৪. যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা, ৫. ঋতুবর্ণনা প্রধান কবিতা, ৬. বিবিধ বিষয়ক কবিতা, ৭. শকুন্তলার কাহিনি নিয়ে রচিত কবিতা, ৮. সারদা-মঙ্গল বা উমা-মেনকার প্রসঙ্গে কবিতা, ৯. কাব্যকানন, ১০. রসলহরী ও ১১. কবিতাগুচ্ছ।

পারমার্থিক ও নৈতিক বিষয়েই ঈশ্বর গুপ্ত সর্বাধিক কবিতা রচনা করেছেন। পারমার্থিক কবিতায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির প্রাথমিক জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়বোধ প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তা কাব্যকলার দিক থেকে তেমন উৎকর্ষের পরিচায়ক নয়। নীতিসম্পর্কিত কবিতায় সাধারণ নীতিকথার প্রচার হয়েছে, তা কাব্য হয়ে ওঠে নি।

সামাজিক ও ব্যঙ্গকবিতাগুলোর জন্য ঈশ্বর গুপ্তের সর্বাধিক খ্যাতি। তাঁর রঙ্গরসপ্রবণতা ও লঘু চপলভঙ্গি কবিতাগুলোকে উৎকর্ষ দান করেছে। সে আমলে ইংরেজি শিক্ষাসভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালির সমাজ ও জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল ঈশ্বর গুপ্ত তাকে তাঁর কবিতার উপজীব্য করেছেন। যেখানেই তিনি সামাজিক অনাচার, চারিত্রিক দৈন্য ও আদর্শহীনতা দেখেছেন সেখানেই তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রাচীন-নবীনের কোন পার্থক্য করেন নি। সমাজসংক্রান্ত কবিতার বিষয়বস্তুও ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। যেমন : ১. বিধবাবিবাহ আন্দোলনের বিরোধিতা, ২. কৌলীন্যপ্রথার

অপকারিতা, ৩. খ্রিস্টধর্মের ব্যাপক প্রসারে আশঙ্কা, ৪. বাঙালির সাহেবিয়ানা-অনুকরণ-প্রিয়তা এবং দেশীয় আচারপ্রথা ও গুরুপুরোহিতে অবজ্ঞার জন্য ক্ষোভ, ৫. স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে সমাজে বিকৃতি ও প্রাচীন সনাতন স্ত্রীধর্ম লোপের আশঙ্কা, ৬. দেশে ব্যাপক গোহত্যা এবং সে কারণে দুগ্ধাভাব, ৭. স্নানযাত্রা উপলক্ষে জমিদারের অনাচার-ব্যভিচারের বর্ণনা, ৮. খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ, ৯. বাঙালিদের প্রতি সাহেবদের উপেক্ষা, ১০. ইয়ং বেঙ্গলদের ক্রিয়াকলাপে অশ্রদ্ধা, ১১. নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-অবিচার। এসব বিষয় থেকে প্রমাণিত হয় ঈশ্বর গুপ্ত যুগের পরিবর্তনকে মেনে নেন নি।

ঈশ্বরগুপ্ত ব্যঙ্গকবিতার জন্য যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। কবিওয়ালাদের জন্য সখীসংবাদ লিখে সমকালে তিনি খ্যাতিমান হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তার কোন গুরুত্ব থাকে নি। যাবতীয় বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ করে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন তাই তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল করেছে। তবে প্রাচীন কবিগণের জীবনী সংগ্রহ করে কবি যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন তার গুরুত্বও কম নয়।

ইংরেজদের আচার আচরণকে তিনি এদেশের কল্যাণকর মনে করেন নি। তাই ইংরেজিয়ানা প্রীতির ব্যঙ্গ করেছেন 'ইংরেজি নববর্ষ' কবিতায় :

গোরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে বস গিয়া বিবিদের ঘেঁসে ॥
রাঙ্গামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম।
ডোন্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম ॥
পিঁড়ি পেতে ঝুরো লুসে মিছে ধরি নেম।
মিসে নাহি মিস খায় কিসে হবে ফেম?
সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।
বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্ শেম্ ॥
* * * *
ধন্যরে বোতলবাসি ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার ফল ॥
* * * *
যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ভবের টবে চ্যাপেলেতে যাব ॥
কাঁটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভরে খাব থাবা থাবা ॥
পাতরে খাব না ভাত গো টু হেল কাল।
হোটেলে টোটেল নানা সে রকম ভাল ॥
পূরিবে সকল আশা ভেব নারে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে রাখিব না ক্ষোভ ॥

তাঁর 'বাঙালির মেয়ে' কবিতায়ও অতীতমুখীনতার পরিচয় মিলে। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল না বলেই তিনি তাতে লিখেছিলেন :

লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল,
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া চড়বে ঘোড়া।
ঠাট ঠমকে চালাক চতুর
সভ্য হবে থোড়া থোড়া ॥
আর কি এরা এমন কোরে,
সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে?
আর কি এরা আদর কোরে,
পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে?
কপালে যা লেখা আছে,
তার ফল তো হবেই হবে।
(এরা) এ বি পোড়ে বিবি সেজে,
বিলিতী বোল কবেই কবে
(এরা) পর্দা তুলে ঘোমটা খুলে,
সেজে গুজে সভায় যাবে।
ড্যাম হিন্দুয়ানী বোলে
বিন্দু বিন্দু ব্রাণ্ডি খাবে ॥
আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে
সবাই দেখতে পাবেই পাবে
(এরা) আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

জীবনকে হালকাভাবে দেখার একটা বিশেষ দৃষ্টি ঈশ্বর গুপ্তের ছিল বলেই নানা বিষয়ে তিনি রঙ্গরসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি সমগ্র জগতকে একটা কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন বলে তাঁর রচনায় সূক্ষ্মতা বা গভীরতা ছিল না। তাই তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, 'ঈশ্বর গুপ্ত সমসাময়িক ঘটনার কবি এবং লৌকিক আচার ও সামাজিক পরিচিতির কবি, কিন্তু গভীর জীবনবোধের কবি নন।' এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধূঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁঠার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপসে মাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বীভাব দেখেন, পাঁটার বোকা গন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। স্থুল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য এবং ইহাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।'

ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন সাংবাদিক। যা তিনি চারদিকে দেখেছেন কৌতুক সহকারে তা-ই ফুটিয়ে তুলেছেন। গভীর জীবনবোধের পরিচয় তাঁর কবিতায় নেই। এখানে তাঁর প্রতিভা সাংবাদিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যথার্থ শিক্ষার অভাবে তাঁর প্রতিভার উৎকর্ষপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয় নি। সেজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস যে, তিনি যদি তাঁহার

সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়—মার্জিত রুচির অভাব এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারকি। আধুনিক সামাজিক বানরদিগের ইয়ারকির মত ইয়ারকি নয়—প্রতিভাশালী মহাত্মার ইয়ারকি। তবু ইয়ারকি বটে।...ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি নই। বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়েই এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ এবং ভোগ বিলাসের আকাঙ্ক্ষা বা পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য রত্নটি পাইয়া হারাইতে আমরা রাজি নই, কিন্তু দুঃখ এই যে—এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।'

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় প্রাচীন ও নবীন দুই যুগের বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি যুগের পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে পারেন নি বলে প্রাচীন পন্থীর প্রমাণ মিলে। ইংরেজি শিক্ষাসংস্কৃতির প্রতি তাঁর বিরূপতা তাঁকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছে। কবিওয়ালাদের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন বলে তাঁর কাব্যে সে ধরনের বৈশিষ্ট্যও প্রকাশমান। তাঁর রঙ্গব্যঙ্গপ্রবণতা, কৌতুকরসসৃষ্টির দিকে বিশেষ ঝোঁক, অনুপ্রাস যমকের আতিশয্যে চমক লাগানোর প্রয়াস, তাঁর উচ্চকণ্ঠ হাসিহল্লা—এ সবই কবিওয়ালাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগের প্রমাণ। বাঙালির অন্তঃপুরের বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত সে সব কবিতা রচনা করেছেন তাও কবিওয়ালাদের প্রভাবজনিত। তবে তিনি কবিওয়ালাদের অসংলগ্ন ও শিল্পবোধহীন রচনারীতি অতিক্রম করে উন্নত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঈর্ষা ও আকাঙ্ক্ষাবিড়ম্বিত গার্হস্থ্য জীবন এবং এর কলহপরায়ণা, স্থূলরুচি, রন্ধন ও ঢেঁকিশালার কুশ্রী পরিবেশে অধিষ্ঠিতা বঙ্গনারীর ব্যঙ্গচিত্র বোধহয় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় শেষ বারের মত অঙ্কিত হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যে নবযুগের কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। বাংলার এই লৌকিক ও মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যকে প্রাচীনপন্থী করে রেখেছে।

তবে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যও তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সমাজ সচেতনতা তাঁর কাব্যে প্রথম বারের মত ফুটে ওঠে। তিনি সমসায়িক ঘটনা অবলম্বনে অনেক ব্যঙ্গকবিতা রচনা করেছেন। ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ ঘটেছিল তিনি সে সম্পর্কে ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখেছেন। সমাজের এই অসংগতি তাঁর কাব্যের উপজীব্য। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম পরিবেশ সচেতন কবি। চারদিকের জীবন তাঁর দৃষ্টিতে কৌতুকের উপাদেয় উপকরণ হিসেব ধরা পড়েছিল। তা নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নৈতিকতা, দেশপ্রেম, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনেও ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গকবিতা রচনা করেছেন। বস্তুতপক্ষে, সামাজিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত কবিতাগুলোর মাধ্যমেই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি সমসাময়িক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এদিক থেকে তিনি আধুনিকতার অনুসারী। তবু বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। একদিকে যেমন তিনি

সমসাময়িক কবিওয়ালাদের প্রভাবে কবিতা রচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজি কবিতার আদর্শ অনুসরণে বাংলায় খণ্ড কবিতাও রচনা করেছেন।

ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর রচনায় ইতিহাসচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন কবিদের জীবনী ও কাব্যালোচনার মাধ্যমে তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। সমকালীন যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েও কবিতা রচনার নিদর্শন তাঁর আছে। সামাজিক কবিতার অন্তর্গত তাঁর কিছু সংখ্যক দেশপ্রীতিমূলক কবিতাও রয়েছে। এই দিক থেকে তিনি প্রথম আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত কবি। তবে নতুন ভাবধারায় সম্পূর্ণরূপে অবগাহন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি বলে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, 'ঈশ্বর গুপ্ত আঙ্গিকে পুরানো, কিন্তু ভাবে নতুন।'

উনিশ শতকের মধ্যভাগে গদ্য বা পদ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক কিছু রচনা করার প্রয়াস প্রায় সকল লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। ঈশ্বর গুপ্ত এদিক থেকে অগ্রণী ছিলেন। তাঁর অপরাপর জাতের কবিতাও আছে। বিশেষত তাঁর নিসর্গ বিষয়ক কবিতার সংখ্যা কম নয়। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় ব্যাপক হতে পারে নি। বরং ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা রচনাকারী হিসেবে ঈশ্বর গুপ্তের বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের স্রষ্টা হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। তাঁর মধ্যে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধেরও পরিচয় মিলে। কিন্তু কোথাও কোথাও ইংরেজদের প্রশংসার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মধ্যে স্ববিরোধিতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গকবিতার নমুনা হিসেবে এ প্রসঙ্গে কতিপয় পংক্তি উল্লেখ করা চলে। 'নীলকর' কবিতায় নীলকরদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কবি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছেন। তাতে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর পরিহাসমধুর মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে :

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষাগরু
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালী ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙ্গে না;
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না ~

তুচ্ছ বিষয় তাঁর কৌতুকরসের প্রেরণা দিয়েছে। তাই 'পাঁঠা' কবিতায় সহজেই বলতে পেরেছেন :

রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল ॥

অজস্র প্রশংসাসূচক পংক্তি সাজিয়ে শেষে লিখেছেন :

সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে ॥
হাড়িকাষ্ঠে ফেলে দিই ধরে দুই ঠ্যাঙ।
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাডাঙ ছ্যাডাঙ।
এমন পাঁঠার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশে বোকা ॥

দেশপ্রীতিমূলক কবিতা লিখে ঈশ্বর গুপ্ত যে অভিনব বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছিলেন তার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর 'স্বদেশ' কবিতা থেকে কয়েকটি পংক্তি উল্লেখযোগ্য :

মিছা মণিমুক্তা হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥

তারাপদ মুখোপাধ্যায় 'আধুনিক বাংলা কাব্য' গ্রন্থে ঈশ্বর গুপ্তের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত যুগেরই সৃষ্টি, তিনি যুগস্রষ্টা নন।..ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় কোন message নাই।...যে কবি আধুনিক যুগের সাহিত্যের ভিত্তিপত্তন করিবেন, তিনি নবীন ভাবধারাকেও অভ্যর্থনা করিয়া আনিবেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নবীন ভাবধারার মধ্যে সৃষ্টির অঙ্কুর দেখিতে পান নাই, তিনি ইহার মধ্যে ধ্বংসের বীজ দেখিয়াছেন।'

ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর রচনায় প্রধানত রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষাসভ্যতার প্রসার সমর্থন করেন নি। স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সংস্কারের তিনি ছিলেন বিরোধী। প্রাচীন সংস্কারের প্রতি অন্ধ একটা সহানুভূতি তাঁর ছিল। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষায় বাঙালির জীবনকে নতুন আলোকে আলোকিত করতে পারবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাই পূর্বতন ও নবাগত আদর্শের মধ্যে যে প্রবল সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় এই দুই আদর্শের সংযোগ সাধন করতে দেখা যায়। সমালোচকের মতে, 'বিদেশী সুরার উগ্র ঝাঁঝ ও উগ্র স্বাদ যে কালক্রমে বিশুদ্ধ মধুর রসে পরিণত হইয়া বাঙালির জীবনে সঞ্চিত অমৃতের সহিত নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়া যাইবে ইহা অনুমান করিবার ভবিষ্যৎদৃষ্টি তাঁহার ছিল না। তাই এই যুগের বাঙালির প্রতিনিধি কবি পরবর্তী যুগে একক ব্যতিক্রমে পর্যবসিত হইয়াছেন—আধুনিক কাব্যধারার প্রবর্তক না হইয়া ইহার গতিরোধের ব্যর্থ প্রয়াসের নায়করূপেই সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছেন।'

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৮৬) আবির্ভাব আধুনিকতার যৌবন-ঊষার পরিপ্রেক্ষিতে কোকিলকণ্ঠের মত বসন্ত সমাগমের বার্তাকে পরিস্ফুটিত করে তুলেছিল। ইংরেজি শিক্ষা তিনি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল, ফলে ইংরেজি সাহিত্যরসে বাংলা সাহিত্যকে রসায়িত করতে তিনি সচেষ্ট হন। তবুও আধুনিকতার পরিপূর্ণ বিকাশ তাঁর সাহিত্যসাধনায় লক্ষণীয় হয়ে ওঠে নি। আধুনিক শিক্ষাসভ্যতাকে জাতীয় জীবনের উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে তিনি কল্পনা করতে ব্যর্থ হন। প্রাচীন ঐতিহ্যকে আধুনিকতার

সংস্পর্শে নবরূপায়ণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি—তিনি অতীতের স্মৃতিমন্থন করাকেই তাঁর কাব্যের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেশাত্মবোধক কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের রোমান্টিক ভাবধারার প্রয়োগ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত সমসাময়িক যুগের আবহাওয়ার প্রভাবকে গ্রহণ করেন নি, ব্যঙ্গবিদ্রূপের দ্বারা এর স্বরূপ প্রকাশ করতে সচেষ্ট ছিলেন। পক্ষান্তরে, রঙ্গলাল বর্তমানকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করে অতীতের প্রতি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। কবি রঙ্গলালকে বলা হয় বয়ঃসন্ধির বার্তাবহ। সমকালীন নাগরিক জীবনে যে চেতনার সঞ্চার হয়েছিল রঙ্গলাল জ্ঞানচর্চার সামর্থ্যে তার সম্পূর্ণ খবর রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিসত্তায় তা সার্থকভাবে বিধৃত হতে পারে নি। নতুন জীবনবাণীর উপযোগী শিল্পরূপ তাঁর কাব্যে গড়ে ওঠে নি। অনাগত জীবনের বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছিল। রঙ্গলাল যে জীবনধর্মের পথিকৃৎ, মাইকেল মধুসূদন তারই যথার্থ নির্মাতা।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত। ব্যক্তিগত জ্ঞানসাধনায় তিনি সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংযোগসাধন ছাড়াও তিনি এদেশীয় কয়েকটি পত্রপত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। বিশেষভাবে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার একজন বিখ্যাত লেখক হিসেবে তাঁর গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হিসেবে রঙ্গলালের মধ্যে বিচারবুদ্ধির, যুক্তিশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধ গভীরতর ভাবে বিদ্যমান ছিল। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল নিজের জাতি এবং জাতীয় সাহিত্য অবলম্বনে। তাঁর মধ্যে ইতিহাসানুরাগও পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ইতিহাসের প্রতি বিশেষ আনুগত্যই প্রকাশ পেয়েছে। রঙ্গলালের দেশাত্মবোধক কাব্যরচনার পশ্চাতে ইংরেজলেখক টমাস মূর ও স্যার ওয়াল্টার স্কটের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর দেশাত্মবোধ হিন্দুজাতি অবলম্বনে পরিস্ফুট। মুসলমান আক্রমণের সূত্রপাত থেকে দেশকে পরাধীন বিবেচনা করে কবি নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তবে ইংরেজদের প্রতি সমর্থন তাঁর মূল বক্তব্যবিষয়কে করেছে মর্যাদাহীন।

কাহিনিকাব্যের রচয়িতা হিসেবেই রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য। কবি অতীতসচেতন হয়ে রাজপুতদের অতীতের গৌরবকাহিনি অবলম্বনে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) রচনা করেন। টডের Annals of Rajsthan গ্রন্থ থেকে গৃহীত কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই কাব্যের মাধ্যমে তিনি এদেশীয় লোকের মনে দেশাত্মবোধ সৃষ্টির প্রয়াস পান। তিনি ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তৎদৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রসাধন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্বক রচিত করিলাম।' এ থেকে কাব্যরচনার উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন হয়। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার দিক থেকে গতানুগতিক ভাবাদর্শ পরিত্যাগ করে কবি এ কাব্যে এক নতুন আদর্শ অনুসরণ করেছেন। দিল্লির সুলতান আলাউদ্দীন খিলজি এবং চিতোরের রানী পদ্মিনীর কল্পিত কাহিনি অবলম্বনে এই কাব্যটি রচিত। এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই রঙ্গলাল 'স্বদেশপ্রেম ও

স্বাধীনতাপ্রীতির কবি' হিসেবে খ্যাত। রাজপুত জাতির শৌর্য-বীর্য-আত্মত্যাগের মহিমা প্রচারের জন্য এই কাব্যের আয়োজন। তবে কাব্যটির বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নিহিত কবির আদর্শগত তাৎপর্যের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'বাংলাদেশে এই প্রথম এমন এক সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচিত হল, যে কাব্যে দেববন্দনা নেই, সৃষ্টিতত্ত্ব নেই। বংশলতিকা নেই এবং গল্প শুরু হয়েছে সরাসরি। এমন কি মৃত্যুর পর স্বর্গারোহণ বা পুনর্জন্মের প্রসঙ্গ নেই। নারীর বর্ণনা আছে, অথচ কাঁচুলি-প্রসঙ্গ নেই। শহর, গ্রাম, অরণ্য—সবই আছে। অথচ বৃক্ষরাজির তালিকা ও পশুপক্ষীর সংখ্যাগণনা নেই। নারীপ্রসঙ্গ থাকল, অথচ আদিরসের আর্দ্রক্ষেত্র তৈরি না করে বীররসের রুক্ষতা আমন্ত্রণ করা হল। গতানুগতিক কাব্যধারায় কাব্যটি ঐতিহাসিক কাহিনি, প্রকৃতি বর্ণনা ও রোমান্টিক দেশপ্রেম সহযোগে নতুনতর বৈশিষ্ট্য দেখাতে সক্ষম হয়েছিল। টডের 'রাজস্থান' প্রকাশিত হলে পরাধীন বাঙালি হিন্দুর মানসক্ষেত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' তার প্রথম পরিচয় বিদ্যমান।

কবি রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কর্মদেবী' (১৮৬২)। রাজপুত-ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে এ কাব্যও রচিত। বর্ণনাবহুল ভাষা এবং মাইকেল মধুসূদনের অনুকরণে অলঙ্কার এতে ব্যবহৃত হয়েছে। কবির দেশপ্রেমানুভূতি এই পর্যায়েও পরিস্ফুট। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'শূর-সুন্দরী' (১৮৬৮)। এ কাব্যের কাহিনিও রাজপুত-ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। রানা প্রতাপ ও সম্রাট আকবরের বিরোধ এবং সম্রাট আকবরের পরাভবই গ্রন্থটির বক্তব্যবিষয়। উড়িষ্যার এক ঐতিহাসিক ধর্মমূলক কাহিনি অবলম্বনে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯) রচনা করেন। এই কাব্যের বিষয়বস্তু রোমান্টিক। জনৈক প্রাচীন উড়িয়া কবির কাহিনি অনুসরণে তিনি কাব্যটি রূপ দিয়েছিলেন। এতে ভক্তিরসের স্থান পেয়েছিল বলে হৃদয়গ্রাহী কাব্য হিসেবে তা গুরুত্ব লাভ করে। রঙ্গলাল সংস্কৃত ও ইংরেজি থেকে কিছু অনুবাদও করেছিলেন।

বাংলা কাব্যধারায় অতীত ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেও রঙ্গলাল পাশ্চাত্য আদর্শে রোমান্টিক ভাব সঞ্চার করতে সক্ষম হন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের কতিপয় পংক্তি এক সময় এদেশে দেশাত্মবোধ সঞ্চার করেছিল। যেমন :

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায়।

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা সভ্যতা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে এদেশীয় শিক্ষিত মানুষের মনে যে রসপিপাসা জেগেছিল তিনি তার পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারেন নি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব রোমান্টিক কবিত্ব প্রত্যুষান্ধকারে অকালজাগ্রত এক বিহঙ্গের অস্ফুট

কাকলির মত অপূর্ণকণ্ঠ ও দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁর রচনাবলীর কাব্যিক মূল্য বেশি নয়; কাব্যের ভাষা ও রূপ ছিল পুরাতন—মাধুর্যসৃষ্টিতেও তিনি ব্যর্থকাম হয়েছিলেন। গ্রন্থের কাহিনি বর্ণনায় রসসৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে তাঁর সার্থকতা বেশি ছিল না। তবু 'মধ্যযুগের দেবপ্রশস্তিমূলক কাব্যের গণ্ডি থেকে আধুনিক যুগের বিস্তৃততর কাব্য পরিধিতে উত্তরণের দিকে রঙ্গলাল অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন এবং কাব্যের বন্ধনমুক্তি বিষয়ে তাঁর আংশিক সাফল্য যে তাঁর পরবর্তী কবি মধুসূদন দত্তকে মৌলিক পথ আবিষ্কারে অনেকখানি উৎসাহিত করেছিল তা সুনিশ্চিত।'

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিত্বের পেছনে তাঁর পাণ্ডিত্য কাজ করেছে। তাই তাঁর কাব্যরচনায় গভীর ভাবানুভবের আক্ষেপ নেই। তাঁর পাণ্ডিত্যকে তিনি ছন্দোবন্ধ রূপদান করেছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রবর্তক। এদিক থেকে তাঁকে বিপ্লবী কবি হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মধ্যযুগের কাব্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনির বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে বাংলা কাব্যধারায় মানবতাবোধ সৃষ্টিপূর্বক আধুনিকতার লক্ষণ ফুটানোতেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের অতুলনীয় কীর্তি প্রকাশিত। তিনি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে বিষয়নির্বাচনে ও প্রকাশভঙ্গিতে, ভাবে ও ভাষায়, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে এমন একটি আশ্চর্য শিল্পকুশলতা ফুটিয়ে তুলেছেন যাকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সম্পূর্ণ অভিনব রূপে চিহ্নিত করা যায়। বস্তুত এই সমস্ত দিক থেকে তাঁর অপরিসীম কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যের গতি পরিবর্তনে সহায়তা করেছিল।

ড. গোলাম মুরশিদ মন্তব্য করেছেন, 'স্বসমাজের তুলনায় তিনি ছিলেন সবার থেকে আলাদা। আচার-আচরণে তাঁর ঔদ্ধত্য, সনাতন মূল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞা, জীবন এবং সাহিত্যের প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি বিদ্রোহ—সবই তাঁকে তাঁর চারদিকের জনতা থেকে একেবারে আসমানজমিন ফারাক করেছে।...তিনি এমন অসাধারণ ছিলেন যে, সে সময়ের লোকেরা কেউ তাঁকে ঘৃণা করেছেন, কেউ ভালবেসেছেন, কেউ-বা করুণা করেছেন; কিন্তু কেউই তাঁকে অস্বীকার করতে পারেন নি।'

সমকালীন যুগের বৈশিষ্ট্য মধুসূদনের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে সম্বন্ধে যোগীন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করেছেন, 'স্বদেশীয় সাহিত্যে অনাস্থা, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ, স্বদেশীয় আচার ব্যবহারে উপেক্ষা এবং পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব এইগুলি তখনকার ছাত্রমণ্ডলীর লক্ষণ ছিল। মধুসূদনের চরিত্রেও এই সকল দোষের প্রত্যেকটি পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার সমকালবর্তী ছাত্রদিগের ন্যায় তিনিও বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে শিখিয়াছিলেন এবং ইংরাজি ভাষায় কবিতা রচনা দ্বারা প্রতিপত্তিলাভের আশা করিয়াছিলেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পূর্বেই তিনি স্বদেশীয় আচার ব্যবহারে ঘৃণা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কলেজে থাকিতেই সুরাপানে ও হিন্দুধর্ম নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণ বয়সে অনেক বিষয়ে তাঁহার শৈশবর্জিত সংস্কার পরিবর্তিত হইয়াছিল; কিন্তু বিপ্লবকালের প্রভাব তাঁহার হৃদয়ে এমনই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কিছুতেই তিনি তাহা উৎপাটিত

করিতে পারেন নাই। একদিকে পুরুষ পরম্পরাগত প্রাচ্য ভাব ও অপরদিকে কলেজীয় শিক্ষালব্ধ পাশ্চাত্য ভাব, উভয়ের সংমিশ্রণে তাঁহার অনেক কার্য, সেই জন্য, পরস্পর বিসম্বাদী হইত। পূর্ণ বয়সে তিনি বাংলা ভাষায় কাব্য লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই কিন্তু পত্র লেখা লজ্জাজনক মনে করিতেন।...অন্তরে জাতীয় ভাব এবং বাহিরে সাহেবিয়ানা উভয়ের সংমিশ্রণে তাঁহার প্রকৃতি, এইরূপে, এক বিচিত্র পদার্থে পরিণত হইয়াছিল।'

বিরাট প্রতিভা সহযোগে সীমাহীন সম্ভাবনা নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে আবির্ভূত হন। তাঁর কৃতিত্ব যে, তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে সম্পূর্ণ নতুন কাব্যধারার প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সাহিত্যসাধনায় সাফল্যের মাধ্যমে এমন একটি অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন যাকে ভিত্তি হিসেবে অবলম্বন করে পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। পাশ্চাত্য কাব্যপুষ্ট, প্রতিবেশ-নিরপেক্ষ কবিকল্পনার অধিকারী ছিলেন মধুসূদন দত্ত। এই বৈশিষ্ট্য সমসাময়িক কালে একান্ত ছিল অচিন্ত্যনীয় এবং এর প্রভাবেই তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যুগবিভাগে ১৮০০ সাল থেকে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ধরা হয়। কিন্তু আধুনিকতার লক্ষণ বিবেচনায় মধুসূদনের আমল থেকেই এই নতুন কালের সূচনা—তাঁর কবিকৃতির প্রকাশকাল মোটামুটি ১৮৬০ সাল থেকেই আধুনিক যুগের প্রকৃত লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সীমাহীন কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টিসম্ভারের মাধ্যমে। তাঁর প্রতিভা বিকাশের প্রধান পর্ব ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত মাত্র পাঁচ বছর। শেষবারের মত ১৮৬৫ সালে চতুর্দশপদী কবিতাবলি রচনার মাধ্যমে তাঁর কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল।

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের অবদান স্বল্প সময়ের কৃতিত্বের ফল। তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র (১৮৫৯) মাধ্যমে পাশ্চাত্য রোমান্টিক নাট্যকলার আদর্শ প্রদর্শিত হওয়ায় তা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম সার্থক নাটক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এর পরে পরেই প্রকাশিত 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) ও 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকদ্বয়ের মাধ্যমে তিনি প্রথম আধুনিক কমেডি ও ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করেন। তাছাড়া 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) নামক প্রহসন দুটি নতুনত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০) রচনার মাধ্যমে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মেঘনাধবধ কাব্য' (১৮৬১) রচনা করে বাংলা মহাকাব্যের ধারার প্রবর্তন করেন। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের (১৮৬২) পৌরাণিক নারীচরিত্রের পুনর্বিচারে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরমোৎকর্ষ সাধনে মাইকেল নতুনতর বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনে সক্ষম হন। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি বাংলা ছন্দে নতুন যুগের সৃষ্টি করেন। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও (১৮৬১) নতুন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এখানে পৌরাণিক রাধাকে তিনি নতুনরূপে প্রত্যক্ষ করলেন। এ সব দিক ছাড়া তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৫) বাংলা কাব্যধারায় সনেট জাতীয় কবিতা রচনার পথিকৃৎ হিসেবে অপরিসীম গুরুত্বের অধিকারী।

এই সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন বিদেশী সাহিত্যাদর্শের প্রাণধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। কাহিনিনির্মাণ, চরিত্রসৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে বিদেশী আদর্শ ছিল তাঁর অনুসরণযোগ্য। সমাজ সচেতনতা, মানবপ্রীতি ও নতুনত্ব প্রকাশ করেই মধুসূদন বাংলা কাব্যে যথার্থ আধুনিকতা আনয়ন করতে সক্ষম হন।

পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বাংলা সাহিত্যকে মধুসূদন আধুনিকতার খাতে প্রবাহিত করলেন। তা সম্ভবপর হয়েছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সুনিবিড় পরিচয়ের ফলে। যশোরের বিত্তশালী জমিদার এবং কলকাতার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইনজীবী রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র ছিলেন মধুসূদন। বাল্যকাল থেকেই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে এবং কলকাতার পরিবেশে থেকে চিন্তায় ও চলনে পাশ্চাত্যানুসারী হয়ে উঠেন। তৎকালীন ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুগোপযোগী উচ্ছৃঙ্খলতায় অবগাহন করলেও তাঁর মধ্যে একটি উচ্চাভিলাষী মনোবৃত্তি জাগরূক ছিল। অত্যধিক স্নেহে লালিত হয়ে ভোগলালসাপূর্ণ হৃদয়ের ভিতরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকবি হওয়ার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা সঞ্জীবিত করে রেখেছিলেন। সেকালের কলকাতাকেন্দ্রিক পরিবেশ তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রেরণা দিয়েছে এবং সমুদ্রপারের মহাকবিদের আদর্শ তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। তাই কলকাতা থেকে বিলাতগামী জাহাজ যাত্রা করতে দেখলে তাঁর মনও সঙ্গে সঙ্গে সেক্সপীয়র, মিলটন প্রমুখ কবির দেশে যাত্রা আরম্ভ করত। সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর কোন বিতৃষ্ণা না থাকলেও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ বিলাতযাত্রার সহায়ক হবে বিবেচনা করে তিনি সাগ্রহে পরধর্ম গ্রহণ করলেন। এতে বিলাত যাওয়া সম্ভবপর না হলেও বাংলা সাহিত্যের জন্য তা পরম কল্যাণজনক হয়েছিল। খ্রিস্টান হওয়ার ফলে কলকাতার বিশপস কলেজের ছাত্র হিসেবে এবং পরে মাদ্রাজের বিদ্যালয়শিক্ষক রূপে তিনি গ্রীক ল্যাটিন সংস্কৃত প্রভৃতি ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করতে পেরেছিলেন। এ সব সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে উপকরণ নিয়ে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যকে বহুদিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

মধুসূদনের ধর্মান্তরিত হওয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'তাঁর এই ধর্মান্তর গ্রহণ তাঁর নিজের জন্য যতবড় দুঃখের কারণ হোক তাঁর জাতির জন্য প্রকৃতই হয়েছে এক মহা লাভের ব্যাপার। এই ধর্মান্তর গ্রহণের ফলেই খ্রিস্টান পাদরিদের সাহায্যে গ্রীক লাতিন ইতালিয় প্রভৃতি ভাষায় ও সাহিত্যে তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটে—তাঁর নব-সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল এই সব সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়ের গুণে। মধুসূদন তাঁর সমসাময়িক কালেই দেশে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মর্যাদা যে কত বড় তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে একালে। তাঁর স্বাজাত্যবোধ সুগভীর, সেই সঙ্গে সর্বমানবের সঙ্গে তাঁর যোগও সুনিবিড়; দেবতা বা ভাগ্যের ভ্রূকুটির ঊর্ধ্বে তিনি তুলে ধরেছেন মানুষের পৌরুষের মহিমা, শব্দপ্রয়োগের নিপুণতায় বিশ্ব-শিল্পীদের সভায় তিনি একজন প্রথম শ্রেণির শিল্পী; আর হৃদয়ধর্মে তিনি রাজাধিরাজ। এই অপেক্ষাকৃত স্বল্পজীবী কবি যে প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন তার তুলনায় তাঁর সৃষ্টি পর্যাপ্ত নয়; কিন্তু সেই জন্যই তিনি হয়ে রয়েছেন সহৃদয় পাঠকের চির- বিস্ময়।'

মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও প্রত্যক্ষ জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে মধুসূদন কয়েকজন সুধী ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন এবং অনেকটা আকস্মিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে

বাংলা সাহিত্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য মাদ্রাজ প্রবাসকালে তিনি Captive Ladie এবং Visions of the past নামক দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থদ্বয় দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত যশলাভে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হন। মাদ্রাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কলকাতার পুলিস আদালতে দোভাষীর চাকরিতে ১২০ টাকা বেতনে তাঁর জীবন কাটছিল অস্বচ্ছলভাবে। এমন সময় তিনি রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলা নাটকের দীনতা উপলব্ধি করলেন। এর ফলস্বরূপ তিনি রচনা করেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। তখন থেকে পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁর প্রায় সমগ্র সাহিত্যকীর্তি প্রকাশিত হয়।

মধুসূদন জীবনকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় ব্যারিস্টারি পড়ায় উদ্বুদ্ধ হন এবং আজন্ম সাধের বিলাতযাত্রা করেন। সে সময়ে ফ্রান্সে থাকাকালীন ১৮৬৫ সালে তাঁর সনেটগুলো রচিত হয়। দেশে ফিরে ব্যারিস্টারি করে প্রচুর অর্থোপার্জন, হাইকোর্টে বিরাট অঙ্কের চাকরি প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে জীবিকার্জনে মধুসূদন সচেষ্ট হলেও অমিতব্যয়িতা ও উচ্চাভিলাষের জন্য তাঁর জীবনে করুণ পরিণতি নেমে আসে। জীবনের কেন্দ্রস্থলে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্তমান ছিল এবং তার পরিতৃপ্তি সাধনে যে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা-ই তাঁর জীবনকে গ্রীক ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্যানুসারে অলঙ্ঘনীয় দৈবনির্দেশে বেদনাতুর করেছিল। তাঁর জীবনের এই বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যে নবযুগ সৃষ্টির পশ্চাতে কার্যকরী ছিল। গতানুগতিক ধারায় বাংলা কাব্যে যে স্থৈর্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করা মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব হয় জীবনের উচ্চাভিলাষ সাধনে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে।

মধুসূদনের কবিজীবনে পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাব সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 'যে সংস্কৃতি একদা য়ুরোপে নবজাগরণ আনিয়াছিল, যাহার ফলে humanities বা মানববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার উপরে স্থান পাইয়াছিল; এবং মনুষ্য-জীবনগত পরম রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা humanism-ই মানুষকে নবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। আমাদের পক্ষেও তাহা সঞ্জীবন মন্ত্রের মত কাজ করিয়াছিল, সেই মানবতা বা মর্ত্যপ্রীতির প্রেরণাই আমাদিগকে চঞ্চল করিয়াছিল। এই যুগপ্রভাব বা যুগ প্রবৃত্তিই মধুসূদনের জীবন ও তাঁহার কবিপ্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছিল।'

বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম। ইংরেজি শিক্ষাসভ্যতার আলোকে দেশবাসীর জীবনে যখন এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয়েছিল এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের নবরূপায়ণ যখন একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছিল তখনই মধুসূদনের আবির্ভাব। অবশ্য তাঁর জীবনের বিস্তৃত প্রস্তুতি ভিত্তি করেই তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল, তবু বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব আকস্মিক ভাবেই ঘটে। নিজের প্রতিভার ওপর অগাধ বিশ্বাস সহকারে প্রথমে তিনি পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। পরিণামে তিনি বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাকবি হিসেবে পরম গৌরব লাভ করেন।

কোনপ্রকার প্রস্তুতিপর্ব না রেখেই মধুসূদন বলিষ্ঠ প্রতিভার দানে যেভাবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তার জন্য বাঙালি পাঠক মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এ প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য : 'নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্‌বোধিত হল, অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলা ভাষার পায়ে চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা মনে করলেন না। আপন শক্তির পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলা ভাষার পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন। বাংলা ভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন, যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করে তোলার জন্য সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে মধুসূদন নিঃসঙ্কোচে যেসব শব্দ আহরণ করতে লাগলেন সেও নতুন; বাংলা পয়ারের সনাতন সমবিভক্ত আল ভেঙে দিয়ে তার ওপরে অমিত্রাক্ষরের যে-বন্যা বইয়ে দিলেন সে-ও নতুন। আর মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য রচনার যে-রীতি অবলম্বন করলেন, তাও বাংলা ভাষায় নতুন। এটা ক্রমে ক্রমে পাঠকের মনকে সইয়ে সইয়ে সাবধানে ঘটল না, শাস্ত্রিক প্রথায় মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন এক মুহূর্তে ঝড়ের পীঠে—প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল ভেঙে।'

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের কাব্যশাখায় যে অবিস্মরণীয় দান রেখে গেছেন তার মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।' আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে চার সর্গে রচিত এ কাব্যের বিষয়বস্তু ভারতীয় পুরাণকাহিনি থেকে সংগৃহীত। সুন্দ-উপসুন্দ নামে দুই দৈত্যভ্রাতার নিধন কাহিনি এর উপজীব্য। দেবদ্রোহী দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় স্বর্গ বিজয় করেছিল। অত্যন্ত ধার্মিক হয়েও তারা অতুলনীয়া রূপলাবণ্যবতী তিলোত্তমাকে লাভ করার জন্য কিভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে পরস্পরকে আঘাত করে নিহত হল এবং দেবতারা স্বর্গ লাভ করল, তারই কাহিনি এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যরূপায়ণে মধুসূদন দেশীবিদেশী কাব্যের ওপর ছিলেন নির্ভরশীল। 'পদ্মাবতী' নাটকে মাইকেল প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের সামান্য প্রয়োগ করে তার ব্যবহারোপযোগিতা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এই ছন্দের ক্ষমতা উপলব্ধি করে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' তার ব্যবহার দেখান। অমিত্রাক্ষরের গাম্ভীর্য এই কাব্যে বিদ্যমান। কাব্যের আরম্ভ এই রূপ :

> ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে॥
> অভ্রভেদী, দেবতাত্মা, ভীষণ দর্শন,
> সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল,
> যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা শুভ্রবেশধারী,
> নিমগ্ন তপ সাগরে ব্যোমকেশ শূলী॥
> যোগীকুলধ্যেয় যোগী।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রাথমিক ব্যবহারের অপরিপক্কতা এই কাব্যে বিদ্যমান এবং রচনা হিসেবেও গ্রন্থটি গুরুত্বহীন। তবে তা পাঠকের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। দেশী কাহিনি অবলম্বনে বিদেশী প্রভাবের সমন্বয়ে রচিত এ কাব্যে গ্রীক আদর্শে কিছু সংখ্যক দেবদেবীর চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নগণ্য কাহিনি অবলম্বনে রচিত বলে এবং যুগোপযোগী কোন প্রকার আবেদন না থাকায় কাব্যটি তেমন কোন আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে নি। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এবং মহাকাব্য রচনার পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে প্রবহমানতার সঙ্গে উপমা ব্যবহারের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধিত হয়েছে। যেমন মেঘনাদবধ কাব্য থেকে :

উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি,
'নাহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে!
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম, দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে'। যথা পথে সহসা হেরিলে
উর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয় শূন্য হিয়া।
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড হায় রে গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে।'

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনার মাধ্যমে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন। বিপ্লবী মনোবৃত্তি অবলম্বনে তিনি বাংলা ছন্দের চিরাচরিত পয়ার ছন্দকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে বিদেশি প্রভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। বাংলা ভাষার স্বরবহুলতা বিদূরিত করে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদ এবং নামধাতু প্রয়োগে তিনি এ ছন্দে ধ্বনিগাম্ভীর্য আনয়ন করলেন। অন্ত্যমিলের জন্য ভাবের সমাপ্তি ঘটানোর বিপত্তি দূর করা হল ইংরেজি Blank verse ছন্দের অনুসরণে। সংস্কৃত ছন্দের অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ত্যমিল নেই, মধুসূদন তা লক্ষ করেছিলেন। ফলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রবহমানতার সৃষ্টি হয়। বাংলা পয়ারের নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রাসংখ্যা রক্ষা করে অন্ত্যমিলহীনতা ও প্রবহমানতা আনয়ন এবং যতি স্থাপনের গতানুগতিক নিয়ম পরিত্যাগ করে মধুসূদন বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রতিষ্ঠা করলেন।

মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। বাল্মীকির সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ থেকে কাহিনি নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবের সম্মিলনে কবি এ কাব্য রূপায়িত করেন। মহাকাব্যের লক্ষণের মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মহাকাব্যিক আদর্শ এতে একত্রিত হয়েছে। নয় সর্গে কাব্যটি সমাপ্ত। রামরাবণের যুদ্ধে রাবণপুত্র মেঘনাদের হত্যাকাহিনি এর উপজীব্য। কাহিনি রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও উপস্থাপনারীতি মধুসূদনের নিজস্ব এবং সে ক্ষেত্রে তাঁর সার্থক প্রতিভার পরিচয় বর্তমান। চরিত্রচিত্রণে তিনি বাল্মীকির প্রতি আনুগত্য দেখান নি, পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ করেছেন। কাব্যের পরিণতি গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুবর্তী। উপমা অলঙ্কার ব্যবহারেও তিনি গ্রীক মহাকাব্যের সহায়তা নিয়েছেন। পরবর্তীকালে বাংলা মহাকাব্যের ধারাটি অনুসৃত হলেও মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্ব আজও অম্লান।

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যটি বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে আধুনিক রূপে রূপায়িত করে মেঘনাদবধ কাব্যের সমসাময়িক কালে রচিত। কবিতাগুলোতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার আধ্যাত্মিক রূপক গ্রহণ না করে কবি রাধার বিরহের মানবিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের ভক্তি বা রসতত্ত্ব এতে প্রতিফলিত হয় নি, বিরহ ব্যথায় আকুলা রাধার মনোবেদনা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। ভাবে বা ভাষায় ব্রজাঙ্গনা বৈষ্ণবকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত নয়—রাধার বিরহ, হতাশা, আক্ষেপ ফুটিয়ে তুলে কবি রাধাকে যথার্থ মানবী করে রূপ দিয়েছেন। এই রূপান্তরে উনিশ শতকের মানবতাবাদের পরিচয় মিলে। গীতিকাব্যের গুণ কাব্যটির মধ্যে প্রকাশমান। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে কবির আন্তরিক কোন ভক্তিভাব পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে না। মাইকেলের প্রথম যৌবন থেকে তাঁর মধ্যে যে গীতি-প্রবণতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে ব্রজাঙ্গনা কাব্যে। তাছাড়া ভাষা ও ছন্দ নিয়ে কবি নিরন্তর যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তা এ কাব্যে নতুন রূপ লাভ করেছে। স্তবকবিন্যাস ও অন্ত্যমিলেও নতুনত্ব আছে। এ প্রসঙ্গে কয়টি পংক্তি উল্লেখ করা যায় :

কেন এত ফুল তুলিলি, সজনি॥
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
ব্রজের বালা ?

অথবা—

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার॥
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা জুড়া এ প্রাণের জ্বালা
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ॥
মধু—যার মধুধ্বনি, কহে, কেন কাঁদ ধনি
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ॥

বৈষ্ণব পদের মত কবি ভণিতাও ব্যবহার করেছেন। এ কাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে বলা যায়, এগুলো সুরের সহযোগে গেয় মহাজন পদাবলীও নয়, বিভিন্ন পালায় বিভক্ত কবি বা পাঁচালি শ্রেণির গানও নয়। কবি মধুসূদন স্বয়ং এগুলোকে Ode আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দশপদী কবিতার মত বাংলায় এই শ্রেণির গীতিকবিতারও তিনি জন্মদাতা। বৈষ্ণব পদকর্তাদের ভক্তিভাব মধুসূদনের মনে কখনও ছিল না। তিনি ওড বা অসমচরণ গীতিকবিতা রচনা করতে গিয়ে যতি পংক্তি অন্ত্যমিল ও মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে স্বাধীনতা দেখিয়েছেন। কবির ভাষাপ্রয়োগ বিষয়ানুযায়ী সহজ।

'বীরাঙ্গনা' ইটালির কবি ওভিদের Heroides কাব্যের আদর্শানুসারে লিখিত পত্রকাব্য। যীশু খ্রিস্টের জন্মের অব্যবহিত পরে রচিত ওভিদের কবিতাগুলোর মূল বিষয়বস্তু প্রেম হলেও উপকরণ ছিল পুরাণের। মধুসূদনেরও তাই। তিনি অভিমান ও

অনুযোগের যোগসূত্র দিয়ে বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন অবস্থানের কয়েকজন ক্ষুব্ধা ও বিরহিণী নারীকে সফলভাবে এই কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

ওভিদের কাব্যের পত্রসংখ্যা ছিল একুশ। মধুসূদন এগারটি পত্র পূর্ণ করেছিলেন। আরও কয়েকটির সূত্রপাত করলেও তাঁর পক্ষে সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নি। ওভিদের কাব্যের নায়িকারা তাদের পতি বা প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে প্রধানত প্রেম-উদ্বোধিত চিত্তে পত্ররচনা করেছে। মধুসূদন এদেশের পৌরাণিক নারীচরিত্র উপজীব্য করে পত্ররচনা করেছেন। তবে কবি সেসব চরিত্র নিজের আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছেন। পত্রগুলোর 'কোন নারী নিষিদ্ধপ্রেমে উন্মাদিনী, কেউ প্রিয়সঙ্গলাভের জন্য কামাতুরা, কেউবা দুর্বল ভীরু স্বামীর প্রতি তীব্র বাক্যবাণবর্ষণে অকৃপণা।' বীরাঙ্গনা কাব্যের চরিত্রগুলোতে কামনার রক্তরাগ এবং চরিত্রের সুদৃঢ় স্বাতন্ত্র্য প্রাধান্য পেয়েছে। চরিত্রগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কোথাও নায়িকার প্রেমানুভূতির বেদনাকাতর রূপটি ফুটে উঠেছে। যেমন 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রে বনবাসিনী শকুন্তলার আবেদন :

কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব, সেবিবে
পা দু খানি—দাসীভাবে, এই লোভ মনে,
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে।
বনবাসিনী আমি, বাকল-বসনা,
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে ?
আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী; কুমুদী তারে পূজে মর্ত্য তলে!
কিংকরী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে!

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের কবিতাগুলোকে Dramatic monologue জাতীয় কবিতা বলা যায়। কতগুলো কবিতায় নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে। সর্বোপরি নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় কবি তাঁর লিরিক ক্ষমতাটুকু উজাড় করে দিয়েছেন। বীরাঙ্গনা কাব্যের ভাষা সরল এবং আবেগময়।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত বীরাঙ্গনা কাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছন্দের দিক থেকে চরম সার্থকতা লাভ করেছেন। এমন কি মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ থেকেও এতে অধিক কৃতিত্ব বিদ্যমান। মেঘনাদবধ কাব্যে অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়; কিন্তু বীরাঙ্গনা কাব্যে পরিচিত পরিবেশের মধ্যেই শব্দব্যবহার সীমাবদ্ধ রয়েছে। তাই কাব্যের ভাষা সরলতা-অভিমুখী।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে সনেট জাতীয় কবিতা রচনার মাধ্যমে মধুসূদন বাংলা কাব্যে একটি নতুন শাখার সৃষ্টি করেছেন। বৈচিত্র্যহীন বাংলা কাব্যে নতুনত্ব সৃষ্টি করে সমৃদ্ধি আনয়ন করার জন্য কবির সনেট রচনার এই উদ্যোগ। মেঘনাদবধ কাব্যের রচনাকালে কবির মনে সনেট রচনার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলেও ব্যারিস্টারি পড়া উপলক্ষে ফ্রান্সে থাকাকালীন এই সনেটগুলো রচিত হয়। মধুসূদন বিদেশযাত্রা করেন ১৮৬২

সালের ৯ই জুন তারিখে এবং ব্যারিস্টারি পড়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৬৭ সালে। ১৮৬৫ সালের স্বল্প সময়ে রচিত ১০২টি কবিতা প্রকাশের জন্য কলকাতায় প্রেরিত হয় এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে প্রকাশ লাভ করে। প্রকৃত পক্ষে এটিই মধুসূদনের সর্বশেষ কাব্য।

গীতিকবিতার পর্যায়ভুক্ত এই সনেটে কবিহৃদয়ের একটি সম্পূর্ণ অনুভূতি চৌদ্দ পংক্তির মধ্যে আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য সহকারে প্রকাশ পায়। সনেটে আবেগের তীব্রতা অপেক্ষা জীবন সম্বন্ধে পরিণত চিন্তা রূপ লাভ করে, প্রজ্ঞা ও মননের মাধ্যমে মুহূর্তের অনুভবের স্থায়িত্ব বিধান হয় এবং অতীত স্মৃতিচারণ অবলম্বনে কবি চেতনার গভীর স্তরে অবতরণ করেন। এক অখণ্ড ভাব ও চিন্তার রসপরিণতি এতে লক্ষণীয় এবং সনেটের অষ্টক ষটক—এই দুই অংশে বক্তব্যের বিশেষ রূপায়ণ এর বৈশিষ্ট্য। ইটালির কবি পেত্রার্কের আদর্শে মধুসূদন অধিকাংশ সনেট রচনা করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পেত্রার্কের সঙ্গে মনন ও মানসের আশ্চর্য মিল ছিল। পেত্রার্ক সনেট ও খণ্ড কবিতার এমন আদর্শ স্থাপন করেছিলেন যা পরবর্তী চার-পাঁচ শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই কবি তাঁর কাব্যকে এমন একটা পরিশীলিত ও নাগরিক রূপ দিয়েছিলেন, রেনেসাঁর সময়কার ও তার পরবর্তী কবিরা যাকে আধুনিকতার প্রথম সোপান হিসেবে গণ্য করেছিলেন। এসব কারণে মধুসূদন তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন।

ইউরোপে প্রবাসকালে মাতৃভূমির স্মৃতি-উদ্ভাসিত মনে বাল্যস্মৃতি, হিন্দুদের পূজাউৎসব, পূবর্তন কবিদের স্মৃতিতর্পণ ইত্যাদি বহুবিধ বৈশিষ্ট্য নিয়ে কবিতাগুলো রচিত। ফলে এসব কবিতায় তাঁর মানসিক অবস্থার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য :

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, বিনাহারে সঁপি কায়মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

পৌরাণিক আদর্শের কালোচিত রূপান্তর, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় এবং যুগোপযোগী জীবন জিজ্ঞাসার প্রতিফলন তাঁর কাব্যকে যেমন ঐতিহ্য বিরহিত করেছে, তেমনি অনাগত কালের জন্য রেখে গেছে অন্তহীন আবেদন। বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন যুগের প্রবর্তনার মাধ্যমে মাইকেল মধুসূদন দত্ত আশ্চর্য প্রতিভার যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। গতানুগতিক সাহিত্যাদর্শে তাঁর বলিষ্ঠ বিদ্রোহের ফলে বাংলা সাহিত্যের মুক্তিলাভ এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। একান্ত আকস্মিকতা সহকারে তাঁর আবির্ভাব, স্বল্প সময়ে তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার বিকাশ এবং যুগস্রষ্টা হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পরম বিস্ময়।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। 'ঈশ্বর গুপ্ত আঙ্গিকে পুরানো, কিন্তু ভাবে নূতন।'—এই উক্তির আলোকে বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

২। 'ঈশ্বর গুপ্তকে যুগসন্ধির কবি' বলা হয় কেন ?

৩। 'ঈশ্বর গুপ্তে নিম্নমানের কৌতুকপ্রবণতা ছিল এ কথা স্বীকার করি, হয়ত ইহার নাম ভাঁড়ামি, কিন্তু তবু আধুনিক বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম পথিকৃত কবি।' আলোচনা কর।

৪। আধুনিক বাংলা কবিতার উন্মেষকালে ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল যে কাব্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন তাহার আধুনিকতা ও মধ্যযুগীয়তার লক্ষণসমূহের পরিচয় দাও।

৫। 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় যার আভাস, রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে তারই পূর্ণতার বিকাশ।'—এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কাব্যে দেশাত্মবোধের সূত্রপাত ও বিবর্তনের স্বরূপ আলোচনা কর।

৬। মধুসূদনই 'প্রথম দেশীয় বিষয়বস্তুর কাব্য উপস্থাপনায় পাশ্চাত্য কবিকল্পনার বিশেষ রীতিটির সার্থক প্রয়োগ করিলেন।'—মধুসূদন সৃষ্ট নবীন কাব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া এই বিশেষ 'রীতিটির' ব্যাখ্যা কর।

৭। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রবর্তনে মধুসূদনের ভূমিকার পরিচয় দাও।

৮। টীকা লিখ : ঈশ্বর গুপ্ত, গুপ্ত কবি, পদ্মিনী উপাখ্যান, বীরাঙ্গনা কাব্য।

অষ্টম অধ্যায়

মহাকাব্য

মহাকাব্য বলতে যে অতিকায় কবিকৃতি বোঝায় এক কথায় তার যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অসম্ভব। এই সুপ্রাচীন সাহিত্যসৃষ্টি প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে স্বতন্ত্রভাবে বিকাশলাভ করেছিল বলে এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা বিদ্যমান। সংস্কৃত তথা প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণের সংজ্ঞার সঙ্গে তার ঐক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত মহাকাব্যের কালের সীমানা থেকে বহুদূরে এই আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্য রচনায় প্রাচ্য ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্য প্রভাব কোনটাই উপেক্ষা করা যায় নি। তাই বাংলা মহাকাব্য রচনায় এই দুই বৈশিষ্ট্যের সম্মিলন প্রত্যক্ষ করা চলে।

বাংলা মহাকাব্যের পরিচয় লাভ করতে হলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ সম্পর্কে অবহিত থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাচ্য আদর্শানুসারে মহাকাব্যে সর্গবিভাগ থাকবে এবং সর্গ সংখ্যা হবে অষ্টাধিক। সমগ্র সর্গ এক ছন্দে রচিত হবে, তবে সর্গান্তে ছন্দের পরিবর্তন ঘটবে। বিষয়ানুযায়ী সর্গের নামকরণ হবে। আশীর্বাদ, নমস্কার অথবা বস্তুনির্দেশ দ্বারা হবে মহাকাব্যের আরম্ভ। এর উপজীব্য হবে পুরাণ, ইতিহাস বা কোন সত্য ঘটনা। মহাকাব্য পাঠে ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফললাভ হবে। নায়ক ধীরোদাত্ত গুণসম্বলিত এবং সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় বা দেবতা হবেন। পটভূমি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালপ্রসারী এবং তাতে যুদ্ধ প্রকৃতি নগর ও সমুদ্রের বর্ণনা থাকবে। এতে শৃঙ্গার বীর শান্ত—এই তিনটির একটি রস প্রধান এবং অন্যান্য রস এর অঙ্গস্বরূপ হবে। নায়কের জয় বা প্রতিষ্ঠার মধ্যে মহাকাব্যের সমাপ্তি ঘটবে।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য আদর্শানুসারে মহাকাব্য বলতে বীরত্বব্যঞ্জক উপাখ্যান বোঝায়। সর্গ সংখ্যা সম্পর্কে কোন সীমাবদ্ধতা এতে নেই, তবে এক ছন্দেই তা রচিত হবে। এর বস্তু উপাদান হবে জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তথ্য। নায়ক দেবতা না হলেও অসাধারণ ক্ষমতাশালী এবং মহৎ গুণসম্পন্ন বীর হতে হবে। মূলকাহিনির পাশে শাখাকাহিনি থাকতে পারে এবং কাহিনিতে থাকবে নাটকীয়তা। মহাকাব্য হবে বীররস প্রধান। পরিসমাপ্তি শুভান্তিক হবে এমন কোন সীমাবদ্ধতা নেই। মহাকাব্যের ভাষা হবে প্রসাদগুণসম্পন্ন, ওজস্বী এবং অনুপ্রাস উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারবহুল। এরিস্টটলের মতে, 'মহাকাব্য আদি, মধ্য ও অন্তসম্বলিত বর্ণনাত্মক কাব্য—এতে বিশিষ্ট কোন নায়কের জীবনকাহিনি অখণ্ডরূপে একই বীরোচিত ছন্দের সাহায্যে কীর্তিত হয়।'

তবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদর্শে পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য বর্তমান। কারণ দেশকালের ব্যবধান থাকলেও ভাবের ক্ষেত্রে মানব মনের ধ্যানধারণার ঐক্য কাজ করেছে।

পাশ্চাত্য মহাকাব্য দু ভাগে বিভক্ত—জাত মহাকাব্য (Epic of Growth বা Authentic Epic) এবং সাহিত্যিক বা অনুকৃত মহাকাব্য (Literary Epic বা

Imitative Epic)। প্রথমোক্ত মহাকাব্য কোন বিশেষ কবির রচনা নয়, তাতে বহু অজানা কবির অসংখ্য রচনা পরবর্তীকালে কেউ একত্রিত করে অখণ্ড কাব্যে রূপ দেন। বাল্মীকির 'রামায়ণ', ব্যাসের 'মহাভারত' এবং গ্রীক কবি হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' এই জাতীয় মহাকাব্য। শেষোক্ত শ্রেণির মহাকাব্য অলঙ্কারশাস্ত্রবিধি সম্মত রচনা। একজন বিশেষ কবির প্রতিভায় তা রচিত হয়। জাত মহাকাব্য পুরাণ ইতিহাস থেকে কাহিনি নিয়ে রচিত নতুন সৃষ্টির মর্যাদা পায়। ভার্জিলের 'ইনিড', মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এই শ্রেণির মহাকাব্য।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সূত্রপাত থেকে কাব্যের একচ্ছত্র আধিপত্য বিদ্যমান থাকলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্ব পর্যন্ত কোন মহাকাব্য রচিত হয় নি। তখন নানা কাহিনিকাব্য প্রচলিত থাকলেও সে সব মহাকাব্য হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার অধিকারী ছিল না। পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে এই বিশেষ শাখাটির সূত্রপাত এবং বিশেষভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কিছু সংখ্যক মহাকাব্য রচিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। উনিশ শতকের জাতীয়তাবোধ এই রচনাপ্রাচুর্যের মূল কারণ। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালির মনে পাশ্চাত্য প্রভাব সম্প্রসারিত হয়। তার ফলে নতুন জীবনদর্শন ও কাব্যপ্রত্যয় বাঙালি পাঠক ও কবিকে নতুনতর সৃষ্টিশীলতায় উদ্বুদ্ধ করে। তাই আধুনিক জীবনোল্লাসের উদ্বোধন বাংলা মহাকাব্যেই সম্ভবপর হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিরা পাশ্চাত্য প্রভাবে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং তারা জাতীয় চেতনা অনুভব করতে সক্ষম হয়। সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যেই বাঙালি কবি মহাকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

উনিশ শতকে বাঙালির জাতীয় জীবনে যে নবচেতনার সৃষ্টি হয়েছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে বাংলা মহাকাব্যগুলোতে। জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে জাতীয় জীবনে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টাই এর পশ্চাতে কার্যকর ছিল। নতুন যুগচেতনায় জাতি গঠনের প্রেরণায় জাতিবৈরীমূলক মহাকাব্য রচনার প্রতি মহাকবিগণের বিশেষ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। অপর জাতির বৈরিতা স্বাজাত্যবোধ বিকাশে সহায়ক ছিল। পাশ্চাত্য দেশে মহাকাব্যের যুগ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। পাশ্চাত্যের আদর্শেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সৃষ্টি হয়েছিল; তবু নবযুগের প্রয়োজনে বাংলায় মহাকাব্য রচিত হয়। মহাকাব্য সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে প্রাচীনতাধর্মী হলেও বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে মহাকাব্যের মধ্যে আধুনিকতার স্পর্শ ছিল। তাই তখন তা পাঠকের নিকট পুরাতন বলে বিবেচিত হয় নি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকাব্যের যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে তা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কায়কোবাদ প্রমুখ মহাকবি কর্তৃক অনুসৃত হয়। কিন্তু তাঁদের পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে আর মহাকাব্য রচিত হচ্ছে না। এমন কি রবীন্দ্রনাথের মত বিস্ময়কর প্রতিভা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে নিয়োজিত হলেও মহাকাব্য রচনায় নিয়োজিত হয় নি। বর্তমানে মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। যে অতিপ্রাকৃতের অবতারণা মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য, বর্তমানের মানুষ তার ওপর আস্থাশীল নয়। সমাজ ও জীবনাদর্শের এই পরিবর্তন আধুনিক কালে মহাকাব্য রচিত না হওয়ার প্রধান কারণ। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে ব্যক্তিবিশেষের সমুন্নত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাতির

আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত নয়। তাই মহাকাব্যের নায়ককে বর্তমানের মানুষ জীবন-সংগ্রামের নায়ক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। বর্তমান ব্যক্তিনিষ্ঠ কাব্যের যুগে মহাকাব্যের চেয়ে গীতিকাব্যে কবিহৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি সার্থকভাবে প্রকাশমান। প্রমথ চৌধুরী মনে করেন, 'এ যুগের কবিতা হচ্ছে হৃদয়ের স্বগতোক্তি। সুতরাং সে উক্তি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের চেয়ে দীর্ঘ হতে পারে না।' আধুনিক মানুষের রসঘন আনন্দবেদনা রূপায়ণের ক্ষমতা মহাকাব্যের নেই। কথাসাহিত্যের উপযোগিতা ও জনপ্রিয়তা পাঠককে মহাকাব্য বিমুখ করেছে। এসব কারণে মহাকাব্য অপেক্ষা গীতিকবিতা রচনাতেই যুগমানস অধিক আগ্রহশীল। তাই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মন্তব্য করেছিলেন, 'সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারেই চলিয়া গিয়াছে।' এ কারণে কৌতুকচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা' কাব্যে বলেছিলেন :

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য—
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন—
কিংকিণীতে,
কল্পনাটি গেল কাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকাব্যের ধারার সূত্রপাত করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত মেঘনাদবধ কাব্যের মাধ্যমে মহাকাব্যের পূর্ণাঙ্গ রূপের অনবদ্য প্রকাশ ঘটে এবং বাংলা সাহিত্যের তা প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। মধুসূদন প্রবর্তিত পথরেখায় হেমচন্দ্র, নবীন সেন, কায়কোবাদ প্রমুখ মহাকবির পরিক্রমণ সংঘটিত হলেও অন্য কারও পক্ষে মাইকেলের মত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা সম্ভব হয় নি।

পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি কাব্যসাধনায় বিখ্যাত পাশ্চাত্য কবিদের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। সে উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থকাম হয়ে তিনি অনেকটা আকস্মিকভাবে বাংলা ভাষার শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস সঞ্চয়পূর্বক প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদর্শের সম্মিলনে বাংলায় মহাকাব্য রচনার প্রয়াস পান। মধুসূদনের যুগে মহাকাব্য রচনাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ মর্যাদালাভের একমাত্র উপায় ও পরীক্ষাস্থল বলে বিবেচিত হত। সেজন্য মধুসূদন যখন বাংলায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মনস্থির করলেন তখন তিনি হোমার ভার্জিল দান্তে ট্যাসো প্রভৃতি বিদেশী এবং ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি দেশীয় মহাকবিদের রচনার প্রতিস্পর্ধী মহাকাব্য রচনার দুঃসাহসিক

কল্পনাকেই রূপদানের কার্যে প্রবৃত্ত হলেন। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে তিনি রামায়ণের রাবণকর্তৃক সীতাহরণ ও রামের উদ্ধার কাহিনির মেঘনাদবধের ঘটনা কেন্দ্র করে হোমার ভার্জিল দান্তে ট্যাসো মিলটন বাল্মীকি কালিদাস প্রমুখ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কবিগুরুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামক মহাকাব্য রচনা করেন।

মধুসূদন বাল্মীকির রামায়ণ থেকে স্বল্প পরিমিত কাহিনি সংগ্রহ করেন। বীরবাহুর নিহত হওয়ার সংবাদ থেকে মেঘনাদের হত্যা এবং প্রমীলার চিতারোহণ পর্যন্ত তিন দিন দু রাত্রির ঘটনা এতে বর্ণিত হয়েছে। নয় সর্গের এই কাব্যকে মধুসূদন ঠিক মহাকাব্য বলেন নি, বলেছেন Epicling—ছোট মাপের মহাকাব্য। কাহিনির দিক থেকে রামায়ণের নিকট ঋণী হলেও তিনি প্রয়োজন মত কাহিনি ও চরিত্রের পরিবর্তন করে নিয়েছেন। এর জন্য রাবণ-মেঘনাদ-প্রমীলা ও রাম-লক্ষ্মণকে অভিনব রূপে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়।

পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে মাইকেল বাংলা সাহিত্যে মহত্তর সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধ হন। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের মানবতার বন্দনাগীতি মধুসূদনের মনে নবপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল। এদিক থেকে রামরাবণের সংগ্রামের মধ্যে যুগচেতনানুসারে মানবিকতার পরিচয় উপলব্ধি করেছিলেন। সংস্কৃত কবি বাল্মীকি এবং তাঁর বাংলা অনুবাদক কবি কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র অবতাররূপে কল্পিত হলেও মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে অভিনব দৃষ্টিতে এই পৌরাণিক চরিত্রটির নবমূল্যায়নে সচেষ্ট হন। মধুসূদনের মতানুসারে রাবণচরিত্র মহত্ত্ব ও গৌরবময় আদর্শের প্রতীক—পরম পরাক্রমশালী রাজা রাবণ দেশপ্রেমিক ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ, পতিব্রতা প্রমীলা চরিত্র তাঁকে অধিকতর আকৃষ্ট করেছিল। সমসাময়িক যুগে রামের নৈতিক আদর্শ অপেক্ষা রাবণের দৈবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামের অধিকতর উপযোগিতা এবং প্রবলতর আবেদন আছে বলে মধুসূদন এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন, কবিমানস ও যুগমানসে যে বিদ্রোহ বিদ্যমান ছিল মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দে ও ভাবে তার প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে এই তাৎপর্য সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে : 'মেঘনাদবধ কাব্যের কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙ্গিয়াছেন এবং রামরাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে একটা যে বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহার শাসন ভাঙ্গিয়াছেন। এই কাব্যে রামলক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভাল ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য, ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এ শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোন-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এত দিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারি রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার

প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র-পৌত্র-আত্মীয় স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতেই হার মানিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্ত মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি অতি সাবধানে স্পর্ধাভরে কিছু মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।'

মেঘনাদবধ কাব্যে মাইকেলের দৃষ্টিভঙ্গি এক নতুনতর দিকের পরিস্ফুটন ঘটিয়েছে। রাক্ষসেরা এখানে সুসভ্য মানুষের মতই চিত্রিত হয়েছে। মহিমান্বিত সম্রাট, পুত্র-অনুরাগী পিতা, স্বদেশপ্রেমিক বীর প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত রাবণ মাইকেলের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছে।

ড. গোলাম মুরশিদ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী 'আশার ছলনে ভুলি' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'মাইকেল বারবার পৌরাণিক কাহিনি বেছে নিয়েছেন। এ থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তিনি পৌরাণিক জগতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেটা মোটেই ঠিক নয়। এমন কি, নতুন ভাষা ও ছন্দ এবং ভিন্নতর ভঙ্গিতে পৌরাণিক কাহিনি নতুন করে বলার লোভেও নয়। সত্যি বলতে কি, তাঁর মনোভাব ছিল প্রাচীন জগৎ থেকে একেবারে আলাদা। কিন্তু তিনি ধ্রুপদী সাহিত্যের অত্যুৎসাহী পাঠক হিসেবে পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য দেখতে পেতেন। সেই সৌন্দর্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পুরাণকে পরিবেশন করতে। তিনি পৌরাণিক কাহিনি বেছে নিয়েছিলেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর আধুনিক মানবিক মূল্যবোধকে প্রকাশ করার জন্য।'

মেঘনাদবধ কাব্যে গৃহীত বিষয়ের রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনচরিত' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন :

'মেঘনাদবধ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, ইহার রাক্ষসগণ রামায়ণের বীভৎসরসের আধার নরশোণিতপ্রিয় জীব নহেন। বীরত্বে, গৌরবে, ঐশ্বর্য এবং শারীরিক সৌন্দর্যে সাধারণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা মনুষ্য। আবার, ব্যবহারেও আর্য সমাজ হইতে তাঁহাদিগের সমাজের কোন পার্থক্য নাই। আর্য নরনারীগণের ন্যায় তাহারাও যজ্ঞ ও দেবপূজা করেন; ধূপদীপ, নৈবেদ্য এবং গঙ্গাজলও তাঁহাদিগের পূজার অঙ্গ; তাঁহাদিগেরও কুললক্ষ্মীগণ স্বামী-পুত্রের কল্যাণের জন্য শিবসাধনা করেন এবং সতী পতির সঙ্গে সহমৃতা হন। তাঁহাদিগেরও গৃহে পার্থিব ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী রূপে রাজলক্ষ্মীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত এবং মহামায়া তাঁহাদিগেরও পুরাধিষ্ঠাত্রী। আর্য রামায়ণের যে নরমাংসাশী রাক্ষসরাজ, সীতাদেবীকে প্রাতরাশ রূপে ভক্ষণ করিবেন বলিয়া, মধ্যে মধ্যে ভীতি প্রদর্শন করিতেন, মেঘনাদবধের পাঠককে সর্বপ্রথমে, তাঁহার ও তাঁহার পরিজনবর্গের কথা বিস্মৃত হইতে হইবে। রাক্ষসগণের ন্যায় মেঘনাদবধের বানরগণও মানব; বৃহল্লাঙ্গুল, রোমশ পশু নহেন; সাধারণ মানব হইতে তাঁহাদিগের কোনও পার্থক্য নাই। মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহার রামচন্দ্র ও সীতা দেবী নারায়ণের ও লক্ষ্মীর অবতার নহেন; তাঁহারাও মানব-মানবী এবং পৃথিবীর অপর

নরনারীগণের ন্যায় সুখ-দুঃখ ভাগী। সাধারণ মনুষ্য হইতে তাঁহাদিগের এইমাত্র বিভিন্নতা যে তপোবলে ও কর্মবলে, তাঁহারাও দেবগণকে প্রত্যক্ষ করিতে এমনকি, সময়ে-সময়ে আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্মেরও অংশ গ্রহণ করাইতে পারেন। মেঘনাদবধ সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, ইহাতে রামায়ণে অনুল্লিখিত, এমনকি, রামায়ণ-বিরোধী, অনেক কথাও লক্ষিত হইবে। রামায়ণের ন্যায় ইলিয়াড ও ইনিয়াড প্রভৃতি পাশ্চাত্য কাব্যসমূহের অনেক ঘটনা, পরিবর্তিত আকারে, ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণের আদর্শ হইতে ইহার আদর্শও ভিন্ন। মহর্ষির প্রদর্শিত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া কবি ইহাতে রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের অপেক্ষা রাক্ষস পরিবারদিগের প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।' মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বীর রাক্ষসদের প্রতিপক্ষ হিসেবে বানরদের দেখাতে কবি সংকোচ বোধ করেছেন। কারণ তাতে রাক্ষসদের বীরত্ব ম্লান হয়ে যায়। কবি বহিরাগত ও আগ্রাসী রামের চেয়ে রাক্ষসদেরই জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে সমর্থন করেছেন।

বীররসাত্মক কাব্য রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বীররসের কাহিনির ইঙ্গিত দিয়েই কাব্যের আরম্ভ :

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি?

এই সরস্বতী-বন্দনাতেই কবি বলেছেন :

গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা। কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

বীররসে কাব্যরচনার এই উদ্দেশ্য সার্থকভাবে রূপায়িত হয়ে ওঠে নি। বীরবাহু জননী চিত্রাঙ্গদার আর্তনাদে, অশোকবনে বন্দিনী সীতার অশ্রুবিসর্জনে, মেঘনাদপত্নী প্রমীলার চিতারোহণে, সর্বোপরি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুত্রহারা রাবণের হাহাকারে করুণ রসেরই প্রাধান্য ঘটেছে। প্রথম সর্গে রাবণের খেদ :

কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;

তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?

বেদনাকাতর এই অনুভূতি শেষ সর্গে চরম হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রাণপ্রিয় পুত্র মেঘনাদের চিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রাবণ তাঁর হৃদয়ের হাহাকার ব্যক্ত করেছেন :

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায় করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে!

রাবণচরিত্রের এই হাহাকারই কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে।

স্বদেশি ও বিদেশি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে মেঘনাদবধ কাব্য রচিত। রামায়ণ থেকে কাহিনি গ্রহণ করলেও মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনি অনেকটা পরিবর্তিত। তবে কবি অনেক স্থানে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেছেন। মধুসূদনের ওপর বাল্মীকি ও হোমারের প্রভাব সমধিক। কাহিনিবিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে দেখা যায়, মাইকেল রামায়ণ কাহিনির মহৎ ও স্নিগ্ধ কবিত্বের ওপর হোমারের 'ইলিয়াড' কাহিনির কঠিন ও দীপ্ত শৌর্যের রং ফলিয়ে নতুন কবিকল্পনার ফসল মেঘনাদবধ মহাকাব্য সৃষ্টি করেছেন। গ্রিক মহাকবি হোমারকে অনুসরণ করে মেঘনাদবধের অধিকাংশ চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। মেঘনাদবধের শিব উমা যেন হোমারের জেউস হেরা। মহামায়াকে স্বতন্ত্র দেবী কল্পনা মধুসূদনের নিজস্ব। ইলিয়াডের আরেস মেঘনাদবধের স্কন্দ। মেঘনাদের পরিণাম হেকটরের পরিণামের মত। প্রমীলা কতকটা হেকটরের স্ত্রী আন্দ্রোমাখের এবং কতকটা ট্যাসোর কাব্যের রণরঙ্গিণী ক্লোরিন্দার মত। মেঘনাদবধ কাব্যে রামচন্দ্রের পক্ষাবলম্বন পূর্বক দেবদেবীকর্তৃক পরামর্শ প্রদান, উমাকর্তৃক শিবকে ভুলিয়ে রাবণের বিরুদ্ধে নেওয়ার চেষ্টা, দেবতাকর্তৃক রামকে অস্ত্রপ্রদান ও রামের পক্ষে যোগদান, রামচন্দ্রের নরকভ্রমণ ও পরলোকে পিতৃদর্শন, ইন্দ্রজিতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি ঘটনা হোমারের অনুসরণে সংস্থাপিত।

ভাষা, শব্দ ও উপমা ব্যবহারের দিক দিয়ে মাইকেল হোমারের মহাকাব্যের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। কয়েকটি বিশেষণ, শব্দ ও বাক্যাংশ গ্রিক থেকে অনূদিত। সিংহ ব্যাঘ্র অগ্নি প্রভৃতি উপমা ব্যবহারের বাহুল্য গ্রীকের অনুসারী।

মধুসূদন দেশিবিদেশি উৎস থেকে উপমা-অলঙ্কার সংগ্রহ করে মহাকাব্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত উপমার কিছু নিদর্শন :

১. পৌরাণিক		হলাহল জ্বলে কোন স্থলে; সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি।
২. কালিদাসীয়		যে রমণী পতিপরায়ণা, সহচরীসহ সে কি যায় পতিপাশে? একাকী প্রত্যুষে, প্রভু; যায় চক্রবাকী যথা প্রাণকান্ত তার!
৩. বৈষ্ণব সাহিত্য		চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,— গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে।
৪. দেশীয় ব্রত-উৎসব	:	বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।
৫. মহাদেব	:	শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম।
৬. অগ্নি	:	উঠিল আভা আকাশ মণ্ডলে, যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
৭. সমুদ্র		ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে সাগর কল্লোলসম।
৮. পর্বত	:	হেমকুট হৈম শিরে শৃঙ্গধর যথা তেজঃপুঞ্জ।
৯. সূর্য	:	হাসিল তারাবলী মণিকুল সৌরকরে যথা।
১০. চন্দ্র	:	সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে।
১১. হাতি	:	চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর গমনে।
১২. সিংহ	:	কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বীতংসে?
১৩. পদ্ম		লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।
১৪. সাপ		বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে বিষাদে লুকায় যথা।

গ্রিক মহাকাব্যের 'নেমেসিস' বা দৈবনির্বন্ধবাদ মেঘনাদবধ কাব্যে প্রকাশমান। সমস্ত শক্তিসামর্থ্য থাকলেও যে বিধির বিধানে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হতে হয় তা গ্রিক নিয়তির বৈশিষ্ট্য। রাবণ তাঁর ধ্বংসের জন্য কোন কারণ খুঁজে পান নি, সীতাহরণকে পাপ বলে মনে করার যুক্তি তাঁর ছিল না, পূর্বজন্মের অজ্ঞাত পাপ সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে, কিন্তু এক অদৃশ্য নিয়তির নির্দেশেই যেন তাঁকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. আবুল হাসান শামসুদ্দিন তাঁর অভিসন্দর্ভ 'বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য : মধুসূদন ও অনুসারিবৃন্দ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'মধুসূদন তাঁর কাহিনি পরিকল্পনায় নিয়তির অনিবার্য পরিণাম সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করতে পারেন নি। রাবণের ধ্বংসের জন্য তাঁর পাপকে তিনি দায়ী করেন নি, অথচ সমস্ত দেবকুল রাবণের ধ্বংসের জন্য সমবেত হয়েছেন, এবং এর ফলেই রাবণের ধ্বংস সাধিত হয়েছে। পাঠকদের কাছে দেবতাদের ষড়যন্ত্রই রাবণের নিয়তিরূপে প্রতিভাত হয়। এমনকি, মহাদেব ও মায়াদেবী সহায়তা না করলে দেবতারাও মেঘনাদের হত্যার ষড়যন্ত্র সফল করে তুলতে পারতেন না।'

মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে মধুসূদনকে ভাব ভাষা ও ছন্দ নতুনভাবে রূপায়িত করে তুলতে হয়েছিল। ভাবের প্রকাশের দিক থেকে যেমন তাঁর মৌলিকতার পরিচয়

পাওয়া যায়, তেমনি মহাকাব্যের উপযুক্ত ভাষা তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন। সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যপূর্ণ ব্যবহার, অপরিচিত অথচ ধ্বনিগাম্ভীর্যপূর্ণ শব্দের প্রয়োগ, সমাসবদ্ধ শব্দের প্রাচুর্য তাঁর কবিভাষাকে বিশিষ্ট করেছে। বাংলা ভাষার অপূর্ব শক্তির পরিচয় এই মহাকাব্যে বিধৃত। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে'-এ ধরনের দুরূহ ভাষাপ্রয়োগও যে ভাব প্রকাশের উপযুক্ত বাহন তা সমালোচক-স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে নতুন শব্দ নির্মাণকৌশলের প্রতি মনোযোগী না হয়ে কবি প্রচলিত শব্দকেই নতুন বাণীভঙ্গিতে বিন্যস্ত করেছেন। মধুসূদনের কৃতিত্ব আছে প্রতিশব্দ ব্যবহারে। মেঘনাদবধ কাব্যে প্রচুর প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একই শব্দের পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য যেমন এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি ছন্দ, ধ্বনিগাম্ভীর্য ও শ্রুতিমাধুর্যের জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে শব্দের অর্থসম্পর্কে কবির পাণ্ডিত্য, ছন্দ সম্পর্কে সচেতনতা, ধ্বনির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবির উপলব্ধির গভীরতার বিষয় অবহিত হওয়া যায়। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মহাকবির বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় এখানে সহজেই লাভ করা সম্ভব। কবির প্রতিশব্দ ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত :

রামের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত শব্দাবলি : রাঘব, দশরথাত্মজ, দাশরথি, সীতাপতি, বৈদেহীনাথ, বৈদেহীরঞ্জন, কৌশল্যানন্দন, বৈদেহীমনোরঞ্জন, রঘুকুলমণি, রাঘবেন্দ্র, রঘুবর, রঘুনন্দন, রঘুশ্রেষ্ঠ, সীতানাথ, রবিকুল রবি, রঘুকুলনিধি, রঘুচূড়ামণি, নর-বর, রঘুপতি, রঘুনাথ, রঘুবংশ-অবতংস, সীতাকান্ত, রাঘবচন্দ্র, রঘুকুল-রাজা, বৈদেহীবিলাসী, রাঘবেশ্বর, মৈথিলীনাথ, নরপাল, বৈদেহীপতি, রক্ষোরিপু, মৈথিলী-বিলাসী, রামভদ্র, মৈথিলীপতি, রঘুজ-অজ-অঙ্গজ-দশরথাত্মজ।

সুনির্বাচিত উপমা তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট রূপ দিয়েছে। অনুপ্রাস ব্যবহারের প্রাচুর্য মেঘনাদবধ কাব্যের সর্বত্র রয়েছে। 'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে'—এ ধরনের অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যেতে পারে। মহাকাব্যের উপযুক্ত ছন্দ অমিত্রাক্ষর সৃষ্টি করে মধুসূদন যে শুধু তাঁর মহাকাব্যে সার্থকতা দেখিয়েছেন তা নয়, বরং বাংলা ছন্দের পরবর্তী সম্ভাবনাপূর্ণ ইতিহাস সৃষ্টির জন্য বন্ধনমুক্তি ঘটালেন। এ সমস্ত দিক থেকে মধুসূদনের সাধনা একক। এর ফলেই তিনি বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের নতুন ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং এই ধারায় শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবও তাঁর। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বন্ধু রাজনারায়ণ রায় মেঘনাদবধ কাব্যকে বাংলা ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য বিবেচনা করে মন্তব্য করেছিলেন, 'অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়ই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে।'

মেঘনাদবধ কাব্যের ত্রুটি সম্পর্কে যেসব মন্তব্য লক্ষ করা যায়, সেগুলো হল : কাহিনির সংক্ষিপ্ততা, কাব্যে বিধৃত নীতিধর্ম সম্পর্কে ভিন্নমত, অনার্যপ্রীতি, স্বর্গ-নরকের প্রাণহীন বর্ণনা, আখ্যানের বাইরে সীমিত ও আড়ষ্ট কবিকল্পনা, পৌরাণিক কাহিনিমূলক উপমা-অলঙ্কার প্রয়োগ, অনুপ্রাস-যমকের বিপুল ভার, নামধাতুর আতিশয্য প্রভৃতি।

মধুসূদনের মহাকাব্যের প্রথম আলোচক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ করেছিলেন সে সম্পর্কে এ ভাবে মন্তব্য করেছেন : 'বাক্যের জটিলতা দোষই তাঁহার

রচনার প্রধান দোষ; অর্থাৎ যে বাক্যের সহিত যাহার অন্বয় বিশেষ্য বিশেষণ, সংজ্ঞাসর্বনাম এবং কর্তাক্রিয়া সম্বন্ধ তৎপরস্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান; সুতরাং অনেক স্থলে অস্পষ্টার্থ দোষ জন্মিয়াছে,—অনেক পরিশ্রম না করিলে ভাষার উপলব্ধি হয় না।

দ্বিতীয়ত, তিনি উপর্যুপরি রাশি রাশি উপমা একত্রিত করিয়া স্তূপাকার করিয়া থাকেন এবং সর্বত্র উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না।

তৃতীয় দোষ, প্রথা-বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা। যথা—'স্তুতিলা', 'ধ্বনিলা', 'মর্মরিছে', 'দ্বন্দ্বিলা', 'সুবর্ণি' ইত্যাদি।

চতুর্থত, বিরাম যতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে।'

এই ত্রুটি নির্দেশ করে হেমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, 'এ সমস্ত দোষ না থাকিলে মেঘনাদবধ গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইত; কিন্তু এই রূপ দোষাশ্রিত হইয়াও কাব্যখানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে বঙ্গভাষার ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না।' মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, 'মেঘনাদবধের ঘটনাবস্তু জটিল বা বিস্তৃত নহে; চরিত্র সৃষ্টিতে অথবা নায়কের কীর্তিকুশলতায় মহাকাব্যোচিত মহিমা ইহার নাই—এমন একটি চরিত্রও নাই, যাহাকে দুর্ধর্ষ পুরুষ বীর বা মানুষরূপী দেবতা বলা যাইতে পারে। নায়ক মেঘনাদের হত্যা এবং যে-ভাবে সেই হত্যা সাধিত হইয়াছে, লঙ্কার সর্বনাশ ও রাবণের শোক এ সকলের কোনটিতেই মহাকাব্যোচিত বিষয় গৌরব নাই।'

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকাব্য রচনায় যে অপরিসীম সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার ফলে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার প্রেরণা আসে। তবে পরবর্তীকালে কারও পক্ষেই মধুসূদনের সমকক্ষতা লাভ করা সম্ভব হয় নি। মধুসূদন মনে করতেন 'আমাদের নাটক গদ্যে না-লিখে, অমিত্রাক্ষরে লেখা উচিত।' এই অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই তিনি আক্ষরিক অর্থে বাজি রেখে বাংলাকাব্যে প্রয়োগ করলেন এবং মেঘনাদবধ কাব্যে তা বাহন হিসেবে রূপ দিয়ে মহাকাব্যের এক গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত মহাকাব্যের ধারা অনুসরণে যাঁরা এক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) তাঁদের অন্যতম। বিধর্মী মধুসূদন কর্তৃক হিন্দু সংস্কৃতির মহিমা উচ্চারণ তাঁর অনুসারীগণকে হিন্দু জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে মহাকাব্য রচনায় প্রেরণা দান করেছিল। পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে কাব্যরচনার দৃষ্টান্ত স্থাপনে মধুসূদনের কৃতিত্ব পরবর্তী কবিগণের মনে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে হিন্দু জাতীয়তাবোধ প্রকাশক 'বৃত্রসংহার কাব্য' (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭) রচনা করেন। পৌরাণিক কাহিনি মূল কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করে হেমচন্দ্র তাঁর কবিমানসের বিচিত্র কল্পনা রূপায়িত করে তুলেছেন। বৃত্র নামক অসুরকর্তৃক স্বর্গবিজয় এবং দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক স্বর্গের অধিকার পুনঃস্থাপনা ও বৃত্রাসুরের নিধন এই মহাকাব্যের মূল বিষয়বস্তু। এই কাহিনির মধ্যে দেবতাদের কল্যাণের জন্য দধীচি মুনির মহান আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত হেমচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কবি হিসেবে হেমচন্দ্রের

অত্যধিক খ্যাতি অর্জনের পশ্চাতে তাঁর কাব্যে উনিশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবোধের আদর্শ রূপায়ণ, হিন্দুধর্ম, আচার-অনুষ্ঠানের মর্যাদা, পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যের আঙ্গিক ব্যবহার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য কার্যকরী ছিল। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর কবিত্ব প্রতিভার অপ্রতুলতা সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির যুগোপযোগী ধারক হিসেবে বাংলা মহাকাব্যের ধারায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে ঐতিহ্যচেতনার পরিচয় দিতে গিয়ে এ পর্যায়ের কবিগণ যে কাব্যের উৎকর্ষ ঘটাতে পারেন নি সে সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'হেমচন্দ্র ও নবীন চন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অতিপক্ষপাতিত্বের জন্য সময় সময় কাব্যোৎকর্ষের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে এতই নিবিষ্টচিত্ত যে, এই তত্ত্বপ্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকল সময় কাব্যানুমোদিত রচনারীতি অবলম্বন করেন নাই।'

হেমচন্দ্রের কাব্যসাধনার পশ্চাতে জাতীয়তাবোধের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা এদেশের সমগ্র অধিবাসীর একটা অংশমাত্র—বিশেষত হিন্দুজাতিকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ পেয়েছে। মাইকেল মদুসূদন দত্তের কাব্যসাধনায় জন্মভূমি প্রীতির মধ্যে যে উদারতা প্রত্যক্ষ করা যায়, হেমচন্দ্রের মধ্যে তা একেবারেই অনুপস্থিত। দেশের সর্বাঙ্গীন রূপটি তাঁর কাব্যে বিধৃত না হয়ে শুধু হিন্দুজাতি অবলম্বনে বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। কবি এদেশের মুসলমান অধিবাসীকে হিন্দুদের প্রতিপক্ষ বিবেচনা করেছেন এবং হিন্দুদের অবহেলিত অবস্থার জন্য দুঃখানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গের সমর্থনে তাঁর 'বীরবাহু কাব্যে' বিজ্ঞাপনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : 'উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দু কুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থে কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কাল নির্ণয়ার্থে হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান অনাবশ্যক।' বস্তুত বৃত্রসংহার কাব্যের কাহিনি পুরাণ থেকে গ্রহণ করলেও মূলে একই উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল।

বৃত্রসংহার কাব্য রচনা করতে গিয়ে হেমচন্দ্র মাইকেলের অনুসরণ করেছিলেন। পৌরাণিক কাহিনি ভিত্তি করে কল্পনার প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বক্তব্যস্থাপনায় মাইকেলের মত সার্থকতা লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি, তবে হেমচন্দ্রের কাব্যে দেবদৈত্যের সংগ্রাম উদ্দীপনাপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। বীর ও রুদ্ররস বর্ণনায় হেমচন্দ্র যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। হেমচন্দ্রের ভাষার নমুনা হিসেবে বৃত্রের বর্ণনা উল্লেখ করা যায় :

ত্রিনয়ন, বিশাল বক্ষ অতি দীর্ঘকায়,
বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
পারিজাত পুষ্পহার বিচিত্র শোভায়।
নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস;
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।

শিবের ক্রোধের বর্ণনা :

চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ,
অতল ছাড়িয়া কূর্ম উঠে অদ্রিবৎ,
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত;

উত্তাল কল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত;
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জয়;
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয়,
বিদীর্ণ বিমান মার্গ; গিরিশৃঙ্গ পড়ে;
চেতনে জড়ে গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে।

কাব্যটিতে বীরত্ব-গাম্ভীর্য ও অলৌকিকতা পরিস্ফুটনে সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এর গীতপ্রধান অংশগুলো প্রকৃষ্টভাবে রূপায়িত হয়েছে।

তবুও হেমচন্দ্র মহাকাব্য রচনায় সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। কেবল কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাহিনি অবলম্বনেই মহাকাব্য রচিত হতে পারে না, এর সার্থকতার জন্য প্রয়োজন যথার্থ প্রকাশভঙ্গি—এর ভাষা, ভাবকল্পনা, ছন্দ ইত্যাদি। এদিক থেকে হেমচন্দ্রের কৃতিত্বহীনতার পরিচয় বিরল নয়। মহাকাব্যোচিত শিল্পকৌশলে বৃত্রসংহারের কাহিনি রূপায়িত করতে হেমচন্দ্র ব্যর্থকাম হয়েছেন। স্বতঃস্ফূর্ত কবিকল্পনার অভাবই এর কারণ। এই মহাকাব্যে কবির সাধনার যে পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়েছে তার সঙ্গে মানবজীবন ও সমাজের কোন নিবিড় যোগাযোগ উপলব্ধি করা যায় না। মধুসূদনের কাব্যে যে বলিষ্ঠ জীবনবোধ প্রকাশ পেয়েছে হেমচন্দ্রের কাব্যে তা অনুপস্থিত। শব্দব্যবহার, ভাষারীতি ও ছন্দপ্রয়োগের দিক থেকে হেমচন্দ্রের সার্থকতা পরিলক্ষিত হয় না। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন হেমচন্দ্র তা পারেন নি। ফলে তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিলহীন পয়ারে পর্যবসিত হয়েছে। তাছাড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতার গুণটুকু হেমচন্দ্র তাঁর ছন্দে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হন। যুদ্ধ ও গুরুগম্ভীর বিষয়ের বর্ণনায় হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন। অন্য বিষয়ে তিনি সমিল পয়ার ত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। মধুসূদন সকল ভাবের উপযোগী করে অমিত্রাক্ষর ছন্দ রূপ দিয়েছিলেন, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রাণশক্তি হেমচন্দ্র উপলব্ধি করতে পারেন নি। হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিদর্শন :

হেথা ভাগ্যদেব গাঢ় চিন্তা-নিমজ্জিত;
বসিয়া বৈকুণ্ঠ-প্রান্তে বিনত সম্মুখে
বিশাল প্রাক্তন-লিপি-দৃশ্য মনোহর।
ছায়া ইন্দ্রজালে যথা ধূর্ত যাদুকর
দেখায় অদ্ভুত রঙ্গ অদ্ভুত তেমনি
অনন্ত আলেখ্য অঙ্গে ক্রীড়া নিরন্তর।

হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' কাব্যে কতগুলো ঘটনাপূর্ণ সংগ্রামের বর্ণনা, অসম্ভব চরিত্রসৃষ্টির এবং ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ পৌরাণিক ঘটনার সমাবেশে পাঠক মনে আবেগময় আবেদনের সৃষ্টি করেছিলেন মাত্র; সার্থক প্রয়োগহীন ভাষা ও ছন্দ, অসংলগ্ন কাহিনি, গুরুত্বহীন চরিত্র, হাস্যকর বীররস ইত্যাদি ত্রুটির জন্য মহাকাব্য হিসেবে সার্থকতা প্রদর্শন করতে পারেন নি। তাই তাঁর কাব্যসাধনার বৈশিষ্ট্য তাঁকে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমপর্যায়ভুক্ত করেছে। হেমচন্দ্র বৃত্রসংহার কাব্যে অমিত্রাক্ষর ব্যতীত মিলযুক্ত ছন্দও ব্যবহার করেছেন; কিন্তু তা বৈচিত্র্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে হলে সে উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। বরং তাতে বিষয়োচিত গাম্ভীর্যের অভাব আছে। ইংরেজি

সাহিত্যের সঙ্গে হেমচন্দ্রের পরিচয় ছিল। মহাকাব্য রচনায় সে পরিচয় প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সার্থক রূপায়ণে সাহায্য করে নি।

মহাকাব্যের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সার্থকতার পরিচয় না দিতে পারলেও খণ্ডকবিতা ও গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা সার্থকভাবে প্রকাশমান। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল তাঁর যোগ্য বিহারভূমি। এই পর্যায়ে তাঁর রচনাগুলোর নাম : চিন্তাতরঙ্গিণী (১৮৬১), বীরবাহু (১৮৮২), আশাকানন (১৮৭৬), ছায়াময়ী (১৮৮০), দশমহাবিদ্যা (১৮৮২), চিত্তবিকাশ কবিতাবলী (২ খণ্ড, ১৮৭০, ১৮৮০), বিবিধ কবিতা (১৮৮৩) ইত্যাদি।

'চিন্তাতরঙ্গিণী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমেই হেমচন্দ্র কবিখ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'বীরবাহু' কাব্যে স্বদেশপ্রীতি এবং রচনা পারিপাট্য প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যে হেমচন্দ্রের কবি-স্বরূপ অনেকখানি অনুধাবন করা যায়। এই কাব্যের আঙ্গিক নির্মাণে তিনি ভারতচন্দ্র দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত, আর বিষয়বস্তু ও ভাবের দিক থেকে রঙ্গলালের অনুসারী ছিলেন। 'ছায়াময়ী' কাব্যটি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র অনুসরণে লিখিত। 'দশমহাবিদ্যা' গ্রন্থের বিষয়বস্তু পৌরাণিক। 'চিত্তবিকাশ' কাব্যে হয়েছে নীতিমূলক ও চিন্তাগর্ভ কবিতার স্থান। 'কবিতাবলী' কাব্যের কবিতায় হেমচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাস রূপায়িত হয়েছে। এই কাব্যের জন্য কবি অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সেক্সপীয়রের 'টেমপেস্ট' ও 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকদ্বয় তাঁর হাতে অনূদিত হয়।

হেমচন্দ্র ব্যঙ্গরসাত্মক রচনায় কৃতিত্বের অধিকারী। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'হাস্যকর কৃত্রিম আস্ফালন, ইংরেজের বিরুদ্ধে ফাঁকা বীররস প্রয়োগ, রাজনৈতিক অনুকরণের নীচতা, ভোটভণ্ডুল, কর্পোরেশনের নির্বাচন-সংক্রান্ত ঘোঁট-পাকানো প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে তিনি যে সমস্ত শাণিত ব্যঙ্গকবিতা লিখেছিলেন, সেগুলির দাম এখনও অটুট আছে। এর ভাষায় রঙ্গব্যঙ্গের উতরোল হুল্লোড়, আক্রমণের অম্লতিক্ত স্বাদ—কোথাও বা নিছক হিউমারের সহাস্য কৌতুক বড়ই উপভোগ্য হয়েছে।'

সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনেও হেমচন্দ্র কবিতা রচনা করেছেন। ভাবমূলক কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা প্রভৃতি ছাড়া দেশাত্মবোধক কবিতা রচনায়ও তাঁর খ্যাতি ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত 'ভারতসঙ্গীত' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। 'ভারতসঙ্গীতের' দ্বারা জাতীয় আন্দোলনের পরিপুষ্টি হয়েছিল। দেশপ্রেমের এমন উচ্ছ্বাসপূর্ণ ও উত্তেজনাময় প্রকাশ খুব কম বাংলা কবিতায় আছে। বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য তিনি ইংরেজি সাহিত্য থেকে কিছু কিছু অনুবাদও করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি লঙফেলোর অনুবাদ 'জীবনসঙ্গীত' কবিতাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কবিতাটির অংশবিশেষ :

বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার, কে তোমার॥
বলে জীব করো না ক্রন্দন।

... ...

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন

হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।

হেমচন্দ্রের কাব্যে দেশি মনোভাব ও সামাজিক রুচিই প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সমসাময়িক সামাজিক ও সাহিত্যিক রুচির অনুবর্তী হয়ে ইংরেজি কাব্যের বিষয় ও কল্পনাশক্তির অনুসরণ করে অতিশয় সহজ গদ্যভাষায় ও বক্তৃতার ছন্দে কবিতা রচনা করেছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁর কৃতিত্ব না থাকলেও মিত্রাক্ষর ছন্দে যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। মহাকবির বিশালতা ও গাম্ভীর্য এবং গীতিকবির আবেগময়তার জন্য উনিশ শতকের পটভূমিকায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কবি হেমচন্দ্রের মূল্যায়ন করতে গিয়ে সজনীকান্ত দাস মন্তব্য করেছেন, 'হেমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন; কারণ তিনি আমাদের স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম যে পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এমন আর সে যুগে কোন কবি করেন নাই।'

নবীনচন্দ্র সেন

উনিশ শতকের মহাকাব্যের ধারায় নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) হেমচন্দ্রের সমসাময়িক কবি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের আদর্শ সম্মুখে রেখে তিনি মহাকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তবে তিনি মহাকাব্যের কাহিনি নির্বাচনে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। মহাকাব্যের সুবিপুল কাহিনি নির্বাচন করে তিনি কাহিনিগত দিক থেকে সবচেয়ে বেশি বিশিষ্টতা অর্জন করেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি গীতিকবিতা, গাথাকাব্য ও মহাকাব্য—উনিশ শতকের রীতি অনুযায়ী এই তিন ধরনের কাব্য রচনা করেছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেন হেমচন্দ্রের মতই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর কবিমানসের অভিব্যক্তি ঘটেছিল হিন্দুদের সনাতন ধর্মবিশ্বাস অবলম্বনে। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁর জনপ্রিয়তার পশ্চাতে কার্যকরী ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে এদেশের সাহিত্যে যে নতুন হাওয়া প্রবাহিত হয়, নবীন সেন তা উপলব্ধি করে স্বীয় কাব্যধারায় তা পরিস্ফুটনে সচেষ্ট হন। অনিয়ন্ত্রিত কল্পনা এবং হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য নিয়ে তিনি পুরাতন ভাবধারাকে নতুন রূপদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সমসাময়িক যুগের আদর্শ তিনি বরণ করেন, তার নিদর্শন রেখেছেন জাতীয়তাবোধ নিয়ে রচিত তাঁর মহাকাব্যে।

চট্টগ্রামের নবীন যুবক নবীন সেন এফ. এ. পড়ার জন্য কলকাতা আগমনের পরে পরেই প্রতিভাধর হিসেবে সুধীমহলে খ্যাতি অর্জন করেন। সেখানে কলেজ জীবনেই কবিখ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হন এবং পত্রপত্রিকায় তাঁর গীতিকবিতা প্রকাশিত হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবনে তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। কর্মজীবনে বাংলার বাইরে পুরী ও রাজগিরে থাকাকালীন সে সব স্থানের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পটভূমিকায় আকৃষ্ট হয়ে হিন্দুধর্মগ্রন্থ ও কাব্যপাঠে মনোযোগী হন। এর পরিণতিতে তিনি পরিণত বয়সে মহাকাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন।

নবীন সেনের মহাকাব্য 'রৈবতক' (১৮৮৩), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) ও 'প্রভাস' (১৮৯৬)—এই তিনটি কাব্য 'ত্রয়ীকাব্য' নামে পরিচিত। তিনি মহাভারত, ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থ থেকে উপকরণ নিয়ে তৎকালীন ভারতের সমাজ ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বনে চৌদ্দ বছরে এই মহাকাব্য রচনা করেন। কাব্য তিনখানির কাহিনিগত তাৎপর্যের দিক থেকে তা 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' নামে অভিহিত। ত্রয়ীকাব্যে একদিকে কবির ধর্মবোধ, অন্যদিকে স্বাজাত্যবোধ রূপায়িত হয়েছে। 'রৈবতক' কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, 'কুরুক্ষেত্রে' মধ্যলীলা এবং 'প্রভাসে' অন্ত্যলীলা স্থান পেয়েছে। এসব কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা যথাক্রমে সুভদ্রাহরণ, অভিমন্যুবধ ও যদুবংশ ধ্বংস। এর মূল বক্তব্য নিষ্কাম কর্ম ও নিষ্কাম প্রেমের ডোরে আর্য-অনার্যের রাখিবন্ধন এবং অখণ্ড হিন্দুসংস্কৃতির পত্তন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ পাঠে প্রভাবিত হয়ে মহাভারত থেকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র অবলম্বনে কবি মূল বক্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁর অনুকূলে ছিল অর্জুনের শৌর্য, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মনীষা, সুভদ্রার প্রীতি এবং শৈলজার প্রেম। প্রতিকূলে ছিল দুর্বাসার অকারণ প্রতিহিংসা ও অভিমান এবং বাসুকির সংশয়। ভারতের দ্বিধাবিভক্ত অবস্থার অবসানে এক ধর্ম ও এক জাতি প্রতিষ্ঠার কল্পনায় নবীন সেন শ্রীকৃষ্ণকে অবতার শ্রেণি থেকে স্থানচ্যুত করে আদর্শ মানুষ হিসেবে অঙ্কন করেছেন। মহাভারতের অলৌকিকতা থেকে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধার করে ভারতের ধর্মসংস্কারক এবং এক অখণ্ড মহাভারতের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করা হয়েছে। সমস্ত বিরোধের অবসানে এক ভারত সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে—এই ছিল কবির কাম্য; সমগ্র ভারত জুড়ে এক ধর্মরাজ্য স্থাপন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর কৃষ্ণের আদর্শ ছিল :

এক ধর্ম এক জাতি এক রাজ্য এক নীতি
সকলের এক ভিত্তি সর্বভূতহিত।
সাধনা নিষ্কাম ধর্ম লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম
একমেবাদ্বিতীয়ম, করিব নিশ্চিত,
ওই ধর্মরাজ্য, 'মহাভারত' স্থাপিত।

নবীন সেন মানবমাহাত্ম্যকেই সর্বাপেক্ষা বড় বলে উল্লেখ করেছেন। তাই দেখা যায়, ভগবানের অবতার হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে যে সমস্ত অলৌকিকতার সমাবেশ ঘটেছিল তা দূর করে বিভিন্ন দিক থেকে তাঁকে মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শ হিসেবে নবীন সেন স্থান দিয়েছেন। নবীনচন্দ্র সেন শিল্পসৃষ্টি অপেক্ষা আদর্শ চরিত্রসৃষ্টির ব্যাপারে বেশি মনোযোগী ছিলেন।

কাহিনিগত দিক থেকে কবির মৌলিকতা না থাকলেও কতিপয় বিষয়ে কবি মৌলিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। তাঁর পরিকল্পনায় কৃষ্ণ ভগবান বা অবতার নন, তিনি শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন মহামানব। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির আদর্শের প্রতিফলন তাঁর কৃষ্ণজীবনে লক্ষণীয়। নবীনচন্দ্রের লেখনীতে শ্রীকৃষ্ণ পুরাণের পরিমণ্ডল ছেড়ে আধুনিক ভারতে আবির্ভূত হয়েছেন। নবীন সেনের মহাকাব্যে সমকালীন ধ্যানধারণার প্রতিফলন ঘটেছে :

নবধর্ম বেদি-মূলে বসিয়া দেবগণ॥
আর্য অনার্যের ধ্যানে; বেদি-বক্ষে নিরুপম
নিষ্কামের মহামূর্তি; তদুপরি বিরাজিতা
জননী আনন্দময়ী, অতুল প্রতিভান্বিতা।
বিদগ্ধ অধর্ম-মল, রক্তবর্ণ কলেবর
অর্ধেন্দু-কিরীট শিরে, পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর,
—সমরাস্ত্র, শাসনাস্ত্র হইয়াছে শোভমান
চারিভূজে চারিদিকে; ত্রিনেত্রে ত্রিকালজ্ঞান।
ধর্ম-সম্রাজ্ঞীর মুখ, অনন্ত মহিমা-ছবি,
ভাসিল প্রভাতাকাশে যেন শান্ত-বাল-রবি,
অনন্ত মানব-ব্যাপী ভবিষ্যৎ বর্তমান,
নয়নে আনন্দ অশ্রু গাহিতেছে কৃষ্ণনাম।

নবীন সেন তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে যথেষ্ট মৌলিকতা ও অনন্যসাধারণতার পরিচয় প্রদান করলেও মহাকাব্যের রচনাকারী হিসেবে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। পরিকল্পনার বিরাটত্ব ও মহাকাব্যোচিত উপাদানের সমাবেশ ঘটালেও কাব্যটি মহাকাব্যের গৌরব অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তত্ত্বের প্রাধান্য, ঐক্যহীন ভাব, রসহীন কাব্যনিবদ্ধ প্রভৃতি অসঙ্গতির জন্য কাব্যটি সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। ভক্তিরস ও ভাববিলাসের কবি বলে নবীন সেন কৃষ্ণভক্তির প্রচারক রূপেই প্রাধান্য লাভ করেছিলেন, কিন্তু উপাদান বিন্যাসের দৃঢ়তা এবং মূল কল্পনার কেন্দ্রিকতা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়েছে। এক মহাভারতের পরিকল্পনার মধ্যেও নবীন সেন কোন সুনির্দিষ্ট গঠন সুষমা দান করতে পারেন নি। অসংযত ভাবোচ্ছ্বাস, গম্ভীর বিষয় থেকে তুচ্ছ বিষয়ে অতর্কিতে অবতরণ, আখ্যানের অতিপল্লবিত রূপ, গীতিমূর্ছনা ইত্যাদি এই মহাকাব্যের ত্রুটি হিসেবে বিবেচ্য। কবি পৌরাণিক কাহিনি থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন বলে তাঁর মৌলিক পরিকল্পনা অসঙ্গত। মহাকাব্যের বিশালতা, চরিত্র পরিকল্পনার ঔদার্য এবং রচনারীতির ক্লাসিক গাম্ভীর্য ভাবপ্রবণ কবি নবীন সেন আয়ত্ত করতে সক্ষম হন নি। তাই তাঁর কাব্যকে পুরাণকাহিনিভিত্তিক অভিনব আখ্যানকাব্য হিসেবেই বিবেচনা করা চলে। নবীন সেনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের নমুনা :

একাকী নির্জনে এক তরুর ছায়ায়
একটি উপল খণ্ডে করিয়া শয়ন
চাহি অনন্তের শান্তদীপ্ত নীলিমায়
ভাবিতেছি,—জীবনের ভাবনা প্রথম,—
একই মানব সব; একই শরীর,
একই শোণিত মাংস ইন্দ্রিয় সকল;
জন্মমৃত্যু একরূপ ; তবে কি কারণ
নীচ গোপজাতি, আর সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ ?
চারি বর্ণ চারি বেদ, দেবতা তেত্রিশ ?
নিরমম জীবঘাতী যজ্ঞ বহুতর।

নবীন সেনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাও রয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী' (প্রথম ভাগ ১৮৭১, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৭৮)। ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ, সমসাময়িক ঘটনা, স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি বিচিত্রভাব এই কাব্যে রূপায়িত হয়েছে। তবে দুর্বল শব্দবিন্যাস, অশোভন উপমা কাব্যটিকে উন্নত পর্যায়ে স্থান দিতে পারে নি। কবির সহজাত উচ্ছ্বাস প্রবণতা ও যৌবনসুলভ আবেগের ফলে কোন বক্তব্যে বা প্রেমচিন্তায় কোন স্থির প্রত্যয়ে পৌঁছাতে না পারলেও গীতিকবিতার সকল বৈশিষ্ট্যই 'অবকাশরঞ্জিনী'তে লক্ষ করা যায়।

'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৬) নবীন সেনের ঐতিহাসিক গাথাকাব্য। দেশপ্রেমমূলক এই কাব্যটির মাধ্যমে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাব্যটি কবির জন্য যথেষ্ঠ খ্যাতি এনে দিয়েছিল। এমন কথাও বলা হয় যে, 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশের ফলে বঙ্গ সাহিত্যজগতে একটা তোলপাড় শুরু হয়েছিল। প্রকাশের পরই কাব্যটি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ধারিত হয়েছিল। পরাধীনতার বেদনাবোধ এবং স্বাধীনতা লাভের উন্মাদনায় কাব্যটি সমৃদ্ধ। এতে মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করে ইংরেজদের বিজয় দেখানোর মাধ্যমে কবি দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধের কাহিনি কাব্যটির উপজীব্য। তবে এতে সিরাজদ্দৌলাকে গুরুত্বহীন করে সেনাপতি মোহনলালকে কাব্যের নায়ক হিসেবে স্থান দিয়েছেন এবং মোহনলালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই কবির দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। কবি এই কাব্যে ইতিহাসের বস্তুসত্য ও কল্পনার কাব্যসত্য যথার্থরূপে মিশাতে পারেন নি, আবেগের অসংযত প্রকাশও এতে বিদ্যমান। তবু নবীন সেনের কবিখ্যাতি প্রধানত 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের ওপরই নির্ভরশীল।

'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) নবীন সেনের ক্ষুদ্র কাব্য, প্রতিভার তেমন কোন নিদর্শন এতে নেই। ওয়াল্টার স্কটের আদর্শানুসারে তিনি 'রঙ্গমতী' (১৮৮০) নামে একটি কাল্পনিক, রোমান্টিক ও স্বদেশপ্রেমের আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেন। তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলো অবতার মহাপুরুষের জীবনী অবলম্বনে রচিত। যীশুখ্রিস্টের জীবনী অবলম্বনে 'খৃস্ট' (১৮৯১), বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে 'অমিতাভ' (১৮৯৫) এবং শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপ-লীলাকাহিনি অবলম্বনে 'অমৃতাভ' (১৯০৯) কাব্যগুলো রচনা করা হয়। তাঁর ধর্মমূলক কাব্য হচ্ছে 'গীতা' ও 'চণ্ডীর' অনুবাদ। নবীন সেন 'প্রবাসের পত্র' ভ্রমণকাহিনি, 'ভানুমতী' দীর্ঘ উপন্যাস এবং 'আমার জীবনী' সুবৃহৎ আত্মজীবনী প্রভৃতি গদ্য গ্রন্থের রচয়িতা। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত 'আমার জীবনী' বাংলা আত্মজীবনীর ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংযোজন।

নবীন সেন অত্যধিক হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত ছিলেন বলে কাব্যকলায় যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখাতে পারেন নি। মহাকাব্যের চেয়ে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তাঁর কবিপ্রতিভা ছিল সম্ভাবনাময়। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, 'একটা পার্বত্য পাগলাঝোরার ধারার ন্যায় অনিয়ন্ত্রিত কল্পনা এবং হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য লইয়া বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব হয়েছিল কবি নবীনচন্দ্রের।...প্রাচ্য প্রতীচ্যের কোন কবির সহিতই নবীনচন্দ্রের ঠিক ঠিক মিল হয় না; তাঁহার উন্মাদ প্রতিভা লইয়া তিনি কাব্যক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র মূর্তি। যদি

তাঁহাকে যথার্থ কাহারও মন্ত্রশিষ্য বলা যায়—তবে তিনি সমুদ্র মেঘলা পর্বতবাসিনী চট্টলেশ্বরী।' কবির উচ্ছ্বাসধর্মিতা প্রশ্রয় পেয়েছিল তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নির্বিচার ভাববিলাসের মধ্যে, নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের সফল স্ফূর্তির মধ্যে, আত্মসংগঠনের নামে বিবেচনাহীন ঐতিহ্য পূজার নামে।

নবীন সেন স্বাজাত্যবোধের জন্য হেমচন্দ্রের মতই সমকালীন যুগে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের এই জনপ্রিয়তার মূল্যায়ন করে প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন, 'হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের সমসাময়িক খ্যাতির কারণ-নির্ণয় এখনকার পাঠকের পক্ষে দুষ্কর। তাঁহাদের মহাকাব্যগুলি ব্যর্থতার মরুভূমি। এখানে ওখানে যে দু চারিটি মরুদ্যান দেখা যায় সে সব নিতান্তই লিরিক উচ্ছ্বাস। মধুসূদনের বলিবার কিছু ছিল, ইহাদের কিছু বক্তব্য ছিল না। মধুসূদনগঠিত নূতন কাব্যসংস্কার বা ট্র্যাডিশনটা মাত্র ছিল তাঁহাদের সম্বল। প্রাণহীন সেই সংস্কার তাঁহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহাকাব্য না লিখিয়া হেমচন্দ্র যদি সমাজবিষয়ক ব্যঙ্গকাব্য ও ব্যঙ্গনাট্য রচনা করিতেন, নবীনচন্দ্র যদি মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া কাব্য না লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া উপন্যাস লিখিতেন—হয়ত তাঁহাদের কীর্তি সময়ের বিচারে অধিক টেঁকসই হইত।'

কায়কোবাদ

বাংলা মহাকাব্যের ধারায় কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২) অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি। মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে 'মহাশ্মশান' নামে মহাকাব্য রচনা করে তিনি জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রয়াস পান। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবোধের কবি হিসেবেই বাঙালি মুসলমানদের কাছে তাঁর শ্রদ্ধার আসন।

মোহাম্মদ কাজেম আলকোরেশী সাহিত্যক্ষেত্রে কায়কোবাদ নামে পরিচিত। ১৮৫৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘজীবন তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে ঢাকা জেলার আগলা গ্রামে নিজ বাসভূমিতে। উচ্চ শিক্ষা তাঁর লাভ হয় নি, ডাক বিভাগে স্বল্প বেতনের চাকরিতে তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে।

কায়কোবাদ গীতিকবিতা রচনার মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। কিন্তু মহাকাব্য রচনাতেই তিনি প্রতিভা বিকাশের সার্থকতা অনুভব করেছেন। অবশ্য মহাকাব্যের অস্তোন্মুখ যুগে গীতিকবিতার সর্বগ্রাসী প্রভাব উপেক্ষা করে তিনি মহাশ্মশান কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিশ শতকের পরিবেশ মহাকাব্য রচনার উপযোগী নয় বলে ধরা হয়। গীতিকবিতার প্রাচুর্যে এই শতাব্দীর কাব্যের ইতিহাস মুখরিত। অথচ কায়কোবাদ গীতিকবিতা রচনায় খ্যাতিলাভ করলেও মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। মহাকাব্য রচনার প্রতি তাঁর আগ্রহের কারণ সম্পর্কে মহাকাব্যের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে মহাশ্মশান কাব্যের ভূমিকায় কবি লিখেছেন, 'সাহিত্যের বাজারে আজকাল কবিতার বড়ই ছড়াছড়ি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গ-সাহিত্যে মহাকাব্যের জন্ম অতি বিরল। মধুসূদনের পর হইতে আজ পর্যন্ত মহাকবি নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র ব্যতীত কয়জন কবি মহাকাব্য লিখিয়াছেন। এখনকার কবিগণ কেবল 'নদীর জল', 'আকাশের তারা', 'ফুলের হাসি', 'মলয়পবন' ও 'প্রিয়তমার কটাক্ষ' লইয়াই পাগল। প্রেমের ললিত ঝঙ্কারে তাঁহাদের কর্ণ এরূপ বধির যে, অস্ত্রের ঝনঝনি বীরবৃন্দের

ভীষণ হুঙ্কার তাঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিতে অবসর পায় না। তাঁহারা কেবল প্রেমপূর্ণ খণ্ড কবিতা লিখিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। খণ্ড কবিতা কেবল কতকগুলি চরণের সমষ্টি, সামান্য একটি ভাব ব্যতীত তাহার বিশেষ কোন লক্ষ্য নাই, কিন্তু মহাকাব্য তাহা নহে; তাহাতে বিশেষ একটি লক্ষ্য আছে,—কেন্দ্র আছে। কবি কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন গঠনপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া নানারূপ মালমসলার যোগে বহু কক্ষ সমন্বিত একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ইহার প্রত্যেক কক্ষের সহিত প্রত্যেক কক্ষেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অথচ সকলগুলিই পৃথক, সেই পৃথকত্বের মধ্যেই আবার একত্ব, ইহাই কবির নূতন সৃষ্টি ও রচনা কৌশল।—ইহাই মহাকাব্য।'

মহাকাব্যের মধ্যে কবিপ্রতিভার সম্যক বিকাশ সম্ভব মনে করে তিনি গীতিকবিগণকে এমন কি রবীন্দ্রনাথকেও কোন গুরুত্ব দেন নি। তাই গীতিকবিতার স্বর্ণযুগে কায়কোবাদ জাতিকে জাগ্রত করার ব্রত নিয়ে মহাকাব্য রচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন। 'মহাশ্মশান' ১৯০৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সমগ্র কাব্যটি তিনখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ঊনত্রিশ সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ডে চব্বিশ সর্গ এবং তৃতীয় খণ্ডে সাত সর্গ। মোট ষাট সর্গে ৮৭০ পৃষ্ঠায় এই কাব্য সমাপ্ত। সমগ্র কাব্য প্রকাশের জন্য দশ বৎসর সময় লেগেছিল।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দের পরাজয় এবং আহমদ শাহ আবদালীর বিজয় বর্ণনা কাব্যটির বিষয়বস্তু। ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভারতে হিন্দু রাজ্য পুনঃস্থাপনের সংকল্পে মারাঠারা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কাবুল-অধিপতি আহমদ শাহ আবদালীর সহায়তায় রোহিলার অধিপতি নজীবদ্দৌলা ভারতের মুসলিম শক্তি সংগঠন করেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করলেও উভয় জাতির জীবনে করুণ ও মর্মান্তিক পরিণতি নেমে আসে। কায়কোবাদ এই ভয়াবহ সংগ্রামের মাধ্যমে মানবভাগ্যের উত্থানপতনের বিস্ময়কর রহস্য অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর মতে, 'একপক্ষে পানিপথ যেমন হিন্দু গৌরবের সমাধিক্ষেত্র, অপরপক্ষে সেইরূপ মুসলমান-গৌরবেরও মহাশ্মশান।' কায়কোবাদ এই ঐতিহাসিক কাহিনিকে তাঁর মহাকাব্যের উপজীব্য করেছেন। মূল কাহিনির সঙ্গে অনেকগুলো প্রণয়-কাহিনিও স্থান পেয়েছে। যে সুবিশাল কাহিনি-পরিকল্পনা নিয়ে কায়কোবাদ মহাকাব্য রচনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন তাতে মহাকাব্যের উপাদান ছিল। অসংখ্য ঘটনা ও চরিত্র এর অনুকূলে ছিল। নতুনত্ব না থাকলেও উপমা ও ভাষা প্রয়োগে ছিল সরলতা ও অকৃত্রিমতা। এতে সমসাময়িক জাতীয় চেতনারও প্রতিফলন ঘটেছিল।

কায়কোবাদ জাতীয় গৌরবের কাহিনি পরিবেশনেই উদ্যোগী হয়েছিলেন। কাব্য রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন,'আমি বহুদিন যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ করিতেছিলাম যে, ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্যবীর্য-সংবলিত এমন একটি যুদ্ধকাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে এক সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণও অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন; শৌর্যে বীর্যে ও গৌরবে কোন অংশেই তাঁহারা জগতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না; তাই তাঁহাদের অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ যেখানে যে কীর্তিটুকু, যেখানে যে স্মৃতিটুকু পাইয়াছি, তাহাই কবি-তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকের চক্ষের

সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি এবং তাঁহাদের সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি।' কবির মতে তাঁর বীণায় যে বাণী ঝঙ্কৃত হবে তাতে,

ঘুমন্ত বসুধা যেন, উঠেরে মাতিয়া
নীরবে জাগিয়া উঠে মোসলেম সন্তান।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জাতীয়তাবোধের যে প্রেরণা বাংলা সাহিত্যে জেগে উঠেছিল মহাকবি কায়কোবাদ ছিলেন তারই অনুসারী। এ সময়ে স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম মহাকাব্য রচনায় প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। পূর্ববর্তী মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান; কায়কোবাদও জাতীয়তাবোধের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে যে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ঘটেছিল তাতে মুসলমান সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে নি। এতে শিক্ষিত মুসলমানদের মনে যে বেদনার সঞ্চার হয়েছিল কায়কোবাদ তাঁর সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে তা উপশমের প্রলেপ দিতে চেয়েছিলেন।

তৎকালীন পরিবেশ কায়কোবাদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরেজদের আগমনে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজি শিক্ষাসংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটেছিল তার সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানদের কোন যোগাযোগ ছিল না। পরে ১৮৬৩ সালে নবাব আবদুল লতিফ কর্তৃক Muhammadan Literary Society প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমানেরা ক্রমান্বয়ে নতুন শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসে। ইংরেজদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে মুসলমানদের জাতীয় জীবনের উন্নয়ন সাধন করতে হবে বলে তখন এক নতুন চেতনার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের অতীত ঐতিহ্যকে বর্তমান জীবনে উপলব্ধি করে মুসলমান কবিসাহিত্যিকগণ সাহিত্যসাধনার প্রয়াস পান। স্বাজাত্যবোধের এই বৈশিষ্ট্য কায়কোবাদের কাব্যসাধনার পশ্চাতে বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করেছে।

স্বধর্মের—স্বজাতির—স্বদেশের হিতে
দেও হৃদয়ের রক্ত—কর প্রাণ দান।
প্রেম বল, অর্থ বল, সকলি অসার,
জীবনের সার ধন ধর্ম আপনার।

—এ ধরনের অজস্র উদ্দীপনাময় উক্তি মহাশ্মশানের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কাহিনির মধ্যে সংযোজিত গানেও এ ধরনের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে :

জাগোরে মোসলেম, জাগো একবার
ধর দৃঢ় করি অসি খরধার,
মারাঠার বক্ষ করিয়া বিদার,
লও প্রতিশোধ ভীষণ বলে!
কি ভয় কি ভয় কি ভয় তোমার,
জন্মিলে মরণ বিধি বিধাতার,
অই যে উন্মুক্ত স্বর্গের দুয়ার,
এখানে যাইবে সমরে মলে!

তবে কার ভয়ে ভাবিছ নীরবে,
কাপুরুষ প্রায় বসে আছ সবে
কাঁপাও বসুধা 'দীন দীন' রবে
পেশবা তস্করে করনা ভয়!
ধর বজ্রমুঠে ভীষণ কৃপাণ,
এ ধর্ম সমরে দেও বলি প্রাণ,
শত-বজ্রশব্দে গর্জুক কামান,
গাও ভীম রবে 'ইসলাম জয়।'

উনিশ শতকের জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে কায়কোবাদ জাতীয় উদ্দীপনামূলক মহাকাব্য রচনা করেছেন। এদিক থেকে তিনি হেম-নবীনের সমগোত্রের কবি। কিন্তু কায়কোবাদ সমকালীন কবিগণের মত সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন হিন্দু কবিগণের বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্নতর প্রকৃতির অধিকারী। তাঁর কাব্যে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠেছে—যা হিন্দু কবিগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। হিন্দু কবিগণ মুসলমানকে প্রতিপক্ষ কল্পনা করে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে মুসলিম বিদ্বেষের কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হিন্দু জাতির ইতিহাসে তাদের যে সমস্ত পতন ঘটেছে তা শুধু মুসলমানদের সঙ্গে সংগ্রামের ফলে। মেবারের পতন, রাজপুতদের বা মহারাষ্ট্রের সশস্ত্র অভ্যুত্থান—এগুলোকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম না বলে সামন্ত প্রভুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনে করা যায়। এই সমস্ত সংগ্রামের মধ্যে হিন্দু কবিসাহিত্যিকগণ জাতীয় গৌরবের সন্ধান করতে গিয়ে মুসলমানকে বিপক্ষ হিসেবে কল্পনা করেছেন। তাই তাঁদের মতে ভারতের ইতিহাস শুধু হিন্দুদের ইতিহাস—মুসলমানদের নয়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ সকলেই মুসলমানদের কলঙ্কিত করেছেন এবং তাঁদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কায়কোবাদ হিন্দু-মুসলমানদের সম্প্রীতির মধ্যে দেশের কল্যাণ নিহিত বলে বিশ্বাস করতেন। কবি কায়কোবাদ সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় দিক 'সংগ্রামের তীব্রতা এবং উভয় পক্ষের বীর্যবত্তার পরিচয়দান প্রসঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বিরোধীদলের মধ্যে সচেতনভাবেই পক্ষাবলম্বন করেন নি।' তাই কায়কোবাদের কণ্ঠে হিন্দু মুসলমানদের মিলনবাণী বিঘোষিত হয়েছে :

এস ভাই এস হিন্দু-মুসলমান
একস্বরে আজি গাহিব এ গান;
আমরা দু ভাই ভারত সন্তান
দুঃখিনী ভারত মোদের মাতা।

মহাশ্মশান কাব্য মূলত হিন্দু-মুসলমানদের সংগ্রামের কাব্য; কিন্তু কবি তাতে অসাম্প্রদায়িক আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছিলেন। কাব্যের ভূমিকায় অসাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে কবি লিখেছেন, 'মুসলমানগণ বীরপুরুষ হিন্দুগণও বীরপুরুষ, এই দুই বীরজাতি হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতে আপনাদিগের জাতীয় গৌরব ও ভীষণ বীরত্ব কালের অক্ষয়পটে

লিখিয়া গিয়াছেন।...একজাতি দেশের জন্য, ধর্মের জন্য স্বজাতির কল্যাণের জন্য হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ প্লাবিত করিয়া বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন; কম কে? উভয় জাতির বীরত্বই প্রশংসার্হ। যদি মুসলমান ভ্রাতৃগণ বলেন যে, এই কাব্যে হিন্দুদের চিত্র এত উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করা মুসলমান লেখকের উচিত হয় নাই, হিন্দু মহারথিগণ যে নীতির অনুসরণ করিয়া মুসলমানদের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, মুসলমান লেখকেরও সেই নীতির অনুসরণ করিয়া লেখা উচিত ছিল। সে নীতির অনুসরণ করিয়া লিখিলে এই কাব্যের সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত এবং পক্ষপাতিত্বের ঘৃণনীয় কলঙ্ক কালিমায় ইহা কলুষিত হইয়া পড়িত।' কায়কোবাদের এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁর কাব্যকে বিশিষ্ট করেছে।

ইতিহাস থেকে মহাশ্মশান কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাধ্যমে কায়কোবাদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই কাব্যের পূর্ববর্তী অন্য কোন মহাকাব্যই ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে রচিত নয়। কায়কোবাদ এই ঐতিহাসিকতার দিক থেকে 'মৌলিক মহাকাব্য' হিসেবে দাবি করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী কবিগণ যেখানে পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে মহাকাব্য রচনা করে কাহিনি নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পারেন নি, সেখানে কায়কোবাদ ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে নতুনত্ব ও মৌলিকতার পরিচয় দান করেছেন। তবে তাঁর কাব্যে ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জের পাশাপাশি প্রণয়রস সঞ্চারের জন্য ইতিহাসবহির্ভূত চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ইতিহাসের প্রতি কায়কোবাদের অত্যন্ত আনুগত্য ছিল বলে কাব্যের প্রধান চরিত্র ও ঘটনা ইতিহাস সম্মত। এমন কি ইতিহাসের সত্য সম্পর্কে পাঠকের সংশয় বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে কবি তথ্যের উৎসও নির্দেশ করেছেন। কাব্যের প্রয়োজনে যে সব ইতিহাস-বহির্ভূত চরিত্র এতে স্থান পেয়েছে সেগুলো মূল কাহিনি বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করে নি। কায়কোবাদ ইতিহাসের সঙ্গে মানবহিতৈষণার সংযোগ সাধন করেছেন। মানবজাতির কল্যাণ কামনায় কবি ইতিহাসের গৌরবজনক তথ্য কাব্যে রূপ দিয়েছেন। জাতীয় জীবনে তা প্রেরণার উৎস। ড. কাজী আবদুল মান্নান মন্তব্য করেছেন, 'ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত আদর্শ—বীরত্ব, মহত্ত্ব ও সর্বমানবের কল্যাণকামনা মহাশ্মশান কাব্যের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিতে বিকশিত করার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। এ কাব্যে পুরুষ চরিত্র যেমন ধৈর্যে, বীর্যে ও ত্যাগে মহীয়ান, নারী চরিত্রগুলিও তেমনি প্রেমে বীরত্বে সেবায় মহীয়সী।'

ড. আবুল হাসান শামসুদ্দিন মন্তব্য করেছেন, 'কায়কোবাদের ইতিহাস-চেতনা ছিল, যুগের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে তিনি সমকালের জীবন সমস্যার আলোকে উপস্থিত করেছেন—তা যত সরল ভাবেই হোক। যুগের প্রয়োজনেই তিনি অতীতের হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের চিত্রকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যসৃষ্টির কাজে লাগাতে চেয়েছেন। এখানেই কায়কোবাদের আবেদন শাশ্বত কালের কাছে, যদিও কালোত্তীর্ণ বাক-প্রতিমা তিনি তৈরি করতে পারেন নি, এমন কি কালোপযোগী রূপ-নির্মিতিও তাঁর অনায়ত্ত ছিল।'

মহাশ্মশান কাব্যে অনেকগুলো গান সংযোজিত আছে। সেসব কবির গীতিকবিতা রচনায় কৃতিত্বের নিদর্শন হিসেবে বিবেচ্য। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা প্রথম

জীবনে 'অশ্রুমালা' কাব্য রচনাতে প্রকাশ পেয়েছিল। মহাকাব্য রচনাকালে তা তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি। আর মহাশ্মশানের অন্তর্নিহিত ভাব গীতিকাব্যের করুণ রসাশ্রিত। খাঁটি গীতিপ্রেরণা এ কাব্যে বর্তমান। সম্ভবত সমকালীন গীতিকবিতার সর্বগ্রাসী প্রভাব এবং বাঙালি হৃদয়ের আবেগপ্রবণতা কবিকে এই সব করুণ রসাত্মক গীতিকবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এ ধরনের গানের একটি নিদর্শন :

আমি ভাল বাসি যারে
সে ত নাহি ভাল বাসে!
আমি মরি যার তরে
সে ত নাহি কাছে আসে।
অশনে বসনে ধ্যানে
তারি কথা পড়ে মনে,
কেমনে ভুলিব তারে
সে আছে মোর প্রাণে মিশে।

কবি ছিলেন রূপসন্ধানী। সৌন্দর্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি গীতোচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনায় তাঁর কাব্যকে বিশিষ্টতা দিয়েছেন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে ঐতিহাসিক তথা মৌলিক মহাকাব্য হিসেবে মহাশ্মশান রচনা করাতেই মহাকবি কায়কোবাদের কৃতিত্ব। এ যুগের অনেক সাহিত্য সমালোচক মহাশ্মশান কাব্যকে মহাকাব্যের মর্যাদা দান করেছেন। ড. কাজী আবদুল মান্নান একে জাতীয় আখ্যান কাব্য ধারায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে কায়কোবাদ যে জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁকে উনিশ শতকের আদর্শবাহী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। হেমচন্দ্র-নবীন সেন যেমন স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহাকাব্য রচনা করেছিলেন, কায়কোবাদও তেমনি স্বজাতিপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দু কবিগণ হিন্দু জাতিকে বড় করতে চেষ্টা করেছেন, কায়কোবাদও মুসলমানদের গৌরব কাহিনির বর্ণনা দিয়েছেন। এই দিক থেকে কায়কোবাদ উনিশ শতকের জাতীয়তাবোধের অনুসারী। তিনি বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু যুগের প্রভাব অস্বীকার করে তিনি ছিলেন অতীতমুখী। যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে এই অসঙ্গতি তাঁর অসার্থকতার পরিচায়ক।

কায়কোবাদ মহাশ্মশান রচনায় শিল্পগত উৎকর্ষের মোটেই পরিচয় দিতে পারেন নি। অসংখ্য কাহিনি এতে স্থান পেয়েছে, কিন্তু কাহিনিগুলো বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকার জন্য এর যেমন ধারাবাহিকতা নেই, তেমনি নেই কোন সুষ্ঠু পরিণতি। এ কাব্যে নায়কোচিত কোন চরিত্র নেই। আহমদ শাহ আবদালী, নজীবদ্দৌলা, সুজাউদ্দৌলা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে এমন পূর্ণতা নেই যাতে কাউকে নায়ক বলা চলে। চরিত্রগুলো অসম্পূর্ণ ও দুর্বল। কাহিনি আকস্মিকতায় পরিপূর্ণ। দীর্ঘ বক্তৃতা বা অহেতুক বর্ণনার অতিকথনদোষ এ কাব্যকে ত্রুটিযুক্ত করেছে। মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে কায়কোবাদ গীতিস্রোতে ভেসে গেছেন। বিভিন্ন প্রণয়কাহিনি ও সংযোজিত গানের মাধ্যমে রোমান্টিকতা ও গীতি- প্রবণতার প্রকাশ

ঘটেছে। মহাশ্মশান কাব্যে আছে বর্ণনার অসংযম, গদ্যাত্মক ভাষা, প্রকাশভঙ্গির দুর্বলতা এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিস্প্রাণ প্রয়োগ। মহাশ্মশানে বক্তব্য থাকলেও শিল্প নেই। কাব্যে শব্দব্যবহারের দিক থেকে যে সরলতা প্রকাশ পেয়েছে তা কবির নিজস্ব দুর্বল বৈশিষ্ট্য। কবির নিজের মতে, 'যাহারা সহজ ও কোমল শব্দের দ্বারা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় কবিতার গাঢ় ভাব অঙ্কিত করিতে অসমর্থ, তাহাদের কবিতা লিখা বিড়ম্বনা মাত্র।' সাধারণত মহাকাব্যের ভাষায় যে গাম্ভীর্য আকাঙ্ক্ষিত এ কাব্যে তা অনুপস্থিত। মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য একমাত্র মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য ব্যতীত আর কোথাও ফুটে ওঠে নি। কায়কোবাদের কাব্যে নির্মাণকৌশলের দিক থেকে মহাকাব্যের উপযুক্ত সংযম ও মহিমা দেখা যায় না। ভাষার সরলতা বক্তব্যকে ব্যঞ্জনাহীন করেছে। যেমন :

সে আমারে বহুদিন করেছে নিষেধ
যেতে তব কাছে, আমি বলেছি তাহারে
কেন যাইব না আমি তব কথা মত
তার কাছে? দাসী আমি নহি ত তোমার?
তোমার ওসব কথা চাহিনা শুনিতে,
কেন মোরে কর ত্যক্ত, করেছি নিষেধ
আসিতে আমার কাছে কতদিন তারে?

অথবা,

রাত্র নাই যাও বাবা, শুয়ে থাক যেয়ে,
আমিও যাইব এবে নামাজ পড়িতে।

অথবা,

কি বলিলি নরাকৃতি কুক্কুর অধম
চূর্ণিবি মস্তক মোর দেখিব এখনি
রে পাষণ্ড, কোন বাপে রক্ষে আজি তোরে?
একটি একটি করি দন্তগুলি তোর
উৎপাটিব নরাধম অস্পৃশ্য পামর;
হৃদয়ের রক্তে তোর নিবারিবে ক্ষুধা
হিংস্র জন্তু, মাংসপিণ্ডে শকুনি গৃধিনী।

এ ধরনের শব্দ প্রয়োগের ব্যর্থতার প্রচুর নিদর্শন মহাশ্মশান কাব্যে বর্তমান। ড. আনিসুজ্জামানের মতে, 'মহাকাব্যের গাম্ভীর্য এতে নেই, কবির রোমান্টিক প্রবণতা অনাবশ্যক প্রেমকাহিনি-সন্নিবেশের কারণ। সংলাপ দুর্বল, বর্ণনা পুনরুক্তি দোষে আক্রান্ত।' কাব্যের ভাষার গদ্যাত্মক প্রয়োগ মহাশ্মশানের উৎকর্ষের অন্তরায় ছিল। এ ধরনের ভাষা-প্রয়োগে কবিত্বের স্পর্শ নেই। কাব্যিক মানের অবনতির জন্য ভাষা বহুলাংশে দায়ী হয়েছে। কায়কোবাদ মাইকেলের অনুসরণে নামধাতুর ব্যবহার করেছেন, নিয়তি ও কল্পনা দেবীর ধ্যানও কবি করেছেন। তৎসম শব্দের প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যবহার মহাশ্মশানে বিদ্যমান। কিন্তু কায়কোবাদের মধ্যে মধুসূদনের কাব্যিক উৎকর্ষের মূল রহস্য অনুপস্থিত ছিল।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাপারেও কায়কোবাদ মোটেই সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। তাঁর কবিতায় কোন ছন্দস্পন্দন নেই। অমিত্রাক্ষরের ব্যর্থ অনুকরণ করতে গিয়ে কবির পক্ষে কাব্যের উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয় নি। মিলহীন পয়ার হিসেবেই এর পরিচয়। কায়কোবাদের অমিত্রাক্ষরের একটি নমুনা :

এ কোন্ অমরাবতী কহ লো কল্পনে
সুধামুখি, কহ শুনি এ কার উদ্যান
মর্ত্যভূমে? ত্রিদিবের নন্দন-কানন
নহে সমতুল্য; দেবি, কোন ভাগ্যবান
গড়িয়াছে এ উদ্যান এত সুশ্রী করি
এই স্থানে? অই দেখ নয়ন-রঞ্জন
কত পুষ্প তরু, কত কুসুম বল্লরী
শোভিছে শ্রেণিমত; তব শাখে বসি
কত জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখি মনোহর
আলাপিছে সুধারবে সঙ্গীত মধুর।

মহাকাব্য ছাড়া কায়কোবাদ গীতিকবিতা ও কাহিনিকাব্য রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বিরহবিলাস' (১৮৭০) ও 'কুসুমকানন' (১৮৭৩) অল্প বয়সের রচনা বলে গুরুত্বহীন। 'অশ্রুমালা' (১৮৯৪) কাব্যটি গীতিকবি হিসেবে কায়কোবাদের প্রতিভার সার্থক পরিচয়বাহক। কাব্যটি এ কারণে তৎকালীন সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। কাব্যটিতে জীবন-জিজ্ঞাসা, স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' কাব্য প্রকাশকালে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিসাহিত্যিকের একান্ত অভাব ছিল বলে সহজে তাঁর ওপর সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি নিপতিত হয়েছিল। মুসলমানদের অতীত সৌভাগ্যের স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত রেখে কবি সে সময়ে কতকগুলো জাতীয় প্রেরণামূলক কবিতা রচনা করেছিলেন। 'অশ্রুমালা' কাব্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। গীতিকবির অকৃত্রিম আবেগ তাঁর হৃদয়ে ছিল বলে এই ক্ষেত্রে তিনি সার্থকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর গীতিকবিতা রচনার প্রবণতা মহাশ্মশান কাব্য রচনার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

কায়কোবাদ পরবর্তী পর্যায়ে আখ্যানকাব্য রচনায় মনোযোগী হন। এই প্রসঙ্গে শিব মন্দির (১৯১৭), অমিয়ধারা (১৯২৩), শ্মশানভস্ম (১৯২৪), মহরম শরীফ (১৯৩৩) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব কাব্যে কবি ইতিহাসপ্রীতি, স্বাজাত্যবোধ ও নীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এগুলোতে কাব্যকলার উৎকর্ষসাধন মোটেই সম্ভবপর হয় নি। 'মহরম শরীফ'কে মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এ কাব্যে কবি মহরমের প্রকৃত ইতিবৃত্ত রূপায়িত করার দাবি জানিয়েছেন। অসংখ্য পাদটীকা প্রয়োগ করে কবি এর ঐতিহাসিকতা প্রমাণেরও প্রয়াস পেয়েছেন। এ কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে মহাকাব্যের উপযোগিতা থাকলেও 'এপিক সুলভ কবিকল্পনা, ঘটনা সংস্থান, চরিত্র সৃষ্টি, ভাষার গাম্ভীর্য এবং ব্যঞ্জনা প্রভৃতির অভাব থাকায়' তা মহাকাব্য বলে গৃহীত হতে পারে নি। কায়কোবাদের আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা মোটেই সম্ভব হয় নি।

গীতিকবি হিসেবে কায়কোবাদ খ্যাতিলাভ করলেও মহাকাব্য রচনায় তাঁর প্রতিভার উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল। তবে মহাকাব্য রচনায় তাঁর পক্ষে গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হয় নি। কাব্য বিচারের মাপকাঠিতে তাঁর রচনার মূল্য যেমনই হোক না কেন স্বাজাত্যবোধ সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিষ্ঠা ও সাধনার মর্যাদা অনস্বীকার্য।

মুসলিম সমাজে কায়কোবাদের যে মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছিল তা শিল্পদক্ষতার জন্য নয়, বরং তা ছিল আবেগ-আপ্লুত। 'মহাশ্মশান' একটি মহাকাব্য, সুবৃহৎ কলেবর, ঘটনা মুসলিম গৌরবের ইতিহাসাশ্রিত, স্বাজাত্যবোধের যুগোপযোগী চেতনা সমৃদ্ধ—এসবই মর্যাদার কারণ। এই আবেগ নিয়েই কবি গোলাম মোস্তফা মন্তব্য করেছেন, 'মহাশ্মশান কাব্যখানি হাতে নিলেই সর্বপ্রথম যে বিস্ময় ও কৌতূহল মনে জাগে তা হচ্ছে এই : এত বড় একটা মহাকাব্য লিখবার মত বিরাট মন যে কবির ছিল সে ত সাধারণ নয়। কবি যে তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে পেরেছিলেন এই ত তাঁর প্রতিভার এক বড় পরিচয়। সৃষ্টির গভীর উল্লাস না থাকলে এত বড় কাব্য রচনা সম্ভব হত না। তরল হাসি কান্না ও আলোছায়া মাখান লিরিক কাব্যের যুগে একজন মুসলিম কবি যে নীরব রাত্রে একটি মহাকাব্য রচনার স্বপ্ন দেখেছিলেন, এ আমাদের পক্ষে সত্যিই এক গৌরবের কথা। কবির দানের বিচার যদি নাও করি তবু তিনি যে একটা 'নতুন কিছু' দান করে গেছেন, এটাই তাঁর পক্ষে এক মহাসার্থকতা। সাহিত্যক্ষেত্রে 'মহাশ্মশান কাব্য' তাই বাংলার মুসলমানদের হাতের দেওয়া এক বিরাট অবদান।'

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে মুসলমানদের নবজাগরণে ইসলামি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন সিরাজগঞ্জের কবি সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১) তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে মুসলমানদের জাতীয় জীবনের দুর্দিন দূর করার জন্য ইসলামি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একদল কবি-সাহিত্যিক সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সিরাজীর ভাষায় মুসলমানদের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব প্রকাশমান :

কিবা ছিলে, কি হইলে, যদি বুঝিবারে দাও,
অতীত গৌরব-পানে মোসলেম! ফিরিয়া চাও।

তাঁদের কামনা ছিল জাতীয় জীবনের উন্নয়নের ফলে 'সেবিবে সমগ্র বিশ্ব মোসলেম চরণ।' এই মূল উদ্দেশ্য কেন্দ্র করে বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী কবি সিরাজী জাতির সেবায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর প্রভাবে বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উদাত্ত আহ্বানে বাঙালি মুসলমানের জীবনে সাড়া জেগেছিল। আবদুল কাদির মন্তব্য করেছেন, 'বিংশ শতাব্দীর ভীত সন্ত্রস্ত বাঙালি মুসলমানের কানে তিনি শুনিয়েছেন অভয় জীবনমন্ত্র। অজ্ঞানতা ও

নৈরাশ্যের অন্ধকারে জ্বালিয়েছেন আশার অম্লান আলোকবর্তিকা।...বাংলার প্রতি পল্লী ও নগরীতে তাঁর উদ্দীপনাময়ী বাণীর প্রভাব অনুভূত হয়। এদেশের মুসলমানকে সবল মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি নানা সদনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'নূর' ও সাপ্তাহিক 'সোলতান' পত্রিকায় সাহিত্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনের পুনর্গঠনের স্বপ্ন রূপ লাভ করে। তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতাগুণে আপামর সাধারণের মনে হীনম্মন্যতাবোধ দূরীভূত হয়ে প্রবল কর্মৈষণা সৃষ্টি হয়।'

সিরাজী ছিলেন স্বাধীনতার অক্লান্ত সৈনিক, ছিলেন মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি। সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্য প্রতিভা সে উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিল। দেশ ও জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় অনুপ্রাণিত করাই তাঁর সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল। স্বজাতির জাগরণের জন্য ইসমাইল হোসেন সিরাজী যে বলিষ্ঠ বাণী প্রকাশ করেছিলেন তার পরিচয় মিলে 'অনল প্রবাহ' (১৮৯৯) নামক কাব্যগ্রন্থে। মুসলমানদের তৎকালীন দূরবস্থার যে বেদনা কবির মনে সঞ্চারিত হয়েছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যের মাধ্যমে। ফলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কবির বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। 'অনল প্রবাহ' কাব্যে শিরাজী দেশের যুবসমাজকে লক্ষ্য করে আহ্বান জানান :

আবার উত্থান-লক্ষ্যে
বহাও জগৎ-বক্ষে
নব-জীবনের খর প্রবাহ-প্লাবন।
আবার জাতীয় কেতু
উড়াও মুক্তির হেতু,
উঠুক গগনে পুনঃ রক্তিম তপন।

'অনল প্রবাহ' কাব্যের অগ্নিবাণী ভাবের তীব্রতা ও ভাষার ওজস্বিতা-গুণে সমাজের সর্বত্র অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। কাব্যটি যে কতদূর আবেদনশীল হয়েছিল তা উপলব্ধি করা যায় ইংরেজ সরকারকর্তৃক এর বাজেয়াপ্তকরণের ঘটনার দ্বারা।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী 'স্পেনবিজয় কাব্য' (১৯১৪) নামে মহাকাব্যের রচয়িতা। এই কাব্যে স্পেনের সম্রাট রডারিকের সঙ্গে মুসলমান বীর তারেকের সংগ্রামকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের মাধ্যমে সিরাজী মুসলমানদের বীর্যবত্তা, ন্যায়পরায়ণতা, অকুতোভয় ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যের আখ্যানভাগ ইতিহাস থেকে গৃহীত। বীররস এ কাব্যের প্রধান অবলম্বন বলে বিবেচিত হতে পারে। কাব্যটিতে অমিত্রাক্ষরের মধ্যে মধ্যে মিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করে ছন্দের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। গ্রন্থটি রচনার পশ্চাতে কবির উদ্দেশ্য ছিল—মুসলমানদের অতীত ইতিহাসের গৌরবময় কাহিনির মাধ্যমে স্বীয় গৌরব উপলব্ধি করে বর্তমান জীবনেও যেন তারা গৌরবজনক অধ্যায়ের সূচনা করতে সমর্থ হয়। কবি কামনা করেছেন :

গৌরব কাহিনি-গাথা করুক স্মরণ
গঠিত করুক সবে জাতীয় জীবন।
উঠুক গগনে পুনঃ সৌভাগ্য চন্দ্রমা।
মোহিত করুক বিশ্ব ইসলাম সুষমা।

কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সিরাজীর মত ছিল : 'কোন জাতি যখন মরণ-সাগরের তলে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে, তখন কবির স্বর্গীয় বীণাধ্বনিই জাতিকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া জীবনতটে উপস্থাপিত করে।' সিরাজীর কবিপ্রতিভা এই মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহাকাব্যের মহিমা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'যে রবীন্দ্রনাথের গৌরবে আজ বাংলাদেশ আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে তিনিও মহাকবি নহেন; তিনি শুধু গীতিকবি। তিনি বহু সংখ্যক সঙ্গীত, গাথা ও কবিতা রচনা করিয়াছেন বটে; কিন্তু একখানিও মহাকাব্য লেখেন নাই। সঙ্গীত গাথা ও কবিতা বসন্তের ফুলের ন্যায়, উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।...কিন্তু মহাকাব্য হিমাচলের মত জিনিস, যতদিন মানবসমাজ থাকিবে, ততদিন উহাও থাকিবে। আজ কতকাল হইল ব্যাস-বাল্মীকি, হোমার ও ফেরদৌসী পরলোকগমন করিয়াছেন, কিন্তু জগতের সুধীমণ্ডলী তাঁহাদের কাব্যরসামৃত পানে আজও সরস ও উৎফুল্ল হইতেছেন।' সিরাজীর মহাকাব্য রচনার পশ্চাতে স্বজাতিপ্রেমই প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

সিরাজীর কাব্যের ভাষায় মধুসূদনের সার্থক অনুসরণ আছে; কিন্তু কাব্যরচনায় সার্থকতার নিদর্শন নেই। সিরাজীর কাব্যে আছে মাইকেলের যান্ত্রিক অনুকরণ। কিন্তু মাইকেলের সার্থকতা সিরাজীর মধ্যে অনুপস্থিত। মেঘনাদবধ কাব্যে পুরাণের কাহিনি ও কালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও মহাকবি যে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করেছিলেন, সিরাজীর কাব্যের মধ্যে তা অনুভব করা যায় না। এ সম্পর্কে আবদুল কাদির মন্তব্য করেছেন, 'সৌন্দর্যকল্পনা ও ভাবপ্রকাশের কিছু দৈন্য ছিল বটে; কিন্তু মনে হয় ধ্যানীর প্রসন্ন নিরাসক্তি ও স্থিরচিত্ততা তাঁর ততখানি ছিল না এবং প্রধানত ধর্মবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে তিনি কাব্যচর্চায় অগ্রসর হয়েছিলেন, তাই চরম সাফল্যলাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি।' সিরাজীর কাব্যে মাইকেলের প্রতিধ্বনি সহজেই শোনা যায়। সিরাজী তাঁর কাব্য এ ভাবে আরম্ভ করেছেন :

এস গো কল্পনে সখি অমিয় ভাষিণী!
কুসুম-ভূষণা দেবী হসিত-আননা,
লয়ে সঙ্গে মনোরঙ্গে বিজয়-গঞ্জিনী
অপার সৌন্দর্যময়ী কবিত্ব ললনা;
দুজনে মিলিয়া আজি গাঁথি চারুহার॥
পরাইয়া দেই গলে বাঙলা ভাষার ॥

শোক বর্ণনা :

ছিল আশা সিংহাসনে বসাইয়া তোমা
জুড়াব এ পোড়া আঁখি। নিষ্ঠুর বিধাতা

সে আশা-তরুর মূলে ভীষণ কুঠার
হানিল অকালে, হায়! মম ভাগ্যদোষে
তোমা হেন পুত্ররত্ন হারাইনু আমি।

কাব্য উপন্যাস ভ্রমণবৃত্তান্ত ইতিহাস প্রবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণি মিলে ইসমাইল হোসেন সিরাজী অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যসাধনার পশ্চাতে জাতির কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ এবং মুসলমান সমাজভুক্ত মানুষের কল্যাণসাধনাই গুরুত্বলাভ করেছিল; শুধু সাহিত্যপ্রীতিতে তিনি সাহিত্যচর্চা করেন নি। তাই তাঁর কাব্যের মধ্যে উৎকর্ষের চেয়ে জাতীয়তাবোধের প্রেরণাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। শিরাজী চেয়েছিলেন, 'মুসলমানদিগকে স্বরাজ-সংগ্রামে দ্রুত অগ্রসর করিবার জন্যই স্বতন্ত্র জাতীয় সভা ও জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করা কর্তব্য। ...আমাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা একান্ত আবশ্যক।' মুসলমানদের স্বাধিকার লাভের জন্য শিরাজী যে পথ দেখিয়েছিলেন সে পথ অনুসরণ করে জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

হামিদ আলী

আবুল-মা-আলী মহাম্মদ হামিদ আলী বা এ. এম. এম. এইচ. আলী (১৮৭৪-১৯৫৪) মহাকাব্যের ধারা অনুসরণে কাব্য রচনা করেছিলেন। 'কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে মনে আঘাত প্রাপ্তে বা হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তনে কোন কোন অতীত কবিবৃন্দের কবিত্বশক্তি বিকাশ পেয়েছিল'—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হামিদ আলী ভ্রাতৃবিয়োগ বেদনায় 'ভ্রাতৃবিলাপ' কাব্য রচনা করেন। তৎকালীন মুসলমান কবিগণের মতই স্বতন্ত্র সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা তাঁর মধ্যে কার্যকরী ছিল। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি 'কাসেমবধ কাব্য' (১৩১১) রচনা করেন। কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন, 'রাম-রাবণের যুদ্ধের অনেকগুলি ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে যেমন 'মেঘনাদবধ' লিখিত, সেইরূপ এজিদ ও ইমামদিগের মধ্যে যে সকল যুদ্ধাদি হয় তাহার অনেকগুলি ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য লিখিত।' এ কাব্য সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত, 'চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনাবিন্যাস ও কাব্যসুষমার দিক থেকে এ কাব্য 'মহাশ্মশান' থেকে শ্রেষ্ঠ ত বটেই, অনেক ক্ষেত্রে 'বৃত্রসংহারের' চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কাসেমবধে কবির দুর্লভ সংযম, প্রদীপ্ত বুদ্ধি এবং চমৎকার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।'

কাসেমবধ কাব্যে মাইকেল ও নবীন সেনের অনুকরণ আছে। কবি নিজেই বলেছেন,'মেঘনাদবধের কয়েক স্থলে মাধুর্যের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহা অনুকরণ করিয়াছি।' ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ ও উপমা প্রয়োগে মাইকেলের প্রভাব বিদ্যমান। ভাষায় এই প্রভাবের নমুনা :

'হায় কি কুক্ষণে
হেরেছিনু, অপরূপ সে রূপ মাধুরী
আভাময়, জ্যোতির্ময় পূর্ণচন্দ্র যথা।'

কবির পরবর্তী রচনা 'জয়নালোদ্ধার কাব্য' (১৩১৪)। 'কাসেমবধ' কাব্যে যা বর্ণিত হয়েছে তার পরবর্তী ঘটনাবলীই এ কাব্যের বর্ণিতব্য বিষয়। পূর্ববর্তী কাব্যের মত এর উৎকর্ষ ঘটে নি। মাইকেলের ব্যাপক প্রভাব এতে সহজে লক্ষণীয়। কবির অপর আখ্যানজাতীয় কাব্য 'সোহরাববধ কাব্য।'

গতানুগতিক কাব্যধারায় স্বতন্ত্র সাহিত্যসৃষ্টিই হামিদ আলীর উদ্দেশ্য ছিল। বাংলা মহাকাব্য উনিশ শতকের পরিসীমায় বিকাশ লাভ করলেও বিশ শতকের প্রথম দিকে তার চর্চা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মধ্যে সার্থকতার নিদর্শন নেই। এইসব কাব্য মূলত আখ্যান কাব্যের পর্যায়ে পড়ে।

যোগীন্দ্রনাথ বসু

এই সময়ে মহাকাব্য সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হচ্ছে যোগীন্দ্রনাথ বসুর(১৮৫৪-১৯২৭) 'পৃথ্বীরাজ' (১৩২২) ও 'শিবাজী' (১৩২৮) কাব্য দুটি। মহাকাব্য রচনা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল, 'কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ অতীত হইয়াছে। আমার সে বিশ্বাস নাই বলিয়া 'পৃথ্বীরাজ' রচনার পর আমি 'শিবাজী' রচনায় প্রণোদিত হইয়াছি।' তিনি আরও বলেছেন, 'পৃথ্বীরাজে আমি হিন্দু জাতির পতন বর্ণনা করিয়াছিলাম। পতনের পর উত্থান প্রকৃতির নিয়ম। শিবাজীতে আমি এই উত্থান বর্ণনা করিয়াছি।' কাব্যের ইতিহাস আশ্রিত কাহিনির মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যে আছে প্রচুর টীকা-টিপ্পনী। কাব্যের কাহিনির ঐতিহাসিকতা প্রমাণের জন্য এমন করা হয়েছিল। ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে গ্রন্থদ্বয় রচিত হয়েছিল বলে তার মধ্যে বিশিষ্টতা আছে। বাংলা কাব্যে তখন গীতিকবিতার আধিপত্য, মহাকাব্যের আকর্ষণ তখন ছিলই না। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী' কাব্য দুটির ভাষা ও রচনাভঙ্গি সহজ সরল। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কাব্য দুটিতে কবির যথার্থ কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। তবে অতিরিক্ত উদ্দেশ্যমূলকতা ও বিষয় প্রাধান্য তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করেছে। যোগীন্দ্রনাথ বসু বর্তমান সাহিত্য-সমালোচনায় উপেক্ষিত হলেও তাঁর সমকালে প্রচুর সম্মান পেয়েছিলেন। মহাকাব্যের এই অতিক্রান্ত যুগে এ ধরনের কাব্যসৃষ্টির প্রচেষ্টায় তেমন কোন গুরুত্ব নেই।

পরবর্তী পর্যায়ে এমন কি সাম্প্রতিক কালেও মহাকাব্য জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন রচিত হতে দেখা গেলেও এ যুগে তার আবেদন না থাকার জন্য সেসব রচনা গুরুত্বহীন বলে বিবেচ্য। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশের এক শতাব্দী পরেও বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের দাবিদার এমন কাব্যও রচিত হয়েছে। তবে মহাকাব্যের অপ্রতিহত প্রভাব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই ছিল সীমাবদ্ধ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে এত মহাকাব্য সৃষ্টি হইবার কারণ কি? ইহা কতটা কালধর্মসংগত অথবা আকস্মিক, বিচার কর এবং এই প্রসঙ্গে প্রধান মহাকাব্য রচয়িতাগণের পরিচয় দাও?

২। 'জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া জাতিগঠনের উদ্দেশ্যেই উনবিংশ শতাব্দীর কবিগণ জাতিবৈরমূলক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।'—এই উক্তি কোন অর্থে কতখানি সত্য?

৩। উনিশ শতকের মহাকাব্যের ধারা আলোচনা করিয়া মধুসূদন অনুসারী মহাকাব্য রচয়িতাদের পরিচয় দাও।

৪। বাংলা কাব্যে মহাকাব্য বলিয়া চিহ্নিত রচনাবলীর বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করিয়া একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ লিখ।

৫। যে ইংরেজির প্রভাবে আমাদের ভাষায় আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব, সে ভাষায় মহাকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা বক্তব্য কি?

৬। 'উনবিংশ শতাব্দীতে মধুসূদনের হাতে যে কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যধারার সূত্রপাত হইয়াছিল উপযুক্ত উত্তরসূরীর পরিচর্যার অভাবে তাহা তেমন পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই।'—বাংলা মহাকাব্যের বিকাশ ধারা আলোচনা প্রসঙ্গে উক্তিটির সার্থকতা প্রদর্শন কর।

৭। 'মহাকাব্যের যুগ গত হইলেও মহাকাব্য রচনার মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকত্বের সূত্রপাত।'—বুঝাইয়া দাও।

৮। 'উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রবর্তিত মহাকাব্যের ধারা আসলে একটি ক্ষয়িষ্ণু ধারা।' রঙ্গলাল থেকে কায়কোবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলা মহাকাব্যের ধারা বিশ্লেষণপূর্বক এ উক্তির যথার্থতা প্রমাণ কর।

৯। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার আধুনিক মহাকাব্যগুলি রচিত হইবার কি কি কারণ ছিল তাহা আলোচনা করিয়া মহাকাব্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১০। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেল মধুসূদনই একমাত্র মহাকবি—অন্য সকলেই তাঁর অনুকারক।'—আলোচনা কর।

১১। 'জাতিবৈরের মাধ্যমে স্বাজাত্যবোধ জাগানোর উদ্দেশ্যেই উনিশ শতকের মহাকাব্যগুলো রচিত হয়েছিল।'—যুক্তি প্রমাণযোগে এ সিদ্ধান্ত খণ্ডন অথবা সমর্থন কর।

১২। 'উনিশ শতকের মহাকাব্যগুলি জাতিগঠন ও জাতীয়তা জাগানোর লক্ষ্যে রচিত।'—প্রধান মহাকাব্যগুলির আলোকে এই সিদ্ধান্তের যথার্থ্য বিচার কর।

১৩। বাংলা মহাকাব্য ধারার পরিচয় দাও।

১৪। বাংলা মহাকাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান আলোচনা কর।

১৫। টীকা লিখ : ইসমাইল হোসেন সিরাজী, পলাশীর যুদ্ধ, বৃত্রসংহার কাব্য, স্পেনবিজয় কাব্য।

নবম অধ্যায়
গীতিকবিতা

গীতিকবিতার মধ্যে কবিহৃদয়ের বিশেষ কোন অনুভূতি সঙ্গীতমাধুর্য সহকারে রূপায়িত হয়ে ওঠে। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি এর উপজীব্য, সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা নিয়ে তার প্রকাশ। যে শ্রেণির কবিতায় কবির হৃদয়ের অনুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত বাসনাকামনা ও আনন্দবেদনা প্রাণের অন্তস্তল থেকে আবেগকম্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাকেই গীতিকবিতা বলে অভিহিত করা হয়। আন্তরিকতাপূর্ণ অনুভূতি, অবয়বের স্বল্পতা, সঙ্গীতমাধুর্য ও গতিস্বাচ্ছন্দ্য—এই কয়টি বৈশিষ্ট্য গীতিকবিতার মধ্যে বিদ্যমান। গীতিকবিতা কবির আত্মমুকুর। জগৎ ও জীবনের সান্নিধ্যে কবিমনে ভাবের যে বিচিত্র লীলাখেলার সৃষ্টি হয় তা-ই কবি ছন্দ ঝঙ্কারে গীতিকবিতায় রূপ দেন। এই জন্য গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তি পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য। হৃদয়ের অনুভূতি সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী নয় বলে তা অবলম্বনে লেখা গীতিকবিতাও দীর্ঘ আকারের হয় না। ইংরেজি সাহিত্যে গীতিকবিতাকে বলা হয় লিরিক। আগের কালে বীণা বাদ্য যন্ত্র বা Lyre সহযোগে এ ধরনের কবিতা গীত হত বলে তার নাম হয়েছে লিরিক (Lyric)। তবে গান ও গীতিকবিতার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। গানে সুরের প্রাধান্য, আর গীতিকবিতায় কথা ও সুরের সমন্বয় থাকে। গানে থাকে ভাবের একত্ব, গীতিকবিতায় থাকে ভাবের বৈচিত্র্য।

গীতিকবিতায় সে ভাববস্তু সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত উভয় রূপই হতে পারে। আর একারণেই গীতিকবিতার আকার তথা দৈর্ঘ্য সম্পর্কে সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ অসম্ভব। খুব ছোট আকারের কবিতা যেমন আছে, তেমনি রচিত হয়েছে বড় আকারের কবিতা। ভাবের অনুসারী হয়েই কবিতা তার আকৃতি লাভ করে। ভাবের বৈচিত্র্যের জন্যই গীতিকবিতার ধারা ক্রমশ অগ্রসরমান। জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে গীতিকবিতা সমকালীন বক্তব্যকে তাৎক্ষণিক ভাবে রূপ দিচ্ছে। নিত্যনতুনের চমক তাই গীতিকবিতায় বিদ্যমান।

গীতিকবিতায় ঘটেছে ছন্দের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশ। ছন্দ এসেছে ভাবের অনুসারী হিসেবে। ভাবের সর্বোত্তম প্রকাশের জন্য উপযোগী ছন্দনির্মাণে কবিরা ছিলেন তৎপর। তাই গতানুগতিক ছন্দে এসেছে পরিবর্তন। শব্দের নতুন ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে গীতিকবিতায়। শব্দ এসেছে নতুন অর্থ নিয়ে। ফলে পাঠককে করে তুলেছে সচেতন। বিদগ্ধ পাঠকই আধুনিক যুগে কবিতার রসমাধুর্য উপভোগের আনন্দপথের অভিসারী। আধুনিক গীতিকবিতায় বিদেশী প্রভাব এসেছে ভাবে, প্রকাশভঙ্গিতে, শব্দব্যবহারে, ছন্দ-নির্মাণে ও ভাষা প্রয়োগে।

ভাবের বৈচিত্র্য গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য। কবিহৃদয়ের মধ্যে জীবন ও প্রকৃতির বিচিত্র ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটে। সে সকল ভাবের প্রকাশ গীতিকবিতায় ঘটে বলে তাতে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বিষয়ের এই বৈচিত্র্যের জন্য গীতিকবিতা ভক্তিমূলক, স্বদেশ-প্রীতিমূলক, প্রেমমূলক, প্রকৃতিবিষয়ক, সনেট, স্তোত্র, চিন্তামূলক, শোকগীতি ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে থাকে।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলিতে গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য প্রথম বারের মত ফুটে উঠেছিল। মধ্যযুগের মৌলিকতাহীন কাব্যের অঙ্গনে ধর্মীয় অনুভূতি রূপায়ণের মধ্যেও হৃদয়ের যে পরিচয় বৈষ্ণব কবিগণ ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে গীতিকবিতার লক্ষণের অভাব ছিল না। বৈষ্ণব কবিদের বিস্ময় ও সৌন্দর্যের দৃষ্টি ছিল, তাঁদের নায়িকা রাধার প্রেমদগ্ধ হৃদয়ের পরিচয় তাঁরা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষকে বৈষ্ণব কবিরা উপেক্ষা করেন নি। তাঁদের রচনা তাই গীতিকবিতা হিসেবে গ্রাহ্য। মানুষের নিবিড় রসানুভূতি ক্ষুদ্রায়তনে প্রকাশ পেলে যদি গীতিকবিতা নামে আখ্যাত হতে পারে তবে বৈষ্ণব কবিতা তার বাইরে নয়। বৈষ্ণব কবিতায় কবির শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ের ভক্তিটুকুই প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে হৃদয়ের যে বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তার বাইরে অন্য কোন বক্তব্য এতে অনুপস্থিত। এর মধ্যে কবির ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের নিবেদন প্রাধান্য পেয়েছে বলে এতে মানবহৃদয়ের পরিচয় তথা কবিহৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ লাভ করতে পারে নি। বৈষ্ণব কবিদের বাসনাকামনা রাধাকৃষ্ণের রূপকল্পনার অনুষঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে বলে ব্যক্তিহৃদয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় তাতে নেই। বৈষ্ণবসাধনায় আত্মভাব বিসর্জন দিতে হয়। বৈষ্ণব কবিতায় তাই গোষ্ঠী মনোভাব প্রাধান্য পেয়েছে, ব্যক্তি মনোভাব সেখানে গৌণ। এ কারণে আধুনিক গীতিকবিতার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার বিস্তর পার্থক্য।

কবিহৃদয়ের বিচিত্র ভাবভাবনা আধুনিক গীতিকবিতায় প্রকাশমান। জগৎ ও জীবনের সান্নিধ্যে লব্ধ কবির অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে গীতিকবিতায়। তাই আধুনিক গীতিকবিতা কবিমানসের বিচিত্র অনুভূতির যথার্থ প্রকাশক। পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে আধুনিক যুগের বাংলা গীতিকবিতায় মানবিকতা, জীবনবোধ প্রভৃতি প্রবেশ করেছে। হৃদয়ের সূক্ষ্ম একটা বেদনাবোধ তথা সৌন্দর্য-আনন্দানুভূতি গীতিকবিতায় রূপ লাভ করে। বৈষ্ণব কবিতার গোষ্ঠীগত ধর্মচেতনা মানবরসকে ধর্মরসে অভিষিক্ত করেছে, আধুনিক গীতিকবিতা কবির আত্মচেতনা ও মানবরসে সিক্ত হয়ে উঠেছে। বিষয়ের বৈচিত্র্যহীনতায় বৈষ্ণব কবিতার সীমাবদ্ধতা, কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতায় আছে ভাবের বহুমুখী সমাবেশ।

আধুনিক যুগের কবিতায় মানুষের বাস্তব জীবন ও সমাজের চিত্র যথাযথ রূপায়িত হয়ে উঠছে। তাই সেখানে জীবনের সমস্যা-ঘেরা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকেরও প্রতিফলন ঘটছে। আগের তুলনায় আধুনিক কালের কবিতার বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের কথায় এভাবে বিধৃত হয়েছে : 'কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকেও ছাড়ে না।'

উনিশ শতকে এদেশে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করে। কাব্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন কাহিনিকাব্য ও গীতিকবিতার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। দুটি ধারা পাশাপাশি চললেও গীতিকবিতার ধারাটি অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। কাহিনিকাব্য রচনার প্রবণতা বিলুপ্ত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের চাঞ্চল্যে প্রভাবিত কবিরা গীতিকবিতার মধ্যেই প্রতিভা বিকাশের স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন। আধুনিক কালে গীতিকবিতা উপজীব্য বিষয়ের বৈচিত্র্যে বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক, মনোজগতের নানা ভাবনা অবলম্বনে গীতিকবিতা রচিত হয় বলে এতে সীমাহীন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। আর বিষয়- বৈচিত্র্যের পথ ধরে বৈচিত্র্য এসেছে আঙ্গিকে, ভাষা ব্যবহারে, ছন্দে, রূপকল্পে ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪) বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার প্রবর্তক। গীতিকবির ভাবরসনিমগ্ন, আত্মচেতনায় অন্তর্লীন হৃদয়ের আনন্দবেদনার প্রথম প্রকাশ বিহারীলালের কবিতায় রূপলাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বিরহিত এই বৈশিষ্ট্য কবিকে যেমন স্বাতন্ত্র্য দান করেছে, তেমনি এই মৌলিক সুর এক নবযুগের প্রবর্তক। কবির অন্তরঙ্গ মনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবের ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটিয়ে বিহারীলাল আধুনিক অর্থে 'বিশুদ্ধ গীতিকবি' বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে কাব্যের নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য বিহারীলাল আয়ত্ত করেছিলেন। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছে এবং তা গতানুগতিক কাব্যধারায় সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। আধুনিক যুগের সূত্রপাতে আখ্যান কাব্যের যে ব্যাপক চর্চা সাধিত হচ্ছিল বিহারীলাল তার সঙ্গে কোন সংযোগ রাখেন নি। প্রকৃতপক্ষে, সমসাময়িক কাব্যসাহিত্যের ধারা থেকে নিজেকে একান্ত সন্তর্পণে সরিয়ে নিয়ে তিনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কাব্যসাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণযোগ্যঃ 'বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনা-সঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না,—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা সভা মনোরঞ্জনের কোন উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গ রূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।' বিহারীলাল তাঁর কাব্যসাধনার মাধ্যমে নতুন গীতিকবিতার যুগের একটি আভাসমাত্র দিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে পরিপূর্ণ সার্থকতা অর্জন করে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীকালে তাঁর ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথের হাতে গীতিকবিতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয় এবং বাংলা কাব্যে গীতিকবিতা একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, 'সে প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীতি কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।'

ভোরের পাখি যেমন দিবসের আলোকোজ্জ্বল আবির্ভাবের পূর্বে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, বিহারীলালও তেমনি বঙ্গসাহিত্যের কাব্যনিকুঞ্জে একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর কবিপ্রতিভার খ্যাতি খুব বেশি সম্প্রসারিত হয় নি, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ছিলেন তাঁর কাব্যের রসজ্ঞ। এ সম্পর্কে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, 'উদীয়মান নবীন সূর্যের একটি অস্ফুট আভাস দেওয়াই ভোরের পাখির কাজ; বিহারীলালও ভাস্বর প্রতিভায় দশদিক উদ্ভাসনকারী রবীন্দ্রনাথের আগমনীবার্তা জানাইয়া কাব্যমোদিগণের দৃষ্টি সেই দিকে ফিরাইয়া গিয়াছেন মাত্র।'

বাংলা সাহিত্যের 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল গতানুগতিক কাব্যধারার মধ্যে এমন একটি অভিনব সুর শুনালেন যার মাধ্যমে কবিহৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব হল। এ ক্ষেত্রে কবির সার্থকতার কারণ হিসেবে তাঁর মৌলিকতার কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর নিকট কাব্যকলার চেয়ে কবি হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য প্রকাশই বড় হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর কাব্যে রূপ অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য বিদ্যমান। তিনি বাংলা কাব্যে যে নতুন সুর সংযোজন করলেন তাতে কবির অন্তর্লোকের সহজ ও স্পষ্ট স্পর্শ লাভ করা সম্ভবপর হয়। তাঁর অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ, হৃদয়ভাবের অন্তরঙ্গ প্রকাশের পরিসীমায় তাঁর আনাগোনা। অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি ছিলেন 'আপন অধিকারের ভিতরে রাজা।' পাশ্চাত্য লিরিক কথাটি বিহারীলালের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত বলে বিবেচিত। তাঁর সকল কবিতাই লিরিক বা গীতিকবিতা। মনের বীণায় নিভৃত ঝঙ্কারে তার প্রকাশ। তাঁর এই বিশুদ্ধ গীতিকবিতার মধ্যে বিশুদ্ধ রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল।

গীতিকবিতায় যে ব্যক্তিভাবের পরিচয় মিলে তার উপলব্ধি পূর্বেই সম্ভবপর হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে। সনেট গীতিকবিতার পর্যায়ভুক্ত। মধুসূদন তাঁর সনেটে ব্যক্তিহৃদয়ের পরিচয় রূপায়িত করে গীতিকবির বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করেন। কিন্তু সনেটের আঙ্গিকগত প্রকৃতি লক্ষ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, তার দৃঢ় গঠনসংহতির মধ্যে আত্মভাব সঙ্কুচিত এবং হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত। সনেটের রূপের ব্যাপারে সচেতনতার ফলে ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে না। মধুসূদন ছিলেন মহাকবি, তাঁর মহাকাব্যের গুরুগম্ভীর নির্ঘোষে সরল কোমল মনটির অনুরণন ক্ষীণ হয়ে এসেছে 'চতুর্দশপদী কবিতার শব্দচ্ছন্দ, উপমা ও সুউচ্চ প্রকাশভঙ্গি সহজ সরল সঙ্গীত-মাধুর্যের বুকে পাষাণ চাপা' দিয়েছে। বিহারীলাল এই পাষাণভার থেকে বাংলা কাব্যকে উদ্ধার করলেন। তাঁর কাব্যে ফুটে উঠল কবিহৃদয়ের অন্তরঙ্গ সুর। এখানেই মধুসূদন ও বিহারীলালের পার্থক্য।

বিহারীলাল চক্রবর্তী ছিলেন নিসর্গ-প্রেমিক কবি। তাঁর নিভৃত মানসলোকে রোমান্টিক কল্পনার স্পর্শ দিয়ে নিসর্গ-প্রীতি ও সৌন্দর্য রূপায়িত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কবির স্পর্শকাতর মন বস্তুজগৎ থেকে মুক্তি কামনায় প্রকৃতির নিভৃত জীবনলোকে স্বেচ্ছাবিচরণ করেছে। প্রকৃতির জগৎকেই কবি তাঁর আপন জগৎ করে নিয়েছিলেন, প্রকৃতি প্রসঙ্গেই আর সব কিছুর অস্তিত্বকে অনুভব করেছেন,—এমন কি মানুষকেও।

বিহারীলাল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যানুসারে গতানুগতিক কাব্যধারায় ব্যতিক্রম সৃষ্টি করলেও রচনার প্রাচুর্য তিনি দেখাতে পারেন নি। তাঁর বাষ্পাকুল কবিকল্পনার মধ্যে আবেগের বেগ কম হলে লেখনীর দৌড় মসৃণতর হত। একটা আন্তরিকতার সুর তাঁর কাব্যসাধনায়

শ্রুতিগোচর করার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন বলে রচনার সংখ্যাধিক্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। তাঁর কাব্যগুলো হচ্ছে : সঙ্গীতশতক (১৮৬২), নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), প্রেমপ্রবাহিণী (১৮৭০), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), সারদামঙ্গল (১৮৭৯), সাধের আসন (১৮৮৯) ইত্যাদি।

কবি বিহারীলাল কাব্যসাধনার প্রাথমিক পর্যায় থেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদিক থেকে 'বন্ধুবিয়োগ' ও 'প্রেমপ্রবাহিণী' কাব্যদ্বয়ে একান্ত বাস্তবতার অনুসারী করে নিজের ও বন্ধুদের জীবনের সাধারণ ঘটনা উপজীব্য করেছেন। 'বন্ধুবিয়োগে' তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পত্নীর অকালমৃত্যুতে বেদনাতুর কবিমনের সহজ সরল স্বাভাবিক পরিচয় বিদ্যমান। হৃদয়ের ভাবের প্রকাশে কবি উদ্যোগী ছিলেন, কিন্তু তা কতটুকু শিল্পগুণ মণ্ডিত হয়েছে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। যেমন :

কেহ যদি কোনখানে পাইত আঘাত,
সকলের শিরে যেন হত বজ্রপাত,
তৎক্ষণাৎ উঠিতাম প্রতিকার তরে,
পড়িতাম বিপক্ষের ঘাড়ের উপরে।
কেহ দিলে কাহাকেও খামকা যাতনা,
সবে মিলে করিতাম তাহাকে লাঞ্ছনা।

'প্রেমপ্রবাহিণী' কাব্যে শুদ্ধপ্রেমের অন্বেষণে ব্যর্থ কবি লিখেছেন :

কিছুতেই যখন তোমারে না পেলাম,
একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলাম।

'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যগ্রন্থটিতে বিহারীলালের উল্লেখযোগ্য কবিকৃতি বিদ্যমান। নারী-সম্পর্কে রোমান্টিক মনোভাবসম্পন্ন কবিহৃদয়ের পরিচয় এই কাব্যে দেখা যায়। কবি এখানে গৃহচারিণী নারীকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সৌন্দর্যস্বর্গে স্থান দিয়েছেন। ছন্দের বৈচিত্র্য কাব্যটির নতুনত্বের পরিচায়ক। 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যে কবির প্রকৃতিসচেতনতা প্রকাশমান। এখানে কবি প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় একাত্মতার পরিচয় দিয়েছেন।

কবির শ্রেষ্ঠকাব্য 'সারদামঙ্গলে' কবির কাব্যাদর্শের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। পাঁচ সর্গে রচিত এ কাব্যে রয়েছে এক অনাবিল সৌন্দর্য কল্পনার রূপায়ণ। কবি তাঁর অন্তরবাসিনী কাব্যলক্ষ্মীকে অন্তরের বাইরে বিচিত্রভাবে উপলব্ধি করেছেন—তারই পরিচয় এ কাব্যে লক্ষণীয়। সারদামঙ্গল কাব্যে কবি যে সারদা বা সরস্বতীর কল্পনা করেছেন, তা পৌরাণিক আদর্শ থেকে স্বতন্ত্র। যে সৌন্দর্যসত্তা নিখিল বিশ্বের কারণস্বরূপ, তারই মানসীমূর্তি তাঁর এই সারদা। কবির মানসপ্রিয়া রূপে সারদা বিশেষ, কিন্তু বিশ্বসৌন্দর্যের উৎস হিসেবে তা নির্বিশেষ। কবি তাঁকে কখনও কবিপ্রতিভার উন্মেষপ্রেরণা, কখনও প্রেয়সীজায়া, কখনও বা সর্বব্যাপিনী বিচিত্ররূপিণী প্রাণশক্তিরূপে কল্পনা করেছেন। তাই কবি লিখেছেন :

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে,
আরবার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী!

কাতরা করুণা ভরে,
গান সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী।

আর—

নিরখি নন্দিনীচ্ছবি
গদগদ আদি কবি—
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায়।

তখন—

রোমাঞ্চিত কলেবর,
টলমল থরথর,
প্রফুল্ল কপোল বহি বহে অশ্রুজল।
হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?

কবি তাঁর পরবর্তী কাব্য 'সাধের আসনে' এর জবাব দিয়েছেন :

ধেয়াই কাঁহারে দেবী!
নিজে আমি জানি নে।
কবিগুরু বাল্মীকির ধ্যানধনে চিনিনে।
মধুর মাধুরী বালা,
কি উদার করে খেলা!
অতি অপরূপ রূপ!
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে।

'সাধের আসন' কাব্য 'সারদামঙ্গলের' পরিশিষ্টের মত। সারদামঙ্গলের কল্পনা-ময়ীকে সাধের আসনে কবি মনে করেছেন 'আকাশ পাতাল ভূমি সকলি কেবল তুমি।'

বিহারীরালের কবিখ্যাতি যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয় নি। প্রেম ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে গিয়ে তিনি সহজ সরল ভাষায় নিরাভরণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি যে পরিমাণ ভাবুক ছিলেন সে পরিমাণে শিল্পী ছিলেন না। তিনি আবেগবহুল বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাতে শিল্পীমনের পরিচয় অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন 'বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবি।' নিজের আনন্দেই তিনি মগ্ন ছিলেন বলে তাঁর কবিখ্যাতি মোটেই প্রসারিত হয় নি। তবে রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল।

বিহারীলাল সমকালীন কাব্যধারায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর প্রভাবের কথা সর্বজনস্বীকৃত। কাব্যধর্মের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বিহারীলালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বিহারীলালপন্থী রোমান্টিক ধর্মের পূর্ণ পরিণতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষণীয়। তবে রবীন্দ্রনাথের মিস্টিকদৃষ্টি জীবনদেবতার সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। কাব্যরচনার বিভিন্ন দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। বিহারীলাল ভাবধারার ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তা কাব্যকলায়

উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। তাঁর তত্ত্ব গভীর হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা রসে জমে ওঠে নি। বিহারীলাল ভাবের লীলাখেলার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন, ভাষার কলাকৌশলের চর্চায় তিনি মনোনিবেশ করেন নি বলে তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে গেছে। প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কল্যাণে এমন মূল্য লাভ করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার প্রাপ্য মনে হয় না।'

বিহারীলাল মনের কথাকে প্রথম মনের মত করেই বলেছিলেন। এতে অনাড়ম্বর স্বভাবের প্রকাশ ঘটেছে যা গীতিকবিতার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু সহজভাষণে অমিত আবেগের প্রভাবে যথেচ্ছভাষী হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর কাব্য কবিভাবনার শিল্প-বাহক হিসেবে সম্পূর্ণ অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে নি বলে মনে করা হয়।

ড. সুকুমার সেনের মতে, 'বিহারীলালের কবিত্বে প্রসাধনের সজ্জা নাই ভাবের প্রকাশ আছে। তাই তাঁহার কাব্যসৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত, অন্তরঙ্গ এবং তাঁর জীবনচেষ্টার অঙ্গীভূত।...হৃদয়াবেগের প্রবলতা ফেনোচ্ছ্বসিত হওয়ায় বিহারীলালের কাব্যের কাজ তলাইয়া গিয়েছে এবং প্রায়ই স্পষ্ট ও সুসংহত হইতে পারে নাই।'

কবি বিহারীলাল নারীবন্দনার যে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছেন তা বাংলা কাব্যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুত পক্ষে, এই নারীবন্দনা উনিশ শতকের গীতিকাব্যের একটি সাধারণ লক্ষণ। বিহারীলালকর্তৃক এর সূচনা এবং পরবর্তী অনেকের মধ্যেই চলে তার অনুসরণ। বিহারীলালের সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার নারীবন্দনাসূচক 'মহিলা' কাব্য রচনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও গোবিন্দচন্দ্র দাসের বিভিন্ন কাব্যে নারীবন্দনার পরিণত নিদর্শন বিদ্যমান। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'গৃহলক্ষ্মী' কবিতায় নারীর গুণগান করা হয়েছে :

প্রিয়ে, কি মধুর মনোহর মূরতি তোমার!
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার!
সদা যেন ঘরে ঘরে
কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেব-বীণা বাজে সারদার!
ধাইয়ে হরষ-ভরে
কল-কোলাহল করে,
হাসে খেলে চারিদিকে কুমারী-কুমার!
হয়ে কত জ্বালাতন,
করি অন্ন আহরণ,
ঘরে এলে উবে যায় হৃদয়ের ভার!
মরুময় ধরাতল,
তুমি শুভ-শতদল,
করিতেছ ঢলঢল সম্মুখে আমার!
ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে রাখি,
ভোর হয়ে বসে থাকি

নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার।—
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোকগে এ বসুমতী যার খুশি তার।

আধুনিক গীতিকবিতার পথে বিহারীলাল ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি নিজের মনের আবেগ আকৃতি দিয়ে পথের বাধা দূর করেছেন, তাকে সুগঠিত করতে পারেন নি।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

সংস্কৃত, বাংলা ও ফারসি ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭-১৯০৫) ছিলেন 'সংবাদ প্রভাকরের' লেখক। তিনি 'ঢাকা প্রকাশ' ও 'কবিতাকুসুমাবলী' নামক পত্রিকাগুলোরও সম্পাদক ছিলেন। যশোর জেলা স্কুলের হেডপণ্ডিত হিসেবে তিনি চাকরি করেছেন। সেখানে বাংলা-সংস্কৃত দ্বিভাষিক পত্রিকা 'দ্বৈভাষিকীর' সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ফারসি কবি শেখ সাদী ও হাফিজের কবিতার ভাবানুবাদ 'সদ্ভাবশতক' কাব্য কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। নীতিমূলক এই কবিতাগুলো তাঁর কবিখ্যাতির প্রধান কারণ। কিছু গদ্যরচনাও তাঁর ছিল। তাঁর 'সদ্ভাবশতক' কাব্যটি নীতিকবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ফারসি থেকে ভাব গ্রহণ করা হলেও কবির অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি এতে যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে। এতে বহু পংক্তি প্রবাদ বাক্যের মত তত্ত্ব কথার বাহন হিসেবে যুগ যুগ ধরে সমাদৃত হয়ে আসছে। তাঁর এ ধরনের কবিতার একটি নমুনা :

কি কারণ, দীন! তব মলিন বদন ?
যতন করহ লাভ হইবে রতন।
কেন পান্থ! ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ ?
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?
মনে ভেবে বিষম-ইন্দ্রিয়-রিপু-ভয়,
হাফেজ, বিমুখ কেন করিতে প্রণয় ?

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

বাংলা গীতিকবিতার ধারায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৩৮-৭৮) কবিপ্রতিভা বিকশিত হয়েছে 'মহিলা কাব্য' (১৮৮০) নামক একটি অসমাপ্ত গ্রন্থের মাধ্যমে। কবি বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের আদর্শানুসারে তিনি 'মহিলা কাব্যের' পরিকল্পনা করেন। এখানে কবি নারীর তিনটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন—মাতা, জায়া ও ভগ্নী— এই তিনটি অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে। কবির মতে সংসারের অপূর্ণতার বেদনা বিদূরিত করার জন্যই বিধাতাকর্তৃক কল্যাণময়ী নারীর সৃষ্টি। 'মহিলা কাব্যে' কবির এই মনোভাবেরই প্রকাশ লক্ষণীয়। কবি মনে করেছেন, নারীপ্রকৃতি আত্মোৎসর্গের যে স্তরে উন্নীত হয়েছে, নরপ্রকৃতি যখন সে স্তরে উন্নীত হবে তখনই ভূতলে স্বর্গ নেমে আসবে। কবির ভাষায় নারীসৃষ্টির প্রেক্ষিত :

পূজিবার তরে ফুল ঝরে পড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধমুখে কুরঙ্গিনী মুগ্ধ মুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে!
স্পর্শে পদরাগ ভরা,
অশোক লভিল ধরা;
এল-কেশে কে এল রূপসী!—
কোন্ বন-ফুল কোন্ গগনের শশী।

সুরেন্দ্রনাথের কাব্যে সংস্কৃতানুযায়ী উপমা, রূপক ও অনুপ্রাসের ব্যবহারে বিশিষ্টতা বিদ্যমান। ক্লাসিক্যাল রীতির মননশীল দৃঢ়তা এবং শ্রদ্ধান্বিত ভাবসংযমের মাধ্যমে কবি নারীসৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। রোমান্টিক ভাবকল্পনার ক্ষেত্রে কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন কবি বিহারীলালের অনুসারী। বিহারীলালের আবেগ-সমৃদ্ধ কল্পনার শক্তি সুরেন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু শিল্প নির্মাণে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অধিকতর সচেতন। সেজন্য রূপকল্প, ছন্দ, শব্দ প্রয়োগ সব ক্ষেত্রেই কবির কৃতিত্ব লক্ষ করা যায়।

সুরেন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনাও রয়েছে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'ষড়ঋতু বর্ণনা' বাল্যরচনা। 'সবিতাসন্দর্শন', 'ফুল্লরা' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত কাব্য। তিনি টডের 'রাজস্থান কাহিনি'র বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। 'বিশ্বরহস্য' তাঁর অন্য একটি গদ্যগ্রন্থ। 'হামির' মৃত্যুর পরে প্রকাশিত নাটক।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। দার্শনিক আলোচনায় তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল,—তাঁর কাব্যে সে পরিচয় প্রকাশমান। একান্ত নিজস্ব ভঙ্গি এবং ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের জন্য তাঁর কাব্যসাধনা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) নামক কাব্যের মাধ্যমেই তাঁর বিশেষ খ্যাতি আসে। কাব্যটি মনোজগতের রূপক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' আধ্যাত্মিক কাব্য নয়, পুরাপুরি সাহিত্য রসময় কাব্য। স্বপ্নজগতে পরিভ্রমণের চিত্রসম্বলিত এই কাব্যে ছন্দ ও ভাষার অসঙ্কোচ প্রকাশ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যের কবিতার একটি নিদর্শন :

'রম্য এসে উপবন।'
কহে কবি তখন,
ফিরাইয়া নয়ন
চৌদিক পানে।
'পুষ্প-লতা মিলি-জুলি
সমীরে হেলি দুলি,
করিছে কোলাকুলি
অভেদ প্রাণে।

পথ দিব্য দেখা যায়
জ্যোৎস্নার কৃপায়,
হেলিয়া তরু, তার
ছায়া বিছায়!
নিকুঞ্জে ডাকিছে পিক,
নিভৃত চারিদিক,
নয়ন অনির্মিক,
ফিরান দায়।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' তাঁর ধর্মসম্পর্কিত রচনা। 'যৌতুক ও কৌতুক' নামক গ্রন্থটি একটি গাথাকাব্য। এর কাহিনি রূপকথার মত সরল ও কৌতুকাবহ। তিনি ব্যঙ্গকবিতা রচনায়ও দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক আখ্যায়িক কাব্য ও গাথাকবিতা রচনার ধারার প্রবর্তন করেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৯১৮)। তিনি এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণের রচনায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তাঁর প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ কাহিনিকাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত হন। অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী অক্ষয় চৌধুরী কাব্য ব্যতীত সঙ্গীতশিল্পেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। 'উদাসিনী' নামক কাহিনিকাব্য, ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস অবলম্বনে 'ভারতগাথা', ইংরেজ কবি পোপ-এর কাব্য অবলম্বনে 'মাধবমালতী কাব্য' প্রভৃতি তাঁর রচনা। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মবিস্মৃত সৌন্দর্য-স্বপ্নাকুলতা। তাঁর কাব্যে স্বপ্ন-সুরভিত প্রেম সৌন্দর্যের রোমান্টিক পিপাসা গীতমূর্ছনায় তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে।

সারল্য ও স্বচ্ছতা অক্ষয়কুমার চৌধুরীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ইংরেজি সাহিত্যেও তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল। গীতিকবিতার অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ তাঁর কাব্যে বিরল নয়। যেমন :

দেখিব বিকায়ে হিয়ে
পরাণ-সর্বস্ব দিয়ে
গম্ভীর সাগর-প্রেম পাওয়া কিনা যায়!
দেখিব এ দগ্ধ হৃদি নাহি কি জুড়ায়!
না জুড়াক মন প্রাণ,
নাই পাই প্রতিদান,
জ্বলন্ত যাতনে হৃদি হোক দগ্ধপ্রায়,
তবুও উজানে ফিরে
যেতে সাধ হয় কিরে!
প্রাণ মন বিসর্জিয়ে রহিব হেথায়,
যাহাতে মিশেছি প্রেমে মিশিব তাহায়।

স্বর্ণকুমারী দেবী

আধুনিক গীতিকবিতায় কবিহৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ রয়েছে বলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কিছু সংখ্যক মহিলাকবিও হৃদয়ানুভূতি ব্যক্ত করেছেন। সাধারণত মহিলাকবিগণের কবিতায় পরিবার জীবনের কোন না কোন বেদনাময় আঘাত, প্রিয়জনের বিরহবেদনা, সংসারের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য, নিজের অদৃষ্ট ও বিধাতার প্রতি অনুযোগ—প্রভৃতি ভাবধারা রূপায়িত হয়ে উঠেছে। শান্ত সমাহিত নারীহৃদয়ের পরিচয়ও এই শ্রেণির কবিতায় স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় বোন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) মহিলা কবিগণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করেছিলেন। অবশ্য গল্প-উপন্যাস-নাটক- কবিতা-গান প্রভৃতি সাহিত্যের প্রায় সকল বিষয়েই তাঁর অল্পবিস্তর কৃতিত্ব বিরাজমান। সাহিত্যচর্চা, সংবাদপত্র পরিচালনা এবং অন্যান্য কল্যাণজনক কাজে তিনি সমগ্র জীবন বিজড়িত ছিলেন। 'কবিতা ও গান' নামক সঙ্কলন গ্রন্থে তাঁর অধিকাংশ কবিতা স্থান পেয়েছে। তাছাড়া 'গাথা' নামক কাব্য, 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্য এবং 'দেবকৌতুক' কাব্যনাট্য প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর রচিত। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের জাতীয়তাবোধ, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাব্য এবং বিহারীলালের ছন্দ স্বর্ণকুমারী দেবীর কাব্যসাধনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর 'বসন্ত-উৎসব' গীতিনাট্যের একটি জনপ্রিয় গান :

উষা। ধর্‌লো ধর্‌লো ডালা, এই নে কামিনী ফুল।
ইন্দু। তু সখি আঁচল দিয়ে তাড়া লো ভ্রমরাকুল।
উষা। উঁহু সখি মরি জ্বলি
কপোলে দংশেছে অলি॥
ইন্দু। কপোলে দংশেনি সে ত ভ্রমরারি ভুল।
উষা। মিছে, সই ফুল তুলি, ঝরে গেল পাপড়িগুলি,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা তারা যেন ছেয়েছে গাছেরি মূল।
ইন্দু। তুলি গে নলিনী ওই॥
উষা। আমি ত যাব না সই,
মৃণাল কাঁটার ঘায়ে কে বল হবে আকুল?
ইন্দু। সে ভয়ে পিছোয় কেবা তুলিতে অমন ফুল?

গোবিন্দচন্দ্র দাস

'ভাওয়ালের কবি' হিসেবে গোবিন্দ দাসের (১৮৫৬-১৯১৮) পরিচয়। গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে তাঁর জন্ম। তিনি ভাওয়াল রাজসরকারের কর্মচারী ছিলেন। কর্তৃপক্ষের অসন্তুষ্টির ফলে তাঁকে জীবনে বহু দুঃখদারিদ্র্য ও উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল এবং পরিণামে চাকরি পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে হয়। এই গ্রামীণ সহজ-কবির কণ্ঠে ক্ষুব্ধ বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছিল। নিজের হৃদয়ের সুদৃঢ় অপরাজেয়তার বশবর্তী হয়ে তিনি সামাজিক অত্যাচারের সুতীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পরিণামে তাঁকে চরম দুর্গতি লাভ করতে হয়। স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সে আমলের তরুণদের কণ্ঠে তাঁর কবিতা উচ্চারিত হত :

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়,—
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?

গোবিন্দ দাস ছিলেন স্বভাব কবি। সমসাময়িক কবিগণের ন্যায় তিনি শিক্ষিত ছিলেন না, ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর কোন যোগাযোগ ছিল না। নিজের স্বাভাবিক প্রতিভাবলে তিনি কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। 'প্রসূন', 'প্রেম ও ফুল', 'কুঙ্কুম', 'কস্তুরী', 'চন্দন', 'ফুলরেণু', 'বৈজয়ন্তী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর কবিপ্রতিভার নিদর্শন। প্রেমের কবি হিসেবে কবি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কিছুটা সামঞ্জস্য আছে। তাঁর কবিত্ব উৎসারিত হয়েছিল তাঁর যৌবনসঙ্গিনী পত্নীর প্রেমে এবং তা প্রবাহিত হয়েছিল এই যৌবন প্রেমস্বপ্নের স্মৃতিপথেই। তবু তাঁর কবিতায় প্রেমের প্রকাশ পুরাপুরি পত্নীনিষ্ট নয় এবং তাতে আছে প্রেমের স্থূল দিক তথা দেহের আকর্ষণের বেশি ঝোঁক। এ দিক থেকে গোবিন্দ দাস সমসাময়িক কবিদের থেকে স্বতন্ত্র। প্রেমের মহিমা সম্পর্কে কবি লিখেছেন :

প্রেমে পাপ হয় পুণ্য কর্ম সে কামনাশূন্য,
অধর্ম হইয়ে ধর্ম করে সে উদ্ধার;
রজকিনী চণ্ডীদাসে সে প্রেমে বৈকুণ্ঠ ভাসে,
সে কি গো কুণ্ঠিত প্রেম পাপ কুলটার?
লছমী ও বিদ্যাপতি, পুণ্যধর্ম মূর্তিমতী,
বহে স্বর্গ-সরস্বতী প্রেমে দুজনায়।
প্রেমে নিবে দৃষ্টি-অলো, করে অন্ধকার কালো,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে প্রেমে একাকার,
তাই শ্যাম শ্যামরূপ প্রেমদেবতার।

বাংলাদেশে প্রকৃতি পরিবেশ তাঁর কাব্যে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। সহজ সরল মনোভাব প্রকাশের বিশিষ্টতা তাঁর মধ্যে বর্তমান থাকলেও কাব্যের সর্বত্র সংযম এবং ভাষার সার্থক বাঁধুনি ছিল না। প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে রচিত তাঁর কাব্যের মধ্যে ছন্দ শব্দযোজনা প্রভৃতি দিক থেকে যথেষ্ট কৃতিত্বের প্রকাশ না থাকলেও সর্বত্র আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দ দাসের 'মগের মুল্লুক' নামক ব্যঙ্গকাব্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকাতে তার প্রচার বন্ধ করা হয়েছিল। কবির দেহাত্মবাদের বিদ্রোহী সত্তা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার জন্য পরিস্ফুট হতে পারে নি। হলে আধুনিক বাংলা কাব্যে আধুনিক মনস্কতার পরিচয় অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারত।

দাদ আলী

কুষ্টিয়ার কবি দাদ আলী (১৮৫৬-১৯২৭) 'ভাঙ্গাপ্রাণ', 'শান্তিকুঞ্জ', 'আশেকে রসূল', 'অন্তিমে মৃত্যু'—এই কয়টি কাব্যগ্রন্থের রচনাকারী হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এই কবি অল্পবয়সেই কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সাধক কবি নিভৃত পল্লীতে বসবাস করেও আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। তিনি সনাতন রীতিনীতি ও বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর কাব্যের উপজীব্য ছিল আল্লাহ-রাসূল, মক্কা-মদিনার প্রতি ভালবাসা, পত্নীর বিয়োগ- জনিত ব্যথা,

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি, দেশাত্মবোধ ও মানবপ্রীতি। স্ত্রীবিয়োগের ফলে রচিত 'ভাঙ্গাপ্রাণ' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কাব্যটিতে কবিহৃদয়ের গভীর বেদনার প্রকাশ ঘটেছে। আধ্যাত্মিক ভাব অবলম্বনে রচিত কবিতা সঙ্কলন 'শান্তিকুঞ্জ' বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রন্থ। 'আশেকে রসুল' রাসুলুল্লাহ্‌র জীবনের কয়েকটি ঘটনা অবলম্বনে লিখিত গীতিসমষ্টি। কাব্যটি এক সময় বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হত। মৃত্যুর কথা স্মরণ করে 'অন্তিমে মৃত্যু' কাব্যটি রচিত।

দাদ আলীর কাব্যে অনুভূতির গভীরতা থাকলেও তাতে উচ্চ ভাব ফুটে ওঠে নি।

দেবেন্দ্রনাথ সেন

বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রবর্তিত আদর্শের অনুসরণকারীদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) একজন বিশিষ্ট কবি। জীবন ও সংসার অবলম্বনে তাঁর কাব্যাদর্শ প্রকাশ পেয়েছিল। তাই নারীপ্রেমের বিচিত্র প্রকাশ তাঁর কাব্যে স্পষ্ট। বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয়ও সেখানে সহজলভ্য। বাঙালি জীবনের বাৎসল্যরস, দাম্পত্যপ্রণয়, পারিবারিক বৈশিষ্ট্য, মানবজীবনের সুখদুঃখ, মান-অভিমান প্রভৃতি তাঁর কাব্যে উপজীব্য হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দেবেন্দ্রনাথ সেন 'অশোক মঞ্জরী হইতে তাহার তরুণতা, বধূর ভূষণঝঙ্কার হইতে তাহার রহস্য চুরি করিয়া লইতে পারেন।' এই 'তরুণতা' ও 'রহস্য'কে—সেই অরূপ সৌন্দর্যের রূপ-বিভায় ব্যঞ্জিত করতে পেরেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। তিনি ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত কবিপ্রতিভার অধিকারী। তাঁর নিজস্ব রচনা রীতিরও যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। সনেট রচনায়ও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। নারীপ্রেমের অনাবিল মাধুর্য তাঁর সনেটে বিধৃত হয়েছে। যেমন :

নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে,
আধ গ্লাস জল যেন নিদাঘের কালে;
চারিধারে গুরুজন; চল অন্তরালে
দোঁহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে।
কে যেন গো কানে কানে কহিছে সোহাগে,
'আন থালা; ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়
একরাশ শেফালিকা কুড়ান কি যায়?'
শুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে।
বন্দী হয়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে
কাঁদে যবে সুকবিতা গুমরে গুমরে
মনোদুঃখে, ঘোমটার জলদ আঁধারে
তোমার ও মুখশশী কাঁদিছে কাতরে!
ছাদে চল; মুক্ত বায়ু, বহিছে তটিনী
দ্রৌপদীর শাড়ি সম সচন্দ্র যামিনী।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের ওপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বিহারীলাল উভয়েরই প্রভাব বর্তমান। 'ঊর্মিলা' কাব্য রচিত হয়েছিল মাইকেলের অনুসরণে। তাঁর মধ্যে বিহারীলালের রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনা স্বচ্ছ ও সহজ সরল ব্যঞ্জনা লাভ করেছিল। তাঁর কাব্যের মৌলধর্ম ছিল রোমান্টিক প্রণয়াকাঙ্ক্ষা। পুষ্পপ্রীতি দেবেন্দ্রনাথের প্রধান

বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রথম কাব্য 'ফুলবালা'র কবিতা ফুলবিষয়ক। 'অশোকগুচ্ছ', 'শেফালি-গুচ্ছ', 'পারিজাতগুচ্ছ', 'গোলাপগুচ্ছ' প্রভৃতি কাব্যের নামের মাধ্যমেও কবির পুষ্পপ্রীতি ফুটে উঠেছে। দেবেন্দ্রনাথ সেন আরও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থেরও রচয়িতা।

মোজাম্মেল হক

'শান্তিপুরের কবি' হিসেবে খ্যাত মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩০) আজীবন সাহিত্যসেবা করেছেন। উচ্চশিক্ষা লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর না হলেও বাংলা ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। মুসলমানদের জাতীয় জীবনের আদর্শ, ইসলামের নবজাগরণ প্রভৃতি দিক অবলম্বনে তাঁর কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। কবিতা, জীবনী, ইতিহাস, উপন্যাস ইত্যাদি নানা শ্রেণির সাহিত্য রচনায় তাঁর দক্ষতা বিদ্যমান। গীতিকবিতা সংগ্রহ 'কুসুমাঞ্জলি (১৮৮১) নিয়ে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। 'অপূর্বদর্শন' (১৮৮৫) তাঁর ঐতিহাসিক কাহিনিকাব্য। 'প্রেমহার' (১৮৯৮) তাঁর অন্যতম গীতিকবিতা সংগ্রহ। কবির অকৃত্রিম লিরিক অনুভূতি এবং দেহ সম্পর্কে অসঙ্কোচ মনোভাব এর বৈশিষ্ট্য। হযরত মুহম্মদ (স)-এর জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত 'হজরত মোহাম্মদ' (১৯০৩) কাব্যে তিনি পরিণত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। এতে ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে কবি কাব্যিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এ কাব্যে হযরতের জীবনে প্রাথমিক পর্যায় রূপলাভ করেছে। জাতীয় জীবনে জাগরণের জন্য কবি তাঁর কবিতায় নীতি-আদর্শকে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। বিদ্যাহীন জীবনের ব্যর্থতার কথা কবি এভাবে বলেছেন :

আর যেই জন মূর্খ, বিদ্যা নাহি জানে
সবে অনাদরে তায়, কেহ নাহি মানে।
সমাজের মাঝে সেই মুখ নাহি পায়,
ঘরে পরে নিন্দা করে কথায় কথায়।
বড় ক্লেশ হয় তার জীবন যাপন,
সন্তোষ কেমন সুখ জানে না কখন।
নয়ন থাকিতে মূর্খ অন্ধের সমান,
কি লেখে কেতাবে, কিছু না জানে সন্ধান।
বিদ্যার বিমল সুধা যে না পান করে,
নরাকার পশু সে ত সংসার ভিতরে।

মোজাম্মেল হক 'লহরী' নামে একটি কবিতা মাসিক প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন বিখ্যাত 'মোসলেম ভারত' নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। গদ্যরচনার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

গ্রাম্যজীবনের পরিবেশ, গ্রাম্যপ্রকৃতি, বাল্যস্মৃতি প্রভৃতি অবলম্বনে কাব্য রচনায় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। 'কবিতাহার', 'ভারতকুসুম', 'অশ্রুকণা', 'আভাস', 'শিখা', 'অর্ঘ্য', 'স্বদেশিনী', 'সিন্ধুগাথা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ' নামক নাট্যকাব্য তাঁর রচিত। তাঁর রচনায়

রসদৃষ্টি, লিপিকুশলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিরাভরণ বর্ণনাভঙ্গির পরিচয় তাঁর কাব্যে যে সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তা সমসাময়িক মহিলা কবিদের মধ্যে অনুপস্থিত। তিনি 'জাহ্নবী' নামে একটি মাসিক সাহিত্যপত্রের সম্পাদনা করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুজনিত বেদনাবোধ তাঁর কাব্যরচনার মূলে প্রভাব সঞ্চার করেছিল। গ্রামের বালিকা হয়ে বাঙালির গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি কাব্য সাধনা করেছিলেন। তাঁর আবেগের কেন্দ্রস্থল ছিল প্রধানত তাঁর স্বামী। সে আবেগ নারীসুলভ অন্তরঙ্গতায় নিবিড় হয়ে আছে তাঁর স্বভাব-কবিত্বে সুন্দর পংক্তিতে :

তুমি কি গিয়াছ চলে ? না না, তা ত নয়।
য'দিন বাঁচিব আমি, ত'দিন জীবিত তুমি,
আমার জীবন যে গো শুধু তোমা-ময়।

গার্হস্থ্য চিত্র তাঁর কাব্যে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে :

মা নাই ঘরেতে যার ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে।
চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি চাঁদে চাঁদে মেশামেশি,
স্বর্গে মর্ত্যে প্রভেদ কি আছে।

অক্ষয়কুমার বড়াল

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গীতিকবিগণের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬১-১৯১৯) আত্মময় ভাববিহ্বলতা, মিতভাষিতা, প্রকৃতি বর্ণনা প্রভৃতি দিক থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রেমের কবিতা রচনায় তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। তাঁর কাব্যে প্রেমের যে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে তাতে দেখা যায়, দূর থেকে ধ্যানকল্পনায় নারীসৌন্দর্য উপভোগ করাতেই কবির আনন্দ। এ দিক থেকে দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য রয়েছে। তাঁর কাব্যের ওপর রবীন্দ্রনাথেরও কিছু কিছু প্রভাব বিদ্যমান। কবির হৃদয়াবেগের প্রাবল্যের বহিঃপ্রকাশের চেয়ে অন্তরের গভীর ভাবে ভাবাবিষ্ট রূপটি কবিতায় বেশি ফুটেছে। নারীপ্রেম অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতাবলীর একমাত্র বিষয়। কবির প্রেয়সী তাঁর পত্নী, কিন্তু তিনি শুধু পত্নী নন, তিনি নারী। তিনি কবির হৃদয় মথিত করে তৃপ্তির নরকে কবিচিত্তকে অতৃপ্তির খেদে জ্বালিয়েছেন। তবু তার মিলনে পরিপূর্ণ চরিতার্থতা অপেক্ষমান।

অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন কবি বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ অনুসরণকারী। বিহারীলালকে তিনি সচেতনভাবেই গুরু বলে মানতেন। কবির প্রতিভার স্বরূপ সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'অক্ষয়কুমারের কবিতা রোমান্টিক উৎকণ্ঠায় তীব্র, কোথাও বা আবার বিষণ্ণতায় উদাস হয়ে উঠেছে। দেবেন্দ্রনাথের মতই তিনি প্রেমের জগতে গৃহ-সুখ-পিপাসু। কিন্তু প্রণয়তৃষ্ণায় গৃহাশ্রয়ী হলেও, গৃহ-সীমাতেই কবিমন তৃপ্ত হতে পারে নি। ঘরের প্রেমকে অক্ষয়কুমারের কবিকল্পনা বিশ্বাভিসারী করেছে। একদিকে গৃহের নির্জন নিভৃত সৌন্দর্য-উপভোগের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বিশ্বাভিমুখিতা তাঁর সম্ভোগের মধ্যে তৃষ্ণাকে, আস্বাদনের মধ্যে অতৃপ্তিকে উৎকণ্ঠিত করে রেখেছে।'

অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্য 'প্রদীপ' (১২৯৩), 'কনকাঞ্জলি,' (১২৯২), 'ভুল' (১২৯৪), 'শঙ্খ' (১৩১৭) ও 'এষা' (১৩১৯)—এই কয়টি। 'এষা' কাব্যটি কবিপত্নীর

মৃত্যুশোকে রচিত। 'মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা'—এই বাণীই প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় প্রকাশ পেয়েছে। 'এষা' কাব্যের 'নিবেদনে' কবি লিখেছেন :

কোথা পাব বাল্মীকির সে উদাত্ত স্বর ?
কোথা কালিদাস-কণ্ঠ ষড়্জ-মধুর ?
কোথা ভবভূতি-ভাষ-গৈরিক-নির্ঝর ?
ছিন্ন-কণ্ঠ পিক আমি, মরণ-আতুর।

সে নহে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, সতী,
চিরোজ্জ্বল দেবী-মূর্তি কবিত্ব-মন্দিরে;
লয়ে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ মমতা ভকতি,
ক্ষুদ্র এক বঙ্গনারী দরিদ্র কুটিরে।

নহে কল্পনার লীলা-স্বরগ নরক;
বাস্তব জগৎ এই, মর্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাব-বন্ধ, বাক্য রসাত্মক;
মানবীর তরে কাঁদি—যাচি না দেবতা।

অক্ষয়কুমারের ভাষারীতির মধ্যে সংযম ও পরিমিতিবোধ বিদ্যমান। বাকসংযম, শব্দচয়ন ও পদলালিত্যের সঙ্গে ভাবগাম্ভীর্যের মিলন তাঁর রচনাভঙ্গির বিশেষত্ব। তাঁর কাব্যে ছন্দবৈচিত্র্যের দিকে যদিও ঝোঁক ছিল না, তবু ছন্দবিদগ্ধতার প্রমাণ অপ্রচুর নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক গীতিকবিতার ধারাটির প্রবর্তন করেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন গীতিকবিতার বেলায় ভোরের পাখির মত—তাঁর অস্ফুট বাণীতে গীতিকবিতার সূচনার ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) হাতে এই ধারাটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং একমাত্র তাঁরই বিস্ময়কর প্রতিভার অনুপম স্পর্শে বাংলা গীতিকবিতার একটি পূর্ণ পরিণতি ঘটে।

শুধু গীতিকবিতার এই বিশেষ ক্ষেত্রটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল না, সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও তিনি চরম সার্থকতা লাভ করেছিলেন। কবিতা, গান, নাটক, প্রহসন, উপন্যাস, ছোটগল্প, পত্রসাহিত্য, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ সাহিত্য প্রভৃতি সকল দিকেই তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। এই সমস্ত শ্রেণিবিভাগের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর অবদান তুলনারহিত। সুদীর্ঘ জীবনের পরিসীমায় অক্লান্ত সাহিত্যসাধনার মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যে যে সীমাহীন অবদান রেখে গেছেন তা বৈচিত্র্যে উৎকর্ষে ব্যাপকতায় সারা পৃথিবীর কবিসাহিত্যিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টিসম্ভারে রবীন্দ্রপ্রতিভা বিকশিত হলেও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যরচনারই প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। ভাবের বহুমুখীনতা থাকলেও জগৎ ও জীবনের প্রতি কবির ভালবাসা ছিল প্রবল। মর্ত্যপ্রীতির নিদর্শন তাঁর কাব্যে বিধৃত। প্রকৃতিপ্রীতি, অধ্যাত্ম অনুভূতি, মানবতাবোধ, বিশ্বজনীনতা তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিহৃদয়ের

ব্যক্তিগত অনুভূতি সর্বকালের সর্বমানবের হৃদয়ভাবের পরিচায়ক হয়ে অনবদ্য কাব্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সবটুকুকেই শিল্পে পরিণত করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রায় নিঃসঙ্গ। প্রমথ বিশীর মতে, 'আভিজাত্য নিঃসঙ্গ বাল্যকাল ও মহর্ষিভবনের inhibition. আরও একটা কারণ থাকা সম্ভব। ঠাকুরবংশ পীরালি, মহর্ষির সন্তানগণ ব্রাহ্ম; এই দুই কারণে মিলে বৃহৎ হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা করে রেখেছিল।' এই নিঃসঙ্গতার কারণে তাঁর না-কথা সাহিত্যে অপূর্ব মূর্তি লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের উন্মেষকাল থেকে আরম্ভ করে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথরেখায় যে কাব্যসাহিত্য বিকশিত হয়ে উঠেছে তার মধ্যে স্পষ্টত কয়টি পর্ববিভাগ নির্দেশ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) কাব্যগ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ফুটে উঠেছিল। অবশ্য এই কাব্যের পূর্ববর্তী সময়ের কিছু কিছু নিদর্শন থাকলেও সেগুলোকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই গুরুত্বপূর্ণ রচনা হিসেবে বিবেচনা করেন নি। প্রাচীনতম রবীন্দ্র পদ্য রচিত হয়েছিল সাত-আট বছর বয়সে। তা 'করুণাময়ী বিলুপ্তি দেবী' গ্রাস করেছিল। বার বছর পূর্ণ হওয়ার মুখে লেখা 'পৃথিরাজ পরাজয়' কাব্যটিরও একই অবস্থা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বনামাঙ্কিত প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার' ১৮৭৫ সালে হিন্দু মেলায় পঠিত এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখের দ্বিভাষিক 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। কবির লেখা প্রথম মুদ্রিত কাহিনিকাব্য 'বনফুল'। তারপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় গীতিকাব্য সংকলন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', গাথাকাব্য 'ভগ্নহৃদয়', গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' এবং নাটক 'রুদ্রচণ্ড'। এসবই কবির অপরিণত রচনা এবং কুড়ি-একুশ বছরের বয়ঃসীমায় রচিত। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে রবীন্দ্রকাব্যসাধনার প্রথম পর্বের সূত্রপাত এবং 'প্রভাতসঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল'—এই কয়টি কাব্যের মাধ্যমে তা বিকাশ লাভ করে। প্রাথমিক কাব্যসাধনার অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই পর্বের কাব্যের মধ্যে প্রকাশমান। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে।' এ সময়টাই অপরিণতির অঙ্কুর অবস্থা থেকে কবির প্রতিভা শতদলের প্রথম উন্মেষকাল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' গোধূলির বিষাদ, 'প্রভাতসঙ্গীতে' নব-জাগরণের আনন্দকাকলি, 'ছবি ও গানে' গভীর অনুভূতির সঙ্গে রং ও সুরের খেলা এবং 'কড়ি ও কোমলে' প্রধানত রূপবিহ্বলতার মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মতর অনুভূতির উন্মেষ কবিমানসের অগ্রগতির স্তরগুলো সূচিত করে। 'প্রভাত-সঙ্গীতের' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিতে কবি প্রতিভার প্রথম নিদ্রাভঙ্গ। যেমন :

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যে জগৎ ও জীবনের প্রতি কবি নিবিড় আকর্ষণের পরিচয় দিলেন :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

'মানসী' কাব্যগ্রন্থ থেকে দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা' প্রভৃতি কাব্য অবলম্বনে এই পর্বের বিকাশ। রবীন্দ্রমানসের নিঃসন্দিগ্ধ স্বরূপবিকাশই এই পর্যায়ের বিশেষত্ব। কবির মনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে এই পর্যায়ে কবিহৃদয়ের রোমান্টিক কল্পনা ও বিশিষ্ট জীবনদর্শন, বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলনাকূতি, জীবনদেবতার লীলাচেতন, প্রেমভাবনার অতীন্দ্রিয়তার উন্নয়ন প্রভৃতি বহু বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। এই পর্বে কবিমনের বিভ্রান্তি বিদূরিত হয়েছে; কবি জগৎ ও জীবনের প্রতি আত্মিক আকর্ষণ উপলব্ধি করেছেন। 'মানসী' প্রেমের কাব্য। রবীন্দ্রনাথের দেহাতীত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় 'মানসী' কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় :

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে
শতদল উঠিতেছে ফুটি—
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য বিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের॥

মানসী কাব্য থেকেই ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র প্রতিভার বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। কবি লিখেছেন, 'মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে।' এ পর্যায়ে কবি যুক্তাক্ষরকে পূর্ণ মূল্য তথা দুই মাত্রার ধরে ছন্দকে নতুন শক্তি দান করলেন। ড. ক্ষুদিরাম দাস এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'খাঁটি বাংলায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনায়াস স্ফুরণের যে প্রাথমিক চপলতা তা 'মানসী'র কতকগুলো কবিতায় প্রাপ্তব্য।'

'সোনার তরী'র কবিতায় অসীম অভিসারী মগ্নচেতন কবিমনের উন্মোচন-আকাঙ্ক্ষাই রসরূপ লাভ করেছে। সোনার তরীই কবির প্রথম কাব্য যেখানে একটিমাত্র সামগ্রিক কবিমনোঋতু সংহত অখণ্ড ধারায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

'সোনার তরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় জগতের সৌন্দর্যপিপাসু কবিমানসের পরিচয় প্রকাশ করে কবি জানিয়েছেন :

ইচ্ছা করে, বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরা ধারা নব নব স্রোতে।

আর মর্ত্যপ্রীতির বৈশিষ্ট্য 'চিত্রা' কাব্যের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় :

স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক্ সুখে-দুখে-অনন্ত-মিশ্রিত
প্রেমধারা অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি।

'চিত্রা'য় জীবনদেবতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ কবিহৃদয়ের বিচিত্র পরিচয় দান করেছেন। 'কল্পনা' কাব্যে কবি অতীতের সৌন্দর্যপ্রীতি ও মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয় এবং 'ক্ষণিকা'য় শেষবারের মত জীবনের তুচ্ছ দিকের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার পরবর্তী পর্ব অধ্যাত্মভাবপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা চলে। 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' প্রভৃতি এই পর্বের কাব্যগ্রন্থ। কবির জীবনদেবতার কল্পনা এই পর্যায়ে প্রকাশমান। তাছাড়া, জগৎ ও জীবনের মাধ্যমে ভগবৎ উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যও এই পর্বের কাব্যে ফুটে উঠেছে। কবি ভগবানকে কোন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট পূজানুষ্ঠান বা রূপধ্যানের মাধ্যমে অনুভব করেন নি, বরং উপলব্ধি করেছেন প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপের মধ্যে তাঁর চকিত প্রকাশে, এক ক্রীড়াশীল অদৃশ্য সত্তার মুহুর্মুহু আবির্ভাব-অন্তর্ধানলীলার লুকোচুরিতে, কখনও কখনও একান্ত বিহ্বল আত্মনিবেদনের মাধ্যমে। ভগবদভক্তি, প্রকৃতিপ্রীতি প্রভৃতি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য এই সমস্ত কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মুক্তি সংসার পরিত্যাগ করে নয় বলে 'নৈবেদ্য' কাব্যের 'মুক্তি' কবিতায় কবি বলেছেন, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।' নৈবেদ্য কাব্যের কবিতার মধ্যে অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য কবির প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। তিনি ভগবদুপলব্ধির জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। কবিকে সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, দুঃখে-দৈন্যে অবিচলিত, ন্যায়ে কর্তব্যে কঠোর করার জন্য কবি স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিবেদন করেছেন। 'খেয়া' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক কবিতার শুরু। বিচিত্র রস-প্লাবনের মধ্য দিয়ে অসীমের লীলা চঞ্চল অনুভূতির প্রকাশ—মিস্টিক কবিতার এই লক্ষণ খেয়া কাব্যে রূপ লাভ করেছে। গীতাঞ্জলি কাব্য রচনা করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভগবৎ প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ কাব্যের জন্য কবি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করার গৌরব অর্জন করেন। গীতাঞ্জলি কাব্যে কবি দেখিয়েছেন যে, বিধাতা বিচিত্র রূপে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করছেন। কবি তাঁর আনন্দময় লীলার স্পর্শ লাভ করেন। কখনও 'দুঃখের বেশে', কখনও শরৎ প্রভাতে

'নয়ন-ভুলানো রূপে', 'ঝড়ের রাতে পরাণসখা বন্ধু' রূপে, কখনও 'সাপ খেলানো বাঁশি' হাতে বিদেশী রূপে—কত না বিচিত্র ভাবে কবি জীবনে তাঁর প্রকাশ ঘটেছে।

'বলাকা', 'পূরবী', 'মহুয়া' প্রবৃতি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে চতুর্থ পর্ব বিকাশ পেয়েছে। কবির নতুন জীবনদর্শনের পরিচায়ক এই কাব্যগ্রন্থগুলোর মাধ্যমে জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের উচ্ছলতা অতিবাহিত হয়ে পরিণত বয়সের স্থৈর্য ফুটে উঠেছে। 'বলাকা' কাব্যে কবি প্রথম মহাযুদ্ধের ভাবালোড়ন, এর জীবন সমীক্ষার নতুন প্রেরণা, এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশে মানবমনের দুরূহতর প্রয়াস ও আদর্শনিষ্ঠার কথা গভীরভাবে অনুভব করেছেন এবং তাঁর ছন্দরীতির পরিবর্তনে এই ভাবান্তর প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এ কাব্যে কবি গতিবাদের কথা ব্যক্ত করেছেন। কবি উপলব্ধি করেছেন, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিরন্তর পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছে। এই গতিই সৃষ্টির মর্মবাণী। 'বলাকা' কবিতায় হংসবলাকার পাখার চাঞ্চল্যে সে বাণী রূপান্তরিত হয়েছে :

মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশেহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

'মহুয়া' কাব্যটি রচিত হয়েছিল বিয়ে উপলক্ষে উপহার দেওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্যে। কিন্তু এতে সে উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে কবির প্রেমানুভূতির স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে। মহুয়ার প্রেম দেহমনের ঊর্ধ্ব স্তরের এবং মানব জীবনে তার মাহাত্ম্য সম্পর্কে ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। তবে কোথাও কোথাও রক্তমাংসের নরনারীর হৃদয়ের উষ্ণতাপও অনুভব করা যায়।

পঞ্চম পর্ব কবির গদ্যছন্দে রচিত কাব্যগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। কবি এই পর্যায়ে তাঁর চিরাচরিত পন্থা অনুসরণ না করে কাব্যে একটি নতুন পথের অভিযাত্রী হলেন। কাব্যের অন্ত্যমিলের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করে গদ্যছন্দে কবি কাব্য রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা' গদ্যগ্রন্থে এই জাতীয় নতুন ছন্দের পরীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন এবং পরবর্তী কাব্য 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'—এই চারটি গ্রন্থে এই ছন্দে রচিত কবিতা বিধৃত। বাংলা ছন্দের মুক্তি সাধনার্থে রবীন্দ্রনাথ যে সব ছন্দের সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে এই শ্রেণির গদ্যছন্দ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই পর্বের কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কোন দার্শনিক তত্ত্ব, জীবনবীক্ষণের কোন বিশেষ রকমের মৌলিকতা কাব্যসৌন্দর্যের মুখাপেক্ষী না হয়েই নিজ ভাবগরিমা বলে পাঠকহৃদয় স্পর্শ করে। এগুলোর মধ্যে কাব্যকলার বিশেষ পরিচয় না থাকলেও এদের বিষয়গৌরব ও কল্পনার মোহনীয়তা সে অভাব পূরণ করেছে। গদ্যছন্দে রচিত কাব্যগুলোতে ভাষা ও ছন্দের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে। এতদিন কাব্য

প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতখানি দূরে ছিল এখন তা আর রইল না। 'পুনশ্চ' কাব্যের কবিতায় এর সমর্থন মিলে। যেমন :

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে॥
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আটি আটি খড় বোঝাই করে ;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে ;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা ;
আর, মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

কবির পরবর্তী কাব্যগুলো শেষ পর্বের নিদর্শন। 'প্রান্তিক', 'আকাশ প্রদীপ', 'সেঁজুতি', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এই শ্রেণিভুক্ত। এদের কতকগুলোর মধ্যে শৈথিল্যপূর্ণ কবিকল্পনা সহজ সরল ছন্দ সহকারে প্রকাশ পেয়েছে। এই সব কাব্যের মাধ্যমে মরণের উপকূলে দাঁড়িয়েও কবি নতুন চিন্তা ও অনুভূতিকে আত্মসাৎ এবং নতুনছন্দে তা রূপায়িত করেছেন। শেষ পর্বের কাব্যে কবি পূর্ববর্তী কাব্যসমূহের ভাবধারাকে অভিনবত্ব দান করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত রবীন্দ্র-সমালোচক আবু সায়ীদ আইয়ুব মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, 'পূর্বোক্ত ভাবগুলোকে মাত্রায় ও গুণে, অনুভব ও অভিব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পর্বের কাব্যে এমন এক স্তরে তুলে দিয়েছেন যাকে নতুন বলে অভ্যর্থনা করতেই হয়।'

'শেষ লেখা' রবীন্দ্রনাথের শেষ রচনা। কাব্যটি কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। জীবন-মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে কবির অনুভূতি এ কাব্যে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিল। জীবনের সত্য দ্রষ্টা ঋষির মত কবি এখানে হ্রস্ব, কঠিন ও তেজোগর্ভ বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

উপরোক্ত পর্ববিভাগ প্রধানভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক কাব্যসাধনার মধ্যে পর্ববহির্ভূত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থও রয়েছে। ব্যাপক প্রতিভার বহুমুখী বিকাশের জন্য রবীন্দ্রকাব্যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে যা সাধারণ শ্রেণিনির্ণয়ের ব্যাপারে বিবেচ্য হতে পারে না; পৃথকভাবেই এদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান।

প্রসঙ্গক্রমে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : 'বিষয়ের নানামুখীনতায়, রচনার বিষয়োপযোগী পরিবর্তনে, কাব্যের আঙ্গিকের বিচিত্র রূপে, কল্পনা ও মনোভঙ্গির নব নব প্রকাশে, মননসূত্রের দৃঢ়তায়, ভাব ও রূপের নিবিড় একাত্মতায় রবীন্দ্রকাব্য বিপুল বিরাট বিস্ময়কর ও বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। গীতিকবিতা, গান, আখ্যানকাব্য, জীবনব্যাখ্যান ও অধ্যাত্ম অনুভূতিমূলক কাব্য, নাট্যরসপ্রধান কাব্য, লঘু কল্পনা ও হাস্যরসিকতা আশ্রয়ী কাব্য ইত্যাদি কবিতার প্রায় সব রকম প্রকরণেই তিনি সমান কুশলী।'

রবীন্দ্রকাব্যে জগৎ ও জীবনের কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কবিজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আবু সয়ীদ আইয়ুব লিখেছেন, 'শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ যেমন অত্যধিক ছিল, জাগতিক দুঃখ ও পাপের মাত্রাও তেমনি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। তখন যদিও তাঁর মন বহু নিরুত্তর প্রশ্নে বিক্ষুব্ধ ও হতাশায় ভারাক্রান্ত ছিল তবু তিনি তাঁর সহজাত মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য হারান নি। নটরাজের ধ্যান তাঁকে একপ্রকার বৈরাগ্যমাখা স্থিত প্রজ্ঞ প্রশান্তি দিয়েছিল; অন্যদিকে মানুষের অপরাজেয় শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনায়, বিশ্বাস তাঁকে তিক্ত নৈরাশ্যের কবল থেকে রক্ষা করেছিল মৃত্যুদিন অবধি। 'নির্বাচিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে' যেমন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন 'নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী', তেমনি দুই মহাযুদ্ধে নির্বাপিত-প্রায় মনুষ্যত্বের ভস্মস্তূপে দেখতে পেয়েছিলেন চিরমানসে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের সুদীর্ঘ সময় কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর সৃষ্টিসম্ভার ছিল বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষে অনন্য। নানা রূপে নানা রসে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টির নিরন্তর প্রবহমান গতিবেগে কবি নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। জীবন ও জগতের বিচিত্র রূপ তাঁর কাব্যের উপজীব্য হয়েছে। তাঁর কবিপ্রতিভার বিকাশ ছিল বহুমুখী এবং সৃষ্টিতে ছিল বৈচিত্র্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) জন্ম কৃষ্ণনগরে। এম. এ. পাশ করে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য সরকারি বৃত্তি নিয়ে তিনি বিলাত গমন করেন। বিলাত থেকে ফিরে প্রথমে সেটেলমেন্ট অফিসার এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করেন।

নাট্যকার হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিষ্ঠা অধিক হলেও হালকা ছাঁদে রচিত কবিতা ও গানে তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা নিয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আগমন। 'আর্যগাথা', 'মন্দ্র', 'আলেখ্য', 'ত্রিবেণী', 'হাসির গান' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ তাঁর রচিত। এই সব রচনায় কৌতুকরসের প্রাধান্য এবং ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম সমসাময়িক কবিগোষ্ঠীর চেয়ে তাঁকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছিল। স্বদেশী গানের রচয়িতা হিসেবেও তাঁর বিশেষ পরিচয় উল্লেখযোগ্য। 'হাসির গানের রাজা' হিসেবে তাঁর খ্যাতি নাটক রচনাকারীর চেয়েও বেশি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জীবনের বহু বিচিত্র বিষয়কে তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপের উপজীব্য করেছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল প্রধানত গীতিকবির। ব্যঙ্গকবিতা ও হাসির গানের আকারে তাঁর এ ধরনের প্রতিভার সার্থক বিকাশ ঘটেছিল। কখনও তাঁর আবেগ-প্রবাহ রোমান্স-স্বপ্নঘন গান ও কবিতার আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বাক্-প্রতিমা নির্মাণে ও ছন্দশৈলী রূপায়ণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নতুনত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা কাব্যে তা ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। স্বীয় ধর্ম ও স্বসমাজকেও তিনি পরিহাসের বিষয় বিবেচনা করতে পেরেছিলেন। 'গীতা আবিষ্কার' কবিতা থেকে তার নিদর্শন হিসেবে কিছুটা অংশ উল্লেখ করা যায়। যেমন :

সকাল বেলায় অফিস গিয়ে গাধার মত খাটি,
নিত্য নিত্য প্রভুর রাঙা পা দুখানি চাটি;

বাড়ি ফিরে—বন্ধুবর্গ জড় হলে খালি,
যাঁদের তরে ভরণ-পোষণ, তাঁদের পাড়ি গালি;
একা হলে (হায়রে কপাল জোটেও না দড়ি!)
বুঝি বা সে না-ই বুঝি—গীতাখানি পড়ি॥
আমার গীতাখানি পড়ি।

কবিতার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিভার বিকাশ হয়েছে ভাষা ও ছন্দের মধ্যে দুঃসাহসিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে। তাঁর ভাষা গদ্যঘেঁষা এবং ছন্দে আছে শৈথিল্য। যত্নহীনতা তাঁর কাব্যশিল্পকে উৎকর্ষের পর্যায়ে স্থান দিতে পারে নি। তাছাড়া শব্দনির্বাচনেও তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে প্যারডি রচনায় তিনি পথিকৃৎ।

মানকুমারী বসু

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) স্বামীর অকালমৃত্যুতে ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ 'প্রিয়প্রসঙ্গ' ও 'বনবাসিনী' কাব্যগ্রন্থদুটি রচনা করে-ছিলেন। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'কনকাঞ্জলি' প্রভৃতি। তিনি অভিমন্যুর কাহিনি নিয়ে 'বীরকুমারবধ' নামে একটি কাহিনিকাব্য রচনা করেছিলেন। নিজের জীবনের বেদনাতুর দিকটির জন্য তাঁর কাব্যে বেদনার সুর ফুটে উঠেছে। সমালোচকের ভাষায়, 'মানকুমারী বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো বেদনার কথা কইত এবং কান্নাভেজা প্রেমরসসিক্ত কবিতাগুলি তাঁরই জীবনের দ্বারোন্মোচন করত।' ছোটবেলা থেকে মানকুমারী বসুর কাব্যরচনার যে অভ্যাস ছিল, বিয়ের পর স্বামীর উৎসাহে তা সুগঠিত হয়েছিল। বিধবা হওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁর রচিত কবিতা নারীসুলভ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে সহজ ভগবৎভক্তি ও শোকার্তির করুণায় মণ্ডিত হয়ে আছে।

ছোটগল্প রচনায়ও মানকুমারী বসু ছিলেন সিদ্ধহস্ত। চলমান জীবনের ছোটখাট ঘটনা, প্রেমপ্রীতি, হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ তাঁর গল্পের উপজীব্য। 'অদৃষ্ট চক্র,' 'রাজলক্ষ্মী', 'শোভা' প্রভৃতি গল্পের জন্য তিনি কুন্তলীন পুরস্কারে ভূষিত হন। মানকুমারী বসুর কবিতায় হালকা কথার ভঙ্গি চমৎকার ফুটেছে :

শুনিলাম, এই মাসে
যাবে তুমি পতি-পাশে
করিতে গৃহিণীপনা—ধিক মূর্খতায়।
এত শীতে নারী কেবা
করে পতিপদ সেবা,
পৌষমাসে ঘরকন্না কে করিতে চায়?
শাস্ত্রের বচন, সতী॥
শীতকালে যার পতি
রাঁধেন বাড়েন নিজে প্রফুল্ল অন্তরে ;
সেই ধন্যা নরকূলে,
লোকে তারে নাহি ভুলে,
চির সোহাগিনী জায়া শিবদুর্গা বরে।

মানকুমারী বসু সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯১৯ সাল থেকে আমৃত্যু ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মানকুমারী বসুকে সাহিত্য প্রতিভার সম্মানার্থে ১৯৩৯ সালে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক ও ১৯৪১ সালে জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে ভূষিত করে।

কামিনী রায়

গীতিকবিতার ধারায় মহিলাকবিগণের মধ্যে কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। অল্প বয়স থেকে কাব্যসাধনায় তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর কবিজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বিষয়নিষ্ঠা, নীতিচিন্তা ও উপদেশাশ্রয়—এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রকাশের মাধ্যমে তিনি পূর্বসূরীদের ধ্যানধারণার সঙ্গে সংযোগসাধন করেছিলেন। তাঁর নীতিবিষয়ক কবিতা প্রবাদের মত মর্যাদা পেয়েছে। যেমন :

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

কামিনী রায় একান্ত অকৃত্রিমতা সহকারে নারীহৃদয়ের অনুভূতির সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুজনিত বেদনাবোধ তাঁর কাব্যে প্রকাশমান। 'আলো ও ছায়া', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'পৌরাণিকী', 'অশোকসঙ্গীত', 'গুঞ্জন', 'দীপ ও ধূপ', 'জীবন পথে' প্রভৃতি কামিনী রায়ের কাব্যগ্রন্থ। সনেট জাতীয় কবিতায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। নাট্যরচনা, গল্প, জীবনী ও অনুবাদেও তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন।

কামিনী রায়ের কবিতার ভাষা সরল, সংযত ও পরিমিত। ভাবে ও ভাষায় সংযম ও শালীনতা তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। হৃদয়দ্বন্দ্বের মধ্যে নৈতিক এবং বৃহত্তর আদর্শের সঙ্গতি অন্বেষণ তাঁর কবিতার মর্মকথা। তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সংযোগ ঘটেছিল। সেজন্য তাঁর রচনা মার্জিত ও শিল্পসুষমা মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। কামিনী রায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ 'আলোছায়া'র (১৮৮৯) মাধ্যমে পাঠকের হৃদয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। সুকর্ষিত-চিত্ততার ফলে কামিনী রায়ের অকপট নারীস্বভাব তাঁর কবিতায় কাব্যিক সুষমা লাভ করেছে। কামিনী রায়ের কবিতার নমুনা :

আধেক স্বপনে, প্রিয়ে,
কাটিয়া গিয়াছে নিশি,
মধুর আধেক আর
জাগরণে আছে মিশি।
আঁধারে মুদিনু আঁখি,
আলোকে মীলিনু তায়;
মরণের অবসানে
জীবন জনম পায়।

রজনীকান্ত সেন

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) স্বদেশপ্রেম ও ভগবদ্‌ভক্তিমূলক কাব্যরচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনে তাঁর গান ছিল প্রেরণার উৎস। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গীতিকার ও সঙ্গীত শিল্পী। স্বরচিত গানের সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন তিনি। নির্মল আবেগ ও কোমল সুরের ব্যঞ্জনায় তাঁর গান ও কবিতা সমৃদ্ধ। তিনি 'কান্তকবি' নামেও পরিচিত। 'বাণী', 'কল্যাণী', 'অমৃত', 'অভয়া', 'আনন্দময়ী', 'বিশ্রাম', 'সদ্ভাবকুসুম', 'শেষ দান' প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রেরণায় তিনি হাসির গান রচনা করেছিলেন। বস্তুত কাব্যের চেয়ে গানের ক্ষেত্রে রজনীকান্ত সেনের কৃতিত্ব অধিক। স্বদেশী যুগে স্বদেশী গান লিখে রজনীকান্ত সেন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গান :

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই;
পরের জিনিস কিনবো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

রজনীকান্ত সেন সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ করেছিলেন, তৎকালীন সামাজিক সংস্কার, শিক্ষিত সমাজের বিকৃতি ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে ব্যঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্লানিমুক্ত নির্দোষ হাসির কবিতাও তিনি লিখেছেন। এদেশের ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সঙ্গে কৌতুকরসের পরিবেশনা রয়েছে 'পুরাতত্ত্ববিৎ' কবিতায় :

রাজা অশোকের কটা ছিল হাতি,
টোডরমল্লের কটা ছিল নাতি,
কালাপাহাড়ের কটা ছিল ছাতি,
এসব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।
আকবর শাহ্ কাছা দিত কিনা,
নূরজাহানের কটা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিম্বা পীনা,
এসব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

নিত্যকৃষ্ণ বসু

'সাহিত্য' পত্রিকার নিয়মিত লেখক নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫-১৯০০) 'মায়াবিনী' ও 'প্রেমের পরীক্ষা' নামক দুটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'ভবানী' তাঁর গল্পসঙ্কলন। প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা 'মায়াবিনী' কাব্যগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার ভাষা সংযত, গদ্যঘেঁষা এবং ভাব সংহত ও বস্তুনিষ্ঠ। নিত্যকৃষ্ণের কাব্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব রয়েছে।

সৈয়দ এমদাদ আলী

মুন্সীগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের দাসপাড়া গ্রামে সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৫-১৯৫৬) জন্মগ্রহণ করেন। পুলিশ বিভাগে ইন্সপেক্টর পদে তিনি চাকরিরত ছিলেন, কিন্তু তা তাঁর কাব্যসাধনায় কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। সাহিত্যসাধনার মাধ্যমে কল্যাণের আদর্শ তিনি প্রতিফলিত করেছেন। যেমন :

এ জগতে যাহা কিছু মহান উদার
তাহারেই লও সাথী করে,
যাহা কিছু পবিত্রতা মাখানো হেথায়,
লও তারে তুমি নিজ ক্রোড়ে।

ইসলামি মানবতাবাদের আলোকে মানুষের মঙ্গলকামনায় তাঁর কবিমানসের বিকাশ ঘটেছিল। তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি কামনা করেছেন এবং মুসলমান সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন ছিল তাঁর লক্ষ্য। প্রথম ঈদের কবিতা লিখে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

'নবনূর' নামে একটি সাহিত্য মাসিক পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় কিছুকাল প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থের নাম 'ডালি' (১৯১২)। তিনি 'তাপসী রাবেয়া' নামক একটি জীবনীগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। পত্রোপন্যাস 'হুজেরা' তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ। কর্মদক্ষতার জন্য কবি সরকারের কাছ থেকে খান সাহেব উপাধি পেয়েছিলেন।

শেখ ফজলল করিম

রংপুর জেলার কাকিনা গ্রামে শেখ ফজলল করিমের (১৮৮২-১৯৩৬) জন্ম। অল্প বয়স থেকেই তাঁর কবিত্বশক্তির বিকাশ ঘটে। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। 'সরল পদ্যবিকাশ' তাঁর এগার বছর বয়সের রচনা। কাব্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি হযরত মুহম্মদের (স) জীবনকাহিনি অবলম্বনে 'পরিত্রাণ' নামক একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। সাহিত্য সাধনায় তিনি একনিষ্ঠতার পরিচয় দান করেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে 'বাসনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করা তাঁর কৃতিত্বের নিদর্শন। 'তৃষ্ণা', 'ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি', 'গাঁথা' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। 'লায়লী মজনু' তাঁর উপন্যাস। এছাড়া তিনি জীবনী ও শিশুতোষ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শেখ ফজলল করিমের কবিতায় নীতিকথা আছে, আছে উপদেশ। তাঁর কোন কোন উজ্জ্বল পংক্তি চিরন্তন আবেদন ব্যক্ত করে। তাঁর কবিতার একটি নিদর্শন :

কোথায় স্বর্গ ? কোথায় নরক ? কে বলে তা বহুদূর ?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ-নরক—মানুষেতে সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি-প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।

শেখ ফজলল করিমের ভাষা অত্যন্ত সরল ও সাবলীল। নদীয়ার সাহিত্য সভা তাঁকে সাহিত্যবিশারদ উপাধি দানে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি জানিয়েছিল।

মুন্সী মুহম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমদ

সমাজহিতৈষী রিয়াজউদ্দিন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) অনেকগুলো পত্রপত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন মুসলমান সমাজকে গড়ে তোলার জন্য যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কাব্যরচনায়ও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'কৃষকবন্ধু' তাঁর কাব্যগ্রন্থ। এতে তাঁর সমাজসংস্কারক মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসেবে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি অনেক পত্রপত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। 'পদ্যপ্রসূণ' (১২৮৭ বঙ্গাব্দ) তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ। তাঁর ভাষাজ্ঞান ছিল তীক্ষ্ণ।

আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী

টাঙ্গাইলের কবি আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০) 'উদাসী' নামক সুবৃহৎ কাব্যের রচয়িতা। কাব্যটি ১৯০০ সালে প্রকাশিত। কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি এই গ্রন্থের তিন খণ্ডের প্রথমটি 'উদাসী'—প্রেমানুভূতি ও স্বাজাত্যবোধক কবিতার সংগ্রহ, দ্বিতীয়টি 'কিরণপ্রভা'—কাহিনিভিত্তিক রচনা, তৃতীয় 'অরুণভাতি' কাহিনি-ভিত্তিক প্রণয়রসের বর্ণনা। বাঙালি মুসলমান সমাজকে ইসলাম মুখী করে তোলাই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান লক্ষ্য। তিনি অনেক গদ্যগ্রন্থও রচনা করেছেন। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ছিলেন টাঙ্গাইল দেলদুয়ার এস্টেটের এক অংশের ম্যানেজার।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহচ্ছায়ায় যে সব কবি কাব্যরচনায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি। তবে তাঁর কবিমানস বিবিধ বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রকবিমানস থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষত স্বদেশী যুগের মধ্যে তাঁর কবিপ্রতিভার বিকাশ ও পরিসমাপ্তি ঘটে। তাছাড়া, তাঁর কাব্যে রোমান্সবিমুখ বস্তুপ্রাধান্য, তথ্য ও ইতিহাসপ্রীতি এবং জ্ঞানমুখী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এই সমস্ত কারণে তাঁকে বাস্তববাদী কবি বলে অভিহিত করা যায়। কবি তাঁর কবিতায় ভাবের উদ্দীপনাকে বিষয়-বিবৃতির সীমায় সংবৃত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি কবিতার রূপপ্রকৃতির প্রতি সচেতন ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ছন্দের কারুকুশলতার ওপরে তাঁর ঝোঁক কম ছিল না। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় তিনি গীতিকবিতার জগতে ছিলেন জ্ঞানযোগী।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সহজ ভাষা এবং প্রসন্ন চপল ছন্দের ব্যাপারে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর কবিপ্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানী বুদ্ধির অংশ যে প্রবল ছিল তার পরিচয় মিলে কবিতায় বিষয়বৈচিত্র্যে। কবিতায় বাহুল্য তথ্যের প্রয়োগ সর্বত্র লক্ষণীয়, কিন্তু তাঁর কবিতা ভাবগম্ভীর নয়। মানবসংসারের বিস্তৃত জ্ঞানভাণ্ডারের প্রায় সকল সামগ্রীর প্রতিই কবির সজাগ কৌতূহল ছিল। প্রাচীন ইতিহাস থেকে

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান কোন কিছু তিনি বাদ দেন নি। এদেশে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়ই জ্ঞানের বিষয় ছিল প্রথম উপজীব্য। এদিক থেকে তিনি তাঁর পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের তথ্যদৃষ্টি ও জ্ঞানবিজ্ঞান প্রিয়তার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে স্বল্প সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টি রেখে গেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম : 'সবিতা', 'সন্ধিক্ষণ', 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'মণিমঞ্জুষা', 'অভ্রআবীর', 'হসন্তিকা', 'বেলাশেষের গান', 'বিদায় আরতি' ইত্যাদি। সাহিত্য রচনায় সত্যেন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কাব্য বাদ দিয়েও অন্যান্য ধরনের সাহিত্যসৃষ্টি কম কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল না। গদ্য রচনায় তাঁর উৎসাহ ছিল। গদ্যেপদ্যে তাঁর বিচিত্র রচনা 'ছন্দসরস্বতী'—এতে ছন্দের রহস্য নিয়ে ছন্দ-শিল্পী-মনের অপরূপ চিন্তা-কল্পনা বিলাস প্রকাশ পেয়েছে। 'জন্মদুঃখী' তাঁর গদ্য-কাহিনি অনুবাদ। 'রঙ্গমল্লী' অনুবাদ নাটকের সংকলন। 'ধূপের ধোঁয়া' কৌতুক নাটিকা। বিচিত্র সৃষ্টিমুখরতার নিদর্শন এসব রচনার মধ্যে বিদ্যমান।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে যে বক্তব্য রূপায়িত হয়েছে তাতে তাঁর মনের বিচিত্র ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সাধক, সেজন্য তাঁর কাব্যে বিজ্ঞানানুরাগ ও ঐতিহ্যপ্রীতির নিদর্শন বিদ্যমান। রাজনৈতিক অবস্থার বিশৃঙ্খলতা, সামাজিক অনাচার, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা—দেশের এসব দিক লক্ষ করে কবি বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যে এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। মানবিকতা, সমাজনীতি ও ধর্মবোধ তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত। মানবতাবোধের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। কবি 'সন্ধিক্ষণ' কাব্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণা দিয়েছেন :

সুবেশ রাখাল-বেশ সকল ভুলিয়া
ধন্য হও স্বদেশের কাজে;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থাণুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে।
আত্মতেজে করি ভর—
কর্মে হও অগ্রসর!
মূর্খে শুধু বলে এ 'হুজুক',
বঙ্গ ইতিহাসে আজ এল স্বর্ণযুগ।

জ্ঞানসাধকদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। দেশের ও মানুষের কল্যাণে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের প্রতি বহু কবিতায় কবি ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। প্রেমের কবিতা রচনায় কবি দক্ষতা দেখিয়েছেন। শিশুর প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে কতগুলো কবিতায়। কিছু ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতাও তিনি রচনা করেছিলেন। প্রকৃতির চিত্রাঙ্কনে তাঁর দক্ষতার নিদর্শন মিলে 'পাল্কীর গান' কবিতায় :

বৈরাগী সে,
কণ্ঠী-বাঁধা,
ঘরের কাঁখে
লেপ্‌ছে কাদা,
মট্‌কা থেকে
চাষার ছেলে
দেখ্‌ছে ডাগর
চক্ষু মেলে!
দিচ্ছে চালে
পোয়াল গুছি;
বৈরাগীটির
মূর্তি শুচি।

কবি এমনিভাবে বিচিত্র ধরনের বিষয় নিয়ে স্বীয় কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় কল্পনার লঘু লীলাই বেশি ফুটেছে। কবি ছড়ার ঝোঁকে, ছন্দের বৈচিত্র্যময় নৃত্যহিল্লোলে, চটুল শব্দের ধ্বনিময় প্রয়োগে, রং-তুলির হালকা টানে অপরূপ চিত্রাঙ্কনে তাঁর কল্পনালীলা ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলে আধুনিক যুগের রুচিবৈচিত্র্যের প্রয়োজন মিটাতে তাঁর কবিতা ছিল যথার্থই সক্ষম। কবিমনের অপরিসীম অনুসন্ধিৎসা তাঁর কাব্যে প্রকাশ পেয়ে পাঠকহৃদয়কে সে দিকে আকৃষ্ট করেছে।

বাংলা অনুবাদ কবিতার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', 'মণিমঞ্জুষা' তাঁর অনুবাদ কাব্য। এই অনুবাদগুলোর মাধ্যমে বহু দেশের বহু ভাষার প্রাচীন ও নবীন গান, ছড়া ও গীতিকবিতার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ঘটে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ কবিতাগুলো অনেক সময়ে অনুবাদের অনুবাদ। তিনি ইংরেজি ছাড়া বিদেশি ভাষার কবিতাগুলো প্রায়ই ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর ইংরেজি কবিতার কোন কোন অনুবাদে বিদেশী ছন্দের শৈলী অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা কবিতায় নতুন রূপ ও ছন্দ প্রয়োগের জন্যও অনুবাদগুলোর গুরুত্ব আছে। অনুবাদেও কবি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য নহে ইহা সৃষ্টিকার্য।'

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের মতই সমকালীন জীবনের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। স্বদেশের প্রতি আকর্ষণ তাঁর কাব্যে রূপলাভ করেছে। সমসাময়িক ইতিহাসও তাঁর অনুরাগের বিষয় ছিল। এই অনুরাগ তাঁর কবিতা রচনার পেছনে কাজ করেছে। এ প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'রবীন্দ্র কবিতায় ইতিহাসের আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা এবং ঘটনার সারাৎসার যেখানে ভাব-সুরভিভরে বিধূনিত হয়েছে—সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে ইতিহাসের বিষয়কেই প্রধানত কবিতার অবলম্বন করেছেন। কেবল বিদ্যাসাগর কিংবা গান্ধীকে নিয়ে লেখা কবিতায় নয়, 'মেথর' থেকে 'আমরা' কিংবা 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' পর্যন্ত সেই একই প্রবণতা অনবচ্ছিন্ন।'

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসম্ভারে উচ্চতর কল্পনানিষ্ঠার খুব বেশি সার্থক উদাহরণ পাওয়া যায় না। আসলে কল্পনার উচ্চশৃঙ্গে তিনি অস্খলিত পদচারণা করতে পারতেন না বলে যথার্থ কৃতিত্বের নিদর্শন তাতে অনুপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে তত্ত্বের ভারে তাঁর কবিতা দুর্বল হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও আবেগের প্রাবল্য পরিস্ফুট।

বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যথেষ্ট বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছিলেন। ছন্দের বহুবিধ কৌশল দেখানোর জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকে ছন্দের রাজা এবং ছন্দের যাদুকর আখ্যা পেয়েছিলেন। অবশ্য এই কৃতিত্বের জন্য তিনি কিছুটা নিন্দার ভাগীও হন। কারণ, ছন্দের কৌশল ফোটানোর দিকে প্রখর দৃষ্টি দিতে গিয়ে কবি কাব্যরসসৃষ্টির গুরুত্ব উপেক্ষা করেছেন। কবি সংস্কৃত থেকে এবং নানা দেশীয় ভাষার কবিতার অনুবাদ কালে লৌকিক ছন্দ নিয়ে বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। অনেক সময় তাঁর ছন্দ কবিকল্পনার বশবর্তী না হয়ে কবিকল্পনাই ছন্দের বশবর্তী হয়ে পড়েছে। শব্দসম্ভারের দিক দিয়েও সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আরবি ফারসি ও অনাদৃত দেশজ শব্দের প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যবহারে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যগুলো এভাবে উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, তিনি খাঁটি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর শব্দযোজনা যেমন গভীর ভাষাজ্ঞান ও ঐকান্তিক সাধন-সাপেক্ষ, তেমনি তা অতিশয় অর্থপূর্ণ। তৃতীয়ত, তাঁর কবিমানসে চরিত্র ও পৌরুষ বড় বেশি প্রকট হয়ে আছে। চতুর্থত, তাঁর ছন্দ-জ্ঞান ও ছন্দবোধ অতিশয় সুখকর; এবং সর্বোপরি, তাঁর রচনায় একপ্রকার সুতীক্ষ্ণ রসবোধের আত্যন্তিক সদ্ভাব রয়েছে।

বাকচাতুরী ও বাগবৈদগ্ধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য সহজেই লক্ষণীয়, বাঙালি সমাজের চটুল ও মুখর রসিকতা সহজাত শক্তিতে রূপ লাভ করেছে। যেমন :

বলব আমি 'প্রিয়া' 'প্রাণেশ্বরী'
 ছেড়ে দিয়ে 'শুনছ'? 'ওগো।' 'হ্যাঁগো';
বলতে গিয়ে লজ্জাতে হায় মরি,
 ও সম্বোধন ওদের মানায় নাকো।
ওসব যেন নেহাৎ থিয়েটারী,
 যাত্রাদলের গন্ধ ওতে ভারি,
'ডিয়ার'টাও একটু ইয়ার-ঘেঁষা,
 'পিয়ারা' সে করবে ওদের খাটো,
এর তুলনায় 'ওগো' আমার খাসা,
 যদিও,—মানি—একটু ঈষৎ মাঠো।

'বক্তব্যকে প্রাঞ্জল অথচ সুঠাম-পরিপাটি করে তোলার আগ্রহও তাঁর তথ্যবলয়িত ছন্দ-মন্দ্রিত কাব্যকলার এক বিশেষ প্রবণতা।'

কাব্যের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা ব্যাপকভাবে রূপায়িত হলেও গদ্যরচনায় তাঁর কিছু বিশিষ্টতা ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সহজ বিষয় থেকে সৌন্দর্য আহরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। 'পাল্কীর গান', 'ইলশে গুঁড়ি' ইত্যাদি কবিতায় অতি সাধারণ বিষয়বস্তুকে

আশ্চর্য সুন্দর রূপে রূপায়িত করে তুলেছেন। তাঁর কবিতায় ভাবের চেয়ে ছবি বেশি ফুটে উঠেছে। অনির্বচনীয়তার চেয়ে স্পষ্টার্থক শব্দের ধ্বনি-চঞ্চলতাময় ঝঙ্কারেরই প্রাধান্য লাভ ঘটেছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবি হিসেবে রোমান্টিক, কিন্তু সে রোমান্টিকতা ইন্দ্রিয়-চেতনা-নিহিত, অতীন্দ্রিয় নয় একেবারেই।

কাজী নজরুল ইসলাম

রবীন্দ্রযুগে যে কয়েকজন কবি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) তাঁদের অন্যতম। বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও গুরুত্ব। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতের মধ্যবর্তী সময়টুকু কাজী নজরুল ইসলামের কবিপ্রতিভার বিকাশকাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বলাকা-পূরবী কাব্যের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে। সংখ্যায় বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তখন রবীন্দ্রযুগের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের মত ও পথ অস্বীকার করার উপযুক্ত ক্ষমতা কারও ছিল না। রবীন্দ্রকাব্য সাধনার এই মধ্যাহ্ন লগ্নে নজরুলকাব্য এক পরম বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই বিস্ময়ের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। কারণ, তাঁর প্রতিভা বিকাশের প্রথম পর্যায়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আবহাওয়ার পর্যালোচনায় দেখা যায় এক অনিশ্চিত পরিবেশ আর বিশৃঙ্খল অবস্থায় শাসনযন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে এসেছে জীর্ণতা, প্রতিটি স্তরে নিপীড়িত জনগণের দীর্ঘশ্বাস দেশের বাতাস বিষাক্ত করছে; জাতীয় জীবনে তখন ঘনান্ধকারের সমাবেশ। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন সুর সংযোজন করলেন—উৎপীড়িত জনগণের প্রতি সহানুভূতির মাধ্যমে। অকৃত্রিম সহমর্মিতা তাঁর কাব্যে ও অপরাপর সাহিত্যসৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল; সেই সঙ্গে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের নির্ভয় উচ্চারণ বক্তব্যকে করেছে ব্যতিক্রমধর্মী ও শক্তিশালী। তাঁর জীবন ও সাহিত্য একসূত্রে গাঁথা। তাঁর অধিকাংশ কাব্যে স্বতন্ত্র কণ্ঠের বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আজহার উদ্দিন খানের মন্তব্য থেকে কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভার স্বরূপ অবহিত হওয়া যাবে। তিনি লিখেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব বাংলার স্যাঁৎসেতে মাটি জলো বাতাস, ছায়াঘন নিকুঞ্জে দোয়েল শ্যামার কলতানের মধ্যে দৃপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জনমদগর্বিত গজেন্দ্রের ন্যায় বিচরণ অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। রবীন্দ্রযুগে শক্তিমান কবির সংখ্যা কম নয়—প্রকৃত প্রতিভার কবিও রয়েছেন অনেক, কিন্তু নজরুল ঠিক তাঁদের জাতের নয়। শীতলতার চেয়ে গ্রীষ্মের প্রখরতার তিনি বেশি পক্ষপাতী। বাংলাদেশের জ্যৈষ্ঠ মাসে যেরূপ গুমোট-গরম, সূর্যের উত্তপ্ত কিরণে যেমন চারদিকে ঝলসিয়ে ওঠে সেইরূপের সম্পূর্ণতা নজরুল-সাহিত্যে প্রতিভাসিত। আবার দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে যেমন মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়ে ধরণীকে শীতল করে তারও সুর তার মধ্যে পাওয়া যাবে। তাঁর প্রতিভাকে সমগ্রভাবে বুঝতে হলে তাঁর কঠোর ও কোমলের, রৌদ্র ও জ্যোৎস্নার যথার্থ সমন্বিত রূপ আমাদের বুঝতে হবে। তাঁর মানসে শক্তি ও সৌন্দর্যের যথার্থ মিলন ঘটেছিল বলেই তাঁর পৌরুষ ছিল রুক্ষতাহীন এবং লাবণ্য হয়েছিল দুর্বলতাহীন।'

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যসমূহের নাম : 'অগ্নিবীণা', 'দোলনচাঁপা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'প্রলয় শিখা', 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া', 'সাম্যবাদী', 'চিত্তনামা', 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা', 'সিন্ধু হিন্দোল', 'ঝিঙেফুল', 'সাত ভাই চম্পা', 'জিঞ্জীর', 'চক্রবাক', 'সন্ধ্যা', 'নতুন চাঁদ', 'মরু ভাস্কর' ইত্যাদি। তাঁর গানের বই : 'বুলবুল', 'চোখের চাতক', 'চন্দ্রবিন্দু', 'সুরসাকী', 'জুলফিকার', 'বনগীতি', 'গুলবাগিচা', 'গানের মালা', 'গীতি শতদল' ইত্যাদি।

কাজী নজরুল ইসলাম উপলব্ধি করেছিলেন 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই—নহে কিছু মহীয়ান।' মানবের মঙ্গলসাধনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাই সমাজসেবা ও সাহিত্যসেবা তিনি একই সঙ্গে করতে সক্ষম হন। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর অতর্কিত আবির্ভাব ধূমকেতুর মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর্যায়ভুক্ত। তাঁর আগমনে সৌন্দর্য তটভূমিতে সুরক্ষিত, শান্ত নিয়ন্ত্রিত ছন্দপ্রবাহে মৃদু সঞ্চারী, পরিশ্রুত জীবনাবেগবাহী বাংলা কাব্যদেহের ওপর যেন একটা প্রলয়প্লাবন বয়ে গেল।

অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নজরুল ইসলাম বলিষ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। কবিহৃদয়ের অনির্বাণ বহ্নিজ্বালাই তাঁর প্রধান অনুভূতি। তাঁর গভীরতম চেতনায় যে ক্ষোভ, বঞ্চিতের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি বজ্রাগ্নির মত অসহনীয় উত্তাপে ফুটে উঠেছিল, তা প্রকাশ করার তীব্র আকুতিই তাঁর কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস। তাই 'অগ্নিবীণার' 'বিদ্রোহী' কবিতায় ঘোষণা করেছেন :

বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর।

নজরুল ইসলাম যে মনোভাব তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেছেন তাতে প্রমাণিত হয়, তিনি প্রথমে সৈনিক, পরে কবি। এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন তাঁর তাঁর চোখে ছিল, লেখনীতে সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের সাধনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কাব্যকে অবলম্বন করেছিলেন সংগ্রামের মাধ্যম হিসেবে। সে কারণে তাঁর রচনায় সংগ্রামী মানসিকতারই বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর সর্বস্বপণ ছিল দেশপ্রেম ও শোষণবিরোধিতা। কবির এই সংগ্রামী মনোভাবের অবসান ঘটবে সমস্ত শোষণের সমাপ্তিতে। তাই তিনি বলেছেন :

মহা—বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত!

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অন্যদের মধ্যে অনুপস্থিত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও অন্যায়ের প্রতিবাদ আছে, অসত্যের প্রতি তিনিও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নজরুল ইসলাম যত বলিষ্ঠতা সহকারে তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ করতে পেরেছেন তা অন্য কারও মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। ১৯২২ সালে 'অগ্নিবীণা' কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভার ব্যাপক বিকাশ ঘটে এবং বাংলা কাব্যের চিরাচরিত ধারার মধ্যে এক ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হয়।

কাজী নজরুল ইসলাম সম্প্রদায় বিশেষের জন্য সাহিত্যসাধনা করেন নি। সকল সম্প্রদায়—তথা সকল মানুষের জন্য তাঁর উদার অন্তরের অপরিসীম সহানুভূতি উৎসারিত হয়ে উঠেছিল। সাম্যবাদের অনুপ্রেরণা ও মানবতাবোধ তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য।

বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল ইসলামের বলিষ্ঠ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিল। সাময়িক প্রয়োজন মিটানোর দিকে তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর মধ্যে চিরন্তন আবেদন কম বলে কারও কারও অভিযোগ রয়েছে। বাঙালির নিস্তরঙ্গ জীবনে আলোড়ন আনাতেই তাঁর সার্থকতা বলে তিনি মনে করে বলেছিলেন, 'বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী।' 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় কবি স্পষ্ট করে তাঁর বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত করেছেন :

> বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে,
> দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে,
> রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা
> তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
> বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুঃখে!
> অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!
> পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
> মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
> প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটী মুখের গ্রাস
> যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ!

কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহভাবমূলক কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ করলেও অপরাপর ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রেমের কবিতা রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন। কবির বিদ্রোহভাবমূলক ও প্রেমানুভূতিমূলক কবিতা একই সময়ে রচিত। তাঁর প্রেমের কবিতায় প্রেমিক হৃদয়ের বেদনার্ত হাহাকার রূপায়িত হয়েছে। বিদ্রোহ ভাবের কবিতায় যে বলিষ্ঠতা আছে, প্রেমের কবিতায় তা নেই। বরং এখানে অশ্রুর মাধ্যমে তাঁর প্রেমের আবেদন প্রকাশমান। যেমন 'চোখের চাতকে' লিখেছেন :

> পরজনমে দেখা হবে প্রিয়!
> ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও ॥
> এ জনমে যাহা বলা হল না,
> আমি বলিব না, তুমিও বলো না।
> জানাইলে প্রেম করিও ছলনা,
> যদি আসি ফিরে, বেদনা দিও ॥

হেথায় নিমেষে স্বপন ফুরায়,
রাতের কুসুম প্রাতে ঝরে যায়,
ভালো না বাসিতে হৃদয় শুকায়,
বিষ জ্বালা-ভরা হেথা অমিয় ॥
হেথা হিয়া ওঠে বিরহে আকুলি
মিলনে হারাই দু দিনেতে ভুলি,
হৃদয়ে যথায় প্রেম না শুকায়
সেই অমরায় মোরে স্মরিও ॥

'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী' প্রভৃতি বিদ্রোহভাবমূলক কাব্যের পাশে 'দোলন চাঁপা', 'ছায়ানট', 'সিন্ধুহিন্দোল', 'চক্রবাক' প্রভৃতি প্রেমানুভূতিমূলক কাব্য গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহভাবমূলক কবিতাগুলোর মধ্যে সাময়িকতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যে পরিবেশে সেগুলো রচিত হয়েছিল তা পরিবর্তিত হয়েছে বলে হয়ত এই কবিতাগুলোর আবেদন তত প্রকটভাবে অনুভূত নাও হতে পারে; কিন্তু প্রেমানুভূতিমূলক কবিতার আবেদন চিরন্তন।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন ঐতিহ্য-সচেতন কবি। একদিকে ইসলামি ঐতিহ্যে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, অন্যদিকে হিন্দু ঐতিহ্যের পরিবেশের মধ্যে তাঁর জীবন বিকশিত হয়েছিল। তাই মুসলিম ও হিন্দু ঐতিহ্য যথাযথ স্থানে যথোপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতার শব্দ ব্যবহারে, উপমা অলঙ্কারে এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে কবির এই ঐতিহ্যপ্রীতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম ইসলামের অতীতের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়েছেন এবং সমকালীন জীবনের গ্লানি মোচনের জন্য ইসলামি চেতনার আলোকে নবচেতনা সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছেন। এজন্য অনেকে তাঁকে মুসলিম রেনেসাঁর কবি বলেও বিবেচনা করেন। মুসলমান সমাজ গতানুগতিকতায় বাঁধা পড়ে তার অন্তর্নিহিত শক্তিটুকু হারিয়ে ফেলেছিল, প্রগতির ধ্বজাবহ না হয়ে, হয়ে পড়েছিল প্রতিক্রিয়াহীন শিবির— সে সত্য কবির রচনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। এই সব সঙ্কীর্ণতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে উদ্যত হয়ে উঠেছিল কবির ব্যঙ্গবিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ তরবারি।

শব্দব্যবহারের দিক থেকে নজরুল ইসলাম বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। আরবি-ফারসি শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ তাঁর কবিতায় যত বেশি সার্থকতা সহকারে রূপায়িত হয়েছে তা অন্যদের মধ্যে দেখা যায় না। যেমন ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম কবিতায় :

নাই তা-জ
তাই লা-জ ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ!
করে তস্‌লিম হর্ কুর্নিশে শোর্ আওয়াজ
শোন্ কোন্ মুঝদা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা-মাঝ!
উরজ্ য়্যামেন্ নজ্‌দ হেজাজ, তাহামা ইরাক্ শাম
মেসের ওমান্ তিহারান—স্মরি কাহার বিরাট নাম,
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম।'

কবি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের সার্থক প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। যেখানে কণ্ঠস্বর উদাত্ত ও বলিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন ছিল সেখানে তাঁর নির্বাচিত শব্দাবলী উপযুক্ত ভূমিকা পালন করেছে। হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশের ভাষার মধ্যে আছে নম্রতা। তাঁর ভাষায় আছে তৎসম শব্দ ও বিদেশি শব্দের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ। তাঁর কবিতায় মুসলিম ইতিহাস, ইসলাম ধর্ম বা ঐতিহ্যচেতনা রূপায়ণের অনুষঙ্গ হিসেবে আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যবহার হয়েছে। তৎসম শব্দের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যে ঐতিহ্য বিধৃত তা-ও কবি অস্বীকার করেন নি।

নজরুল ইসলাম সময়ের প্রয়োজন সাধন করেছিলেন বলে কাব্যের পরিণতির দিকে তাঁর তত লক্ষ ছিল না। তাঁর অদম্য প্রাণপ্রবাহ, তাঁর বিক্ষুব্ধতা ভাবের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা আনলেও ভাবপ্রকাশের ভাষায় অসচেতনতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। মনের ক্ষোভ ব্যথাবেদনা দ্বিধাহীন চিত্তে কাব্যে রূপায়িত করতে গিয়ে কোথাও কোথাও কাব্যিক সৌন্দর্য হয়ত ক্ষুণ্ন হয়েছে। কিন্তু মানুষের মাহাত্ম্যের অকুণ্ঠ প্রকাশেই তাঁর কবিকৃতি সার্থকতর।

কাজী নজরুল ইসলামের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ মন্তব্য করেছেন, 'কবি নিঃসঙ্গ ব্যক্তি নন—কোন সমাজের বা জাতির তিনি প্রতিনিধি। নজরুল এ-যুগের বাঙালি জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রধানত জড়তার বিরুদ্ধে বারবার সংগ্রাম ঘোষণা করে ও নির্যাতিত জনসাধারণের পক্ষ সমর্থন করে; আর মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের মনে নব নব আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করে, বিশেষ করে বাংলার বা ভারতের আবহমান প্রাণধারার সঙ্গে তাদের প্রেমের নিবিড় যোগ স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে।'

নজরুল ইসলাম অসংখ্য গান রচনা করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণির গান রচনায় এবং গানের সংখ্যাধিক্যে তাঁর কৃতিত্ব নিহিত। গান রচনায় কবি বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় দিয়েছেন। বিদেশী সুর ও ছন্দে তাঁর বক্তব্যকে ঝংকৃত করেছেন। তাঁর গানে যেমন আছে বিষয়ের বৈচিত্র্য, তেমনি সুরের বৈচিত্র্যও কম নয়। তিনি কয়েকটি কাব্যানুবাদও করেছেন। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম', 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ', 'কাব্যে আমপারা' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর গল্প-উপন্যাস হচ্ছে : 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'শিউলিমালা', 'বাঁধনহারা', 'কুহেলিকা', 'মৃত্যুক্ষুধা'। তাঁর নাটক : 'ঝিলিমিলি', 'আলেয়া', 'পুতুলের বিয়ে'। কতকগুলো প্রবন্ধও নজরুল ইসলাম রচনা করেছেন। বিদ্রোহভাবমূলক মনোবৃত্তিই সেগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রযুগের অপরাপর গীতিকবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপুল প্রতিভার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে যে রবীন্দ্রযুগের আবির্ভাব ঘটে তাতে জন্মগ্রহণ করে সমকালীন কবিরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্বীকার করতে বাধ্য হন। তবে রবীন্দ্র মত ও পথ অনুসরণ করলেও কয়েকজন কবি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখাতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদুর্বা', 'রবীন্দ্র-আরতি', 'শতনরী' প্রভৃতি কাব্যের লেখক করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) অনায়াসসরল, চিত্রকুশল ও আবেগময় রচনারীতি প্রদর্শনে বাংলা কাব্যে একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন। মন্ময় ভাবালুতাই তাঁর কবিতাকর্মের সাধারণ লক্ষণ। প্রকৃতি, প্রেম ও সৌন্দর্য সম্ভোগ-পিপাসায় মদির হিল্লোলে নিজের দেশকাল থেকে বহু দূরবর্তী হয়েছিল তাঁর কবি মন। পত্নী বিয়োগের পরে রোমান্স-স্বপ্ন-সৌন্দর্য-জগৎ বিচ্ছিন্ন কবি গীতা উপনিষদের অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর (১৮৭৮-১৯৫৫) কবিতায় পল্লীপ্রকৃতির প্রকাশ এবং নিপীড়িত নারীর প্রতি সমবেদনা রূপায়িত হয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতি তাঁর কবিতায় একাত্ম হয়ে রূপলাভ করেছে। তাঁর বিখ্যাত 'অন্ধবধূ' কবিতায় তার চমৎকার সাক্ষ্য বর্তমান। কবিতাটির প্রথম স্তবক :

পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি?
আস্তে একটু চল্ না, ঠাকুর ঝি—
ওমা, এ যে, ঝরা-বকুল। নয়?
তাই তো বলি, বসে দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল—মধুমদির বাসে,
আকাশ পাতাল কতই মনে হয়।
জ্যৈষ্ঠ আসতে কদিন দেরী, ভাই!
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?

'লেখা', 'রেখা', 'অপরাজিতা', 'নাগকেশর', 'বন্ধুর দান', 'জাগরণী', 'নীহারিকা', 'মহাভারতী' প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। প্রকৃতি সৌন্দর্য-সম্ভোগের চেয়ে সকরুণ মানবিকতাবোধের একটি অনতিলঘু ভাবাবেগ ছিল তাঁর কবিতার প্রধান উপাদান। কবি প্রত্যক্ষ ও আন্তরিক বেদনাকে রহস্যকল্পিত করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মানুষের জীবনের সহজ অভাব, অসংগতি, অসাম্য তাঁর কবিতায় মানবিক আবেদন সঞ্চার করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাব-রূপ তাঁকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি কাব্যের রূপায়ণে আছে রবীন্দ্র প্রভাব।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের (১৮৮২-১৯৭০) কাব্যশিল্প অত্যন্ত সরল ও নিরাড়ম্বর, কলা-কৌশলের প্রচেষ্টাহীন। দেশের মাটির ওপর কবির গভীর মায়া কবিতার বিষয়ে ও ভাবে এবং কাব্যের নামে অভিব্যক্ত। 'উজানী', 'বনতুলসী', 'শতদল', 'একতারা', 'বীথি', 'বনমল্লিকা', 'নূপুর', 'রজনীগন্ধা', 'অজয়' প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। কুমুদরঞ্জনের ছিল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বংশের উত্তরাধিকার। ঐতিহ্যানুরাগ ও পল্লীপ্রীতি ছিল তাঁর কাব্যের প্রেরণা। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতার অংশবিশেষ :

হয়ত আমার এ পথে আর
হবে নাক আশা,
দুধারে যাই রোপণ করে
বুকের ভালবাসা।
ধুলার এ পথ যাই ভিজায়ে,
শ্যামল আসন যাই বিছায়ে,
অমল করে যাই রেখে যাই
ক্ষণিক কাঁদা হাসা।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) দুঃখবাদী কবি হিসেবে পরিচিত। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রযুগের অন্যতম শক্তিশালী ও মৌলিক কবি। তিনি বাংলা কবিতাকে কল্পনার জগৎ থেকে কঠোর বাস্তবে নিয়ে আসেন। 'ভাবের দৃঢ়তায়, ব্যঙ্গের ঝাঁজে, দুঃখময়তায়, মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের স্বপ্ন ও বাস্তবের সংঘাত-চেতনায়, বিদ্রোহী মনোভাবে তাঁর কবিতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।'

মোহিতলাল মজুমদার

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) ছিলেন কবি ও সমালোচক। 'স্বপনপসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল', 'হেমন্তগোধূলি', 'ছন্দচতুর্দশী' তাঁর কাব্যগ্রন্থ। ভাবে ও ভাষায় প্রচলিত কাব্যরীতিতে মোহিতলাল ছিলেন বিদ্রোহীস্বরূপ। বাংলা সাহিত্যের 'দেহাত্মবাদী কবি' হিসেবে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যে ক্লাসিক্যাল ভঙ্গি এবং রোমান্টিক ভাবের সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর কবিতার ভাষা, শব্দ প্রয়োগ ও ছন্দ নির্মাণ-কৌশল ছিল অনন্য। তিনি তাঁর কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। সৃষ্টিশীল সাহিত্য সমালোচক ও প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। তাঁর 'মানস-লক্ষ্মী' কবিতার প্রথম কটি পংক্তি :

আমার মনের গহন বনে
পা টিপে বেড়ায় কোন্ উদাসিনী
নারী-অপ্সরী সঙ্গোপনে!
ফুলেরি ছায়ায় বসে তার দুই চরণ মেলি
বিজন-নিভৃতে মাথা হতে দেয় ঘোমটা ফেলি,
শুধু একবার হেসে চায় কভু
নয়ন কোণে,
আমারি মনের গহন বনে।

কালিদাস রায়

কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) 'কুন্দ', 'কিশলয়', 'পর্ণপুট', 'ব্রজরেণু', 'বল্লরী' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় অর্থ ও ভাবের জটিলতা নেই; সেখানে

পল্লীপ্রীতি প্রগাঢ়, তবে তার মধ্যে রোমান্টিক রং জোরালো। কালিদাস রায় পেশায় ছিলেন শিক্ষক। তাঁর দৃষ্টি ছিল জ্ঞানী পণ্ডিতের। প্রাচীন ভারতবর্ষ কিংবা বৈষ্ণব ভাবুকতাসিক্ত তাঁর কবিতার মধ্যে অতীত-বিহার ও রোমান্টিকতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বিবরণাত্মক চিত্রাঙ্কনকেই তাঁর কবিতাকলার সহজ গুণ হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কিছু কাহিনি-প্রধান কবিতাও আছে। কালিদাস রায় তাঁর বিখ্যাত 'ছাত্রধারা' কবিতায় কিছু অনুভূতিকে চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত করেছেন :

রাজপথে দেখা হলে কেহ যদি গুরু বলে
হাত তুলে করে নমস্কার,
বলি তবে হাসি মুখে 'বেঁচে থাক রও সুখে
কি করিছ কাজ-কারবার ?'
ভাবিতে ভাবিতে যাই, কি নাম মনে ত নাই,
ছাত্র ছিল কতদিন আগে,
দেখি স্মৃতি ধরি টানি, কৈশোরের মুখখানি
মনে মোর জাগে কি না জাগে।
ঘন ঘন আনাগোনা কতদিন দেখা শুনা,
তবু কেন মনে নাহি থাকে ?
'ব্যক্তি' ডুবে যায় দলে, মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে ?

গীতিকবিতার পরবর্তী ধারা : অতিআধুনিক কবিতা

বাংলা গীতিকবিতার পরবর্তী ইতিহাস এক ধরনের আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। আধুনিক ইউরোপীয় কবিতার আদর্শ অনুসরণে এ সময় থেকে এক নবতম বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যে স্থান লাভ করে। প্রখ্যাত ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়টকে এ ব্যাপারে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আধুনিক কবিতার লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়, 'কালের দিক থেকে তা রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসী। সৃষ্টির দিক থেকে তা নবতম সুরের সাধক।' বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'এই আধুনিক কবিতা এমন কোন পদার্থ নয় যাকে কোন একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকলভাবে সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতে নয়, কখনও হয়ত বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।' কবিতার বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়কে রবীন্দ্রোত্তর কাল বলে বিবেচনা করা হয়।

ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' গ্রন্থে অতি আধুনিক কবিতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা হল : ভাবের দিক থেকে আধুনিক কবিতার সাধারণ লক্ষণ এই—

১। নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত।
২। বর্তমান জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ।

৩। আত্মবিরোধ ও অনিকেত (rootless) মনোভাব।

৪। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হতে সচেতন গ্রহণ।

৫। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অবচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারার অসম্বদ্ধতা।

৬। ফ্রেজার প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক, ও প্ল্যাঙ্ক, বোর, আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীর প্রভাব।

৭। মার্ক্সীয় দর্শনের, বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির আশা।

৮। মননধর্মিতা—অনেক সময় জ্ঞানের বিপুল ভারে দুরূহতার সৃষ্টি।

৯। বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে (যেমন প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্ম) সংশয় এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ।

১০। দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা।

১১। ভগবান এবং প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস।

১২। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নতুন সৃষ্টির পথ-সন্ধান।

ভাবধর্মের সঙ্গে শৈলী ও প্রকরণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে আধুনিক কাব্যের প্রকরণেও বহু পরিবর্তন দেখা দিল। এজন্য আধুনিক কাব্যের লক্ষণ আলোচনায় আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যও সমমর্যাদা দাবি করে। বৈশিষ্ট্যের লক্ষণগুলো এই—

ক. বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ। গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলতি শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য, পদ্য ও কথ্য ভাষার ব্যবধান বিলোপের চেষ্টা পরবর্তী পর্যায়ে অতি-ব্যবহৃত পদ্যগন্ধী শব্দকেও গ্রহণ অর্থাৎ ভাষা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার শুচিবায়ু পরিহার।

খ. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ এবং বিখ্যাত কবিদের কাব্য অথবা ভাবনা থেকে উদ্ধৃতির যত্রতত্র প্রয়োগে সিদ্ধরসকে চূর্ণ করা বা অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন অনুভূতির সমন্বয় সাধন।

গ. প্রচলিত কবিপ্রসিদ্ধি উপমা ও বর্ণনার বিরলতম ব্যবহার। প্রচলিত কাব্যিক শব্দ, যথা—ছিনু, গেনু, মনে, হিয়া প্রভৃতি বর্জন।

ঘ. প্রাচীন উপমা বা শব্দের অভিনব অর্থে প্রয়োগ এবং তৎসহযোগে নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টি।

ঙ. শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা ও অর্থঘনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা।

চ. এই মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্যে বাহুল্যবর্জনের ফলে মধ্যবর্তী চরণের অনুল্লেখ। এই চিন্তাধারার মধ্যে একটা উল্লম্ফনের সৃষ্টি, আপাতদৃষ্টিতে যাকে মনে হয় অসম্বদ্ধ। ছড়ার উল্লম্ফনের সঙ্গে তার পার্থক্য মৌলিক।

ছ. নামবাচক বিশেষ্য, বহুপদময় বিশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়ার পূর্ণরূপের ব্যবহার। চলতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংস্কৃতবহুল বিশেষ্য বা বিশেষণের সংযোগ।

জ. প্রচলিত পয়ার, সনেট ও মাত্রাপ্রধান ছন্দের রূপান্তর এবং মধ্যমিলের (internal rhyme) সৃষ্টি।

ঝ. গদ্যছন্দের ব্যবহার।

ঞ. ব্যঙ্গ, বিতর্ক, অদ্ভুত, বীভৎস রসের বহুল ব্যবহার।

ট. শব্দালংকার অপেক্ষা বিরোধাভাস, বক্রোক্তি, স্মরণ প্রভৃতি অর্থালংকারের ব্যবহার।

ঠ. বিষয় বৈচিত্র্য।

আধুনিকতার অনুসারী কবিগণের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সালের পর থেকেই আধুনিক কবিগণের বিকাশ ঘটে।

জীবনানন্দ দাশ

বাংলা কবিতার এই পর্যায়ে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) একজন বিশিষ্ট কবি। 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা অবেলা কালবেলা' ও 'রূপসী বাংলা' তাঁর কাব্যগ্রন্থ। জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। এই দূরত্ব স্বভাবসিদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত। বাংলা কবিতায় পুরানো অতিক্রম করে নতুনের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁর পদশব্দ সেখানেই অনুরণিত হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর নিজের কাব্যাদর্শ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারও মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার, সুররিয়ালিস্ট।...প্রায় সবই আংশিক সত্য—সমগ্র কাজের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।' প্রকৃতি মগ্নতা তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রকৃতিপ্রেম আসলে এক ইন্দ্রিয়চেতনাই। অবচেতনার অতল অবধি তার মূল প্রসারিত। তাঁর কাব্যে প্রকৃতি-প্রীতির অজস্র নিদর্শন বিদ্যমান। ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি জীবনানন্দ। পৌষের চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রির প্রকৃতির মত তাঁর কাব্য কুহেলীকুহকে আচ্ছন্ন। আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কাব্যেই এযুগের সংশয়ী মানবাত্মার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পরিচয়টি ফুটে উঠেছে।...জীবনানন্দের অন্তর্লোকে যে সমুদ্র মন্থন চলেছে তার উগরানো বিষ তাঁকেই পান করে নীলকণ্ঠ হতে হয়েছে। এ জন্য তাঁর কাব্যের ট্র্যাজিক মহিমা এত বেশি মর্মভেদী। অন্যান্য কবিদের কাব্য রসাস্বাদনের জন্য পূর্বেই যে পঠন-পাঠনের প্রস্তুতি প্রয়োজন জীবনানন্দের কাব্যপাঠে তার বিশেষ মূল্য নেই। পূর্বে নয়, পাঠান্তেই তাঁর কাব্য পাঠকমানসে আলোড়ন তোলে এবং শেষ পর্যন্ত মনে হয় অর্থের দুর্বোধ্যতা, ছন্দের অভিনবত্ব, শব্দের বৈচিত্র্য অপেক্ষা এই চিন্তার রহস্য-ভেদ অনেক বেশি দুরূহ।' তাঁর বিখ্যাত 'বনলতা সেন' কবিতার মধ্যে মানব হৃদয়ের চিরন্তন প্রেমানুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে। যেমন :

> হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
> সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
> অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
> সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকার বিদর্ভ নগরে;
> আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
> আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

বাংলাদেশের প্রকৃতি তাঁর কবিতায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় রূপে বিধৃত হয়েছে। এখানকার প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাঁকে বিমুগ্ধ করেছিল বলেই তিনি লিখেছিলেন : 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।' বাংলার সৌন্দর্যের মোহেই তিনি লিখেছিলেন :

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তোবা শঙ্খচিল শালিখের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়।

স্বভাবোক্তি অলঙ্কার ও বাক্‌প্রয়োগের দেশজ রীতির মিলনে সৃষ্ট তাঁর আপাত-সুবোধ্যতার অন্তরালে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য বিরাজিত। বক্তব্য প্রকাশে কবি বিশেষ চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, শব্দ ব্যবহারে তাঁর নিজস্বতা আছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬১) 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী', 'উত্তর ফাল্গুনী', 'সংবর্ত', 'দশমী' প্রভৃতি কাব্যরচনার মাধ্যমে পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও ঔৎসুক্য কাব্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তিনি জীবনের ফুটোফাটা জোড়াতালি বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন করে মহাকালে পৌঁছে জীবনের তাৎপর্য খুঁজেছেন। তাঁর কবিতায় মনন ও আবেগের সমন্বয় ঘটেছে। জীবনদর্শনেও তাঁর বিশিষ্টতা আছে। 'রূঢ় বাস্তব থেকে তিনি কোন দিন পলায়ন করেন নি, যুগের ট্র্যাজেডির ঘোর ঘনঘটায় ব্যক্তিমানুষের মর্মান্তিক বেদনা তাঁর প্রকরণের সাহায্যে ফুটে উঠেছে।' সুধীন্দ্রনাথ বিখ্যাত 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে স্বতন্ত্র লেখকগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে জীবন-জিজ্ঞাসার এক অনন্য— প্রায় অননুসরণীয় মান অর্জন করেছিল। তিনি ছিলেন পরিশ্রমী কবি। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যা জেনেছিলেন তার সঙ্গে সমকালীন প্রতীচ্য কবিতা-লোক থেকে সমর্থন নিয়ে আপন কাব্যধারণা গড়ে তুলেছিলেন। ড. দীপ্তি ত্রিপাঠীর মতে, 'সুধীন্দ্রনাথের কাব্য যেন ভ্রষ্ট আদমের আর্তনাদ। তিনি স্বর্গচ্যুত কিন্তু মর্ত্যে অবিশ্বাসী। তাঁর মধ্যে বিজ্ঞতা আছে কিন্তু শান্তি নেই, যুক্তি আছে কিন্তু মুক্তি নেই। তাঁর কাব্য কোন আশ্বাসের আশ্রয়ে আমাদের পৌঁছে দেয় না। সুধীন্দ্রনাথের নঞর্থক ও পরে ক্ষণবাদী জীবনদর্শন আমাদের ধর্মপুষ্ট বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। এমনকি আধুনিক কাব্যের অনেকগুলো লক্ষণ যদিচ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান তথাপি এই দর্শন-বৈশিষ্ট্যে তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যেও স্বতন্ত্র। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠকালে মনে হয়, কবি যেন এক নিঃসঙ্গ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আধুনিক জীবনের নিঃসীম শূন্যতা-নৈরাশ্য ভারাতুর নয়নে অবলোকন করেছেন।' বুদ্ধদেব বসুর মতে 'সুধীন দত্ত তাঁর কবিতাকে গদ্যের মত নিয়মানুগত্য দিতে চেয়েছিলেন।'

জীবন সম্বন্ধে সংশয় থাকলেও জীবনকে তিনি স্বাদহীন মনে করেন নি :

এই নিষ্ঠুর অপচয়,
এর পাছে আছে আছে অভিপ্রায়,
আছে কি আকুতি ?
হেথা যারা পরাজিত বৈকুণ্ঠে তাদের হবে জয় ?

হায় ক্ষেমঙ্কর,
অজস্র মঙ্গল তব পারিবে কি করিতে সুন্দর
অবরুদ্ধ যৌবনের জীবন্ত মৃত্যুরে ?

সুধীন দত্তের 'প্রতিধ্বনি' কাব্য তাঁর অনুবাদ কবিতার সংকলন। 'স্বগত' এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ' তাঁর গদ্যগ্রন্থ।

বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২) 'উর্বশী ও আর্টেমিস', 'চোরাবালি', 'পূর্বমেঘ', 'সন্দ্বীপের চর', 'অন্বিষ্ট', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', 'সাত ভাই চম্পা', 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ', 'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ', 'সেই অন্ধকার চাই', 'ইতিহাসের ট্র্যাজিক উল্লাসে', 'রবিকারোজ্জ্বল নিজদেশে', 'দিবানিশা', 'চিত্ররূপমত্ত পৃথিবীর', 'উত্তরে থাকো মৌন', 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তিনি সমাজসচেতন কবি এবং চিন্তায় মার্কসপন্থী। তাঁর বহু কবিতায় রাজনৈতিক মতের এবং তির্যক ব্যঙ্গদৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে। বিষ্ণু দে আধুনিক কাব্যের ক্লান্তি, জিজ্ঞাসা, সংশয়, বিতৃষ্ণা, নৈরাশ্য ও নির্বেদের বিশৃঙ্খল বাষ্পপুঞ্জ থেকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্বাসের ধ্রুবলোক। তিনি আধুনিক কাব্যজগতের প্রথম অস্তিবাদী কবি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'হ্যাঁ-ধর্মী', যদিও সে হ্যাঁ-ধর্মের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আধুনিক এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ থেকে উৎসারিত অস্তিবাদ থেকে তার মৌল পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিষ্ণু দের অন্বিষ্ট একক সাধনার পথে মেলে না—মেলে সচেতন সামাজিক সমবায়ের পথে। যন্ত্রের শৃঙ্খলে বন্দী মানবের অসহায়তা এবং অপরাজেয় মানবাত্মার নভোবিহার এ দুটি চিত্র পাশাপাশি রেখে বিষ্ণু দে আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথের যুগের দুস্তর ব্যবধান বৈপরীত্যের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যে তিরিশের কবিগণ যে নতুনত্ব এনেছিলেন তাঁদের কাব্যধারায় বিষ্ণু দের মধ্যেই প্রথম রাবীন্দ্রিক কাব্য বলয় অতিক্রমণের সার্থক প্রয়াস লক্ষ করা গিয়েছিল। তিনি মার্কসীয় তত্ত্বকে জীবনাবেগ ও শিল্পসম্মত করে অপরিসীম সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন 'পরিচয় গোষ্ঠীর' অনন্য সৃজনশীল শিল্পী। তিনি প্রাচ্যবিদ্যা- সংস্কৃতির প্রগাঢ় অধিকার অর্জন করেও প্রতীচ্য সৃজন-মননের গহনে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। বিষ্ণু দে ছিলেন স্বভাবতই লিরিক্যাল কবিধর্মের অধিকারী। তবে তাঁর প্রতিভায় ছিল তীক্ষ্ণধার শিল্পসচেতনতা। ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'বিষ্ণুবাবুর কবিপ্রকৃতি বিদ্যার বন্ধুর পথবাহী বুদ্ধিরই অনুসরণ করিয়াছে।'

বিষ্ণু দে-র কবিতার কিছুটা নমুনা :

চেয়েছি অনেকদিন
আজো তাঁকে খুঁজি সারাক্ষণ
কখনো বা পাশ দিয়ে কখনো আড়ালে
কখনো বা দেশান্তরে কখনো বা চোখোচোখি
কখনো বা ডাকে কানে কানে কাছাকাছি
নিশ্বাসের তাপে একান্ত আপন ছন্দময়
বুঝিবা অলক তাঁর কাঁপে আমার কপালে
কখনো হাওয়ায় লাগে হাওয়া
তবু তাকে পাওয়া আজো হল না নিঃশেষ।

অমিয় চক্রবর্তী

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৬) আধুনিক কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল ও দ্বিধাবিভক্ত কবিমানসের অধিকারী। 'খসড়া', 'এক মুঠো', 'মাটির দেয়াল', 'অভিজ্ঞান বসন্ত', 'পারাপার', 'পালাবদল', 'ঘরে ফেরার দিন', 'কবিতাবলী', 'উপহার', 'দূরযানী', 'হারানো অর্কিড', 'পুষ্পিত ইমেজ', 'অমরাবতী', 'অনিঃশেষ' ইত্যাদি তাঁর কাব্য।

'এই ধ্যানগম্ভীর 'সঙ্গতির' কবির প্রশান্তির অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক দ্বন্দ্বজর্জর আধুনিক মানস—এক অনিকেত ছিন্নমূল সত্তা—সমন্বয় যার কাম্য কিন্তু আজও অপ্রাপনীয়, যার অনুভূতি মৃন্ময়ী বাড়ি ও গোলক চাঁপার তলার জন্য আকুল, আবার যার আন্তর্জাতিক চেতনা বিদেশের পথেঘাটে স্বজন খুঁজে বেড়ায়—এক কথায় দুই পৃথিবী হারিয়ে যে কেবল তাদের মধ্যে পারাপার করে চলে সেতুবন্ধনের দুর্মর আশায়।' অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন, 'বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যাঁর রচনায় নারী তার শরীর নিয়ে কখনোই প্রবেশ করে নি।'

দৃষ্টির জগৎ ও ধ্যানের জগতের বিরোধ তাঁর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। তিনি বিজ্ঞান চেতনারও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শব্দভাণ্ডার ছিল ক্রমবর্ধমান। কবির মাধুর্যমণ্ডিত সহজ কবিতার একটি নিদর্শন :

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনি কত, রাতি চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জ্বলে রাতে,
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে জলের আঘাতে।
দুঃখের আবর্তে নৌকা ডোবে, ঝড় নামে
নূতন প্রাণের বার্তা জাগে গ্রামে গ্রামে॥
নীলান্ত আকাশে শেষ পাইনি কখনো
আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো।

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। 'বন্দীর বন্দনা', 'পৃথিবীর পথে', 'কঙ্কাবতী', 'দময়ন্তী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি', 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর', 'যে-আঁধার আলোর অধিক', 'মর্মবাণী', 'মরচে পড়া পেরেকের গান', 'একদিন চিরদিন', 'স্বাগত বিদায়' ইত্যাদি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। কবির 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যের বলিষ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠা, ভাবনা ও প্রকরণের অভিনব রূপান্তর, শব্দচয়নের উদ্ভাবনী প্রতিভা দেখে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রশস্তি লিখেছেন—'এই রচনাগুলো জলভরা ঘন মেঘের মত যার ভিতর থেকে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত।'

কবি বুদ্ধদেব বসুর মনের ধর্ম প্রেম। তিনি প্রেমের কবি। এজন্য তাঁর অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ প্রধানত প্রেমের কাব্য। কিন্তু এ প্রেম রোমান্টিক প্রেম নয়। প্রেমকে

রোমান্টিক কবিদের মত অতীন্দ্রিয়, অমূর্তভাবে তিনি দেখেন নি, দেখেছেন মূর্ত, শরীরী রূপে। প্রেমের দেহী রূপ মর্মে মর্মে অনুভব করলেও একান্ত দেহবাদেই কবি নিমজ্জিত হতে চান নি। কবি কামনার কারাগার থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল। কারণ কবি মনে করেন শুধু কামনার পরিতৃপ্তিতেই মনুষ্যত্বের চরম প্রকাশ ঘটে না।

আধুনিক নারী প্রেমের শোষণ রূপ সম্পর্কে সচেতন বলে কবি 'মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান' কবিতায় উচ্চারণ করেছেন :

চেয়েছিলে প্রতি রাত্রে শয্যার সঙ্গিনী,
প্রত্যহ পরিচারিকা,
সন্তানের মাতা তব, নিপুণা গৃহিণী।
প্রিয়াকে পেতে না আর।
প্রেমের সমাধি হত অগোচরে মোদের দোঁহার,
হাজার প্রয়োজনের পুঞ্জিত জঞ্জালে
হয়ে পথ-হারা
লুপ্ত হত ক্ষীণ প্রেম-ধারা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮) আধুনিক জীবন কাব্যে রূপায়িত করেছেন। 'প্রথমা', 'সম্রাট', 'ফেরারি ফৌজ', 'সাগর থেকে ফেরা', 'হরিণ চিতা চিল', 'কখন মেঘ' ইত্যাদি কাব্য গ্রন্থে তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় বিদ্যমান। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতা ও কথাসাহিত্যে সব্যসাচী ছিলেন। তিনি আধুনিক কবিতার অন্যতম পথনির্মাতা ছিলেন, কিন্তু পরে গোত্র-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁকে আবেগধর্মী কবি বলে বিবেচনা করা হয়। অথচ আবেগকে সংযত নিয়ন্ত্রিত প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারার সামর্থ্যেই তাঁর শিল্পধর্মের সফলতা প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক জীবনের অস্থিরতাকে তিনি কাব্যরূপ দান করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, 'আপন যুগের বাণীহারা অমূর্ত যন্ত্রণাকে তিনি নিজের চেতনায় নিরন্তর বয়ে ফিরেছেন।' প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা ব্যক্তিগত জীবনাচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তাঁর কবিতায় আপন পরিবেশ-পরিপার্শ্বজ ব্যাপক জীবনের পরিমণ্ডলে স্পন্দিত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনের রহস্যসন্ধানী—তাঁর এই প্রচেষ্টার স্বাতন্ত্র্যেই তিনি নতুন যুগের এক প্রতিনিধি কণ্ঠ, কেবল ভাবানুভবের নিবিষ্টতায় নয়, রূপনির্মিতির স্বতঃস্ফূর্তির বশেও। তাঁর কবিতার নমুনা :

ওরা অন্ধকার বেচে।
বিক্রী হয় অন্ধকার
প্রকাশ্য ও গোপন বাজারে
নানান মোড়কে মোড়া রঙীন লোভন,
কত না লেবেল-এ।

আর এক অন্ধকার,
পৈশাচিক মস্তিষ্ক ও মেশিনে প্রস্তুত
তাল তাল, ফেরি করে সুচতুর বণিকের চর।
আমাদের চিন্তায় ও ধ্যানে,
স্বপ্নে জাগরণে
মিলিয়ে দেয় সংক্রামক জীবাণুর মত।

সমর সেন

সমর সেন (১৯১৬-৮৭) 'কয়েকটি কবিতা', 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা', 'নানা কথা', 'খোলাচিঠি', 'তিনপুরুষ' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। 'নগর জীবনের নোংরামি ও ক্লান্তি সমর বাবুর কবিতায় বারবার প্রতিধ্বনিত, সেই সঙ্গে সাঁওতাল পরগনার শান্ত পরিবেশের মাধুর্যও।' সমর সেন ছিলেন মার্ক্সীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ কবি। তাঁর স্বল্পস্থায়ী কবিতাকর্মে সমসাময়িক নির্লিপ্ত মানসিকতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। সমর সেন এভাবে নিজের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন :

আর রোমান্টিক কবি নই মার্কসিস্ট।
অনেকে জিজ্ঞাসা করে; গুরুদেবের সঙ্গে
তোমার তফাৎটা কী? তফাৎ এই :
বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বরাবর,
অক্লান্ত বাউল, একই নৌকায়
একঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন।
কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা
নিশ্চয় দেবেন বলে তাই আমার বিশ্বাস।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭) অকালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'ছাড়পত্র', 'পূর্বাভাস', 'ঘুম নেই', 'মিঠেকড়া' ইত্যাদি কাব্যে তাঁর প্রতিভার নিদর্শন বিদ্যমান। ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'সুকান্তের ব্যক্তিত্ব ও কবিতাকর্মের অনন্যতা তাঁর অদম্য অখণ্ড সম্পূর্ণতায়। কবিতা তাঁর হাতে সংগ্রামী হাতিয়ার—তাই কবিতা কখনও স্লোগান হতে দ্বিধা করে না, স্লোগান প্রায়ই হারায় না কবিতার আন্তরিক জোর। নানাদিক থেকেই এই অতি স্বল্পজীবী দুর্দান্ত প্রতিভাটি সমকালীন ইতিহাসের অদ্বিতীয় দিশারী।...আর আক্ষরিক অর্থেই সুকান্ত ছিলেন আজন্ম স্বভাবকবি। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, অনুভব, উত্তেজনামাত্রই তাঁর অস্তিত্বের স্বতই প্রকাশ পেয়েছিল কবিতার কণ্ঠস্বরে।' সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি কবিতা :

হে মহামানব, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

সজনীকান্ত দাস

সজনীকান্ত দাস (১৯০০-৬২) ব্যঙ্গকবিতায় পারদর্শী ছিলেন। গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব নিয়ে লেখা কবিতার পাশাপাশি তাঁর ব্যঙ্গকবিতাগুলো সমকালীন জীবনের রসালো চিত্র হিসেবে উপভোগ্য হয়েছিল। বিশেষত তাঁর প্যারডি কবিতা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিগণের শ্রেষ্ঠ অনুকৃতি হিসেবে যথেষ্ট রস পরিবেশনে সক্ষম হয়েছে।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) কবিতা রচনায়ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মনীশ ঘটক (১৯০২-৭৯), আশোক বিজয় রাহা (১৯১০-৯০), মৃণালকান্তি দাস (১৯১৫- ৮০), সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-৬৯) কবি হিসেবে কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের জগদীশ ভট্টাচার্য (১৯১২), হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭-৯৪), সুভাষ মুখোপাধ্যায়(১৯১৯), শুদ্ধসত্ত্ব বসু (১৯২১), মণীন্দ্র রায় (১৯১৯-২০০০) প্রমুখ অনেক প্রবীণ-নবীন কবি নতুন নতুন পরীক্ষায়-নিরীক্ষায় আধুনিক কাব্যের ধারা সমৃদ্ধ করেছেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় গীতিকাব্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

২। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা গীতিকবিতা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।

৩। 'বাংলা কাব্যে নবযুগের কবিপ্রকৃতির নূতন পরিচয়ের একটা দিক যেমন মধুসূদনে রূপ পাইয়াছে, তেমনি বিপরীতধর্মী আর একটা দিক বিহারীলালে পরিস্ফুট হইয়াছে।'—এই মন্তব্যটি আলোচনা প্রসঙ্গে এই দুই কবির কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দাও।

৪। আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসে বিহারীলালের স্থান নির্দেশ কর।

৫। বিহারীলালের কাব্যের মূলসুর নির্ণয় করিয়া আধুনিক অর্থে বিহারীলালকে 'বিশুদ্ধ গীতি কবি' বলা যায় কিনা আলোচনা কর।

৬। 'যে বিচারে বিহারীলালের কাব্যকে গীতিকাব্য বলা যায়, ঠিক সে বিচারে বৈষ্ণবকাব্যকে গীতিকাব্য বলা চলে না।'—এই উক্তির আলোকে আলোচনা করিয়া দেখাও যে, 'বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্যের উদ্ভব বিহারীলাল থেকেই।'

৭। 'আধুনিক বাংলা কাব্যের ধারায় বিহারীলাল চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে নতুন সুরের উদগাতা। তাঁর কবিতা পোষাকি সাজ নয়, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।'—আলোচনা কর।

৮। ১৮৮০ হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত মুসলিম রচিত কাব্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

৯। আধুনিক বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগ বলিতে কি বুঝ ? এই যুগের কাব্যধারার পরিচয় দাও।

১০। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের অন্যান্য গীতিকবিদের পরিচিতি-মূলক একটি নিবন্ধ রচনা কর।

১১। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রবর্তনে বিহারীলালের ভূমিকার পরিচয় দাও।

১২। আধুনিক যুগের গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝাইয়া দাও এবং প্রসঙ্গক্রমে তিনজন গীতিকবির অবদানের পরিচয় দাও।

১৩। মধ্যযুগের গীতিকবিতার সঙ্গে আধুনিক যুগের গীতিকবিতার পার্থক্য কোথায়? এ পার্থক্যের সূচনায় কোন কোন কবি কি ধরনের কাব্য রচনা করেছিলেন তাহার পরিচয় দিয়া প্রশ্নটির মীমাংসা কর।

১৪। আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।

১৫। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে নজরুলের মূল্যায়ন কর।

১৬। 'বাংলা কাব্যসাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক।'—আলোচনা কর।

১৭। টীকা লিখ : অগ্নিবীণা, কুহু ও কেকা, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দাদ আলী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দোলন চাঁপা, বঙ্গসুন্দরী, বনলতা সেন, বাউল বিংশতি, বিষের বাঁশী, বুদ্ধদেব বসু, ভাঙ্গার গান, মোজাম্মেল হক, মানকুমারী বসু, রূপসী বাংলা, সারদামঙ্গল, সাধের আসন, সুধীন দত্ত।

দশম অধ্যায়
নাটক ও প্রহসন

'নাটক জীবনসম্বন্ধীয় ধারণার এমন ধরনের কাব্যিক প্রকাশ যা অভিনেতারা রূপ দিতে পারে এবং যা শব্দমাধুর্য শোনার জন্য ও আঙ্গিক-ক্রিয়াদি দেখার জন্য উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দান করতে পারে।'—নাটক সম্পর্কে সমালোচক নিকলের এই মত। সংস্কৃতের একটি সংজ্ঞা অনুসারে, 'নানা ব্যক্তির আচরিত কর্মের অনুকরণ করলে তাকে নাটক বলা যায়।' রস-ভাব-ব্যঞ্জনা সহযোগে আনন্দদান নাটকের উদ্দেশ্য। নাট্যমঞ্চে অভিনেতাকর্তৃক নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে গতিশীল মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়।

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র অনুসারে কোন রচনায় দেবতা, মুনিঋষি, রাজা, গৃহস্থ ইত্যাদির আচরিত কর্মের অনুকরণকে নাট্য বলা হয়। অন্য একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'সুখদুঃখযুক্ত মানুষের যে স্বভাব আঙ্গিকাদি অভিনয়ের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তার নাম নাটক।' নাটকে রস উপলব্ধির বিষয়টি জড়িত বলে তাকে বলা হয় দৃশ্যকাব্য। নাটককে সমাজজীবনের দর্পণ বলা হয় একারণে যে, এতে নাট্যকার মানব জীবন চিত্রণের জন্য সমাজজীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেন।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে, নাটক দৃশ্যকাব্য—এতে কাব্যত্ব ও দৃশ্যত্ব বা অভিনয়ত্ব দু-ই থাকবে। সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শ অনুসারে নাটক দৃশ্যকাব্য—এতে ঘটনাবলী সংলাপ ও অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। সংলাপ আর ক্রিয়াকলাপ থেকে নাটকে উল্লেখিত পাত্রপাত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্বসংঘাতের ফলে তাদের চরিত্রের পরিচয় প্রকাশ পায় এবং ঘটনার পরিণতি থেকে দর্শকদের মনে একটি বিশেষ রসের উদ্রেক হয়। সুসংবদ্ধ কাহিনি, রসঘনিষ্ঠতা, চিত্তাকর্ষক পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে নাট্যকারকে সঙ্গতি রক্ষা ও সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। কাহিনি, চরিত্র, ঘটনাসমাবেশ ও সংলাপ—এই কয়টি নাটকের অঙ্গ। সময়ের ঐক্য, স্থানের ঐক্য ও ঘটনার ঐক্য রক্ষা করে নাটক রচনা করতে হয়। নাটকে কোন একটি ঘটনা রূপলাভ করে। ঘটনার বিকাশ পাঁচটি অঙ্গে বা পর্যায়ে বিভক্ত। বিভাগগুলো হচ্ছে : ১. প্রারম্ভ (exposition), ২. প্রবাহ (growth of action), ৩. উৎকর্ষ (climax), ৪. গ্রন্থিমোচন (falling action or denouncement) ও ৫. উপসংহার (catastrophe or conclusion)। নাটকের প্রথম অঙ্কে আখ্যানের সূচনা, দ্বিতীয় অঙ্কে জটিলতাসৃষ্টি, তৃতীয় অঙ্কে চরম উৎকর্ষ, চতুর্থ অঙ্কে জটিলতামুক্তি এবং পঞ্চম অঙ্কে সমাপ্তি দেখানো হয়। নাটক সংলাপ-নির্ভর সাহিত্যসৃষ্টি। নাটকের চরিত্রগুলো পারস্পরিক সংলাপ বা কথোপকথনের মাধ্যমে কাহিনি গড়ে তোলে এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রূপায়িত করে। নাটকের চরিত্রে স্বাভাবিক ভাষা ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত আছে। তাই সংলাপের

ভাষায় আছে বৈচিত্র্য। নাটকের সাফল্য নির্ভর করে ঘটনা সমাবেশের ওপর। এ জন্য নাট্য ঐক্যতত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। নাট্যকারকে স্থান, কাল ও ঘটনা বিষয়ে ত্রয়ীঐক্য রক্ষা করতে হয়।

প্রহসন বলতে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা 'সমাজের কুরীতি শোধনার্থে রহস্যজনক ঘটনা সম্বলিত হাস্যরসপ্রধান একাঙ্কিকা নাটককে' বুঝাতেন। প্রহসনে হাস্যরসময় জীবনালেখ্যই রূপায়িত হয়। বর্তমান কালে প্রহসন বলতে 'অতিমাত্রায় লঘু কল্পনাময়, আতিশয্যব্যঞ্জক, হাস্যরসোজ্জ্বল সংস্কারমূলক নাটককে বোঝায়।'

নাটকের শ্রেণি বিভাগ

বাংলা নাটকের শ্রেণি বিভাগের বেলায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে নাটককে প্রধানত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন : ১. পৌরাণিক নাটক, ২. ঐতিহাসিক নাটক ও ৩. সামাজিক নাটক। এ ছাড়া আছে রূপক বা সাংকেতিক নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, চরিত নাটক বা জীবনী নাটক ইত্যাদি।

রসের দিক থেকে নাটককে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : ১. নাটক ও ২. প্রহসন। প্রহসনকে : ক. সমাজ সংস্কারমূলক, খ. হাস্যরসপ্রধান বিদ্রূপাত্মক, গ. বুদ্ধি বৃত্তিমূলক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

অভিনয়ের দিক থেকে : ১. নাটক ও ২. যাত্রা—এই দুই ভাগে নাটক বিভক্ত।

আকারের দিক থেকে নাটকের বিভাগ দুটি : ১. নাটক ও ২. নাটিকা বা একাঙ্কিকা।

ইংরেজি আদর্শের প্রেক্ষিতে নাটককে রসের দিক থেকে : ১. ট্র্যাজেডি, ২. কমেডি, ৩. মেলোড্রামা, ৪. ট্র্যাজি-কমেডি ও ৫. ফার্স—এই পাঁচভাগে ভাগ করা হয়। ভাবের দিক থেকে নাটক : ১. ক্লাসিকাল, ২. নিও ক্লাসিক্যাল ও ৩. রোমান্টিক ধরনের হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামতের প্রেক্ষিতে নাটকের শ্রেণিবিভাগ ছকে দেখানো যায়।
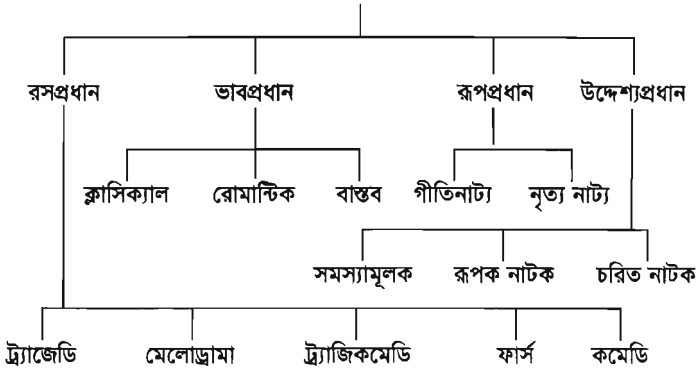
বাংলা নাটকের উৎপত্তি

সাহিত্যের বাহন হিসেবে গদ্যরীতি উৎকর্ষের পর্যায়ে উন্নীত হলে নাটক রচনার সূত্রপাত হয়। বাংলা নাটকের ইতিহাসের শুভ সূচনায় এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এদেশে পূর্ব থেকে প্রচলিত যাত্রার মধ্যে এমন লক্ষণ ছিল যার বিবর্তনের মাধ্যমে নাটকের উৎপত্তি হতে পারত। কিন্তু কবিগান, পাঁচালি, কথকতা, টপ্পা, কীর্তন, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি কোনটার ক্রমপরিণতি বলে বাংলা নাটককে গণ্য করা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যেও নাটকের প্রচলন বহুযুগ থেকেই ছিল, কিন্তু বাংলা নাটকের উৎপত্তির মূলে সংস্কৃত নাটকের কোন প্রভাব নেই। সংস্কৃত নাটক থেকে কিছু সংখ্যক গদ্যানুবাদ ও কাব্যানুবাদ বাংলা নাটক হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচলিত হলেও সেগুলো প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাটকরূপে গুরুত্ব লাভ করতে পারে নি।

সতের-আঠার শতকে নেপাল রাজদরবারের কবিগণের রচিত পৌরাণিক নাটকগুলোর মধ্যে এদেশীয় যাত্রার পালার পরিচয় পাওয়া যায়। আঠার শতকের শেষদিকে নেপালে বাংলা নাটক রচিত ও অভিনীত হলেও বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এসব একটা কৌতূহল সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৭৯৫ সালে। হেরাসিম লেবেডফ নামে একজন রুশদেশীয় আগন্তুক কলকাতায় বেঙ্গল থিয়েটার নামে একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেন। তিনি The Disguise এবং Love is the best Doctor নামে দুখানি নাটক বাংলায় ভাষান্তরিত করে এদেশীয় পাত্রপাত্রীর দ্বারা অভিনয় করান। এতে ভারতচন্দ্র রচিত গান সংযোজিত হয়েছিল। এই অভিনয়ের পর হেরাসিম লেবেডফ নিজের দেশে চলে যান। এরপর বহুকাল পর্যন্ত বাংলা নাট্যশালা ও নাটকাভিনয় সম্পর্কে আর তেমন কিছু জানা যায় না।

নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। নাটক যেহেতু অভিনয়ের মাধ্যমে সার্থকতায় মণ্ডিত হয় সে জন্য মঞ্চের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকে। বাংলা নাটকের সূচনা ও বিকাশের সঙ্গে তাই নাট্যশালার যোগাযোগ রয়েছে। নাট্যকারের কল্পনা রঙ্গমঞ্চে বাস্তব রূপ লাভ করে। রঙ্গমঞ্চে যে বাস্তব জগতের সৃষ্টি করা হয় তা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবের প্রতিরূপ। মঞ্চের গঠন ও সংস্থানের ওপর নাটকের অভিনয় সাফল্য নির্ভর করে। তবে রঙ্গমঞ্চ নাটকের উদ্দেশ্য নয়—উপায় মাত্র। প্রাচীন কাল থেকে নানা রূপে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করা হত। দৃশ্যপট ও আলোকসম্পাত দ্বারা নাটকের বক্তব্য রূপায়ণে সহায়তা নেওয়া হয়। এক সময় সহজ অভিনয়ের জন্য ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সৃষ্টি হয়েছিল। আধুনিক নাটকে চিত্রিত দৃশ্যপটের প্রয়োজন পড়ে না এবং দৃশ্যের সংখ্যাও কমিয়ে আনা হয়েছে। এখন একটি মাত্র দৃশ্য পরিবেশে সমগ্র নাটক অভিনীত হতে পারে।

রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকলে নাট্যরচনায় কৃতিত্ব ফুটিয়ে তোলা যায়। নাটককে অভিনীত হতে হয় বলে এ ব্যাপারে নাট্যকারের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। মঞ্চাভিনয়ে যাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁরা নাট্যরচনায় অধিকতর সার্থকতা লাভ করেছেন।

ইংরেজি নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে কলকাতায় বহু পূর্বেই রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ইংরেজি নাটক উপভোগ করে এবং ইংরেজি সাহিত্যের রস আস্বাদন করে এদেশের শিক্ষিত লোকের মনে বাংলা নাট্যাভিনয়ের প্রেরণা আসে। এর ফলে ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্তৃক কলকাতায় হিন্দু থিয়েটার নামক বাংলা নাট্যাভিনয়ের উপযোগী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিদ্যাসুন্দর অংশের নাট্যরূপ অভিনীত হয়। এখান থেকেই মোটামুটি বাংলা নাটকের সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ বা পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত অনেকগুলো শখের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাধারণত শখের অভিনয় করাই ছিল সেগুলোর বৈশিষ্ট্য। পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা নাট্যাভিনয়ে শখের পর্বের অবসান ঘটে।

নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের বাস্তব চিত্র দর্শকদের সামনে তুলে ধরা যায়। প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হওয়ার ফলে দর্শকদের ওপর তার প্রভাবও পড়ে বেশি। সেজন্য অনেক নাটক সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। এ কারণে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক কালাকানুনেরও সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলা নাটকের প্রাথমিক ইতিহাসে লক্ষ করা যাবে যে, এ সময়কার নাট্যরচনায় সাহিত্যসৃষ্টির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় নি, সমাজসংস্কারের চেষ্টাই প্রথম যুগের বাংলা নাটকের প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রহসন রচনার পশ্চাতে সমাজসংস্কারের এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির সমাজসংস্কৃতির যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল, তাতে প্রহসনের অবদানই ছিল বেশি।

বাংলা মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত হয় ১৮৫২ সালে। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস', তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' এই বৎসরে প্রকাশিত নাটক। কীর্তিবিলাস বিয়োগান্ত নাটক রচনার প্রথম প্রচেষ্টা। কীর্তিবিলাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত ভদ্রার্জুন ইংরেজি ও সংস্কৃতের যুক্ত আদর্শে রচিত প্রথম মৌলিক মধুরান্তিক বাংলা নাটক। সপত্নীপুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচারকাহিনি অবলম্বনে কীর্তিবিলাস নাটকটি রচিত। বিভিন্ন চরিত্রের মৃত্যুর মাধ্যমে ট্র্যাজেডির রূপায়ণ এর বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য আদর্শে নাটকের অংক পাঁচটি; কিন্তু সংস্কৃত আদর্শে এতে 'নান্দী' ও 'সূত্রধার' রয়েছে। কীর্তিবিলাসের ভাষা সংস্কৃতের প্রভাবে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম। ভদ্রার্জুন নাটকের কাহিনি অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণ। মহাভারত থেকে কাহিনি সংগ্রহ করা হলেও বাঙালি সমাজের বাস্তব পরিবেশ এতে অঙ্কিত হয়েছে।

অনুবাদ নাটক বাংলা নাটকের বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এই ক্ষেত্রে হরচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ নাটকের কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫২) ও 'চারুমুখ চিত্তহারা' (১৮৬৪) যথাক্রমে সেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ও 'রোমিও জুলিয়েটে'র ভাবানুবাদ।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

বাংলা নাটকের ইতিহাসে অস্থিরচিত্ততা কাটিয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক সৃষ্টি হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-৮৬) হাতে। নাট্যকার হিসেবে তাঁর প্রভূত খ্যাতিলাভের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর সামাজিক নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্বের' (১৮৫৪) অভিনয় সাফল্য।

এই নাটকটি নাট্যকর্মের বিবিধ বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ অনুসারী না হলেও তা তৎকালীন বাংলা নাটকের মধ্যে বৈচিত্র্যের পরিচায়ক বলে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিল। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামে নাটক রচনার জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে রংপুরের কুণ্ডী পরগনার জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী যে প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিলেন তাতে বিজয়ী হয়ে রামনারায়ণ সে পুরস্কার লাভ করেন। এতে দেখা যায় রামনারায়ণের নাটক রচনা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না এবং নাটকের বিষয় ও নাম পর-নির্দেশিত ছিল। তবে নাটকটির বিষয়ের প্রতি সমগ্র জাতির কৌতূহলই রামনারায়ণকে জনপ্রিয়তা দান করেছিল। এই নাটকের মাধ্যমে দর্শকদের প্রবলভাবে মাতিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। সে কারণে তিনি 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কৌলিন্যপ্রথার দোষ নির্দেশক এই নাটকটিতে মূলকাহিনির শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। তাতে কতকগুলো কৌতুকপূর্ণ দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে মাত্র। একান্ত বাস্তব সামাজিক জীবনের ঘটনা অবলম্বন করাতেই এই নাটকটির বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে যে কৌতুকরস স্থান পেয়েছে তা কোথাও করুণ, আবার কোথাও প্রহসনধর্মী।

নাটকটির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য এর টাইপ চরিত্রের প্রাধান্য। অনৃতাচার্য, অধর্মরুচি, বিবাহবণিক, উদারপরায়ণ, বিবাহবাতুল, অভব্যচন্দ্র এই সব নাম একদিকে যেমন ব্যঙ্গরসাত্মক, অন্যদিকে তাৎপর্যবাহী। হাস্যরসের আধিক্যের জন্য কোন কোন চরিত্র অবাস্তবতায় পরিপূর্ণ। সমস্যাপীড়িত মানবজীবনের অন্তরবেদনা, প্রথানুগত্যের পেছনে গোপন মর্মকথা, হাসির অন্তরালে অশ্রুর আভাস রামনারায়ণ তর্করত্নের এই নাটকটিকে জীবনরসোচ্ছল করেছে। বাঙালি শ্রোতা এ নাটকে সর্বপ্রথম নিজ সমাজপরিবেশে নিজের হাসিকান্নায়, বিরূপ সমবেদনায় দোলায়িত হয়ে আত্মপরিচয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে নতুন সমাজচেতনা প্রবর্তন করেছিরেন তা-ই একটি বিশেষ সমস্যা অবলম্বনে রামনারায়ণের হাতে নাটকীয় রূপ লাভ করেছে।

সংস্কৃতে সুপণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃত থেকে কতিপয় নাটক বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। বেণীসংহার (১৮৫৬), রত্নাবলী (১৮৫৮), অভিজ্ঞান শকুন্তলা(১৮৬০) ও মালতীমাধব (১৮৬৭)—এই চারটি নাটক সংস্কৃত থেকে অনূদিত। এদের স্বচ্ছন্দ অনুবাদে স্থানে স্থানে মূলের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। 'রত্নাবলী' নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়াতেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের রুক্মিণীহরণ (১৮৭১), কংসবধ (১৮৭৫) ও ধর্মবিজয় (১৮৭৫)—এই কয়টি নাটক পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত। তিনি কয়েকটি প্রহসনও রচনা করেছিলেন। যথা : যেমন কর্ম তেমন ফল (১২৭৯ বঙ্গাব্দ), উভয় সঙ্কট (১৮৬৯), চক্ষুদান (১৮৬৯) প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক সমস্যাই এই প্রহসনগুলোর বিষয়বস্তু। স্বপ্নধন (১৮৭৩) রোমান্টিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক। বাল্যবিবাহ প্রথার দোষ দেখিয়ে রচিত সম্বন্ধসমাধি নাটক (১৮৬৭) রামনারায়ণের রচনা বলে অনুমিত হয়। সমকালীন সামাজিক দুর্নীতির প্রতি কটাক্ষপাত করে যে সমস্ত নাটক সে সময়ে রচিত হয়েছিল তাদের মধ্যে রামনারায়ণের 'নবনাটক' (১৮৬৬) শ্রেষ্ঠ। তাঁর সমস্ত নাটকের মধ্যে একেই পূর্ণ নাট্যমর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক' এই নামকরণের মাধ্যমেই নাটকটির পরিচয় ফুটে উঠেছে।

এই নাটকটিও পুরস্কার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পর-নির্দেশিত বিষয়ে রচিত। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পক্ষ থেকে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। রামনারায়ণ এই নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য 'নবনাটক' প্রকাশের আগেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। রামন্যারায়ণ তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নাটকের ভাষা-বিন্যাস ও পরিণতিতে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণের' প্রভাব লক্ষ করা চলে। বহু মৃত্যুজনিত ট্র্যাজেডি সৃষ্টি 'নীলদর্পণের' প্রভাবের ফল।

রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলা নাটকের ইতিহাসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক তৎকালীন নাট্যসাহিত্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সমকালীন সমাজব্যবস্থার কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিকগুলো নাটকে রূপায়িত করতে গিয়ে আঙ্গিকগত দিক থেকে তাঁর চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুণে শুধু তিনি যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তা নয়, বরং তাঁর অনুবর্তী একটা নাট্যধারার সৃষ্টি সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। রামনারায়ণের নাটকের অভিনয় সাফল্যের পর থেকেই অভিনয় শিল্পে এবং বাংলা নাটক রচনায় প্রবল উদ্দীপনা দেখা দেয়। এর ফলে একদিকে যেমন অজস্র নাটক রচিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অভিনয়যোগ্য নাটকের প্রয়োজন প্রকাশ পেয়েছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) সগৌরব আবির্ভাব ঘটেছিল নাট্যরচনার সূত্র ধরে। বাংলা নাটকের দীনহীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা বৈচিত্র্যমুখী হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাট্যকার হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্থান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) বাংলা নাটকে প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম হয়। এই নাটকের পূর্বেকার বাংলা নাটকে কৌতুকরসের বাহুল্য, রচনার গুরুভার ইত্যাদি ত্রুটি বিদ্যমান ছিল। মধুসূদন পূর্ববর্তী প্রভাব কাটিয়ে বাংলা নাটককে উদ্দেশ্যহীন গতি থেকে মুক্তি দিয়ে কাহিনিবিন্যাস, ঘটনার সংস্থাপনা এবং কৌতুক-রসের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে এক নতুন জীবনদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি, কাহিনিতে নিরবচ্ছিন্ন গতি, নাট্যরীতিতে পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ ইত্যাদির ফলে বাংলা নাটক তাঁর হাতেই ভাবীকালের পথের সন্ধান পেয়ে সার্থকতর সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয়।

কলকাতার বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ের সংস্পর্শে এসে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। পুরাণকাহিনি অবলম্বনে রচিত 'শর্মিষ্ঠা' নাটক ব্যতীত মাইকেল পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটক এবং সামাজিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) নামক প্রহসন রচনা করেছিলেন। এগুলো ছাড়া মধুসূদন শেষজীবনে 'মায়াকানন' নাটক রচনা করেন এবং তা তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৭৪ সালে

প্রকাশিত হয়। তবে নাটক হিসেবে তা অন্যান্য নাটকের মত সার্থকতা লাভ করতে পারে নি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে নতুন আদর্শ অবলম্বনে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার প্রথম ফসল 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রথম সংস্করণে সংস্কৃত নাটকের আদর্শে শুরুতে 'প্রস্তাবনা' এবং শেষে 'উপসংহার গীত' সংযোজিত ছিল। পরে তা পরিত্যক্ত হয়।

প্রস্তাবনাটি ছিল এ রকম :

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারত ভূমি, কত নিদ্রা যাও তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর, হইল, হইল ভোর;
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে জাগ মাগো, বিভুস্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়।

এতে পৌরাণিক কাহিনি, সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষণ এবং পাশ্চাত্য রোমান্টিক নাট্যকলার আদর্শ স্থান পেয়েছে। সংস্কৃত নাটকের অলংকার, অঙ্কের আদর্শ, নান্দী-প্রস্তাবনা সূত্রধার প্রভৃতি বর্জিত হয়ে এই নাটকটি প্রথম সার্থক বাংলা নাটক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। তৎকালীন অপরিকল্পিত প্লট অথবা দৃশ্যহীন নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে এই নাটকটিকে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৃষ্টি বলে ধরা যায়। এই নাটকে কাহিনির ঘনবিন্যাস এবং সংলাপ সৃষ্টিতে মাধুর্য থাকায় এতে সত্যিকার নাট্যরসের সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রিক পুরাণের আখ্যায়িকা হিন্দু পুরাণের ছাঁচে ঢেলে হিন্দু ধর্মসংস্কারানুযায়ী রূপ প্রদানপূর্বক মাইকেল মধুসূদন তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। শর্মিষ্ঠার তুলনায় দৃশ্যস্থাপনা এই নাটকে অবিন্যস্ত; তবে এতে চমকপ্রদ কাহিনির মাধ্যমে নাট্যরস সৃষ্টি হয়েছে। গল্পসর্বস্বতা, বৈশিষ্ট্যহীন চরিত্রচিত্রণ এ নাটকে লক্ষণীয়। 'পদ্মাবতী' নাটকেই মাইকেল প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। তবে এর ভাষারীতি প্রধানত গদ্য।

মধুসূদনের পরবর্তী নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজিডি নাটক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে লিখিত এটিই প্রথম বাংলা নাটক। তবে ইতিহাসের মূল কাহিনির সঙ্গে নাট্যকাহিনির সংযোগ ক্ষীণতম

বলে একে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। এই নাটকটি সমসাময়িক ও পরবর্তী অনেকগুলো নাটকের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কৃষ্ণকুমারীর কাহিনি নাট্যোপযোগী ও দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং এর স্বাভাবিক পরিণতির মধ্যে কোন অসংলগ্নতাও পরিদৃষ্ট হয় না। মানবীয়তা এই নাটককে বাস্তবতার অনুসারী করেছে। প্রতীচ্য আঙ্গিকের ব্যবহারে রচিত 'কৃষ্ণকুমারী' মাইকেলের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। নাট্যকাহিনিটি টডের 'রাজস্থান' থেকে গৃহীত। কৃষ্ণকুমারী নাটক বাংলা ঐতিহাসিক রোমান্টিক ট্র্যাজেডির পথপ্রদর্শক।

মাইকেলের সর্বশেষ নাটক 'মায়াকানন' কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। 'রিজিয়া' ইসলামি বিষয়ে রচিত অসমাপ্ত নাটক।

মধুসূদনের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বাংলা নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রহসনের পর্যায়ে স্থান লাভ করতে পারে। প্রথম প্রহসনটির মধ্যে তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষাভিমানী যুবসম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অন্যটির মধ্যে অধর্মচারী লোকের ভণ্ডামি এবং চরিত্রহীনতার চিত্র বিদ্যমান। নাট্যকার প্রহসন দুটিতে টাইপ জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করে সমকালীন সমাজের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। এগুলোর অনুসরণে পরবর্তীকালে এই প্রকার অনেকগুলো প্রহসনের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রহসন হিসেবে নিখুঁত এই রচনা দুটিকে বাস্তবতাপ্রধান বলে অভিহিত করা যায়। প্রহসন দুটিতে কথ্য বাগ্‌ভঙ্গির সাবলীলতা, চরিত্রোপযোগী সংলাপ ও বাস্তব পরিবেশ-সচেতনতা নিঃসন্দেহে উৎকর্ষের কারণ হয়েছে। নব্যবঙ্গ সমাজ এবং প্রাচীন বকধার্মিক বৃদ্ধ সমাজ-নায়কদের নৈতিক অনাচারকে মাইকেল সমপরিমাণেই কটাক্ষের রূঢ় আঘাত করেছিলেন।

মাইকেল মধুসূদনের নাট্যরচনার কাল মাত্র দু বছর। এই স্বল্পকালের মধ্যে তাঁর সাফল্য বিস্ময়কর। তাঁর নাট্যরচনায় দ্বন্দ্বসংঘাতের ফলে ঘনীভূত নাট্যরসে, নাটকীয় রসপুষ্টির জন্য ঘটনাবিন্যাসে এবং চরিত্রসৃষ্টি ও মূল্যায়নে আধুনিক যুগের বাঙালির প্রাণধর্ম ও জীবননিষ্ঠতার পরিচয় সুস্পষ্ট। মধুসূদনের নাটকে একদিকে যেমন মানবজীবনের বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মানবমনের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করা হয়েছে।

মধুসূদনের হাতে বাংলা নাটক রচনার ভাষা, কাহিনির পরিকল্পনা, চরিত্রসৃষ্টির আদর্শ বিশিষ্ট রূপ লাভ করে সার্থক বাংলা নাটকের অগ্রগতি সাধন করেছে।

দীনবন্ধু মিত্র

বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮২১-৭৩)। আধুনিক যুগের সূত্রপাতে যে সমাজচেতনা পরিলক্ষিত হয়েছিল তার স্বরূপ তৎকালীন লেখকদের রচনায় লক্ষণীয়। হিন্দু সমাজের বহুবিধ কুসংস্কার যে ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনকে ঘোরতর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত করেছিল তা দূর করার জন্য এই সময়ের সমাজসচেতন লেখকগণ সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলে, বাংলা নাটকের প্রাথমিক ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ নাট্যকারের রচনায় সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিকটি প্রতিফলিত করার চেষ্টা দেখা যায়। দীনবন্ধু মিত্রের হাতে এই শ্রেণির নাট্যসৃষ্টি ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। সমাজের চিত্র রূপায়ণের ঊর্ধ্বে

মানবমনের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা প্রকাশেই তাঁর প্রকৃত কৃতিত্ব প্রকাশমান। গতানুগতিক বাংলা নাটক ও প্রহসনে দীনবন্ধু মিত্র গঠনকৌশলের দিক থেকে কোন অগ্রগতি সাধন না করতে পারলেও তাঁর নাটকে অঙ্কিত চরিত্রাবলী বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের বিচিত্র পরিচয় তিনি লাভ করেছিলেন বলে তাঁর রচনায় বাস্তব অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক বেনামীতে মুদ্রিত 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। এদেশে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে। নাটকটিতে নাট্যকারের প্রত্যক্ষ স্বজাতি-প্রেম এবং বিদেশী শাসকের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। নাটকটির নাম ছিল 'নীলদর্পণম নাটকম' এবং বিজ্ঞপ্তিটি ছিল : 'নীলকর-বিষধর-দংশনকাতর-প্রজা নিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনাচৎ পথিকেনাভি প্রণীতম।' নাটকে নাট্যকারের নাম ছিল না। অনুমান করা হয় এটি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন এবং অনুবাদের প্রকাশক হিসেবে নাম থাকায় পাদ্রী রেভারেন্ড লং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। নীলকরেরা কি ধরনের অত্যাচার করত সে সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, 'নীলকর কর্তৃক টাকা দাদন দিয়ে উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষে চাষীকে প্ররোচনা, আশানুরূপ ফসল না হলে পর বছর নীল উৎপাদনে তাকে বাধ্য করান, নীল চাষের জন্য দশ বছরের চুক্তি, পুরুষানুক্রমে নীলকরের আজ্ঞাবহ প্রজায় পরিণতি, নীলকরদের জমিদারী তালুকদারী ক্রয়, প্রজাবৃন্দের দ্বারা বেগার খাটান, চুক্তি ভঙ্গকারী চাষীদের নীলকুঠিতে কয়েদ রাখা প্রভৃতি যত রকমের অত্যাচার উৎপীড়ন হতে পারে, নীলকরেরা নির্বিঘ্নে নীল চাষীদের ওপর তা করতে লাগল।' নারী নির্যাতন, পারিবারিক সম্ভ্রমহানি, নরহত্যা ইত্যাদি কাজও তারা করতে থাকে। বাস্তব চিত্র রূপায়ণের ফলে সে আমলে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারে এদেশে কৃষকজীবনের দুর্বিষহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে এই নাটকটির গুরুত্ব অপরিসীম। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক নাটক হিসেবে রচিত হলেও এর মধ্যে গ্রাম্যলোকের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা তৎকালীন নাট্যসাহিত্যে ছিল একান্তই অভিনব। নাটকটির মধ্যে এদেশের শাসক ও শাসিতজনের সম্বন্ধ, অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশের অবস্থা, সভ্য মানুষের মধ্যে বর্বরতার পরিচয় প্রভৃতি দিকগুলো সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছিল। নাট্যকারের বাস্তব অভিজ্ঞতা নাটকটির উপজীব্য হলেও স্থানে স্থানে তাঁকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে; তবে এই পর্যায়ে তাঁর সার্থকতার তেমন পরিচয় মিলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, 'তাঁহার চরিত্র প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন।' এইজন্য তাঁর কাহিনি কল্পনার মধ্যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এই নাটকে উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলোর ভূমিকা যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। পক্ষান্তরে সমাজের নিচুস্তরের চরিত্র সৃষ্টি যথেষ্ট সার্থক হয়েছে। এই নাটকে বিশেষ সময়ের কতকগুলো অসহায় মানুষের ওপর নিপীড়নের মোটা রঙের চিত্রের অতিরিক্ত আর কিছু নেই। তবে এর গ্রাম্য ভূমিকাগুলোর মধ্যে মানবজীবনের যে খণ্ডিত রূপটুকুর পরিচয় মিলে তা সমসাময়িক নাটক থেকে 'নীলদর্পণ'কে বিশিষ্ট করেছে। নাট্যরচনার মাধ্যমে রাজদ্রোহের প্রকাশ দীনবন্ধু মিত্রের উদ্দেশ্য ছিল না। অসহায় প্রজাদের দুঃসহ

লাঞ্ছনার প্রত্যক্ষ চিত্র উদঘাটন করে প্রজাজননী মহারানীর করুণা উদ্রেক করাই ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে সফল হলেও নীলদর্পণের নাট্যসম্ভাবনা বহুলাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। নাটকে অঙ্কিত চিত্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'বস্তুত করুণ থেকে করুণতম,—বীভৎস থেকে বীভৎসতম চিত্রের উদ্ধারে 'নীলদর্পণ' নাটক লোমহর্ষরূপ পরিগ্রহ করেছিল; নীলকরদের পাশবিক উৎপীড়নের দর্পণ হয়ে উঠেছিল যথার্থই। তাই প্রকাশ্য মঞ্চে আত্মহত্যা, শ্বাসরুদ্ধ করে উন্মাদিনী স্নেহশীলা শাশুড়ি কর্তৃক পুষ্প-প্রতিমা বালিকা-বধূর নিধন, একাধিক মৃত্যু, প্রকাশ্যে নারীধর্ষণ-প্রয়াস ইত্যাদি অসহনীয় বীভৎস চিত্রের একের পর একের অবতারণা করা হয়েছে। এই অপরিমিত অতিচার- চিত্র দর্শকমনে রসানুভবের উদ্রেক যত পারে, যথাসময়ে স্তব্ধ আতঙ্কেরই সৃষ্টি করেছিল তার চেয়ে বেশি।'

'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) দীনবন্ধু মিত্রের দ্বিতীয় নাটক। এতে যে দুটি ভিন্ন কাহিনি স্থান পেয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে মিশ্রিত হয় নি। 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) নামক প্রহসনে তৎকালীন ইয়ংবেঙ্গল দলের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। প্রহসনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' অনুসরণে রচিত। এতে গ্রাম্যতা ও রুচিবিকল্পতা থাকলেও তা গুরুত্বপূর্ণ রচনা। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লিখিত একটি প্রহসন। নামের মাধ্যমেই এর পরিচয় প্রকাশমান। দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' (১৮৬৭) নাটকটি রচনা হিসেবে সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। 'জামাই বারিক' (১৮৭২) প্রহসনটি সামাজিক বিষয়াবলম্বনে রচিত। জামাতা পোষণ পদ্ধতি ব্যঙ্গ করে লিখিত এই নাটকে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। 'কমলে কামিনী' (১৮৮৩) তাঁর শেষ রচনা। রোমান্টিক প্রণয়চিত্র হিসেবে এর গুরুত্ব।

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের যথেষ্ট অভিনয়োপযোগিতা থাকায় সাধারণ নাট্যশালায় সেগুলো অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তৎকালীন জনসমাজে প্রহসন জাতীয় নাট্যরচনা সমাদৃত হত। দীনবন্ধু মিত্রের এই শ্রেণির রচনায় কৌতুকরসের প্রাধান্য ছিল বলে তা যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। মানবজীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-অনাচার প্রভৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি হাস্যরসের অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে একটা স্বাভাবিকতাও রয়েছে। তিনি ভাষা ব্যবহারের দিক থেকেও বিভিন্ন শ্রেণির লোকের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটক রচনার মাধ্যমে বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বাংলা নাটকের সমৃদ্ধিসাধনে গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) অবদান অপরিসীম। যশস্বী অভিনেতা এবং প্রতিভাশালী নাট্যকারের যুগ্মবৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে তিনি পঁচাত্তরখানি সমাপ্ত ও চারখানি অসমাপ্ত নাটক-প্রহসন রচনা করেন। এতে বাংলা নাটকের ইতিহাস যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে এবং তিনি সে সময়কার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকার হিসেবে গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করতে সক্ষম হন। নাটক ও রঙ্গমঞ্চের মধ্যে যে নিবিড় যোগসূত্র বিদ্যমান তার পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকার

ও অভিনেতার যুগ্মপ্রতিভার সমাবেশে তিনি বাংলা নাটক ও মঞ্চের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। অভিনয়ে তাঁর অতুলনীয় দক্ষতা নাট্যরচনার পশ্চাতে কার্যকরী ছিল। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে তিনি নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর সমসাময়িক কালে বাংলা নাটক রচনার ব্যাপারে বিশেষ উদ্দীপনারও সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে সাড়া দিতে গিয়ে গিরিশ ঘোষ প্রথমত গীতিবহুল কাহিনি অবলম্বনে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং বাংলা নাট্যধারা সুপুষ্ট করে এর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হন।

গিরিশচন্দ্রের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা ছিল 'নটগুরু' হিসেবে। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় ধারা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি নাট্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অভিনয়-সাফল্য তাঁর নাট্যরচনা প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল।

গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটক রচনায় সাহিত্যের প্রয়োজনের চেয়ে মঞ্চের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই শেষ বয়সে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'একখানি নাটকও তিনি নিজের ইচ্ছামত লিখে যেতে পারেন নি।' এই আক্ষেপে নটের কাছে নাট্যকারের পরাভবই ব্যক্ত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রথমে নট ও মঞ্চাধ্যক্ষ, পরে নাট্যকার।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু ধর্ম সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর নাট্যরচনার পশ্চাতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল সমাজসচেতনতা। গিরিশচন্দ্রের সমগ্র নাট্যসাহিত্যকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় : ১. ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক বিষয়ের নাটক, ২. পৌরাণিক-ভক্তিমূলক নাটক, ৩. সামাজিক-পারিবারিক নাটক এবং ৪. প্রহসন।

ঐতিহাসিক নাটকগুলোর মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীর কাসিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরিশ ঘোষ সব নাটকের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিক নাটকে যে মহান চরিত্রের পরিচয় আকাঙ্ক্ষিত তা গিরিশ ঘোষের নাটকে বিদ্যমান। বীররস সৃষ্টির স্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে তা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবে প্রতিভাত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার আদর্শ বিগ্রহে পরিণত করেছিলেন। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় স্বাধীন বাংলার শেষ নবাব, ইংরেজ ঐতিহাসিকদের হাতে কুৎসা-কণ্টকিত, সিরাজদ্দৌলার নতুন দেশভক্তরূপ আবিষ্কার করেছিলেন। নাটকে তা যথাযথ রূপায়িত হয়েছিল। নাটকে সিরাজ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সিরাজের উক্তিতে :

স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন,
হিতাহিত ছিল না বিচার,
মদ্যপানে করিয়াছি
শত শত দুর্নীতি ব্যাভার
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন
বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ শয্যায়,
শেষ বাক্যে তাঁর

জন্মিয়াছে ধারণা আমার,
রাজকার্য নহে স্বেচ্ছাচার।
নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে
প্রজার মঙ্গল সাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।

পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকগুলোর মধ্যে 'রাবণবধ', 'রামের বনবাস', 'অভিমন্যুবধ', 'ধ্রুবচরিত্র', 'পাণ্ডবগৌরব', 'জনা', 'বুদ্ধদেব', 'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই প্রকারের নাটক রচনায় তাঁর প্রতিভার সার্থক বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে। এই সমস্ত নাটকে তাঁর প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে দেখা দিয়েছে। পরিচিত পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই নাটকগুলোর মধ্যে ভক্তিরসের প্রাবল্য এবং অলৌকিকতার নিদর্শন সুপরিস্ফুট। ভক্তি বা ধর্মমূলক নাটকগুলোর মধ্যে ভক্তিরসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হওয়ার কারণ নাট্যকারের ধর্মজীবনের অভিজ্ঞতার প্রভাব। তাঁর নিজের ধর্মমতে উদারতা বিদ্যমান ছিল বলে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদ অবলম্বনে নাটক রচনায় তিনি সার্থকতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। গিরিশ ঘোষের নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার পরিচয়ও এই ভক্তিমূলক নাটকগুলোর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

বাঙালি সমাজজীবন, সংসারচিত্র, বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথাবেদনা অবলম্বনে গিরিশচন্দ্রের সামাজিক ও পারিবারিক নাটকগুলো রচিত। 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'শাস্তি কি শান্তি' প্রভৃতি নাটকের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের স্বরূপ চিত্রিত করতে গিয়ে তাতে নাটকীয় উপকরণের অভাব লক্ষ করেছিলেন। এই অভাব দূর করার জন্য তিনি তাঁর নাটকে জাল জুয়াচুরি প্রতারণা হত্যা ইত্যাদি কার্যকলাপের স্থান দিয়েছেন। এই শ্রেণির নাটক রচনায় গিরিশ ঘোষ দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন।

গিরিশ ঘোষের প্রহসনগুলোর মধ্যে 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিক বাজার', 'বড়দিনের বকশিস', 'সভ্যতার পাণ্ডা' প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে। নিতান্ত সাধারণ ঘটনা অবলম্বনে সংক্ষিপ্তাকারে এই গ্রন্থগুলো রচিত। তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষিত সমাজের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপও কোন কোন প্রহসনে স্থান পেয়েছে। তবে রুচিশীলতার দিক থেকে এই প্রহসনগুলো তেমন গুরুত্বলাভ করতে পারে নি। প্রহসন রচনায় গিরিশ ঘোষ প্রাচুর্যের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারেন নি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমকালীনতার সীমা এসব প্রহসন অতিক্রম করে নি।

'মণিমালা', 'স্বপ্নের ফুল', 'আবু হোসেন' প্রভৃতি গীতিনাট্য রচনা করে এই ক্ষেত্রেও গিরিশ ঘোষ তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

নাট্যমঞ্চের সঙ্গে গিরিশ ঘোষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে নাট্যরচনায় তিনি বিশেষ সার্থকতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। বিশেষ কোন মঞ্চ চরিত্রের উপযোগী করে নাটক রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাছাড়া, বাঙালি মানসের ধর্মভীরুতা, জীবনে নীতি-আদর্শের প্রভাব, মহাপুরুষ চরিত প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত নাটকের জন্য তিনি দর্শকদের চিত্ত জয় করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তাঁর নাটকে আবেগই প্রাধান্য লাভ করেছে—জীবনের গভীরে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাঁর

নাট্যরচনায় উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য শিল্পেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে গিরিশ ঘোষ আন্তরিকতা সহকারে সারল্য ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ভাষারীতি অবলম্বনে বাংলা নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গালয়ের সেবা করে গেছেন।

গিরিশ ঘোষের কোন কোন নাটকে তাঁর নিজের প্রবর্তিত 'গৈরিশ ছন্দের' ব্যবহার হয়েছে। এতে তিনি যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেন। অভিনয়ের উপযোগী ভাষাসৃষ্টির উদ্দেশ্য এর পশ্চাতে কার্যকরী ছিল। তাঁর গৈরিশ ছন্দের নমুনা :

যবে ধনু ধরি করে,
ঘোর সিংহনাদে প্রবেশ করেছি রণে—
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর আদি চরাচর
কে কবে হয়েছে স্থির ?
যদি যায় প্রাণ মাতঃ করগো কল্যাণ
সেই দর্পে সেই শরাসন করে
সেই রণক্ষেত্রে আনন্দ যথায় মম
হইব ধরণীশায়ী অনন্ত শয্যায়।

গিরিশ ঘোষের অনুবর্তী নাট্যকারগণের ওপর এই ছন্দের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালের ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য।

গিরিশ ঘোষের নাটকে দেশীয় ও জাতীয় ভাবই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। তবে বিদেশী ভাব ও সাহিত্যাদর্শ তিনি অস্বীকার করেন নি। তিনি নিজেই বলেছেন, 'মহাকবি সেক্সপীয়রই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি।' তাঁর নাটকে এই মন্তব্যের সমর্থন মিলে।

মনোমোহন বসু

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) নাট্যরচনায় খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সে সময়ে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ অনুসরণে নাটক রচনার যে প্রবণতা ছিল তিনি তা উপেক্ষা করে প্রাচ্য আদর্শ অবলম্বন করেন। তিনি মঞ্চাশ্রয়ী নাট্যকলার কাঠামোর ওপরে যাত্রাধর্মী বর্ণনা, আবেগ ও সংগীতরস পরিবেশন করে বাঙালির পক্ষে নতুন নাট্যস্বাদ-সম্ভাবনার পথ উৎসারিত করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, ইউরোপীয় নাট্য আঙ্গিক যথাযথ অনুসরণ করা এদেশে রসপ্রসূ হবে না—একথা বিবেচনা করে তিনি নতুন আঙ্গিকের অবতারণা করেছিলেন। তাঁর কতিপয় সামাজিক নাটক থাকলেও নতুন ধরনের পৌরাণিক নাটক রচনায়ই যথার্থ কৃতিত্ব ছিল। তিনি যাত্রাজাতীয় নাটক রচনা করেন। এতে অভিনয় যোগ্যতা বেশি থাকায় তা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি ছিলেন একজন উত্তম গীতিকার। তাঁর নাটকে সে নিদর্শন বিদ্যমান। নাটক রচনায় তিনি গানের প্রাধান্য দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'ইউরোপে নাটককাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। এটি জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পাঠ পর্যন্ত সুর সংযোগ ভিন্ন সাধিত হয় না; যে দেশের অপর সাধারণ জনগণ পরাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার হীনতা ও দীনতার হস্তে পড়িয়াও পূর্ব গন্ধর্ববিদ্যায় উন্নত

অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গে অত্র বঙ্গে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ফুল ও হাফ আখড়াই, কীর্তন, তর্জা, মরিচা ভজন প্রভৃতি নিত্য নূতন সঙ্গীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী। অধিক কি, যে দেশের দিব্যভিক্ষু ও পথভিখারীরাও গান না শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, সে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি ?'

মনোমোহন বসুর পৌরাণিক নাটক হল : 'রামাভিষেক নাটক' অথবা 'রামের অধিবাস ও বনবাস', 'সতী', 'হরিশচন্দ্র'; সামাজিক নাটক : 'প্রণয়পরীক্ষা' ও 'আনন্দ নাটক'। তাঁর পৌরাণিক নাটকের বিষয়বস্তু পুরাণকাহিনি থেকে সংগৃহীত হলেও তাতে ধর্মীয় তত্ত্ব-উপদেশ প্রাধান্য পায় নি, নাটকগুলোর চরিত্র মানবীয় হয়ে পড়েছে। তাঁর সামাজিক নাটকের উপজীব্য ছিল সামাজিক কুপ্রথা।

নাট্যরচনা ছাড়াও মনোমোহন বসু শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গান রচনা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। 'মনোমোহন গীতাবলী'তে বিচিত্র বিষয়ে রচিত গান সংগৃহীত হয়েছে। মনোমোহন বসু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও পরিচিত ছিলেন।

মীর মশাররফ হোসেন

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) বাংলা গদ্যসাহিত্যে মুসলিম লেখক হিসেবে সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমান-মানসের নবজাগরণের তিনি ছিলেন অগ্রদূত। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'বঙ্গবাসী মুসলমানদের দেশভাষা বা মাতৃভাষা বাংলা। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে।' সাহিত্যের অপরাপর ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের সঙ্গে বাংলা নাটক রচনায়ও তাঁর প্রতিভা সমধিক বিকশিত হয়েছে। বিশেষত যে সময়ে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের কোন উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল না সে সময়ে তিনি নাটক রচনা করে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছেন।

নাট্যরচনায় মীর মশাররফ হোসেনের প্রতিভার নিদর্শন চারটি নাটক ও চারটি প্রহসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁর নাটকগুলোর নাম : 'বসন্তকুমারী নাটক', 'জমীদার দর্পণ', 'বেহুলা গীতাভিনয়' ও 'টালা অভিনয়'; প্রহসনগুলোর নাম : 'এর উপায় কি', 'ভাই ভাই এইতো চাই', 'ফাঁস কাগজ' ও 'একি'।

মীর মশাররফ হোসেনের নাটকগুলোর মধ্যে 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩) উল্লেখযোগ্য। এই নাটকটিকে মুসলমান নাট্যকার রচিত প্রথম নাটক হিসেবে নির্দেশ করা যায়। ইন্দ্রপুরের বিপত্নীক রাজার বৃদ্ধ বয়সে যুবতী স্ত্রী গ্রহণ, রাজার যুবক পুত্রের প্রতি বিমাতার আকর্ষণ এবং প্রেম নিবেদন, পুত্রের প্রত্যাখ্যান ও বিমাতার ষড়যন্ত্র, পরিশেষে রাজপরিবারের সকলের মৃত্যু—এই কাহিনি অবলম্বনে 'বসন্তকুমারী' নাটক রচিত। নাটকটির অপর নাম 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'—কাহিনির তাৎপর্য প্রকাশক। মানুষের দেহাশ্রিত কামনাবাসনার যে বিচিত্র অভিব্যক্তি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে 'বসন্তকুমারী' নাটকে তা প্রকাশের মাধ্যমে মীর মশাররফ হোসেন মুসলমান সাহিত্যিকগণের মধ্যে পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন। কাহিনি গ্রন্থনের সুসংবদ্ধতা, সংলাপের বিচিত্র চাতুরী এবং সর্বাঙ্গীন প্রাণবন্ত ভাবপরিমণ্ডল এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য নাটকটির স্বাতন্ত্র্য বিবেচ্য।

'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) মীর মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় নাটক। জমিদারির ম্যানেজার হিসেবে নিজের পরিবেশে জমিদারদের অত্যাচারী মনোবৃত্তির যে পরিচয়টি লেখক লাভ করতে পেরেছিলেন তারই প্রকাশ 'জমীদার দর্পণ' নাটকে লক্ষণীয়। নাটকটির নামের মাধ্যমেই এর ওপর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। তবে বিষয়বস্তু, ঘটনা সংস্থাপন ও চিত্রসৃষ্টিতে এ নাটকে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। মুসলমান চরিত্রাবলম্বনে প্রথম রচিত এই নটকে জমিদারদের অত্যাচারের চিত্র রূপায়ণই লক্ষ্য। কৃষকদের জীবনে জমিদার যে কতটুকু অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে পারে তা এখানে প্রকাশমান। নিপীড়িত মানুষের প্রতি লেখকের যে সহানুভূতি ছিল তার প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়। 'জমীদার দর্পণ' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিখ্যাত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।

জমীদারদিগের অত্যাচার উদাহরণ দ্বারা বর্ণিত করা উহার উদ্দেশ্য। নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমীদার সম্বন্ধে ইহার সেই উদ্দেশ্য।' মুনীর চৌধুরীর মতে, 'এই দর্পণে এক বিশেষ প্রকৃতির বর্বরোচিত অত্যাচারের কদর্যতা হয়ত অবিকল প্রতিবর্ণিত হয়েছে কিন্তু তার শিল্পসঙ্গত রূপান্তর সাধিত হয় নি।'

'এর উপায় কি' (১৮৭৬) মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম প্রহসন। বইটির ওপর হয়ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসনের প্রভাব আছে। প্রহসন রচনাকারী হিসেবে এই পর্যায়ে মীর মশাররফ হোসেনের সার্থকতার পরিচয় বিদ্যমান। লেখক সামাজিক অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর প্রহসনে সে মনোভাবের পরিচয় মিলে। তিনি নিজের জীবনে সহজ বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে তাঁর নাটক-প্রহসনে তা প্রতিফলিত করেছিলেন। অন্যায়-অনাচার রূপায়ণে তাঁর সাহসিকতাও নাটকে প্রকাশমান এবং তা প্রশংসার্হ। চরিত্রসৃষ্টিতে মীর মশাররফ হোসেন পূর্বসূরীর অনুসারী হলেও তাঁর কৃতিত্ব এই ক্ষেত্রে সমধিক। নাটকে ভাষার লালিত্যবৃদ্ধি এবং সঙ্গীত সংযোজনা তাঁর নিজস্ব শিল্পকুশলী মনের পরিচায়ক। মীর মশাররফ হোসেন 'জমীদার দর্পণ' নাটকে চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। জমিদার হায়ওয়ান আলী চরিত্রটি অত্যাচারী জমিদারের প্রতীক হিসেবে রূপলাভ করেছে। ছোটখাট চরিত্র রূপায়ণেও নাট্যকারের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সংলাপ রচনায়ও তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষ করার মত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) ঐতিহাসিক নাটক রচনার মাধ্যমে জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রয়াস পান। উনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে যে জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারণ ঘটেছিল তারই প্রতিফলন তাঁর নাটকে লক্ষণীয়। জাতীয় জীবনে চেতনা সঞ্চারের জন্য বিশেষ আদর্শে তাঁর নাটক রচিত বলে তাতে ইতিহাসের চরিত্র কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে এবং প্রয়োজনবোধে অনৈতিহাসিক চরিত্রও স্থান পেয়েছে। তবে তাঁর নাটকে জাতীয় উদ্দীপনার চেয়ে স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্য প্রভৃতির দ্বন্দ্বসমস্যাই প্রকট।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ দেশের ইতিহাসের ঘটনা কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯), 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২)। তাঁর এ সব নাটক বীররসাত্মক। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য লেখক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বিষাদাত্মক নাটক রচনার জন্যও তিনি খ্যাতিমান ছিলেন।

প্রহসন রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। সমাজজীবন থেকে তাঁর প্রহসনের উপকরণ সংগৃহীত হলেও তিনি সমাজের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নি। তাঁর প্রহসনে বাস্তবতার নগ্নতার পরিবর্তে রুচিশীল হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর প্রহসনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২), 'এমন কর্ম আর করব না' (১৮৭৭), 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬), 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' ইত্যাদি। প্রহসন রচনায় তিনি অনুবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফরাসি থেকে গৃহীত তাঁর অনুবাদগুলো বিশিষ্ট। অনেকগুলো সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ইংরেজি থেকেও তাঁর অনুবাদ নাটক রয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যসৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য সেকালের পক্ষে দুর্লভ আঙ্গিক-চেতনা, তথা স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন প্লট ও সংলাপের রচনায়। তাঁর শিল্প-মননের মূলে একটি আভিজাত্য ছিল, সে কেবল ঠাকুরবাড়ির জীবনযাত্রার ফল নয়, শিল্পীর ঘনিষ্ঠ ফরাসি সাহিত্যচর্চার দ্বারাও তা প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর অনুবাদ নাটকের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। ভাসের নাটক-নাটিকাগুলো প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেসবের অনুবাদ করেছিলেন। এ ছাড়া কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্বশী', ভবভূতির 'উত্তরচরিত', 'মালতী-মাধব', 'মহাবীর চরিত', শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', আর্যক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক', ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার', কৃষ্ণমিত্রের 'প্রবোধ- চন্দ্রোদয়', রাজশেখরের 'বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা', 'প্রিয়দর্শিকা', 'কর্পূরমঞ্জরী' এবং কাঞ্চনাচার্যের 'ধনঞ্জয় বিজয়' প্রভৃতি নাটক তিনি অনুবাদ করেছিলেন।

অমৃতলাল বসু

নাট্যসৃষ্টিতে অমৃতলাল বসুর (১৮৫৩-১৯২৯) স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তিনি হাস্যরসের অবতারণা করে হালকা ভাবে জীবনের বিপর্যয় ও বিকৃতির রূপ দিয়েছেন। অভিনয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠায়ও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কতিপয় নাটক রচনা করলেও প্রহসনের রচয়িতা হিসেবেই তাঁর খ্যাতি বেশি। তাঁর প্রহসনে বিদ্রূপের লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্যভাববিকৃত পুরুষ ও নারীসমাজ। পাশ্চাত্য ভাবধারায় এ দেশের সমাজজীবনে যে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়েছিল তারই প্রতিফলন তাঁর প্রহসনে লক্ষণীয়। তিনি শাণিত কথার বিদ্যুৎদীপ্তিতে দর্শককে বিস্মিত করতে সক্ষম ছিলেন। অমৃতলাল বসু যে সব নাটক রচনা করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'হীরকচূর্ণ নাটক', 'তরুবালা', 'বিমাতা বা বিজয়বসন্ত', 'হরিশ্চন্দ্র', 'আদর্শবন্ধু', 'নবযৌবন', 'যাজ্ঞসেনী' প্রভৃতি। তবে নাটক রচনায় তাঁর খুব সার্থকতার পরিচয় নেই। তাঁর প্রহসনগুলো বিদ্রূপাত্মক প্রহসন ও বিশুদ্ধ প্রহসন—এই দু শ্রেণিতে বিভক্ত। বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'বিবাহবিভ্রাট',

'সম্মতি-সঙ্কট', 'কালাপানি', 'বাবু', 'একাকার', 'বৌমা', 'গ্রাম্যবিভ্রাট', 'বাহবা বাতিক', 'খাসদখল' ইত্যাদি। এ সব প্রহসনে আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্যই রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। বিশুদ্ধ প্রহসনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'চোরের উপর বাটপাড়ি', 'ডিসমিস', 'চাটুয্যে ও বাঁড় য্যে', 'তাজ্জব ব্যাপার' ও 'কৃপণের ধন'। এতে ব্যঙ্গবিদ্রূপের সমাবেশ ঘটেছে, কিন্তু তা কখনও পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে নি। স্নিগ্ধ হাস্যরস এগুলোকে সরস করেছে। প্রহসন হিসেবে এগুলোর সার্থকতা অধিকতর।

অমৃতলাল বসু গীতিনাট্যও রচনা করেছিলেন। তাঁর নাটকে জীবনের গভীরতর রূপের পরিচয় নেই। কৌতুকসৃষ্টি ও হাস্যরস পরিবেশনের প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন, ফলে তাঁর এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর নাটকে গানের বাহুল্য ছিল। তিনি গান ও ছড়া তাঁর রচনার সরসতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছেন। তাঁর গদ্য-কথোপকথন আধুনিক ও ঘরোয়া বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

অমৃতলাল বসু 'রসরাজ' নামে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। নট ও নাট্যকারের উভয় ভূমিকাতে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করাই তাঁর প্রহসন রচনার পটভূমিতে কাজ করেছে। গুরুগম্ভীর নাটক রচনায় তাঁর প্রকাশ ছিল আড়ষ্ট ও কৃত্রিম। কিন্তু তাঁর লেখা প্রহসনের সংলাপ গদ্য ও পদ্য উভয়ক্ষেত্রেই তির্যক, পরিমিত ও অর্থবহ। সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক—সমকালীন প্রায় সব ধরনের বিষয় নিয়েই তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করে গেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

'হাসির গানের রাজা' নামে বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হলেও নাট্যকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি কম নয়। ঐতিহাসিক সামাজিক নাটক ও প্রহসন রচনার মাধ্যমেই তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধ করেছে। নাট্যাভিনয়ে তাঁর কোন দক্ষতা ছিল না; তিনি এদেশীয় ও পাশ্চাত্য নাট্যকারদের আদর্শানুসরণে নাটক রচনার সূত্রপাত করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রহসন ও নাট্যকাব্যের রচয়িতা হিসেবে তাঁর পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক নাটক অবলম্বনে তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলো হল : 'তারাবাঈ' (১৯০৩), 'প্রতাপ-সিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), 'সিংহলবিজয়' (১৯১৫) ইত্যাদি। 'চন্দ্রগুপ্ত' ব্যতীত সকল নাটকের কাহিনি মোগল আমলের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। ইতিহাসের কাহিনি অনুসরণে নাট্যকার অত্যন্ত সাবধানতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। এই সব নাটকে ইতিহাসের পাতা থেকে সংগৃহীত চরিত্রগুলো যেন জীবন্ত করে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাঁর কতিপয় নাটকে দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র স্থান পেয়েছে। স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ তাঁর কয়েকটি নাটকের বৈশিষ্ট্য। এই সমস্ত নাটকের চরিত্র সাংসারিক জীবনের তুচ্ছতা অতিক্রম করে উন্নত ও অনুপম ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ধরনের নাটক রচনার মাধ্যমে জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নাটকে একদিকে মহাপ্রাণের আত্মবলিদানে, চারণের শোকসঙ্গীতে এবং স্বাধীনতাব্রতী জাতির বিরাট ত্যাগের মধ্যে মর্মান্তিক কারুণ্য প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে 'আত্মোৎসর্গের

মহিমা, স্বার্থত্যাগের গৌরব' উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিদ্যমান। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলো সম্পর্কে সমালোচক দেবকুমার রায়চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতি সাবধানতার সহিত লিখিত। কোন স্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে অতিক্রম করেন নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, মাত্র সেখানেই তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত কর্ণপাত করিয়াছে।' দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে নিজে বলেছেন, 'ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাস নয়, কাব্য।'

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পৌরাণিক উপাদানজাত 'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮) 'ভীষ্ম' (১৯১৪) নাটকে পৌরাণিক চরিত্রগুলো আধুনিক বাস্তবের পরিদৃশ্যমান পট-ভূমিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোতে অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতা ক্ষুণ্ন হওয়ার নিদর্শন মিলে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের বস্তুবাদী, ইহসর্বস্ব মন পৌরাণিক ধর্মাদর্শ এবং দেবদেবীর চরিত্রের অলৌকিক মহিমা সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হতে পারে নি। তাই তাঁর নাটক এ ধরনের আধ্যাত্মিক ভাবে মহিমান্বিত না হয়ে মানবীয় ভাবাত্মক হয়ে পড়েছে।

সামাজিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর অস্তোন্মুখ প্রতিভা মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে নাটকীয় উপাদান সন্ধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। 'পরপারে' (১৯১২) ও 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) তাঁর দুটি সামাজিক নাটক।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কতকগুলো প্রহসন রচনা করেছিলেন। তাঁর সে সব প্রহসনের নাম হচ্ছে : 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত', (১৯০২) 'পুনর্জন্ম' ইত্যাদি। প্রহসনগুলো রচনার মাধ্যমেই তিনি পাঠকসমাজে পরিচিত হন। তাঁর হাস্যরসাত্মক গানগুলো এসব প্রহসনের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করেছে। প্রাচীন ও নবীন সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যঙ্গবিদ্রূপ সহকারে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর প্রহসনে ব্যঙ্গবিদ্রূপের কাঁটা তীক্ষ্ণ ভাবে বিদ্যমান।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের নাট্যকলার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে বাংলা নাটকে আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারে সার্থকতা লাভ করেছিলেন। তিনি নাটকের মধ্যে শক্তিশালী, কবিত্বপূর্ণ ও নাটকীয় ভাষা ব্যবহার করে নাটকের উৎকর্ষ ঘটিয়েছিলেন। সুললিত শব্দ, পারিপাট্য সুষম ছন্দমাধুর্য তাঁর ভাষার গুণ। তবে তাঁর অনুসৃত ভাষারীতিতে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটেছে। বিভিন্ন শ্রেণির পাত্রপাত্রীর ভাষা একই ধরনের হওয়াতেও তাঁর নাটকে অপকর্ষ বিদ্যমান। স্বগতোক্তির পরিহার, পৌরাণিক কাহিনিকে বাস্তবানুযায়ী করা প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অবদান গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বৈচিত্র্যপূর্ণ নাট্যসৃষ্টি তাঁর রয়েছে, প্রত্যেক নিদর্শনেই তাঁর অপরিসীম কৃতিত্ব বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে রীতিনীতিগত বন্ধন স্বীকৃত হয়েছিল, কিন্তু তিনি পূর্ববর্তী ধারার বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করে গতানুগতিক নিয়মরহিত নাট্যসৃষ্টিতে সফলকাম হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মপরিচয়ে' লিখেছিলেন, 'একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছু নয়, আমি কবিমাত্র।' আবার 'ছিন্নপত্রাবলীতে' লিখেছিলেন, 'আমার বুদ্ধিতে

যতটা আসে, তাতে তো বোধ হয় কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। এক এক সময় মনে হয় আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার উপযুক্ত নয়।' রবীন্দ্রনাথের কবির এই স্বভাবটি তাঁর অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টির মত নাট্যরচনায়ও প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নাটক কাব্য লক্ষণাক্রান্ত।

রবীন্দ্রনাথ নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেমন বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, তেমনি আঙ্গিক ও অপরাপর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও বৈচিত্র্যের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রপূর্ব নাটকে বাইরের ক্রিয়া ও সংঘর্ষের প্রাধান্য ছিল, তিনি তা পরিহার করে হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য রূপায়ণে সচেষ্ট হন। তিনি নাটকে যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তুলনারহিত। মঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমগ্র জীবন অভিনয়ের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর নাট্যরচনায় তাই নানা পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োগ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদর্শন অপরাপর সাহিত্যসৃষ্টির মত নাটকেও রূপায়িত করে তুলেছেন। এদিক থেকে তাঁর সাঙ্কেতিক নাটকগুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মাধ্যমে তিনি আপন আদর্শবাদ এবং ধর্মনির্ভর দুরূহ জীবনতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। অধ্যাত্মজীবনের নিগূঢ় রহস্য তাঁর নাট্যকৌশলের মাধ্যমে রূপায়িত করা হয়েছে।

নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে অতুলনীয় ভাষাসৃষ্টিতে। তাঁর ভাষায় অনুপম বৈশিষ্ট্যের জন্য নাটকগুলো আবেগপ্রধান ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। তিনি সংক্ষিপ্ত ও পরিমিত সংলাপ ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাষা বক্তব্য প্রকাশের অত্যধিক উপযোগিতা প্রমাণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটককে কয়েক শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। সে সব হচ্ছে : গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, সাঙ্কেতিক নাটক, সামাজিক নাটক, প্রহসন, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি।

গীতিনাট্য হিসেবে 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা'(১৮৮৮) উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রভৃতি কাব্যনাট্য রচিত হয়েছিল। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে মনে হয়, তাঁর নাট্যপ্রতিভা কখনও সঙ্গীত, কখনও কাব্যাশ্রিত ছিল। 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'মালিনী' (১৮৯৬) প্রভৃতি তাঁর কাব্যনাট্য। 'চিত্রাঙ্গদা' থেকে রবীন্দ্রনাটকে নাট্যধর্মিতা অপেক্ষা কাব্যধর্মিতা বেশি প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যনাট্যের কোন কোনটির মধ্যে গদ্য পদ্য সংলাপের মিশ্রণ ঘটেছে। কাব্যনাট্যে কাব্য হচ্ছে উপায় এবং নাটক উদ্দেশ্য। এতে কাব্যরীতি অবলম্বন করলেও নাটকীয়তা প্রাধান্য পায়। 'রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জন' এ ধরনের নিদর্শন।

কতকগুলো রচনায় নাট্যধর্ম অপেক্ষা কাব্যধর্ম প্রাধান্য পেয়েছে বলে সে সব নাট্যকাব্য নামে পরিচিত। 'বিদায় অভিশাপ' এই শ্রেণির নাট্যসৃষ্টি। 'কাহিনি' কাব্য-গ্রন্থের কবিতাগুলো এই শ্রেণির।

সাঙ্কেতিক নাটকে রবীন্দ্রনাথ অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে সাঙ্কেতিক নাটক ছিল না। প্রমথনাথ বিশী এই শ্রেণির নাটককে তিনটি মূল সমস্যায় বিভক্ত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে : (ক) মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক, (খ) মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং (গ) মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক। এ ধরনের সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯), 'রাজা'(১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা'(১৯২৫), 'রক্তকরবী' (১৯১৬), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২), 'তাসের দেশ' (১৯০৩) ইত্যাদি।

সামাজিক নাটক হিসেবে 'শোধবোধ' ও 'বাঁশরী' উল্লেখযোগ্য।

প্রহসন রচনায় রবীন্দ্রনাথের অবদান বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। তাঁর হাস্যরসে 'একটা সুসংহত পরিমিতিবোধ, একটা সযত্ন-চেষ্টালব্ধ সুপরিপাটি শব্দবিন্যাস এবং অন্তঃশায়ী সুগূঢ় রসের ব্যঞ্জনা' লক্ষণীয়। তাঁর প্রহসনে এই বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলোর নাম : 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'চিরকুমার সভা'(১৯২৬), 'শেষরক্ষা' (১৯২৮), 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭), 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭) ইত্যাদি। সমালোচকের মতে, 'রবীন্দ্রনাথ যে কেবল রোমান্টিক ভাবুকতা-সর্বস্ব গীতিকবি, কিংবা ঔপনিষদ রহস্যবাদের প্রবক্তা 'ঋষি'মাত্র ছিলেন না,—অসংখ্য সবলতা-দুর্বলতায় বিচক্ষণ পূর্ণায়ত মানুষ ছিলেন, তার অভিনবত্বের নিশ্চিত স্বাক্ষর হিসেবেই 'হাস্য কৌতুক' রচনাগুচ্ছের যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্য,—রচনাগুণে নয়, রচয়িতার নিঃসংশয় পরিচয় প্রকাশের অকুণ্ঠ দক্ষতায়।'

নৃত্যনাট্য রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'নটীর পূজা' (১৯২৬), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৭), 'শ্যামা' (১৯৩৯) প্রভৃতি তাঁর নৃত্যনাট্য।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানত কবি। তাই তাঁর নাট্যরচনায় কবিসুলভ বৈশিষ্ট্যের অনুসারী হয়ে আবেগ কল্পনা তত্ত্ব ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। তাঁর নাটক কবিপ্রত্যয়েরই বাহন। তবে তা বাংলা সাহিত্যে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) কয়েকখানি পৌরাণিক ঐতিহাসিক ও হালকা ধরনের নাটক ও গীতিনাট্য রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন মিটানোর জন্য তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করে নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। রোমান্স ও কৌতুকরস সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব ছিল। 'আলিবাবা', 'বেদৌরা', 'বরুণা', 'ভূতের বেগার', 'বাসন্তী', 'কিন্নরী' প্রভৃতি নাটক এই শ্রেণির। তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'বভ্রুবাহন', 'সাবিত্রী', 'উলুপী', 'ভীষ্ম', 'মন্দাকিনী', 'নরনারায়ণ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে প্রয়োজনানুসারী কল্পনার বিকাশ ঘটেছে। এই পর্যায়ে 'প্রতাপাদিত্য', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'পদ্মিনী', 'আশোক', 'চাঁদবিবি', 'বাঙ্গালার মসনদ', 'আলমগীর', 'বিদূরথ' ইত্যাদি ঐতিহাসিক নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি ইতিহাসের চরিত্র নিয়ে কতিপয় কাল্পনিক কাহিনির সাহায্যে নাটক রচনা করেছিলেন। 'খাঁজাহান', 'আহেরিয়া', 'বঙ্গে রাঠোর' ইত্যাদি এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে রঙ্গনাট্য, কাব্যনাট্য ও গীতিনাট্য রচনায়। তিনি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক রচনায়ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছিলেন। তাঁর নাটকে দেশপ্রেম ছিল প্রধান উপজীব্য বিষয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যক্তিত্বে কবি-জনোচিত উচ্ছ্বাস কম ছিল বলে নাট্যরচনায় তাঁর প্রভাব সুদূর প্রসারী হতে পারে নি। তাঁর স্বাদেশিকতা বা পৌরাণিকতা প্রবুদ্ধ নাটকে বিষয়বস্তু প্রায়ই শিথিলবদ্ধ হয়েছে, সংলাপও হয়েছে কৃত্রিম।

রবীন্দ্রোত্তর নাট্যসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বা পরবর্তী নাট্যকারগণ বাংলা নাটকে তাঁদের বৈচিত্র্যপূর্ণ অবদানের সাহায্যে উৎকর্ষ না হলেও প্রাচুর্য আনয়ন করেছেন।

এই পর্যায়ে একজন বিশিষ্ট নাট্যকার ছিলেন **শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত** (১৮৯২-১৯৬১)। তিনি প্রায় ত্রিশখানি নাটক লিখেছিলেন। তাঁর খ্যাতির পশ্চাতে ঐতিহাসিক নাটক রচনার গুরুত্ব বিদ্যমান। 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজদ্দৌলা', 'রাষ্ট্রবিপ্লব', 'ধাত্রীপান্না' ইত্যাদি তাঁর বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নাটক। তাঁর 'স্বামী-স্ত্রী', 'তটিনীর বিচার' ইত্যাদি সামাজিক নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

জলধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৭০) বিশ-পঁচিশখানি নাটক লিখেছিলেন। তাঁর নাটকগুলো দর্শকদের মন জয় করেছিল। তবে নাট্যকলার উৎকর্ষ দেখানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক : 'অহিংসা', 'সত্যের সাধন', 'রাঙ্গারাখী', 'অসবর্ণা', 'আঁধারে আলো', 'রীতিমত নাটক' ইত্যাদি।

মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) পৌরাণিক নাটক লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন। অন্যান্য শ্রেণির নাটকেও তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। তিনি পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ফলে নাটকে অনাবিষ্কৃত রহস্য ও অনাস্বাদিত রস পরিবেশিত হয়েছে। 'কারাগার', 'দেবাসুর', 'সাবিত্রী', 'চাঁদসদাগর', 'সীতা' ইত্যাদি এই শ্রেণির নাটক। একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব বিদ্যমান। 'খনা', 'অশোক', 'মীরকাশিম' প্রভৃতি তাঁর ঐতিহাসিক নাটক।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) কয়েকটি নাটক রচনা করে এ ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 'আলেয়া', 'মধুমালা', 'ঝিলিমিলি' ইত্যাদি তাঁর নাট্যসৃষ্টি। কাজী নজরুল ইসলাম কৈশোর কালেই গ্রাম্য যাত্রাদলের সংস্পর্শে এসে গীতিনাট্য রচনা করে নাট্যরচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নাট্যরচনায় তাঁর প্রতিভা ব্যাপক হতে পারে নি। তাঁর 'আলেয়া' নাটকটি প্রতীকধর্মী। এতে ত্রিশটি গান সংযোজিত হয়েছিল। নাটকের কাহিনি বা চরিত্র বাস্তবানুগামী হয় নি এবং চরিত্রগুলো তত্ত্বের বাহন হয়ে উঠেছিল। তবে সংলাপ রচনায় দক্ষতার পরিচয় ছিল। 'মধুমালা' তাঁর গীতিনাট্য—পল্লীগীতিকার কাহিনি অবলম্বনে এর রূপ দেওয়া হয়েছিল। এই গীতি- নাট্যের ভাষা সঙ্গীতধর্মী ও আবেগপ্রধান। 'ঝিলিমিলি' গীতিনাট্যটিতে নরনারীর প্রেম ও বিরহ প্রাধান্য পেয়েছে।

মহেন্দ্র গুপ্ত (১৯১০-৮৪) প্রায় চল্লিশখানি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটক ঐতিহাসিক ও সামাজিক শ্রেণিভুক্ত। 'রানী ভবানী', 'রানী দুর্গাবতী', 'মহারাজা নন্দকুমার', 'টিপু সুলতান', 'পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক।

বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-৮৬) 'মাটির ঘর', 'মেঘমুক্তি', 'তাইতো', 'বিশ বছর আগে', 'ক্ষুধা' ইত্যাদি; **প্রমথনাথ বিশী** (১৯০১-৮৫) 'ঋণাং কৃত্বা', 'ঘৃতং পিবেৎ', 'মৌচাকে ঢিল', 'পরিহাস বিজলিপতম', 'ভূতপূর্ব স্বামী' ইত্যাদি; **বনফুল** (১৮৯৯-১৯৭৯) 'শ্রীমধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'মধ্যবিত্ত', 'বন্ধনমোচন' ইত্যাদি; **বিজন ভট্টাচার্য** (১৯০৬-৭৮) 'নবান্ন', 'গোত্রান্তর', 'জনপদ', 'কলঙ্ক', 'মরাচাঁদ', 'অবরোধ'; **তুলসী লাহিড়ী** (১৮৭৯-১৯৫৯) 'পথিক', 'ছেঁড়াতার' ইত্যাদি নাটক রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। পশ্চিম বঙ্গের নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সলিল সেন, কিরণ মৈত্র, ধনঞ্জয় বৈরাগী, উৎপল দত্ত, রমেন লাহিড়ী, বাদল সরকার প্রমুখ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। আমাদের নাট্যসাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনামূলক ইতিহাস লিখ।

২। ১৮৫২ হইতে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের বিকাশের পরিচয় দাও।

৩। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। 'বাংলা নাটক দেশীয় যাত্রাগান নয়, ইংরেজি থিয়েটার হইতে উদ্ভূত।'—হরচন্দ্র রায়, জে. সি. গুপ্ত ও রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক আলোচনা উপলক্ষে এই মন্তব্যের সত্যাসত্য বিচার কর।

৫। 'সাহিত্যসৃষ্টি নয়, সমাজসংস্কারের চেষ্টাই প্রথম যুগের বাংলা নাটকের প্রধান লক্ষ্য ছিল।'—আলোচনা কর।

৬। উনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যসাহিত্যের গোড়াপত্তন ও বিকাশ যাঁহাদের দান গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা কর তাঁহাদের যে কোন দুইজনের অবদানের মূল্য নিরূপণ কর।

৭। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় যে-কোন দুইজনের দানের মূল্যায়ন কর : দীনবন্ধু, গিরিশ ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল।

৮। 'সাহিত্যসৃষ্টি নয়—সমাজসংস্কার এবং নূতন সমাজ গঠনই প্রথম যুগের বাংলা নাটকের লক্ষ্য ছিল। তাই প্রথম যুগের নাটকমাত্রই ট্র্যাজেডি-কমেডিভেদে মেলোড্রামা বা প্রহসনের লক্ষণাক্রান্ত'—এই মন্তব্যের আলোকে নিম্নের যে-কোন দুইজনের নাট্যকর্মের পরিচয় দাও : রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশ ঘোষ।

৯। 'রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটকে সমাজের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা গেলেও যে বাস্তববোধ, সমাজসচেতনতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি নাটকের চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে নাটককে সাফল্যমণ্ডিত করে রামনারায়ণের মধ্যে তার ছিল একান্ত অভাব। কিন্তু এই গুণের জন্যই দীনবন্ধু মিত্রের নাটক বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।'—এই উক্তির আলোকে রামনারায়ণ ও দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যসাধনা সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

১০। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধু মিত্রকে 'বাস্তবতার অগ্রদূত' রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। দীনবন্ধুপূর্ব নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে এ সম্পর্কে তোমার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত কর।

১১। বাংলা নাটকের বিকাশে মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদানের পরিমাপ কর।

১২। 'বাংলা প্রহসনগুলির সাহায্যে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও সমাজমানসকে যথার্থ ভাবে অধ্যয়ন করা যায়।'—আলোচনা কর।

১৩। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসনে সমসাময়িক বাঙালি সমাজের এবং রুচির যে পরিচয় আছে, তাহা অকৃত্রিম।'—আলোচনা কর।

১৪। 'ইদানিং কালের বাংলা নাটক আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্যরীতির সঙ্গে আমাদের শিল্পীদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছে এবং তাঁরা অনবরত নতুন সম্ভারে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন।'—আমাদের ইদানিং কালের নাটকের পরিচয় দান প্রসঙ্গে উক্তিটি যুক্তিযুক্ত কিনা দেখাও।

১৫। 'বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় নাট্যশাখা অতিশয় দুর্বল।'—বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

১৬। 'মধুসূদন শুধু বাংলা কাব্যেই আধুনিকতার পথ প্রদর্শক নহেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাটকেরও মুক্তিদাতা।'—বাংলা কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্যের সারবত্তা নির্দেশ কর।

১৭। বাংলা নাটকের বিকাশধারায় দীনবন্ধু মিত্র ও গিরিশ ঘোষের অবদান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ কর।

১৮। রামনারায়ণ তর্করত্ন হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাল পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিকাশের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর।

১৯। 'সমাজসংস্কার, সমাজস্বাস্থ্যরক্ষণ ও নীতিপ্রচার উদ্দেশ্যে রচিত বলেই উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের প্রায় নাটকই প্রহসন কিংবা প্রহসনের লক্ষণাক্রান্ত।'—এই সময়কার জনপ্রিয় নাটক প্রহসনগুলির বিষয়বস্তু ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে এই উক্তি যাচাই কর।

২০। 'উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের নাটক-প্রহসনগুলি সমাজ-সংস্কার লক্ষ্যেই রচিত।'—এই সময়ে রচিত শ্রেষ্ঠ নাটক-প্রহসনগুলির পরিচয় দানসূত্রে এই মন্তব্য যাচাই কর।

২১। বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২২। উনিশ শতকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।

২৩। টীকা লিখ : অমৃতলাল বসু, একেই কি বলে সভ্যতা, কুলীনকুলসর্বস্ব, জামাই বারিক, জমিদার দর্পণ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, ভদ্রার্জুন, রামনারায়ণ তর্করত্ন, লেবেডফ, সধবার একাদশী।

একাদশ অধ্যায়
মুসলমান সাহিত্যিক

পটভূমি

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে মুসলমান সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ছিল যথেষ্ট বিলম্বিত। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের পর এদেশে ইংরেজ আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অনগ্রসরতা ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিমুখতার ফলে ঘটেছে বলে ধরা হয়। পক্ষান্তরে, ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতার জন্য এদেশীয় হিন্দুরা জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রেও সুযোগ্য স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে সাহিত্যের যে বিচিত্র বিকাশ হয়েছে তা প্রধানত হিন্দু সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টার ফল। অন্যদিকে, ওয়াহাবী আন্দোলনের মানসিকতার জন্য মুসলমানদের অতীতমুখী মন 'দোভাষী পুঁথি'র মধ্যেই কাব্যরস আস্বাদনের প্রয়াস পেয়েছে; আধুনিকযুগের পরিবর্তিত পরিবেশে উন্নত পর্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় নি।

তবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই নিষ্ক্রিয় ভাবটি স্থায়ী হয়ে অবস্থান করে নি। ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের অসহযোগিতামূলক মনোবৃত্তি বিদূরিত হতে থাকে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর—স্যার সৈয়দ আহমদের (১৮১৭-৯৮) আপোষমূলক প্রচেষ্টার ফলে। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'এই দূরদর্শী মনীষীই প্রথম উপলব্ধি করলেন, হিন্দুরা যখন ব্রিটিশের সহযোগিতা করছে, তখন মুসলমানদের এই ব্রিটিশ-বিদ্বেষ, অসহযোগ ও সংগ্রাম আত্মধ্বংসী বৈ কিছুই নয়। এই সর্বনাশ থেকে উদ্ধারের উপায় হিসেবে ব্রিটিশ প্রীতি ও সহযোগের মনোভাব সৃষ্টির জন্য তিনি মুসলিম সমাজে প্রচারণা চালাতে লাগলেন। তাঁর মতবাদ মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজে অভিনন্দিত হল। তখন থেকেই মুসলমানেরা আচরণে ব্রিটিশ বিদ্বেষ ত্যাগ করে এবং অভিমান ছেড়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে।' তবে মুসলমানদের মধ্যে অনগ্রসরতার ফলে এই চেতনা কার্যকর হতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে। তৎকালীন মুসলমান মনীষীবৃন্দ ইংরেজদের সঙ্গে মুসলমানদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩) 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' নামে ১৮৬৩ সালে একটি সাহিত্য সমিতি গঠন করেন। মুসলমানেরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ ও স্বকীয় অবস্থার পর্যালোচনার মাধ্যমে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন করুক—এ-ই ছিল সমিতির উদ্দেশ্য। এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলেই দেখা যায়, মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশে একান্তই তৎপর হয়ে ওঠে এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকগণের আত্মনিয়োগ করার সময় থেকে তাঁদের রচিত সাহিত্যে দুটি ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সে আমলের মুসলমান রচিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে লক্ষ করা যাবে যে মুসলমান লেখকগণের সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদান গতানুগতিক বাংলা সাহিত্যের হিন্দু লেখকগণের অবদান থেকে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার নমুনা বিরল ছিল না। মুসলমান ও হিন্দু লেখকগণের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠছিল সে সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধারা সম্মিলিত হয়েই রয়েছে, কিন্তু গঙ্গা-যমুনার মত। ভবিষ্যতেও দুয়ের এই অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে কিনা সেটি হয়ত নির্ভর করবে তাদের পরস্পরের ভবিষ্যৎ সামাজিক সম্বন্ধের ওপরে। তবে একালের বাংলা সাহিত্যে এমন একটি চিন্তাধারা রূপ লাভ করতে চাচ্ছে যার পরিপূর্ণ বিকাশে মুসলমান সমাজ-উদ্ভূত সাহিত্যিক বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন বলে মনে হয়।' সামগ্রিক ভাবে মুসলমান কবিসাহিত্যিকগণ হিন্দুদের থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। এরপরও মুসলমান লেখকগণের মধ্যে সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কিত বেশ পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

একদল লেখক ছিলেন গতানুগতিক বাংলা সাহত্যের ঐতিহ্যের অনুসারী। তাঁরা হিন্দুরচিত বাংলা সাহিত্যের আদর্শ অবলম্বনে সাহিত্যসাধনা করে হিন্দুদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেছেন। তাঁরা সমন্বয়পন্থী। অন্যদিকে এক দল সাহিত্যিক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্যের কথা অনুভব করেছেন। তাঁরা স্বাতন্ত্র্যপন্থী। সমন্বয়ধর্মী ও স্বাতন্ত্র্য-ধর্মী—এই দুই বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে দুই ধারা প্রবাহিত হতে দেখা যায়। বস্তুতপক্ষে মীর মশাররফ হোসেনই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সার্থকতর মুসলমান সাহিত্যিক হিসেবে পথিকৃৎ। প্রচলিত ধারণায় মীর মশাররফ হোসেনকে প্রথম মুসলমান গদ্য রচনাকারী হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও তার পূর্বে 'হাড়জ্বালানী' গ্রন্থের লেখক গোলাম হোসেন, 'উচিত শ্রবণ' গ্রন্থের লেখক খোন্দকার সামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী এবং 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' গ্রন্থের লেখক শেখ আজিমদ্দী—এই কয়জন সাহিত্যিককে পাওয়া যায়। তবে পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে সৃষ্ট আধুনিক সাহিত্যের ধারাটি অনুসরণ করলেন মীর মশাররফ হোসেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রমুখ হিন্দু কবিসাহিত্যিকগণ যে ধারার পরিবর্ধন করেছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে তা অনুসরণ করে মুসলমান সাহিত্যিকগণ পাশ্চাত্য প্রভাবশাসিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ সাধন করেন। হিন্দু সাহিত্যিকগণের সৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে মুসলমানদের অনুসৃত এই ধারার বিশেষ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এ ধারার অনুসারী মুসলমান সাহিত্যিকগণকে সমন্বয়পন্থী নামে অভিহিত করা হয়।

মুসলমান সাহিত্যিকদের সমন্বয় সাধনের এই আদর্শ হীনম্মন্যতা বা উদারতাজাত নয়, তা ছিল রাজনৈতিক দৃষ্টিপ্রসূত। দেশের ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাছাড়া, বাংলাদেশের মুসলমানেরা বাঙালি রূপেই বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেছিলেন। মীর মশাররফ হোসেন কর্তৃক এই ধারার উদ্বোধন এবং কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবিসাহিত্যিকের মাধ্যমে বর্তমান কাল পর্যন্ত তা অনুসৃত। ইংরেজ জাতি ও ইংরেজি ভাষার প্রতি বিরূপ মনোবৃত্তি শতাব্দী কালের পরে পরিবর্তিত হলে মুসলমানেরা

সাহিত্যে অবতীর্ণ হন। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শে উদ্বুদ্ধ হিন্দু লেখকগণ অগ্রণী হলেও সমন্বয়পন্থী মুসলমান লেখকরা তাঁদের নৈকট্য অনুভব করেছিলেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকগণের অনুসৃত অপর ধারা স্বাতন্ত্র্যধর্মী বলে চিহ্নিত। বস্তুত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাতীয়তার উৎপত্তি এখান থেকেই। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত 'সুধাকর' নামক সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্র কেন্দ্র করে এই স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব। 'সুধাকর' কেন্দ্র করে এই পর্যায়ের সাহিত্যিকগণ সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে তাঁরা 'সুধাকর দল' নামে চিহ্নিত। তাঁদের রচিত সাহিত্যকে 'ইসলামি সাহিত্য' বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই দলটির পশ্চাতে একটি ধর্মীয় অনুভূতি কার্যকরী ছিল। তবে তাঁরা কখনই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। নিজেদের অনগ্রসরতা বিদূরিত করার জন্য তাঁরা ছিলেন স্বাতন্ত্র্যকামী। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তাঁরা দেখান নি।

মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টির জন্য তৎকালীন ধর্মীয়-সামাজিক অবস্থা কার্যকরী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্ররোচনায় ও প্রলোভনে মুসলমানদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের প্রবৃত্তি দেখা দেয়। খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচারণার জন্য হিন্দুদের মধ্যে ধর্মান্তর গ্রহণের যে অনুপ্রেরণা এসেছিল, তা মুসলমানদের মধ্যেও সম্প্রসারিত হয়। এ সময় থেকেই অশিক্ষা, নিজ ধর্মের প্রতি শিথিল বিশ্বাস এবং আর্থিক ও সাংসারিক মোহই মুসলমানদের মধ্যে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে তৎকালীন রাজধর্ম গ্রহণ করতে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। এই অবস্থায় খ্রিস্টধর্মের গ্রাস থেকে মুসলমানদের রক্ষার জন্য কয়েকজন মহান ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ এবং তাঁর অনুগামী মুন্সী জমিরুদ্দিনের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান সমাজকে রক্ষার জন্য তাঁরা গ্রামে গ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে সে আমলে একটি বিশেষ দল সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলমান সমাজ সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সঙ্ঘবদ্ধ দলটি 'সুধাকর দল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে মুসলমান সমাজে জাতীয় চেতনাবোধের উদ্বোধন ঘটে।

জাতীয় জীবন থেকে অনগ্রসরতা কাটানোর জন্য সাহিত্য অনুকূল ভূমিকা পালন করতে পারে একথা মনে রেখে মুসলমান লেখকগণ সে আমলে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। জাতীয় জীবনে নবচেতনা যে সাহিত্যে নবসৃষ্টিমুখরতা আনতে পারে সে সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন, 'বাংলার মুসলমান এক নতুন জীবনের স্পন্দন অনুভব করতে শুরু করেছে। সেই নতুন জীবনের সূচনায় নানা সমস্যা সহজেই তাকে আঘাত দিচ্ছে। সেই সব সমস্যা যদি গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, রূপকে, কিংবা নিবন্ধে সে রূপ দিতে চেষ্টা করে তবে বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সম্পদ সে দান করতে পারবে আশা করা যায়। অনেক সময়ে দেখা যায়, বড় বড় উত্তেজনার মুখে উৎক্ষিপ্ত হয় বড় বড় সাহিত্য।' তৎকালীন মুসলিম সমাজে এ ধরনের পটভূমি রচিত হয়েছিল বলে মুসলমান কবিসাহিত্যিকগণের অবদান বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে।

সুধাকর দলের প্রবীণ লেখক ছিলেন মৌলভী মেয়রাজউদ্দিন আহ্মদ, পণ্ডিত রিয়াজুদ্দিন আহমদ মাশহাদী, শেখ আবদুর রহিম ও মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ১৮৮৭ সালে 'এসলাম তত্ত্ব' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রতি মাসে খণ্ড খণ্ড ভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁরা ইসলামের মর্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এখান থেকেই স্বাতন্ত্র্যধর্মী সাহিত্যের সূচনা। 'এসলাম তত্ত্ব' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ভূমিকায় বলা হয়েছে :

> 'বঙ্গদেশে এসলাম ধর্মের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তৎসংশোধনের জন্য আমরা এসলাম-তত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিশেষত এরূপ একখানি গ্রন্থের আবশ্যকতা মোসলমান মাত্রই অনুভব করিতেছেন। আজকাল আমাদের শিক্ষিত মোসলমান ভ্রাতাদিগের মধ্যে 'স্বধর্মে অনাস্থা' একটি উৎকট রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা আমাদের ভবিষ্যৎ আশাভরসার একমাত্র অবলম্বন তাহাদের শোচনীয় অধঃপতন এসলামের অশেষ অমঙ্গলের কারণ। একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এসলাম ধর্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য অবগত থাকিলে তাহারা কদাচ অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইত না। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই একটি 'নাস্তিকের'ও আবির্ভাব হইয়াছে। 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' একথার সত্যতা তাহারা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে। অপর এক সম্প্রদায় একেশ্বরবাদিতের ভান করিয়া ধর্মপ্রচারক ও তত্ত্ববাহকের (পয়গম্বরের) আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছে। এই সম্প্রদায়ের দুই একটি মহাপুরুষ প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া স্ব স্ব বিকৃত মস্তিষ্ক চিত্তদৌর্বল্যের পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। কেবলমাত্র বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়া অনেক লোক গোপনে ব্রাহ্মমত স্বীকার করিতেছে। বাংলা ভাষায় এসলাম ধর্মবিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি বর্তমান থাকিলে তাহাদের এরূপ শোচনীয় পরিণাম হইত না। এই সকল লোকেরা যদি ইসলাম ধর্মের সারমর্ম কিছুমাত্র অবগত থাকিত, তাহা হইলে কদাচ অধঃপাতে যাইত না। প্রকাশ্য ধর্মত্যাগী অপেক্ষা অপ্রকাশ্য ধর্মত্যাগীদিগের দ্বারা এসলাম সমাজের ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে। ইহারা বিড়াল তপস্বীর ন্যায় নীরবে অনেক যুবক ও বালকদিগকে স্বীয় মতাবলম্বী হইবার জন্য উত্তেজিত করিয়া থাকে। এসলাম ধর্মাবলম্বীর অন্য ধর্ম অবলম্বন করা অপেক্ষা আশ্চর্য ও বিস্ময়ের কারণ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা এই সকল বিপথগামী ও অন্ধবিশ্বাসী লোকদিগের চক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক দেখাইব যে, পৃথিবীতে এসলাম ধর্মই প্রকৃত ধর্ম। যদি মানুষের জন্য কোনও ধর্ম থাকে, তাহা 'এসলাম ধর্ম।'

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, উদ্যোক্তাগণ ইসলামের স্বরূপ প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন এবং স্বজাতীয় লোকদের ব্যাপারেই তাঁরা ছিলেন বেশি সচেতন। 'এসলাম তত্ত্ব' খণ্ডাকারে কিছুদিন প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৮৯ সালে শেখ আবদুর রহিম ও মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'সুধাকর' পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। 'সুধাকর' পত্রিকা প্রকাশে ও পরিচালনায়

প্রধানভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন মৌলভী মেয়রাজউদ্দিন আহমদ, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন মাশহাদী, ডাক্তার হাবিবর রহমান, কবি মোজাম্মেল হক, শেখ আবদুর রহিম ও মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ।

লক্ষ করা যাবে, সে আমলে মুসলমান কর্তৃক প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যার যথেষ্ট আধিক্য ঘটেছিল। জাতীয় জীবনে নবতর চেতনাবোধের প্রেক্ষিতে তখন সাময়িক পত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার উপযুক্ততার প্রমাণ দিতে পারে একথা অনেকে ভেবেছিলেন। সেজন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো পত্রপত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর মুসলমান সমাজ এই উদ্যোগকে জাতীয় জীবনে সর্বাংশে কল্যাণকর করে তুলতে পারে নি। তবু এই সব পত্রপত্রিকা তাদের স্বল্পায়ু সত্ত্বেও মুসলমান সমাজের কল্যাণে নিঃশেষে নিয়োজিত হতে পারে নি।

'এসলাম তত্ত্ব' প্রচার করতে গিয়ে যে কয়জন সমাজসেবক বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার মুসলমানদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশে উৎসাহিত হয়েছিলেন, তাঁরাই ছিলেন 'সুধাকর' পত্রিকার পরিচালক। নিছক সাহিত্যসাধনার ব্যাপারে তাঁরা উৎসাহী ছিলেন না; ধর্ম ও সমাজসংক্রান্ত সংবাদ প্রচারই ছিল এই পত্রিকার প্রধান কাজ। শিক্ষাসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বসে সমগ্র বাংলার মুসলমানদের সংযোগসাধনের প্রয়াস হিসেবেই এই 'সুধাকর' পত্রিকার জন্ম হয়েছিল। এ থেকে তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের যে উপকার হয়েছিল তা হচ্ছে : ক. সমগ্র মুসলমান সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধন, খ. ধর্ম ও সমাজসংস্কার এবং স্বদেশ স্বাজাত্যবোধের প্রচার এবং গ. নগরকেন্দ্রিক সংবাদপত্র ও সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত।

'সুধাকর' পরিচালকগণের পত্রিকাপ্রচারের লক্ষ্য ছিল তৎকালীন মুসলমান সমাজের অধঃপতন রোধ করা। তবে শুধু সংবাদপত্র প্রচারের মাধ্যমেই যে এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না তা তাঁরা অচিরেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। জাতীয় জীবনে উন্নতির প্রেরণা জাগাতে হলে অতীতের গৌরবান্বিত ইতিহাস এবং ধর্মীয় চেতনার প্রচার করতে হবে। এই লক্ষ্য সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে সাধিত হতে পারে না, এর জন্য বিশেষ প্রয়োজন মাসিক পত্রের—যার মাধ্যমে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা অনুভূত হবে এবং সে সাহিত্যের উপজীব্য হবে ধর্মীয় বিষয় ও জাতির ঐতিহ্য-ইতিহাস। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই জাতির মানস গঠন সম্ভবপর—এই ছিল তৎকালীন মুসলমান মনীষীগণের ধারণা। তাই তাঁরা কতিপয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারে রত থেকেও 'ইসলাম প্রচারক', 'মিহির', 'হাফেজ' প্রভৃতি মাসিক সাহিত্যপত্র প্রকাশ করেছিলেন।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রাচুর্যপূর্ণ উৎস ছিল ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। মুসলমান কবিসাহিত্যিকগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য অথবা সহজলভ্যতা ও সহজাত অধিকারের জন্য এসব ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন।

সে আমলের মুসলমানদের এসব সাহিত্যপ্রচেষ্টা ছিল প্রচারধর্মী। জাতীয় কল্যাণ ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এজন্য তাঁরা ইসলাম ধর্ম এবং মুসলমানদের ইতিহাস সাহিত্যের উপজীব্য করেছিলেন। 'সুধাকর' পত্রিকাটি বহুবিধ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কিছুদিন প্রকাশিত হয়ে মুসলমানদের ধর্মের মহিমা তত্ত্ব তথ্য জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন করতে সক্ষম হয়।

সুধাকর দলের আবির্ভাবের পূর্বে কোন কোন মুসলিম সাহিত্যিক সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলিম জাতীয় জীবনে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এই সুধাকর দল। মুসলমানদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক জাতীয় সাহিত্যের বিকাশে এই লেখকদলের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী কালের মুসলমান সাহিত্যিকগণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পথিকৃৎ হিসেবে এই দলের বিশেষ ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য। ইংরেজি শিক্ষাসংস্কৃতি এবং হিন্দুয়ানি সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্যিক হিসেবে মুসলমানদের অবদান প্রতিষ্ঠা করা ছিল সুধাকর দলের অপরিসীম কৃতিত্ব। এই দলের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলাফল হিসেবে পাওয়া যায় মৌলিক গ্রন্থ, অনুবাদ, জীবনী, দর্শন, তত্ত্বালোচনা, কুরআন ও হাদিসের বঙ্গানুবাদ ও আলোচনা ইত্যাদি। এই সময়কার মুসলিম রচিত সাহিত্যে গদ্যের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। জাতীয় জীবনের উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে ধর্ম ও ইতিহাস আলোচনায় গদ্য ব্যতীত উপায় ছিল না বলে এ সময়ের মুসলমান রচিত সাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাই বলা যায় কাব্যের দিক দিয়ে না হলেও অন্তত গদ্যরচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান সাহিত্যিকগণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অবশ্য গদ্যরচনার আধিক্যের পেছনে বিশেষ কারণও সন্ধান করা সম্ভব। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেয় তার বাহন ছিল গদ্য। বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলার আগ্রহ লেখকগণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তবে কবিতা যে উপেক্ষিত হয়েছে এমন কথাও বলা যায় না। জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য কবিতা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

সুধাকর দল বাংলা সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারা প্রচার করার মাধ্যমে যে নিজস্ব সাহিত্যধারার প্রবর্তন করেন তার বিশেষ প্রভাব সমকালীন মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণের ওপর পড়েছিল এবং বর্তমান কালেও এই ভাবধারাটি অনুসৃত হচ্ছে। সমন্বয়পন্থী মুসলমান সাহিত্যিকগোষ্ঠীর পরেও এই দলের প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যের হিন্দু লেখকগণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেও সমন্বয়পন্থী লেখকগণ ইসলামি বিষয়াবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিসাহিত্যিকগণের অবদান সমন্বয়ধর্মী ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী উভয় বৈশিষ্ট্য সহকারেই রূপায়িত হয়েছে।

খন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী

মুসলমানদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের গদ্যলেখক হিসেবে খন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী (১৮০৮-৭০) উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে যে ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোন প্রকার অবদানের নিদর্শন মিলে না সে সময়ে তিনি গদ্য ও কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর 'ভাবলাভ' নামে একটি কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ সালে। 'সুরতজান' তাঁর অপর কাব্য। 'ভাবলাভ' কাব্য রূপকথাধর্মী। কাশ্মীরের রাজপুত্র সাঈদ আহমদ এবং মন্ত্রিতনয় নূর মুহম্মদ—এই দুই আবাল্য সুহৃদের সঙ্গে জনৈক কুজের পরমাসুন্দরী স্ত্রী নূরজাহানের ত্রিভুজ প্রণয়কাহিনি এই কাব্যের বিষয়বস্তু। 'সুরতজান' কাব্যে মর্ত্যের রাজপুত্র দেলারামের সঙ্গে ইন্দ্রসভার নর্তকী সুরতজানের প্রণয়কাহিনি রূপায়িত হয়েছে। 'উচিৎ শ্রবণ অর্থাৎ পরমার্থিক ভাব' (১৮৬০) তাঁর গদ্য রচনা।

গ্রন্থটি ধর্ম ও নীতিসংক্রান্ত উপদেশমালা। প্রথমাংশে ব্যবহারিক জীবনের আচার-আচরণ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য স্থান পেয়েছে। শেষাংশে আছে সুফী অধ্যাত্মসাধনের কথা। দীর্ঘায়িত ও অনুপ্রাসমণ্ডিত বাক্যরীতি লেখকের গদ্যরচনার বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থটিতে কয়েকটি গানও সংযোজিত হয়েছে। লেখকের গদ্যরচনার নমুনা :

> 'অহঙ্কারের দ্বিতীয় অবস্থা। প্রথম জাতি ও কুল। দ্বিতীয় বুদ্ধি ও বিদ্যা। প্রথম অবস্থার ব্যবস্থা এই যে আমি অমুক মুনি কিংবা সাধুর সন্তান বলিয়া আপন আদর বাড়াইতে হয়। বিচার করিয়া দেখ ইহা বিনা মূল্যে পুরাতন অস্থি বিক্রয় করিয়া কেবল মান বাড়ান। ইহার জন্য আমাদের নবিজী রছুলাল্লা আপন কন্যা বিবি ফাতেমা জহরাকে নিষেধ করিয়াছেন যে হে মা ফাতেমা আপন মনে এমত অহঙ্কার করিও না যে আমি রছুলের কন্যা ও হযরত আলির বণিতা ও এমাম হাছেন ও হোছেনের মাতা এবং যাহার পদবী খাতন জেন্নাত এবং স্বর্গীয় বিবি। তিনি অহঙ্কার করিলে করিতে পারেন। তাঁহাকে যখন নিষেধ করিয়াছেন, তখন আমার অহঙ্কার করা কেবল বুদ্ধির ত্রুটি এবং পাপ।'

মীর মশাররফ হোসেন

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলিম সাহিত্যিক। তিনি বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমান-মানসের নবজাগরণের অগ্রপথিক। তিনি সে আমলের মুসলিম সমাজে নতুন প্রত্যাশার সম্ভাবনা তরঙ্গায়িত করে তুলেছিলেন। আধুনিক মানসিকতায় বা নবজাগরণে শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল 'মানবিকতা'। বাঙালি মুসলমানের হাতে সেই সর্বনিরপেক্ষ মানবতার প্রথম স্পর্শ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেনের রচনায়ই সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর নিজের কথায় 'যখন এদেশের মুসলমান ভদ্রলোকেরা সাধারণত সাহিত্যে বীতস্পৃহ, বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না' তখন তিনি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' (১৮৬৯) নিয়েই আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকদের উপন্যাস রচনার যথার্থ সূত্রপাত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক লেখক মীর মশাররফ হোসেন স্বীয় বহুমুখী প্রতিভার বলে মুসলিম রচিত বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি উপন্যাস নাটক প্রহসন কাব্য প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্ব দেখান।

আধুনিক যুগে মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে সমন্বয়ধর্মী ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী নামক দুটি ধারার পরিচয় মিলে। এই দু ধারার মধ্যে সমন্বয়ধর্মী ধারার প্রবর্তন করেছিলেন মীর মশাররফ হোসেন। অবশ্য তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ইসলামি ভাবপ্রকাশক বিষয়বস্তুর রূপায়ণ লক্ষণীয় হলেও সম্পূর্ণ রূপে ইসলামি ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে সাহিত্যসাধনার প্রয়াস তাঁর মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে যে ক্ষেত্রে মুসলমান সাহিত্যিকগণ ধর্মীয় বিষয়বস্তু অবলম্বনে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, মীর মশাররফ হোসেন তখন ধর্মের বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে সাহিত্যশিল্পের দিকে দৃষ্টি দেন। এদিক থেকে তাঁর সাহিত্যসাধনা হিন্দুরচিত সাহিত্যের সঙ্গে সমন্বয়ধর্মী। তাছাড়া ভাষারীতির দিক দিয়ে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী হিন্দু সাহিত্যিকদের

নিকট থেকে আদর্শ লাভ করতে পেরেছিলেন। কারণ শিক্ষার স্বল্পতার জন্য সংস্কৃত ও ইংরেজি আদর্শ অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মীর মশাররফ হোসেন কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষা লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি সম্ভবত ১৮৬৩ সালে পদমদী স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়তেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সতের বৎসর বয়সে কলকাতায় গমন এবং প্রথম বিবাহ। নিয়মিত পাঠাভ্যাসের অন্য কোন সংবাদ এরপর আর পাওয়া যায় নি। কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার এবং ফরিদপুরের পদমদী—এই কয় স্থানেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে জমিদারির ম্যানেজার হিসেবে তিনি কর্মরত ছিলেন। 'গ্রামবার্তা' পত্রিকার সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ ছিলেন তাঁর সাহিত্যগুরু। এই 'গ্রামবার্তা' এবং কবি ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকের রচনা প্রকাশিত হত। সে সময়ে কাঙাল হরিনাথ তাঁর রচনা সংশোধন করে দিতেন।

মীর মশাররফ হোসেনের রচনাবলীর তালিকা দীর্ঘ এবং তা এরূপ :

উপন্যাস : 'রত্নবতী', 'বিষাদসিন্ধু', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিঞার বস্তানী', 'ইসলামের জয়', 'রাজিয়া খাতুন', 'তহমিনা', 'বাঁধা খাতা', 'নিয়তি কি অবনতি'।

নাটক : 'বসন্তকুমারী নাটক', 'জমীদার দর্পণ', 'বেহুলা গীতাভিনয়', 'টালা অভিনয়'।

প্রহসন : 'এর উপায় কি', 'ভাই ভাই এইত চাই', 'ফাঁস কাগজ', 'একি'।

কাব্য : 'গোরাই ব্রীজ বা গৌরী সেতু', 'সঙ্গীত লহরী', 'পঞ্চনারী পদ্য', 'প্রেম পারিজাত', 'বিবি খোদেজার বিবাহ', 'হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ', 'হযরত হামজার ধর্মজীবন লাভ', 'হযরত বেলালের জীবনী', 'মদিনার গৌরব', 'মোসলেম বীরত্ব', 'বাজীমাৎ', 'মৌলুদ শরীফ'।

প্রবন্ধ : 'গোজীবন', 'খোতবা', 'মুসলমানের বাংলা শিক্ষা', 'আমার জীবনী', 'হযরত ইউসোফ', 'বিবি কুলসুম বা আমার জীবনীর জীবনী'।

মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে এবং শেষ গ্রন্থ 'বিবি কুলসুম' প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে।

'রত্নবতী' গ্রন্থটি মুসলমান রচিত প্রথম উপন্যাস। গুজরাট নগরের রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রের কল্পিত কাহিনি অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত। এই প্রসঙ্গে মীর মশাররফ হোসেনে সাহিত্যিক জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশক ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'একটি কৌতুকাবহ গল্প অবলম্বন করিয়া ইহার রচনাকার্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। আজকাল অনেক সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার অনুবাদের পক্ষপাতী হইয়া সে বিষয়ের রস প্রায় একচেটিয়া করিয়াছেন। আমি সে পথের পথিক না হইয়া যথাসাধ্য এই গল্পটি কল্পনা করিয়াছি। গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার নামে পরিচয় দেওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম। অতএব, ইহার মধ্যে শত শত দোষ বিদ্যমান থাকা সম্ভব। ভরসা করি, গুণজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ সে ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।'

প্রথম গ্রন্থের ভূমিকায় এই বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর যাত্রার সূত্রপাত। তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের আদর্শই তিনি এ গ্রন্থে অনুসরণ করেছিলেন।

'রত্নবতী' উপন্যাসটি রূপকথা জাতীয় কাহিনি নিয়ে রচিত বলে একে আধুনিক উপন্যাস হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া যায় না। তবে লেখকের বর্ণনাভঙ্গি আধুনিক রীতিসম্মত। ভাষা সম্পর্কে লেখক বলেছেন, 'ভাষা-সঙ্গতি ও গল্পের বন্ধন যতদূর পারিয়াছি সামঞ্জস্য রাখিতে ক্রুটি করি নাই।' 'রত্নবতী'র ভাষার নমুনা : 'একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য সমাধনান্তর লোহিত বসনাবৃত হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে গমনোদ্যতা করিতেছেন, এমন সময় রাজনন্দন ও মন্ত্রিতনয় অত্যুৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিত হইয়া প্রদোষকালে বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হইলেন।'

মীর মশাররফ হোসেনের গ্রন্থগুলোকে আখ্যানভাগের বৈশিষ্ট্যানুসারে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় : ১. রূপকথা বা পুঁথিপত্রে প্রচলিত কাহিনি, ২. বাস্তব ঘটনা বা সমাজের বাস্তব অবস্থা অবলম্বনে রচিত কাহিনি এবং ৩. ধর্মমূলক কাহিনি।

'বিষাদসিন্ধু' (মহরম পর্ব ১৮৮৫, উদ্ধার পর্ব ১৮৮৭, এজিদবধ পর্ব ১৮৯১) কারবালার বিষাদময় কাহিনি অবলম্বনে রচিত উপন্যাসজাতীয় গ্রন্থ। উপন্যাসের সুবিন্যস্ত বন্ধনরীতি গ্রন্থে অনুসরণ করা হয় নি। গ্রন্থটি 'ইতিহাস, উপন্যাস, সৃষ্টিধর্মী রচনা ও নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের বিবিধ সংমিশ্রণে রোমান্টিক আবেগ মাখানো এক সঙ্কর সৃষ্টি।' 'বিষাদসিন্ধু মৌলিক রচনা নয়, মহরমের ধর্মীয় আখ্যান মহাকাব্যের আকারে লেখা।' ইসলামের ইতিহাসের উপকরণকে সর্বজনীন সাহিত্যরসে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন লেখক। 'ভারতী' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল 'মহরমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস' বলে। প্রধান প্রধান চরিত্র ইতিহাস থেকে সংগৃহীত হলেও গ্রন্থের ঘটনা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসরণ করে সংস্থাপিত নয়। অবশ্য পুঁথি সাহিত্যে এই একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে কিছুসংখ্যক কাব্য রচিত হয়েছিল। মীর মশাররফ হোসেন সেই সমস্ত গ্রন্থ—যেমন, জঙ্গনামা, মুক্তাল হোসেন, শহীদে কারবালা প্রভৃতির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। সে সব গ্রন্থের কল্পনাবহুল কাহিনি দ্বারা তিনি ছিলেন প্রভাবিত। তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থের কাহিনি রূপায়ণে ও চরিত্রচিত্রণে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই গ্রন্থের কতিপয় প্রধান চরিত্র ছাড়া অপরাপর চরিত্র ইতিহাস বহির্ভূত এবং কল্পনাশ্রয়ী। ঘটনাবিন্যাসে প্রথম দিকে সামান্য ঐক্য পরিলক্ষিত হলেও পরের দিকে ব্যাপকভাবে কল্পনানির্ভর।

ইসলামের সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহম্মদ (স) এর দৌহিত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের সঙ্গে দামেস্কের অধিপতি এজিদের বিরোধই 'বিষাদসিন্ধু'র প্রধান ঘটনা। অবশ্য ঘটনার কেন্দ্রস্থলে প্রেম বর্তমান। জয়নবের অনন্য-সাধারণ রূপের প্রতি এজিদের আকর্ষণের ফলে ঘটনার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ব্যর্থতায় এজিদ ইমাম হাসান ও হোসেনকে বঞ্চিত করে মুসলিম সাম্রাজ্য করতলগত করার জন্য বিরোধে অবতীর্ণ হয়। পরিণামে ইমাম হাসানকে কৌশলে বিষপ্রয়োগে আর ইমাম হোসেনকে ষড়যন্ত্র করে কারবালা প্রান্তরে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। এখানে ঐতিহাসিক কাহিনি ভিত্তি করে লেখকমনের বিচিত্র কল্পনা প্রকাশমান। প্রথম পর্ব অর্থাৎ মহরম পর্বে ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে। অন্য দুই পর্বে—উদ্ধার

ও এজিদবধ পর্বের মধ্যে তা রক্ষিত হয় নি। বরং কল্পনাকেই সেখানে অত্যধিক পরিমাণে আশ্রয় করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থের মুখবন্ধের কিছুটা অংশ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সহায়ক হিসেবে উল্লেখযোগ্য : 'পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদসিন্ধু' বিরচিত হইল। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিয়া প্রাচীন কবিগণের রচনাকৌশল এবং শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ।...মহরমের মূল ঘটনাটি বঙ্গভাষাপ্রিয়—প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়াই আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য।' এই উদ্দেশ্য রূপায়ণে মীর মশাররফ হোসেন ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যাসত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নি।

মুনীর চৌধুরী 'বিষাদসিন্ধুর' মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন, 'মশাররফ হোসেনকে ইতিহাস অনুসন্ধানের কোন ক্লেশ স্বীকার করতে হয় নি। মৌলিক অলৌকিক কথা মীর মশাররফ হোসেন যে কিছুই বলেন নি, তা নয়। তবে, সেগুলো কোন গভীর চিন্তার ফল নয়, গ্রামীণ ঐতিহ্যানুশীলনের পরিণাম মাত্র। বিষাদসিন্ধুর জনপ্রিয়তা অনেকাংশে এর ওপর নির্ভরশীল হলেও শিল্পী মীরের কৃতিত্বের কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মধ্যযুগীয় ধর্মচেতনার জীবনবিমুখ আচ্ছন্নতাকে অপসারিত করে ইহলোকের ইন্দ্রিয়পরবশ মানবমানবীয় হর্ষশোকের মহামূল্যকে তিনি যে কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই জন্যই বিষাদসিন্ধুর প্রধান চরিত্রসমূহ, কিসসা-কাহিনির ক্রোড়োদ্‌ভূত হয়েও অনেক দূর পর্যন্ত মৃত্তিকা-সংলগ্ন, প্রিয়-পরিজন-বেষ্টিত, শত্রুমিত্র পরিবৃত, সজীব নরনারী।'

তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাই মন্তব্য করেছেন, 'মীর সাহেবের বিষাদসিন্ধুর বাংলা গদ্য শব্দবন্ধে ও ছন্দস্পন্দে এক অবারিত স্রোত ফল্গুধারার মতই উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। বিষাদ-সিন্ধু কেবল বিষাদেরই সিন্ধু নয়; সর্বজনীন অনুভূতিতে শাশ্বত সত্যের প্রকাশে এবং মহিমময় বিষয়গৌরবে প্রাচীনতর সম্পদের স্বাদগন্ধসহ বাংলা সাহিত্যে এক ক্লাসিক স্থাপত্যের মতই ভাস্বর হয়ে রয়েছে এবং এর ভাষায় উর্মিমুখর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যেই মীর সাহেবের সাহিত্যিক প্রতিভাও যথাযথ বিকশিত হয়ে উঠেছে।' বিষাদসিন্ধুর ভাষার নমুনা :

> 'তুমি আমার অন্ধের যষ্টি, নয়নের পুত্তলী, মস্তকের অমূল্য মণি, হৃদয়ভাণ্ডারের মহামূল্য রত্ন, জীবনের জীবনীশক্তি; আশাতরু অসময়ে মঞ্জুরিত, আশামুকুল অসময়ে প্রস্ফুটিত। বাছা, সদাসর্বদা তোমার মলিন মুখ ও বিমর্ষ ভাব দেখিয়া আমি একেবারে হতাশ হইতেছি, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

ড. মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, 'তাঁহার বিষাদসিন্ধু আজও অসাধারণ জনপ্রিয় গ্রন্থ। মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তাঁহাকে কাঁদাইয়াছিল। মুসলিম গৌরব গাথা তাঁহার জীবনকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি নানা কাব্যে বাংলার মুসলমানকে প্রাচীন মুসলিম গৌরব ও ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।'

'বিষাদসিন্ধু'র ভাষা সম্পর্কে মীর মশাররফ হোসেন লিখেছেন, 'শাস্ত্রানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ়বন্ধনে বাধ্য হইয়া বিষাদসিন্ধুর মধ্যে কতকগুলি জাতীয় শব্দ

ব্যবহার করিতে হইল।' লেখক ইসলামের বিষয় নিয়ে লেখায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার পরিহার করেছেন। 'নিখিল বাঙালির রস-চেতনার প্রতিই অধিকতর আগ্রহী' হয়ে বাংলা ভাষায় সাধারণভাবে অপ্রচলিত, অমুসলমান বাঙালির অজ্ঞাত ইসলামি শব্দ প্রয়োগ না করার নিদর্শন রেখেছেন। সেজন্য নামাজ, রোজা ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে 'উপাসনা', 'উপবাস' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) গ্রন্থে নীলকর অত্যাচারের কাহিনি রূপায়ণের সঙ্গে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আত্মজীবনীমূলক এ গ্রন্থে সে আমলের নীলকরদের ভয়াবহ অত্যাচারের চিত্র এবং তার পরিণতি প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থে মীর মশাররফ হোসেন 'উদাসীন পথিক' ছদ্মনাম অবলম্বন করেছিলেন। সামাজিক শ্রেণি-সংঘাতের চিত্র এখানে স্পষ্ট। নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র বর্ণনায় লেখকের যথেষ্ট সার্থকতা ফুটে উঠলেও গল্পরস মাধুর্যমণ্ডিত হয় নি। লেখক নিজের জীবনে যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই এ গ্রন্থে চিত্রিত হয়েছে। এতে আছে দুঃখীজীবনের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি, হিন্দুমুসলমানের সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে রসপুষ্ট হয়েছে জটিল মানবহৃদয়ের পশ্চাদপটে। ফলে উদাসীন পথিকের মনের কথায় লেখকের সৃষ্টিশীল শিল্পচেতনার মহত্তর পরিচয় বর্তমান।

'গাজী মিঞার বস্তানী' (১৯০০) রসরচনা জাতীয় গ্রন্থ। চব্বিশটি নথি বা পরিচ্ছেদ সম্বলিত দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থে গাজী মিঞার আত্মপরিচয়, বস্তানীপ্রাপ্তির বিবরণ, অপর হস্তে অর্পণের কারণ, ফলশ্রুতি, পরিণাম এবং সবশেষে গাজী মিঞার বিদায়—প্রভৃতি বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন কলুষিত সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিকে পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও রুগ্ন মীরমানসের এক প্রতিশোধাত্মক 'দপ্তর' বলে অভিহিত করা যায়। মীর মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার থাকাকালীন নিজের চারপাশে যে অন্যায়-অনাচার লক্ষ করেছিলেন এবং নিজের জীবনে সমাজসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তারই চিত্র পাওয়া যায় এ গ্রন্থের মধ্যে। উনিশ শতকের শেষ দিকে এদেশে জমিদারদের অন্দরমহলের স্বেচ্ছাচার, মেয়েদের আধুনিকতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, জমিদারের আমলাদের অনাচার, অত্যাচারী জমিদারদের স্বার্থপরতা, বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি কর্মচারীর দুর্নীতি ইত্যাদি অসংখ্য কলুষময় চিত্র 'গাজী মিঞার বস্তানী' গ্রন্থে ব্যঙ্গবিদ্রূপ সহকারে রূপায়িত হয়েছে। লেখক তাঁর চারপাশের স্থান ও চরিত্রের ব্যঙ্গাত্মক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। রচনাটি আত্মজীবনী- মূলক, তাই এই ছদ্মবেশের প্রয়োজন ছিল। স্থানের নাম : জমদ্বার, অরাজকপুর, হাতপাতা থানা, নেংটিচোরা গ্রাম, নচ্ছারপুর, খামখেয়ালীগঞ্জ, আহ্লাদগঞ্জ; লোকের নাম : সোনা বিবি, মণি বিবি, বেগম পয়জারননেসা, ছিঁড়িয়া খাতুন, জ্বালাতন নেসা, সবলোট চৌধুরী, ভেড়াকান্ত, গাজী মিয়াঁ, জয়ঢাক, ধিনতাধিন মোক্তার, ধামাধরা সরকার, বেআক্কেল, তেনাচোরা, আরশুলা, ধড়িবাজ, চোট্টা মিঞা, দাগাদারী, ধূম্বলোচন, লাল আলু, ঘরভাঙ্গা সান্যাল, মাথাপাগল লাহিড়ী, কালকূট রায়, পেটভরা গুহ, উনপাঁজুরে ঘোষ, কীলচোর বাগছি, ঘসাপয়সা, উলটপালট খাঁ, বেল্লীক মুনসী, বদ হজম, পাজী খাঁ, বেহায়া শেখ, কটা লাহিড়ী, আলকাতরা সান্যাল ইত্যাদি। এসব নাম যেমন রহস্যপ্রিয়তার পরিচায়ক, তেমনি

তীব্রবিদ্রূপের সহায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের দপ্তরের' সমগোত্র এই গ্রন্থটি অনেক বেশি বৈচিত্র্যধর্মী এবং সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবেও কৃতিত্বের অধিকারী।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ও 'গাজী মিঞার বস্তানী' গ্রন্থ দুটি লেখকের আত্মজীবনীমূলক রচনা এবং এগুলো তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। তিনি দু চোখ ভরে যা দেখেছেন তারই অবিকল শিল্পমূর্তি দান করেছেন। 'বাংলার মুসলমান সমাজের দারিদ্র্য, তাদের অসহায় সরলতা এবং সেই সুযোগে স্বার্থগৃধ্নু অমানুষদের মর্মান্তিক উৎপীড়নের আর্থিক, সামাজিক, এমনকি ধর্মীয় জীবনের অবিকল নকশা এঁকেছেন শিল্পী।' মুনীর চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'গাজী মিঞার বস্তানী একটি গণ্ডগ্রামের পয়সাওয়ালা অসৎ নরনারীর যাবতীয় অপকর্মের ফিরিস্তি। গ্রাম্য স্থূলতা ও নোংরামি এ জীবনের পরতে পরতে ক্লেদ সঞ্চার করেছে। গাজী মিঞা জগৎকে বর্ণনা করেছেন সমাজ-সচেতন মহৎ শিল্পীর নিরপেক্ষ বেদনাবোধ নিয়ে নয়। বর্ণকের মর্মবেদনা এমন কোন আদর্শগত মহত্তর জীবনের সঙ্কেত নির্মাণ করতে পারে নি, যার ক্ষয় বা বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করে আমরাও মর্মাহত বা অভিভূত হয়ে পড়তে পারি।'

'এসলামের জয়' (১৯০৮) গ্রন্থটি ইতিহাসও নয়, উপন্যাসও নয়—ইসলামের শৈশবেতিহাসের কতগুলো ধারাবাহিক ও বিচ্ছিন্ন কাহিনি অবলম্বনে রচিত এক প্রকার আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগময় সন্দর্ভ। ইতিহাসের তথ্যসম্ভারের ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি রচিত হলেও তা উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। মীর মশাররফ হোসেনের অধিকাংশ রচনাই 'অলৌকিকতামণ্ডিত, কিংবদন্তিপূর্ণ অসংস্কৃত পুঁথিসাহিত্যের ইসলামের পুনর্নির্মাণ' হলেও এই গ্রন্থে ধর্মজীবনের গভীরতম উপলব্ধির সঙ্গে মানবজীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলেছে। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের কতিপয় সংগ্রাম ও বিজয়কাহিনি এর উপজীব্য। গ্রন্থের ভাষা অত্যন্ত বেগবান এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

মীর মশাররফ হোসেনের নাটকগুলোর মধ্যে 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩) উল্লেখযোগ্য। মুসলমান নাট্যকার রচিত প্রথম নাটক হিসেবে এর গুরুত্ব বিদ্যমান। ইন্দ্রপুরে বিপত্নীক রাজার বৃদ্ধ বয়সে যুবতী-স্ত্রী গ্রহণ, রাজার যুবক পুত্রের প্রতি বিমাতার আকর্ষণ এবং প্রেমনিবেদন, পুত্রের প্রত্যাখ্যান এবং বিমাতার ষড়যন্ত্র, পরিশেষে রাজপরিবারের সকলের মৃত্যু—এ কাহিনির অবলম্বনে 'বসন্তকুমারী নাটক' রচিত। নাটকটির অপর নাম 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' কাহিনির তাৎপর্যপ্রকাশক। মানুষের দেহাশ্রিত বাসনায় যে বিচিত্র অভিব্যক্তি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে 'বসন্তকুমারী নাটকে' তা প্রকাশের মাধ্যমে মীর মশাররফ হোসেন মুসলমান সাহিত্যিকদের পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন। কাহিনি গ্রন্থনে সুসংবদ্ধতা, সংলাপের বিচিত্র চাতুরী এবং এক সর্বাঙ্গীন প্রাণবন্ত ভাবপরিমণ্ডল—এই সমস্ত দিকের জন্য নাটকটির বিশিষ্টতা।

'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) মীর মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় নাটক। নিজের পরিবেশে জমিদারের অত্যাচারী মনোবৃত্তির যে পরিচয় তিনি লাভ করেছিলেন তারই প্রকাশ ঘটেছে এই নাটকে। নামের মাধ্যমেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রভাব এর ওপর উপলব্ধি করা চলে। মুসলমান চরিত্র নিয়ে রচিত এ নাটকে জমিদারের অত্যাচারের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। কৃষকের জীবনে জমিদার যে কতটুকু অভিশাপ হয়ে

দেখা দিতে পারে তা-ই এখানে লক্ষণীয়। নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতিসূচক মনোভাব এখানে প্রকাশমান। মুনীর চৌধুরীর মতে, 'এই দর্পণে এক বিশেষ প্রকৃতির বর্বরোচিত অত্যাচারের কদর্যতা হয়ত অবিকল প্রতিবর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তার শিল্পসঙ্গত রূপান্তর সাধিত হয় নি।'

'এর উপায় কি' (১৮৭৬) মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম প্রহসন। প্রহসন রচনাকারী হিসেবে এখানে তাঁর সার্থকতার পরিচয় সহজলভ্য।

'গোজীবন' (১৮৮৮) প্রবন্ধগ্রন্থে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ নির্মূল করার উপায় স্বরূপ গো-মাংস ভক্ষণ মুসলমানদের ত্যাগ করা উচিত বলে মীর মশাররফ হোসেন প্রস্তাব দিয়েছিলেন। লেখক ভেবেছিলেন চিরসঙ্গী হিন্দুদের মনে ব্যথা দিয়ে লাভ কি। কিন্তু এতে মুসলমানদের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। টাঙ্গাইলে ধর্মসভার অনুষ্ঠান করে লেখককে 'কাফের' স্থির করা হয় এবং লেখকের স্ত্রী তালাকের ফতোয়া দেওয়া হয়। মীর মশাররফ হোসেন প্রতিবাদীদের আদালতে অভিযুক্ত করেন।

মীর মশাররফ হোসেন কিছু সংখ্যক কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। এদের অধিকাংশই ধর্মবিষয়ক। তবে ধর্মের মাহাত্ম্য তাঁর মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয় না। সামাজিক সত্তার আচার-আচ্ছন্ন সংস্কারবশ ধর্মকর্মের কথা, প্রকৃত বিশ্বাসে গৃহীত, পুঁথিপরিবেশিত ধর্মবিষয়ক বাসনাধারণাদির উপকথা মাত্র এই জাতীয় রচনায় রূপায়িত হয়েছে।

মীর মশাররফ হোসেনের প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনী' (১৯০৮-১০) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বার খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁর জীবনের বিচিত্র তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। শেষ বয়সে রচিত এই আত্মজীবনীতে জীবনের প্রথম প্রণয়ের ওপর যে নাটকীয়তা ও রোমান্সরস আরোপ করেছেন তা সর্বত্র পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করে না। জীবনকাহিনির দীর্ঘ বর্ণনাচ্ছলে কোথাও নিজেকে তিনি প্রমাণ মাপের মানুষের চেয়ে বৃহদায়তন করে অঙ্কন করেন নি।

'বিবি কুলসুম' (১৯১০) গ্রন্থটি মীর মশাররফ হোসেনের পত্নীর জীবন-কাহিনি এবং এটি তাঁর জীবনের সর্বশেষ রচনা। তাঁর প্রেমময়ী জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে অতিবাহিত জীবনের সুদীর্ঘ দিনের আলেখ্য প্রকাশ পেয়েছে এ গ্রন্থে এবং এতে স্ত্রীর জীবনই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর নিজের দাম্পত্যজীবনের মূল্যবান তথ্য প্রকাশের জন্যও গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য।

ভাষারীতির দিক থেকে মীর মশাররফ হোসেন বিশিষ্টতার অধিকারী। তাঁর 'গদ্য ফেনিলোচ্ছল ও বেগবান।' এই গদ্যরীতি তাঁকে সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যে মর্যাদাপূর্ণ আসন দিয়েছে। ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'মশাররফের শিল্পী-চেতনা ছিল স্বভাবপটু; উচ্চশিক্ষা কিংবা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের পরিমার্জনা এবং অনন্য স্বাতন্ত্র্যে তাঁর নিজস্ব স্টাইলটি পূর্ণ বিকশিত হতে পারে নি। যেখানে তা সম্ভব হয়েছে, সেখানে পল্লীবাংলার মাটির গন্ধ ভাষা এবং ভাবে পরিশ্রুত আকারে ধরা পড়েছে।'...কেবল বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের নয়, বাংলা সাহিত্যে এই মাটির ভাব-গন্ধভরা ভাষাশিল্পের স্বভাব রূপকার ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন।

মোজাম্মেল হক

বাংলা কাব্যে মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) দক্ষতা প্রদর্শন করলেও গদ্য রচনায়ও তার কৃতিত্ব ছিল। 'শান্তিপুরের কবি' হিসেবেই তাঁর বিশেষ কবিখ্যাতি, কিন্তু গদ্যরচনাকারী হিসেবে তাঁর অবদান অনুল্লেখযোগ্য নয়। 'কুসুমকুমারী', 'জাতীয় ফোয়ারা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করলেও গদ্যের ক্ষেত্রে তিনি অধিকতর সার্থকতা লাভ করতে পেরেছিলেন। তাঁর সাহিত্যসাধনা, মননশীলতা ও পরিশ্রম বাংলা গদ্যের পরিণতিতে ছিল যথেষ্ট সহায়ক। তিনি যেসব গদ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার নাম :

জীবনী : 'মহর্ষি মনসুর', 'তাপস কাহিনি', 'বড়পীর চরিত', 'ফিরদৌসী চরিত', 'মৌলানা পরিচয়'।

ইতিহাস : 'টিপু সুলতান'।

কাহিনি : 'হাতেম তাই'।

উপন্যাস : 'জোহরা', 'দরাফ খান গাজী' ও 'রঙ্গিলাবাঈ'।

অনুবাদ : 'শাহনামা'।

মোজাম্মেল হকের গদ্য রচনাকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা চলে। যেমন : ১. ঐতিহাসিক মহাপুরুষ ও সুফীসাধকদের জীবন কাহিনি অবলম্বনে রচিত গ্রন্থসমূহ এবং ২. সামাজিক, ধর্মমূলক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস।

'মহর্ষি মনসুর' জীবনী গ্রন্থটি অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহামানব মনসুরের জীবন কাহিনি অবলম্বনে রচিত। প্রচলিত গল্প এবং একটি উর্দুগ্রন্থ অবলম্বনে মোজাম্মেল হক এই গ্রন্থের কাহিনি রূপায়িত করেন। 'মহর্ষি মনসুর' গ্রন্থের ধ্বনিময় ভাষা ও আবেগপ্রধান প্রকাশভঙ্গি লেখকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। ভাষার নমুনা :

> 'সসাগরা পৃথিবীর প্রচণ্ডবিক্রম সার্বভৌম নরপতি ও দীনহীন নিরাশ্রয় পথের ভিখারী, পরমধার্মিক নিত্য-জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষ ও পরাস্বপহারী সদা-কদাচারী দুর্দান্ত দস্যু, অগাধ-মনীষাসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও হিতাহিত-বোধহীন নিরক্ষর মূর্খ, দিব্য লাবণ্য পরিশোভিত বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ ও চলচ্ছক্তিবিরহিত লোলচর্ম বৃদ্ধ, নব-যৌবনগরবিনী রূপবতী কামিনী ও রূপযৌবনবিগতা পলিতকেশা প্রবীণা, পবিত্র-সলিল-স্নাত প্রিয়দর্শন বালক ও উদ্যতোন্মুখী শুদ্ধমতি সুকুমারী বালিকা, সকলেই নিয়তির অধীন।'

'তাপসকাহিনি' গ্রন্থটি সাতজন প্রখ্যাত আওলিয়ার জীবনকাহিনি। 'বড়পীর চরিত'ও তেমনি একখানি জীবনীগ্রন্থ। ইসলামের দরবেশ ও অন্যান্য বিশ্ববিশ্রুত মুসলমানদের জীবনের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই মোজাম্মেল হক এই শ্রেণির জীবনী ও ইতিহাস রচনায় প্রয়াস পান। 'টিপু সুলতান' তাঁর শেষ বয়সের রচনা। মহীশূরের শেষ স্বাধীন শাসকের জীবনকাহিনি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থের বর্ণিতব্য বিষয়।

উপন্যাসের দিক থেকে 'জোহরা'র কথা উল্লেখযোগ্য। গ্রাম্য মুসলমান সমাজের একটি করুণচিত্র এই উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। কন্যার মতামত অগ্রাহ্য করে আত্মীয়স্বজনেরা বিয়ে দিতে গিয়ে কন্যার জীবনে যে দুর্ভোগের সৃষ্টি করে তা-ই এই গ্রন্থের উপজীব্য।

ইসলামি ঐতিহ্য অবলম্বনে সাহিত্যসাধনা করলেও মোজাম্মেল হক স্বাতন্ত্র্যপন্থী সুধাকর দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন নি, বরং সমন্বয়পন্থী হিসেবেই তাঁর যথার্থ পরিচয় প্রকাশমান। মুসলিম কৃষ্টি অবলম্বনে আদর্শ জীবনের কল্পনা করলেও তিনি সুধাকর দলের মত আদর্শ প্রচারে অবতীর্ণ হন নি। তাঁর রচনায় সাবলীলতা, দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা এবং নিষ্ঠার একাগ্রতা তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর গদ্যরীতির প্রসাদগুণ সরসতার জন্য নিত্যন্ত বাস্তবধর্মী বিষয়ও সুখপাঠ্য ও সাহিত্যরসমণ্ডিত হয়ে সমাদৃত। ভাষাব্যবহারে ও শব্দচয়নে তিনি ছিলেন একজন সচেতন শিল্পী। কি ধরনের ভাষা ও রীতি অবলম্বনে সাহিত্যসাধনা সার্থকতর হয়ে উঠতে পারে সেদিকে তিনি বিশেষ লক্ষ রেখেছিলেন বলে তাঁর রচনায় ভাষার একটি ক্রমপরিণতি লক্ষণীয়। এর ফলেই তাঁর ভাষায় ঘটেছে লালিত্য ও গাম্ভীর্যের সমন্বয়।

শেখ আবদুর রহিম

স্বাতন্ত্র্যবাদী বা সুধাকর দলের পুরোভাগে থেকে শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) মুসলিম রচিত বাংলা সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'সুধাকর', 'মিহির', 'মিহির ও সুধাকর', 'হাফেজ' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা সম্পাদনায় সংশ্লিষ্ট থেকে তিনি ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমানদের জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটকালে তিনি জাতীয় জাগরণের জন্য সাহিত্যকে নিয়েছিলেন মাধ্যম হিসেবে। সুধাকর দলে সংশ্লিষ্ট থেকে ইসলাম ধর্ম ও বাংলা সাহিত্যের সেবা ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। চব্বিশ পরগনা জেলায় তাঁর জন্ম; প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ করে সাংবাদিক হিসেবে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'অন্ধকার যুগে যখন আমি নিজের ক্ষীণশক্তিটুকু লইয়া সম্পূর্ণ নিরাবলম্বন ও নিঃসহায় অবস্থায় বাংলার সাহিত্য আসরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম তখন একটিমাত্র চিন্তাই আমার সমস্ত দেহমন অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সেই চিন্তাটি এই যে—কেমন করিয়া আমার প্রিয়তম স্বজাতি বাঙালি মুসলমানদিগের মধ্যে বাংলা ভাষার অবাধ প্রচার করিব, কেমন করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত কুহেলিকা ও জড়তা মোচন করিয়া তাহাদিগকে মাতৃভাষার পুণ্যমন্দিরে লইয়া আসিব এবং কেমন করিয়া তাহাদের মনের মধ্যে মাতৃভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের প্রেরণা জোগাইয়া দিব?'

শেখ আবদুর রহিমের অবিস্মরণীয় কীর্তি 'হযরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭) নামক জীবনীগ্রন্থ। ৯৫৮ পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থের মধ্যে রাসুলুল্লাহ্‌র জীবনী, ইসলাম ধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং ইসলামের তত্ত্বকথা রূপায়িত হয়েছে। গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য প্রকাশক ভূমিকা থেকে কিছু বক্তব্য উল্লেখযোগ্য : 'ইহাতে হযরত নূহ আলায়হেচ্ছালামের সময় হইতে আরব্ব দেশের প্রাচীন এবং আধুনিক অবস্থা বিশদভাবে বিধৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হিজরির প্রথম অব্দ হইতে প্রত্যেক বৎসরের ঘটনাবলী এক একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে নিয়মিত রূপে লিখিয়াছি। প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধে কোরআন শরীফের যে যে আয়াত অবতীর্ণ (নাজেল) হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত অনুবাদ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। কোন ঘটনা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ হইলে বিভিন্ন হাদিসের বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। পুস্তকের পরিশিষ্টে হযরত

মুহম্মদের আবির্ভাব হইবার ভবিষ্যদ্‌বাণী তওরাত ও ইঞ্জিলে যাহা যাহা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ করিয়া দিয়াছি এবং উক্ত ভবিষ্যদবাণী সম্বন্ধে মুসায়ী ও ঈসায়ীগণের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে শেষ ধর্মপ্রচারকদের আবির্ভাবের বিষয়ে মুসায়ী ও ঈসায়ীগণ কিরূপ কুসংস্কারাবিষ্ট, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। হযরত মুহম্মদ তরবারি বলে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ যে তাঁহার নামে বৃথা দোষারূপ করিয়া থাকেন, এই পুস্তক পাঠ করিলে সে ভ্রম বিদূরিত হইবে।' তাঁর ভাষার ক্লাসিক্যাল গদ্যরীতির নমুনা :

> 'মহাত্মা নির্বাকে, ভয়কম্পিত কলেবরে গিরিগুহার অভ্যন্তরে চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন, এমন সময় সহসা এক অপার্থিব জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া সমগ্র গিরিকন্দর আলোকিত করিয়া তুলিল। মহামনা হজরত মুহম্মদ সেই আকস্মিক জ্যোতিঃরাশি দর্শন করিয়া ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট ও বাক-নিস্পত্তিরহিত ও স্বেদসিক্ত কলেবর হইয়া গেলেন। তখন সেই জ্যোতিঃরাশির মধ্য হইতে এক বিরাট পুরুষ (জেব্রিল) আবির্ভূত হইয়া হজরত মহম্মদকে বলিলেন, 'হে মহম্মদ! আল্লাহতায়ালা আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তুমি তাঁহার নিয়োজিত ধর্মপ্রচারক, আমি তাঁহার দূত রুহোল আমিন (জেব্রিল)।'

তৎকালীন মুসলমান সমাজে নিজস্ব ধর্ম, ইতিহাস ও মহাপুরুষদের জীবনকাহিনি উপলব্ধি করার যে প্রেরণার সঞ্চার হয়েছিল, তারই ফল হিসেবে শেখ আবদুর রহিমের সাহিত্যসাধনার বিকাশ ঘটে।

'হযরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' গ্রন্থের পরিপূরক হিসেবে তাঁর 'ইসলাম ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি রচিত। এতে খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় থেকে আরম্ভ করে উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমীয় প্রভৃতি মুসলিম শাসকবংশের ইতিহাস এবং তৎকালীন রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, আচার-অনুষ্ঠান ধর্মপ্রচার প্রভৃতির আলোচনা স্থান পেয়েছে।

এই সমস্ত গ্রন্থ ছাড়া তিনি 'নামাজতত্ত্ব', 'হজ্ববিধি', 'ইসলামনীতি', 'রোজাতত্ত্ব', 'খোৎবা', 'কোরআন ও হাদিসের উপদেশাবলী', 'ইসলামতত্ত্ব' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি আরভিং-এর 'টেলস্ অব আলহামরা' গ্রন্থের 'পিলগ্রিমেজ অব লাভ' নামক গল্পকে 'প্রণয়যাত্রী' নামে বাংলায় অনুবাদ করেন।

শেখ আবদুর রহিম চিন্তার স্বচ্ছতা, ভাষার বর্ণনাভঙ্গির সুস্পষ্ট শক্তিশালী ও ছন্দোময় বৈশিষ্ট্যের জন্য সুধাকর দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

পণ্ডিত রিয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদী

সুধাকর দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কলকাতার মাদ্রাসায়ে আলীয়ার সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক পণ্ডিত রিয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯) একজন বিশিষ্ট লেখক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় তাঁর মোটামুটি অধিকার ছিল। 'সুরিয়া বিজয়', 'প্রবন্ধ কৌমুদী', 'সমাজ ও সংস্কারক', 'অগ্নিকুক্কুট'—এই কয়টি তাঁর রচিত গ্রন্থ। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরের সিরিয়া অভিযান ও বিজয় অবলম্বনে 'সুরিয়া বিজয়' রচিত। জামালুদ্দীন আফগানির বিপ্লবী জীবন এবং তাঁর মতবাদ উপজীব্য করে রচিত

'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থটি। কৌতুকপ্রদ রচনা 'অগ্নিকুক্কুট' বাদানুবাদমূলক সাহিত্যসৃষ্টি। গোহত্যা সম্পর্কিত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থটি রচিত। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা যেমন হিন্দুদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধের সৃষ্টি করেছিল তেমনি দেরিতে হলেও পাশ্চাত্য প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যেও ঐতিহ্য ও স্বাজাত্যবোধের বিকাশ ঘটে। এর ফল তৎকালীন মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা প্রকৃষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। পণ্ডিত রিয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদীর সাহিত্যসাধনায় সে ঐতিহ্য ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় মিলে। ড. আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, 'ঐতিহ্যচেতনা তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল, কিন্তু ঐতিহ্যগর্ব তাঁকে অন্ধ করতে পারে নি। মুসলমানদের অতীতে যা কিছু সুন্দর ও শ্রেয়, তাকে তিনি গ্রহণ করেছেন কেবল সুখস্মৃতিরূপে নয়, নতুন সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে।'

মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ

সুধাকর দলের প্রবর্তনকারীদের মধ্যে মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ(১৮৬২-১৯৩৩) অন্যতম প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যসাধনার বিষয়বস্তু ও জীবনাদর্শের সঙ্গে পণ্ডিত রিয়াজউদ্দিন মাশহাদীর ঐক্য বিদ্যমান। আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মুন্সী রেয়াজুদ্দিন ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করে কলকাতায় আগমন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলমান মনীষীগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। বিভিন্ন ইসলামি পত্রপত্রিকার সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন এবং 'এসলাম তত্ত্ব' গ্রন্থের প্রকাশের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সেবা করেছেন। 'গ্রীসতুরস্ক যুদ্ধ', 'তোহ্ফাতুল মুসলেমিন', 'কৃষক বন্ধু' (কাব্য), 'হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনচরিত', 'মোসলেম পাক প্রণালী', 'আমার সংসার জীবন' প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ। গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তুর মাধ্যমেই মুন্সী রেয়াজুদ্দিন আহমদের সাহিত্যসাধনার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। 'ইংরেজ শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা, হিন্দু সম্পর্কে বিরূপতা, সামাজিক প্রগতির বিরোধিতা এবং সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতাই তাঁর বৈশিষ্ট্য।'

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্

বিশিষ্ট লেখক হিসেবে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭) খ্যাতিমান ছিলেন। ইসলামের ঐতিহ্য ইতিহাস ধর্মনীতি ইত্যাদি ব্যাখ্যা ও প্রচার করার উদ্দেশ্যে যাঁরা সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে আদর্শগত দিক থেকে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র মিল ছিল। তবে তিনি প্রধানত ধর্মপ্রচারক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থগুলো সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কিছু বাংলা ও আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা করে জীবিকার্জনের জন্য দর্জিগিরি অবলম্বন করেন। খ্রিস্টান পাদ্রিদের ধর্মপ্রচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে তিনি ইসলাম প্রচারে অবতীর্ণ হন। তিনি স্বল্প বিদ্যা, অমিত উদ্যম ও অসাধারণ বাগ্মিতার সাহায্যে মিশনারিদের সম্মুখীন হয়ে বাঙালি মুসলমানদের সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই কারণে সুধাকর দলের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে। ইসলাম ধর্মের প্রচারক হিসেবে তিনি 'খ্রিস্টীয় ধর্মের অসারতা', 'মেহেরুল ইসলাম', 'বিধবা গঞ্জনা', 'হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা', 'পান্দেনামা', 'উপদেশমালা',

'নবরত্নমালা বা বাংলা গজল', 'ইসলামি বক্তৃতামালা', 'খ্রিস্টান-মুসলমান তর্কযুদ্ধ', 'রদ্দে খ্রিস্টান ও দলিলোল ইসলাম' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনাবলীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ধর্মবিষয়ক তর্কে ইসলাম ধর্মের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তিনি সমগ্র জীবন এ কাজে ব্যয় করেছেন এবং জীবনে হাজার হাজার লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন অথবা ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানরূপে জীবন যাপনে প্রেরণা দিয়েছেন।

মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন

ইসলাম ধর্ম প্রচারে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সহকর্মী ছিলেন মুন্সী জমিরুদ্দিন(১৮৭০-১৯৩০)। অবশ্য মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারক। ১৮৮৭ সালে জমিরুদ্দিন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি ক্রমান্বয়ে কলকাতার সি. এম. এস. হাইস্কুল, এলাহাবাদের সেন্টপলস ডিভিনিটি কলেজে ও কলকাতার সি. এম. এস. ক্যাথিড্রাল মিশন ডিভিনিটি কলেজে দীর্ঘকাল খ্রিস্টধর্ম তত্ত্ব এবং সংস্কৃত আরবি গ্রীক ও হিব্রু ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ১৮৯২ সালে তিনি মিশনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে রত হন। ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে তিনি মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সঙ্গে পত্রিকার মাধ্যমে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন এবং পরাস্ত হয়ে স্বধর্মে ফিরে আসেন। তখন তিনি হন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সহকর্মী। ইসলাম প্রচার হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের ব্রত।

মুন্সী জমিরুদ্দিন অনেকগুলো গ্রন্থের রচনাকারী। প্রচারক জীবনের কর্তব্য হিসেবে তিনি শতাধিক বই লিখেছিলেন। 'ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদের মন্তব্য' গ্রন্থটি ১৯০০ সালে প্রকাশিত। বিভিন্ন মনীষীর ইসলাম ধর্মসম্পর্কিত মন্তব্য সংগ্রহ করে এই গ্রন্থটি সংকলিত। 'আসল বাংলা গজল' স্বরচিত ও অন্য রচয়িতার গজল গানের সংগ্রহ। 'শ্রেষ্ঠনবী হযরত মুহম্মদ (স) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন' গ্রন্থটি হযরত মুহম্মদের (স) জীবনী। 'ইসলামি বক্তৃতা' গ্রন্থটি 'ক্রিশ্চিয়ানিটি এ্যান্ড ইসলাম' নামক ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ। 'ইঞ্জিলে হযরত মোহাম্মদ ও পাদ্রী বাউস সাহেবের সাক্ষ্য' গ্রন্থটি বাউস রচিত হযরত মুহম্মদের (স) আবির্ভাব বিষয়ক বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত প্রবন্ধের অনুবাদমূলক রচনা। 'রদ্দে সত্যধর্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খ্রিস্টান', 'হযরত ঈশা কে ?', 'পাদ্রী মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ মুন্সী জমিরুদ্দিন রচনা করেছিলেন। ১৯১০ সালে প্রকাশিত 'শোকানল' কবিতাগ্রন্থটি কয়েকজন পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে লিখিত। 'বিশুদ্ধ খতনামা' নামে তিনি একটি আদর্শ পত্ররচনা শিক্ষাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

ড. আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, 'জমিরুদ্দিনের গ্রন্থাদির যা কিছু মূল্য—মেহেরুল্লাহর রচনাবলীর মত—তা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে। আমাদের সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এগুলোর ভূমিকা স্মরণীয়। রচনার যে প্রসাদগুণে ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের আলোচনা সাহিত্য হয়ে ওঠে, তা তাঁদের লেখনীতে প্রকাশ পায় নি। তা এঁদের অভিপ্রেতও ছিল না। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারের প্লাবনে ও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় বাঙালি মুসলমানের ধর্মজীবনে যে ভাঙন এসেছিল, এঁরা তা রোধ করতে চেয়েছিলেন। সে প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করে এঁরা গৌরবান্বিত হয়েছেন।'

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

রাজনীতিবিদ সমাজসেবক সাংবাদিক সাহিত্যিক ও বাগ্মী হিসেবে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১৯৫০) ছিলেন বিশেষ খ্যাতিমান। রংপুর সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট থাকাকালীন তিনি ইসলাম প্রচার এবং শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। ইতিহাসমূলক রচনার জন্য ইসলামাবাদীর খ্যাতি সমধিক। মুসলমানদের জীবনের নবরূপায়ণের জন্য তিনি ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস থেকে ঘটনা নিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'তুরস্কের সুলতান', 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা', 'নেজামুদ্দিন আওলিয়া', 'ভারতে ইসলাম প্রচার', 'মুসলমানদের অভ্যুত্থান', 'সমাজ-সংস্কার', 'ভূগোলশাস্ত্রে মুসলমান', 'কনস্টানটিনোপল', 'আও-রঙ্গজেব', 'মোসলেম বীরাঙ্গনা', 'কোরানে স্বাধীনতার বাণী', 'ইসলামের উপদেশ', 'ইসলামের পুণ্যকথা' ইত্যাদি।

শেখ ফজলল করিম

শেখ ফজলল করিমের (১৮৮২-১৯৩৬) প্রতিভার বিকাশ কাব্যক্ষেত্রে ঘটলেও তিনি গদ্যলেখক হিসেবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। 'সাহিত্যবিশারদ', 'নীতিভূষণ', 'কাব্যরত্নাকর' প্রভৃতি ছিল তাঁর সাহিত্যিক উপাধি। কাব্য নাটক উপন্যাস জীবনী ইত্যাদি সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর সাধনার ফল রূপায়িত হয়ে উঠেছিল।

'লায়লী মজনু' তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস। সরল ও সাবলীল ভাষায় রচিত এ উপন্যাস পাঠকমন আলোড়িত করতে সমর্থ হয়েছিল। 'চিন্তার চাষ' গ্রন্থে তিনি চিন্তা উদ্রেককারী কথার স্থান দিয়েছেন। 'পথ ও পাথেয়' ছোট ছোট ধর্মীয় গল্পের সংকলন, সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে মূল্যবান। তাঁর অপরাপর গদ্যরচনা হচ্ছে : 'মানসিংহ', 'ছামাতত্ত্ব', 'হযরত রাব্বানী সাহেবের জীবনী', 'হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি', 'বিবি রহিমা', 'হারুন অর রশীদের গল্প', 'সোনার বাতি', 'রাজর্ষি এবরাহিম', 'আফগানের ইতিহাস', 'মাথার মণি', 'হাতেম তাইর গল্প', 'বিবি খোদেজার জীবনী', 'বিবি ফাতেমার জীবনী', 'বেহেস্তের ফুল', 'বাগ ও বাহার' ইত্যাদি। ড. আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, 'ফজলল করিমের সাহিত্যকর্মের সর্বপ্রধান লক্ষণ হচ্ছে আদর্শবাদ। আদর্শ পুরুষ ও রমণীর জীবনচরিত-অঙ্কনই ছিল তাঁর গদ্যরচনার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।'

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

বাংলার মুসলমান নারীসমাজের প্রগতির অগ্রদূতী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) উপন্যাস ছোটগল্প প্রবন্ধ কবিতা প্রভৃতি রচনায় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনি শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যসাধিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। 'অবরোধ বাসিনী' প্রবন্ধ পুস্তকে নারীর দুঃখদুর্দশার চিত্র ফুটানো হয়েছে। 'মতিচূর' ও 'পদ্মরাগ' তাঁর উপন্যাস। কাজী আবদুল ওদুদ মন্তব্য করেছিলেন, 'মিসেস আর এস হোসেনের প্রতিভা একালের ভগ্নহৃদয় মুসলমানের জন্য যেন এক দৈব আশ্বাস। নিবাত নিষ্কম্প মুসলমান অন্তঃপুরে যদি এহেন বুদ্ধির দীপ্তি, মার্জিত রুচি, আত্মনির্ভরতা ও লিপিকুশলতার জন্ম হয় তবে আজো ভয় কেন বাংলার মুসলমানের ঘোচে না।'

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

সাহিত্যিক, বাগ্মী ও সমাজকর্মী ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০-১৯৩১) প্রতিভা কাব্যশাখায় বিকশিত হলেও গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। মুসলমান সমাজের জাগরণের সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাই তাঁর সাহিত্যসাধনায় সে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রকাশমান।

বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের মন্ত্র নিয়ে ইসমাইল হোসেন সিরাজী বাংলা সাহিত্যসাধনায় রত ছিলেন এবং কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত হন। ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক তথা গদ্যলেখক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর যে ভূমিকা তাও নানা বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তিনি বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণ ও সঙ্ঘবদ্ধতার বাণী প্রচার করতে গিয়ে তৎকালীন সুধাকর দলের লেখকদের সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন। জ্ঞানে ও কর্মে মুসলমানেরা উন্নতি লাভ করুক এই আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁর মনে উজ্জীবিত।

নানা ধরনের গ্রন্থরচনায় ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কৃতিত্ব বিদ্যমান। 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা', 'সুচিন্তা', 'তুর্কি নারীজীবন', 'স্ত্রীশিক্ষা', 'তুরস্ক ভ্রমণ', 'আদবকায়দা শিক্ষা', 'কারাকাহিনি' প্রভৃতি তাঁর প্রবন্ধ পুস্তক। তাঁর প্রবন্ধাবলী জাতীয় জাগরণের মন্ত্র হিসেবে কার্যকরী ছিল। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করে জাতি শিক্ষিত হয়ে উঠলে জাতীয় জীবনের অন্ধকার বিদূরিত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। 'আদবকায়দা শিক্ষা' ও 'স্ত্রীশিক্ষা' গ্রন্থে সমাজ ও সংসারের অভিপ্সিত উন্নতি ও কল্যাণ যে শিক্ষা ও স্বাধীনতাই আনয়ন করতে পারে তা ব্যক্ত হয়েছে। 'তুরস্ক ভ্রমণ' তাঁর ভ্রমণকাহিনি। 'স্পেনীয় মুসলমানদের সভ্যতা' ও 'তুর্কি নারীজীবন' গ্রন্থে অন্য দেশের মুসলমানদের গৌরবের ইতিহাসকে এদেশের প্রেরণার উৎস হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। 'রায়নন্দিনী', 'ফিরোজা বেগম', 'তারাবাঈ' ও 'নূরুদ্দীন' তাঁর রচিত উপন্যাস। তাঁর উপন্যাসগুলো বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় লিখিত। স্বসমাজপ্রীতি এসব উপন্যাসে উগ্রভাবে প্রকাশমান। স্বাজাত্যাভিমান ও স্বধর্মপ্রীতি তাঁর উপন্যাস রচনায় প্রেরণা দিয়েছে।

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর গদ্যের ভঙ্গি সাবলীল। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোর ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রাণবন্ত। তাঁর রচনার শক্তি প্রশংসাযোগ্য বলে সহজেই বিবেচিত হতে পারে। উপন্যাসের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি অলঙ্কারবহুল ক্লাসিক্যাল রীতির অনুষঙ্গী। দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপনা সৃষ্টির অনুকূল আবেগময় ভাষা তাঁর বক্তব্য প্রকাশের উপযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। তাঁর ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দবহুল ও সমাসবদ্ধ পদের বাহুল্যযুক্ত। তাঁর ভাষার কাঠামো ছিল ঐশ্বর্যময়, গতি ছিল স্বচ্ছন্দ; সে ভাষা ছিল অনলবর্ষী অথচ অমৃতময়। সিরাজীর সাহিত্য সাধনায় স্বাতন্ত্র্যপন্থীর পরিচয় পাওয়া যায়। রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তিনি নিজ সমাজ থেকেই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু পরাজয় মেনে নেন নি। আত্মসচেতন জাতি হিসেবে মুসলমানেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াক—এটাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল।

কাজী ইমদাদুল হক

বিখ্যাত 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের রচয়িতা কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গদ্যলেখক। 'নবীকাহিনি', 'প্রবন্ধমালা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করলেও মুসলমান সমাজের কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'আবদুল্লাহ্' উপন্যাসটি

তাঁকে সমধিক খ্যাতি দিয়েছে। সামাজিক মূঢ়তা ত্যাগ করে শিক্ষিত হয়ে উঠলে সমাজের উন্নয়ন সাধিত হবে—এই কথাই উপন্যাসটির উপজীব্য। এদেশের মুসলমান সমাজের ক্ষয়িষ্ণু আদর্শ ও রীতিনীতির সমালোচনা করে লেখক এখানে স্বাধীন চিত্তের ও মৌলিক পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। পীরবাদ, আভিজাত্যবোধ, পর্দাপ্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে লেখকের মনোভাব ছিল সোচ্চার।

ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) ছিলেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তিনি সাহিত্য ও সমাজকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। কাব্য ও উপন্যাস রচনায় তাঁর সাহিত্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব সমধিক। 'উন্নত জীবন', 'মানবজীবন', 'মহৎ জীবন', 'সত্য জীবন' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ। তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে আদর্শবাদী মনের পরিচয়। ব্যক্তিজীবনে কিভাবে উন্নত আদর্শ রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে তিনি বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর চিন্তায় ছিল অভিনবত্ব, প্রকাশে ছিল স্বতন্ত্র কৌশল এবং ভাষায় আছে ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতা। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর মূল্যায়ন করেছেন এ ভাবে, 'একালের বাংলার মুসলমান-সমাজে ধর্ম নিয়ে বাগবিতণ্ডা ও মাতামাতি কম হয় নি, কিন্তু সেই বিপুল আড়ম্বরের ফাঁকি একদিন যখন নিঃশেষে ধরা পড়বে তখন এ-যুগ ধর্মহীনতার, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের জন্য বেদনাহীনতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে যাঁদের অতন্দ্রিতচিত্ততার দৃষ্টান্তে, এই কিছু অব্যবস্থিত প্রতিভা লুৎফর রহমান তাঁদের মধ্যে এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।'

মোহাম্মদ নজিবর রহমান

'আনোয়ারা', 'প্রেমের সমাধি', 'গরীবের মেয়ে', 'পরিণাম', 'চাঁদতারা বা হাসান গঙ্গা বাহমনি', 'দুনিয়া আর চাই না', 'মেহেরউন্নিসা' প্রভৃতি উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩) ছিলেন অত্যধিক জনপ্রিয়। 'আনোয়ারা'(১৯১৪) উপন্যাসটির জন্য তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত এ উপন্যাসে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের পারিবারিক ও সামাজিক চিত্র উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর গুণে তিনি অল্পশিক্ষিত পাঠকদের নিকট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর রচনায় ইংরেজি শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমর্থন ছিল। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সাধারণ চিত্র তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

মতিয়র রহমান খান

আধুনিক যুগে যে কয়জন মুসলমান সাহিত্যিক তাঁদের প্রাচুর্যপূর্ণ অবদান সাহিত্যক্ষেত্রে রেখে গেছেন মতিয়র রহমান খান (১৮৭২-১৯৩৭) তাঁদের অন্যতম। তিনি কবিতা, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ ও রম্যরচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি সাংবাদিক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কাব্যসাধনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। গদ্যরচনায়ও তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। তিনি 'যমুনা', 'নবকুমুদ', 'আগ্রা

কাহিনি' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি কিছু ব্যঙ্গরসাত্মক গদ্যরচনাও প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে স্বজাতি প্রীতির পরিচয় দিতে গিয়ে মুসলিম চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে সমকালীন জীবনের প্রতিফলন নেই, আছে ইতিহাসের উপকরণ নিয়ে রচিত সাহিত্যসৃষ্টি।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

শক্তিশালী প্রবন্ধলেখক হিসেবে এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 'মানব মুকুট', 'নূরনবী', 'শান্তিধারা', 'ধর্মের কাহিনি' ইত্যাদি তাঁর গদ্যরচনা। মানব মুকুট তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। হযরতকে তিনি এখানে মানবজাতির সেবক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে এসব গ্রন্থের উপকরণ সংগৃহীত হলেও তিনি তাতে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতার পরিচয় না দিয়ে সুষ্ঠু মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। একজন শক্তিশালী গদ্যশিল্পী হিসেবে ইসলামি দর্শন ও সংস্কৃতিকে সাহিত্যের উপজীব্য করেছিলেন। ভাষার লালিত্যে, ওজস্বিতায় ও প্রকাশভঙ্গির ঋজুতায় তাঁর রচনাশৈলী বিশিষ্ট। আবেগবহুল ভাষার জন্য তাঁর রচনারীতি স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী।

কাজী আবদুল ওদুদ

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) ছিলেন ঢাকাস্থ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামক সংগঠনের অন্যতম নেতা। কলকাতা থেকে অর্থনীতি বিষয়ে এম এ পাশ করে ঢাকায় নিযুক্ত হয়েছিলেন বাংলার অধ্যাপক। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা'য় মুক্তচিন্তা ও যুক্তিভিত্তিক রচনার জন্য তিনি ঢাকার নবাব পরিবার কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করেন। পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজে মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণা জাগ্রত করার জন্য তিনি সাহিত্যসাধনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হল : 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠ', 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ', 'কবিগুরু গ্যেটে', 'সমাজ ও সাহিত্য', 'শাশ্বত বঙ্গ', 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'নজরুল প্রতিভা', 'বাংলার জাগরণ', 'শরৎচন্দ্র ও তারপর', 'হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম' ইত্যাদি। 'নদীবক্ষে' তাঁর উপন্যাস এবং 'মীরপরিবার' গল্পগ্রন্থ। তিনি ন্যায়নিষ্ঠা, উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য খ্যাত ছিলেন। 'বিশ দশকে ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি একজন সজাগ বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও লেখক হিসেবে সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে নিজের প্রজ্ঞা ও সংবেদনশীলতাকে সক্রিয় রেখেছিলেন।' তিনি ছিলেন অন্তরে ধার্মিক অথচ শাস্ত্রাচারের গোঁড়ামিমুক্ত এক উদার মানবিকতাসম্পৃক্ত, বিচারপরায়ণ ও নির্ভীক। অন্নদাশঙ্কর রায় মন্তব্য করেছেন, 'কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন জাতিতে ভারতীয়, ভাষায় বাঙালি, ধর্মে মুসলমান, জীবনদর্শনে মানবিকতাবাদী, মতবাদে রামমোহনপন্থী, সাহিত্যে গ্যেটে ও রবীন্দ্রপন্থী, রাজনীতিতে গান্ধী ও নেহেরুপন্থী, অর্থনৈতিক শ্রেণিবিচারে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, সামাজিক ধ্যানধারণায় ভিক্টোরিয়ান লিবারল।' তাঁর গদ্য রচনা প্রাঞ্জল ও বিশ্লেষণধর্মী।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে মুসলমান লেখকগণ জাতীয় জীবনের অনগ্রসরতা দূর করার লক্ষ্যে যে সাধনা শুরু করেছিলেন তাতে সাহিত্যের প্রতি তাঁদের প্রীতির পরিচয়ই প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান অনুরাগের পেছনেও এই উদ্যোগ কাজে লেগেছিল।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ

'মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তমনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা, জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করা এবং অতীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুসলমানকে মুক্ত করে তদানীন্তন কালের বাস্তবকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা করা'—এই আদর্শ নিয়ে ঢাকায় ১৯২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বার বছর এই সংগঠনের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সূত্রপাত্র করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও প্রবীণ ছাত্র বাঙালি মুসলমান সমাজে আড়ষ্ট বুদ্ধিকে মুক্ত করে জ্ঞানপিপাসা জাগিয়ে তোলার জন্য এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর গঠনতন্ত্রে সত্যপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

মুসলিম সাহিত্যসমাজের প্রতিষ্ঠালগ্নে সভাপতি ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং সম্পাদক ছিলেন আবুল হোসেন। সংগঠনের প্রাণপুরুষ ছিলেন তৎকালীন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষক কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হোসেন। সমাজের বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা'। শিখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখকেরা 'শিখা গোষ্ঠী' নামে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। শিখার প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছিল, 'শিখার প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন সাধন।' পত্রিকার পরিচালকেরা মনে করতেন, জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্মী ও লেখকগোষ্ঠী মাসিক ও বার্ষিক সভা, মুখপত্র শিখা প্রকাশ, প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ সমকালীন লেখকদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। এ আন্দোলনের সঙ্গে আরও সংশ্লিষ্ট ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির, কাজী আনোয়ারুল কাদির, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ অনেকেই।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও এর পরিচালকেরা সেকালের বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্য ও চিন্তাধারায় আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। মাসিক ও বার্ষিক সভায় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সদস্যদের লেখা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হত এবং 'শিখা' পত্রিকায় সেসব প্রকাশিত হত। আবুল হোসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ সামাজিক সমস্যা নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁদের লেখায় মুক্তমন ও মুক্ত চিন্তাশীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল। শিখা গোষ্ঠী ও তাঁদের সহসংগঠন 'পর্দাবিরোধী সংঘ'র সদস্যরা তৎকালীন মুসলিম সমাজে

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ভেতর দিয়ে প্রবল আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ এই আন্দোলনকে মেনে নিতে পারেনি। মাওলানা আকরম খাঁ ও মোহাম্মদী পত্রিকা এসব কর্মকাণ্ডকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছিল।

ঢাকার রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ এ আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। সে কারণে মুসলিম হলে এদের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ হয়। বিশেষ করে আবুল হোসেন প্রবল সামাজিক বিরোধিতার সম্মুখীন হন এবং এক পর্যায়ে ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যেতে হয়।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্মকাণ্ডের পরিণতি সম্পর্কে মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ মন্তব্য করেছেন, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্মতৎপরতা ও চিন্তাধারা বুদ্ধিবাদী বাঙালি মুসলমানের মনে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল সত্য, কিন্তু সে চিন্তায় তারা সমকালে তেমন অবগাহন করে নি, নবজাগ্রত মুসলিম সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই উদারনৈতিক চিন্তাধারার স্পর্শে চকিত হয়েছিল, কিন্তু তা তাদের চেতনায় ও মর্মমূলে স্থায়ীভাবে অনুপ্রবেশ করেনি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, সাহিত্য সমাজের কর্মীরা উদারনৈতিকতা ও মানবতাবাদের বাণী প্রচার করলেও, মুসলিম মনের গড়ন ও তাদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে তাঁরা খুব বেশি সচেতন ছিলেন না; ফলে ধর্মীয় চিন্তাধারা, ঐতিহ্যের স্বতন্ত্ররূপ এবং সাংস্কৃতিক ও আধিমানসিক চেতনা ইত্যাদি বিশ্লেষণে তাঁরা তেমন সংবেদনশীলতার পরিচয় দেননি এবং এর ফলে মুসলিম সমাজের সর্বাঙ্গীন সংস্কার ও উজ্জীবন প্রচেষ্টা অনেকক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যেহেতু মুসলিম সাহিত্য সমাজের আন্দোলন ছিল বুদ্ধিবাদী আন্দোলন, সে কারণে তা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল— সে গোষ্ঠীর সমবায়ী প্রচেষ্টায় জনমানসে তা শিকড় অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়নি।'

মুসলিম সাহিত্য সমাজের আন্দোলন দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু উদ্যোক্তাদের অবদানের গুরুত্বও কম ছিল না। কাজী আবদুল ওদুদের রচনা বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্যিক রুচির উন্নয়নে সাহায্য করেছে। আবুল হোসেনের রচনাতেই মুসলিম সমাজের জন্য সচেতনতার বাণী বিদ্যমান ছিল। মুসলিম সাহিত্য সমাজের সামগ্রিক প্রয়াস বুদ্ধিবাদী বাঙালি মুসলমানের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, 'এই আন্দোলন আইডিয়ার জগতে সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে চিন্তার দৈন্য ছিল তখন সুস্পষ্ট। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির তুলনায় এঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে অগ্রসর ছিলেন। এই অগ্রসর চিন্তা সমগ্র সমাজে গৃহীত হয় নি। এই জন্যই এঁরা তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাকে অব্যাহত ধারায় সচল রাখতে পারেন নি।'

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

১। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'মুসলিম জাতীয়তার' উৎপত্তি বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর।

২। উনিশ শতকী মুসলিম লিখিয়েদের সাহিত্য প্রচেষ্টা মুখ্যত আরব-ইরানি গৌরব ও ঐতিহ্য স্মরণেই সীমিত ছিল। কারণ, তাঁদের আত্মপ্রবোধ প্রাপ্তির প্রয়াস ছিল, আত্মোন্নয়নের উদ্যোগ ছিল না।—উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের প্রধান লেখকদের পরিচয়দানসূত্রে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য যাচাই কর।

৩। 'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্য প্রচেষ্টা স্বজাতিকে প্রাচীন মুসলিম গৌরবে ও ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।'—তথ্য প্রয়োগে এই মন্তব্য যাচাই কর।

৪। উনিশ শতকের শেষার্ধে যে কয়েকজন মুসলিম সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া মুসলমান সমাজের জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে তাঁহাদের কৃতিত্ব নিরূপণ কর।

৫। আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের অবদান বিলম্বিত কেন ? ইহার ঐতিহাসিক কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর।

৬। 'উনবিংশ শতকের শেষ পর্বে এবং বিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্বে বাঙালি মুসলিম লেখকদের যে সাহিত্য প্রয়াস তার মূলে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রেরণা।'—আলোচনা কর।

৭। 'একদিকে ইসলামের মহিমা প্রচার ও সমাজ-সংস্কার, অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বের প্রতি প্রবল আগ্রহ—উনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্যান্দোলনের মূলে সক্রিয় ছিল এই সকল উপকরণ।'—আলোচনা কর।

৮। 'কাব্যে না হলেও, গদ্যরচনায় উনিশ শতকের মুসলমান সাহিত্যিকগণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।'—এই উক্তির আলোকে উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সাহিত্যিকদের অবদানের মূল্য নিরূপণ কর।

৯। 'উনিশ শতকের মুসলিম লেখক প্রয়োজনের তাকিদে স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না।'—স্বাতন্ত্র্যকামী মুসলিম লেখকদের রচনার আলোকে এই উক্তি যাচাই কর।

১০। 'ধর্মীয় মনোভাবও নয়, সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধিও নয়, নিছক অতীত প্রীতিই উনিশ শতকের মুসলিম সাহিত্যিকদের লেখনী নিয়ন্ত্রিত করেছিল।'—উনবিংশ শতাব্দীর যে-কোন দুইজন মুসলিম লেখকের সাহিত্যকর্মের পরিচয় দান সূত্রে এই মন্তব্য যাচাই কর।

১১। 'বাংলার মুসলমান বাঙালি হিসেবেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনায় রত ছিল। তাদের রচনার মধ্যে নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য যে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়, তা সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট এ কথা বলা যাবে না, বরং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তখনকার বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতিই ছিল অমনি, মুসলমানেরা অনুসরণ করেছে মাত্র।'—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া বল।

১২। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের রচনাবলীর নামোল্লেখ করিয়া সেই সকল রচনার ভাবগত ও বিষয়গত সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর।

১৩। মীর মশাররফ হোসেনের রচনাবলীর নাম উল্লেখ করিয়া, গদ্যশিল্পী হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্দেশ কর।

১৪। 'উনিশ শতকে যে একদল সমন্বয়বাদী মুসলিম সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ পাই তাঁদের সে আদর্শ হীনম্মন্যতা বা উদারতাজাত নয়, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি প্রসূত।'—এই দলের প্রধান লেখকদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে এই উক্তি পরীক্ষা কর।

১৫। মশাররফ হোসেন বা মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ বা আবদুর রহিম প্রত্যেকেই প্রধানত অতীত মুসলিম গৌরবকথা ব্যাখ্যানে রত থাকিতে দেখা যায়। তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকায় মুসলিম লেখকদের এই সাহিত্যিক চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

১৬। উনিশ শতকের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক, একজন প্রধান কবি, একজন নাট্যকারের সাহিত্য সাধনার পরিচয় দাও।

১৭। 'মীর মশাররফ হোসেন তাঁর সমকালীন মুসলিম সাহিত্যিকদের ভিতরে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।'—স্বীকার কর কি?

১৮। 'বাংলা উপন্যাসে মুসলিম অবদানের কথা বলিতে গেলে অবশ্যই আমাদের মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক ও নজিবর রহমানের কথা স্মরণ করিতে হইবে।'—ইহাদের অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৯। উনিশ শতকের সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের কোন বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল কি না তাহা আলোচনা কর।

২০। উনবিংশ শতাব্দীর গদ্য রচনার ক্ষেত্রে মুসলমান সাহিত্যিকগণ যে অবদান সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার পরিচয় দাও।

২১। আধুনিক যুগের প্রথম শতকে মুসলমান সাহিত্যকগণ তাঁহাদের সাহিত্যকর্মের যে পরিচয় প্রকটিত করিয়াছেন তাহা উপস্থাপিত কর।

২২। 'উনিশ শতকের মুসলিম সাহিত্যিকদের স্বকালের ও স্বসমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য ছিল না, তাঁরা স্বধর্মীয় কৃতি ও কীর্তি স্মরণে ও রোমন্থনেই আত্মপ্রসাদ পেতে চেয়েছিলেন।'—এই সিদ্ধান্ত কি যথার্থ?

২৩। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' পরিচালিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের স্বরূপ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২৪। টীকা লিখ : এয়াকুব আলী চৌধুরী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, উদাসীন পথিকের মনের কথা, কাজী ইমদাদুল হক, গাজী মিঞার বস্তানী, জোহরা, ডাক্তার লুৎফর রহমান, মোজাম্মেল হক, মুন্সী মেয়রাজউদ্দিন, জমিরুদ্দিন, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, রিয়াজ উদ্দিন মাশহাদী, শেখ আবদুর রহিম।

দ্বাদশ অধ্যায়
বাংলাদেশের সাহিত্য

[বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য একই
লেখকের রচিত **'বাংলাদেশের সাহিত্য'** বইটি পড়ুন]

বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিধিকে তিন যুগে ভাগ করা হয়েছে—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ। আধুনিক যুগের শুরু ১৮০০ সাল থেকে এবং সম্প্রসারিত হয়েছে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত। আধুনিক যুগকে আবার দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে—প্রথম পর্যায় ১৮৬০ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৬০ থেকে বর্তমান পর্যন্ত। এই দ্বিতীয় পর্যায়টি যথার্থ আধুনিক কাল। বাংলাদেশের সাহিত্য এই আধুনিক যুগের সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে সাধারণত ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের বর্তমান পরিসীমায় রচিত সাহিত্য বোঝায়। আধুনিক যুগের পরিসীমায় বাংলা সাহিত্যের যে রূপরেখা ফুটে উঠেছিল তা সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে থাকায় কোন একটা নতুন যুগের ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট নয়। বরং পরিবর্তিত ভৌগোলিক সীমারেখার পরিপ্রেক্ষিতে যে স্বাতন্ত্র্য স্বাভাবিক ভাবে অভিপ্রেত তা এখানে বিবেচনার যোগ্য। তাই ইংরেজ শাসনপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্য যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল, বর্তমান বাংলাদেশ তারই উত্তরাধিকারী। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের সাহিত্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কোন কোন ক্ষেত্রে স্পষ্টতর হয়ে উঠলেও প্রায় সবক্ষেত্রে এখনও পূর্বতন বৈশিষ্ট্যেরই জের চলছে। একেবারে আলাদা করে স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করার মত সৃষ্টিসম্ভার এবং স্বরূপলক্ষণ এখনও স্বকীয়তা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। এই অবস্থার পটভূমিকায় বরং ১৯৪৭ সাল থেকেই বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বতন্ত্র পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র পথনির্দেশের প্রয়োজন দেখা দেয় ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান মন্তব্য করেছেন, 'নতুন পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র আবাসভূমিতে মুসলমানরা নতুন সাহিত্যে আপন জীবন এবং আদর্শের কথা বলবে।' ফলে ১৯৪৭ সালের পর থেকেই বাংলাদেশের 'ভূগোল, মানুষ, ইতিহাস এবং বিশ্বাস' সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ভাবে দেশবিভাগ বাংলাদেশের সাহিত্যে যে সাংস্কৃতিক-বিবর্তনের প্রতিধ্বনি জাগিয়েছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ড. মুহম্মদ এনামুল হকও আশা করেছিলেন এদেশের 'অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও আদর্শ এই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইতে থাকিবে।'

মুসলমান লেখকগণ দেশবিভাগের আগে থেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। 'বাঙালি মধ্যবিত্তের সাহিত্যচর্চা ও সাধনার উচ্চচূড় পীঠভূমি' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। সেখানে মুসলমান-দের গুরুত্ব উপেক্ষিত হওয়ায় ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। মুসলমানদের জন্য পৃথক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, 'আমরা কয়েকজন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য ছিলাম। সেখানে হিন্দু মুসলমান কোন ভেদ না থাকলেও আমরা বড়লোকের ঘরে গরিব আত্মীয়দের মতন মন-মরা হয়ে তার সভায় যোগদান করতাম। আমাদের মনে হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিলোপ না করেও আমাদের একটি নিজস্ব সাহিত্য-সমিতি থাকা উচিত।' মুসলমানদের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ পরবর্তীকালে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর পরই বাংলাদেশের মুসলমানেরা সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি উঠাল। এর ফলে ১৯৪১ সালে কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেঁনেসা সোসাইটি এবং ১৯৪২ সালে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে স্বতন্ত্র আবাসভূমি বাংলাদেশে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সাহিত্যের সম্ভাবনা যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এমন ধারণা স্বাভাবিক বলে বিবেচনা করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যসৃষ্টিতে সকল অঞ্চলের বাঙালির অবদান সমভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন আসে। রাজনৈতিক আদর্শে দেশবিভাগের ফলে সাহিত্যের অঙ্গনেও তার প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয়ে ওঠে। বাঙালি মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃতি পাওয়ায় এখানকার বাংলা সাহিত্যে জাতীয় জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। তাছাড়া পৃথক দেশ হিসেবে এখানকার জীবনযাপন পদ্ধতিতে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার রূপায়ণ লক্ষণীয় হয়েছে। নিজস্ব চিন্তাভাবনার পরিচায়ক হিসেবেও এ অঞ্চলের সাহিত্য বিশিষ্টতার অধিকারী।

বাংলাদেশের সাহিত্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই পরিলক্ষিত হতে পারে। যে সব বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয় তা হল :

ক. বাংলাদেশের সমাজ জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে এখানকার সাহিত্যে। এখানকার মানুষের সুখদুঃখ আনন্দবেদনা সাহিত্যে এনেছে পৃথক রূপ। গ্রাম বাংলার বাস্তবধর্মী চিত্র ফুটে উঠেছে সাহিত্যে।

খ. বাংলাদেশের প্রকৃতি সাহিত্যে তার স্বকীয়তা ফুটিয়ে তুলেছে।

গ. সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম মানসের পরিচয় এখানে স্পষ্ট।

ঘ. ভাষা ব্যবহারে নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের পরিসীমায় ব্যবহৃত শব্দ ও ভঙ্গিমা এখানকার সাহিত্যে স্বাভাবিক স্থান করে নিয়েছে। জনগণের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরবি ফারসি শব্দ মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করে ভাষায়ও এনেছে স্বাতন্ত্র্য।

ঙ. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরের স্বাধীনতা অর্জন এখানকার সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে নবরূপায়ণে সহায়তা করেছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে যেমন জাতীয় জীবন সচেতন হয়ে উঠেছে, তেমনি সাহিত্যে তার প্রতিফলন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পৃক্ত থাকলেও ১৯৪৭ সালের পর একটি স্বতন্ত্র স্বরূপ লক্ষণ সুস্পষ্ট হওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না। বরং বলা যায়, এতদঞ্চলে জীবনাচরণের যে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিল তা এ সময়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করে। সে কারণে সাহিত্যের চেহারাও যে কিছুটা পৃথক হবে সেটাই ছিল স্বাভাবিক।

দেশবিভাগের পূর্বে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর এই গুরুত্বের অবসান ঘটে এবং ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের নতুন রূপরেখা অঙ্কিত হতে থাকে। আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুসলমান কবিসাহিত্যিকদের অবদানে হিন্দু কবিসাহিত্যিকদের তুলনায় যে অনগ্রসরতার নিদর্শন দেখা দিয়েছিল দেশবিভাগের ফলে তা কাটিয়ে ওঠার একটা অনুকূল পরিবেশ ও অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাস মুসলমান কবিগণের অবদানে উজ্জ্বল হয়ে থাকলেও আধুনিক যুগে গৌরবান্বিত স্থান দখল করতে পারে নি। ফলে হিন্দু কবিসাহিত্যিকদের লেখনীতে রূপায়িত মুসলমানদের জীবনচিত্রে যথার্থতা অনুপস্থিত। এর জন্য মুসলমানদের ক্ষোভ কম ছিল না এবং স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা প্রবর্তন করে তার অবসানেরও চেষ্টা চলে। তাই ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের অনেক পূর্ব থেকেই মুসলমান কবিসাহিত্যিকগণ স্বতন্ত্র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদের ঐতিহ্য ও ইতিহাসভিত্তিক রচনার নিদর্শন দেখিয়েছেন। ড. আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'বাঙালি মুসলমানদের হাতে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে যে ফসলটুকু ফলেছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের দ্বারা সাধারণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সেকালের মুসলিম সাহিত্যব্রতীদের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল জেগেছে, অনেক উৎসাহী কর্মী তাঁদের জীবনকাহিনির পুনর্গঠনে এবং তাঁদের রচনার সন্ধান ও সংগ্রহে, পরিচয়দান ও মূল্যনিরূপণে প্রবৃত্ত হয়েছেন।' উপমহাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। ফলে স্বতন্ত্র আবাসভূমি লাভের পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব পরিবেশে সাহিত্যসৃষ্টির সুযোগ আসে। এখানকার সাহিত্যে তাই এ অঞ্চলের জীবন ও সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখা যায়।

দেশবিভাগের ফলে এবং পরবর্তী কালে স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের পরিচয়টি এখানকার সাহিত্যে রূপ দেওয়া সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে নিজস্ব পরিচয় তুলে ধরা যেমন আবশ্যক ছিল, তেমনি এখানকার সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার সহজ হয়ে আসে। নতুন জীবন চেতনাবোধ, আঞ্চলিক জীবনধারা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্য কবি সাহিত্যিকগণের দৃষ্টিতে আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে এবং তার বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপায়ণে

সাহিত্য হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের চর্চা বা লালনপালনের সুযোগ এখানে সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠায় বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা সংস্থা প্রভৃতি সাহিত্যের সম্প্রসারণে ও উৎকর্ষবিধানে পৃষ্ঠপোষকতা দান করছে।

বাংলা একাডেমীর বহু বিচিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদে, পরিভাষা তৈরিতে, লোকসাহিত্য সংগ্রহে, বানানরীতি সংস্কারে, স্থানীয় শব্দসম্ভার সমৃদ্ধ অভিধান সংকলনে এবং ভাষা-সাহিত্যের পরিচর্যার আরও অনেক ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী যে অবদান রাখছে তা বাংলাদেশের সাহিত্যকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে ও মর্যাদায় বিশিষ্ট করে তুলেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কর্মের মাধ্যমে এখানকার বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটন করে তার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বকীয়তা সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদানের প্রচেষ্টা এখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকলাপের মধ্যেও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তাছাড়া বাংলাদেশের সাহিত্য এদেশে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আধুনিক শিক্ষার আলোক প্রধানত এ পর্যায়ের লোকদের জীবনকেই আলোকিত করেছে। অভিজাত মুসলমানদের যেমন ইংরেজি শিক্ষার মানসিকতা ছিল না, তেমনি দরিদ্র জনগণ সকল রকম শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত ছিল। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানেরা বিলম্বে হলেও আধুনিক শিক্ষাসংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে এবং এই শিক্ষাসংস্কৃতির প্রভাবজাত সাহিত্যের সঙ্গে নিজেদের সংযোগ ঘটায়। তাছাড়া এই পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গই জীবন ও সমাজের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা সাহিত্যে প্রতিফলনের উদ্যোগ নেয়। আধুনিক যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে বিকাশোন্মুখ সাহিত্যে মধ্যবিত্ত সমাজ যেমন ক্রিয়াশীল ছিল তেমনি বাংলাদেশের সাহিত্যে মধ্যবিত্ত সমাজের আশাআকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়ে ওঠে।

বিভাগপূর্ব কালে সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাপারে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুসলমানেরা যে পশ্চাদপদ অবস্থায় ছিল তা এখানে কাটিয়ে ওঠার সুযোগ আসে। দেশবিভাগ যে বাংলাদেশের সাহিত্যের জন্য কল্যাণপ্রদ হয়েছিল সে সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন, 'পূর্ববঙ্গে তরুণ সাহিত্যিকদের একটা বৃহৎ-গোষ্ঠী আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা এক নূতন সাহিত্যিক-রীতি বা ধারা প্রবর্তনে বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। ফলে, বাংলা-বিভাগ যে আদর্শভিত্তিক, এই সত্য বাস্তবমূর্তিতে দ্রুতই দেখা দিতেছে। নূতন সাহিত্যিক রীতি বা ধারাও ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে বটে, তবে ইহার সংজ্ঞা দান অথবা রূপরেখার পরিচয় প্রদান সহজ ব্যাপার নহে; তবে এই কথা সত্য যে এই সাহিত্যিক-রীতি বা ধারার গতি নূতন পথে, অভিনব রূপে পরিচালিত হইতেছে।' প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব, নিজস্ব জীবন ও সংস্কৃতির রূপায়ণ এবং স্বতন্ত্র পাঠকগোষ্ঠী থাকার ফলে এ অঞ্চলের কবিসাহিত্যিকদের সাহিত্যসৃষ্টির পথ সহজ হয়। ফলে সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানদের অবদান উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের অবদান প্রাধান্য লাভ করলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। দেশের

অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা বলে এবং সে আমলে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনের গুরুদায়িত্ব পালনের প্রেরণা এখানে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। বাংলা ভাষার এই মর্যাদা ও গুরুত্ব অন্যত্র অনুপস্থিত। তাই এখানকার সাহিত্য স্বল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এই সম্ভাবনা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা এখন দেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, সকল কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য জাতি সঙ্কল্পবদ্ধ। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাবভাবনা এ ভাষার মাধ্যমে এখন রূপায়িত হয়ে উঠছে। ফলে বাংলা ভাষা যুগোপযোগী প্রয়োজন মিটানোর যোগ্যতা অর্জনে তৎপর।

জাতীয় জীবনের দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বাংলাদেশের সাহিত্যকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে তুলতে সহায়তা করেছে। একটি ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত ঘটনা এবং অপরটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। দুটি ঘটনাই জাতীয় জীবনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মানুষের জীবনচেতনায় এবং সাহিত্যসংস্কৃতিতে দুটি ঘটনাই গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য বাঙালির আত্মদান সারা বিশ্বে এক বিরল ঘটনা। এই আত্মত্যাগের মাধ্যমেই বাঙালি নিজের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হল এবং একুশের চেতনাকে জাতীয় জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেল। একুশে ফেব্রুয়ারি জনগণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করল। নিজেদের অধিকার আদায়ে সংগ্রামমুখর করে তুলল এবং আন্দোলনের পথ ধরেই মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকারী হওয়ার গৌরব অর্জন করল। মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলে এর উৎকর্ষ সম্পর্কে বৈচিত্র্যময় তৎপরতা দেখা দিল। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটে এবং জাতীয় জীবনকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় উদ্বুদ্ধ করে। ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের সাহিত্যের বিকাশে ও উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ প্রেরণা দান করেছে। তবে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, জাতীয় জীবনকে এক নবতর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত করেছে এবং প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে জাতিকে এক সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ গৌরব ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে জাতি যে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল তা বাংলাদেশের সাহিত্যের বিকাশে ও স্বতন্ত্র পরিচয়ে উদ্ভাসিত করে তুলতে সহায়ক হয়েছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার যে মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে তার ফলে বাংলা ভাষার চর্চা ব্যাপকতর হয়েছে। জাতীয় ভাষা হিসেবে এর উপযোগিতার জন্য তার প্রয়োজনীয় উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষার যুগোপযোগী ব্যবহারের অনন্য সুযোগ এই স্বাধীন বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতি বাংলা ভাষাকে স্বতন্ত্র মর্যাদাদানের সহায়ক হয়েছে বলে সহজেই বিবেচনা করা যায়।

বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা স্বীকৃতির জন্য বাঙালির আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বা শহীদ দিবস 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বব্যাপী উদযাপনে ইউনেস্কোর সিদ্ধান্ত বাঙালি জাতির মহান অর্জন বলে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, '১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে মাতৃভাষার জন্য অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং সেদিন যাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রস্তাব করা হচ্ছে।' একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ফলে বিশ্বের মানুষের কাছে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। গর্বিত বাঙালি একুশের চেতনাকে তার সাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত করবে এমন প্রত্যাশা স্বাভাবিক।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে। ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী নিয়ে নানা ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সাহিত্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামশীলতা, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, বীর্যবত্তা ইত্যাদি গুণের পরিচয় বিধৃত হয়ে সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ক্রমেই স্বমহিমায় অবয়ব লাভ করছে। তাই বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের মুসলমান কবিসাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় স্বাতন্ত্র্যপন্থী ও সমন্বয়পন্থী নামে যে দুটি ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল বিভাগোত্তর বাংলা সাহিত্যেও তার অস্তিত্ব বর্তমান। স্বাতন্ত্র্যপন্থী ও সমন্বয়পন্থী নামে এই দুই শ্রেণির মুসলিম লেখক আধুনিক বাংলা সাহিত্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছিলেন। তার প্রভাব সাম্প্রতিক কালেও লক্ষণীয়। স্বাতন্ত্র্যপন্থী লেখকগণ ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অবলম্বনে যে বৈশিষ্ট্য সাহিত্যক্ষেত্রে রূপায়িত করেছিলেন একদল অনুসারীর দ্বারা তার অনুবর্তন চলেছে; আবার সে আমলে সমন্বয়পন্থী মুসলিম সাহিত্যসাধকেরা গতানুগতিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যেমন যোগসূত্র রক্ষা করেছিলেন, তেমনি এখানকার এক শ্রেণির কবিসাহিত্যিক সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ সাধনের পক্ষপাতী। তাঁদের রচনায় সে পরিচয় সুস্পষ্ট। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে দেশবিভাগের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে এখানকার সাহিত্যে দুটি স্বতন্ত্র ধারার পরিচয় ছিল স্পষ্ট। প্রথম ধারার লেখকসম্প্রদায়কে বলা চলে ইসলামি ঐতিহ্যের অনুসারী। ধর্মীয় ভিত্তিতে স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রয়োজনে তখন দেশবিভাগ হয়েছিল, তাই এখানকার সাহিত্যে স্বকীয় ইসলামি বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হওয়া উচিত বলে প্রথম ধারার অনুসারীরা মনে করেন। অপর ধারার অনুসারীরা আবহমান কালের বাংলাদেশের ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমগোত্রতা উপলব্ধি করেন। প্রথম পর্যায়ের কাব্যের মধ্যে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য এবং অপরটির মধ্যে রূপরীতির প্রাধান্য বিদ্যমান। তবে এই শ্রেণিবিভেদ দেশবিভাগের আগে বা কিছু পরে যত বেশি প্রকট ছিল সাম্প্রতিককালে তত বিরাজমান নেই।

দেশবিভাগের পরে এখানকার জীবনে ও সমাজে যে যুগসংক্রান্তি দেখা দিয়েছে তার প্রতিফলন এখানকার সাহিত্যে বিদ্যমান। ইংরেজ শাসনপাশ থেকে মুক্ত হওয়ায় এদেশবাসী এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ লাভ করে। পুরানো ঐতিহ্য উপেক্ষা করে যে অভিনব জাতীয় চেতনা তখন সঞ্চারিত হয় তাতে একটা ক্রান্তিলগ্নের সৃষ্টি ঘটে। অতীতকে নিঃশেষে বিসর্জন দেওয়া যেমন সম্ভব হয় নি, তেমনি নতুন মনমানসিকতা সৃষ্টির ব্যাপারেও দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। এই যুগসন্ধিক্ষণের জীবন ও সমাজের রূপচিত্র এদেশের সমকালীন সাহিত্যে বিধৃত। সে কারণে এখানকার সাহিত্যে আছে পুরাতন আর নতুন মানসিকতার সমাবেশ, সৃষ্টি হয়েছে নবীনপ্রবীণ মূল্যবোধের পরিচায়ক সাহিত্য নিদর্শনের।

বাংলাদেশের সাহিত্যে বিষয়বস্তু বিন্যাসে অভিনবত্ব ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি আর মানুষের স্বাতন্ত্র্য যেমন এখানকার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি এখানকার সাহিত্যের গবেষণার বিষয়টির মাধ্যমে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে মূল্যায়নের ব্যাপারে যে উপেক্ষা বিদ্যমান ছিল তা বাংলাদেশের গবেষক পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় বিদূরিত হয়েছে এবং সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিসাহিত্যিকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। মুসলমান শাসকগণই যে কেবল বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা দান করে এর সমৃদ্ধির পথ সহজ করেছেন তাই নয়, বরং মুসলমান কবিগণ বিশেষ করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে বাংলাদেশের গবেষণা সাহিত্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

দেশবিভাগের পর এখানকার সাহিত্যে এক নতুনতর চেতনার সঞ্চার হয়। একদল কবিসাহিত্যিক ছিলেন যাঁরা অনেকদিন পূর্ব থেকে সাহিত্যচর্চায় তৎপর; তাঁরা পরিবর্তিত অবস্থায় সাহিত্যসাধনা করে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বর্ষীয়ান কবিসাহিত্যিকগণ বিভাগপূর্ণ কালেই অনেকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাই বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের অবদান সাহিত্যচর্চার সেই সূত্রপাত থেকেই বিবেচ্য। তবে দেশবিভাগের পরে একদল কবিসাহিত্যিক এখানকার সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্বতন্ত্র পরিবেশের আনুকূল্যে তাঁদের চিন্তাধারায় মৌলিকতা ও রূপরীতি প্রয়োগে স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্ভাবনাময় বলে বিবেচিত হয়। এখানকার কবিসাহিত্যিকগণের রচনা স্বকীয়তা নিয়েই সম্প্রসারিত হতে থাকে।

সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যসৃষ্টির প্রয়োজন ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যসম্বলিত ভাবধারা অবলম্বন, আরবি ফারসি উর্দু শব্দের প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যবহার, পুঁথি সাহিত্যের অনুসরণ প্রথম দিকে প্রকট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর অনুদার প্রচেষ্টার ফলে বাঙালি জাতীয়তাবোধের ওপর আঘাত আসে। তখন এর প্রতিরোধ সাধনে যে তৎপরতা প্রকাশ পায় তার প্রভাব সম্প্রসারিত হয় এখানকার সাহিত্যে। ফলে বাংলাদেশের সাহিত্যে বাঙালি জাতীয় জীবনের আশাআকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনের প্রচেষ্টা চলে। এমনিভাবে এখানকার সাহিত্যে স্বতন্ত্র পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের

সাহিত্যে এখন বাঙালির আশাআকাঙ্ক্ষা, চিন্তাভাবনা, জীবনচিত্র প্রকাশমান। সাহিত্যের রূপরীতিগত পরিবর্তনও এখানে অনুপস্থিত নয়। তাই বাংলাদেশের সাহিত্য নানাদিক থেকে বিশিষ্টতার দাবিদার। স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে এক নবতর চেতনা এবং সময়ের অগ্রগতিতে তা ক্রমান্বয়ে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। একাত্তরের বহু আগে থেকে জাতীয় জীবনে যে আশাআকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের সচেতন প্রয়াস চলছিল তা এখন বাস্তবায়নের সুযোগ ঘটে। এখন বাংলাদেশের আপন বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত। এখানকার জীবন ও সমাজ কবিসাহিত্যিকদের মনে নতুন আবেগে বিধৃত হচ্ছে এবং স্বাধীনতা-উত্তর সাহিত্যে তার প্রতিফলন ব্যাপকতর হচ্ছে।

বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে একে একটা স্বতন্ত্র যুগের পরিধিতে আবদ্ধ করতে কেউ কেউ পক্ষপাতী। ড. আহমদ শরীফ তাঁর 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের গোটা কাল-পরিসরকে চার যুগে ভাগ করেছেন। সেখানে আধুনিক যুগ বলতে ব্রিটিশ শাসন কাল নির্দেশ করেছেন এবং স্বাধীনতা উত্তর কালকে 'বর্তমানযুগ' বলে উল্লেখ করেছেন।

১৯৪৭ সালের আগেই স্বকীয়তার যে চেতনা এ অঞ্চলের লেখকগণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, পরবর্তী পর্যায়ে তা বলিষ্ঠতা অর্জন করেছে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানকার জীবনধারার মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান তা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে তাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকগত রূপান্তরও এখানকার সাহিত্যে স্পষ্ট। এর জন্য একটা পৃথক যুগের পরিচয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যকে চিহ্নিত করা চলে। তাছাড়া ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে এই যুগনির্দেশনা সহজ ও তাৎপর্যপূর্ণ। তবে বাংলাদেশের সাহিত্যের এই স্বতন্ত্র পরিচয় কালগত বা দেশগত মাত্র, প্রকৃতিগত নয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি অনুসরণেই এখানকার সাহিত্যের বিকাশ; এই যুগের বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করার মত কোন নিদর্শন এখানে এখনও অনুপস্থিত। প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত যে পার্থক্য বাংলাদেশের সাহিত্যে সে ধরনের কোন পৃথক বৈশিষ্ট্য নেই। তাই তাকে স্বতন্ত্র পরিসরে চিহ্নিত করার প্রয়োজন এখনও অনুভূত হয় নি। তবে 'বাংলাদেশের সাহিত্য' নামে তাকে চিহ্নিত করার মত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও বৈশিষ্ট্যেরও অভাব নেই।

প্রবন্ধ সাহিত্য

বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, বিষয়ের বৈচিত্র্যে, উপস্থাপনার অভিনবত্বে ও প্রকাশভঙ্গির উপযুক্ততায় তা যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এখানকার মনীষীবৃন্দ প্রধানত প্রবন্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। যাঁরা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে বর্ষীয়ান সাহিত্যিকগণ দেশবিভাগের পূর্বেই খ্যাতিলাভ করতে সমর্থ হন। সেজন্য এখানকার সাহিত্যিকদের অবদানের পরিচয় লাভ করতে হলে তাঁদের সামগ্রিক সাহিত্যসৃষ্টির সন্ধান প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যধর্মী। জাতীয় জীবনের চিন্তাভাবনা কামনাবাসনা রূপায়িত হয়েছে প্রবন্ধের মাধ্যমে। সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, সংস্কৃতি, জীবনী, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়াবলম্বনে প্রবন্ধ সাহিত্যের সম্প্রসারণ ঘটেছে। এর মধ্যে সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যাই সর্বাধিক। দেশবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার সাহিত্যের মূল্যায়নের যে অভূতপূর্ব সুযোগ আসে তার ফলেই বাংলাদেশের সাহিত্যিকগণ এ ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণাকর্ম এখানকার প্রবন্ধ সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব তার বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও উপস্থাপনায়। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানের বিষয়টি এতদিন যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা লাভ করে নি। বাংলাদেশের গবেষকগণের অনুসন্ধানের ফলে এতদিনের অবহেলিত বিষয় আলোচনায় এসেছে এবং সে সব আলোচনার প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুর নবপরিচয় উদ্ঘাটন সম্ভবপর হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয়টি এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের গবেষকগণ যে দৃষ্টিভঙ্গি ও মর্যাদার পরিচয় দিয়েছেন তা ইতোপূর্বে লক্ষ করা যায় নি। তাই এখানকার গবেষকদের কল্যাণে সাহিত্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন সম্ভব হচ্ছে এবং বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণের অবদানের যথার্থ স্বীকৃতি ঘটেছে। সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে প্রবন্ধ রচিত হয়ে বাংলাদেশের প্রবন্ধ সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

গবেষণার জন্য সযত্ন প্রয়াস, উন্নত শ্রেণির সাহিত্যপত্রের প্রকাশ, গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশের বিশেষ সুযোগ এবং দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার প্রবন্ধ সাহিত্য যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়। মুসলমান কবিসাহিত্যিক সম্পর্কে এর আগে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালানো হয় নি, তাঁদের সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়নেও তেমন কেউ মনোযোগী ছিলেন না। তাই বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যে এখানকার সাহিত্য ও সাহিত্যিক, সাহিত্যের নানাদিক, নানা সমস্যা ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকবৃন্দও এ ধরনের বিষয়ে ছিলেন বিশেষ অনুরাগী। তাই এখানকার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্ভারে এবং গ্রন্থাকারে বিধৃত আলোচনাসমূহে মুসলিম রচিত বাংলা সাহিত্যের অতীত ও বর্তমানের বিবরণ ও বিশ্লেষণ অত্যধিক পরিমাণে লক্ষযোগ্য।

দেশবিভাগের পর থেকে, বিশেষত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সগৌরব প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে শিক্ষা সংস্কৃতির বিভিন্নমুখী বিকাশ ঘটছে। ফলে সাহিত্যের বিষয়ের পরিধি যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীন জীবনের প্রেক্ষিতে নানা বিষয় হয়েছে প্রবন্ধের উপজীব্য। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়ের অনুবাদ যেমন প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিধি বাড়াচ্ছে, তেমনি ধর্মীয় বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণে প্রবন্ধ সাহিত্যের অবয়বের স্ফীতি ঘটছে। পত্রপত্রিকার ব্যাপক প্রকাশও প্রবন্ধ সাহিত্যের সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে প্রবীণ ও নবীন লেখকগণের গুরুত্বপূর্ণ অবদানে।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

সাহিত্যের নানাদিক নিয়ে যাঁরা মূল্যবান গবেষণার অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়ে- ছিলেন তাঁদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের (১৮৬৯-১৯৫৩) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান অবদানের গবেষণার তিনি অগ্রদূত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আট শতাধিক প্রবন্ধ ব্যাপক সাধনা ও অনুসন্ধানেরই ফল। তাঁর লিখিত বা সম্পাদিত পনেরটি গ্রন্থ বাংলা গবেষণা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 'রাধিকার মানভঙ্গ', 'সত্যনারায়ণের পুঁথি', 'মৃগলুব্ধ', 'মৃগলুব্ধ সম্বাদ', 'গঙ্গামঙ্গল', 'জ্ঞানসাগর', 'শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস', 'সারদামঙ্গল', 'গোরক্ষবিজয়', 'পদ্মাবতী' ইত্যাদি। 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' গ্রন্থের দুই খণ্ডে তিনি তাঁর সংগ্রহের পরিচিতি দান করেছেন। 'ইসলামাবাদ' তাঁর মৌলিক রচনা। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সহযোগিতায় 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদানের পরিচয় দিয়েছেন। 'পুঁথি পরিচিতি' তাঁর সঙ্কলিত গ্রন্থ। মধ্যযুগের কতিপয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থেরও তিনি সম্পাদনা করেছেন। প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও সংরক্ষণকর্মে তিনি অপরিসীম যত্ন ও নিষ্ঠার পরিচয় দান করেছেন। তাঁর অসাধারণ জ্ঞানপিপাসা সারা জীবন তাঁকে মুসলমান সমাজ, সাহিত্য ও ঐতিহ্যপ্রীতি, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং গুপ্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার আর পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে সংযুক্ত করে রেখেছে। তিনি একক ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রায় আড়াই হাজার হাতে লেখা পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। গবেষণা ও সম্পাদনায় অসাধারণ দক্ষতা ও মৌলিকতার প্রেক্ষিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন, 'গ্রন্থের সম্পাদনা কার্যে যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহৃদয়তা ও যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সমস্ত বাংলায় কেন, সমস্ত ভারতেও বোধ হয় সচরাচর মিলে না।' তাঁর প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের অনুদ্‌ঘাটিত অংশের পরিচয় প্রকাশিত হয়ে একদিকে যেমন সেসব সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন সাধিত হয়েছে, অন্যদিকে এ ধরনের নতুনতর গবেষণার ক্ষেত্রে অফুরন্ত প্রেরণার সঞ্চার করেছে। তাঁর অবদানের প্রভাব এখন সুদূরপ্রসারী এবং সেই উদ্‌ঘাটিত ভাণ্ডার থেকে আহরিত উপাদানে বর্তমানের গবেষকগণ সৃষ্টিমুখর।

আবদুল কাদির মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবিশ্রাম সেবা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই অনলস সাধনার ফলে আজ এ-সত্য সর্বস্বীকৃত যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান অপরিমেয় ও গৌরবময়। তাঁহার সুবিপুল সংগ্রহ এখনও আমাদের সাহিত্য গবেষণার সর্বপ্রধান উপকরণ। তাঁহার অবিচল জ্ঞানোজ্জ্বল জীবনাদর্শ আমাদের সংস্কৃতি-চিন্তাকে সঞ্জীবিত ও শাণিত করিয়াছে।'

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

ইসলামি বিষয়বস্তু অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনার যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছিল তাতে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর (১৮৬৯-১৯৬৮) নাম গুরুত্ব সহকারে উল্লেখযোগ্য। রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসেবে তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁর 'মোস্তফা

চরিত (১৯২৩)', 'মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য', 'উম্মুল কেতাব', 'আমপারার তফসীর', 'সমস্যা ও সমাধান', পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ 'তফসিরুল কোরআন', 'মুক্তি ও ইসলাম' ইত্যাদি গ্রন্থ ইসলামি সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থটি হযরত মুহম্মদ (স) এর জীবনী। এই ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিতে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। 'মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' তাঁর অন্য একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। অনগ্রসর মুসলমান সমাজের নবজাগরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁর সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। ইসলামি উপকরণ তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য ছিল, তাঁর বক্তব্য ছিল যুক্তিভিত্তিক এবং তাঁর প্রকাশভঙ্গি ছিল আকর্ষণীয়। আকরম খাঁ আরবি, উর্দু, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ ছিলেন এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রাজনীতির সঙ্গে তিনি নিবিড় ভাবে জড়িত ছিলেন, সমকালীন সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি অবিভক্ত বঙ্গে মুসলমান জাগরণের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁর রচনার ভাষা গাঢ়বদ্ধ ও সংস্কৃতানুসারী।

প্রবন্ধ রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এমন কতিপয় প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থের সংখ্যায় কম হলেও এক সময় তাঁদের অবদান মূল্যবান বিবেচিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে **আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ** (১৮৭৫-১৯৫৯), **এস. ওয়াজেদ আলী** (১৮৯০-১৯৫১), **মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী** (১৮৯৬-১৯৫৪) প্রমুখের কথা স্মরণযোগ্য। তাঁদের অগণিত প্রবন্ধ পত্রপত্রিকায় ছড়ানো। আবদুল গফুর সিদ্দিকীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : শহীদ তিতুমীর, মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য, বিষাদসিন্ধুর ঐতিহাসিক পটভূমি ইত্যাদি। এস. ওয়াজেদ আলীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : গুলদাস্তা, মাশুকের দরবার, দরবেশের দোওয়া, গ্রানাডার শেষ বীর, জীবনের শিল্প, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ভবিষ্যতের বাঙালি, সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের অবদান, আকবরের রাষ্ট্রসাধনা ইত্যাদি। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মহামানুষ মহসীন, মরুভাস্কর, সৈয়দ আহমদ, স্মার্না নন্দিনী, ছোটদের হযরত মোহাম্মদ ইত্যাদি। এই পর্যায়ের প্রবন্ধকারগণ ইসলামের ঐতিহ্য ও ইতিহাস এবং ইসলামি চেতনা রূপায়িত করার মাধ্যমে সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। এদিক থেকে তাঁরা সমকালীন চিন্তাভাবনা থেকে কিছুটা অতীতমুখী ছিলেন এবং আধুনিক যুগে মুসলমান সাহিত্যিকগণের আবির্ভাবের সময় যে ইসলামি চেতনাসৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে সমগোত্রতা এখানেও পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জাতীয় জীবনের সংকট নিরসনে এবং কল্যাণধর্মী বিকাশে সহায়ক বলে বিবেচনা করে তার গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন। এর ফলে স্বতন্ত্র চেতনা এখানকার জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তা স্বাতন্ত্র্যধর্মী সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করেছে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণায় যাঁর নাম বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে তিনি ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯)। তিনি গবেষণা গ্রন্থ, গল্প, শিশুসাহিত্য, অনুবাদ, সম্পাদনা ইত্যাদি

বিচিত্র পর্যায়ে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ উপমহাদেশে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসেবে সর্বজনমান্য ছিলেন এবং এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি সারা জীবন জ্ঞান-সাধনা ও জ্ঞান বিতরণে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। ইসলামি বিষয়াবলম্বনে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন; কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য গবেষণামূলক আলোচনাতেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। 'ভাষা ও সাহিত্য', 'বাংলা ব্যাকরণ', 'আমাদের সমস্যা' ইত্যাদি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থেরও তিনি সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ হচ্ছে : 'বিদ্যাপতি শতক', 'পদ্মাবতী', 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' ইত্যাদি। 'Buddhist Mystic Songs' তাঁর চর্যাপদ সম্পর্কিত গবেষণাগ্রন্থ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের বহু সমস্যা সমাধানে তাঁর অপরিসীম কৃতিত্ব বিদ্যমান। তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়ানো রয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বপ্রকাশক গ্রন্থাবলী হচ্ছে : 'দীওয়ান-ই-হাফিজ', 'শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ', 'রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম', 'মহাবাণী', 'বাইঅতনামা', 'অমিয়বাণী শতক' ইত্যাদি। এসব ছাড়া তিনি কতিপয় ইংরেজি গ্রন্থেরও রচয়িতা।

'ভাষাতত্ত্বের নিবিষ্ট পণ্ডিত তাঁর প্রগাঢ় সংস্কৃত এবং আরবি-ফারসি ভাষা-সাহিত্যের জ্ঞান নিয়ে প্রধানভাবে আপন মাতৃভাষা বাংলার—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর তাঁর প্রায় সকল রচনাই গবেষণাধর্মী—গভীর অন্বেষণ এবং তীক্ষ্ণ-বিচার-বিবেচনার ফসল।' বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের নানা তথ্য উদঘাটনে ও জটিল গ্রন্থিমোচনে তিনি বিস্ময়কর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন। উপযুক্ত সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে তিনি বহু অজানা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। মাতৃভাষা ও সাহিত্যপ্রীতি এবং ধর্মানুরাগ তাঁর কীর্তিমান ও কর্মমুখর জীবনের বৈশিষ্ট্য।

ড. কাজী মোতাহার হোসেন

ড. কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) 'সঞ্চরণ' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করে এক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। তাঁর 'নজরুল কাব্য পরিচিতি' কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যের ব্যাখ্যা। 'গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', 'সেই পথ লক্ষ্য করে', 'সিম্পোজিয়াম', 'আলোকবিজ্ঞান' ইত্যাদি তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়। ড. কাজী মোতাহার হোসেন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, দাবাড়ু , সঙ্গীতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী হিসেবে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তৎকালীন নব্যশিক্ষিত মুসলিম তরুণদের প্রগতিশীল সাহিত্য সংগঠন মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬) প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা'র সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল বিচিত্র ধরনের—ধর্ম, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে সুস্থ মনন ও পরিচ্ছন্ন

জীবনবোধের ঋজু পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী এবং সেই আলোকে দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভীত গড়ে তোলার জন্য সাহিত্যসাধনা করেছিলেন। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়, দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে, নিজস্ব সংস্কৃতির উজ্জীবনে তাঁর অবদান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আবুল মনসুর আহমদ

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯) রসরচনা ও উপন্যাস রচনায় বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলো মনীষার বিশেষ পরিচায়ক। 'পাক বাংলার কালচার', 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', 'শেরেবাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু', 'কোরানের নসিহত', 'আত্মকথা' তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ। সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ হিসেবে আবুল মনসুর আহমদের পরিচিতি। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল। তিনি নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি আবহমান কালের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির পরিবর্তে পূর্ব বাংলার ধর্মভিত্তিক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রস্তাব করেছিলেন। এই আদর্শে তিনি তাঁর সৃষ্ট ভাষারীতির নমুনা 'পাক বাংলার কালচার' গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ব্যঙ্গ রচনায় সমাজের মুখোশধারী মানুষের স্বরূপ উদঘাটন করা হয়েছে।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪) 'পারস্য প্রতিভা' গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে যে মধুর ও বলিষ্ঠ ভাষারীতির পরিচয় দিয়েছিলেন তা তাঁর জন্য যথেষ্ট খ্যাতি আনয়ন করে। তিনি 'মানুষের ধর্ম', 'নবীগৃহ সংবাদ', 'কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত', 'নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ', 'হযরত ওসমান', 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারা' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রবন্ধকার হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ছিলেন একজন সৃজনশীল গদ্যশিল্পী। তাঁর 'পারস্য প্রতিভা'য় পারস্যের খ্যাতনামা কবিদের জীবনী ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম, ফারসি সাহিত্যের প্রেক্ষাপট, সুফীমত ও বেদান্তদর্শন এবং 'মানুষের ধর্মে' জগৎ ও জীবন, ইহলোক ও পরলোক, জড় প্রকৃতি ও মনোজগৎ, জীবনপ্রবাহ ও আত্মা ইত্যাদি দুরূহ তত্ত্ব ক্লাসিক্যাল বাংলা গদ্যে উপস্থাপন করেছেন।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-৫৬) 'সংস্কৃতি কথা' (১৯৫৮) নামক প্রবন্ধ পুস্তকের মাধ্যমে সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করেছেন। বুদ্ধির দীপ্তিতে পরিচ্ছন্ন রচনাভঙ্গিই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকালে ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বুদ্ধির দীপ্তি, যুক্তিনিষ্ঠতা, জীবনরস ও সৌন্দর্য সুষমায় সমৃদ্ধ তাঁর রচনা এক বিশিষ্ট স্টাইলের অধিকারী। ক্লাইভ বেলের সিভিলাইজেশনের অনুবাদ 'সভ্যতা' এবং বার্ট্রান্ড রাসেলের কংকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস গ্রন্থের অনুবাদ 'সুখ' তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন

মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন (১৯০৪-৮৭) গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানের মূল্যায়ন করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' তিন খণ্ড গ্রন্থে মুসলমান লেখকদের সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তিনি অজস্র লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে 'হারামণি' নামে দশ খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : 'শিরনী', 'ধানের মঞ্জরী', 'আগর বাতি', 'ইরানের কবি' ইত্যাদি। তিনি বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান সংগ্রাহক হিসেবে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী

সৈয়দ মুর্তাজা আলী (১৯০২-৮১) নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'প্রবন্ধ বিচিত্রা', 'হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস', 'আমাদের কালের কথা', 'মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' ইত্যাদি তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ। তাঁর রচনা তথ্যবহুল এবং তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিদ্যমান।

আবুল ফজল

আবুল ফজল (১৯০৫-৮৩) মননশীল প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম : 'সাহিত্য সংস্কৃতি জীবন', 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা', 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' 'সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র', 'সমকালীন চিন্তা', 'শুভবুদ্ধি', 'মানবতন্ত্র', 'একুশ মানে মাথা নত না করা', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন', 'বিচিত্র কথা', 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' ইত্যাদি। 'রেখাচিত্র', 'লেখকের রোজনামচা', 'দুর্দিনের দিনলিপি' তাঁর স্মৃতিকথা। তিনি কতিপয় গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। 'সাংবাদিক মুজিবর রহমান', 'শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি'—তাঁর লেখা স্মৃতিকথা। স্বদেশপ্রীতি, অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনা, সত্যনিষ্ঠা, মানবতা ও কল্যাণবোধ ছিল তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি 'মুক্তবুদ্ধির চির সজাগ প্রহরী' বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। 'জাতির বিভিন্ন সংকট ও ক্রান্তিলগ্নে তাঁর নির্ভীক ভূমিকার জন্য জাতির বিবেক' বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

আবুল ফজলের প্রতিভা ছিল বৈচিত্র্যধর্মী। তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে সমকালীন সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক এবং 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬) নামক সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন।

ড. মুহম্মদ এনামুল হক

ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-৮২) সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সহযোগিতায় 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থ রচনা করেন। 'চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ' তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা এবং 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' বাংলা সাহিত্যে মুসলমান

অবদান সম্পর্কে লিখিত ইতিহাস। 'বঙ্গে সুফী প্রভাব', 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে মুসলমান কবিগণের অবদানের অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের জন্য তাঁর 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। 'মনীষা মঞ্জুষা' ২ খণ্ড তাঁর প্রবন্ধ সংকলন। এসব গবেষণামূলক আলোচনা ছাড়াও তাঁর কতিপয় সম্পাদিত গ্রন্থ রয়েছে। সেসব হচ্ছে : 'অস-সবউল-মু অল্লকাত', 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারক গ্রন্থ।' ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সাহিত্যসৃষ্টিতে সংখ্যার দিক থেকে তেমন প্রাচুর্য না থাকলেও পাণ্ডিত্যের গভীরতায় তা বিশিষ্ট। গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁর অনুসন্ধিৎসা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তিনিষ্ঠতার মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে বলিষ্ঠ অবদান রেখেছেন তা তুলনারহিত। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক পুরোধা ও নির্ভীক প্রবক্তা হিসেবে তাঁর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন।

অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত রচনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা ও গবেষণায় তাঁর কৃতিত্ব ছিল অপরিসীম। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকগণের অবদানের মূল্যায়নে তিনি তৎপর ছিলেন। গবেষক, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত ও সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী। তাঁর ভাষা ঋজু ও সাধুরীতির অনুসারী। পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের মধ্যেও তিনি সরস কবিত্বময় স্টাইল রক্ষা করেছেন।'

আবদুল কাদির

আবদুল কাদির (১৯০৬-৮৪) কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করলেও গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় তাঁর সবিশেষ কৃতিত্ব বিদ্যমান। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ছান্দসিক, গবেষক ও মননশীল প্রবন্ধকার। ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামক সংগঠনের মাধ্যমে যে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। এই সংগঠনের মুখপত্র 'শিখা'র তিনি ছিলেন প্রকাশক ও লেখক। সাহিত্য সম্পর্কিত অজস্র মূল্যবান প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর ভূমিকাও তথ্যের আকর। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ : 'বাংলা কাব্যের ইতিহাস : মুসলিম সাধনার ধারা', 'কবি নজরুল', 'মওলানা মোহাম্মদ নইমুদ্দীন', 'কাজী আবদুল ওদুদ', 'ড. মুহম্মদ এনামুল হক বক্তৃতামালা', 'লোকায়ত সাহিত্য'। ছন্দ সম্পর্কিত তাঁর আলোচনা বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেছে। 'ছন্দসমীক্ষণ' তাঁর ছন্দের আলোচনা সম্পর্কিত গ্রন্থ। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে : 'কাব্য মালঞ্চ', 'নজরুল রচনাবলী', 'রোকেয়া রচনাবলী', 'লুৎফর রহমান রচনাবলী', 'মুসলিম সাহিত্যের সেরা গল্প', 'সিরাজী রচনাবলী', 'এয়াকুব আলী চৌধুরী রচনাবলী', 'আবুল হোসেন রচনাবলী', 'কাব্যবীথি' ইত্যাদি।

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী (১৯০১-৭৯) লোকসাহিত্যের সংগ্রহ সম্পাদনা ও আলোচনায় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। 'লোকসাহিত্যে ছড়া', 'লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ', 'বাংলার লোকসাহিত্য পরিচিতি', 'বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি' প্রভৃতি

তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থ। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান লোকসংগীত, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধাঁ ইত্যাদি সংগ্রহ করে সেসবের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তাঁর প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও গভীর পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটেছে। সমগ্র জীবন নিরবচ্ছিন্ন সাধনা দ্বারা তিনি বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের বহু অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করে গেছেন।

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-৬৪) 'পুণ্যময়ী', 'রোকেয়া জীবনী', 'বেগম মহল', 'আমার দেখা তুরস্ক', 'নজরুলকে যেমন দেখেছি', 'শিশুর শিক্ষা', 'ফুল বাগিচা' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এদেশের নারী সমাজের জাগরণের জন্য বেগম রোকেয়ার আদর্শ অনুসরণে ও তাঁর সান্নিধ্যে জাতির সেবায় নিয়োজিত হন। নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'রোকেয়া জীবনী।' এতে বেগম রোকেয়ার কর্মময় জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তা অনুসরণের জন্য নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও তিনি জীবনের যে রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন তা ছিল বিস্ময়কর।

রণেশ দাশগুপ্ত

রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-৯৭) সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'উপন্যাসের শিল্পরূপ', 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে', 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা', 'ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রাম', 'সেদিন সকালে ঢাকায়' প্রভৃতি তাঁর রচনা।

মনিরউদ্দীন ইউসুফ

মনিরউদ্দীন ইউসুফ (১৯১৯-৮৭) বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চরিতকথা, আত্মজীবনী, অনুবাদ ও কিশোর পাঠ্য রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ফারসি ও উর্দু থেকে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। পারস্যের মহাকবি ফেরদৌসীর 'শাহনামা' কাব্যের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ তাঁর বিশিষ্ট কীর্তি। তাঁর অন্যান্য অনুবাদ হল : 'ইকবালের কাব্য সঞ্চয়ন', 'দীওয়ান-ই-গালিব', 'কালামে রাগিব', 'রুমীর মসনবী' ইত্যাদি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলো তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলো হল : 'বাংলা সাহিত্যে সুফী প্রভাব', 'উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস', 'আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি', 'কারবালা একটি সামাজিক ঘূর্ণাবর্ত', 'সংস্কৃতি চর্চা', 'বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব', 'নব মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ'। তাঁর রচিত জীবনীগ্রন্থ : 'ছোটদের রসূল চরিত', 'হযরত ফাতেমা', 'হযরত আয়েশা'। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন আমার অভিজ্ঞতা' মূল্যবান গ্রন্থ।

মুহম্মদ আবদুল হাই

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-৬৯) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কিত তাঁর আলোচনা অত্যন্ত মূল্যবান। 'ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থ তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা অভিনবত্বের পরিচায়ক এবং বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমধর্মী রচনা। ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কিত তাঁর কতিপয় ইংরেজি গ্রন্থও রয়েছে। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ভাষা ও সাহিত্য', 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা' প্রভৃতি তাঁর সাহিত্য আলোচনামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ। তিনি সৈয়দ আলী আহসানের সহযোগিতায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' নামে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে গদ্য লেখক সম্পর্কিত আলোচনা অংশটি মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত। এই গ্রন্থে আধুনিক যুগের মুসলমান লেখক সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা তথ্য পরিবেশনে ও মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কতিপয় সম্পাদিত গ্রন্থও রয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত ষান্মাসিক 'সাহিত্য পত্রিকা' সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যে গবেষণা পত্রিকা হিসেবে মূল্যবান সংযোজন। এই পত্রিকা কেন্দ্র করে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রেরণায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার সূত্রপাত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানের জন্য তিনি তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল গভীর। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য তাঁর উদ্যোগ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য তিনি কঠোর সংগ্রাম করে গেছেন। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মুখে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদাকে সমুন্নত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম পাঁচ ভাগে বিভক্ত হতে পারে : ক. অনুবাদ ও ভ্রমণকাহিনি, খ. সাহিত্য আলোচনা, গ. লোকসাহিত্য, ঘ. ভাষাতত্ত্ব এবং ঙ. পত্রিকা সম্পাদনা। তাঁর সম্পর্কে আজহারউদ্দিন খান মন্তব্য করেছেন, 'অধ্যাপক ও সাহিত্যসেবী হিসেবে তিনি চিরকাল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অপরিসীম মমতা প্রকাশ করে গেছেন। বাংলা ভাষার বদলে উর্দু বা আরবির প্রচলন, আরবিতে বাংলা লিখন-পদ্ধতি প্রবর্তন, রোমান হরফে বাংলা লেখার ব্যবস্থা, বাংলা বর্ণমালা শুদ্ধিকরণ, বাংলা বানান সংস্কার, রবীন্দ্র-বিরোধী আন্দোলন, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎখাত প্রচেষ্টা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি প্রবলভাবে লড়েছেন।' 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান' তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ। 'বিলাতে সাড়ে সাত শ দিন' তাঁর ভ্রমণকাহিনি। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী, ধ্বনিবিজ্ঞানী ও গবেষক হিসেবে তাঁর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসেবেও সুনাম অর্জন করেছিলেন।

আবদুল হক

আবদুল হক (১৯২০-৯৭) 'ক্রান্তিকাল', 'সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ', 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ', 'সাহিত্য ও স্বাধীনতা', 'ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব', 'নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থের লেখক। নাটক ও ছোটগল্পেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। তবে প্রবন্ধ রচনায় তিনি বিষয়-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন— সাহিত্য, রাজনীতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল। তাঁর বক্তব্যে আছে গভীরতা, ভাষায় আছে ঋজুতা এবং চিন্তায় আছে মৌলিকতার পরিচয়।

ড. নীলিমা ইব্রাহিম

ড. নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২) উপন্যাস নাটক ভ্রমণকাহিনি অনুবাদ প্রভৃতি বিচিত্রধর্মী সাহিত্যসৃষ্টি করলেও প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'উনবিংশ শতকের বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক' তাঁর গবেষণা গ্রন্থ। এছাড়া 'শরৎ প্রতিভা', 'বাংলার কবি মধুসূদন', 'বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা', 'বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্য', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য পাঠের ভূমিকা' ইত্যাদি গ্রন্থ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে রচিত। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থ : 'বেগম রোকেয়া', 'সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ', 'সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত : অতঃপর অমানিশার অন্ধকার', 'অগ্নিস্নাত বঙ্গবন্ধুর ভস্মাচ্ছাদিত কন্যা আমি', 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি', 'বেগম ফজিলতুননেসা মুজিব' ইত্যাদি। তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থ—'বিন্দু বিসর্গ' এবং ভ্রমণকাহিনি 'শাহী এলাকার পথে পথে।'

ড. আহমদ শরীফ

ড. আহমদ শরীফ (১৯২১-৯৯) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে অনেকগুলো গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গবেষণায় মধ্যযুগের অনেক মুসলমান কবির কাব্যসম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'সৈয়দ সুলতান, তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ' গবেষণামূলক আলোচনা। 'বিচিত চিন্তা', 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা', 'পুঁথির ফসল', 'স্বদেশ অন্বেষা', 'জীবনে সমাজে সাহিত্যে', 'কালিক ভাবনা', 'যুগযন্ত্রণা', 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ', 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য' ২ খণ্ড, 'প্রত্যয় ও প্রত্যাশা' ইত্যাদি তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থ হল : 'একালে নজরুল', 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র', 'এবং আরো ইত্যাদি', 'ইদানিং আমরা', 'কালের দর্পণে স্বদেশ', 'বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তন ধারা', 'বাংলার বিপ্লবী পটভূমি', 'মানবতা ও গণমুক্তি', 'সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা', 'গণতন্ত্র সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা', 'বাঙলা, বাঙালি ও বাঙালিত্ব', 'জাগতিক চেতনার বিভিন্ন প্রসূন', 'সংস্কৃতি', 'শাস্ত্র সমাজ ও নারীমুক্তি', 'সংকট: জীবনে ও মননে', 'মুক্তি নিহিত: নতুন চেতনায় ও নতুন চিন্তায়', 'প্রগতির বাধা ও পন্থা', 'এই শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা', 'সময় সমাজ মানুষ', 'দেশ কাল জীবনের দাবী ও সাক্ষ্য', 'স্বদেশ চিন্তা', 'জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা', 'উজান স্রোতে কিছু আষাঢ়ে চিন্তা' ইত্যাদি। মধ্যযুগের কতগুলো কাব্যের সম্পাদনাকালে তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তাঁর গবেষণামূলক সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'নীতিশাস্ত্রবার্তা', 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য', 'চন্দ্রাবতী', 'লায়লী মজনু', 'বাউলতত্ত্ব', 'পুঁথি পরিচিতি', 'মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ', 'মধ্যযুগের গীতিকবিতা', 'তোহফা', 'রসুলবিজয়', 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ', 'শা বারিদ খান গ্রন্থাবলী', 'মধ্যযুগের রাগতালনামা', 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল', 'সওয়াল সাহিত্য', 'সিকান্দর নামা' ইত্যাদি। ড. আহমদ শরীফ তাঁর অফুরন্ত গবেষণার মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছেন। গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসন্ধিৎসা, সুতীক্ষ্ণ যুক্তি ও আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনাকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

সৈয়দ আলী আহসান

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) বাংলাদেশের কাব্যে অন্যতম আধুনিক কবি রূপে খ্যাতিমান হলেও প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর অবদান কম নয়। তিনি মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সঙ্গে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে কাব্য ও নাটক সম্পর্কিত আলোচনাসমূহ লিখেছেন। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞ সমালোচকের পরিচয় বিধৃত। 'কবিতার কথা', 'নজরুল ইসলাম', 'কবি মধুসূদন', 'আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গ', 'রবীন্দ্রনাথ : কাব্যবিচারের ভূমিকা', 'কবিতার রূপকল্প', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আদিপর্ব', 'মধুসূদন : কবিকৃতি ও কাব্যাদর্শ', 'আধুনিক জার্মান সাহিত্য, 'সতত স্বাগত', 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য', 'আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তা- বাদ' ইত্যাদি বিশিষ্ট সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করে সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশের সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। 'পদ্মাবতী', 'মধুমালতী' প্রভৃতি সম্পাদিত গ্রন্থেও তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় নিহিত। মাইকেল মধুসূদনের কতিপয় গ্রন্থের সম্পাদনাও তিনি করেছেন। তিনি কয়েকটি নাটকের রচয়িতা, কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থও তাঁর রয়েছে। সৈয়দ আলী আহসানের গদ্য রসমধুর, বক্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ, তাঁর ভাষারীতিতে আছে নিজস্ব একটা স্টাইল।

মুনীর চৌধুরী

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১) নাট্যকার, গল্পলেখক, শ্রোতাসম্মোহনকারী বক্তা, কৃতী অধ্যাপক, সমালোচক, প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী হিসেবে দেশের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বলে খ্যাত ছিলেন। প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর 'মীরমানস' সমালোচনা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'তুলনামূলক সমালোচনা' ও 'বাংলা গদ্যরীতি' তাঁর আলোচনা গ্রন্থ। নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হিসেবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আশ্চর্য সুন্দর বক্তব্য, রসসমৃদ্ধ ভাষা, চমৎকার উপস্থাপনা ইত্যাদি তাঁর রচনাকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

ড. মযহারুল ইসলাম

ড. মযহারুল ইসলাম (১৯২৫-২০০৩) কবি হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। তবে গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের কয়েকজন কবির জীবনী ও কাব্য তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। লোকসাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর বিশিষ্টতা রয়েছে। 'কবি হেয়াত মামুদ', 'কবি পাগলা কানাই', 'লোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠনপাঠন', 'লোককাহিনি সংগ্রহের ইতিহাস', 'সাহিত্য পথে', 'লোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি' ইত্যাদি তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ। তাঁর সম্পাদিত কয়েকটি গ্রন্থও বিদ্যমান। তিনি কতিপয় পত্রপত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। তিনি 'বঙ্গবন্ধু' নামে শেখ মুজিবুর রহমানের সুবৃহৎ জীবনী রচনা করেছেন এবং ইংরেজি থেকে তাঁর কিছু অনুবাদও রয়েছে।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-৭১) সাহিত্যালোচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। 'রবি পরিক্রমা' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত তাঁর কতিপয় প্রবন্ধের সঙ্কলন। 'সাহিত্যের নবরূপায়ণ', 'বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার', 'রঙিন আখর' ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থ।

ড. কাজী দীন মুহম্মদ

ড. কাজী দীন মুহম্মদ (১৯২৭-২০১১) চার খণ্ডে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' রচনা করেছেন। তাঁর অপরাপর প্রবন্ধ গ্রন্থ হচ্ছে : 'সাহিত্যসম্ভার', 'সাহিত্য শিল্প', 'মানব জীবন', 'জীবন সৌন্দর্য', 'সুফীবাদের গোড়ার কথা', 'ইসলামি সংস্কৃতি', 'সেকালের সাহিত্য', 'সাহিত্য ও আদর্শ', 'ভাষাতত্ত্ব', 'সুখের লাগিয়া', 'বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব', 'আল কাওসার', 'নাস্তিকতা ও আস্তিকতা' ইত্যাদি।

ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯২৭) 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে কয়েকজন মুসলমান লেখকের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর অপর প্রবন্ধগ্রন্থ 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত।' 'নজরুল ইসলাম', 'আবহমান বাংলা' তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ। 'আমাদের মাতৃভাষা-চেতনা ও ভাষা আন্দোলন' তাঁর অপর প্রবন্ধগ্রন্থ। 'বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা' তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধগ্রন্থ হল : 'মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ', 'উচ্চ শিক্ষায় এবং ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ', 'সমকালে নজরুল ইসলাম', 'আমাদের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন', 'আমাদের বাঙালিত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ', 'সময়ের মুখ তাঁহাদের কথা' ইত্যাদি।

আবদুস সাত্তার

আবদুস সাত্তার (১৯২৭-২০০০) কবি হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ 'আরণ্য জনপদে', 'আরণ্য সংস্কৃতি', 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য', 'আধুনিক আরবি সাহিত্য', 'ফারসি সাহিত্যের কালক্রম', 'আরবি লোকসাহিত্য', 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য', 'আরবি সাহিত্যে লৌকিক উপাদান', 'গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য', 'ফারসি সাহিত্যে লৌকিক উপাদান', 'আলোকের সন্ধানে শেখ সাদী', 'কাহিনীকাব্য নয় কাব্য কাহিনী' প্রভৃতি। আবদুস সাত্তার এদেশের উপজাতীয় জীবন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা করে তা রূপায়িত করেছেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে। তাঁর প্রতিভা বৈচিত্র্যধর্মী এবং সে কারণে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি অনুবাদের ক্ষেত্রেও বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। আরবি-ফারসি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ তিনি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন এবং সেসব সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। রম্যরচনা ও শিশুতোষ রচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব বিদ্যমান।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী

ড. আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭) লোকসাহিত্যের গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'লোকসাহিত্য' দুই খণ্ড তাঁর গবেষণামূলক রচনা। 'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী', 'কিংবদন্তির বাংলা' ইত্যাদি গ্রন্থে লোকসাহিত্যের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থ হচ্ছে 'লোকায়ত বাংলা', 'শুভ নববর্ষ', 'আবহমান বাংলা' ইত্যাদি। তাঁর কতিপয় সম্পাদিত গ্রন্থও বিদ্যমান। সাহিত্যসৃষ্টিতে তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কবি হিসেবে তিনি খ্যাতিমান। গল্প, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য ও অনুবাদে তাঁর দক্ষতা আছে। স্মৃতিকথা রচনাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'যা দেখেছি যা শুনেছি যা পেয়েছি', 'রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন', 'স্মৃতির আয়নায়' ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি জীবনের বিচিত্র স্মৃতিকে রসরূপ দান করেছেন। লোকসাহিত্য তাঁর আলোচনার বিষয়, সেই সঙ্গে শিশুমানসের প্রতি আছে তাঁর অফুরন্ত সহানুভূতি।

ড. কাজী আবদুল মান্নান

ড. কাজী আবদুল মান্নান (১৯২৮-৯৪) গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' গ্রন্থে তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানের পর্যালোচনা করেছেন। 'সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী' তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা গ্রন্থ। 'রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ' তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থ। তিনি ছিলেন দক্ষ অধ্যাপক, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিদীপ্ত বক্তা ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্যিক প্রয়াস ও সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ড. গোলাম সাকলায়েন

ড. গোলাম সাকলায়েন (১৯২৮-২০০৯) 'বাংলা মর্সিয়া সাহিত্য' নামে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত অপর গ্রন্থ 'মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক', 'অন্তরঙ্গ আলোকে ডক্টর শহীদুল্লাহ্', 'কবি মোজাম্মেল হক ও ফেরদৌসী চরিত', 'ফকীর গরীবুল্লাহ্', 'পূর্ব পাকিস্তানের সুফী সাধক', 'শেখ ফজলল করিম', 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান', 'সাহিত্য পরিচয়' ইত্যাদি।

মুহম্মদ আবু তালিব

মুহম্মদ আবু তালিব (১৯২৮-২০০৭) সাহিত্য বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করে নিজস্ব ধ্যানধারণার পরিচয় দিয়েছেন। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাঁর রচনায় বিদ্যমান। 'বাংলা সাহিত্যের ধারা', 'লালন শাহ ও লালনগীতিকা', 'লালন পরিচিতি', 'লোক সাহিত্য', 'মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী', 'মুসলিম বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা',

'বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়', 'উত্তরবঙ্গের সাহিত্য সাধনা', 'ফকির নেতা মজনু শাহ', 'বাংলা সনের জন্মকথা', 'উপেক্ষিত সাহিত্য সাধক', 'ভাষা লিপি ও সাহিত্য' ইত্যাদি তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ।

আনোয়ার পাশা

আনোয়ার পাশা (১৯২৮-৭১) কবিতা গল্প উপন্যাস রচনা করেছিলেন। প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। 'রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা', 'সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল' তাঁর আলোচনা গ্রন্থ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী ভক্ত ও প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী এই লেখক 'রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা' গ্রন্থের দুই খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলোর মূল্যায়ন করেছেন।

ড. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

ড. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২৯-৮৪) গবেষণামূলক প্রবন্ধের রচনাকারী। 'জসীম উদ্‌দীন', 'কবি ফররুখ আহমদ', 'মোজাম্মেল হক', 'সাহিত্য সমীক্ষা' তাঁর সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে : 'হোরেসের কাব্যতত্ত্ব', 'কাব্যনির্মাণকলা : আরিস্টটল', 'লঙিনুসের সাহিত্য' ইত্যাদি। 'জসীমউদ্‌দীনের কবি মানস ও কাব্য সাধনা' তাঁর অভিসন্দর্ভ।

বদরুদ্দীন ওমর

বদরুদ্দীন ওমর (১৯৩১) মননশীল ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর গ্রন্থ হচ্ছে 'সংস্কৃতির সংকট', 'সাম্প্রদায়িকতা', 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা', 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি', 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক', 'যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ', 'যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে', 'সামরিক শাসন ও বাংলাদেশের রাজনীতি', 'ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'বাংলাদেশের মার্কসবাদ' ইত্যাদি। ভাষা আন্দোলন, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি তাঁর প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়। বদরুদ্দীন ওমর রাজনৈতিক বিষয়ে আরও অনেক প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় রাজনেতিক মতাদর্শের বিশ্লেষণ ঘটেছে এবং তিনি সমকালীন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ, বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী এবং ভাষা বক্তব্যবিষয়ের উপযোগী।

মোবাশ্বের আলী

মোবাশ্বের আলী (১৯৩১-২০০৫) সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। 'মধুসূদন ও নবজাগৃতি', 'নজরুল প্রতিভা', 'বিশ্বসাহিত্য' তাঁর আলোচনা গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হল : 'বাংলাদেশের সন্ধানে', 'শিল্পীর ট্র্যাজেডি', 'রবীন্দ্রনাথ : অন্তরঙ্গ আলোকে', 'শেলী : জীবন ও সাহিত্য', 'বরিস পাস্তেরনাক', 'এন্টিগোনি', 'নজরুল : সমাজ পরিবেশ ও কাল', 'নজরুল ও সাময়িকপত্র', 'গ্রীক ট্র্যাজেডি' ইত্যাদি। বিশ্ব সাহিত্যের মূল্যবান সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসা বাঙালি পাঠকদের কাছে তা পরিচিত করে তুলতে সহায়তা করেছে।

আবদুল লতিফ চৌধুরী

আবদুল লতিফ চৌধুরী (১৯২৬) কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা গ্রন্থের রচয়িতা। 'কবি কায়কোবাদ', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', 'মীর মশাররফ হোসেন' ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থ।

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) বৈচিত্র্যধর্মী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কবি, কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার। প্রবন্ধরচনায়ও তাঁর দক্ষতা আছে। 'শিল্পীর সাধনা', 'সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু' তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধের বই। তাঁর অপরাপর প্রবন্ধ গ্রন্থ হল : 'নজরুল গবেষণা : ধারা ও প্রকৃতি', 'মায়াকভস্কি ও নজরুল', 'রবীন্দ্রক্লাসিক আবিষ্কার', 'সাহিত্য সমালোচনা', 'অজিতকুমার গুহ', 'মুজফ্ফর আহমদ', 'হামিদুর রহমান' ইত্যাদি। শিশু সাহিত্যেও তাঁর অবদান রয়েছে।

ড. রফিকুল ইসলাম

ড. রফিকুল ইসলাম (১৯৩৪) 'নজরুল নির্দেশিকা', 'নজরুল জীবনী', 'বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা', 'ভাষাতত্ত্ব', 'নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য', 'ঢাকার কথা', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম', 'ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার', 'আবদুল কাদির', 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ', 'ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য', 'বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ', 'কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি', 'নজরুল প্রসঙ্গে', 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৫) সাহিত্য সমালোচনামূলক অনেক প্রবন্ধের রচয়িতা। 'অন্বেষণ' তাঁর অন্যতম প্রবন্ধ গ্রন্থ। 'কাব্যের স্বভাব', 'এরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব' প্রভৃতি তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত অনুবাদ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে : 'আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য', 'শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ', 'বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক', 'কুমুর বন্ধন', 'স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি', 'উপর কাঠামোর ভিতরেই', 'উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ', 'গণতন্ত্রের পক্ষ-বিপক্ষ', 'বাঙালি কাকে বলি', 'বৃত্তের ভাঙা গড়া' 'স্বাধীনতার স্পৃহা সাম্যের ভয়', 'বাঙালিকে কে বাঁচাবে', 'টলস্টয় : অনেক প্রসঙ্গের কয়েকটি', 'নেতা জনতা ও রাজনীতি', 'শ্রেণী সময় ও সাহিত্য', 'বাঙালির জয় পরাজয়', 'এর পথ ওর প্রাচীর', 'পতঙ্গ, ভৃত্য ও দৈত্য', 'রাষ্ট্রের মালিকানা' ইত্যাদি।

যতীন সরকার

যতীন সরকার (১৯৩৬) প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলো হল : 'সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা', 'বাংলাদেশের কবিগান', 'বাঙালির সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য', 'কেদারনাথ মজুমদার', 'সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী', 'হরিচরণ আচার্য', 'চন্দ্রকুমার দে', 'পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু দর্শন', 'ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদের ভূত ভবিষ্যৎ' ইত্যাদি। 'গল্পে গল্পে ব্যাকরণ' তাঁর ছোটদের উপযোগী বই।

মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ

মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ্ (১৯৩৬) অনেকগুলো সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থের রচয়িতা। 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা', 'মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ', 'বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য', 'সমকালীন সাহিত্যের ধারা', 'নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ', 'সাহিত্য সংস্কৃতি জাতীয়তা', 'মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন' প্রভৃতি তাঁর প্রাবন্ধিক প্রতিভার নিদর্শন। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধগ্রন্থ হল : 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক', 'কবিতা ও প্রসঙ্গকথা', 'সাহিত্যের রূপকার', 'বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন', 'বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা প্রীতি' ইত্যাদি। কবিতা রচনাতেও তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে।

ড. আনিসুজ্জামান

ড. আনিসুজ্জামান (১৯৩৭) গবেষণা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাঁর 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থটি সাময়িক পত্রে মুসলমানদের অবদানের বিবরণ। 'মুনীর চৌধুরী' তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা গ্রন্থ এবং 'স্বরূপের সন্ধানে', 'আঠারো শতকের বাংলা চিঠি' ও 'পুরানো বাংলা গদ্য' তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ। 'রবীন্দ্রনাথ' কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধের সম্পাদনা। তাঁর অপরাপর প্রবন্ধ গ্রন্থ : 'মহম্মদ শহীদুল্লাহ', 'মোতাহের হোসেন চৌধুরী', 'আমার একাত্তর' ইত্যাদি। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছেন।

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮) কবিতা সমালোচনা গবেষণামূলক প্রবন্ধ গান ও অনুবাদে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণামূলক গ্রন্থ হচ্ছে : 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক', 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'বাংলা কবিতার ছন্দ', 'আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র', 'বাংলা সাহিত্যে বাঙালি ব্যক্তিত্ব', 'সাময়িক পত্রে সাহিত্য চিন্তা : সওগাত', 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ইতিহাস', 'সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা', 'মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী', 'রবীন্দ্রচেতনা', 'আধুনিক বাংলা কাব্য : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত', 'ভাষা আন্দোলন : শিক্ষায় ভাষা পরিকল্পনা', 'মধুসূদন', 'নজরুল চেতনা' ইত্যাদি। তিনি অনেক গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছেন।

ড. ওয়াকিল আহমদ

ড. ওয়াকিল আহমদ (১৯৪১) সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম : 'সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য', 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান', 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত', 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', 'বাংলায় বিদেশী পর্যটক', 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা', 'বাংলার মুসলিম

বুদ্ধিজীবী', 'মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা', 'প্রবাদ ও প্রবচন', 'ধাঁধাঁ', 'মন্ত্র', 'বাংলা লোকসঙ্গীত : ভাওয়াইয়া', 'বাংলা লোকসঙ্গীত : ভাটিয়ালী গান', 'সারিগান' ইত্যাদি।

হোসনে আরা শাহেদ

হোসনে আরা শাহেদ (১৯৪২) প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সমকালীন জীবনের সমস্যা তাঁর প্রবন্ধের উপজীব্য। তাঁর রচিত প্রবন্ধের বই 'চলমান দিন', 'নিহত আগন্তুক', 'জনারণ্যে', 'বৈরীসমাজ', 'কেন এ দুয়ারটুকু', 'দুঃখের কাছাকাছি', 'ডায়নার ছেলে সোনাভানের মেয়ে' ইত্যাদি। সমকালীন জীবনের নানা অসংগতি তিনি পরিহাস মধুর ভাষায় তাঁর লেখনীর মাধ্যমে রূপায়িত করে তুলেছেন। মহৎ আদর্শে উদ্দীপ্ত মানসিকতা নিয়ে তিনি মানবমনের বিচিত্র আচরণের পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর আলেখ্য জাতীয় রচনা হচ্ছে : 'গিন্নির ডায়েরী', 'জীবন থেকে', 'নেপথ্যে জনারণ্যে', 'অনন্ত ফেরারি', 'জীবনান্দমের জামিন' ইত্যাদি। তাঁর রম্যরচনা : 'পঞ্চমন্ত্র', 'টাকা দেবে গৌরি সেন।' 'মনোলোক' তাঁর গল্পগ্রন্থ এবং 'টম চাচার কুড়ে' ছোটদের জন্য রচনা।

নরেন বিশ্বাস

নরেন বিশ্বাস (১৯৪৫-৯৮) সাহিত্যের অলঙ্কার ও সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন। এসব বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : 'অলঙ্কার অন্বেষা', 'কাব্যতত্ত্ব অন্বেষা', 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা', 'ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব'। তাঁর অমরকীর্তি 'বাংলা উচ্চারণ অভিধান।'

ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা

সাহিত্যের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে বাংলাদেশের অগণিত লেখক আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাবন্ধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৪৪) 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : 'দেশ কাল ও শিল্পরূপ', 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ', 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য' গ্রন্থের লেখক। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ হচ্ছে : 'মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আনোয়ার পাশা', 'চক্রবাক', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি। আতাউর রহমান (১৯২৫) 'কবি নজরুল', 'নজরুল কাব্য সমীক্ষা', 'নজরুল : উপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি', 'বেনজীর আহমদ'; ড. আনোয়ারুল করীম(১৯৩৭) 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক', 'বাউল কবি লালন শাহ্', 'লালন গীতি', 'বাউল সাহিত্য ও বাউল গান', 'ফকির লালন শাহ', 'লালনের গান', 'রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ'; আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) 'শুদ্ধতম কবি', 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', 'নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা', 'দশ দিগন্তের দ্রষ্টা', 'বেগম রোকেয়া', 'আমার বিশ্বাস'; 'ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য', 'পুনর্বিবেচনা'; আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৪৪) 'কালের যাত্রার ধ্বনি', 'একুশে ফেব্রুআরি আন্দোলন', 'উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য', 'মুক্তি সংগ্রাম', 'নৈতিকতা :

শ্রেয়োনীতি ও দুর্নীতি', 'মানুষ ও তার পরিবেশ'; আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১) 'বুদ্ধিবৃত্তির নূতন বিন্যাস', বাঙালি মুসলমানের মন', 'জাগ্রত বাংলাদেশ', 'আহমদ ছফার প্রবন্ধ', 'আনুপূর্বিক তসলিমা নাসরিন ও অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ'; আহমদ রফিক (১৯২৯) 'শিল্প সংস্কৃতি জীবন', 'নজরুল কাব্যে জীবন সাধনা', 'আরেক কালান্তরে'; ড. গোলাম মুরশিদ (১৯৪০) 'আশার ছলনে ভুলি', 'কালান্তরে বাংলা গদ্য', 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদি পর্ব', 'বৈষ্ণব পদাবলী প্রবেশক', 'বিদ্যাসাগর', 'বাংলাদেশ সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি', 'রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ : পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা', 'সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক ১৮৫৪-১৮৭৬'; ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬) 'স্বদেশ ও সাহিত্য', 'বাংলাদেশের লোকশিল্প', 'চিত্রশিল্প : বাংলাদেশে', 'গ্রামাঞ্চলে ধনতন্ত্রের বিকাশ'; মুনিরুজ্জামান (১৯৪০) 'ভাষা সমস্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'; মুহম্মদ সিদ্দিক খান (১৯১০-৭৮) 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরি যুগ', 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা'; ড. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল (১৯৩২) 'ভাষাশিল্পী মশাররফ', 'মীর মশাররফ হোসেন', 'মীর মশাররফের গদ্য রচনা'; ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (১৯৩৩) 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা'; শাহেদ আলী (১৯২৫) 'বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রাম'; শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (১৯১৯) 'নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা', 'সিলেটি ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', 'যশোর-খুলনার ছড়া'; ড. সনজীদা খাতুন (১৯৩৩) 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ'; ড. হায়াৎ মামুদ (১৯৩৯) 'রবীন্দ্রনাথ : কিশোর জীবনী', 'মৃত্যুচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জটিলতা'; হাসান হাফিজুর রহমান(১৯৩২-৮৩) 'আধুনিক কবি ও কবিতা', 'সাহিত্য প্রসঙ্গ', 'মূল্যবোধের জন্যে', 'আলোকিত গহ্বর', 'প্রতিবিম্ব'; আল মাহমুদ (১৯৩৬) 'কবির আত্মবিশ্বাস', 'দিনযাপন'; মনসুর মুসা (১৯৪৫) 'পূর্ববাংলার উপন্যাস'; 'ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ', 'ভাষা চিন্তা : প্রসঙ্গ ও পরিধি', 'ভাষা পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব', আজহার ইসলাম (১৯৪৪) 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ', 'সাহিত্যে বাস্তবতা', 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি', 'বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য'; আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (১৯৪০) 'দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ'; ড. আবুল আহসান চৌধুরী (১৯৫৩) 'মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা', 'বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও ভাষা আন্দোলন'; ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ(১৯৩৮) 'বাংলা ভাষাতত্ত্ব', 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব'; ড. আবুল কাসেম চৌধুরী (১৯৩৩-২০০৫) 'বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা'; আমিনুল ইসলাম বেদু (১৯৪১) 'সময় ও সাহিত্য', 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন'; আলমগীর জলিল (১৯২৮-২০১১) 'মুসলিম মানস ও লোক সংস্কৃতি', 'বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি'; ড. এস এম লুতফর রহমান (১৯৪১) 'লালন জিজ্ঞাসা', 'লালন শাহ জীবন ও গান', 'বাউল তত্ত্ব ও বাউল গান'; কবীর চৌধুরী (১৯২৩) 'ছয়সঙ্গী', 'প্রাচীন ইংরেজি কাব্যসাহিত্য', 'আধুনিক মার্কিন সাহিত্য', 'সাহিত্যকোষ', 'প্রসঙ্গ নাটক', 'অভি- ব্যক্তিবাদী নাটক' ইত্যাদি; কাজী সিরাজ (১৯৪৫) 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞান', 'আধুনিক ভাষা বিজ্ঞান'; খোন্দকার রিয়াজুল হক (১৯৪০) 'লালন সাহিত্য ও দর্শন', 'মরমী কবি পাঞ্জু শাহ : জীবন ও কাব্য' ইত্যাদি; খোন্দকার সিরাজুল হক

(১৯৪১) 'মুসলিম সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম'; ড. জাহাঙ্গীর তারেক (১৯৪২) 'প্রতীকবন্দী সাহিত্য', 'শব্দার্থবিজ্ঞানের ভূমিকা'; জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮) 'শব্দের সীমানা', 'আমার দেশ আমার ভাষা'; তিতাশ চৌধুরী (১৯৪৫) 'কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য', 'জসীমউদ্‌দীন : কবিতা গদ্য ও স্মৃতি', 'মোতাহের হোসেন চৌধুরী : জীবন ও সাহিত্য'; বশীর আল হেলাল (১৯৩৬) 'সাম্প্রতিক কবি সাম্প্রতিক কবিতা', 'বাংলা গদ্য', 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', 'ইবরাহীম খাঁ', ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৫৮) 'বাংলাদেশের সাহিত্য', 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গচেতনার রূপায়ণ', 'নজরুল মানস ও অন্যান্য'; ড. বেগম আকতার কামাল (১৯৫৮) 'বিষ্ণু দে-র কাব্যে পুরাণ প্রসঙ্গ', 'বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্য'; ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৫৭) 'জগদীশ গুপ্তের গল্প : পঙ্ক ও পঙ্কজ', 'বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য'; ভুইয়া ইকবাল(১৯৪৬) 'বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র'; দানীউল হক (১৯৪৭) 'অনুবেদন', 'সাহিত্য কথা', 'ভাষাতত্ত্বের কথা', 'ভাষার কথা'; মাহবুব সাদিক (১৯৪৭) 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ', 'কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'; ড. মজিরউদ্দিন মিয়া(১৯৩৯-৯৯) 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা', 'বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা', 'রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশসচেতনা'; ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (১৯৩৩) 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা', 'উনিশ শতকের ঢাকায় সাহিত্য সংস্কৃতি'; ড. রফিক উল্লাহ খান (১৯৫৭) 'বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ'; ড. রাজীব হুমায়ুন (১৯৫১) 'সমাজ ভাষাবিজ্ঞান', 'নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশের সাহিত্য', ড. শফিউদ্দিন আহমদ (১৯৪১) 'বাংলা গদ্যের বিবর্তন', 'বাংলা গদ্য ও গদ্যশিল্পী', 'ডিরোজিও জীবন ও সাহিত্য'; ড. সৈকত আসগর (১৯৫৪-২০০০) 'গদ্যশিল্পী নজরুল', 'আধুনিক বাংলা কবিতা : শিল্পরূপ বিচার'; ড. স্বরোচিষ সরকার (১৯৬০) 'কথাসাহিত্য ও নাটকে মুসলিম সংস্কার চেতনা'; আহমদ কবির (১৯৪৪) 'রবীন্দ্রকাব্য : উপমা ও প্রতীক'; ড. হুমায়ূন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪) 'রবীন্দ্রপ্রবন্ধ : রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা', 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্', 'লাল নীল দীপাবলী', 'শামসুর রাহমান নিঃসঙ্গ শেরপা', 'বাঙালা ভাষার শত্রুমিত্র', 'বাক্যতত্ত্ব', 'সীমাবদ্ধতার সূত্র', 'নারী', 'প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘছায়া', 'নরকে অনন্ত ঋতু' প্রভৃতি; ড. সাইদ-উর রহমান (১৯৪৮) 'চারু মজুমদার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন', 'পূর্ববাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা'; আকিমুন রহমান(১৯৫৯) 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন।

বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা

বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন ড. মোহাম্মদ কুদরত-এ-খোদা (১৯০০-৭৮)। তাঁর বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক।

ড. আবদুল্লাহ্ আলমুতী শরফুদ্দিন (১৯৩০-৯৮) 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে', 'অবাক পৃথিবী', 'রহস্যের শেষ নেই', 'আকাশের সাথে মিতালী', 'আবিষ্কারের নেশায়', 'রহস্যটা জানতে হবে', 'মহাবীর পরমাণু', 'সাগরের রহস্যপুরী' প্রভৃতি গ্রন্থের

রচয়িতা। শাহ ফজলুর রহমান 'মহাশূন্যে অভিযান' গ্রন্থের রচয়িতা। এম. আকবর আলী, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, ড. এ. কে. এম. আমিনুল হক, ড. এবনে গোলাম সামাদ, ড. জহুরুল হক, ড. মুহম্মদ ইব্রাহীম, ড. আলী আসগর, দ্বিজেন শর্মা, ড. ইনামুল হক, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল প্রমুখ লেখকেরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলাদেশের বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার মধ্যে আছে বৈচিত্র্যধর্মিতা। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিবেশনের জন্য অনেক বিদেশী ভাষার গ্রন্থ যেমন অনূদিত হচ্ছে, তেমনি নিত্য নতুন গ্রন্থ রচনার প্রাচুর্যও দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে কিশোরদের উপযোগী অনেক বই রচিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী রচনার ক্ষেত্রেও লেখকদের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করেছেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, শাহেদ আলী, আবুল কাসেম প্রমুখ অনেকে। বাংলা সাহিত্যে ইসলামি বিষয় নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতা সুদীর্ঘকালের। বাংলাদেশে এই উদ্যোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে ধর্মীয় বিষয়কে জনগণের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য। ধর্মীয় বিষয়ের গ্রন্থের মধ্যে অনুবাদ বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ, মহানবী জীবনী, ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি ধর্মীয় সাহিত্যকে ব্যাপকতর করে তুলেছে।

ভ্রমণকাহিনি

প্রবন্ধ সাহিত্য হিসেবে ভ্রমণকাহিনীর কথাও উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে স্বল্পসময়ে প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনীর সংখ্যা অনেক। এখানকার ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে ইবরাহীম খাঁ-র (১৮৯৪-১৯৭৮) 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র', 'নয়াচীনে এক চক্কর', 'পশ্চিম পাকিস্তানের পথে ঘাটে', 'নয়াজগতের পথে'; মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের (১৯১৯-৬৯) 'বিলাতে সাড়ে সাত শ দিন'; আ. ন. ম. বজলুর রশীদের (১৯১১-৮৬) 'দ্বিতীয় পৃথিবীতে', 'পথ বেঁধে দিল'; সৈয়দ শাহাদাত হোসেনের (১৯২৪) 'দূরের সুর'; মোহাম্মদ মোদাব্বেরের (১৯০৮-৮৪) 'জাপান ঘুরে এলাম'; সানাউল হকের (১৯২৩-৯৩) 'বন্দর থেকে বন্দরে'; নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের (১৯০৬-৮২) 'দূরে দূরান্তরে'; ড. জহুরুল হকের (১৯২২-৯৮) 'সাত সাঁতার'; ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের 'বুলগেরিয়া ভ্রমণ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রম্যরচনা

রম্যরচনার ক্ষেত্রেও এখানকার সাহিত্য উল্লেখযোগ্য অবদানের অধিকারী। আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) রম্যরচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'আয়না', 'ফুড কনফারেন্স', 'আসমানী পর্দা', 'গালিভারের সফরনামা' ইত্যাদি তাঁর রচনা। এই প্রসঙ্গে নূরুল মোমেনের (১৯০৮-৯০) নামও উল্লেখযোগ্য। 'বহুরূপা' এই ক্ষেত্রে অনন্য গ্রন্থ। ইবনে ইমামের 'চিত্র-বিচিত্র'; ড. জহুরুল হকের 'মনু বর্ণালী', তাজা কলমের 'চেনা মানুষের ইতিকথা'; ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'তাকিয়ে দেখি'; হাসান হাফিজুর রহমানের 'দক্ষিণের জানালা' ইত্যাদি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। বাংলাদেশের রম্যরচনার মধ্যে সমাজ জীবনের অসংগতি প্রাধান্য পাচ্ছে।

আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা

আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা জাতীয় গ্রন্থ রচনায়ও এখানকার লেখকবৃন্দ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আব্বাস উদ্দিনের 'আমার শিল্পী জীবনের কথা'; জসীম উদ্‌দীনের 'জীবন কথা', 'যাঁদের দেখেছি', 'স্মৃতির পট'; আবুল কালাম শামসুদ্দীনের 'অতীত দিনের স্মৃতি', ইবরাহীম খানের 'বাতায়ন'; ড. আশরাফ সিদ্দিকীর 'রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন', 'যা দেখেছি যা শুনেছি যা পেয়েছি'; এম. আর. আখতার মুকুলের 'রূপালী বাতাস সোনালী আকাশ'; আবুল মনসুর আহমদের 'আত্মকথা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত গ্রন্থ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রবন্ধ স্মৃতিকথা জাতীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : এম. আর. আখতার মুকুলের 'আমি বিজয় দেখেছি'; শামসুল হুদা চৌধুরীর 'একাত্তরের রণাঙ্গন'; সেলিনা হোসেনের 'একাত্তরের ঢাকা'; এম. এস. এ. ভূইয়ার 'মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস'; মেজর রফিকুল ইসলামের 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে'; জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি'; রফিকুল ইসলামের (বীর উত্তম) 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে'; কাজী জাকির হাসানের 'মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি'; আসাদ চৌধুরীর 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ'; ছদরুদ্দীনের 'মুক্তিযুদ্ধ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে'; মনজুর আহমদের 'একাত্তর কথা বলে'; আতিয়ার রহমানের 'মুক্তিযুদ্ধের অপ্রকাশিত কথা'; হেদায়েত হোসাইন মোরশেদের 'স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকায় গেরিলা অপারেশন'; রশীদ হায়দার সম্পাদিত '১৯৭১ : ভয়াবহ অভিজ্ঞতা' ইত্যাদি। সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে নতুনভাবে চেতনার সঞ্চার হচ্ছে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি নিজেদের মহান আত্মত্যাগের ইতিহাসকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপনার জন্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপকভাবে প্রতিফলনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা এখন সম্প্রসারণশীল। অগণিত সাহিত্যসাধক এই ধারাটিকে সমৃদ্ধিশালী করার সাধনায় নিমগ্ন। অগণিত প্রবন্ধকার দেশের বর্তমান সাহিত্যের ধারাকে সম্ভাবনাময় করে তুলছেন।

উপন্যাস

বাংলাদেশের উপন্যাস হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের পরিধিতে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যেরই অনুসারী। বাংলা উপন্যাসের আদিযুগে মুসলমান ঔপন্যাসিকদের অবদান ছিল না। মুসলমানরা যখন উপন্যাস রচনায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন তখন বাংলা উপন্যাসের ধারা সমৃদ্ধির নিদর্শন নিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। সে হিসেবে তুলনামূলক বিচারে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অবদান কিছুটা নিষ্প্রভ। তবে বাংলাদেশের পরিসীমায় তা কাটিয়ে ওঠার একটা প্রচেষ্টা প্রথম থেকেই লক্ষণীয় হওয়ার ফলে এখানকার উপন্যাসের ইতিহাস অনেকটা সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে এখানকার উপন্যাস সাহিত্য অগ্রসর হচ্ছে বলে তা নতুনতর বৈশিষ্ট্যের পরিচয়বাহক। বর্তমান বাংলাদেশের স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও জীবন এখানকার উপন্যাসে রূপায়ণের সুযোগ বিভাগপূর্ব কালে অনুপস্থিত ছিল। তখন যে দু একটি উপন্যাসে এখানকার জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা সহজেই প্রশংসা পেয়েছে। তাই স্বতন্ত্র পরিবেশে এই অঞ্চলের জীবন অচিরেই উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে উঠল। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জীবনে নতুনতর চেতনার সঞ্চার হয়েছে। স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে জীবনের গতিধারা বৈচিত্র্যপূর্ণ খাতে প্রবাহিত হতে শুরু হল। দেখা দিল নিত্য নতুন সমস্যা। যেহেতু উপন্যাসে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন ঘটে সে কারণে ঔপন্যাসিকবৃন্দ প্রবহমান জীবনধারার নানা দিক অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। ড. রফিকল্লাহ্ খান তাঁর অভিসন্দর্ভ 'বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'মধ্যবিত্তের প্রত্যাশা-অপ্রাপ্তি, সংগ্রাম, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ এ-পর্যায়ে রচিত উপন্যাসের মৌল উপজীব্য। বিকাশশীল মধ্যবিত্তের অশক্ত, অপরিণত ভিত্তি উপকরণের প্রশ্নে ঔপন্যাসিকদেরকে করেছে গ্রামজীবনমুখী। বিষয়ভাবনায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বময় প্রকাশ। একদিকে সামন্ত আর্থ-উৎপাদন কাঠামোর পিছুটান, অন্যদিকে বিকাশকামী মধ্যবিত্তের কর্মোদ্যোগ, সংগ্রাম ও স্বাবলম্বন-প্রত্যাশা— এ দুয়ের অনিবার্য দ্বন্দ্ব উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপকে প্রভাবিত করেছে।'

বাংলাদেশের শান্তস্নিগ্ধ পল্লীশ্রী এখানকার উপন্যাসে রূপায়ণের প্রচেষ্টা লক্ষণীয় হয়ে উঠলেও শহুরে জীবন উপেক্ষিত হয় নি। গ্রাম বাংলার জীবনের বৈচিত্র্যময় রূপ যেমন উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি নাগরিক জীবনের সমস্যাও এখানে স্থান পেয়েছে। দেশ বিভাগের ফলে এখানকার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে, এখানকার মানুষের জীবনে তার প্রভাব রূপায়িত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকগণ এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনই উপন্যাসে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এখনকার জীবন এতদিন সাহিত্যে যথাযোগ্য স্থান পায় নি বলে সমকালীন লেখকদের জন্য তা বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস সৃষ্টির উপাদানের বিপুল উৎস হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ জীবন, নাগরিক জীবন, আঞ্চলিক জীবনচিত্র, মনস্তত্ত্ব, ঐতিহাসিক চেতনা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। বিষয়বস্তুর এই বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে মুহম্মদ আবদুল হাই মন্তব্য করেছেন, 'একদিকে কৃষিভিত্তিক পল্লীজীবন, অপরদিকে আধুনিক দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ নাগরিক জীবন; একদিকে পূর্ববঙ্গের ঐশ্বর্যময় বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা, অপরদিকে আধুনিক মানুষের জটিল অন্তর প্রকৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ; একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ, অপরদিকে রোমান্টিক কল্পনার বিলাস; একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ পটভূমিকায় মানুষের অস্থিরতা, অপরদিকে হৃদয়াবেগের চিরন্তন পটে প্রতিষ্ঠিত প্রেমিক মানুষ, সবই আমাদের বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।'

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন প্রবল প্রভাব বিস্তার করে আছে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে। একুশের চেতনা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান। একুশের আন্দোলন

বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে। একুশের চেতনা নিয়ে কিছু সংখ্যক উপন্যাস বাংলাদেশের সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয়। তবে একুশের গুরুত্বের তুলনায় এ ধরনের উপন্যাস খুব বেশি রচিত হয় নি।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের যথেষ্ট প্রতিফলন লক্ষণীয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে এখানকার জীবনে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রত্যক্ষদর্শী ঔপন্যাসিকগণ উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই এখানকার উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তর কালের জীবনের রূপায়ণেরও নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে। খুব কাছে থেকে এ জীবনের চিত্রায়ণ তাই বাস্তবানুসারী হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন ও নবীন ঔপন্যাসিকবৃন্দ বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে জড়িত।

আবুল মনসুর আহমদ

ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯) নাম উল্লেখযোগ্য। ব্যঙ্গরসাত্মক রচনায় খ্যাতি অর্জন করলেও উপন্যাসে তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। 'সত্যমিথ্যা', 'জীবনক্ষুধা', 'আবে হায়াত' প্রভৃতি উপন্যাসেও তিনি আদর্শবাদিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় সে আমলের সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা আছে। তিনি তাঁর উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারে স্বকীয়তা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন।

আবুল কালাম শামসুদ্দিন

আবুল কালাম শামসুদ্দিন (১৮৯৭-১৯৭৯) সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতিমান হলেও উপন্যাসে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। তবে ভাবানুবাদ জাতীয় উপন্যাসে তাঁর কীর্তি সীমাবদ্ধ। 'অনাবাদী জমি' (পূর্বনাম পোড়ো জমি) উপন্যাসটি রাশিয়ান ঔপন্যাসিক ইভান তুর্গেনিভের 'ভার্জিন সয়েল'-এর অনুবাদ। 'ঝর্ণাধারা' (পূর্বনাম খরতরঙ্গ) উপন্যাসটি তুর্গেনিভের গল্প অবলম্বনে রচিত। তাঁর উপন্যাসগুলো মূলত অনুবাদ হলেও তাতে মৌলিক রচনার স্বাদ সহজলভ্য। ভাষা রূপায়ণে তিনি নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন।

মাহবুব-উল-আলম

কথাশিল্পী মাহবুব-উল-আলম (১৮৯৮-১৯৮৯) স্মৃতিকথা ইতিহাস গল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। উপন্যাসেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল। আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস 'মোমেনের জবানবন্দী' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। মনোভাবের অকৃত্রিম প্রকাশে বইটি বিশিষ্ট। সাহিত্যের বেলায় তিনি ছিলেন স্পষ্টবাক ও যুক্তিনির্ভর। তাঁর উপন্যাসের ভাষা বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্জল। উপন্যাসে তিনি সমাজ ও বাস্তবজীবনের নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'গাঁয়ের মায়া', 'মফিজন' তাঁর অপরাপর উপন্যাস।

আবুল ফজল

আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩) বৈচিত্র্যধর্মী সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় দান করলেও উপন্যাস রচনায় তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। 'চৌচির', 'সাহসিকা', 'জীবন পথের যাত্রী', 'প্রদীপ ও পতঙ্গ', 'রাঙ্গা প্রভাত' প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস। এই সব উপন্যাসে সমকালীন জীবনের চিত্র ও সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ আদর্শবাদিতার পরিচয়ও কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। উপন্যাসের বিষয় হিসেবে তিনি মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায় প্রাঞ্জলতা ফুটে উঠেছে।

সত্যেন সেন

সত্যেন সেন (১৯০৭-৮১) অনেকগুলো উপন্যাসের রচয়িতা। লেখকের সংগ্রামীজীবনের আদর্শ উপন্যাসগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে। দীর্ঘ কারাবাসের জীবনে গ্রন্থগুলো রচিত হলেও ষাট দশকের শেষ দিকে সে সব প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলোর নাম : 'ভোরের বিহঙ্গী', 'অভিশপ্ত নগরী', 'পদচিহ্ন', 'পাপের সন্তান', 'মা', 'অপরাজেয়', 'শহরের ইতিকথা', 'আলবেরুনী', 'উত্তরণ', 'কুমারজীব', 'সেয়ানা', 'পুরুষমেধ', 'বিদ্রোহী কৈবর্ত', 'সাত নম্বর ওয়ার্ড' ইত্যাদি। লেখকের উপন্যাসগুলো সুপ্রাচীন কালের পটভূমিকায় রচিত। ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা সমস্যা এ সবে প্রতিফলিত। সত্যেন সেন কতকগুলো গ্রন্থে সমকালীন জীবনের কথাও বলেছেন। অধিকাংশ গ্রন্থের মধ্যে নিপীড়িত গণমানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনী বিধৃত। 'মিথের নবরূপায়ণে, গদ্যরীতির ধ্রুপদী বিন্যাসে এবং বক্তব্যের সমকালীন-সংকট বিবেচনায় 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান' বাংলাদেশের উপন্যাসে স্বতন্ত্র, অনতিক্রান্ত।'

খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন

খান মোহাম্মদ মইনুদ্দিন (১৯০১-৮১) 'নয়া সড়ক' উপন্যাস রচনা করেছেন। যুগচেতনার বৈশিষ্ট্য তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত।

বন্দে আলী মিয়া

বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-৭৯) কবিতা ও শিশু সাহিত্য রচনায় খ্যাতিমান। তবে তাঁর প্রতিভা বৈচিত্র্যধর্মী। ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর পরিচয় 'নীড়ভ্রষ্ট', 'দিবাস্বপ্ন', 'জাগ্রত যৌবন', 'ঘূর্ণি হাওয়া', 'অরণ্য গোধূলি', 'ঝড়ের সঙ্কেত' ইত্যাদি গ্রন্থে রূপায়িত হয়েছে।

আবুল হাশেম খান

আবুল হাশেম খান (১৯০৯) 'আলোর পরশ' নামক উপন্যাসের রচয়িতা। উপন্যাসটি ইতিহাস ভিত্তিক। এই উপন্যাসে কৃতিত্ব দেখানোর জন্য তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

কাজী আবুল হোসেন

কাজী আবুল হোসেন (১৯০৯) বহু উপন্যাসের স্রষ্টা। তাঁর উপন্যাসগুলোর নাম : 'উমাপদ যশোদা সংবাদ', 'কাজল আঁখির মায়া', 'কালো বউ', 'চেনা অচেনা',

'জীবনের খেলাঘর', 'নারাঙ্গী বনে ঝড়', 'নূরবানু', 'পথের বুকে', 'বনজ্যোৎস্না', 'সতীনের ঘর', 'স্ত্রীভাগ্য ভাল' ইত্যাদি। এদেশের মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সহজ সরল চিত্র তাঁর উপন্যাসে রূপ লাভ করেছে।

আশরাফুজ্জামান

আশরাফুজ্জামান (১৯১১) ছোটগল্প রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসও রয়েছে। 'মনজিল' ও 'শায়ের নামা' তাঁর উপন্যাস। বাংলার জীবন ও প্রকৃতি তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য ছিল। তিনি অবহেলিত মানব জীবনের সহানুভূতিশীল রূপকার। 'এলেম নতুন দেশে' তাঁর অনূদিত উপন্যাস। এছাড়া তিনি ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী ও শিশুতোষ গ্রন্থ রচনায়ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

আবু জাফর শামসুদ্দিন

আবু জাফর শামসুদ্দিন (১৯১১-৮৯) মননশীল লেখক হিসেবে বৈচিত্র্যধর্মী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক রূপে বাংলাদেশের সাহিত্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট আসন রয়েছে। তিনি 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' নামে সুবৃহৎ উপন্যাসের রচয়িতা। উপন্যাসটি ইতিহাসভিত্তিক এবং তাতে জাতীয় জীবনের বিবর্তন রূপায়িত হয়েছে। তাঁর অপরাপর উপন্যাস : 'মুক্তি', 'পরিত্যক্ত স্বামী' রোমান্টিক ধরনের; 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যে প্রবণতা এখানকার উপন্যাসের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত এক্ষেত্রে তারই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাসকে এসব উপন্যাসে জাতীয় জীবনের গৌরব প্রকাশে সহায়ক হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 'সংকর সংকীর্তন', 'দেয়াল' তাঁর অন্যান্য উপন্যাস। ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল।

মবিনউদ্দিন আহমদ

মবিনউদ্দিন আহমদ (১৯১২-৭৮) 'রূপ হতে রূপে', 'সুখচর' ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর অপরাপর সাহিত্যসৃষ্টিও রয়েছে। ছোটগল্প রচনাতেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক।

আহসান হাবীব

আহসান হাবীব (১৯১৭-৮৫) বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। কিন্তু উপন্যাস রচনায় প্রাচুর্যের পরিচয় দিতে না পারলেও তিনি বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। 'অরণ্য নীলিমা', 'জাফরানী রং পায়রা', 'রানীখালের সাঁকো' তাঁর উপন্যাস।

শওকত ওসমান

শওকত ওসমান (১৯১৯-৯৮) ছিলেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক-গণের অন্যতম। তিনি উপন্যাস ছোটগল্প নাটক প্রবন্ধ অনুবাদ ইত্যাদি বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। তবে কথাশিল্পী হিসেবেই তাঁর পরিচয়

সমধিক এবং তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিও নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় সমৃদ্ধ। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে : 'জননী', 'বনি আদম', 'ক্রীতদাসের হাসি', 'সমাগম', 'বেড়ী', 'দুই সৈনিক', 'ক্ষুদে সোশ্যালিস্ট', 'চৌরসন্ধি', 'জাহান্নাম হতে বিদায়', 'রাজা উপাখ্যান', 'নেকড়ে অরণ্য', 'পতঙ্গপিঞ্জর', 'রাজসাক্ষী', 'জলাংগী', 'পুরাতন খঞ্জর' ইত্যাদি। 'জননী' উপন্যাস লিখেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গ্রাম্য জীবনের পটভূমিকায় রচিত এ উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতা ও সমাজচিত্রের রূপায়ণ লক্ষণীয়। লেখকের গভীর জীবনজিজ্ঞাসা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক হিসেবে এই উপন্যাস বিশিষ্ট। আঙ্গিকের কলাকৌশলের পরীক্ষানিরীক্ষায় শওকত ওসমান সফলকাম শিল্পী। 'ক্রীতদাসের হাসি' ও 'সমাগম' নতুন আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস দুটি তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'ক্রীতদাসের হাসি' প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস। 'দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস, গোলাম কেনা যায়, বান্দী কেনা সম্ভব—ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না।'—নায়কের এই উক্তি উপন্যাসের সারকথা। 'সমাগমে' শওকত ওসমান ফ্যান্টাসির জগতে পদচারী। 'রাজাউপাখ্যান' প্রতীকাশ্রয়ী হলেও গল্পরস প্রধান, পরিচর্যায় বিবরণধর্মী এবং নাট্যিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে তাঁর কতিপয় গ্রন্থ রচিত। বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালে স্বল্পসময়ে বাঙালির সংগ্রাম ও সাধনার পরিচয় লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনি কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। এতে সমকালীন জীবনের পরিচয় বিধৃত এবং এ ধরনের রচনার ক্ষেত্রে অনেকটা পথিকৃৎ রূপে তাঁর স্থান।

আকবর হোসেন

আকবর হোসেন (১৯১৫-৮১) কতিপয় উপন্যাস রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সাধারণ পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করার মত উপাদান তাঁর উপন্যাসে ছড়ানো। 'অবাঞ্ছিত', 'কি পাইনি', 'মোহমুক্তি', 'ঢেউ জাগে', 'দুদিনের খেলাঘর', 'মেঘ বিজলী বাদল', 'আলোছায়া', 'নতুন পৃথিবী' প্রভৃতি উপন্যাসে প্রেমের বিচিত্র কাহিনী সহজ সরলভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কাহিনীর উপাদেয়তা ও বর্ণনায় সরলতার জন্য এক শ্রেণির পাঠকের কাছে এসব রচনা হৃদয়গ্রাহী। সমসাময়িককালে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক রূপে তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল।

দৌলতুন্নেসা খাতুন

দৌলতুন্নেসা খাতুন (১৯১৮-৯৭) 'পথের পরশ' নামক সামাজিক উপন্যাস লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন। 'বধূর লাগিয়া' তাঁর অপর উপন্যাস।

আবু রুশদ

আবু রুশদ (১৯১৯) যে কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন তাতে তাঁর প্রতিভার উৎকর্ষের প্রকাশ ঘটেছে। 'এলোমেলো', 'সামনে নূতন দিন', 'ডোবা হল দীঘি', 'অনিশ্চিত রাগিণী', 'নোঙর', 'স্থগিত দ্বীপ' প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস। 'নোঙর' উপন্যাসটি তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। দেশবিভাগের পটভূমিকায় গ্রন্থটি রচিত এবং জাতীয় জীবনের বিশেষ আদর্শ তাতে প্রতিফলিত হয়েছে।

চরিত্রচিত্রণে এবং ভাষাব্যবহারে লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব বিদ্যমান। ছোটগল্প রচনাকারী হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। সাহিত্যসমালোচনা, আত্মজীবনী রচনা ও অনুবাদে তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে।

শামস রশীদ

শামস রশীদের (১৯২০-২০০২) উপন্যাসের নাম : 'উপল উপকূলে', 'নীলাঞ্জনা', 'প্রাণবসন্ত', 'হৃদয় উপবনে', 'পঞ্চালিকা', 'সিন্ধুবারোয়া', 'মনকোরক', 'মনপ্রসূন', 'পর্বত বুরুঞ্জী' ইত্যাদি। সংখ্যার দিক থেকে খুব বেশি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি নন, কিন্তু বিশিষ্টতার জন্য সেসব প্রশংসিত।

কাজী আফসারউদ্দিন আহমদ

কাজী আফসারউদ্দিন আহমদ (১৯২১-৭৫) বহু উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে : 'কলাবতী কন্যা', 'চরভাঙ্গা চর', 'নীড় ভাঙ্গা ঝড়', 'নোনাপানির ঢেউ', 'বাতাসী', 'সুরের আগুন' ইত্যাদি। পল্লীর জীবন ও সমাজ তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য। তাঁর কিছু গল্পগ্রন্থ ও প্রবন্ধ রয়েছে।

ড. নীলিমা ইব্রাহীম

ড. নীলিমা ইব্রাহীম (১৯২১-২০০২) গবেষণামূলক সাহিত্যসৃষ্টিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু গদ্যসাহিত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর উপন্যাসগুলো হচ্ছে : 'কেয়াবন সঞ্চারিণী', 'পথশ্রান্ত', 'বিশ শতকের মেয়ে', 'একপথ দুই বাঁক', 'বহ্নিবলয়' ইত্যাদি। সমসাময়িক জীবনের সমস্যা এইসব উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে।

মোজাহারুল ইসলাম

মোজাহারুল ইসলাম (১৯২১) 'সোনাঝরা দিন', 'কখনো অন্য মনে', 'আমার পৃথিবী তুমি', 'হৃদয়ের রং', 'হীরাঝিল', 'বেগম থেকে বাঈ', 'এক নায়ক দুই নায়িকা', 'আলো ঝরা রাত' ইত্যাদি উপন্যাসে সংসারের সাধারণ প্রেমপ্রীতির আলেখ্য অঙ্কন করেছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-৭১) প্রথমে 'লালসালু' নামক উপন্যাস লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে বাংলাদেশের উপন্যাসে 'আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও যথার্থ আধুনিক উপন্যাস লেখক' বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাহিত্যে যে সব উপন্যাস প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাদের মধ্যে 'লালসালু'র স্থান অনন্য। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় এই উপন্যাসটি রচিত। ধর্মের নামে স্বার্থান্ধ মানুষের কার্যকলাপ এখানে রূপলাভ করেছে। গ্রামবাংলার বাস্তব চিত্র হিসেবে এই উপন্যাসটি অত্যন্ত মূল্যবান। 'লালসালু' উপন্যাসের উপকরণ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে 'পশ্চাদপদ গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো লালিত

জীবন।' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং অভিনব আঙ্গিক প্রয়োগে বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন বলে স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেও বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর অপর দুটি উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ। দার্শনিক চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাস হিসেবে এগুলো বিবেচ্য। ভাষার কারুকার্যে, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায়, আঙ্গিকের সুষ্ঠু রূপায়ণে ও পটভূমির বৈচিত্র্যে লেখকের কৃতিত্ব বিদ্যমান। ছোটগল্প ও নাটক রচনায়ও তাঁর সমান দক্ষতা ছিল।

ইসহাক চাখারী

ইসহাক চাখারী (১৯২২) কয়েকটি উপন্যাসের রচয়িতা। 'পরাজয়', 'মায়ের কলঙ্ক', 'মেঘবরণ কেশ', 'বোবা জোয়ার' তাঁর উপন্যাসগুলোর নাম। সামাজিক জীবনের নানা সমস্যা তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। তিনি বক্তব্য সহজ সরল ভাবে পরিবেশন করে বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন।

সরদার জয়েনউদ্দিন

সরদার জয়েনউদ্দিন (১৯২৩-৮৬) ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসগুলোর নাম হচ্ছে : 'আদিগন্ত', 'নীল রং রক্ত', 'পান্নামোতি', 'অনেক সূর্যের আশা', 'বেগম শেফালী মির্জা', 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ', 'শ্রীমতী ক খ এবং শ্রীমান তালেব আলী', 'কদম আলীদের বাড়ি'। সমকালীন জীবনের সমস্যা তাঁর উপন্যাসে রূপ লাভ করেছে। 'আদিগন্ত' উপন্যাসটি সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গাবিরোধী সমাজসংস্কারমূলক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। 'নীল রং রক্ত' এ দেশে নীলকরদের অত্যাচারের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস। 'পান্নামোতি' সমাজের অভিজাত ও নিচুস্তরের মানুষের কাহিনী। 'অনেক সূর্যের আশা' লেখকের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় বিস্তৃত পরিসরে এই উপন্যাসটি রচিত। এ উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, মানুষের নৈতিক অধঃপতন, আর্থিক সংকট, মানুষের জীবনযুদ্ধের বহুভুজ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। চরিত্রচিত্রণ ও বর্ণনাভঙ্গি আকর্ষণীয়। 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' ভাষা আন্দোলনভিত্তিক মননশীল রাজনৈতিক উপন্যাস।

নূরুন নাহার

নূরুন নাহার (১৯২৩) 'বৈরাগীর আখড়া' ও 'জাঙ্গালের মেয়ে' উপন্যাস রচনা করেছেন।

বেদূঈন সামাদ

বেদূঈন সামাদ (১৯২৪-২০০১) 'দুই নদী এক ঢেউ', 'ধূমনগরী', 'নিষ্পত্তি', 'পথে যেতে যেতে', 'বেলাশেষে' প্রভৃতি উন্যাসের রচয়িতা।

খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস

খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯২৩-৯৫) আদর্শবাদী লেখক হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর 'কত ছবি কত গান' বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম

উপন্যাস। অসংখ্য ঘটনাবলীর মাধ্যমে সংগ্রামী মানুষের কথা এই উপন্যাসে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। তত্ত্বের প্রাধান্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। বিশেষ আদর্শ সামনে রেখে উপন্যাসটি রচিত। তাই এতে তত্ত্বকথার গুরুত্ব গল্পরসের প্রকাশ বাধাগ্রস্ত করেছে। সমকালীন রাজনীতি তাঁর রচনায় বিষয়বস্তু হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে।

রশীদ করীম

রশীদ করীম (১৯২৫) 'উত্তম পুরুষ' উপন্যাস রচনা করেই সাহিত্য পুরস্কার ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নগরজীবনের বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে এই উপন্যাসের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অন্যান্য জনপ্রিয় উপন্যাস হচ্ছে : 'প্রসন্ন পাষাণ', 'আমার যত গ্লানি' ও 'প্রেম একটি লাল গোলাপ'। এসব গ্রন্থেও নাগরিক জীবনের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। 'আমার যত গ্লানি' উপন্যাসটি একজন যন্ত্রণাক্লিষ্ট অধঃপতিত কিন্তু চৈতন্যমুখর আধুনিক মানুষের উপাখ্যান। 'মায়ের কাছে যাচ্ছি', 'একালের রূপকথা', 'পদতলে রক্ত', 'চিনি না', 'সাধারণ লোকের কাহিনী' তাঁর অপরাপর উপন্যাস।

আবদুর রাজ্জাক

এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক আবদুর রাজ্জাকের (১৯২৬-৮১) কথাও উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'কন্যা কুমারী'। 'ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য', অবক্ষয়ী গ্রামজীবন এবং আধুনিক শহরের বাহ্যিক জৌলুসের পটভূমিতে' এই উপন্যাস রচিত।

আবু ইসহাক

গ্রামবাংলার অনন্য চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) রচিত 'সূর্যদীঘল বাড়ি' উপন্যাসে। বাংলাদেশের সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র হিসেবে এ উপন্যাসের বিশেষ মর্যাদা। পঞ্চাশ সনের মন্বন্তর, দেশবিভাগ এবং স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নের আনন্দ ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উন্মূলিত-অস্তিত্ব মানুষের জীবনসংগ্রাম এই উপন্যাসে চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। একটি বিশিষ্ট সামাজিক উপন্যাস হিসেবে এই গ্রন্থের পরিচয়। সমালোচকেরা 'সূর্যদীঘল বাড়ি' উপন্যাসটিকে বিস্ময়কর, শিল্পকুশল, সার্থক সাহিত্য, স্মরণীয় সাহিত্য বলে আখ্যা দিলেও কেউ কেউ এটাকে স্কেচধর্মী রচনা বলে অভিহিত করেছেন। নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টি দিয়ে লেখক ঢাকা শহরের কাছের জীবনধারা, স্বাধীনতা উৎসব, ঈদ উদযাপন ইত্যাদির যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা গতিমান। গ্রামের দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে স্বার্থপর মানুষের অত্যাচার-উৎপীড়নের বাস্তব চিত্র এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। 'জীবন-নির্বাচনে সমকালমনস্কতা এবং রূপায়ণে বস্তুনিষ্ঠনিরাসক্তি এ উপন্যাসকে নবতর মাত্রা দান করেছে।' বাংলাদেশের উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে কয়টি গ্রন্থ বাস্তব জীবনের সার্থক চিত্রণের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত এ গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী (১৯২৬) কবিতা রচনা করেন। তিনি উপন্যাসও রচনা করেছেন। 'প্রেম পরিণয়', 'বান' তাঁর উপন্যাস।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-৯৭) উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গল্প রচনায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। 'আশিয়ানা','জীবনকাব্য', 'কাঞ্চনমালা', 'আলম নগরের উপকথা', 'দুই মহল', 'কাশবনের কন্যা', 'জায়জঙ্গল' প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস। বাংলাদেশের বিচিত্র মানুষের চিত্র রূপায়ণের জন্য যেসব উপন্যাসের বিশেষ খ্যাতি রয়েছে তাদের মধ্যে 'কাঞ্চনমালা' ও 'কাশবনের কন্যা' উপন্যাস দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেলে ও বেদেদের জীবনকাহিনী এগুলোতে রূপলাভ করেছে। এই শ্রেণির সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ আনন্দবেদনার বাস্তব চিত্র হিসেবে উপন্যাস দুটির মর্যাদা অত্যধিক। 'আলমনগরের উপকথা' উপন্যাসটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত। সুদক্ষ কথাশিল্পীর কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে লেখকের গ্রন্থগুলো পাঠকহৃদয় জয় করে নিয়েছে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে : 'নবান্ন', 'সমুদ্র বাসর', 'যার সাথে যার', 'মনের মত ঠাঁই' ইত্যাদি।

শহীদুল্লা কায়সার

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-৭১) ঔপন্যাসিক হিসেবে পুরস্কৃত ও খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর মাত্র দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেই স্বল্পতার মধ্যেই তাঁর অপরিসীম কৃতিত্ব প্রকাশিত। তাঁর 'সারেং বৌ' গ্রন্থে সমুদ্র উপকূলের নাবিকদের জীবনকাহিনী রূপ দেওয়া হয়েছে। বাস্তব চিত্র হিসেবে এর মর্যাদা অনেক। 'বিষয়কল্পনা ও জীবনজিজ্ঞাসার বিচারে সারেং বৌ এক অনবদ্য সৃষ্টি।' 'সংশপ্তক' উপন্যাসের বিরাট কলেবরে গ্রাম ও নগর জীবনের পরিচয় প্রকাশমান। এই উপন্যাসে যুগচেতনা, শিল্পচেতনা এবং জীবনচেতনার সমন্বয় ঘটেছে। উপন্যাসটি এপিকধর্মী। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা এবং আকর্ষণীয় গল্পরস সৃষ্টিতে কৃতিত্ব থাকার ফলে তাঁর উপন্যাস সংখ্যায় কম হলেও সার্থকতার নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত। পাঠক হৃদয় জয় করার বিরল ক্ষমতা তাঁর উপন্যাসে রয়েছে। সমালোচকের মতে, 'জীবনাদর্শ ও শিল্পনির্মিতি উভয় মানদণ্ডেই সংশপ্তক বাংলা উপন্যাসের ধারায় এক অসামান্য সংযোজন।'

রোমেনা আফাজ

রোমেনা আফাজ (১৯২৬) অনেকগুলো উপন্যাস রচনা করেছেন। 'কাগজের নৌকা', 'জানি তুমি আসবে', 'প্রিয়ার কণ্ঠস্বর', 'লেখকের স্বপ্ন', 'সোনালী সন্ধ্যা', 'হারানো মাণিক' প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস। রহস্যোপন্যাস রচনায়ও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

মেসবাহুল হক

মেসবাহুল হক (১৯২৭) 'পূর্বদেশ' নামে সুবৃহৎ উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাসটি ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী এর উপজীব্য। 'আরেক পৃথিবী', 'শতাব্দীর ডাক' তাঁর অপরাপর উপন্যাস।

আনোয়ার পাশা

আনোয়ার পাশা (১৯২৮-৭১) বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। উপন্যাস রচনায় তাঁর কৃতিত্ব বিদ্যমান। 'নিষুতি রাতের গাথা', 'নীড়সন্ধানী' ও 'রাইফেল রোটি আওরাত' তাঁর উপন্যাস। শেষোক্ত উপন্যাসটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত। সংগ্রামের কিছু দিনের লেখকের মর্মান্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতার চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসটি 'আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার বস্তুনিষ্ঠশিল্পরূপ।' বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে লেখক বাঙালির দুঃখ-বেদনা ও আশা-এষণার শিল্পরূপ এক অপরূপ সাহিত্যকর্ম হিসেবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

আনিস চৌধুরী

আনিস চৌধুরী (১৯২৯-৯০) কতিপয় উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের নাম 'সখের পুতুল', 'সরোবর', 'সৌরভ', 'মধুগড়', 'ঐ রকম একজন', 'ময়নামতী' ইত্যাদি। আধুনিক জীবনের জটিলতা, হৃদয়ের দ্বন্দ্ব এই সব উপন্যাসের বিষয়বস্তু। মধ্যবিত্ত মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দুঃখ-দারিদ্র্য ও সংগ্রামী চেতনা তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। নাট্যরচনাতেও তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

মোহাম্মদ মোর্তজা

মোহাম্মদ মোর্তজা (১৯৩১-৭১) 'চরিত্রহানির অধিকার' নামে একটি বিশিষ্ট উপন্যাস রচনা করেছিলেন। অনুবাদেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শোষিত-নিপীড়িত জনগণের মুক্তির নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। তিনি সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি ও চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

আতাহার আহমদ

আতাহার আহমদ কয়েকটি বিশিষ্ট উপন্যাসের রচয়িতা। 'উন্মোচন', 'পিপাসা', 'সূর্যের নিচে' তাঁর উপন্যাসের নাম। এসব উপন্যাসে সমকালীন জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। নাগরিক জীবনের জটিলতা উপন্যাসগুলোতে বিধৃত।

নাজমুল আলম

নাজমুল আলম (১৯২৭) 'নিশি হলো ভোর', 'সন্ধ্যারাগ', 'ফুলমতি', 'অলৌকিক' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেছেন। নাট্যকার ও ছোটগল্পকার হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন।

রাজিয়া মজিদ

রাজিয়া মজিদ (১৯৩০) উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের নাম : 'তমসা বলয়', 'দিগন্তের স্বপ্ন', 'মেঘের জলতরঙ্গ', 'নক্ষত্রের পতন', 'দাঁড়িয়ে আছি একা', 'সেই তুমি', 'অশঙ্কিনী সুদর্শনা', 'দিনের আলো রাতের আঁধার', 'এই মাটি এই প্রেম', 'অরণ্য জনতা', 'শতাব্দীর সূর্যশিখা', 'সুন্দরতম', 'জ্যোৎস্নায় শূন্য মাঠ', 'অন্তরলোকে জ্বলে জোনাকী', 'বৃষ্টি ভেজা মুখ', 'ভালবাসার সেই মুখ', 'যুদ্ধ ও ভালবাসা' ইত্যাদি।

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক প্রবন্ধ প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ব্যতিক্রমধর্মী ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়ে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম ছোটগল্প গ্রন্থ 'জেগে আছি'-এর মাধ্যমে তিনি অনন্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব বিদ্যমান। 'কর্ণফুলী' উপন্যাসটি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত। এই গ্রন্থে তিনি কর্ণফুলী নদী তীরের চট্টগ্রামের উপজাতীয় জীবনের কিছু চিত্র অঙ্কন করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব জনগণের ওপর পড়ে। তার ফলে মানুষের জীবনে আসে সঙ্কট— স্বার্থলোলুপ মানুষের হাত পড়ে অসহায় মানুষের ওপর। জীবনের আনন্দবেদনার চিত্রই এই উপন্যাসের উপজীব্য। এই উপন্যাসে লেখক আঞ্চলিক লোকজীবন ও তার ভাষার পরিচয় দানের চেষ্টা করলেও তা যথার্থ আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠে নি। বরং বাইরের জগতের অভিঘাত-সংঘাতে আঞ্চলিক জীবনের রূপের কি ধরনের রূপান্তর ঘটতে পারে তা এখানে দেখানো হয়েছে। 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' গ্রন্থে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' উপন্যাসে যৌনচেতনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসটিতে রূপায়িত হয়েছে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত সামাজিক অবস্থায় সংগ্রামী মানুষের চিত্র। উপন্যাসটি 'মানবিক মূল্যবোধ ও তীক্ষ্ণ জীবনচেতনায় সমৃদ্ধ।' 'গ্রামজীবনের বৈচিত্র্যে শহর জীবনের অন্ধকার রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং একটি বিশেষ যুগের সার্বিক পরিচয় 'ক্ষুধা ও আশায়' সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের বস্তুনিষ্ঠা জীবনবোধ ও মনোবিশ্লেষণী অন্তরঙ্গতার স্বাক্ষর 'ক্ষুধা ও আশা।' তাঁর অন্যান্য উপন্যাস : 'খসড়া কাগজ', 'শ্যামল ছায়ার সংবাদ', 'জ্যোৎস্নার অজানা জীবন', 'যেখানে দাঁড়িয়ে আছি', 'পাটরানী', 'স্বাগতম ভালোবাসা', 'অপর যোদ্ধারা', 'পুরানা পল্টন', 'অন্তরীক্ষ বৃক্ষ রাজি', 'প্রিয় প্রিন্স', 'পুরুদ্রজ', 'ক্যামপাস', 'অনূদিত অন্ধকার', 'স্বপ্নশিলা', 'কালো জ্যোৎস্নার চন্দ্রমল্লিকা', 'বিশৃঙ্খলা' ইত্যাদি।

জহির রায়হান

জহির রায়হান (১৯৩৩-৭২) উপন্যাস রচনায় উৎকর্ষপূর্ণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'শেষ বিকেলের মেয়ে', 'আরেক ফাল্গুন', 'বরফ গলা নদী', 'আর কত দিন', 'হাজার বছর ধরে', 'কয়েকটি মৃত্যু' ও 'তৃষ্ণা' তাঁর উপন্যাস। শেষোক্ত উপন্যাস

দুটি তাঁর মৃত্যুর পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। জহির রায়হানের অধিকাংশ উপন্যাসে আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্বসংঘাতময় নাগরিক জীবনের কথা রূপায়িত হয়ে উঠেছে। 'হাজার বছর ধরে' শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে পুরস্কৃত। বাংলার পল্লীর পরিসরে যে জীবনধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে তারই রসমধুর বাস্তবচিত্র এই উপন্যাসটি। লেখকের আকর্ষণীয় বর্ণনাভঙ্গি পাঠককে সহজেই বিমুগ্ধ করে। এই উপন্যাস সম্পর্কে ড. রফিকুল্লাহ খান তাঁর 'বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ' অভিসন্দর্ভে মন্তব্য করেছেন, 'বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনবাস্তবতার সুদীর্ঘ পরিসর উপজীব্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে। জীবনের এই আয়তন-কল্পনার পেছনে ঔপন্যাসিকের রোমান্টিক মন-মানসিকতার ভূমিকাই মুখ্য। যে কারণে, আবহমান বাংলা ও বাঙালির চলমান জীবনরূপ আবেগী শব্দরূপায়ণের মধ্যেই হয়ে পড়েছে সীমাবদ্ধ। তবে দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ময় বিন্যাসে হাজার বছরের মন্থর জীবনস্রোতের মধ্যেও তরঙ্গিত হয়েছে মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা—অচরিতার্থতা-বেদনার রূপ-বৈচিত্র্য।' তাঁর কোন কোন রচনার অবয়ব সংক্ষিপ্ত কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব, বর্ণনার আকর্ষণীয়তা এবং চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সমাদৃত করেছে। জহির রায়হান জীবনবোধে রোমান্টিক, দৃষ্টিতে আবেগপ্রবণ ও চিত্রাত্মক।

আবদুল গাফফার চৌধুরী

আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩৪) কথাসাহিত্যিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতিমান। তাঁর উপন্যাস হচ্ছে : 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান', 'নাম না জানা ভোর', 'নীলযমুনা', 'শেষ রজনীর চাঁদ'। 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান' উপন্যাসটি ঐতিহাসিক চেতনায় সমৃদ্ধ, কিন্তু গ্রামজীবনকেন্দ্রিক এর কাহিনী। এই উপন্যাসটিতে আছে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ সম্বলিত শ্রেণিচেতনার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু আবদুল গাফফার চৌধুরী মনে বুর্জোয়া রোমান্টিক এবং মানবতাবাদী; মননে শ্রেণিসচেতন। 'উপন্যাসে চন্দ্রদ্বীপ এমন একটি নিসর্গশোভাসমৃদ্ধ স্থান সেখানে 'চারিদিকে বঙ্গোপসাগরের জলকল্লোল, আকাশে অনিয়ম প্রকৃতির নির্মম বিধাতার মত রাজত্ব, আর নিচে জমিদারের বংশগত, চিরাচরিত শাসন ও শোষণ, চন্দ্রদ্বীপের মানুষ একেই পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবন বলে জানে।' এই পটভূমিকায় লেখক বাংলাদেশের সমাজ বিকাশের ধারা রূপ দিয়েছেন। 'নাম না জানা ভোর' সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য।

সৈয়দ শামসুল হক

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫) উপন্যাসে যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। 'অনুপম দিন', 'এক মহিলার ছবি', 'দেয়ালের দেশ', 'সীমানা ছাড়িয়ে', 'খেলারাম খেলে যা', 'দূরত্ব' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এসব উপন্যাসে জৈবিক প্রবৃত্তির পরিচয় স্পষ্ট। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো অন্তর্দ্বন্দ্বে সুতীব্র; ভাষা সাবলীল ও বেগবান। তাঁর রচনায় আছে পরীক্ষানিরীক্ষার নিদর্শন। 'কয়েকটি মানুষের সোনালী যৌবন', 'তুমি সেই তরবারী', 'ত্রাহী', 'স্তব্ধতার অনুবাদ', 'এক যুবকের ছায়াপথ', 'বারো দিনের শিশু', 'বনবালা কিছু টাকা ধার নিয়েছিল',

'কালধর্ম', 'নিষিদ্ধ লোবান', 'নীলদংশন' ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস। 'বাংলাদেশের বিকাশশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের বহুভঙ্গিমা জটিলতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাসসমূহে। জীবনের উপরিতলের পরিবর্তে মনো-অন্বেষাই সৈয়দ শামসুল হকের বৈশিষ্ট্য।'

রাবেয়া খাতুন

রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫) 'অনন্ত অন্বেষা', 'মধুমতী', 'মন এক শ্বেত কপোতী', 'রাজারবাগ শালিমারবাগ', 'সাহেব বাজার' ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করে মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস : 'ফেরারী সূর্য', 'অনেক জনের একজন', 'জীবনের আর এক নাম দিবসরজনী', 'বায়ান্ন গলির এক গলি', 'বাগানের নাম মালনিছড়া', 'এই বিরহকাল', 'ই ভরা বাদর মাহ ভাদর', 'প্রিয় গুলশানা' ইত্যাদি।

শহীদ আখন্দ

শহীদ আখন্দ (১৯৩৫) 'পান্না হলো সবুজ', 'পাখির গান বনের ছায়া', 'দু দণ্ড শান্তি', 'একদা এক বসন্তে', 'সেই পাখি', 'আপন সৌরভ', 'ভালবাসায় বসবাস', 'এইখানে কখনো', 'আবার আসিব', 'কখন কে জানে' প্রভৃতি উপন্যাসের রচয়িতা। মানব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র এসব উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

রাজিয়া খান

রাজিয়া খান (১৯৩৬) 'অনুকল্প', 'বটতলার উপন্যাস', 'চিত্রকাব্য', 'প্রতিচিত্র', 'হে মহাজীবন', 'দ্রৌপদী', 'পদাতিক' নামক উপন্যাস রচনা করেছেন। এই সকল উপন্যাসে 'আধুনিক নিঃসঙ্গতা, শূন্যতাবোধ, প্রেম এবং সংস্কারের দ্বন্দ্ব' রূপায়িত হয়েছে।

শওকত আলী

শওকত আলী (১৯৩৬) 'পিঙ্গল আকাশ' (১৯৬৩) উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন। এ উপন্যাসে নারীহৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'যাত্রা', 'গন্তব্যে অতঃপর', 'ওয়ারিশ', 'দক্ষিণায়নের দিন', 'কুলায় কালস্রোত', 'পূর্বরাত্রি পূর্বদিন', 'উত্তরের খেপ', 'পতন', 'প্রেমকাহিনী', 'দলিল' 'প্রদোষে প্রাকৃতজন', 'অপেক্ষা', 'সম্বল', 'ভালোবাসা কারে কয়', 'যেতে চাই', 'বাসর ও মধুচন্দ্রিমা' ইত্যাদি তাঁর উপন্যাস।

আল মাহমুদ

আল মাহমুদ (১৯৩৬) 'উপমহাদেশ', 'কাবিলের বোন', 'ডাহুকী', 'ময়ূরীর সুখ', 'দিন যাপন', 'কবি ও কোলাহল', 'যে ভাবে বেড়ে উঠি' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস : 'নিশিন্দা নারী', 'আগুনের মেয়ে', 'পুরুষ সুন্দর', 'পুত্র' ইত্যাদি।

বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ

বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ্ (১৯৩৪) বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন। 'প্রত্যাবর্তন', 'কাজল দীঘির উপকথা', 'বরবর্ণিনী', 'বনচন্দ্রিকা', 'সমুদ্রের ঢেউ', 'নূপুর নিক্কণ', 'আজকের পৃথিবী', 'নিরুত্তর', 'আমার সংসার', 'মাথুরের পথ', 'জীবনের পাতা থেকে', 'বড়বাড়ি কথা', 'ডাঃ প্রিন্স', 'সমুদ্রের ঢেউ' প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস।

দিলারা হাসেম

দিলারা হাসেমের (১৯৩৬) 'ঘর মন জানালা' উপন্যাসে নগরজীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর অপরাপর উপন্যাস 'আমলকীর মৌ', 'একদা এবং অনন্ত', 'স্তব্ধতার কানে কানে', 'বাদামী বিকেলের গল্প', 'কাকতালীয়', 'মিউর‍্যাল', 'শঙ্খকরাত', 'অনুক্ত পদাবলী', 'সদর অন্দর' ইত্যাদি।

রিজিয়া রহমান

রিজিয়া রহমান (১৯৩৯) উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হচ্ছে : 'ঘর ভাঙা ঘর', 'উত্তরপুরুষ', 'রক্তের অক্ষর', 'বং থেকে বাংলা' 'অরণ্যের কাছে', 'শিলায় শিলায় আগুন', 'অলিখিত উপন্যাস', 'ধবল জ্যোৎস্না', 'সূর্য সবুজ রক্ত', 'শুধু তোমার জন্য', 'একটি ফুলের জন্য', 'প্রেম আমার প্রেম', 'একাল চিরকাল', 'ঝড়ের মুখোমুখি', 'হারুন ফেরে নি', 'হে মানব মানবী' ইত্যাদি।

রাহাত খান

রাহাত খান (১৯৪০) 'হে অনন্তের পাখি', 'হে শূন্যতা', 'অমল ধবল চাকরি', 'এক প্রিয়দর্শিনী' ইত্যাদি উপন্যাসের রচয়িতা। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস 'ছায়াদম্পতি', 'সংঘর্ষ', 'শহর', 'আকাঙ্ক্ষা', 'কয়েকজন', 'অগ্নিদাহ' ইত্যাদি।

মকবুলা মনজুর

মকবুলা মনজুর (১৯৩৮) রচিত উপন্যাসের নাম 'আর এক জীবন', 'জল রং ছবি', 'বৈশাখে শীর্ণ নদী', 'অবসন্ন গান' 'আত্মজ ও আমরা', 'পতিতা পৃথিবী', 'প্রেম এক সোনালী নদী', 'শিয়রে নিয়ত সূর্য', 'অচেনা নক্ষত্র', 'কনে দেখা আলো', 'নদীতে অন্ধকার', 'লীলাকমল', 'কালের মন্দিরা' ইত্যাদি।

মাহমুদুল হক

মাহমুদুল হক (১৯৪০-২০০৮) উপন্যাস সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর রচিত উপন্যাস 'যেখানে খঞ্জনা পাখি', 'নিরাপদ তন্দ্রা', 'জীবন আমার বোন', 'অনুর পাঠশালা', 'কালো বরফ চিক্কোর কাবুল', 'খেলাঘর', 'মাটির জাহাজ' ইত্যাদি।

মাহবুব তালুকদার

মাহবুব তালুকদারের (১৯৪০) উপন্যাসের নাম 'ক্রীড়নক', 'অবতার'। সমাজ ও জীবনসচেতন উপাখ্যান হিসেবে এগুলোর গুরুত্ব। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস : 'অপলাপ', 'আরেকজন আমি', 'পলাশ ও শিমুলের গল্প', 'বন্ধভূমি' ইত্যাদি।

আমজাদ হোসেন

আমজাদ হোসেন (১৯৪২) উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস 'অস্থির পাখিরা', 'আমি এবং কয়েকটি পোস্টার', 'নিরক্ষর স্বর্গে', 'উঠোন', 'অবেলায় অসময়', 'মাধবীসংবাদ', 'মাধবীর মাধব', 'মাধবী ও হিমানী', 'আগুন লাগা সন্ধ্যা', 'শেষরজনী', 'কেউ কোনদিন', 'যুদ্ধে যাবো', 'যুদ্ধ যাত্রার রাত্রি', 'গোলাপী এখন ট্রেনে' ইত্যাদি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

আখতরারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-৯৭) 'চিলে কোঠার সেপাই' উপন্যাস রচনা করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। 'খোয়াবনামা' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

আহমদ ছফা

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১) 'সূর্য তুমি সাথী'. 'ওঙ্কার', 'একজন আলি কেনানের উত্থান পতন', 'মরণবিলাস', 'অলাতচক্র', 'গাভি বিত্তান্ত', 'অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী', 'পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গপুরাণ' ইত্যাদি উপন্যাসের রচয়িতা।

সেলিনা হোসেন

সেলিনা হোসেন (১৯৪৭) 'উত্তর সারথি', 'জলোচ্ছ্বাস', 'জ্যোৎস্নায় সূর্যজ্বালা', 'পদশব্দ', 'হাঙর নদী গ্রেনেড', 'মগ্ন চৈতন্যে শিস', 'যাপিত জীবন', 'নীল ময়ূরের যৌবন', 'চাঁদ বেনে', 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি', 'কাঁটাতারে প্রজাপতি', 'ভালোবাসা প্রীতিলতা', 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি', 'ক্ষরণ', 'খুন ও ভালোবাসা', 'কালকেতু ও ফুল্লরা', 'টানাপড়েন', 'গায়ত্রীসন্ধ্যা-এক', গায়ত্রীসন্ধ্যা-দুই', 'গায়ত্রীসন্ধ্যা-তিন', 'দীপান্বিতা', 'যুদ্ধ' ইত্যাদি উপন্যাসগুলো রচনা করেছেন।

বুলবুল চৌধুরী

বুলবুল চৌধুরী (১৯৪৭) উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস 'কহ কামিনী', 'পাপপুণ্যি', 'জলটুঙ্গি', 'ঘরবাড়ি', 'দম্পতি', 'বলো কি অনুভব' 'যাও পাখি বলো তারে', 'অপরূপ বিল ঝিল নদী', 'খাটের বাও' প্রভৃতি।

হুমায়ূন আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাংলাদেশে সমকালে সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ। সংখ্যার আধিক্যে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, কাহিনী রূপায়ণে, ভাষার মাধুর্যে হুমায়ূন আহমেদ অনন্য। চরিত্র চিত্রণের আশ্চর্য দক্ষতা তাঁর রচনায় পরিলক্ষিত হয়। রসমধুর করে গল্প পরিবেশন করা তাঁর অনন্য গুণ। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের চিরপরিচিত আলেখ্য তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য। কাহিনী উপস্থাপনায় তাঁর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ভাষা ব্যবহারে সারল্য তাঁর বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তাঁর উপন্যাসগুলোর নাম : নন্দিত নরকে (১৯৭২), শঙ্খনীল কারাগার, শ্যামল ছায়া, নির্বাসন, অচিনপুর, সৌরভ, অন্যদিন, এই বসন্তে, সবাই গেছে

বনে, তারা তিনজন, তোমাকে, একাএকা, অমানুষ, প্রথম প্রহর, আমার আছে জল, দেবী, ১৯৭১, ফেরা, মহাপুরুষ, সূর্যের দিন, আগুনের পরশমণি, দূরে কোথায়, নক্ষত্রের রাত, অন্যভুবন, নিশীথিনী, অরণ্য, আকাশজোড়া মেঘ, ইরিনা, অপরাহ্ন, অনন্ত নক্ষত্রবীথি, সম্রাট, প্রিয়তমেষু, বাসর, পুতুল, বৃহন্নলা, দ্বৈরথ, সাজঘর, অন্ধকারের গান, রজনী, নিষাদ, চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক, সমুদ্র বিলাস, জনম জনম, দিনের শেষে, কোথাও কেউ নেই, এইসব দিনরাত্রি, গৌরীপুর জংশন, ময়ূরাক্ষী, অয়োময়, আমাদের শাদা বাড়ি, বহুব্রীহি, মন্দ্রসপ্তক, নীল অপরাজিতা, কুহক, দুই দুয়ারী, ভয়, দারুচিনি দ্বীপ, একজন মায়াবতী, আশাবরী, কৃষ্ণপক্ষ, পাখি আমার একলা পাখি, অনিল বাগচীর একদিন, দরজার ওপাশে, মিসির আলীর অমিমাংসিত রহস্য, জলপদ্ম, আয়না ঘর, হিমু, তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে, মেঘের ছায়া, জয়জয়ন্তী, পেন্সিলে আঁকা পরী, সেও নর্তকী, শুভ্র, 'বিরহ গাথা', 'আজ হিমুর বিয়ে', 'মেঘের ছায়া', 'হলুদ হিমু কালো র‍্যাব', 'লিলুয়া বাতাস', 'কুহুরানী', 'জোছনা ও জননীর গল্প' ইত্যাদি।

ইউসুফ শরীফ

ইউসুফ শরীফ (১৯৪৮) উপন্যাস ছোটগল্প ও ভ্রমণকাহিনী রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের নাম : 'গ্রহণ', 'শুধু বাঁশি শুনেছি', 'স্বপ্নের চারুলতা', 'পরম মাটি', 'নদীর মতো', 'তোমাকেই শুধু', 'সেই মেয়েটি' ইত্যাদি। এসব উপন্যাসে তিনি যেমন সমকালীন জীবন জিজ্ঞাসা ও মানব মানবীয় হৃদয়ানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি আকর্ষণীয় গল্পরস সৃষ্টিতে উপাদেয় প্রকাশভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমদাদুল হক মিলন

ইমদাদুল হক মিলন (১৯৫৫) বাংলাদেশের উপন্যাসে একটি বিশেষ জনপ্রিয় আসন অলংকৃত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর রচনায় আছে প্রাচুর্য, কাহিনী বর্ণনায় আছে আকর্ষণীয়তা।

ইমদাদুল হক মিলন 'অভিমানপর্ব', 'দিনগুলি', 'নায়ক', 'যাবজ্জীবন', 'ও রাধা ও কৃষ্ণ', 'তোমাকে ভালোবাসি', 'মেয়েমানুষ', 'ভূমিকা', 'যা কিছু', 'ভালোবাসা', 'হে প্রেম', 'দ্বিতীয় প্রেম', 'যৌবনকাল', 'নিরাপত্তা হই', 'উপনায়ক', 'বালকের অভিমান', 'বনমানুষ', 'সম্পর্ক', 'পরকীয়া', 'প্রেম ভালোবাসা', 'সখা তুমি সখি তুমি', 'আজকের দেবদাস', 'রাত বারোটা', 'কালোঘোড়া', 'টোপ', 'কালাকাল', 'স্বামী স্ত্রী', 'রূপনগর', 'সুন্দরী কমলা', 'নদী উপাখ্যান', 'কথা ছিল', 'দুজনে', 'প্রেমেবিরহে', 'মহাযুদ্ধ', 'পরাধীনতা', 'দেখা হবে', 'স্বপ্ন', 'প্রিয়জন', 'বলো তারে', 'বহুদূর', 'দুঃখকষ্ট', 'রাজাকারতন্ত্র', 'দ্বিতীয় পর্বের শুরু', 'আমার মেয়ের সংসার', 'যত দূরে যাই', 'সারাবেলা', 'তাহারা', 'ভূমিপুত্র', 'প্রেমনদী', 'বালিকারা', 'প্রেমিক প্রেমিকা', 'অদ্বিতীয়া', 'মধুরাত', 'প্রিয়দর্শিনী', 'পিঞ্জর', 'যাও তুমি ফিরে', 'অপহরণ', 'একজনা', 'সাঁঝবেলাতে', 'তুমি আমার', 'ভালোবাসা নাও', 'কুসুমকাহিনী', 'বিরহী', 'বিচ্ছেদ', 'দুই প্রেম', 'পাশাপাশি', 'আড়াল', 'মনে রেখো', 'পরিচয়', 'যে ছিল আমার', 'আশায় আশায় থাকি', 'তুমি কেমন আছো', 'ভালোবাসা ভালো নয়', 'পরবাস', 'বাঁকা জল',

'ভালবাসার সুখদুঃখ', 'সুপুরুষ', 'নারীপুরুষ', 'চরিত্র', 'মন', 'এসো হাত ধরো', 'খুঁজে বেড়াই তাকে', 'মন কেমন করে', 'কেমন আছো সবুজ পাতা' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

মঞ্জু সরকার

মঞ্জু সরকার (১৯৬০) গল্প ও উপন্যাস রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। উপন্যাস রচনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 'তমস' (১৯৮৪), 'নগ্ন আগন্তুক', 'প্রতিমা উপাখ্যান', 'দাঁড়াবার জায়গা', 'আবাসভূমি', 'ভাঙনের সময় ভালবাসা', 'অমৃতা', 'স্বপ্নচোর', 'যমুনা', 'অবগুণ্ঠন' ইত্যাদি।

শিরীন আখতার

শিরীন আখতার (১৯৫৬) 'অবাক পৃথিবী', 'নন্দিনী থামো', 'অথচ পবিত্র', 'ক্ষুদিরাম যুগে যুগে', 'গোলাপী বারুদে নূর হোসেন', 'সূর্যের চোখে জল', 'আবার আসিব ফিরে', 'স্বর্গ থেকে ফেরা', 'রাতের অতিথি', 'তবুও বেঁচে আছি', 'পরমা', 'প্রিয় বান্ধবী', 'কাজলের স্বাধীনতা', 'তোমার জন্যে', 'অনন্তের পাখিরা', 'অভিমান', 'অপু বিজয় দেখেনি', 'উনিশ শ একাত্তর' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

মঈনুল আহসান সাবের

মঈনুল আহসান সাবের (১৯৫৮) 'পাথর সময়', 'চার তরুণ তরুণী', 'এক রাত', 'না', 'এসব কিছুই না', 'কয়েকজন অপরাধী', 'আগামী দিনের গল্প', 'আদমের জন্য অপেক্ষা', 'পরাজয়', 'এ এক জীবন', 'পরাস্ত সহিস', 'মামুলী ব্যাপার', 'কেউ জানে না', 'কবেজ লেঠেল', 'সতের বছর পর', 'ফেরা হয় না', 'অগ্নিগিরি', 'নীল খাম', 'স্বজন', 'দুপুর বেলা', 'হারানো স্বপ্ন', 'অপরাজিতা', 'কয়েকটি প্রেমপত্র', 'এক ঝলক', 'তুমি আমাকে নিয়ে যাবে', 'সুদূর', 'প্রেম ও প্রতিশোধ' ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

নাসরিন জাহান

নাসরিন জাহান (১৯৬৪) কথাসাহিত্যিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ছোটদের জন্যও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি প্রশংসনীয়। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হল 'উড়ুক্কু' (১৯৮৩), 'চন্দ্রের প্রথম কলা', 'যখন চারপাশের বাতিগুলো নিভে আসছে', 'সোনালি মুখোশ', 'লি', 'বৈদেহী', 'কুয়াশার কণা', 'ঈশ্বরের বামহাত', 'উড়ে যায় নিশিপক্ষী' ইত্যাদি।

বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় অসংখ্য ঔপন্যাসিক নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রকাশের সাধনায় বর্তমানে লিপ্ত। তাঁদের অনেকেই নবাগত। নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের সৃষ্টিধারার অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। তাঁদের গতিপথ বিস্তীর্ণ এবং সম্মুখে প্রচুর সম্ভাবনাও বিদ্যমান। তাঁদের দৃষ্টিতে নতুন আশার আলো—প্রাণে সীমাহীন ঐশ্বর্য। তাই এখানকার সাম্প্রতিক কালের উপন্যাস সাহিত্যের সাধকগণের অনেকের প্রচেষ্টায় উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ছোটগল্প

বাংলাদেশের ছোটগল্পের ইতিহাস সময়ের স্বল্পতার মধ্যে সমৃদ্ধির পর্যায়ে অগ্রসর হচ্ছে। কয়েকজন প্রতিশ্রুতিশীল ছোটগল্পকারের আবির্ভাবের ফলে এখানকার গল্পে উৎকর্ষের পরিচয় প্রকাশমান। তাই একই লেখকের লেখনী উপন্যাস ও ছোটগল্প—এই উভয় শাখাতেই কৃতিত্বের পরিচয় দান করে। এখানকার যেসব ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের প্রায় সবাই গল্প রচনাতেও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছেন। কথাসাহিত্যের এই উভয় শাখা লেখকদের কাছে সমাদৃত বলে এখানকার উপন্যাসের মতই ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হচ্ছে।

বর্তমান ছোটগল্পের ইতিহাস বিভাগপূর্ব কালের ঐতিহ্যের অনুসারী। প্রবীণ ছোটগল্পকারগণ দেশবিভাগের আগেই গল্পরচনায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাই এখানকার ছোটগল্পের ইতিহাস উপন্যাস সাহিত্যের মত বিভাগপূর্ব কাল থেকেই বিচার্য। অবশ্য দেশবিভাগের পরবর্তী পর্যায়ে ছোটগল্পের ইতিহাস দ্রুত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। নিজস্ব সাহিত্যের স্বতন্ত্র পরিসরে অসংখ্য গল্পকারের আবির্ভাবও লক্ষণীয়। সাধারণত পত্রপত্রিকার প্রয়োজন মিটানোর জন্য গল্পের রচনায় প্রাচুর্য আসে। বর্তমানে অস্তিত্বহীন এমন অজস্র পত্রপত্রিকা এ দেশে প্রকাশিত হয়েছিল। এদের প্রয়োজনে এখানে অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টি হয়েছে। এখানকার ছোটগল্প নিরীক্ষাধর্মী। ছোটগল্পের গতানুগতিক আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের এদিক ওদিক পদচারণায় চেষ্টা রয়েছে; তবে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এখনও অনুপস্থিত।

ছোটগল্প তার নিজস্ব আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করে। স্বল্প পরিসরে বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ-সম্ভাবনাকে এদেশের লেখকগণ যথেষ্ট কাজে লাগিয়েছেন এবং এখনও উদ্যোগের অভাব নেই। ছোটগল্পে সমকালীন জীবনই প্রাধান্য লাভ করে। সেজন্য মানুষের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ছোটগল্পের অনুরাগী পাঠকের অভাব নেই। ছোটগল্পে আছে বাস্তব জীবনের সফল প্রতিফলন। বাংলাদেশের স্বতন্ত্র পরিসরে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস যথার্থই সম্ভাবনাময়।

এখানকার জীবনের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে গল্পের বিষয়েও এসেছে বৈচিত্র্য। একদিন বাংলার পল্লীর প্রকৃতি আর মানুষ গল্পে স্থান পেয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে নগরমুখী মানুষের সুখদুঃখ আনন্দবেদনা হয়েছে ছোটগল্পের উপজীব্য। কৃষিভিত্তিক জীবনাচরণে এসেছে শিল্পের প্রভাব। আধুনিক জীবনের নানা সমস্যা এখন চারদিকে প্রকট। ছোটগল্প এসব কোন কিছু উপেক্ষা করতে পারে না বলে বাংলাদেশের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিষয় নির্বাচনে এখানকার গল্পকারগণ ব্যতিক্রমধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন। শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র ছোটগল্পে এখন সহজলভ্য। জীবনঘনিষ্ঠতার জন্য এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান। মুক্তিযুদ্ধের ফলে জীবনে ও সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তা ছোটগল্পকারগণ উপেক্ষা করেন নি। তাই এখানকার কিছু কিছু গল্পে সেসবের চিত্র

রূপায়িত হয়েছে। তবে সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন যেমন গল্পে বিধৃত তেমনি নগরকেন্দ্রিক জীবনের বিভিন্ন দিকও এখানকার গল্পে প্রতিফলিত। বরং সাম্প্রতিক গল্পে শেষোক্ত পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যই বেশি লক্ষণীয়।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে তার প্রেক্ষিতে সাহিত্যসৃষ্টিতেও এসেছে নতুনত্ব—বিষয় নির্বাচনে ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় সে নতুনত্ব প্রতিনিয়ত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের ছোটগল্প তারই সার্থক পরিচয় বহন করছে।

বাংলাদেশের ছোটগল্পে প্রবীণ গল্পকারগণ অবিভক্ত বাংলার ছোটগল্পের ঐতিহ্যের অনুসারী ছিলেন। তাঁদের গল্পের মধ্যে স্বতন্ত্র চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রথমেই প্রকাশ পায় নি, ধীরে ধীরে তা নিজস্ব অবয়ব গ্রহণ করেছে। তবে বাংলাদেশের ছোটগল্পে সমাজচিত্র প্রাধান্য পেয়েছে এবং সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিফলনও ছোটগল্পে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

আবুল মনসুর আহমদ

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি প্রবীণ হিসেবে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। তাঁর কৃতিত্ব ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক গল্পরচনাকারী হিসেবে। 'আয়না', 'ফুড কনফারেন্স', 'আসমানী পর্দা', 'গালিভারের সফরনামা' ইত্যাদি তাঁর গল্পগ্রন্থ এবং তা সবই ব্যঙ্গরচনায় সমৃদ্ধ। ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীব্রতায় তাঁর গল্পগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সমকালীন সমাজ-জীবনে বিরাজমান অন্যায়-অনাচারের প্রতি সুতীব্র ব্যঙ্গ প্রকাশ করার জন্য তাঁর গল্পগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচনার যোগ্য।

মাহবুব-উল-আলম

কথাশিল্পী মাহবুব-উল-আলমের (১৮৯৮-১৯৮১) গল্পগ্রন্থের নাম 'তাজিয়া', 'পঞ্চঅন্ন'। 'গোফ সন্দেশ' তাঁর ব্যঙ্গরচনা।

আবুল ফজল

আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩) গল্পরচনায় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছেন। 'মাটির পৃথিবী', 'আয়না', 'মৃতের আত্মহত্যা', 'নির্বাচিত গল্প' ও 'শ্রেষ্ঠগল্প' নামে তাঁর গল্পসংকলন গ্রন্থ রয়েছে। সমাজচিত্র হিসেবে তাঁর গল্পগুলো প্রশংসিত। প্রেমের বিচিত্র প্রকাশও তাঁর গল্পে দেখা যায়। সমকালীন জীবনের বিভিন্ন দিক তাঁর ছোটগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

আবু জাফর শামসুদ্দিন

আবু জাফর শামসুদ্দিন (১৯১১-৮৮) কিছু গল্প রচনা করেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর নাম 'জীবন', 'শেষ রাত্রির তারা', 'এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য', 'রাজেন ঠাকুরের তীর্থ যাত্রা', 'স্বনির্বাচিত গল্প', 'শ্রেষ্ঠগল্প', 'নেংড়ী' ইত্যাদি। তাঁর গল্পে সমাজচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

মবিনউদ্দিন আহমদ

মবিনউদ্দিন আহমদ (১৯১২-৭৮) বিচিত্র বিষয়াবলম্বনে গল্প রচনা করেছেন। 'ভাঙ্গা বন্দর', 'হোসেন বাড়ীর বৌ' তাঁর গল্পগ্রন্থ। মুসলমান সমাজ জীবনের কথা তাঁর গল্পে রূপায়িত হয়েছে। আঙ্গিক বা কলানৈপুণ্যের দিক থেকে অভিনবত্ব না থাকলেও সহজ সরল ভাষায় গল্পরস সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষণীয়। সমাজসচেতনতা ও বাস্তব জীবনবোধ তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

শওকত ওসমান

শওকত ওসমান (১৯১৯-৯৮) ঔপন্যাসিক হিসেবে যেমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর নাম : 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প', 'সাবেক কাহিনী', 'পিঁজরাপোল', 'ওটেন সাহেবের বাংলো', 'ডিগবাজী', 'প্রস্তর ফলক', 'উপলক্ষ', 'নেত্রপথ', 'জন্ম যদি তব বঙ্গে', 'এবং তিন মির্জা', 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী', 'উভশৃঙ্গ', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'নির্বাচিত গল্প', 'মনিব ও তাহার কুকুর', 'বিগত কালের গল্প' ইত্যাদি। শওকত ওসমান নিরীক্ষামুখীন শিল্পী বলে তাঁর রচনায় বিচিত্র স্বাদ ও আঙ্গিকের গল্প পাওয়া যায়। খুব ছোট আকারের গল্প তিনি রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর গল্প নকশাজাতীয়। অল্প কথায় গভীর ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা বিদ্যমান। সংক্ষিপ্ত অবয়বে গল্প রচনা করে যে বাক্‌ভঙ্গিমায় আকর্ষণীয়তা সৃষ্টি করেছেন তাতে পাঠকের সমাদর লাভ করা সম্ভব হয়েছে। সমাজজীবনের বিচিত্র মানুষের পরিচয়—জীবনের দারিদ্র্য, সংগ্রাম, ধর্মের বাহ্যিক রীতিনীতি, মত আচার— তাঁর গল্পে রূপ লাভ করেছে। লেখকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় গল্পে প্রকাশমান। অনেক ক্ষেত্রে তিনি সমাজ সমালোচকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর রচনা গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম। সমকালীন জীবনের চিত্র তাঁর গল্পে খুব সার্থকভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। গল্পের বিষয় নির্বাচনে তাঁর পর্যবেক্ষণশীলতা, গল্পের রূপায়ণে আকর্ষণীয় ও সাবলীল ভাষার ব্যবহার, চরিত্রচিত্রণে দক্ষতা—সবকিছু মিলিয়ে তাঁর গল্প যথার্থ সার্থকতার দাবিদার।

আবু রুশদ

আবু রুশদ (১৯১৯) স্বল্প সংখ্যক গল্পের রচয়িতা হলেও তাঁর রচনায় বিশিষ্টতা রয়েছে। 'প্রথম যৌবন', 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী', 'রাজধানীতে ঝড়', 'স্বনির্বাচিত গল্প', 'মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার', 'ডোবা হল দীঘি', 'দিন অমলিন', 'বিয়োগ ব্যথা' তাঁর গল্প গ্রন্থ। তাঁর গল্পে শহুরে আবহাওয়া এবং আধুনিক সমাজের চিত্রই বেশি ফুটেছে। সমকালীন জীবনের বিচিত্র রূপ তাঁর গল্পে বিধৃত হয়েছে। গল্পকারের যথার্থ অনুসন্ধিৎসা তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। চরিত্র চিত্রণে, গল্প বর্ণনায় ও ভাষা ব্যবহারে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

মিরজা আবদুল হাই

মিরজা আবদুল হাই (১৯১৯-৮৪) গল্প রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'ছায়া প্রচ্ছায়া' ও 'বিস্ফোরণ' তাঁর গল্পগ্রন্থ। রচনায় প্রাচুর্যের অভাব থাকলেও তিনি স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট ছিলেন। ছোটগল্পকার হিসেবেই ছিল তাঁর যথার্থ প্রতিষ্ঠা। সমকালীন বাস্তব জীবনের আলেখ্য তাঁর ছোটগল্পে দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির ফলে তিনি সমাজ জীবন ও পরিবেশকে তাঁর গল্পে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (১৯২২-৭১) নাম বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। তবে তাঁর গল্পের সংখ্যা বেশি নয়। তাঁর 'নয়নচারা' ও 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' নামে দুটি গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক গল্পেই তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার নির্দশন বিদ্যমান। তাঁর অধিকাংশ গল্পে গ্রামাঞ্চলের অনাচার-কুসংস্কারের যথাযথ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর উপন্যাসের মত গল্পেও লক্ষণীয়। বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য তিনি সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকে পদচারণা করেছেন। সেখানকার নানা অসংগতি তাঁর গল্পে বিধৃত হয়েছে। সুন্দর ও আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গির জন্য তাঁর গল্পের বিশেষ আবেদন বিদ্যমান। শুধু বাংলাদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে তার গল্প ব্যতিক্রমধর্মী তা নয়, বরং এদিক থেকে সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য। তাঁর ছোটগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে গভীর জীবনবোধ, অন্তর্লোকের রহস্য অনুসন্ধানেও তিনি ছিলেন তৎপর, 'ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-সমস্যার পটে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, মূল্যবোধের বিপর্যয় এবং মানসিক স্খলনপতনের আলেখ্য তাঁর রচনায় উজ্জ্বল ভাবে' রূপ লাভ করেছে।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন

সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯২৩-৮৬) 'নয়ানঢুলি', 'বীর কণ্ঠীর বিয়ে', 'খরস্রোতা', 'অষ্টপ্রহর', 'বেলা ব্যানার্জির প্রেম' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থের রচয়িতা। দরিদ্র গ্রামীণ সমাজজীবনের নানা সমস্যা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছভাবে পাঠকের চোখের সামনে উপস্থিত করার ক্ষমতা তাঁর অনস্বীকার্য। গ্রামের মানুষের দুঃখদুর্দশা তাঁর হৃদয়ে সহানুভূতির সঞ্চার করেছিল। তাই তাঁর গল্পে সেই মনের পরিচয় মিলে। তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন সমাজের সংকট, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখায়, আবার গ্রামীণ জীবনের চিত্রাঙ্কনেও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। সামাজিক শোষণের কথাও তিনি উপেক্ষা করেন নি। গ্রামবাংলার শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মননশীল আলেখ্য হিসেবে তাঁর গল্পগুলোকে বিবেচনা করা চলে।

আবু ইসহাক

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) প্রধানত ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতিমান, কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে। 'মহাপতঙ্গ' ও 'হারেম' তাঁর গল্পগ্রন্থ। তিনি বাস্তবধর্মী লেখক এবং তাঁর বক্তব্য সহজ সরলভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

আবদুশ শাকুর

আবদুশ শাকুর (১৯৪১-২০১২) 'ক্ষীয়মান', 'সরসগল্প', 'নৈসর্গিক সম্পর্ক', 'গোলাপ- ধোলাই', 'ধস', 'এপিটাফ', 'বিচলিত প্রার্থনা' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর গল্পে সমকালীন জীবনের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষণীয়। তাঁর গল্পের প্রকাশভঙ্গি তথা ভাষার ক্ষেত্রে স্বকীয়তা রয়েছে। শব্দের অভিনব ব্যবহারে ভাবের ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে আবদুশ শাকুরের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আবদুশ শাকুর সাহিত্য সাধনায় বৈচিত্র্যধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, রম্যরচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

আতোয়ার রহমান

আতোয়ার রহমান (১৯২৭-২০০২) শিশুদের জন্যই বেশি লিখে থাকেন। তবে গল্প রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে। 'হলদে লতা', 'বলয়' তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। বিভিন্ন বিষয়ের অনুবাদে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিদেশী গল্প অনুবাদের নমুনা হিসেবে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'পঞ্চমুখী', 'স্বর্গনরক', 'নির্বাচিত গল্প' ইত্যাদি। শিশুতোষ গল্প রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব বিদ্যমান। ছোটদের জন্য তাঁর গল্প—'সাঁঝের বেলার রূপকথা', 'রঙে রঙে বোনা' ইত্যাদি।

রাজিয়া মাহবুব

রাজিয়া মাহবুব (১৯২৮) বৈচিত্র্যধর্মী সাহিত্যসাধনায় মহিলাদের মধ্যে বিশিষ্ট। তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম 'খাপছাড়া', 'কুয়াশার নদী' ও 'অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা', 'অরণ্যে নক্ষত্রের আলো'।

মিন্নাত আলী

রসরচনা লিখে মিন্নাত আলী (১৯২৬-২০০৮) খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম 'আমার প্রথম প্রেম', 'মফঃস্বল সংবাদ', 'যাদুঘর', 'চেনা ও জানা' 'আমি দালাল বলছি' ইত্যাদি।

ইসহাক চাখারী

ইসহাক চাখারী (১৯২২) রচিত গল্পগ্রন্থের নাম 'জানালা'। স্বল্প সংখ্যক গল্প রচনা করলেও তাঁর গল্পগুলো বিশিষ্টতার দাবি রাখে।

শামসুদ্দিন আবুল কালাম

শামসুদ্দিন আবুল কালাম (১৯২৬-৯৭) রচিত ছোটগল্পের গ্রন্থগুলোর নাম : 'পথ জানা নেই', 'ঢেউ', 'দুই হৃদয়ের তীর', 'অনেক দিনের আশা', 'শাহের বানু', 'পুঁই ডালিমের কাব্য', 'মজা গাঙের গান' ইত্যাদি। তাঁর গল্পগুলো বৈপ্লবিক সমাজচেতনায় সমৃদ্ধ। তাঁর অধিকাংশ গল্প গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত এবং তাতে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতির প্রভাবও তাঁর গল্পে লক্ষ করা যায়। বাস্তবতা ও প্রকৃতির সান্নিধ্যের জন্য তাঁর গল্প পাঠকের কাছে সমাদৃত। এদেশের সামাজিক

সমস্যার বিভিন্ন দিক তাঁর ছোটগল্পে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। নিপীড়িত জনগণের কথা বলার ওপরই তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ছোটগল্পের বক্তব্যের ঐক্য রয়েছে।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী

ড. আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭) 'রাবেয়া আপা' গল্পগ্রন্থ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। কথাশিল্পী হিসেবে তাঁর বিশিষ্টতা আছে। তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থ হল : 'গলির ধারের ছেলেটি', 'কাগজের নৌকা', 'শেষ নালিশ' ইত্যাদি। শিশুতোষ গল্প রচনাতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। শিশুদের জন্য তাঁর লেখা 'সিংহের মামা ভোম্বল দাস', 'আমার দেশের রূপকাহিনী', 'বাণিজ্যিতে যাব আমি', 'বাংলাদেশের রূপকথা', 'রূপকথার রাজ্যে' ইত্যাদি। লোক সাহিত্যের গবেষক, কবি, অনুবাদক, স্মৃতিকথা ও রম্যরচনার লেখক হিসেবে আশরাফ সিদ্দিকী বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

হেলেনা খান

হেলেনা খান (১৯২৯) গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন। 'ফসলের মাঠ', 'বৃষ্টি যখন নামলো', 'একাত্তরের গল্প', 'কালের পুতুল', 'পাপড়ির রং বদলায়', 'নির্বাচিত গল্প', 'ছায়াকালো কালো', 'কারাগারের ভিতরে ও বাইরে' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থে তাঁর প্রতিভা ফুটে উঠেছে। শিশু-কিশোরদের জন্যও তাঁর গল্পগ্রন্থ রয়েছে।

নাজমুল আলম

নাজমুল আলম (১৯২৯) একজন বিশিষ্ট গল্পকার। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'একটি অচল আনি', 'উপস্থিত সুধীমণ্ডলী', 'স্বনির্বাচিত গল্প', 'পাণ্ডুলিপি ও গহনার বাক্স', 'বুনোবৃষ্টি', 'নিজের বাড়ি' ইত্যাদি।

আহমদ মীর

আহমদ মীর (১৯২৮-৭৯) 'লালমোতিয়া' গল্পগ্রন্থ রচনা করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ

সমাজসচেতন লেখক হিসেবে ড. আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২-২০০৯) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর গল্পগ্রন্থ : 'জেগে আছি', 'ধানকন্যা', 'মৃগনাভি', 'অন্ধকার সিঁড়ি', 'উজান তরঙ্গে', 'যখন সৈকত', 'আমার রক্ত স্বপ্ন আমার', 'জীবনজমিন', 'নির্বাচিত গল্প', 'মনোনীত গল্প', 'শ্রেষ্ঠ গল্প' ইত্যাদি। লেখকের প্রথম দিককার গল্পে শ্রেণিসংগ্রাম সম্পর্কিত বলিষ্ঠ বক্তব্য রূপায়িত হয়ে উঠেছিল বলে তিনি সহজেই খ্যাতিলাভ করতে পেরেছেন। সংগ্রামী মানুষের জীবনালেখ্য তাঁর গল্পে বিধৃত হয়েছে, জীবনমুখীনতা তাঁর বৈশিষ্ট্য। কোন কোন গল্পে সমাজজীবনের বাস্তব ও অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লেখকের আন্তরিকতার অভাব নেই। কিছু সংখ্যক গল্পে লেখক ফ্রয়েডীয় রীতিবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর পদচারণা আছে। তবে ছোটগল্পে তাঁর অবদান বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য। সমালোচকের

মতে, 'বাংলা কথাশিল্পের বাস্তবতা-নিবিড় বিষয়-বৈচিত্র্যের বাইরে আলাউদ্দিন আল আজাদের শিল্পচেতনার যে অতিরিক্ত বিশেষত্ব ধরা পড়ে তার পরিচয় রয়েছে তাঁর ভাষার কাব্যময়তায়, বর্ণনার শিল্পিত মাধুর্যে ও বাক্যবিন্যাসের চমৎকারিত্বে, যার সমন্বয়ে অনায়াসে গড়ে ওঠে তাঁর রচনার অনন্য এক শিল্পশৈলী।'

শহীদ সাবের

শহীদ সাবের (১৯৩০-৭১) রচিত গল্পগ্রন্থ 'এক টুকরো মেঘ' বিশিষ্টতার পরিচায়ক।

জহির রায়হান

জহির রায়হান (১৯৩৩-৭২) 'সূর্যগ্রহণ' নামে একটি গল্পসংকলন প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর আরও কিছু গল্প বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়ানো রয়েছে। উপন্যাসের মতই তাঁর গল্পে অপূর্ব মাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে। 'জহির রায়হান গল্পসমগ্র' গ্রন্থে তাঁর রচিত অনেকগুলো গল্প সংগৃহীত হয়েছে। গল্পগুলোতে মধ্যবিত্ত সমাজবাদী মানবহৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতির পরিচয় বিধৃত। জহির রায়হান ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার ধারক। তাঁর উপন্যাসের মত ছোটগল্পেও ফুটে উঠেছে দেশাত্মবোধ সেই সঙ্গে মানবমনের বিচিত্র অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করার বিরল ক্ষমতা ছিল তাঁর। সেজন্য তিনি সহজ সরল ভাষা ও সংক্ষিপ্ত আকারের বাক্য ব্যবহার করেছেন। তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে রসসৃষ্টির সহজ প্রমাণ বিদ্যমান।

মুর্তজা বশীর

মুর্তজা বশীর (১৯৩৩) গল্পকার হিসেবে 'কাঁচের পাখির গান' গ্রন্থে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন।

সাইয়িদ আতিকুল্লাহ

সাইয়িদ আতিকুল্লাহ (১৯৩৩-৯৮) একজন বিশিষ্ট গল্পকার। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম 'বুধবার রাতে'। কবি হিসেবে তিনি সমধিক খ্যাতিমান ছিলেন।

হাসানাত আবদুল হাই

হাসানাত আবদুল হাই (১৯৩৯) গল্পকার হিসেবে খ্যাতিমান। 'একা এবং একসঙ্গে', 'যখন বসন্ত', 'নির্বাচিত গল্প', 'শ্রেষ্ঠ গল্প' তাঁর সংকলন। তাঁর ছোটগল্পে নগর জীবন ও গ্রামীণ জীবন চিত্রিত হয়েছে। আধুনিক চিন্তাধারার এই গল্পকার চলমান জীবনের বিচিত্র ঘটনা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জীবনের নানা জটিলতা ইত্যাদি রূপায়ণে আধুনিক বাস্তববাদী শিল্প ধারণাকে অবলম্বন করেছেন।

কাজী ফজলুর রহমান

কাজী ফজলুর রহমান (১৯৩১) ছোটগল্প রচনায় সমকালীন জীবন ও মানবিক হৃদয়ানুভূতি প্রকাশে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম : 'দর্পণে প্রতিবিম্ব', 'যাত্রী', 'ষোলই ডিসেম্বর ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প'।

আবদুল গাফফার চৌধুরী

আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩৪) লব্ধপ্রতিষ্ঠ গল্পলেখক। 'সম্রাটের ছবি', 'কৃষ্ণপক্ষ', 'সুন্দর হে সুন্দর' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর গল্পগুলো সংকলিত হয়েছে। তিনি শিল্পরীতিতে রোমান্টিক। তাঁর গল্পে বাংলাদেশের সমাজ ও জীবন যেমন রূপায়িত হয়ে উঠেছে, তেমনি কল্পনা প্রবণতার পরিচয়ও তাতে বিদ্যমান।

হেমায়েত হোসেন

হেমায়েত হোসেন (১৯৩৪-৭২) 'অনিদ্র পলাশ' নামক গল্পগ্রন্থ রচনা করে- ছিলেন।

সৈয়দ শামসুল হক

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫) কবি ও ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতিমান হলেও গল্পরচনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। 'তাস', 'শীতবিকেল', 'রক্তগোলাপ', 'আনন্দের মৃত্যু', 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান', 'এক সঙ্গে', 'বাংলার মুখ', 'শ্রেষ্ঠ গল্প' 'সৈয়দ শামসুল হকের প্রেমের গল্প', 'জলেশ্বরীর গল্পগুলো' ইত্যাদি তাঁর গল্পগ্রন্থ। রোমান্টিক মনোভাবের পরিচয় তাঁর গল্পে প্রকাশ পেয়েছে।

শহীদ আখন্দ

শহীদ আখন্দ (১৯৩৫) 'জনতায় নির্জন', 'অনিবার্য বান্ধব', 'যখন পারিনা' 'শহীদ আখন্দের সরস গল্প', 'হালকা হাসির গল্প' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের রচয়িতা। বাস্তবধর্মী সামাজিক আলেখ্য হিসেবে তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। কিশোর সাহিত্যে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। অনুবাদেও তাঁর দক্ষতা রয়েছে। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সুখদুঃখ আনন্দবেদনার চিত্র তাঁর গল্পে চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। তিনি মানবহৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতিকে উজ্জ্বল ভাবে রূপায়িত করেছেন।

হুমায়ুন কাদির

হুমায়ুন কাদির (১৯৩৫-৭৭) কিছু গল্প রচনা করেছিলেন। তাঁর গল্প গ্রন্থের নাম : 'এক গুচ্ছ গোলাপ ও কয়েকটি গল্প', 'আদিম অরণ্যে এক রাত্রি', 'শীলার জন্যে সাধ' ইত্যাদি।

সুচরিত চৌধুরী

সুচরিত চৌধুরী (১৯৩০-৯৪) গল্পকার হিসেবে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'আকাশে অনেক ঘুড়ি', 'একদিন একরাত', 'সুচরিত চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ গল্প', 'সুচরিত চৌধুরীর নির্বাচিত গল্প', 'নদী নির্জন নীল', 'সুরাইয়া চৌধুরীর শুধু গল্প'। তিনি চলন্তিকা রায়, শুধু চৌধুরী, সুরাইয়া চৌধুরী ছদ্মনামে গল্প কবিতা লিখতেন।

হাসান হাফিজুর রহমান

হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-৮৩) গল্পগ্রন্থের নাম 'আরো দুটি মৃত্যু।' শক্তিমান এই কথাশিল্পীর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে 'হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত গল্প'।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬) তাঁর গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ : 'অবিচ্ছিন্ন', 'দূর দূরান্ত', 'বিশাল ক্রোধ' ও 'এক ধরনের যুদ্ধ', 'মুণ্ডহীন মহারাজ', 'সর্বনাশ চতুর্দিকে', 'গণতন্ত্রের প্রথম দিন ও অন্যান্য গল্প'। প্রবন্ধ গবেষণা ও অনুবাদে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে।

আল মাহমুদ

আল মাহমুদ (১৯৩৬) কয়েকটি গল্পসংকলন প্রকাশ করেছেন। 'পানকৌড়ির রক্ত', 'সৌরভের কাছে পরাজিত', 'গন্ধবণিক', 'আল মাহমুদের গল্প', 'প্রেমের গল্প', 'ময়ূরীর মুখ', 'গল্প সমগ্র' তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম। তিনি উপন্যাস রচনায়ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কবি হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি সর্বাধিক।

শওকত আলী

শওকত আলী (১৯৩৬) 'উন্মূল বাসনা', 'লেলিহান সাধ', 'শুন হে লখিন্দর', 'বাবা আপনে যান' গল্পগ্রন্থে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বক্তব্যের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, মনোহর প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। মানব জীবনের সামগ্রিক বোধের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা স্পষ্ট। সাহিত্যের প্রকরণ ও বিষয়বস্তুর প্রতি সচেতনতা তাঁর প্রবল। শিশুতোষ গল্প রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে। তাঁর রচনায় বাংলাদেশের আঞ্চলিক জীবন খুব সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। তিনি খেটে যাওয়া মানুষের চিত্রাঙ্কণে এক কৃতী শিল্পী।

হাসান আজিজুল হক

হাসান আজিজুল হক (১৯৩৬) গল্প রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত গল্পগুলো : 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'জীবন ঘষে আগুন', 'নামহীন গোত্রহীন', 'আমরা অপেক্ষা করছি', 'পাতালে হাসপাতালে', 'রোদে যাবো', 'মা-মেয়ের সংসার', 'নির্বাচিত গল্প', 'রাঢ়বঙ্গের গল্প', 'হাসান আজিজুল হকের শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন তাঁর গল্পে অত্যন্ত সার্থকতা সহকারে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

নূরউল আলম

নূরউল আলম (১৯৩৭) 'পুতুলের কান্না', 'প্রসাধন', 'উঁচু তলার নায়ক' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে সমকালীন সমাজজীবনের কথা বলেছেন।

মকবুলা মনজুর

মকবুলা মনজুর (১৯৩৮) রচিত ছোটগল্প গ্রন্থগুলোর নাম 'সায়াহ্ন যুথিকা', 'শকুনেরা সবখানে', 'নক্ষত্রের তলে', 'মকবুলা মনজুরের প্রেমের গল্প', 'একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প', 'দিন রজনী' ইত্যাদি।

বশীর আল হেলাল

বশীর আল হেলালের (১৯৩৬) গল্পগ্রন্থের নাম 'স্বপ্নের কুশীলব', 'প্রথম কৃষ্ণচূড়া', 'বিপরীত মানুষ', 'ক্ষুধার দেশের রাজা' ইত্যাদি। উপন্যাস ও গবেষণামূলক প্রবন্ধরচনায় তাঁর অবদান রয়েছে।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (১৯৩৯) গল্পকার হিসেবে খ্যাতিমান। তাঁর 'দুর্বিনীত কাল', 'বহে না সুবাতাস', 'সিতাংশু তোর সমস্ত কথা', 'পুনরুদ্ধার', 'উড়িয়ে নিয়ে যা কাল মেঘ', 'ফিরে যাও জ্যোৎস্নায়', 'নির্বাচিত গল্প' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থে মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র রূপায়িত হয়েছে।

রিজিয়া রহমান

রিজিয়া রহমান (১৯৩৯) 'অগ্নিস্বাক্ষর' ও 'নির্বাচিত গল্প' গ্রন্থে বিচিত্র অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক গল্প স্থান দিয়েছেন।

রাহাত খান

রাহাত খান (১৯৪০) খ্যাতিমান গল্পকার। 'অনিশ্চিত লোকালয়', 'অন্তহীন যাত্রা', 'ভালমন্দের টাকা', 'আপেল সংবাদ' ইত্যাদি তাঁর গল্পগ্রন্থ। তিনি ছোটদের জন্যও গল্প রচনা করেছেন। ছোটদের জন্য তাঁর লেখা গল্পগ্রন্থগুলো হল 'দিলুর গল্প', 'হবু রাজা গবু মন্ত্রী', 'হাজার বছর আগে', 'হাসিকান্নার চিকিৎসা' ইত্যাদি।

রশীদ হায়দার

রশীদ হায়দার (১৯৪২) কতিপয় গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলোর নাম : 'নানকুর বোধি', 'অন্তরে ভিন্ন পুরুষ', 'তখন', 'আমার প্রেমের গল্প', 'পৌষ থেকে পৌষ', 'মেঘেদের ঘরবাড়ি', 'উত্তর কাল', 'পূর্বাপর' ইত্যাদি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-৯৭) ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম : 'অন্যঘরে অন্য স্বর', 'খোঁয়াড়ি', 'দুধভাতে উৎপাত' ও 'দোজখের ওম।'

বিপ্রদাস বড়ুয়া

বিপ্রদাস বড়ুয়া (১৯৪২) 'নির্বাচিত প্রেমের গল্প', 'নদীর নাম গণতন্ত্র', 'স্বপ্ন মিছিল', 'বীরাঙ্গনার প্রেম', 'যুদ্ধজয়ের গল্প', 'স্বপ্নসমুদ্রে বনদেবীরা আছে', 'উল্কি একটি প্রেমের গল্প', 'গাঙচিল', 'সাদা কফিন', 'আকাশে প্রেমের বাদল', 'আমি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করি', 'স্বপ্নসুন্দরী', 'অলৌকিক চুম্বন', 'আমি একটি স্বপ্ন কিনেছিলাম', 'ফিরে তাকাতেই দেখি বঙ্গবন্ধু' ইত্যাদি গ্রন্থে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আবদুল মান্নান সৈয়দ

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩) সাহিত্য সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর গল্পের মধ্যেও সে ধরনের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 'সত্যের মত বদমাশ', 'চলো যাই পরোক্ষে', 'মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা', 'নির্বাচিত গল্প', 'উৎসব', 'নেকড়ে হায়েনা আর তিন পরী' তাঁর গল্পগ্রন্থ।

সেলিনা হোসেন

সেলিনা হোসেন (১৯৪৭) 'উৎস থেকে নিরন্তর', 'খোল করতাল', 'মানুষটি', 'জলবতী মেঘের বাতাস', 'পরজন্ম', 'নির্বাচিত গল্প', 'মতিজানের মেয়েরা' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী

নাজমা জেসমিন চৌধুরীর (১৯৪০-৮৯) গল্পগ্রন্থের নাম : 'মেঘ কেটে গেলে', 'অন্য নায়ক', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ইত্যাদি। তিনি কয়েকটি উপন্যাস গ্রন্থেরও রচয়িতা।

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন (১৯৩৪) 'চাবুক', 'ওম শান্তি', 'চিরকুট', 'নল খাগড়ার সাপ', 'কুম্ভকর্ণের দিবানিদ্রা', 'লাল গেঞ্জি কোকড়া চুল', 'আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিনের রম্যগল্প' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ রচনা করে ছোটগল্পের শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত 'মনের রং নেই', 'নিষিদ্ধ শহর', 'নির্বাচিত প্রেমের গল্প', 'নির্বাচিত গল্প', 'নেপথ্য নাটক', 'আনন্দ ভুবন', 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প', 'নীল ছবির নায়িকা', 'সোনার শরীর', 'কলেজ গার্ল', 'মনোনীত গল্প' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থেও প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে।

ইউসুফ শরীফ

ইউসুফ শরীফ (১৯৪৮) উপন্যাসের মত ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম : 'মুহূর্তের বৃত্তান্ত' ও 'যুদ্ধের পর'। সমকালীন জীবনের ছবি তাঁর গল্পে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কায়েস আহমেদ

কায়েস আহমেদ (১৯৪৮-৯৩) 'লাশ কাটা ঘর', 'দিনযাপন', 'অন্ধ তীরন্দাজ', 'নির্বাসিত একজন' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা।

হুমায়ূন আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) 'আনন্দবেদনার কাব্য', 'নিশিকাব্য', 'শীত ও অন্যান্য গল্প', 'ছায়াসঙ্গী', 'নীলহাতী', 'এই আমি', 'আমার আপন আঁধার' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থের রচয়িতা। 'এলেবেলে' তাঁর রম্য গল্পগ্রন্থ। তিনি মানব জীবনের বিচিত্র রহস্য তাঁর

ছোটগল্পে অনবদ্য ভঙ্গিতে রূপায়িত করে তুলেছেন। গল্পে আকস্মিকতার চমক সৃষ্টিতে যেমন তিনি দক্ষ, তেমনি সাধারণ বিষয়ের ওপর অসাধারণত্ব আরোপ করার বিরল প্রতিভা তাঁর রয়েছে। তাঁর গল্পের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যেমন নতুনত্ব আছে, তেমনি নাটকীয়তাকে তিনি যথোপযুক্ত ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সহজ সরল উপস্থাপনা, অনাড়ম্বর ভাষা ও রসমধুর বর্ণনাভঙ্গি তাঁর গল্পকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

মঞ্জু সরকার

মঞ্জু সরকার (১৯৫৩) 'অবিনাশী আয়োজন', 'মৃত্যুবাণ', 'উচ্ছেদ উচ্ছেদ খেলা', 'পুরাতন প্রেম ও অন্যান্য গল্প', 'আনন্দ যাত্রা', 'অপারেশন জয় বাংলা' গ্রন্থের রচয়িতা।

ইমদাদুল হক মিলন

ইমদাদুল হক মিলন (১৯৫৫) 'ফুলের বাগানে সাপ', 'প্রেমের গল্প', 'ভালোবাসার গল্প', 'নিরন্নের কাল', 'হে প্রেম', 'বালিকারা', 'আহারী', 'তোমাকে ভালবাসি', 'তাহারা', 'মর্মবেদনা', 'প্রেমনদী', 'প্রেমিক প্রেমিকা', 'বারো রকম মানুষ', 'যদি জানতে', 'প্রেম ভালোবাসা', 'ভালোবাসা', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'বাছাই গল্প', 'নির্বাচিত প্রেমের গল্প', 'ভালোবাসার নির্বাচিত গল্প' প্রভৃতি ছোটগল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে নাগরিক জীবনের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি গ্রামীণ মানুষের কথাও তিনি উপেক্ষা করেন নি। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি আকর্ষণীয়, উপস্থাপনা রীতিও পাঠকের হৃদয়কে সহজভাবে নাড়া দেয়। একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন।

মঈনুল আহসান সাবের

মঈনুল আহসান সাবের (১৯৫৮) 'ভিড়ের মানুষ', 'আগমন সংবাদ', 'প্রেম বিরহ', 'স্বপ্নযাত্রা', 'এরকমই' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ রচনা করে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্পে নগর জীবনের মানুষের কথা বলা হয়েছে। আকর্ষণীয় বর্ণনাভঙ্গি তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য।

ঝর্না রহমান

ঝর্না রহমান (১৯৬৯) 'কালঠুঁটি চিল', 'অন্য এক অন্ধকার', 'জীবনের জল ও অনল', 'স্বর্ণ তরবারি', 'কৃষ্ণপক্ষের উষা', 'অগ্নিতা' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন।

বাংলাদেশে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন এমন লেখকের সংখ্যা কম নয়। বর্তমানে এখানকার ছোটগল্পের ইতিহাস যথেষ্ট সম্প্রসারণশীল। পাশ্চাত্যের ছোটগল্পের অনেক অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হয়েছে। এখানকার গল্পকারগণ বাইরের উন্নত গল্পসম্ভারের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। তাই এখনকার গল্পে নানা পরীক্ষানিরীক্ষার নিদর্শন বিদ্যমান। এর ফলে এখানকার ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

নাট্যসাহিত্য

বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাস সাহিত্যের অপরাপর শাখার মত সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে নি। অবশ্য সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যেও নাটকের দৈন্য সুস্পষ্ট। তবু দেশবিভাগের পর এখানকার সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অগ্রগতির নিদর্শন সহজেই লক্ষযোগ্য; কিন্তু নাটকের বেলায় অনগ্রসরতা পীড়াদায়ক। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বিভাগপূর্ব কালের ঐতিহ্য অনুসরণ করে যতটুকু অগ্রসর হয়েছে নাটকের পক্ষে ততটুকু সম্ভবপর হয় নি। নাটকের এই অনগ্রসরতার ব্যাপারে মনে করা হয় যে, মঞ্চসম্পর্কে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অভাবে এখানকার নাট্যরচনায় আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হতে পারে নি। ধর্মীয় সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দান সম্পর্কে এখানকার সমাজব্যবস্থা অনেকটা অনুদার। নাট্যান্দোলনের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এখানে জাতীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক রঙ্গমঞ্চের অভাব রয়েছে। ফলে অভিনয় শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয় সুযোগ তেমন নেই। নাটককে জনপ্রিয় করার জন্য তেমন কোন সুসংহত প্রচেষ্টা এখানে এখনও দেখা যায় না। পেশাদার নাট্যগোষ্ঠী বিকাশের জন্য এখানে অনুকূল পরিবেশ অবর্তমান। এতদিন নাট্যাভিনয়ে প্রমোদকরের চাপ পড়েছে। নাটকের প্রকাশনার অসুবিধাও নাটকসৃষ্টির অন্তরায়। তবে এখন এসব অসুবিধা অনেকটা দূর হচ্ছে।

এখানকার নাটকের আবেদন প্রধানত বিনোদনমূলক ছিল বলে জীবনের গভীরে প্রবেশ করার মত কোন বক্তব্য তেমন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে নি। নাটক প্রয়োজনার যথেষ্ট কর্মতৎপরতার অভাব এর বিকাশকে করেছে বাধাগ্রস্ত। নাটক অভিনয়ের সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনেও উৎসাহ দেখা যায় নি। কখনও নাট্যকর্মীর উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেছে উপযুক্ত নাটকের অভাবে।

এসব অসুবিধা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কালে নাট্যসৃষ্টির পরিবেশ কিছুটা অনুকূল বলে মনে হতে পারে। এখন দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং কেন্দ্রীয় ভাবে ঢাকায় বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট পেশাদার নাট্যসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে এবং তাদের প্রচেষ্টার ফলে এখানকার নাটকের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত না হলেও ছোটখাট মঞ্চের সমস্যা বিদূরিত হওয়ায় ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। প্রমোদ করের গ্রাস থেকে নাট্যাভিনয়কে মুক্ত করার কিছু উদ্যোগ এখন অবর্তমান নয়। বাংলা একাডেমীর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ বিদেশী নাটকের অনুবাদ প্রকাশেরও অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। ফলে বিদেশী শ্রেষ্ঠ নাটকের সঙ্গে এখানকার নাট্যকারগণ কিছুটা পরিচিত। সাম্প্রতিক কালের সমস্যা এখন নাটকে কিছু কিছু উপস্থাপিত হচ্ছে। ফলে এখানকার নাটকে জীবনজিজ্ঞাসার পরিচয় মিলে। আঙ্গিকগত পরীক্ষানিরীক্ষায় নাট্যকারগণ উৎসাহী। এ সমস্ত দিক বিবেচনায় বলা চলে যে, নাট্যসাহিত্য অতিসাম্প্রতিক কালে কিছুটা সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এখানকার নাটকে ঐতিহাসিক বিষয়ের চেয়ে সামাজিক বিষয় বেশি রূপায়িত হয়েছে। তবে তাতে সমকালীন জীবনের সমস্যা

তেমন প্রতিফলিত হয় নি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর নাটকের ইতিহাসে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বিনোদনের সীমানা পেরিয়ে এখানকার নাটকে বক্তব্য এখন স্পষ্ট। মুক্তি সংগ্রামের ক্ষতবিক্ষত জীবনের হতাশাবেদনা আশাআকাঙ্ক্ষা সুতীক্ষ্ণ সংলাপে অনুরণিত হয়ে উঠছে সাম্প্রতিক নাটকে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে নাটক রচনা ও অভিনয়ে যথেষ্ঠ আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। নাট্য আন্দোলন এখন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণশীল। বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য এখন সৃষ্টিমুখর। আধুনিক বিশ্বের নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ এখন বেশ ঘনিষ্ঠ এবং তার প্রভাবে নাট্য রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এর সাফল্য এদেশের নাটকে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি আনয়ন করছে।

বাংলাদেশের অপরাপর সাহিত্য শাখার মত নাটকেও প্রবীণ-নবীনের সমাবেশ ঘটেছে। প্রবীণেরা সামাজিক ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছেন। নবীনেরা সমকালীন সমস্যা ও আঙ্গিকগত পরিবর্তন নাটকের উপজীব্য করেছেন।

শাহাদাৎ হোসেন

প্রবীণ নাট্যকারগণের মধ্যে শাহাদাৎ হোসেনের (১৮৯৩-১৯৫৩) নাম উল্লেখযোগ্য। কবি হিসেবে তিনি খ্যাতিমান, কথাসাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর অবদান রয়েছে। তবে নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বিদ্যমান। বিভাগপূর্ব যুগে নাট্যরচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন—পরবর্তীকালে এই গতিধারা অব্যাহত ছিল। 'মসনদের মোহ', 'আনারকলি', 'সরফরাজ খাঁ', 'নবাব আলীবর্দী' তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। ঐতিহাসিক কাহিনীর পটভূমিকায় প্রণয়চিত্রের রূপায়ণই নাটকগুলোর উদ্দেশ্য। তিনি কতকগুলো বেতার নাটকও রচনা করেছিলেন। মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি শাহাদাৎ হোসেনের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাধ্যমে। জাতীয় জীবনে নতুন প্রেরণা সঞ্চারের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নাটকে। বিশেষ আদর্শবোধ তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছিল।

ইবরাহীম খাঁ

ইবরাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের রচয়িতা। 'কামাল পাশা' ও 'আনোয়ার পাশা' নাটকে তুরস্কের নবজন্মের কথা বলা হয়েছে। নিজেদের জাতীয় জীবনে প্রেরণা সঞ্চারের জন্যও এগুলোর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। 'কাফেলা' তাঁর সামাজিক নাটক। সমাজ জীবনে জাতীয়তাবোধের চেতনা সঞ্চারের লক্ষ্যে তিনি মুসলিম ইতিহাস থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিলেন। ঐতিহ্য চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। নাটক রচনায় তাঁর এই সমকালীন বৈশিষ্ট্য তিনি অনুসরণ করেছে। ভাষার সরলতা, সহজ বক্তব্য ও রসমধুর সংলাপ তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য।

আকবর উদ্দিন

আকবর উদ্দিন (১৮৯৬-১৯৭৮) কতিপয় জনপ্রিয় নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর নাটকগুলোর নাম : 'নাদির শাহ', 'সিন্ধুবিজয়', 'মুজাহিদ' ও 'আজান'। প্রথম তিনটি নাটক ইতিহাসের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত। অপর নাটক 'আজানের' উপজীব্য সামাজিক বিষয়বস্তু। আকবর উদ্দিন ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। 'আজান' নাটকে সামাজিক সমস্যার রূপায়ণ লক্ষণীয়। তাঁর অপর ঐতিহাসিক নাটক 'সুলতান মাহমুদ'। জাতীয় জীবনের নবরূপায়ণের জন্য তিনি অতীত গৌরবকে তাঁর নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। সমকালীন সাহিত্যচেতনা তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

জসীম উদ্‌দীন

কবি হিসেবে জসীম উদ্‌দীনের (১৯০২-৭৬) প্রধান পরিচয় প্রকাশ পেলেও তিনি কয়েকটি নাটকেরও রচয়িতা। তিনি তাঁর কাব্যের মত গ্রামীণ জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তাঁর নাটকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর নাট্যপ্রচেষ্টা তাঁর কাব্যসাধনার বৈশিষ্ট্যের সমগোত্রীয় বলা যেতে পারে। 'পদ্মাপার', 'বেদের মেয়ে', 'মধুমালা', 'পল্লীবধূ', 'ওগো পুষ্পধনু' প্রভৃতি তাঁর গীতিনাট্য। 'মধুমালা'য় লোকসাহিত্যের উপাদান স্থান পেয়েছে। অন্যান্য নাটকে গ্রামের মানুষের দ্বন্দ্বসংঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়।

আবুল ফজল

আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩) কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর 'একটি সকাল', 'আলোক লতা', 'স্বয়ম্বরা' প্রভৃতি গ্রন্থ একাঙ্কিকা সঙ্কলন। এসব সাহিত্যসৃষ্টিতে নাটকীয় কলাকৌশলের চেয়ে গাল্পিক বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে তাঁর নাটকের মধ্যে সমকালীন জীবনের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। সমাজজীবন প্রতিফলনে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি।

আযিমউদ্দিন

আযিমউদ্দিন (১৯০৪-৭৩) নাট্যকার হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত 'মহুয়া' নাটকটি লোকসাহিত্যের কাহিনীভিত্তিক। প্রেমের সুতীব্র আকর্ষণে জীবন বিসর্জনের এক বেদনাতুর কাহিনী এই নাটকের বক্তব্য। 'মা' তাঁর অপর বিখ্যাত নাটক। সামাজিক জীবনাদর্শের পরিচয় এতে বিধৃত। আযিমউদ্দিনের অপরাপর নাট্যসৃষ্টি হিসেবে 'অহঙ্কার', 'কাঞ্চন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস

কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯০১) সামাজিক জীবনের সমকালীন সমস্যা নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটক 'স্মাগলার'। নাটকটি দেশাত্মবোধ ও সমাজের দুর্নীতি সম্পর্কে রচিত।

নুরুল মোমেন

সজাগ অনুভূতি, সুতীক্ষ্ণ রসবোধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ নাট্যকার নুরুল মোমেনের (১৯০৮-৯০) নাটকের বিশিষ্টতা। 'রূপান্তর', 'নেমেসিস', 'যদি এমন হোত', 'নয়া খানদান', 'আলোছায়া', 'এইটুকু এই জীবনটাতে', 'যেমন ইচ্ছা তেমন', 'শতকরা আশি' ইত্যাদি তাঁর নাট্যগ্রন্থ। এছাড়া তাঁর বহু একাঙ্কিকা বেতারে প্রচারিত হয়েছে, অনেকগুলো পত্রপত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম নাটক 'রূপান্তর' প্রকাশের ফলেই নুরুল মোমেন নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব 'নেমেসিস' নাটক রচনায়। এক চরিত্রের এই নাটকটি বিশেষ আঙ্গিকে রচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে গড়ে ওঠা বিত্তশালী জনৈক লোকের মনোজগতের দ্বিধা-সংশয়-দ্বন্দ্বের চিত্র এ নাটকে প্রতিফলিত। অন্যান্য নাটকে নুরুল মোমেন সমাজের সমকালীন সমস্যাদি রূপায়িত করেছেন। তাঁর নাটকের মধ্যে সমকালীন জীবনের চিত্র রূপায়ণের ফলে সেসব যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। আঙ্গিকের বৈচিত্র্য এবং সংলাপের আকর্ষণীয়তা তাঁর নাটককে বিশিষ্টতা দান করেছে।

আশরাফুজ্জামান

আশরাফুজ্জামান (১৯১১) সমাজের উঁচুনিচু ব্যবধান অবলম্বনে লিখেছেন 'সয়লাব' নাটকটি। গল্প উপন্যাস ও অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে।

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (১৯১১-৮৬) অনেকগুলো নাটক রচনা করেছেন। সাহিত্যের অপরাপর ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রকাশিত নাটকগুলোর নাম : 'উত্তর ফাল্গুনী', 'একে একে এক', 'ঝড়ের পাখী', 'ত্রিমাত্রিক', 'ধানকলম', 'যা হতে পারে', 'শিলা ও শৈলী', 'সুর ও ছন্দ', 'মেহের নিগার ও অন্যান্যিকা' ইত্যাদি। সমকালীন জীবনের চিত্র ও সমস্যা তাঁর নাটকের উপজীব্য।

আলী মনসুর

নাট্যকার আলী মনসুরের (১৯২৫) 'পোড়োবাড়ী', 'বোবা মানুষ', 'দুর্নিবার', 'শেষ রাতের তারা' ইত্যাদি নাটক হিসেবে বিশিষ্ট। তাঁর নাটকে গ্রামজীবনের ব্যথাবেদনার চিত্র রূপায়িত হয়েছে।

ওবায়দুল হক

ওবায়দুল হকের (১৯২২-২০০৭) 'দিগ্বিজয়ী চোরাকারবারী', 'এই পার্কে', 'ভোটভিখারী', 'ব্যতিক্রম', 'রুগ্নপৃথিবী' প্রভৃতি নাটকে বর্তমান সমাজের বাস্তব সমস্যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। সমাজের অন্যায় অনাচার সম্পর্কে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি এসব নাটকে প্রকাশ পেয়েছে এবং তিনি সমাজের দোষত্রুটি সংশোধনের জন্য তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। সমাজ জীবনের সঙ্গে নাট্যকারের যে সম্পৃক্ততা থাকে তার পরিচয় এসব নাটকে বিদ্যমান। সময়ের প্রয়োজন মিটানোর দিকে নাট্যকারের লক্ষ ছিল।

ইব্রাহিম খলিল

ইব্রাহিম খলিল (১৯১৭-৭৪) কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর নাটকগুলোর নাম : 'ফিরিঙ্গীরাজ', 'স্পেনবিজয়ী মুসা', 'ফিরিঙ্গী হার্মাদ', 'সমাধি' ইত্যাদি। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত নাটকে জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রেরণা রয়েছে। জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির প্রেরণা এসব নাটকে লক্ষণীয়।

ফররুখ আহমদ

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪) 'নৌফেল ও হাতেম' নামে একটি কাব্যনাট্য রচনা করেছিলেন। আঙ্গিকের পরীক্ষা হিসেবে গ্রন্থটি বিশিষ্টতার অধিকারী। পুঁথিসাহিত্যের জনপ্রিয় কাহিনী এখানে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করা হয়েছে।

সিকানদার আবু জাফর

সিকানদার আবু জাফর (১৯১৮-৭৫) কবি হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কয়েকটি নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব বিদ্যমান। 'শকুন্ত উপাখ্যান' একটি রূপক নাটক। 'সিরাজদ্দৌলা' তাঁর ঐতিহাসিক নাটক। জাতীয় চেতনা ঐতিহ্য ও প্রেরণা হিসেবে এখানে কাহিনী নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত হয়েছে। 'মহাকবি আলাওল' জীবনী নাটক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি আলাওলের জীবনকাহিনী এতে স্থান পেয়েছে। কবির সংঘাতময় জীবনালেখ্য নাটকের উপজীব্য। বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ এসব নাটকের বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সত্য উদ্‌ঘাটনে নাট্যকার এসব নাটকে তৎপর ছিলেন।

শওকত ওসমান

কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান (১৯১৭-৯৮) নাটক রচনায় বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার। সমাজজীবনের বিচিত্র পরিচয় তাঁর নাটকে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। শাণিত ব্যঙ্গ তাঁর নাটকের অনুষঙ্গী। তাঁর গল্প-উপন্যাসে যেমন সমাজ-জীবনের চিত্র প্রত্যক্ষ করা তেমনি তাঁর নাটকেও সমকালীন জীবনের বিচিত্র সমস্যা রূপায়িত হয়ে উঠেছে। 'আমলার মামলা', 'তস্কর লস্কর', 'কাঁকরমণি', 'বাগদাদের কবি', 'এতিমখানা', 'ডাক্তার আবদুল্লার কারখানা', 'তিনটি ছোট নাটক', 'পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক।

আবদুল হক

আবদুল হক (১৯২০-৯৭) 'অদ্বিতীয়া' নাটক লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বহুবিবাহ সম্পর্কিত সমস্যা অবলম্বনে নাটকটি রচিত। তাঁর অপর নাটক 'ফেরদৌসী'। বৈচিত্র্যধর্মী প্রতিভার অধিকারী এই নাট্যকার সমকালীন সমাজকে তাঁর নাটকে রূপায়িত করে বাংলাদেশের নাটকের বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করেছেন। কাহিনী উপস্থাপনায়, ঘটনা বিন্যাসে, চরিত্রচিত্রণে ও সংলাপ রচনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব বিদ্যমান। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে ফেরদৌসীর গুরুত্ব। 'সোনার ডিম' তাঁর অপর নাটক। তিনি অনেকগুলো ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদও করেছেন।

ড. নীলিমা ইব্রাহিম

ড. নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২) 'দুয়ে দুয়ে চার', 'নব মেঘদূত', 'মনোনীতা', 'যে অরণ্যে আলো নেই', 'সূর্যাস্তের পর' নাটকে সমাজের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য রূপায়িত করে তুলেছেন। গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস ও অনুবাদে তাঁর দক্ষতার মত নাটকেও কৃতিত্বের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন জীবনের চিত্রাঙ্কনে তাঁর কৃতিত্ব বিদ্যমান।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-৭১) 'সুড়ঙ্গ', 'বহিপীর' ও 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকের রচয়িতা। তাঁর উপন্যাসের মত নাটকও আঙ্গিকগত দিক থেকে বিশিষ্ট। 'বহিপীর' তাঁর পুরস্কৃত নাটক। এতে সমাজজীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের প্রতিফলন ঘটেছে। সমাজসচেতন নাট্যকার হিসেবে এখানে তাঁর পরিচয় প্রকাশমান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'তরঙ্গভঙ্গ' আঙ্গিক পরীক্ষায় একটি সার্থক নাটক। বিষয়বস্তু নির্বাচনে, আঙ্গিক রূপায়ণে ও সংলাপ সংযোজনায় তাঁর বিশিষ্টতা বিদ্যমান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সংখ্যাধিক্যে নয়, উৎকর্ষে তাঁর কৃতিত্বের যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন। বিষয় নির্বাচনে যেমন তিনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, তেমনি নাটকের আঙ্গিকের অভিনবত্বে তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। সমাজের সমস্যা তাঁর নাটকে এসেছে, কিন্তু তা পরিবেশিত হয়েছে গতানুগতিকার বাইরে। এর ফলে নাট্যরসিকের কাছে তা চমকপ্রদ বলে বিবেচিত হতে পারে।

সৈয়দ আলী আহসান

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) কবি ও সমালোচক হিসেবে পরিচিত। তাঁর কয়েকটি নাটকও রয়েছে। 'কোরবানী', 'জোহরা ও মুশতারী', 'জুলায়খা' প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মুনীর চৌধুরী

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১) বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অত্যুজ্জ্বল নাম হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর নাটকগুলো হচ্ছে : 'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'চিঠি', 'কবর', 'দণ্ডকারণ্য', 'পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য'। তাঁর কতকগুলো অনুবাদ নাটকও রয়েছে। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত, কিন্তু তাতে মানবমানবীর হৃদয়বেদনার পরিচয়ই প্রধানভাবে প্রকাশিত। 'কবর' নাটকটি ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা। উন্নত ধরনের আঙ্গিক এবং তীক্ষ্ণ সংলাপের জন্য বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে এর মর্যাদা। মুনীর চৌধুরীর অন্যান্য নাটকে সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতিফলন ঘটেছে। বিষয়-নির্বাচনে, চরিত্র-চিত্রণে, সংলাপ রচনায় মুনীর চৌধুরী যে অনন্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন তা তাঁকে জনপ্রিয়তা দান করেছে। বাংলাদেশের নাটকের দিক নির্দেশনায় মুনীর চৌধুরীর অবদান সর্বাধিক বলে বিবেচনা করা যায়।

আসকার ইবনে শাইখ

আসকার ইবনে শাইখ (১৯২৫-২০০৯) সমকালীন নাট্যকারগণের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়। তাঁর নাটকগুলো অভিনয়েও সাফল্য লাভ করেছে। তিনি গ্রামজীবন, ধর্মীয় আদর্শ, দেশাত্মবোধক কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'বিরোধ', 'পদক্ষেপ', 'বিদ্রোহী পদ্মা', 'শেষ অধ্যায়', 'দুরন্ত ঢেউ', 'প্রতীক্ষা', 'অনুবর্তন', 'বিল বাওরের ঢেউ', 'এপার ওপার', 'অনেক তারার হাতছানি' ইত্যাদি নাটকে সমাজের বিচিত্র বিষয় রূপায়িত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য নাটক 'কর্দোভার আগে', 'রাজপুত্র', 'রাজা, রাজ্য, রাজধানী', 'মেঘলা রাতের তারা', 'কন্যা জায়া জননী' ইত্যাদি। 'অগ্নিগিরি', 'তিতুমীর', 'রক্তপদ্ম' প্রভৃতি তাঁর ঐতিহাসিক নাটক। এগুলোর বিষয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী। অতীত ঐতিহ্যের পটভূমিকায় জাতীয় জীবনের নতুন চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে নাট্যকার তাঁর নাটকের বিষয় নির্বাচন করেছেন এবং সমকালীন জীবনের চাহিদা মিটানোর ব্যাপারে তৎপরতা দেখিয়েছেন।

আনিস চৌধুরী

আনিস চৌধুরী (১৯২৯-৯০) সমাজসচেতন নাট্যকার। সমাজের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে তাঁর বিশিষ্টতা। তাঁর 'মানচিত্র', 'এলবাম', 'চেহারা', 'তবুও অনন্যা' বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তাঁর নাটকে মধ্যবিত্ত মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দুঃখ-দারিদ্র্য ও সংগ্রামী চেতনা সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে।

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) কয়েকটি নাটক রচনা করে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটকের নাম : 'মায়াবী প্রহর', 'মরক্কোর জাদুকর', 'ধন্যবাদ', 'নিঃশব্দ যাত্রা', 'সংবাদ শেষাংশ', 'জোয়ার থেকে বলছি', 'হিজল কাঠের নৌকা', 'মেঠোফুলের ঠিকানা', 'নরকের লাল গোলাপ', 'হে সুন্দর জাহান্নাম' ইত্যাদি। তাঁর কাব্যনাট্যের নাম 'ইহুদির মেয়ে', 'রঙিন মুদ্রারাক্ষস'।

ড. রাজিয়া খান

ড. রাজিয়া খান (১৯৩৬-২০১১) 'আবর্ত' নাটক লিখে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। 'তিনটি একাঙ্কিকা' তাঁর অপর নাটক।

সাঈদ আহমদ

সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০) নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত নাটকের নাম : 'সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক' (কালবেলা, মাইলপোস্ট, তৃষ্ণায়), 'প্রতিদিন একদিন', 'শেষ নবাব'।

জোবেদা খানমের 'ঝড়ের স্বাক্ষর', লায়লা সামাদের 'বিচিত্রা' উল্লেখযোগ্য নাটক।

জিয়া হায়দার

জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮) কাব্য ও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অবদান রাখলেও নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। কয়েকটি মৌলিক নাটক ছাড়াও তাঁর রয়েছে রূপান্তরিত ও অনূদিত নাটক। তাঁর প্রথম নাটক 'শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ' (১৯৭০) অভিনবত্বের জন্য সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'এলেবেলে', 'সাদা গোলাপে আগুন ও পংকজ বিভাস'। তাঁর রূপান্তরিত নাটক 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', 'তাইরে নাইরে না', 'উন্মাদ সাক্ষাৎকার', 'মুক্তি মুক্তি'। তাঁর অনূদিত নাটক 'দ্বার রুদ্ধ', 'ডক্টর ফস্টাস এ্যান্টিগানে' ইত্যাদি।

কল্যাণ মিত্র

কল্যাণ মিত্র (১৯৩৯) নাটক রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর নাটকের সংখ্যা অনেক। 'দায়ী কে', 'একটি জাতি একটি ইতিহাস', 'জল্লাদের দরবার', 'মীর জাফর সাবধান', 'সূর্যমহল', 'অনন্যা', 'চোরাগলি মন', 'কুয়াশা কান্না', 'টাকা আনা পাই', 'পাথরবাড়ি', 'শুভবিবাহ', 'প্রদীপশিখা', 'সোনা রূপা খাদ', 'অতএব', 'সাগর সেঁচা মানিক', 'ডাকাত', 'ত্রিরত্ন', 'শপথ', 'লালন ফকির' ইত্যাদি কল্যাণ মিত্রের নাটক। সমকালীন বিষয়বস্তু তাঁর নাটকের উপজীব্য। রাজনৈতিক সামাজিক উপকরণ থেকে তিনি নাটকের কাহিনী রূপায়িত করে তুলেছেন। তাঁর নাটকের অভিনয় সাফল্য থেকে জনপ্রিয়তার পরিচয় মিলে।

আবদুল্লাহ-আল-মামুন

আবদুল্লাহ-আল-মামুন (১৯৪৩-২০০৮) রচিত নাটকগুলো হল : 'সুবচন নির্বাসনে', 'ক্রস রোডে ক্রস ফায়ার', 'এখন দুঃসময়', 'এবার ধরা দাও', 'অরক্ষিত মতিঝিল', 'আয়নায় বন্ধুর মুখ', 'শপথ', 'সেনাপতি', 'কোকিলারা', 'তোমরাই', 'এখনও ক্রীতদাস', 'চারদিকে যুদ্ধ', 'শাহজাদীর কালো নেকাব', 'দূরপাল্লা', 'তৃতীয় পুরুষ', 'আমাদের সন্তানেরা', 'তিনটি পথনাটক', 'দ্যাশের মানুষ' ইত্যাদি।

মমতাজউদ্দিন আহমদ

মমতাজউদ্দিন আহমদ (১৯৩৫) নাটক রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একজন দক্ষ অভিনেতা হিসেবে মঞ্চ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা নাট্যরচনার কাজে লেগেছে। তাঁর মৌলিক নাট্যরচনার পাশাপাশি রূপান্তরিত নাটক ও নাটকের নবরূপায়ণও রয়েছে। তাঁর মৌলিক নাটক : 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা', 'ফলাফল নিম্নচাপ', 'হরিণ চিতা চিল', 'বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল', 'চয়ন তোমার ভালবাসা', 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'বর্ণচোর', 'রাজা অনুস্বারের পালা', 'এই সেই কলবর', 'এই রোদ এই বিষ্টি', 'বুড়িগঙ্গার সিলভার জুবিলী', 'হৃদয় ঘটিত ব্যাপার স্যাপার', 'নাট্যত্রয়ী', 'প্রেম বিবাহ সুটকেস', 'ক্ষতবিক্ষত', 'রঙ্গ পঞ্চদশ', 'সাত ঘাটের কানাকড়ি', 'রাক্ষুসী', 'আমাদের শহর', 'দুই বোন', 'পুত্র আমার পুত্র', 'দশটি রগড় নাটিকা', 'হাস্য লাস্য ভাষ্য', 'একই নাটক চার রকম', 'তরুকে নিয়ে নাটক' ইত্যাদি।

সৈয়দ শামসুল হক

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫) রচিত 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'গণনায়ক', 'নূরলদীনের সারা জীবন', 'এখানে এখন', 'কাব্যনাট্য সমগ্র', 'ঈর্ষা' ইত্যাদি অভিনয় সফল কাব্যনাট্য।

সেলিম আল-দীন

সেলিম আল-দীন (১৯৪৮-২০০৮) নাটক রচনায় আঙ্গিক রূপায়ণে ও বিষয়নির্বাচনে নতুনত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে : 'সর্পবিষয়ক গল্প ও অন্যান্য নাটক', 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন', 'বাসন', 'তিনটি মঞ্চ নাটক', 'ঢাকা', 'যৈবতী কন্যার মন', 'হরগজ' ইত্যাদি।

মামুনুর রশীদ

মামুনুর রশীদ (১৯৪৮) সমকালীন জীবনের চিত্র তাঁর নাটকে বিধৃত করেছেন। তাঁর নাটকগুলো হল : 'ওরা কদম আলী', 'ওরা আছে বলেই', 'ইবলিশ', 'এখানে নোঙর', 'খোলা দুয়ার', 'অববাহিকা', 'গিনিপিগ', 'নীলা', 'সমতট', 'পাথর', 'লেবেদফ' ইত্যাদি।

অনুবাদ নাটক

কবীর চৌধুরী

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় কিছু সংখ্যক অনুবাদ নাটকের কথাও উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরীর (১৯২৩-২০১১) বিশিষ্ট অবদানের কথা উল্লেখ করা চলে। বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদে তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। ইবসেনের 'দি এনিমি অব দি পিপল' নাটকের ভাবানুবাদ 'শত্রু' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর অন্যান্য অনুবাদ নাটক হচ্ছে : ইউজিন ও নীল রচিত 'সম্রাট জোন্‌স', জে. বি. প্রিস্টলীর 'ডেঞ্জারাস কর্নার'-এর অনুলেখন 'অচেনা', ক্রিস্টোফার ফ্রাই-এর 'টাইগার এট দি গেট্‌স'-এর অনুবাদ 'হেক্টর', 'ইউজীন ও নীলের 'আহ্ ওয়াইল্ডারনেস' এর অনুবাদ 'সেই নিরালা প্রান্তর' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব ছাড়া তাঁর অন্যান্য অনূদিত নাটক হল 'আহ্বান', 'পাঁচটি একাঙ্কিকা', 'শহীদের প্রতীক্ষায়', 'ছায়া বাসনা', 'অমারজনীর পথে', 'প্রাণের চেয়ে প্রিয়', 'জননী সাহসিকা', 'ওথেলো', 'গডোর প্রতীক্ষায়', 'লিলিসট্রাটা', 'বিহঙ্গ', 'ভেক', 'ফেইড্রা', 'হ্যামলেট মেশিন' ইত্যাদি।

মুনীর চৌধুরী

মুনীর চৌধুরীও অনুবাদ নাটকে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর অনুবাদ হচ্ছে : জর্জ বার্নার্ড শ-র 'ইউ নেভার ক্যান টেল'-এর অনুবাদ 'কেউ কিছু বলতে পারেনা', জন গলসওয়ার্দির 'দি সিলভার বকস'-এর অনুবাদ 'রূপোর কৌটা', সেক্সপীয়রের 'টেমিং অব দি শ্রু'-এর অনুবাদ 'মুখরা রমণী বশীকরণ' ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর বহু একাঙ্কিকার অনুবাদ পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

সৈয়দ আলী আহসান

সৈয়দ আলী আহসান গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের 'ইডিপাস রেক্স' এর অনুবাদ করেছেন 'ইডিপাস' নামে।

আবদুল হক

আবদুল হক অনেকগুলো বিদেশী নাটকের বঙ্গানুবাদ করেছেন। তাঁর অনূদিত নাটকগুলো হচ্ছে : ইবসেন রচিত 'ডলস হাউস'-এর অনুবাদ 'পুতুলের সংসার', 'দি মাস্টার বিল্ডার'-এর অনুবাদ 'মহাস্থপতি', 'গোস্ট' এর অনুবাদ 'প্রেতাত্মা', 'জন গ্যাব্রিয়েল বর্কম্যান', 'হেডডা গ্যাবলার', 'রস মার্সহোম' ইত্যাদির অনুবাদ।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কৃত ইবসেনের 'ওয়াইল্ড ডাক'এর-অনুবাদ 'বুনো হাঁস', শওকত ওসমান কৃত 'মলিয়েরের পাঁচটি নাটক', শাহাবুদ্দিন কৃত আন্তন শেখভের 'থ্রি সিসটার্স'-এর অনুবাদ 'তিন বোন', 'দি সিগাল' এর অনুবাদ 'শঙ্খচিল', সিকানদার আবু জাফর কৃত 'সিংগের নাটক', ইসমাইল মোহাম্মদ কৃত 'হপ্তম্যানের তিনটি নাটক', জিয়া হায়দার ও আতাউর রহমান অনূদিত জাঁ-পল সার্ত্রের 'দ্বার রুদ্ধ', মহীউদ্দিন অনূদিত 'শীলারের ঐতিহাসিক নাটক', ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কৃত ও নীলের 'হেয়ারী এপ'-এর অনুবাদ 'জাম্বুবান', আবুল ফজল কৃত গোগলের 'দি গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর' এর অনুবাদ 'ছদ্মবেশী' আলী যাকেরের ভাবানুবাদ 'তেল সংকট ও বিদগ্ধ রমণীকুল', 'দেওয়ান গাজীর কিস্সা' ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা নাটক তার উন্মেষযুগে যে পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত ছিল, এ যুগেও সে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বিশ্বের উন্নত নাট্যসৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের নাট্যসৃষ্টিকে প্রভাবিত করছে এবং এখানকার আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য রূপায়ণে প্রেরণা দিচ্ছে। অনুবাদ নাটকগুলোর গুরুত্ব এভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে।

কাব্য সাহিত্য

বাংলাদেশের সাহিত্যে কাব্য সাহিত্যের শাখাটি সর্বাধিক সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাব্যের বরাবরই আধিপত্য ছিল; প্রাচীন ও মধ্যযুগে একচ্ছত্রভাবে এবং আধুনিক যুগেও বৈচিত্র্যে উৎকর্ষে তা অপরাপর শাখা ছাড়িয়ে গেছে। সেই চিরন্তন ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে বাংলাদেশের অগণিত কবি কাব্যশাখার সগৌরব বিকাশ সাধনে তৎপর। এখানকার কাব্যে কবিপ্রাণের সহজ ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। কাব্যে অন্তরঙ্গ মনের এই পরিচয় ভাবের ক্ষেত্রে যে সমৃদ্ধি আনয়ন করেছে তাতে এখানকার কাব্যধারার স্বাতন্ত্র্য ও পরিপুষ্টি লক্ষণীয় ভাবে প্রকাশমান। অতি আধুনিক কবিতার যে ঐতিহ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যে রূপলাভ করেছে বাংলাদেশের কবিরা তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। ফলে আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানকার কবিতার ধারা অগ্রসর হচ্ছে। দেশবিভাগের আগেই বাংলা কবিতায় অতি-আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছিল। বাংলাদেশের প্রবীণ কবিগণ সে বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। স্বতন্ত্র

পরিসরে সে ঐতিহ্যের অনুসরণ করা হয়েছে। তবে দেশবিভাগের ফলে জনজীবনে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তার যথার্থ প্রতিফলন অচিরেই বাংলাদেশের কবিতায় দেখা গেছে।

এখানেও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত প্রবীণ-নবীনের সমাবেশ ঘটেছে; এখানে প্রবীণেরা নিয়ে এসেছেন পূর্বতন ঐতিহ্য আর আদর্শ, অন্যদিকে নবীনেরা অতিআধুনিক কাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে এনেছেন প্রগতিশীল চিন্তাধারা ভাবে ভাষায় আঙ্গিকে। তাই এখানকার কাব্যধারায় দুটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কেউ অতীতমুখী বিশেষ আদর্শের ধারক, কেউ নতুনতর চিন্তাধারার বাহক। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে মুসলমানদের আগমনের সময়ে সমন্বয়পন্থী ও স্বাতন্ত্র্যপন্থী নামে ভিন্নধর্মী যে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গিয়েছিল এখানে তারই যেন অনুবর্তন চলছে। একটি ধারায় ধর্মীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটেছে, অপরটিতে বাংলা ঐতিহ্যবাহী কাব্যধারার অনুসরণ লক্ষণীয়। প্রথম ধারাটি রক্ষণশীল হিসেবে বিবেচ্য, মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তাঁরা কাব্যে রূপদান করেছেন। অপর দল অতিআধুনিক কাব্যধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁরা আধুনিক কাব্যান্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ; তাঁরা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নিরীক্ষাধর্মী এবং বিষয়ের ক্ষেত্রে আত্মআবিষ্কার প্রয়াসী।

সাম্প্রতিক কালে বাংলা কাব্যের দ্বিতীয় ধারাটিই অধিকতর সমৃদ্ধ। বাইরের আধুনিক কাব্যজগতের সঙ্গে এখানকার কবিরা যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। সেখানকার প্রভাবকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এখানকার কাব্যে, ভাবের বৈচিত্র্য আর আঙ্গিকের পরীক্ষা এখন এখানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কবিরা আধুনিক জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত করেছেন। আঙ্গিকের প্রয়োগে আর শব্দের ব্যবহারে অভিনবত্ব দেখিয়ে বাংলাদেশের কাব্যকে তারা গতিশীলতা দান করেছেন। এখানকার সাম্প্রতিক কবিগণ রূপকল্পের ব্যবহারে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, শব্দব্যবহারে তাঁরা শব্দের ব্যঞ্জনা নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছেন, আবার প্রকাশভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে বিশেষ কুশলতা। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে রাজনৈতিক চেতনা। তাই অল্প সময়ে এখানকার কাব্যধারার যথেষ্ট গৌরবজনক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের কবিতা দেশবিভাগের পর থেকেই যে সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, কালক্রমে তার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। অতিসাম্প্রতিক কালের কবিদের লেখনীতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কাব্যজগৎ সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। বিষয়ের বৈচিত্র্য ও আধুনিকতার চর্চা এখনকার কবিতার বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

গোলাম মোস্তফা

কাব্যশাখার সমৃদ্ধিসাধনে যে সব প্রবীণ কবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ দেশবিভাগের আগেই কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। যে কয়জন কবি দেশবিভাগের পরও অনেকদিন পর্যন্ত কাব্যসাহিত্যে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭-১৯৬৪) নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। তিনি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন, ইসলামের বিষয়বস্তু অবলম্বনে

কবিতা রচনা করেছেন। আবার প্রেমও তাঁর কতিপয় কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল। মুসলমানদের জাগরণবাণী তাঁর কাব্যে রূপায়িত হয়ে উঠলেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় বেশি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রেমানুভূতিসমৃদ্ধ কবিতায়। তাঁর কিছু অনুবাদ কবিতাও আছে। 'রক্তরাগ', 'খোশরোজ', 'হাস্নাহেনা', 'কাব্যকাহিনী', 'সাহারা', 'বুলবুলিস্তান', 'বনি আদম', 'কাব্যে কোরআন' প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। দেশবিভাগের আগেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। যে আদর্শবাদিতা তাঁর কাব্যপ্রেরণায় কাজ করেছে তা জীবনের শেষাবধি তিনি অনুসরণ করেছিলেন। বিশেষ আবেগ তাড়িত অনুভূতি এবং তার প্রকাশের জন্য সহজ সরল ভাষা ব্যবহারে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

শাহাদাৎ হোসেন

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) রবীন্দ্রানুসারী কবি। তিনি যেন এক স্বপ্নের জগতে বিচরণশীল ছিলেন, সেই স্বপ্নের জগতেই তিনি সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন। তাই সমসাময়িক কাব্যধারার প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে নি। অতীতের প্রতি তিনি ছিলেন বিমুগ্ধ, অতীত ঐতিহ্য তাঁর কাব্যের উপজীব্য হয়েছে। 'মৃদঙ্গ', 'কল্পরেখা', 'চিত্রপট', 'রূপচ্ছন্দা' প্রভৃতি তাঁর কাব্য। উপন্যাস-নাটকেও তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল।

জসীম উদ্‌দীন

জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-৭৬) একক অবদানে বাংলা কাব্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। 'পল্লীকবি' নামে খ্যাতি লাভ করে তিনি গতানুগতিক কাব্যপ্রবাহে ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছেন। ময়মনসিংহ গীতিকা ও অপরাপর লোকসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কাব্যাদর্শের নিবিড় ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রামবাংলার জীবনালেখ্য তাঁর কাব্যে চমৎকার সার্থকতা সহকারে বিধৃত হয়েছে। পল্লীর অশিক্ষিত মানবমানবীর সুখদুঃখ আনন্দবেদনা তাঁর অধিকাংশ কাব্যের বিষয়বস্তু। 'নকশী কাঁথার মাঠ' এদিক থেকে অনন্য। জীবনের জটিলতা থেকে জসীম উদ্‌দীনের কবিতা মুক্ত, বরং জীবনের সহজ সরল অভিব্যক্তিই তাঁর কাব্যে দেখা যায়। সেদিক থেকে তিনি অতিআধুনিক যুগের পরিসীমায় জন্মগ্রহণ করেও বিশেষ অর্থে আধুনিক কবি হয়ে ওঠেন নি। প্রকৃতির পরিবেশ থেকে তিনি কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। এ দিক থেকে তাঁকে প্রকৃতির কবি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুর বিবেচনায় তিনি কাহিনীকার। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর কাব্য আধুনিক কথাসাহিত্যের নিকট ঋণী। তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলোর নাম : 'রাখালী', 'নকশী কাঁথার মাঠ', 'বালুচর', 'ধানখেত', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'মাটির কান্না', 'হাসু', 'রঙিলা নায়ের মাঝি', 'এক পয়সার বাঁশি', 'রূপবতী', 'গাঙের পাড়', 'সকিনা', 'মা যে জননী কান্দে', 'সুচয়নী' ইত্যাদি। নাটক, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা ইত্যাদি গদ্যরচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব বিরাজমান। জসীমউদ্‌দীন যুগের বিক্ষোভ ও আলোড়ন থেকে নিজেকে সন্তর্পণে সরিয়ে রেখে গ্রামীণ প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করেছিলেন। সেখান থেকেই তিনি সংগ্রহ

করেছেন তাঁর কাব্যের উপকরণ। আর তা রূপায়িত করে তোলার জন্য পল্লীপ্রকৃতি থেকে অলঙ্কার নির্বাচন করেছেন। তিনি পল্লীজীবনের কথা বলেছেন, পল্লী ও তার মানুষকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন।

মতিউল ইসলাম

মতিউল ইসলাম (১৯১৪-৮৪) স্বল্প সংখ্যক কাব্য রচনা করলেও কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। 'মাটির কান্না' কাব্যে তাঁর সার্থকতার প্রথম পরিচয় ফুটে উঠেছিল। 'পুষ্পবীথি', 'প্রিয়া ও পৃথিবী', 'সপ্তকন্যা' তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ। প্রেম, সৌন্দর্য ও প্রকৃতির কবি হিসেবে তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছিলেন। ব্যঙ্গকবিতা রচনাতেও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। সমকালীন জীবনের অসঙ্গতি তাঁর এ ধরনের কবিতার উপজীব্য হয়েছে।

কে. এম. শমসের আলী

কে. এম. শমসের আলী (১৯০৯) কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর কাব্যের নাম 'আলিম্পন', 'স্বাক্ষর', 'সুরের মায়া', 'রমনার কবি', 'সোনার কমল', 'কল্লোল', 'সুরঝঙ্কার' ইত্যাদি।

ফররুখ আহমদ

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪) ইসলামি ভাবধারা অবলম্বনে কবিতা রচনা করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। দেশবিভাগের আগেই ১৯৪৪ সালে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয়। এ কাব্যের বিশেষ কয়টি কবিতা— 'সিন্দাবাদ', 'পাঞ্জেরী', 'ডাহুক', 'লাশ', 'সাত সাগরের মাঝি' কবির প্রতিভার সার্থক নিদর্শন। 'সাত সাগরের মাঝি' কবির শ্রেষ্ঠকাব্য। সমকালীন আদর্শবাদের পরিচয় এই কাব্যে বিধৃত। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে। ভাষা ব্যবহার ও শব্দ চয়নে কবি ইসলামি আদর্শের অনুসারী। ইসলামি উপকথার উপাদানও তিনি সংগ্রহ করেছেন এবং নতুন আঙ্গিকে তা পরিবেশন করেছেন। রূপকধর্মিতা তাঁর কাব্যের অনুষঙ্গী। ফররুখ আহমদের কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম : 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা', 'হাতেম তায়ী', 'নৌফেল ও হাতেম', 'মুহূর্তের কবিতা', 'পাখির বাসা', 'হরফের ছড়া' ইত্যাদি। 'নৌফেল ও হাতেম' তাঁর কাব্যনাট্য, 'মুহূর্তের কবিতা' তাঁর সনেট সঙ্কলন।

বেনজীর আহমদ

বেনজীর আহমদ (১৯০৩-৮৩) তাঁর কাব্যরচনায় বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। 'বন্দীর বাঁশি' ও 'বৈশাখী' তাঁর কাব্যগ্রন্থ। তিনি ছিলেন ইসলামি ঐতিহ্যের অনুরাগী। তাঁকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাবশিষ্য বলে বিবেচনা করা যায়।

মহীউদ্দীন

মহীউদ্দীন (১৯০৬-৭৫) অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁকে কাজী নজরুল ইসলামের ভাবশিষ্য বলে অভিহিত করা হয়। 'পথের গান', 'জনসাধারণ', 'স্বপ্ন সংঘাত যুদ্ধ বিপ্লব', 'দিগন্তের পথে একা', 'গরীবের পাঁচালী', 'এলো বিপ্লব' ইত্যাদি তাঁর কাব্যের নাম। নামের মাধ্যমে কাব্যের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ছিলেন একজন সাম্যবাদী কবি। তাঁর কবিতায় নির্যাতিত ও নিঃস্ব মানুষের মুক্তির বাণী রূপায়িত হয়ে উঠেছে। তিনি বঞ্চিত ও শোষিত জনগণকে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। গল্প উপন্যাস নাটক অনুবাদ ও ইংরেজি রচনাও তাঁর রয়েছে।

আবদুল কাদির

আবদুল কাদির (১৯০৬-৮৪) সনেট রচনাকারী কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। 'দিলরুবা' কাব্য লিখে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হন। 'উত্তর বসন্ত' তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থ। 'তাঁর কাব্যপ্রয়াসে মোহিতলালের ধ্রুপদী সংগঠন ও নজরুলের উদাত্ত আবেগের চমৎকার সমন্বয় সহজেই লক্ষণীয়।' আবদুল কাদির ছিলেন বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। ছন্দের ওপর তাঁর অগাধ অধিকারের জন্য তাঁকে ছান্দসিক কবি বিবেচনা করা হয়। গবেষণা ও গ্রন্থ-সম্পাদনায় তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব বিদ্যমান ছিল।

বন্দে আলী মিয়া

বন্দে আলী মিয়া (১৯৩৭-৭৯) গদ্যে পদ্যে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে পল্লীপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কাব্যবীথিকা', 'ময়নামতীর চর', 'পদ্মা নদীর চর', 'অনুরাগ', 'ক্ষুধিত ধরিত্রী', 'অস্তাচল', 'দক্ষিণ দিগন্ত' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। তিনি তাঁর কবিতায় পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কবিতায় গ্রামবাংলার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কাজী কাদের নেওয়াজ

কাজী কাদের নেওয়াজ (১৯০১-৮৩) 'মরাল' ও 'নীল কুমুদী' কাব্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : 'দুটি পাখি দুটি তীরে', 'মণিদীপ', 'উতলা সন্ধ্যা', 'কালের হাওয়া' ও 'মরুচন্দ্রিকা।'

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯১০-৮৩) মহিলা কবিগণের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'পসারিণী', 'মন ও মৃত্তিকা', 'অরণ্যের সুর' ইত্যাদি তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

বেগম সুফিয়া কামাল

বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-৯৯) মহিলাকবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারিণী। তবে বাংলাদেশের সামগ্রিক কাব্যসাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। 'সাঁঝের মায়া', 'মায়া কাজল', 'মন ও জীবন', 'প্রশান্তি ও প্রার্থনা', 'উদাত্ত পৃথিবী', 'দিওয়ান', 'স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন', 'অভিযাত্রিক', 'মৃত্তিকার ঘ্রাণ', 'মোর যাদুদের সমাধি

পরে' তাঁর কাব্যগ্রন্থ। গভীর বেদনাবোধ তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁর বক্তব্যে আছে সমকালীন জীবনাদর্শ, আছে স্বদেশপ্রীতি। নিজ দেশ ও মানুষ তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে। বক্তব্যে আছে সরলতা, ছন্দে আছে নৈপুণ্য।

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (১৯১১-৮৬) কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার হিসেবে পরিচিত। গ্রন্থের সংখ্যাও তাঁর কম নয়। তবে কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্বের নিদর্শন বিদ্যমান। তাঁর কাব্যের নাম : 'মরুসূর্য', 'পান্থবীণা', 'শীতে বসন্তে', 'এক ঝাঁক পাখি', 'মৌসুমী মন', 'রক্তকমল' ইত্যাদি।

সুফী মোতাহার হোসেন

সুফী মোতাহার হোসেন (১৯০৭-৭৫) সনেট রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'সনেট সংগ্রহ', 'সনেট সঞ্চয়ন', 'সনেট শতক', 'সনেট মালা' ইত্যাদি তাঁর কাব্য। প্রকৃতি ও প্রেম তাঁর সনেটের মূল উপাদান। তাঁর সনেটে জীবন ও প্রকৃতি সার্থক ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সনেটের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য রূপায়ণে তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে।

তালিম হোসেন

তালিম হোসেন (১৯১৮-৯৯) কবি হিসেবে মুসলিম ঐতিহ্যের অনুসারী। আদর্শের দিক থেকে কবি ফররুখ আহমদের সঙ্গে তাঁর ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। 'দিশারী', 'শাহীন', 'ইসলামী কবিতা', 'নূহের জাহাজ' নামে তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

সিকানদার আবু জাফর

সিকানদার আবু জাফর (১৯১৮-৭৫) সাহিত্যক্ষেত্রে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিভার পরিচয় দিলেও কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি সমধিক। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম : 'প্রসন্ন প্রহর', 'বৈরী বৃষ্টিতে', 'তিমিরান্তিক', 'কবিতা : ১৩৭২' ইত্যাদি। বিখ্যাত 'সমকাল' সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করে তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে গেছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে সমকালীন জীবনের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। সুতীব্র ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশেও তাঁর কৃতিত্ব বিদ্যমান।

আবদুল হাই মাশরেকী (১৯১৯) কবিতা রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। 'দুখুমিয়ার জারী', 'মাঠের কবিতা মাঠের গান' তাঁর কাব্যের নাম।

আহসান হাবীব

আহসান হাবীব (১৯১৭-৮৫) বিভিন্ন ধরনের কবিতা লিখে বাংলাদেশের কাব্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাত্রিশেষ' তাঁর জন্য খ্যাতি এনেছিল। তাঁর 'কবিতায় স্নিগ্ধতা এবং অলস মধ্যাহ্নের বিশ্রামের আনন্দ' আছে। তাঁর অন্যান্য কাব্য হচ্ছে : 'ছায়া হরিণ', 'সারা দুপুর', 'আশায় বসতি', 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো', 'দুই হাতে দুই আদিম পাথর', 'প্রেমের কবিতা', 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' প্রভৃতি। তাঁর কবিতায়

আধুনিকতার ছাপ খুব স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার বিষয় নির্বাচনে ও আঙ্গিকগত রূপায়ণে তিনি বাংলা কবিতার আধুনিকতার ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। তিনি তাঁর কবিতায় দেশকাল সমাজ ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আবুল হোসেন

আবুল হোসেন (১৯২১-২০১৪) বহুদিন আগেই কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মুসলমান কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথম আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য কাব্যে রূপায়িত করে তুলেন। তাঁর প্রথম কাব্যের নাম 'নব বসন্ত' এবং এর জন্যই তাঁর বেশি খ্যাতি। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম—'বিরস সংলাপ', 'হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস', 'দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে', 'এখনও সময় আছে', 'নির্বাচিত কবিতা', 'রাজারাজড়া' ইত্যাদি।

হাবীবুর রহমান

হাবীবুর রহমান (১৯২২--৭৬) 'উপাত্ত' নামে একটি কাব্য লিখেছিলেন।

সৈয়দ আলী আহসান

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) গবেষণামূলক সাহিত্যসৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখালেও কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। অতিআধুনিক কবিতার বিচিত্র বৈশিষ্ট্য তিনি বাংলা কাব্যে রূপায়িত করেছেন। সমালোচকের মতে, 'সর্বত্রই কবি জীবনকে এবং অস্তিত্বকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধির সূত্রে। এই উপলব্ধির দেহ মন প্রকৃতি এবং হৃদয়ের ইচ্ছা যন্ত্রণা ও আনন্দের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে।' সৈয়দ আলী আহসানের কাব্যগুলোর নাম : 'অনেক আকাশ', 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত', 'সহসা সচকিত', 'উচ্চারণ', 'আমার প্রতিদিনের শব্দ', 'কাব্য সংগ্রহ', 'চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা', 'সমুদ্রেই যাব', 'রজনীগন্ধা', 'নির্বাচিত কবিতা' ইত্যাদি।

ইমাউল হক

ইমাউল হক (১৯২৩-৯০) কবিতা রচনায় বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। 'অনুরাগ' তাঁর কাব্যের নাম।

সানাউল হক

সানাউল হক (১৯২৪-৮৩) ছিলেন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম : 'নদী ও মানুষের কবিতা', 'সম্ভবা অনন্যা', 'সূর্য অন্যতর', 'ইচ্ছা অন্যতর', 'পদ্মিনী শঙ্খিনী', 'বিচূর্ণ আর্শিতে', 'কাল সমকাল', 'একটি ইচ্ছা সহস্র পালে', 'দুঃখ নয় দীর্ঘ পরিণাম', 'প্রবাস যখন', 'বিরাশির কবিতা', 'বিরতিবিহীন', 'উত্তীর্ণ পঞ্চাশে' ইত্যাদি। তিনি বিদেশী কবিতার অনুবাদও করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'বরিস পাস্টারনাকের কবিতা' ও 'ইভানগলের কবিতা' উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবিতায় প্রেম, নিসর্গ, স্বদেশ ও বিভিন্ন সূক্ষ্ম মানসিক অনুভূতি রূপ লাভ করেছে। তাঁর কবিতার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও মুক্তবুদ্ধির ধ্যান-ধারণা রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

সৈয়দ আলী আশরাফ

সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-৯৮) 'চৈত্র যখন' কাব্যের রচয়িতা।

আতাউর রহমান

আতাউর রহমান (১৯২৫-৯৯) কবিতা ও প্রবন্ধ রচনায় খ্যাতিমান। তাঁর কবিতার বই : 'দুই ঋতু', 'একদিন প্রতিদিন', 'নিষাদ নগরে আছি', 'ভালোবাসা চিরশক্র', 'ইদানীং রঙ্গমঞ্চ', 'ভালোবাসা এবং তারপর', 'সারাটা জীবন ধরে' ইত্যাদি।

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী (১৯২৬) বৈচিত্র্যধর্মী সাহিত্যসৃষ্টিতে রত ছিলেন। তাঁর কাব্য 'আমির সওদাগর' ও 'যেহেতু'। অতীতের কাহিনী তিনি নতুন করে পরিবেশন করেছেন।

আবদুল গনি হাজারী

আবদুল গনি হাজারী (১৯২৬-৭৬) 'সামান্য ধন', 'সূর্যের সিঁড়ি', 'জাগ্রত প্রদীপে' প্রভৃতি কাব্য রচনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর কাব্যে নাগরিক চেতনা ও যুগযন্ত্রণা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি তাঁর কবিতায় নাগরিক জীবনের বিকার ও অসঙ্গতিকে বিদ্রূপের ব্যঞ্জনা সহকারে রূপায়িত করে তুলেছেন। তাঁর কবিতা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় সমুজ্জ্বল। তিনি বাংলাদেশে উচ্চ পর্যায়ের মানুষের ভিতরের গ্লানি ব্যঙ্গসহকারে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবদুর রশীদ খান

আবদুর রশীদ খান (১৯২৭) কবিতা রচনায় বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্য 'নক্ষত্র মানুষ মন', 'বন্দী মুহূর্ত', 'বিম্বিত প্রহর', 'অন্বিষ্ট স্বদেশ' ইত্যাদি। 'মহুয়া' কাব্যে তিনি লোককাহিনীকে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী

ড. আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭) একসময় বিশেষ কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিচিত্র ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তবে কবি হিসেবে তাঁর স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। তাঁর কাব্যের নাম : 'তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা', 'বিষকন্যা', 'সাত ভাই চম্পা', 'উত্তর আকাশের তারা', 'তিরিশ বসন্তের ফুল', 'কুচবরণ কন্যে', 'ঝড় তুফানে', 'আরশিনগর', 'বৃক্ষ দাও ছায়া দাও', 'দাঁড়াও পথিকবর' ইত্যাদি। তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সহজ সরল ভাষায় বিধৃত হয়েছে।

ড. মযহারুল ইসলাম

ড. মযহারুল ইসলাম (১৯২৭-২০০৩) গবেষণামূলক সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি কাব্য রচনাও করেছেন। তাঁর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'মাটির ফসল', 'বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি', 'যেখানে বাঘের থাবা', 'অপরাহ্নে বিবস্ত্র প্রাতঃরাশ', 'দুঃসময়ের ছড়া' ইত্যাদি। 'আর্তনাদে বিবর্ণ' তাঁর ব্যঙ্গকবিতার সংকলন।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮-২০১৪) 'হৃদয়ে জনপদে', 'চাঁদ ডুবে গেলে', 'আসন্ন বাস্তিল ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থের রচয়িতা। শেকসপীয়রের কিছু সনেটের অনুবাদও তিনি করেছেন।

লতিফা হিলালী

লতিফা হিলালী (১৯২৮) 'এক আকাশে অনেক তারা' নামে কাব্য লিখেছেন। মহিলা কবি হিসেবে তাঁর মর্যাদা।

আহমদ রফিক

আহমদ রফিক (১৯২৯) 'নির্বাসিত নায়ক', 'বাউল মাটিতে মন', 'বিপ্লব ফেরারী, তবু', 'পড়ন্ত রোদ্দুরে', 'রক্তের নিসর্গে স্বদেশ' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

শামসুর রাহমান

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) বাংলাদেশের কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভের অধিকারী। অতিআধুনিক কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনায় সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কাব্যে সমকালীন জীবনের আন্দোলন আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়ে উঠেছে। তাঁর সংবেদনশীল কবিসত্তা, তাঁর জীবনাসক্তি এবং অতিআধুনিক কবিতার নির্মাণ কৌশল তাঁকে বাংলাদেশের প্রধানতম কবি হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম তাঁর কাব্যে নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম : 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'রৌদ্র করোটিতে', 'বিধ্বস্ত নীলিমা', 'নিরালোকে দিব্যরথ', 'নিজ বাসভূমে', 'বন্দী শিবির থেকে', 'দুঃসময়ের মুখোমুখী', 'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা', 'এক ধরনের অহংকার', 'আদিগন্ত নগ্নপদধ্বনি', 'আমি অনাহারী', 'অপরাহ্নের ভিন্ন স্মৃতি', 'প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে', 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে', 'শূন্যতায় তুমি শোকসভা', 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ', 'ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই', 'অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই', 'যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে', 'অবিরল জলভ্রমি', 'মাতাল ঋত্বিক', 'কবিতার সঙ্গে ঘর গেরস্থালী', 'দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে', 'একফোঁটা কেমন অনল', 'ধুলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ', 'টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে', 'স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বার বার', 'আকাশ আসবে নেমে', 'ঝর্ণা আমার আঙুলে', 'গৃহযুদ্ধের আগে', 'ধ্বংসের কিনারে বসে', 'খণ্ডিত গৌরব', 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'ইকারুসের আকাশ', 'প্রেমের কবিতা', 'নায়কের ছায়া', 'আমার কোনো তাড়া নেই', 'হোমারের স্বপ্নময় হাত',

'শিরোনাম মনে পড়ে না', 'আমার কজন সঙ্গী', 'বেশি ভালো থাকতে নেই', 'শামসুর রাহমানের রাজনৈতিক কবিতা', 'মঞ্চের মাঝখানে', 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়', 'হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো', 'সে এক পরবাসে', 'হরিণের হাড়', 'উজাড় বাগানে', 'এসো কোকিলা এসো স্বর্ণচাঁপা', 'মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই', 'তুমিই নিঃশ্বাস তুমিই হৃদস্পন্দন', 'তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি', 'হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল', 'ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ' ইত্যাদি। শামসুর রাহমানের কাব্যে আধুনিকতার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে এবং কাব্যের সাম্প্রতিকতম বিবর্তনের সঙ্গেও তিনি সংযোগসাধন করে আছেন। তাঁর 'মূল্যবোধ প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিন্তু এর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সূত্রে জড়িত হয়েছে পরিপার্শ্ব, সমাজ ও সময়সজ্ঞানতা। উপমা ও চিত্রকল্পে তিনি প্রকৃতিনির্ভর এবং বিষয় ও উপাদানে শহরকেন্দ্রিক।'

আবদুস সাত্তার

আবদুস সাত্তারের (১৯৩১-২০০০) কাব্য 'বৃষ্টিমুখর', 'অন্তরঙ্গ ধ্বনি', 'আমার ঘর নিজের বাড়ি', 'নামের মৌমাছি', 'বিম্বিত স্বরূপ', 'আমার বনবাস' প্রভৃতি।

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ

ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কবিতা রচনায়ও তাঁর বিশিষ্টতা রয়েছে। 'মানচিত্র', 'ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ', 'সূর্য জ্বালার সোপান', 'লেলিহান পাণ্ডুলিপি' ইত্যাদি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। সমাজসচেতনতা তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

হাসান হাফিজুর রহমান

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-৮৩) একজন বিশিষ্ট কবি। 'বিমুখ প্রান্তর', 'অন্তিম শরের মত', 'আর্ত শব্দাবলী', 'যখন উদ্যত সঙ্গীন', 'বজ্রে চেরা আঁধার আমার', 'শোকার্ত তরবারি', 'আমার ভেতরের বাঘ', 'ভবিতব্যের বাণিজ্যতরী' প্রভৃতি তাঁর কাব্য। বক্তব্যের বলিষ্ঠতা তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের কাব্যে আধুনিকতার প্রবর্তনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর কবিতায় জনজীবনের প্রত্যাশা যন্ত্রণা ও প্রতিবাদের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে। মানুষের সংগ্রামী জীবনচেতনা ছিল তাঁর কবিতার উপজীব্য। স্বদেশের সমকালীন জটিলতা তাঁর কাব্যে শিল্পরূপ লাভ করেছে।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্ (১৯৩২-২০০১) একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবে পরিচিত। তাঁর কাব্যের নাম : 'সাতনরী হার', 'কখনো রং কখনো সুর', 'কমলের চোখ', 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি', 'আমার সময়', 'সহিষ্ণু প্রতিক্ষা', 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা', 'নির্বাচিত কবিতা', 'আমার সকল কথা' ইত্যাদি। আঙ্গিকের নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পরিচয় তাঁর কাব্যে বিধৃত।

জাহানারা আরজু

জাহানারা আরজু (১৯৩২) মহিলা কবিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাব্যের নাম : 'নীলস্বপ্ন', 'রৌদ্র ঝরা গান' ও 'ক্রন্দসী আত্মজা'।

কায়সুল হক

কায়সুল হক (১৯৩৩) 'শব্দের সাঁকো' নামক কাব্যের রচয়িতা।

সৈয়দ শামসুল হক

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫) কথাসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিমান থাকলেও কবিতা রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'একদা এক রাজ্যে', 'প্রতিধ্বনিগণ', 'নাভীমূলে ভস্মধারা', 'পরাণের গহীন ভিতর', 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা', 'অপর পুরুষ', 'বিরতিহীন উৎসব', 'নিজস্ব বিষয়', 'অগ্নি ও জলের কবিতা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'বেজান শহরের জন্য কোরাস', 'রজ্জুপথে চলেছি', 'এক আশ্চর্য সংগমের স্মৃতি', 'কাননে কাননে', 'তোমারই সন্ধানে', 'আমি জন্মগ্রহণ করি নি', 'তোরাপের ভাই', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'রাজনৈতিক কবিতা', 'কবিতা সংগ্রহ', 'প্রেমের কবিতা' ইত্যাদি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ।

সাইয়িদ আতিকুল্লাহ

সাইয়িদ আতিকুল্লাহ (১৯৩৩-৯৮) 'শাসন নেই ধমক নেই', 'রোজ তোমাকে বেরুতে হয়', 'যদি কিছু পাই', 'একই টেবিলে দশজন', 'আমাকে ছাড়া অনেক কিছু', 'আঁধির যত শত্রুমিত্র', 'অদম্য পথিকের গান', 'এই যে তুমুল বৃষ্টি', 'সবখানেই চড়া রোদ', 'এই যে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্যাখো', 'চেয়ে দেখি কত কিছু' ইত্যাদি তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

আল মাহমুদ

আল মাহমুদ (১৯৩৬) কবি হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন। 'লোক লোকান্তর', 'কালের কলস', 'সোনালী কাবিন', 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো', 'বখতিয়ারের ঘোড়া', 'মিথ্যেবাদী রাখাল', 'একচক্ষু হরিণ', 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না', 'প্রহরান্তের পাশফেরা', 'পাখির কাছে ফুলের কাছে', 'আরব্য রজনীর রাজহাঁস', 'আমি দূরগামী', 'আল মাহমুদের প্রেমের কবিতা', 'দোয়েল ও দয়িতা', 'প্রেমের কবিতা', 'কবিতা সমগ্র', 'আল মাহমুদের কবিতা' ইত্যাদি তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮) কয়েকটি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যগুলোর নাম : 'দুর্লভ দিন', 'শঙ্কিত আলোকে', 'বিপন্ন বিষাদ', 'প্রতনু প্রত্যাশা', 'ভালবাসার হাতে', 'অশান্ত অশোক', 'ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার', 'তৃতীয় তরঙ্গে', 'সঙ্গী বিহঙ্গ', 'কোলাহলের পর', 'ধীর প্রবাহে', 'ভাষাময় প্রজাপতি', 'মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা সংগ্রহ' ইত্যাদি। কিছু সংখ্যক অনুবাদ কবিতাও তাঁর রয়েছে।

ফজল শাহাবুদ্দিন

ফজল শাহাবুদ্দিন (১৯৩৬-২০১৪) রচিত কাব্যের নাম : 'তৃষ্ণার অগ্নিতে একা', 'আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর', 'আততায়ী সূর্যাস্ত', 'অন্তরীক্ষে অরণ্য', 'সান্নিধ্যের আর্তনাদ', 'আলোহীন অন্ধকারহীন', 'সনেটগুচ্ছ', 'অবিনশ্বর দরোজায়', 'আমার নির্বাচিত কবিতা', 'হে নীল সমুদ্র হে বৃক্ষ সবুজ', 'দিক চিহ্নহীন', 'ছিন্নভিন্ন কয়েকজন', 'জখম জখম নাগমা', 'বাতাসের কাছে', 'ছায়া ক্রমাগত', 'নিসর্গের সংলাপ', 'পৃথিবী আমার পৃথিবী', 'ক্রন্দনধ্বনি', 'ক্রমাগত হাহাকার' ইত্যাদি।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (১৯৩৬) কাব্যরচনায় বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্যের নাম : 'জুলেখার মন', 'অন্ধকারে একা', 'রক্তিম হৃদয়', 'আপন ভুবনে', 'বৈরিতার হাতে বন্দী', 'মোহাম্মদ মাহফুজল্লাহর কাব্যসম্ভার' ইত্যাদি।

ইমরান নূর / মনযুর-উল-করিম

ইমরান নূর (১৯৩৬) বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সমকালীন জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁর কবিতায় বিধৃত হয়েছে। তাঁর কাব্যগুলোর নাম হচ্ছে : 'প্রেক্ষাপট ভিন্নতর', 'শীতল দুপুর', 'ভ্যানিটি ব্যাগে ভালবাসা', 'আমাকে একটু সময় দিতে হবে', 'মেঘের অশ্রু', 'নেপথ্যে উচ্চারণ', 'রাজা আমার মনের মতো', 'ভোম্বলের অম্বল', 'ছড়ায় ছড়ায় গল্প', 'যে দেশে বৃষ্টি কথা বলে' ইত্যাদি।

জিয়া হায়দার

জিয়া হায়দার (১৯৩৬) 'একতারাতে কান্না', 'কৌটোর ইচ্ছেগুলো', 'দূর থেকে দেখা', 'আমার পলাতক ছায়া', 'লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'ভালবাসা ভালবাসা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন।

ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-৯০) 'আপন যৌবন বৈরী', 'আক্রান্ত গজল', 'যেহেতু জন্মান্ধ' কাব্যগ্রন্থে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

দিলওয়ার

দিলওয়ার (১৯৩৭) 'ঐক্যতান', 'উদ্বিগ্ন উল্লাস', 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি', 'জিজ্ঞাসা', 'পুবাল হাওয়া', 'স্বনিষ্ঠ সনেট', 'নির্বাচিত কবিতা', 'বাংলা তোমার আমার' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

আবু বকর সিদ্দিক

আবু বকর সিদ্দিক (১৯৩৪) 'ধবল দুধের স্বরগ্রাম', 'হেমন্তের সোনালতা', 'বিনিদ্র কালের ভেলা', 'হে লোক সভ্যতা', 'মানুষ তোমার বিক্ষত দিন', 'নিজস্ব এই মাতৃভাষা', 'কালো কালো মেহনতি পাখি', 'কংকালে অলংকার দিয়ো', 'শ্যামল যাযাবর' ইত্যাদি কাব্য রচনা করেছেন।

ওমর আলী

ওমর আলী (১৯৩৯) 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর নাম শুনেছি', 'তেমাথার শেষে নদী', 'স্থায়ী দুর্ভিক্ষ সম্ভাব্য প্লাবন', 'আত্মার দিকে', 'অরণ্যে একটি লোক', 'নদী', 'নিঃশব্দ বাড়ি', 'প্রস্তরযুগ তাম্রযুগ', 'ডাকছে সংসার', 'ফেরার সময়', 'যে তুমি আড়ালে', 'নরকে বা স্বর্গে' ইত্যাদি কাব্যের রচয়িতা।

ড. হায়াৎ মামুদ

ড. হায়াৎ মামুদ (১৯৩৯) 'স্বগত সংলাপ', 'প্রেম অপ্রেম নিয়ে বেঁচে আছি' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন।

মাহবুব তালুকদার

মাহবুব তালুকদার (১৯৪০) 'জন্মের দক্ষিণা', 'আত্মসমর্পণ', 'ক্যায়া সীন হ্যায়' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে কাব্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

মোফাজ্জল করিম

'মোফাজ্জল করিমের (১৯৪১) কাব্য 'আড়াল থেকে', 'একটি সার্টিফিকেট চাই', 'অবচেতনে রাজাধিরাজ', 'ভেবো না বৃষ্টি হবে না', 'চলে গেলে পারলে যেতে', 'তোমার হাতে গ্রেনেড এবং আমার বুকে প্রেম', 'প্রথম দেখার দিন' প্রভৃতি।

এখলাসউদ্দিন আহমদ

এখলাসউদ্দিন আহমদ (১৯৪০) ছড়া লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম : 'এক যে ছিল নেংটি', 'বাজাও ঝাঁঝর বাদ্যি', 'রাজরাজড়ার গপ্পো', 'মাঠ পারের গল্প', 'তুনতুবুড়ির ছড়া', 'হঠাৎ রাজার খামখেয়ালী', 'ছোট্ট রঙিন পাখি', 'অন্য মনে দেখা', 'প্রতিরোধের ছড়া', 'কাঁদুনে রাজার কান্নাকাটি', 'টাট্টু ঘোড়া টাট্টু ঘোড়া' ইত্যাদি।

শহীদ কাদরী

শহীদ কাদরীর (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থ 'উত্তরাধিকার', 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা', 'কোথাও কোন ক্রন্দন নেই', 'শহীদ কাদরীর কবিতা', 'প্রেম বিরহ ভালোবাসার কবিতা' প্রভৃতি।

আবদুল মান্নান সৈয়দ

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ', 'জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা', 'ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ', 'নির্বাচিত কবিতা', 'কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড', 'পরাবাস্তব কবিতা', 'পার্ক স্ট্রিটে এক রাত্রি', 'মাছ সিরিজ', 'আমার সনেট', 'সকল প্রশংসা তাঁর', 'নীরবতা গভীরতা দুই বোন বলে কথা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

রফিক আজাদ

রফিক আজাদ (১৯৪৩) 'অসম্ভবের পায়ে', 'সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে', 'নির্বাচিত কবিতা', 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া', 'সশস্ত্র সুন্দর', 'হাতুড়ীর নিচে জীবন', 'অপর অরণ্য', 'গদ্যের গহন অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া আমি এক দিগভ্রান্ত পথিক', 'খুব বেশি দূরে নয়', 'প্রিয় শাড়িগুলি', 'এক জীবনে', 'অঙ্গীকারের কবিতা', 'নির্বাচিত কবিতা', 'প্রেমের কবিতা', 'ভালোবাসার কবিতা', 'প্রিয় শাড়িগুলি', 'পরিকীর্ণ পানশালা আমার স্বদেশ', 'খুব বেশি দূরে নয়' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন।

আসাদ চৌধুরী

আসাদ চৌধুরীর (১৯৪৩) কাব্যগ্রন্থ : 'তবক দেওয়া পান', 'বিত্ত নাই বেসাত নাই', 'দুঃখীরা গল্প করে', 'যে পারে পারুক', 'ভালবাসার কবিতা', 'মধ্যমাঠ থেকে', 'মেঘের জুলুম পাখির জুলুম', 'প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড়', 'জলের মধ্যে লেখাজোখা', 'আমার কবিতা', 'নদীও বিবস্ত্র হয়', 'বাতাস যেমন পরিচিত' ইত্যাদি।

মহাদেব সাহা

মহাদেব সাহা (১৯৪৪) 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', 'মানব এসেছি কাছে', 'চাই বিষ অমরতা', 'কি সুন্দর অন্ধ', 'ধুলো মাটির মানুষ', 'তোমার পায়ের শব্দ','লাজুক লিরিক', 'ফুল কই, শুধু অস্ত্রের উল্লাস', 'কোথায় যাই কার কাছে যাই' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

নির্মলেন্দু গুণ

নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫) 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই', 'না প্রেমিক না বিপ্লবী', 'কবিতা, অমিমাংসিত রমণী', 'দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী', 'চৈত্রের ভালবাসা', 'ও বন্ধু আমার', 'আনন্দ কুসুম', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'আবার একটা ফুঁ দিয়ে দাও', 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র', 'চাষাভূষার কাব্য', 'পৃথিবী জোড়া গান', 'প্রথম দিনের সূর্য', 'নিরঞ্জনের পৃথিবী', 'যখন আমি বুকের পাঁজর খুলে দাঁড়াই', 'ইসক্রা', 'অচল পদাবলী', 'শান্তির ডিক্রি', 'নেই কেন সেই পাখি', 'দুঃখ করো না, বাঁচো', 'দূর হ দুঃশাসন', 'মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা', 'ধাবমান হরিণের দ্যুতি', 'অনন্ত বরফবীথি', 'আনন্দ উদ্যান', 'পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ', 'নির্বাচিতা', 'রাজনৈতিক কবিতা', 'প্রেমের কবিতা', 'কাব্য সমগ্র' প্রভৃতি কাব্য রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতায় বাংলার গণমানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনান্দোলনের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

হুমায়ুন কবির

হুমায়ুন কবিরের (১৯৪৫-৭২) কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমিত ইস্পাত' তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অপ্রকাশিত কবিতা ও অন্যান্য রচনা 'হুমায়ুন কবির রচনাবলী'তে সংকলিত হয়েছে।

রুহুল আমীন খান

রুহুল আমীন খান (১৯৪৬) ইসলামি ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে লিখেছেন 'স্বর্ণ ঈগল' কাব্যগ্রন্থটি। তাঁর ছড়ার বইগুলো হল : 'দশকোটি গিনিপিগ', 'সে আগুন জ্বলবে', 'শ্লোগান একটাই', 'এ লড়াই চলবে' ইত্যাদি।

সায্‌যাদ কাদির

সাযয্াদ কাদির (১৯৪৬) 'যথেচ্ছ ধ্রুপদ', 'রৌদ্রে প্রতিধ্বনি', 'দূরতমার কাছে', 'দরজার কাছে নদী', 'আমার প্রিয়' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন।

আবু কায়সার (১৯৪৫) 'আমি খুব একটি লাল গাড়িকে', 'শেষ মনোহর তুমি', 'যাদুঘরে প্রজাপতি', 'জোছনায় মাতাল জেব্রাগুলো', 'লজ্জার দেরাজ' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

বাংলাদেশের কাব্যে আরও অজস্র কবির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবির সংখ্যাও কম নয়। **সিকদার আমিনুল হক** (১৯৪২) 'বহুদিন উপেক্ষায় বহুদিন অন্ধকারে', 'দূরের কার্নিস', 'তিন পাপড়ির ফুল'; **ফরহাদ মযহার** (১৯৪৬) 'খোকন ও তাঁর প্রতিপুরুষ', 'ত্রিভঙ্গের তিনটি জ্যামিতি', 'আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের সামনে', 'লেফটেনান্ট জেনারেল ট্রাক', 'বৃক্ষ', 'সুভা কুসুম দুই ফর্মা', 'অকস্মাৎ রপ্তানীমুখী নারী মেশিন', 'এবাদতনামা', 'দরদী বকুল'; **হুমায়ুন আজাদ** (১৯৪৭) 'অলৌকিক ইস্টিমার', 'জ্বলো চিতা বাঘ', 'যতোই গভীরে যাই মধু, যতোই উপরে যাই নীল', 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে'; **আবুল হাসান** (১৯৪৭-৭৫) 'রাজা যায় রাজা আসে', 'পৃথক পালঙ্ক', 'যে তুমি হরণ করো'; আনোয়ার পাশা 'নদী নিঃশেষিত হলে', 'সমুদ্র শঙ্খলতা উজ্জয়িনী ও অন্যান্য কবিতা'; **হাবিবুল্লাহ্ সিরাজী** (১৯৪৮) 'দাও বৃক্ষ দাও দিন', 'মোমশিল্পের ক্ষয়ক্ষতি', 'আমার একজনই বন্ধু', 'পোশাক বদলের পালা'; **মুহম্মদ নূরুল হুদা** (১৯৪৯) 'শোণিতে সমুদ্রপাত', 'আমার সশস্ত্র শব্দবাহিনী', 'শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি', 'কুসুমের ফণা', 'নির্বাচিত কবিতা'; **সৈয়দ হায়দার** (১৯৫০) 'কে বিতর্কিত কে তর্কাতীত', 'পরমার্থ অন্ধকার', 'কোন সুখবর নেই', 'ভুলগুলো নাড়া দেয়', 'ধ্বংসের কাছাকাছি', 'ভাঙ্গলে মাটির মত', 'প্রতিপদে সীমান্ত'; **দাউদ হায়দার** (১৯৫২) 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ', 'সম্পন্ন মানুষ নই', 'আমি ভালো আছি, তুমি?', 'এই শাওনে পরবাসে', 'নারকীয় ভুবনের কবিতা', 'আমি পুড়ছি জল ও আগুনে'; **নাসির আহমেদ** (১৯৫৪) 'পাথরগুলো দুঃখগুলো', 'আকুলতা শুভ্রতার জন্য', 'তোমাকেই আশা লতা', 'আমি স্বপ্ন তুমি রাত্রি', 'বৃক্ষমঙ্গল'; **হাসান হাফিজ** (১৯৫৫) 'তুমি বধূ অবিবাহের', 'অবাধ্য অর্জুন', 'হয়তো কিছু হবে', 'ভালবাসা তার ভাষা', 'এখন যৌবন যার', 'দূর পাহাড়ের ঘুম', 'সকল ডুবুরি নয় সমান সন্ধিৎসু', 'তৃষ্ণার তানপুরা', 'ভালোবাসার অগ্নিচুমুক', 'হৃদয় বড়ো কাঁদছে', 'না ওড়ে না পোড়ে প্রেম', 'যে মধুমদ তোমার ফুলে'; **সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল** (১৯৫৮) 'অপেক্ষায় আছি প্রতীক্ষায় থেকো', 'তৃষ্ণার্ত জলপরী', 'সতীদাহ, সীতার বিবৃতি', 'তবু কেউ কারো নই', 'শহরের শেষ বাড়ি', 'ঘাতকের হাতে

সংবিধান', 'একি কাণ্ড পাতা নেই'; **শিহাব সরকার** (১৯৫২) 'কলিযুগ ও অন্যান্য কবিতা', 'জয় হবে দীর্ঘশ্বাসে', 'লাল যৌবন দিন', 'তোমার ক্ষত্রিয়', 'করো গান বনজ্যোৎস্নার', 'ব্যাবিলন এক্সপ্রেস'; **জাহিদুল হক** (১৯৪৯) 'চতুষ্পদী সন্ধ্যা' 'তোমার হোমার', 'নীল দূতাবাস', 'সেই নিঃশ্বাসগুচ্ছ', 'পকেট ভর্তি মেঘ', 'প্যারীগুচ্ছ ও অন্যান্য কবিতা', 'এই ট্রেনটির নাম গার্সিয়া লোরকা', 'এ উৎসবে আমি একা'; হেলাল হাফিজ 'যে জ্বলে আগুন জ্বলে' ইত্যাদি কাব্যে নিজেদের কবিপ্রতিভার নিদর্শন রেখেছেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন

প্রবন্ধসাহিত্য

১। বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলিম মানসের বিবর্তনের পরিচয় দাও।

৩। 'বাংলাদেশের গবেষণা-সাহিত্য'—এই শিরোনামায় একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর।

৪। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর আমাদের দেশে গবেষণা সাহিত্যের যে বিকাশ ঘটিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে গবেষণাসাহিত্যের এবং সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে প্রয়াস সাধিত হইয়াছে তাহার পরিচয় দিয়া একটি নিবন্ধ লিখ।

৬। 'শুধু কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনার মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষের ভাষা-সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় প্রস্ফুট নহে, ভাষা সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা কর্মেও তাহার স্বাক্ষর মিলিতেছে।'—বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যসাধনার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্যটির যাথার্থ্য বিশ্লেষণ কর।

উপন্যাস

১। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলিতে দেশ ও গ্রামীণ মানুষকে প্রকৃতি ও জীবন ব্যবস্থার পটভূমিতে চিত্রিত করার আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়—আলোচনা কর।

২। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কথাসাহিত্যের যে বিকাশ ঘটিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া একটি নিবন্ধ রচনা কর।

৪। আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে সমকালীন সমাজের পরিচয় কতটা বিধৃত করিতে পারিয়াছে তাহা যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর।

৫। 'বাংলাদেশের উপন্যাসে বিধৃত জীবন ও সমাজ' এই শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখ।

৬। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর ভিত্তি করে রচিত উপন্যাসগুলোর পরিচয় দাও।

৭। ঔপন্যাসিক হিসেবে শওকত ওসমানের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৮। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অথবা শওকত ওসমানের উপন্যাসসমূহের পরিচয় দাও।

৯। ইতিহাস অবলম্বনে রচিত বাংলাদেশের উপন্যাসের পরিচয় দাও।

ছোটগল্প

১। 'বাংলাদেশের ছোটগল্পে একই সঙ্গে গ্রামজীবনের অন্তরঙ্গ প্রতিফলন এবং নাগরিক জীবনের যন্ত্রণাকাতরতার পরিচয় পাই।'—এই মন্তব্যের যাথার্থ্য নির্ণয় কর।

২। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের যে বিকাশ ঘটে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। তোমার প্রিয় কোনো গল্পকারকে অবলম্বন করে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের চারিত্র্য বিশ্লেষণ কর।

৪। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের সাফল্য নির্ণয় কর।

৫। দেশকাল ও সমাজসচেতন লেখক হিসেবে বাংলাদেশের ছোটগল্পকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের ছোটগল্পের যেসব ধারা ও প্রণবতা লক্ষ করা যায় তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

নাট্যসাহিত্য

১। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যরচনার পরিচয় দিয়া নাট্যসাহিত্যের স্বল্পতা এবং অনুৎকর্ষের কি কি কারণ থাকিতে পারে সে সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

২। বাংলাদেশের সাহিত্যে নাট্যসাহিত্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৩। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের আঙ্গিক ও বিষয়গত বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৪। 'বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য না প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ না ভাবী সম্ভাবনার আলোকে প্রোজ্জ্বল—বিভাগোত্তর যুগে বাংলাদেশের নাট্যসৃষ্টির পরিচয় দিয়া উক্তিটির সত্যাসত্য যাচাই কর।

৫। বিভাগপূর্ব ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়াও বিভাগোত্তর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে দৈন্যের কারণগুলি কি কি হইতে পারে বলিয়া তোমার মনে হয়? এ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য পেশ কর।

৬। 'বাংলাদেশে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় নাট্যশাখা অতিশয় দুর্বল।'—বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

৭। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৮। 'কাব্য ও উপন্যাসের তুলনায় বিভাগোত্তর কালের নাট্যসাহিত্য অনেকটা নিষ্প্রভ।'—আলোচনা কর।

৯। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা নাটকের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ কর।

১০। 'বাংলাদেশের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর।

১১। 'মুক্তিযুদ্ধের নাটক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখ।

১২। সাহিত্যমূল্যের দিক থেকে বাংলাদেশের গত তিন দশকের যেকোন তিনটি উৎকৃষ্ট নাট্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

কাব্যসাহিত্য

১। 'বাংলাদেশের কাব্য নানা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে একটি লক্ষযোগ্য মানে পৌঁছেছে।'—আলোচনা কর।

২। বাংলাদেশের কবিতা দুটি খাতে প্রবাহিত। একদল রক্ষণশীল এবং মুসলিম জীবন ও মহিমাকে আশ্রয় করে গতানুগতিক ধারার কাব্যক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন আর একদল আধুনিক কাব্যান্দোলন সম্পর্কে সচেতন, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নিরীক্ষাধর্মী ও বিষয়ের ক্ষেত্রে আত্মআবিষ্কার-প্রয়াসী। এই মন্তব্য কতখানি যথাযথ বিশদভাবে আলোচনা কর।

৩। বাংলাদেশের আধুনিক কাব্যচর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কাব্য সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি নিরূপণ কর।

৫। বাংলাদেশের বাংলা কাব্যসাহিত্যে ভাষা, ভাব ও আঙ্গিকগত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়সহ একটি বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ রচনা কর।

৬। বাংলাদেশের যে-কোন দুইজন আধুনিক কবির রচনারীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। ৪৭-উত্তর বাংলাদেশের কবিতার ধারা সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

৮। শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বাধীনতা ও সমাজচেতনার পরিচয় দাও।

৯। শামসুর রাহমানের কবিতার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

১০। 'পাকিস্তানকালের বাংলাদেশের কবিতায় যে উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় সাম্প্রতিককালের কবিতায় তা দুর্লভ।'-এই উক্তি কতখানি যথার্থ তা বিচার কর।

বিবিধ

১। বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যে এ যাবত যেসব সাহিত্যকর্ম প্রশংসার দাবি করে, তাহাতে কি কি বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক নিবন্ধ লিখ।

২। বাংলা সাহিত্যে 'বাংলাদেশী যুগ' নামকরণ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য যুক্তিপ্রমাণসহ বিধৃত কর।

৩। 'সমকালীন সাহিত্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু শিল্পমূল্য অনুধাবণ করা যায় না।'—সমালোচকের মন্তব্যটির সারবত্তা পরীক্ষা কর।

৪। আমাদের সাহিত্যে ভাষা-আন্দোলনের গুরুত্ব নির্ণয় কর।

৫। টীকা লিখ : আহসান হাবীব, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ক্রীতদাসের হাসি, কালের কলস, কত ছবি কত গান, কবর, মাটির ফসল, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ আবদুল হাই, রৌদ্র করোটিতে, লালসালু, শওকত ওসমান, সওগাত, সাত সাগরের মাঝি, সাহিত্য পত্রিকা, সমকাল, শামসুর রাহমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, হাজার বছর ধরে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে এর সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল দুই অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক. পূর্ববঙ্গ পরে পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ, দুই. ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সংশ্লিষ্ট উড়িষ্যা আসাম ইত্যাদি বাংলা ভাষা ভাষী অঞ্চলগুলো। দেশ বিভাগের পর প্রথম পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বিদ্যমান থাকে এবং ১৯৭১ সালে রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়। এর সাকুল্য জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা, তাদের রাষ্ট্রভাষাও বাংলা। ভারতীয় অংশের বাংলা ভাষাভাষী অংশগুলো প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের আঞ্চলিক সাহিত্য বিরাজমান থাকলেও বাংলা সাহিত্যের অনুসারী বলে পরিচয় লাভ করে। ফলে বাংলাদেশের সাহিত্য ও ভারতীয় অংশ পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য—এই দুই সাহিত্যের পরিচয় ও বিকাশ লাভ করে। তাই এখন বাংলা সাহিত্য ১. বাংলাদেশের সাহিত্য ও ২. পশ্চিবঙ্গের সাহিত্য এই দুই অংশে বিভক্ত।

বাংলা দুই রাষ্ট্রের ভাষা হিসেবে বিভক্ত হয়ে পড়ায় তার ব্যবহার, বিকাশ, রূপান্তর ক্রমে ক্রমে ভিন্নধর্মী হয়ে উঠাই স্বাভাবিক এবং হচ্ছেও তাই। বাংলা সাহিত্য এখন দুই দেশে ভিন্নভিন্ন রূপে বিকশিত হচ্ছে। বাংলাদেশে বাংলা এখন রাষ্ট্রভাষা। আধুনিক বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের উন্নত দেশের জ্ঞান বিজ্ঞান এদেশে প্রচারিত হচ্ছে। তাছাড়া বাংলা এখন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বৈচিত্র্যে নিজের যথোপযুক্ততা প্রমাণ করছে এবং প্রয়োজনবোধে বাইরের প্রভাবে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলছে। বাংলা গদ্যের প্রথম দিকে ইসলামি ও সংস্কৃত প্রভাব, ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের পুরানো বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃত বাক্যবিন্যাস ও সমাস-সন্ধির গুরুভার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমে ক্রমে কমে এসেছে। ভাষায় স্থান লাভ করেছে কলকাতা কেন্দ্রিক চলিতরীতি। এখনও ভাষার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য তার পরিবর্তন চলছে। সমকালীন জীবনচেতনার ভাষা সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দগুলি ভাষায় স্থান লাভ করে নিচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের নিজের ভাষা প্রয়োগরীতি অনুপ্রবেশ করে এখানকার বাংলা ভাষাকে ক্রমেই সমৃদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য দান করছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের অবদান প্রাধান্য লাভ করলেও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। দেশের বেশির ভাগ লোকের মাতৃভাষা বলে এবং সে আমলে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃতির ফলে বাংলা ভাষা সাহিত্যে গুরুত্ব পালনের প্রেরণা এখানে ব্যাপকভাবে

অনুভূত হয়। বাংলা ভাষার এই মর্যাদা ও গুরুত্ব অন্যত্র অনুপস্থিত। তাই এখানকার সাহিত্য স্বল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এই সম্ভাবনা আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। বাংলা এখন দেশের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা। সকল কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য জাতি এখন সংকল্পবদ্ধ। জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা ও ভাবভাবনা এ ভাষার মাধ্যমে এখন রূপায়িত হয়ে উঠছে। ফলে বাংলা ভাষা যুগোপযোগী প্রয়োজন মিটানোর যোগ্যতা অর্জনে তৎপর। এভাবেই বাংলাদেশে স্বতন্ত্র পরিসরে স্বকীয় পরিসরে স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে সাহিত্যকে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য নিয়ে স্বাধীন ভারতের অন্যতম রাজ্য হিসেবে অস্তিত্ব অর্জন করেছে। বাংলাদেশের মত স্বাধীনতার গৌরব নেই পশ্চিমবঙ্গের, আছে সুদীর্ঘ দিনের ভারতীয় ঐতিহ্য। সে ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল হয়ে বিশাল ভারতের ভাষা ভাষী অঞ্চল হিসেবে তার পরিচয়। বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যে সে রাজ্য সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গর্বিত ও গৌরবান্বিত। তুলনায় পশ্চিবঙ্গের সাহিত্য অনেক এগিয়ে আছে। সে তুলনায় বাংলাদেশের সাহিত্য অনেকটাই পিছিয়ে আছে।

সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তুলনায় বাংলাদেশের সাহিত্য নেহায়েৎ অবজ্ঞার সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র অংশ বলে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের সাহিত্যের শুরু ১৯৪৭ থেকে আর পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য সেই সুপ্রাচীন চর্যাপদ থেকে শুরু বলেই এই পার্থক্যের কারণ।

জাতীয় জীবনে দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বাংলাদেশের সাহিত্যকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। একটি ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত ঘটনা এবং অপরটি ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের মানুষের জীবনচেতনায় এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিতে দুটি ঘটনাই গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের সাহিত্যে এসেছে সৃষ্টির প্লাবন। কবিসাহিত্যকগণ পরম শান্তিতে নিমগ্ন হতে পেরেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে এই প্লাবন ছিল না, কিন্তু ছিল উচ্ছ্বাস—সুদীর্ঘ দিনের গৌরবময় সমৃদ্ধি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখায় যে পরম উৎকর্ষ ঘটেছিল তারই সগৌরব উত্তরাধিকারী পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য। সেজন্য একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল সে সাহিত্য। নতুন কোনো ভিত্তি খুঁজতে হয়নি তাকে। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্যে অনেক উপকরণ যোগালেও শুধু সেটাই প্রাধান্য পায়নি বরং বৈচিত্র্যপূর্ণ উপকরণে সমৃদ্ধ ছিল সে সাহিত্য। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য স্বমহিমায় উজ্জ্বল। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যে সে সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি সাম্প্রতিক কালের অবদানে সে সাহিত্য গৌরবময়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদানে বাংলা সাহিত্যের যে উৎকর্ষ ঘটেছিল পরবর্তী পর্যায়ে তাই সগৌরব সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য তাই স্বমহিমায় উজ্জ্বল এবং অধিকতর উৎকর্ষের দিকে ধাবমান। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যকে সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার বিবেচনা করে লেখকেরা যে গৌরববোধ করেন বাংলাদেশের সাহিত্যে সে গৌরববোধ নেই।

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য সমৃদ্ধি ও আয়তনে বৈচিত্র্যধর্মী। বিপুল তার আয়তন এবং মহিমময় উৎকর্ষের অধিকারী। সাহিত্যের নানা শাখা প্রশাখায় তার বিচিত্র বিকাশ এবং প্রতিটি শাখা প্রশাখাতেই তার উৎকর্ষের স্বাক্ষর।

বর্তমান বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে উক্তরূপ যুগের কাঠামোতে ভাগ করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্য তার উপকরণ সংগ্রহ করেছে তার সমকালীন জীবন ধারা থেকে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে যে উৎকর্ষ ঘটিয়েছিলেন তারই অনুসারক পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য। ১৯৪৭ সালকে এ অধ্যায়ের শুরু ধরলে ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন অবসান এবং ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ বা ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি— দুটি ঘটনাই সাহিত্যের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া এ সময়ের পটভূমিকায় আছে যুদ্ধ মহামারীর সুদূর প্রসারী বিপর্যয়। এসব ঘটনার প্রভাব পড়েছে ১৯৪৭-এর পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে। দেশ বিভাগের প্রভাব ছিল ব্যাপকতর। ১৯৪৭-এর আগে ও পড়ে বাস্তুত্যাগীরা যে দুর্ভোগ ভোগ করেছে তার প্রভাব এখনও বর্তমান। উদ্বাস্তু ও মন্বন্তরে বিধ্বস্ত মানব সমাজ এখনও সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্যে নানা উপকরণ সমৃদ্ধ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং এখনও তার অনিঃশেষ

অনুকরণ রয়েছে। এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য সুবিশাল ঐতিহ্যের অনুসারী। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে জমিদার শ্রেণির সঙ্গে কৃষক শ্রমিক সমাজের কথা আছে। আছে সাম্প্রতিক কালের কৃষক শ্রমিক আন্দোলন। সমাজ সচেতনা বরাবরই বাংলা সাহিত্যের উপকরণ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যে এর ব্যতিক্রম নেই। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য প্রধানত নগর কেন্দ্রিক। বিশেষত কলকাতা কেন্দ্রীক নগর জীবনের সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার গান এই সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। শহরে আছে বাস্তুহারাদের স্থান। তাই পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে এই বাস্তুহারাদের কাহিনি স্থান পেয়েছে। শহুরে গলি ও বস্তি জীবনের ছবি পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে বেশ খানিকটা জুড়ে অবস্থান নিয়েছে। শিল্পাঞ্চল সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরাও সাহিত্যে স্থান নিচ্ছে। মধ্যবিত্তের বিচিত্র জীবন সাহিত্যে স্থান পাচ্ছে। বিচিত্র সমাজ সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটেছে তার সময়কালের মধ্যেই। গল্প উপন্যাস নাটক কবিতায় যে অতি আধুনিকতার সূচনা হয়েছে তার ধারাটি অধিকতর বেগবান হয়েছে এ আমলে। এখনও নিত্য নতুন আদর্শ সাহিত্যে রূপায়িত হয়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য অতি আধুনিকতায় সমুজ্জ্বল।

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন আদর্শের প্রভাব পড়েছে বাংলা সাহিত্যে। বিদেশি সাহিত্য বাংলায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্য থেকেও বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়ে ভাবাদর্শ বিনিময় ঘটেছে। ভাষার এই বিনিময় সাহিত্যের উৎকর্ষ ঘটিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের ভাষা আধুনিকতায় উৎকর্ষমণ্ডিত। কলকাতাকেন্দ্রীক উপভাষা আগেই সাহিত্যে স্থান পেয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এর আরও উৎকর্ষ সাহিত্য লাভ সম্ভব হয়েছে। তবে বহুভাষী ভারতীয় সংস্কৃতিতে কলকাতার প্রকৃত মর্যাদার পরিবর্তন ঘটছে। অনেক শব্দের পরিবর্তন ঘটছে। এমনকি আশে পাশের বাংলা ভাষা ভাষী অঞ্চলেও এর প্রভাব ঘটছে।

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে কথা সাহিত্যের শাখাটি সর্বাধিক সমৃদ্ধ। অসংখ্য লেখক গল্প উপন্যাস লিখে এ ধারাটিকে ক্রমাগতই সমৃদ্ধ করেছেন। সংখ্যায় লেখক যেমন অধিক রচনাতেও সে আধিক্য বর্তমান। অনেকেই প্রাচুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। উৎকর্ষে তা পরিপূর্ণ। কবিতাতেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য বিদ্যমান। ভাষা ও কাঠামোগত কারণে কবিতা যথেষ্ট উৎকর্ষের পর্যায়ে পৌঁছেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নানাদিক থেকে প্রভাব বিস্তার করে চলছে। বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা বেশি না হলেও দেশে বাংলা পাঠক বেশি বলে সাহিত্য প্রচুর ভাবে সমাদৃত। সেজন্য সাহিত্যের চর্চাও বেশি।

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী সম্প্রসরণশীল সাহিত্যের নাম।

প্রবন্ধ সাহিত্য

পশ্চিমবঙ্গের প্রবন্ধ সাহিত্য বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়বস্তু ও উৎকর্ষপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে সমৃদ্ধ রূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ঐতিহ্যগত দিক থেকে একটা সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসারী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধাবলির মাধ্যমে যে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরই ছত্রছায়ায় পরবর্তী কালের প্রবন্ধ সাহিত্যের গৌরবময় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সে অগ্রগমনের সমৃদ্ধ ইতিহাসই হল পশ্চিমবঙ্গের প্রবন্ধ সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ তাঁদের সামনে বিরাজমান ছিল। তা থেকে লেখকেরা যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেছেন। রবীন্দ্র প্রভাবেই পরবর্তী প্রবন্ধের ধারা এগিয়ে গেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রবন্ধ সাহিত্য নিঃসন্দেহে এক সমৃদ্ধ সাহিত্য।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। সমকালীন নানা বিষয় এ সময়কার প্রবন্ধের উপজীব্য হয়েছে। ব্যক্তিজীবনের নানা চিন্তা ভাবনা, সমাজ জীবনের নানা প্রসঙ্গ, রাজনৈতিক বিষয়, ধর্মীয় নানাদিক কোনোটাই এসব প্রবন্ধের আলোচনা থেকে বাদ যায়নি। সাহিত্যের বিষয় সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে। রচিত হয়েছে সাহিত্যের নানা ইতিহাস, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়েছে সাহিত্যের নানা প্রবন্ধের। সমালোচনা সাহিত্য বিপুল অবয়ব নিয়ে গড়ে উঠেছে। সাহিত্যের মাধ্যমে এসেছে পাশ্চাত্য প্রভাব। শুরু হয়েছে আধুনিকতার জয়গৌরব। সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে নিত্য নতুন অবকাঠামো। বাংলা সাহিত্য বিশ্বের সর্বাধুনিক অবকাঠামো লাভ করেছে এ সময়েই। প্রবন্ধের মাধ্যমে বিস্তর অনুবাদ সাহিত্য বাংলায় এসেছে। বাংলা হয়ে উঠেছে বিশ্ব সাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত।

দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ ঘটেছে প্রবন্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন আর দেশ বিভাগ প্রবন্ধকারদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনও কিছুটা প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে স্বাধীন দেশের নানা রকম পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন। সেসবই এখানকার প্রবন্ধ সাহিত্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধ সাহিত্যের রূপটি এখানে উৎকর্ষপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভাষা ব্যবহারে প্রবন্ধ হয়েছে আকর্ষণীয়। উৎকর্ষপূর্ণ ভাষা ভঙ্গি যেমন এসেছে তেমনি এসেছে নতুন নতুন শব্দ সম্ভার। বিদেশি প্রভাব এসেছে সর্বক্ষেত্রে। নতুন বিষয়ের সঙ্গে এসেছে নতুন ভাষা ও শব্দ ব্যবহার। নতুন শব্দ ব্যবহারে ভাষা গতিশীল হয়েছে। বিষয়ের বৈচিত্র্য আর উৎকর্ষপূর্ণ ভাষা, নতুন অবকাঠামো আর নিত্য নতুন শব্দ সম্ভার এখানকার প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পেরেছে।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক, পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) প্রবন্ধ সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে অনন্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলো বিষয়বস্তুর গুরুত্বে, পাণ্ডিত্যের গভীরতায়, সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে সবিশেষ

গুরুত্বের অধিকারী। ভাষা ও সংস্কৃতির অতুলনীয় ব্যাখ্যাকার হিসেবেও তাঁর অবদান অতুলনীয়।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বরাবরই কৃতি ছাত্র হিসেবে বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন এবং ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে এম এ পাশ করেন। ১৯১৮ সালে সংস্কৃতের শেষ পরীক্ষা পাশ করে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজি বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্বনি বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ও ডিলিট ডিগ্রি লাভ করেন। ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে তিনি প্যারিসে অধ্যয়ন করেন। ১৯২২ সালে দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের 'খয়রা অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৫২ সালে ইমেরিটাস অধ্যাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ করেন।

তিনি বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তিন খণ্ডে 'দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থখানি রচনা করে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হল : 'বেঙ্গলি ফনেটিক রিডার', 'ভারত সংস্কৃতি', 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', 'পশ্চিমের যাত্রী', 'ইউরোপ ভ্রমণ', 'জাতি সংস্কৃতি সাহিত্য', 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা', 'সংস্কৃতি কী', 'দ্বীপময় ভারত', 'রবীন্দ্র সঙ্গমে', 'শ্যামদেশ' ইত্যাদি। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে ভাষাচার্য উপাধি পেয়েছিলেন।

ড. রামেশ্বর শ মন্তব্য করেছেন, 'আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মনীষার দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল—বিষয়ের ব্যাপ্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গি। মূলত এবং সতত ভাষাবিজ্ঞানী বলে পরিচিত হলেও ভাষা ছাড়াও নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সক্রিয় আগ্রহের অন্ত ছিল না। ব্যাপ্তিতে তিনি দেশের সীমা ও বিজ্ঞান নিষ্ঠায় ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করে গেছেন। প্রাচীন সাহিত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ আগ্রহ, অথচ সর্ববিধ অন্ধ অনুকরণ থেকে মুক্তি—একনিষ্ঠ সুস্থ দৃষ্টি ভঙ্গি সচরাচর চোখে পড়ে না।'

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২) ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট পণ্ডিত, প্রবন্ধকার, গবেষক ও সম্পাদক। বাংলা সাহিত্য নিয়ে অমূল্য গবেষণা করে বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। তাঁর গবেষণার ফলেই উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পিতামাতা হারিয়ে ১৯০৮ সালে চাকরির আশায় কলকাতায় আসেন এবং টাইপিস্টের পদে এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। পরে নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এ সময়ে তিনি নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সান্নিধ্যে আসেন। বিদ্যাভূষণের তত্ত্বাবধানে তিনি 'বাংলার বেগম' গ্রন্থ রচনা করেন। এ সময় ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের সাহচর্যে আসেন। তিনি ইতিহাসচর্চার বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অবহিত হন। এ সময়ে তিনি মোগল ইতিহাস অবলম্বনে 'নূরজাহান', 'স্ত্রী শিক্ষা', 'মোঘল বিদূষী জাহানারা', 'দিল্লীশ্বর' বইগুলো রচনা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি বই রাজা রামমোহন রায়ের 'ইংল্যান্ড ভ্রমণ', 'নতুন ভারতের দেওয়ান' ও 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ'—সমকালীন ইতিহাসে নতুন ভাবে আলোকপাত করেন। তিনি ১৯২৯ সালে প্রবাসী ও মর্ডান রিভিউ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্যভুক্ত হন এবং পরিষদের গ্রন্থাগারিক, সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। পরিষদের সেক্রেটারি হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সংবাদপত্রে সেকালের কথা, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, বাংলা সাময়িক পত্র, বাংলা সাময়িক সাহিত্য, সাময়িক পত্র সম্পাদনে বাঙালি নারী, উনিশ শতকের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ তিনি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলি নামে সম্পাদনা করেন (১১ খণ্ড)। তাঁর সম্পাদনায় অনেকগুলো গ্রন্থাবলি প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য সাধন চরিতমালা' নামে গ্রন্থাবলি প্রকাশ করেন। এতে ৯৫টি জীবনী রয়েছে। তিনি তাঁর বাংলা ও ইংরেজি রচনাবলির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। তিনি তাঁর কর্মের সাহায্যে বাংলা সাহিত্যের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করেন।

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০) ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক এবং বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের গবেষক। তাঁর জন্ম বীরভূম জেলার কুশমোর গ্রামে। তিনি ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে এম এ পাশ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি পি-এইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু ছিল 'রোমান্টিক থিওরি—ওয়ার্ডস ওয়ার্থ অ্যান্ড কোলরিজ।' তিনি পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : 'ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস', 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা', 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে', 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা', 'রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা' ইত্যাদি। তিনি কিছু ইংরেজি গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর কিছু সম্পাদিত গ্রন্থও রয়েছে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনারীতি বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার পালা বদল করে দিয়েছে। 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' তাঁর

শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। সুবিশাল এই গ্রন্থে তিনি বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচন, বিশ্লেষণ কৌশল ও পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি ভঙ্গি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সাহিত্যের বিষয়বস্তুর ওপর তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ। তাঁর ভাষা গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং আকর্ষণীয়।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) বিশিষ্ট প্রবন্ধকার হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। বহু বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অনেক প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থগুলো হল—'আমরা ও তাঁহারা', 'চিন্তায়সি', 'বক্তব্য', 'উপক্রমণিকা', 'কথা ও সুর', 'মনে এল' ইত্যাদি। 'আমরা ও তাঁহারা' তাঁর সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করেছেন চিন্তায়সি প্রবন্ধ সংকলনে।

তাঁর লেখায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ছিল। তিনি সহজেই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে পারতেন। অশোক মিত্র এই বিষয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে লিখেছেন, 'শিক্ষা সমস্যা, ছাত্র সমস্যা নিয়ে লিখেছেন, ঠিক পরের মুহূর্তে এ-ওঁর-তাঁর স্মৃতি চারণের চুটকি গল্প। ঠিক তারপর অর্থনীতির প্রসঙ্গ, পরের মুহূর্তে ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে মন্তব্য, অতঃপর মিস্টিসিজম নিয়ে স্বগত উক্তি ও প্রায় প্রবন্ধ আকারে কিছু মন্তব্য, ট্রেনের সামাজিকতা, সংগীত সম্মেলন, মাল্লিক মানসুরের রাগসঙ্গীত, সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান, ... গীতা উপনিষধ, নতুন আমেরিকান কবিতা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, গতি ও অসাম্যের ধর্মীয় সম্পর্ক, বিনোদিনী-গিরিশ ঘোষ, যামিনী রায়, স্থিতধিতা ও স্থিতিস্থাপকতা, মার্কস, এঙ্গেলস, হিস্টরিক্যাল কজেগণ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিভা, হেরোক্লটিস, অ্যারিস্টটল, লাওৎসে, টমাস মান ও জার্মান পাপবোধ, সকালে ইকনমিকস আর বিকালে বৌদ্ধদর্শন। আমি অল্প করে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।'

পরিমল গোস্বামী

পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭৬) ছিলেন বৈচিত্র্যধর্মী প্রবন্ধকার এবং বিভিন্ন খ্যাতিমান পত্র পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তবে বাংলা ব্যঙ্গরচনার অন্যতম পুরোধা হিসেবেও তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার রতনদিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯২১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে যান চিত্রবিদ্যা শিখতে। ইংরেজিতে এম এ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পড়তে শুরু করলেন অ্যানথ্রপজি, আর পরীক্ষা দিলেন বাংলায়। প্রথম শ্রেণি পেয়ে লেখালেখি শুরু করলেন। সে আমলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় সম্পাদনা বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : 'মৌসুমী সুর', 'গল্প ভারতী', 'শীতের অর্ঘ্য', 'স্মৃতি চিত্রণ', 'দ্বিতীয় স্মৃতি', 'আমি যাঁদের দেখেছি', 'যখন সম্পাদক ছিলাম', 'পত্র স্মৃতি', 'পথে পথে', 'ঘুঘু', 'ম্যাজিকলণ্ঠন', 'সপ্তপঞ্চ', 'মারকেলেঙ্গে' ইত্যাদি। তিনি 'ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী' সম্পাদনা করেছিলেন। 'পুরুষের ভাগ্য ও অন্যান্য গল্প' তাঁর ছোটগল্পের বই।

পরিমল গোস্বামী ছিলেন ব্যঙ্গরচনার জনক। 'শনিবারের চিঠি' নামক ব্যঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে তিনি ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে তৎপরতা দেখান। তিনি স্মৃতি বিষয়ক গ্রন্থ যেমন লিখেছেন, তেমনি ভ্রমণ কাহিনিতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। স্মৃতিকথামূলক রচনার জন্য তিনি স্মৃতিদিগগজ উপাধি পেয়েছিলেন।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকগণের অনেকেই বৈচিত্র্যধর্মী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের লেখালেখি কেবল সাহিত্যের একটি শাখায় সীমাবদ্ধ না থেকে নানা শাখায় সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) তেমনি একজন সাহিত্যিক যিনি প্রধানত কথাসাহিত্যিক, কিন্তু প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলো হল : 'সাহিত্যের সত্য', 'ভারতবর্ষ ও চীন', 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী', 'আমার কালের কথা', 'আমার সাহিত্য জীবন' (২ খণ্ড), 'বৈশাখের স্মৃতি' ইত্যাদি।

'সাহিত্যের সত্য' প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখকের নানা চিন্তা ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। এই গ্রন্থে লেখকের কিছু স্মৃতিচারণমূলক রচনাও স্থান পেয়েছে। 'সাহিত্যতত্ত্ব' সম্পর্কিত কিছু বক্তব্যও কোনো কোনো প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠেছে। লেখক এ গ্রন্থে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। 'ভারতবর্ষ ও চীন' গ্রন্থটি চীন ভ্রমণের ডায়েরি। চীন দেশ সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' বইটিতে বিশ্বভারতীতে দেওয়া নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতাগুলো অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এতে চারটি বক্তৃতা আছে। প্রথমটি অভিভাষণ। বাকি তিনটি বক্তৃতা হল রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীর মানুষ, রবীন্দ্রনাথ ও পল্লী সমাজ, রবীন্দ্রনাথ ও পল্লী প্রকৃতি। গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ নামে আরও একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সেটি রবীন্দ্র শতবর্ষ উপলক্ষে লেখা।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী মূলক প্রবন্ধ গ্রন্থগুলো বক্তব্য বিষয়ে, বর্ণনা ভঙ্গিতে ও রস সৃষ্টিতে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। 'আমার কালের কথা' গ্রন্থে লেখকের সমসাময়িক জীবনের নানা কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে লেখক সমকালীন সমাজ পর্যবেক্ষণ করেছেন। সমাজের রূপ প্রকৃতি কাল প্রভৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থটি সম্পূর্ণ আত্মজীবনীমূলক রচনা। সাহিত্য সাধনা ও তাঁর

লেখা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যের সন্ধান এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। আমার সাহিত্য জীবনে সাহিত্য জীবন, কংগ্রেস রাজনীতি ও তৃণমূল স্তরের নেতাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে। বীরভূমের লাভ পুরের লেখক জীবনের পরিচয় এখানে মেলে। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলো থেকে তাঁর সারা জীবনের পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোর ভাষা তাঁর গল্প উপন্যাসের মতই মনোরম।

ড. সুকুমার সেন

ড. সুকুমার সেন (১৯০০-৯২) বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় যে অতুলনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর আসন লাভের অধিকারী। ভাষাতত্ত্বের নানাদিক নিয়ে তিনি যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি পাঁচ খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ধর্মিতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন।

ড. সুকুমার সেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণির অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯২৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি পি-এইচডি ডিগ্রিও অর্জন করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ছাড়াও ড. সুকুমার সেন পালি প্রাকৃত ও সংস্কৃতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইংরেজি ভাষাতে যেমন গ্রন্থ রচনা করেছেন তেমনি বাংলা ভাষাতেও তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হল :

'The use of Cases in Vedic Prose', 'Buddhist Hybrid Sanskrit', 'A History of Brajaboli literature'. 'Persian Inscriptions of the Achaeinnian Empires', 'An Outline of Syntex of Middle Indo-Aryan', 'Competitive Grammar of Middle Indo-Aryan', 'An Etymology of Dictionary of Bengali', 'ভাষার ইতিবৃত্ত', 'বাংলা স্থান নাম', বাংলায় নারীর ভাষা', 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (৫ খণ্ড), 'ভারতীয় আর্য সাহিত্যের ইতিহাস', 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য', 'ভারত কথার গ্রন্থিমোচন', 'রামকথার প্রাক ইতিহাস', 'বটতলার ছাপা ও ছবি', 'বনফুলের ফুলবন', 'কলকাতার কাহিনি', 'বাংলা কবিতা সমুচ্চয়', 'ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি', 'চৈতন্য বাদন', 'দিনের পরে দিন যে গেল' (২ খণ্ড) ইত্যাদি।

প্রাচীন সাহিত্যের রহস্য উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণে কাজ করেছেন। তেমনি বাংলা সাহিত্যের বিস্তারিত ইতিহাস রচনায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর লেখার বিষয়ে ছিল বৈচিত্র্য, পাণ্ডিত্যে ছিল গভীরতা আর প্রকাশ ভঙ্গিতে ছিল সাবলীল বৈশিষ্ট্য।

সুশোভন সরকার

সুশোভন সরকার (১৯০০-৮২) ছিলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। তিনি সমকালীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে সাহিত্য সাধনা করেছেন। তাঁর আদি নিবাস সরিষা, ডায়মন্ডহারবার– দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। পিতার কর্মক্ষেত্র মেদিনীপুরের কাঁথিতে জন্ম। কলেজে পড়ার সময় তিনি কলকাতায় চলে যান এবং ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে এম এ পাশ করেন। পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ঢাকা, যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : 'মধ্যযুগের পরের ইউরোপ', 'জাপানি শাসনের আসল রূপ', 'ইতিহাসের ধারা', 'ইতিহাস চর্চা', 'সমাজ ও ইতিহাস', 'প্রসঙ্গ ইতিহাস', 'বেঙ্গল রেনেসাঁ অ্যান্ড আদার এসেজ', 'অ্যা মার্ক্সিয়ান গ্লিমস অব মিস্ট্রি', 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার', 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ', 'ডিরোজিও অ্যান্ড ইয়ং বেঙ্গল', 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি', 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ', 'দ্য কনফ্লিক্ট উইদিন দ্য বেঙ্গল রেনেসাঁস', 'দ্য হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচ ইন মার্কস', 'হিস্টোরিক্যাল রাইটিংস অব এঙ্গেলস' ইত্যাদি।

সুশোভন সরকার বাংলা ইংরেজি দুই ভাষাতেই সাহিত্য সাধনা করেছেন। দেশীয় বিষয়বস্তু যেমন তেমনি আন্তর্জাতিক বিষয়ও তাঁর আলোচনা ও গবেষণার বিষয়বস্তু হয়েছে।

গোপাল হালদার

গোপাল হালদার (১৯০২-৯৩) বিশিষ্ট প্রবন্ধকার হিসেবে খ্যাতিমান হলেও উপন্যাস রচনায়ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর গদ্য রচনার একটি রীতি ছিল এবং তাঁর ভঙ্গিমায় তা প্রকাশ পেয়েছে। ছোট ছোট সরল গদ্যে তিনি তাঁর বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। পত্র পত্রিকা সম্পাদনাতেও তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল।

গোপাল হালদারের জন্ম বাংলাদেশের ঢাকা জেলায়। নোয়াখালীতে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার শুরু। পরে কলকাতায় চলে যান। ১৯২৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাশ করেন। তিনি দীর্ঘ দিন 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তৎকালীন কিছু বিখ্যাত পত্র পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : 'বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা', 'ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা', 'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা', 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'বাংলা সাহিত্যের রূপ', 'বাঙালি সংস্কৃতির প্রসঙ্গে', 'বাংলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি', 'বাঙালির আশা বাঙালির ভাষা' ইত্যাদি। তিনি কয়েকটি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। সেগুলো হল : 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন', 'তেরোশ পঞ্চাশ', 'স্রোতের দ্বীপ' ইত্যাদি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়েই গোপাল হালদারের প্রবন্ধ সাহিত্য রূপলাভ করেছে। তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে এর নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সাহিত্যে মানবিকতা কীভাবে রূপলাভ করেছে তার পর্যালোচনা করেছেন। সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এসব বিষয়ে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ফুটে উঠেছে।

তাঁর গদ্য রচনায় নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর গদ্যভাষা যুক্তি ও বিশ্লেষণের বাহন হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধের কলাকৌশল স্বতন্ত্র, ভাষাও তেমনি নিজস্ব। ছোট ছোট বাক্যে তাঁর গদ্য রূপলাভ করেছে। তিনি ছিলেন শব্দ সচেতন শিল্পী। তাঁর গদ্যের ভাষা মার্জিত ও শিল্পরস সমৃদ্ধ।

অন্নদাশংকর রায়

অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪-২০০৩) বৈচিত্র্যমুখী সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রবন্ধ, কাব্য, ভ্রমণ কাহিনি, ছড়া, উপন্যাস, রম্যরচনা, গল্প ইত্যাদি রচনা করেছেন। ১৯২৭ সালে তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় আই সি এস এবং তালিকায় ছিলেন শীর্ষে।

অন্নদাশংকরের জন্ম উড়িষ্যার ডেঙ্কানলে। তিনি কটকের দেবেনশ কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে ইংরেজি সাহিত্যে বি এ অনার্স পাশ করেন। তিনি উড়িয়া ভাষায় প্রথম কবিতা রচনা শুরু করেন। পরে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সাধনা করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি এলিস ভার্জিনিয়া অরনডরফ নামে এক আমেরিকান মহিলাকে বিয়ে করেন যিনি লীলা রায় নামে পরিচিতি লাভ করেন।

অন্নদাশংকর রায়ের সব ধরনের গ্রন্থের তালিকা : 'তারণ্য', 'রাখী', 'আগুন নিয়ে খেলা', 'পথে প্রবাসে', 'বাসন্তী', 'অসমাপিকা', 'পুতুল নিয়ে খেলা', 'একটি বসন্ত', 'সত্যাসত্য', 'কালের শাসন', 'প্রাকৃতিক পরিহাস', 'কামনা পঞ্চবিংশতি', 'আমরা', 'জীবনশিল্পী', 'উড়কি ধানের মুড়কি', 'ইউরোপের চিঠি', 'ইশারা', 'নতুন রাধা', 'রাতের অতিথি', 'বিনুর বই', 'পাহাড়ী', 'জীবনকাঠি', 'দেশকাল পাত্র', 'রাঙা ধানের খই', 'প্রত্যয়', 'আধুনিকতা', 'নতুন করে বাঁচা', 'আলাপ', 'সাহিত্যে সংকট', 'ডালিম গাছের মৌ', 'জাপানে', 'অপ্রমাদ', 'দেখা', 'রবীন্দ্রনাথ', 'প্রবন্ধ', 'ফেরা', 'খোলা মন ও খোলা দরজা', 'আর্ট', 'গান্ধী', 'প্রাণ রক্ষা ও বংশরক্ষার অধিকার', 'দিশা', 'সাতকাহন', 'শালি ধানের চিঁড়ে', 'শুভোদয়', 'আতাগাছের তোতা', 'হৈ রে বাবাই হৈ', 'বাংলার রেনেসাঁস', 'চেনাশোনা', 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য', 'কাঁদো প্রিয় দেশ', 'শিক্ষার সংকট', 'প্রেম ও বন্ধুতা', 'দ্বিধাদ্বন্দ্ব', 'আই সি এস', 'চক্রবাল', 'লালন ও তাঁর গান', 'বাংলাদেশ', 'টলস্টয়', 'ইষ্টমালার দেশে', 'রাঙামাথার চিরুণী', 'ক্ষীর নদীর কূলে', 'অতিবৈর', 'শিক্ষার ভবিষ্যৎ', 'সংস্কৃতির বিবর্তন', 'সিংহাবলোকন', 'স্বাধীনতার পূর্বাভাস', 'স্রোতের দীঘা', 'বিন্নি ধানের খই', 'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি', 'কলকাতার পাঁচালি', 'যেন ভুলে না যাই', 'সাত ভাই চম্পা', 'যাদু', 'এ বড়ো রঙ্গ', 'কাহিনি' ইত্যাদি।

অন্নদাশংকর রায় আই সি এস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিলাত গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে প্রথম হয়ে দেশে ফিরে এসে লেখালেখি শুরু করেন। ইউরোপ ভ্রমণের বিষয় নিয়ে পথে-প্রবাসে লিখেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পথে প্রবাসের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর ছড়া দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ছড়া লেখার পরামর্শ দেন। ফলে তিনি ছড়া লেখায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর দুটো ছড়া বিখ্যাত হয়ে আছে।

১. তেলের শিশি ভাঙল বলে/ খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ভারত ভেঙে ভাগ করো।

২. ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।

তিনি কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। 'সত্যাসত্য' তাঁর ছয়টি উপন্যাসের সংকলন। এসব উপন্যাসে সমকালীন জনজীবনের বাস্তব ছবি রূপায়িত হয়ে উঠেছে। অন্নদাশংকর রায় বলেছিলেন, 'আমার মধ্যে অনেকগুলো ব্যাক্তি এক সঙ্গে বাস করছে। তাদের একজন হচ্ছে আর্টিস্ট বা কবি-কথাসাহিত্যিক। আরেকজন হচ্ছে ভাবুক। আরও একজন আছে সে হচ্ছে ধ্যানী বা স্বপ্নদ্রষ্টা বা মিস্টিক। আরও একজন আছে সে হচ্ছে রসিক বা প্রেমিক। যে মানুষকে ভালবাসে মানুষের ভিতর দিয়ে ভগবানকে। আরও একজন আছে যে সৌন্দর্যের পশ্চাদ্ধাবন করছে তাকে ধরতে পারছে না। আরও একজন আছে যে ন্যায়-অন্যায় তৌল করে। আরও একজন আছে যে বিভিন্ন পাবলিক ইস্যুতে লেখনীক্ষেপ করছে। জনপ্রিয়তার দিকে তাকায়নি।'

তিনি ছিলেন বাঙালির জাগ্রত বিবেক। তাই জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে তিনি লেখালেখি করেছেন। তাঁর সমগ্র প্রবন্ধ চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বহু উচ্চ প্রশাসনিক পদে কর্মজীবন অতিবাহিত করার পর ১৯৫১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি গান্ধী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণায় সাহিত্য সাধনা করেন। তিনি কলকাতায় মারা যান।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-৮২) একজন অবাঙালি হয়েও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। বাংলা গদ্য চর্চায় বিশেষ দক্ষতা দেখিয়ে তিনি সুধীমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিলেন। রবীন্দ্র সাহিত্য পর্যালোচনায় তিনি যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে বাংলা সাহিত্যে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আসন নির্ধারিত হয়েছে।

আবু সয়ীদ আইয়ুবের জন্ম কলকাতায়। তিনি দর্শন বিষয়ে লেখাপড়া করে প্রথম শ্রেণির ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। বিগত শতকের তিরিশ দশকের দিকে তিনি লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ

করেন। ১৯৫৪-৫৬ সময়ে তিনি রকফেলার ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে গবেষণার কাজে নিয়োজিত থাকেন। ১৯৬১ সালে তিনি মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডিয়ান স্টাডিজ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯-৭১ সময়ে তিনি সিমলা ইন্সটিটিউট অব এডভান্স স্টাডিজে ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলা ভাষা শেখা বিলম্বিত হলেও আবু সয়ীদ আইয়ুব খুব দ্রুততার সঙ্গে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর লেখা প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরক্ষানুভূতি' প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' নামক সাহিত্য পত্রে ১৯৩৪ সালে। তিনি বিখ্যাত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়ও লিখতে থাকেন। এর ফলে তিনি খুব সহজেই সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন এবং রবীন্দ্র চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা' (১৯৬৮) বইটি ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করে। 'পান্থজনের সখা' (১৯৭৩) গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার অভিনব ও চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। 'পথের শেষ কোথায়', 'পূর্বপ্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ' (১৯৭৭) তাঁর সাহিত্য সাধনার দুটি মূল্যবান নিদর্শন হিসেবে বিবেচ্য। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' ও 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' নামে দুটি গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। উর্দু সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। 'গালিবের গজল থেকে' এবং 'মিরের গজল থেকে'—তাঁর দুটি অনুবাদ গ্রন্থ। 'ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক' তাঁর অপর একটি প্রবন্ধের বই।

আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও অনন্য সাহিত্য সাধনার জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, বিশ্বভারতীর দেশীকোত্তম পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্র তত্ত্বনিধি উপাধিও তিনি লাভ করেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) ছিলেন বৈচিত্র্যধর্মী লেখক। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গল্পকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। সাহিত্যের নানা শাখার পাশাপাশি তিনি প্রবন্ধকার হিসেবেও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থগুলো হল : 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'কালের পুতুল', 'সাহিত্যচর্চা', 'রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য', 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি', 'সঙ্গ-নিসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ', 'প্রবন্ধ সংকলন', 'কবি রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি। এছাড়া তিনি কিছু ভ্রমণ কাহিনি লিখেছিলেন। সেগুলো হল : 'সব পেয়েছির দেশে', 'জাপানি জার্নাল', 'দেশান্তর' ইত্যাদি। তাঁর স্মৃতি কথা : 'আমার ছেলেবেলা', 'আমার যৌবন'।

বুদ্ধদেব বসুর গদ্য ও গদ্যের রচনাশৈলী স্বতন্ত্র ও মনোজ্ঞ। রবীন্দ্র উত্তর আধুনিক কাব্যধারার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। গদ্যশিল্পী হিসেবে সমধিক সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। পরিমার্জিত সঙ্গীতময়তা ও পরিশীলিত স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁর গদ্যের বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সমালোচনামূলক

সাহিত্য রচনায়ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বাংলা গদ্য রীতিতে ইংরেজি বাক্য গঠনের ভঙ্গি গ্রথিত করে বাংলা ভাষাকে অধিকতর সাবলীলতা দান করেন।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের নানা বিষয় অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বনগাঁর নবকুলে তাঁর জন্ম। পাঁচ বছর বয়সে চলে যান হাওড়ায়। লেখাপড়া করেন কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হল : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (নয় খণ্ড), 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য', 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর', 'সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ', 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য' ইত্যাদি। এসব ছাড়াও তাঁর কিছু সম্পাদিত গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয় খণ্ডে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।' এটি বাংলা সাহিত্যের বিস্তারিত ইতিহাস।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোর একটি বিশেষ গুণ হল, তিনি সহজ বাচনভঙ্গীতে বিষয়বস্তুকে খুব সহজেই পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ করে তুলে ধরতে পারেন। নিষ্ঠার সঙ্গে নয় খণ্ডে যে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নামক গবেষণা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন তা এখনও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ বলে স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে বিষয়ের বহুমুখিতা, ইতিহাসের তত্ত্ব ও তথ্য, সমালোচনা পদ্ধতির বিচিত্রতা এবং আস্বাদনধর্মী গদ্য সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফসল। তাঁর প্রবন্ধ রচনার বিশেষত্ব হল মুক্ত চিন্তা এবং উজ্জ্বল দৃষ্টি ভঙ্গি। অসিতবাবু তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য ও মনীষার পরিচয় রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি একবার বলেছিলেন, 'সমাজকে আমার কিছু দেবার আছে। শুধু ছাত্র সৃষ্টি করেই আমি ধন্য নই সাহিত্য কর্মেও আমি আমার জীবনটাকে উৎসর্গ করতে চাই।'

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি একাজই করে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অম্লান দত্ত

পশ্চিমবঙ্গের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে অম্লান দত্ত (১৯২৪-২০১০) সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের অনুসারী এই লেখক ছিলেন বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই সমান পারদর্শী। দুই ভাষাতেই তিনি লেখক হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

অম্লান দত্ত জন্মেছিলেন কুমিল্লা শহরের বাগিচাগাঁও। তাঁর পিতা ছিলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। কমিল্লার ঈশ্বর পাঠশালায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। পরে পরিবারের সঙ্গে কলকাতা চলে যান। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি অর্থনীতি বিষয়ে বি এ অনার্স এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাশ করেন।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় আশুতোষ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৮ সালে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব নর্থ বেঙ্গল-এর উপাচার্য পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর তিনি গান্ধী ইন্সটিটিউ অব স্টাডিজ-এর ডিরেক্টর পদে যোগদান করেন। তিনি বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমান অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত বইগুলো হল : 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' (২ খণ্ড), 'গণতন্ত্র ও গণযোগ' (১৯৬৭), 'তিন দিগন্ত' (১৯৭৮), 'ব্যক্তি, যুক্তি সমাজ' (১৯৭৮), 'কমলা বক্তৃতা ও অন্যান্য ভাষণ', '(১৯৮৪), 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮৬), 'দ্বন্দ্ব ও উত্তরণ' (১৯৮৯), 'বিকল্প সমাজের সন্ধানে' (১৯১৪) 'অন্য এক বিপ্লব' (১৯৯৯), 'যে কথা বলতে চাই' (২০০৯), 'মুক্তি তোরে পেতেই হবে' ইত্যাদি।

অম্লান দত্ত তাঁর সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দার্শনিক প্রবন্ধাবলির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী ও জওহর লাল নেহেরুর আদর্শ থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। আমেরিকায় মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে তাঁর ভাষণ এবং চীনে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত ভাষণগুলো বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া বক্তৃতা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তিনি আদিবাসী সমাজের অনুকরণীয় দিকের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছিলেন। তিনি শেষের দিকে গান্ধীজির ভাবনায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পল্লীভাবনায় নিজেকে নিমগ্ন করেছিলেন।

ড. পবিত্র সরকার

ড. পবিত্র সরকার (১৯৩৭) বিচিত্র ধরনের প্রতিভার অধিকারী হলেও বাংলা গদ্য সাহিত্যে তাঁর অবদান রয়েছে। ভাষাতত্ত্ববিদ, সাহিত্য-সমালোচক, অভিনেতা ও নাট্যব্যক্তিত্ব, শিশু সাহিত্যিক, সংস্কৃতি-ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, প্রবন্ধকার ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ড. পবিত্র সরকার ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং দেশবিভাগের সময় তিনি পরিবারের সঙ্গে কলকাতা চলে আসেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথমে তিনি বঙ্গবাসী কলেজে

অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন এবং পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত হন। সেখানে দীর্ঘদিন অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯০ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ লাভ করেন। এরপর তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর হায়ার এডুকেশন-এর ভাইস-চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে তিনি অবসরে যান। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৫ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু বছর অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন এবং চিত্র সমালোচক হিসেবে আনন্দ বাজার পত্রিকায় লেখালেখি করেন। তিনি ইংরেজিতেও কিছু লেখালেখি করেছেন।

তিনি ষাটেরও বেশি সংখ্যক বই রচনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যাও অনেক। তাঁর বইয়ের তালিকা থেকে বোঝা যাবে যে তিনি কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছেন। শিশুদের জন্য ছড়া লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই তিনি প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'অল্প পুঁজির জীবন' তাঁর আত্মজীবনী।

উপন্যাস ও ছোটগল্প

পশ্চিমবঙ্গের উপন্যাস ও ছোটগল্পের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যে সমুজ্জ্বল। লেখকের প্রচুর্যে, রচনার সংখ্যাধিক্যে, বিষয়ের প্রাচুর্যে, শিল্পগত উৎকর্ষে পশ্চিমবঙ্গের কথা সাহিত্য তথা উপন্যাস ও ছোটগল্প এক অনন্য সাহিত্য সৃষ্টি বলে বিবেচনার যোগ্য। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে এই শাখাটি স্বাভাবিকভাবেই উৎকর্ষমণ্ডিত। কথাসাহিত্যের গতিপথ অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এতদিনকার রীতি নীতি অনুসরণ না করে অতি আধুনিক কালের উপন্যাসিক ও ছোটগল্পকারগণ নানাবিধ বৈচিত্র্যের প্রবর্তন করেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত বাংলা কথা সাহিত্য যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল তাঁর অনুসরণে কয়েকজন খ্যাতিমান ছিলেন। অনেকে গতানুগতিক ধারার রচনায় খ্যাতিমান ছিলেন। এরপর অতি আধুনিক ধারার লেখকদের আবির্ভাব ঘটে। তিরিশ দশকের লেখকগণ বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যে অভিনবত্ব সঞ্চার করেছিলেন কথা সাহিত্যেও তাঁর স্পর্শ বিদ্যমন। সে সময়ের লেখকেরা নানা পরীক্ষা মূলক নতুন পরিকল্পনার পথ অনুসরণ করেছিলেন। নতুন বিষয়বস্তুর নির্বাচনে এবং দৃষ্টিভক্তির অভিনত্বে তাঁরা ছিলেন অভিনব। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'একদিকে বিপ্লব ও রূপান্তরের স্ববিরোধ, অপর দিকে ঘন ঘন জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের নিষ্ফল তরঙ্গের আলোড়ন; একদিকে ফ্রয়েডের অবচেতন লোকের আবিষ্কার, অপর দিকে এঙ্গেলস মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নবীন জ্ঞানের তিরিশের উপান্তে এই জট পাকানো এই পানসা বাস্তব জীবনে গ্রন্থি মোচনের জন্য দুষ্প্রাপ্য বাস্তবকে ব্যাখ্যা করার দায় ছিল এই উপন্যাসিকদের।'

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন, দেশবিভাগ ও পরিণতি জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে পরবর্তীকালীন কথা সাহিত্যে। দেশবিভাগ এবং তার দুঃখজনক পরিণতি পশ্চিমবঙ্গের উপন্যাস ও ছোটগল্পে ব্যাপক ভাবে স্থান পেয়েছে। দেশ বিভাগের ফলে এপার বাংলার লোক ওপার বাংলায় যেতে বাধ্য হয়েছে, আবার ওপার বাংলার লোক এপার বাংলায় চলে এসেছে বাস্তুহারা হিসেবে। তারা তাদের চিরচেনা পরিবেশ ও সহায়সম্পদ হারিয়ে নিঃসহায় অবস্থায় ভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে তারা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। তাদের এহেন দুর্দশার চিত্র উভয় বঙ্গের কথাসাহিত্যে ব্যাপকভাবে দীর্ঘদিন ধরে অঙ্কিত হয়েছে। তবে পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যে এ চিত্র ব্যাপক ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ বাংলাদেশ থেকে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত সমাজ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে চলে গেছে। এই স্থানান্তর দেশ বিভাগের অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। লেখা পড়ার সুবিধার্থে অনেকেই ছোট বেলায়ই কলকাতায় চলেছে এসেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের অনেক লেখকের জন্মস্থান বাংলাদেশ, কিন্তু তাঁরা শিক্ষিত হয়েছেন কলকাতায় এবং তাঁদের প্রতিভার বিকাশও হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। উদ্বাস্তু সমস্যা দুদেশেই ছিল বলে উভয় দেশের বিপর্যস্ত মানুষের ছবি দুদেশের সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সমস্যাও লেখালেখিতে প্রকাশ পেয়েছে।

মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যে ব্যাপকভাবে চিত্রিত হয়েছে। বিরাট শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজ গল্প উপন্যাসে ব্যাপক স্থান জুড়ে রয়েছে। মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার প্রেম-ভালবাসার চিত্র সবচেয়ে বেশি উপকরণ হয়ে উঠেছে গল্পে উপন্যাসে। গল্পে উপন্যাসে আছে শ্রমজীবী মানুষের চিত্র। গ্রামীণ কৃষক জীবনের কথা বিধৃত হয়েছে অনেক লেখকের লেখায়। শ্রেণি সংগ্রামের কথাও আছে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ভাংছে, একান্নবর্তী পরিবারেরও ভাঙন এসেছে। সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিক জীবনের ছবি গল্প উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। এ সময়ে দৃষ্টি গেছে সমাজের নিম্ন শ্রেণি, বস্তিবাসী, আদিবাসীদের প্রতি। ফলে পশ্চিমবঙ্গের গল্প উপন্যাস হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্য ধর্মী। কথাসাহিত্যে উচ্চবিত্ত মানুষের ছবিও বিরল নয়।

বিষয়গত বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকগত পরিবর্তন এ সময়ের কথা সাহিত্যে সহজে লক্ষ্য করা যায়। ছোট আকারের উপন্যাস যেমন রচিত হয়েছে তেমনি খুব বড় আকারের উপন্যাসও রচিত হয়েছে। উপন্যাসে আছে ছোট ছোট কাহিনি, তেমনি বড় উপন্যাসে বিশাল বিস্তারিত শাখা প্রশাখা সম্বলিত কাহিনি স্থান পেয়েছে। নানা আদর্শে উপন্যাস রচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য ও বিদেশি আদর্শ পশ্চিমবঙ্গের উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই।

ভাষাগত দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের গল্পে ও উপন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা ভাষার চরমোৎকর্ষ ঘটেছে কথা সাহিত্যের ভাষায়। অতি আধুনিক ভাষার রূপটি লক্ষ্য করা যায় এ সময়ের সাহিত্যে। চলিত ভাষারীতির উৎকর্ষপূর্ণতা এ সময়ে সহজেই লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। অনেক সময় কাব্যময় হয়ে উঠেছে গল্প উপন্যাসের ভাষা।

সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গের গল্প ও উপন্যাস এক উৎকর্ষপূর্ণ নিদর্শন— অগ্রগতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭) পশ্চিমবঙ্গের একজন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক। তাঁর আদি নিবাস হুগলি জেলার চাতরা হলেও তিন পুরুষের বাস বিহারের দ্বারভাঙ্গা ছিল। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি এ পাশ করেন।

তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বৈচিত্র্যময়। কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি ইন্ডিয়ান নেশন পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষের পদে আসীন ছিলেন। পরে বিহারের দ্বারভাঙ্গায় মহারাজের সচিব হিসাবেও কাজ করেন। আবার পরবর্তী কালে কিছুকাল শিক্ষকতাও করেছেন। শিক্ষকতা চলাকালীন তিনি নিজেকে লেখার কাজে নিয়োজিত করেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁর জনপ্রিয়তম উপন্যাসটি হল 'নীলাঙ্গুরিয়' । এছাড়াও তিনি অনেক কৌতুক ও রঙ্গরসের গল্পও লিখেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হল : 'রানুর প্রথম ভাগ', 'রানুর দ্বিতীয় ভাগ', 'রানুর তৃতীয় ভাগ, 'রানুর কথামালা', 'বরযাত্রী', 'নাটক নয়, নভেল', 'কন্যা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী এবং', 'বসন্তে', 'শারদীয়া', 'চৈতালী', 'লাজবতী', 'হাসি ও অশ্রু', 'আনন্দপট', 'কবি ও অকবি' ইত্যাদি ছোটগল্প গ্রন্থের মাধ্যমে কাব্যধর্মের উৎকর্ষ ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। 'সর্গাদপী গরীয়সী', 'দূয়ার হতে অদূরে', 'কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি', 'একই পথের দুই প্রান্তে', 'অযাত্রার জয়যাত্রা', 'পনুরচিঠি', 'কৈলাসের পাটরানী' 'দুষ্টু লক্ষ্মীদের গল্প', 'জীবনতীর্থ (আত্মজীবনী)', 'কাঞ্চনমূল্য', 'এবার প্রিয়ংবদা' তাঁর অপরাপর গ্রন্থ। বিভূতিভূষণের গল্পগুলো প্রধানত হাস্যরসমূলক হলেও তাঁর হাস্যরসিকের লঘু দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে যে কবিসুলভ সৌন্দর্যবোধ ও দার্শনিকের সূক্ষ্মদর্শিতা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা সহজেই লক্ষ করা যায়। তাঁর গল্পগুলো ব্যক্তিজীবন অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে গঠিত। তিনি বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ ধরনের হাসির গল্পের রূপকার হিসেবে বিশ্রুত হয়ে আছেন। তাঁর জীবন-পরিবেশ, তথা তাঁর স্বতন্ত্র জীবন-চেতনার বৈশিষ্ট্য তাঁর গল্পের মুখ্য উপাদান হয়ে আছে। তিনি নিজেদের বৃহৎ যৌথ পরিবারের ভিতর থেকে প্রধানত হাসির গল্পের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর হাসির গল্পগুলো নিছক হাসিভরা নয়, কোন এক অধরা বেদনার প্রচ্ছন্নতায় আবিষ্ট। অনেক সময়েই সেসব গল্পের মুখে হাসি, চোখে জল।

পরিমল গোস্বামী

পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭৬) ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যঙ্গরচনা লেখক। অনেকগুলো বিখ্যাত পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছেন। তিনি বহু স্মৃতিকথামূলক রচনায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

পরিমল গোস্বামীর জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার রতনদিয়া গ্রামে। তিনি শান্তিনিকেতনে যান চিত্রবিদ্যা শিখতে। ইংরেজিতে এম এ পরীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পড়তে শুরু করলেন নৃতত্ত্ব। আর পরীক্ষা দিলেন বাংলায়। প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলেন। লেখালেখি শুরু করলেন পত্র পত্রিকায়। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক ছিলেন অনেক দিন। এছাড়া 'মাসিক বসুমতী', 'বিচিত্রা', 'প্রবাসী', 'অলকা', 'নতুন পত্র' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। শেষে 'যুগান্তর সাময়িকী'র সহকারী সম্পাদক পদে দীর্ঘদিন নিয়োজিত ছিলেন।

তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি মোট ছত্রিশ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : 'গল্প ভারতী', 'শীতের অর্ঘ্য', 'স্মৃতি চিত্রণ', 'দ্বিতীয় স্মৃতি', 'আমি যাদের দেখেছি', 'যখন সম্পাদক ছিলাম', 'পত্রস্মৃতি', 'পথে পথে' ইত্যাদি। তাঁর গল্প সংকলনের সংখ্যা আট—তার মধ্যে রঙ্গ ব্যঙ্গ আর গোয়েন্দা গল্পও আছে। প্রবন্ধ সংকলন একটি। প্রবন্ধ ও রম্য রচনার বই দুটি, ভ্রমণ কাহিনি একটি, নাটক তিনটি, অনূদিত বই দুটি, ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত বই দুটি, সম্পাদিত বই দুটি। ২০১১ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'সমগ্র স্মৃতিচিত্র'। পরিমল গোস্বামীর স্মৃতি চিত্রগুলোতে সান্নিধ্যের অন্তর্গত বিখ্যাত ব্যক্তিদের তালিকা বিস্ময়কর ভাবে বিপুল। তার মধ্যে লেখক, অভিনেতা, বিজ্ঞানী ছিলেন অনেকে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) লেখায় বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, বাউরি, ডোম, গ্রাম্য কবিয়াল সম্প্রদায়ের কথা। ছোট বা বড় যে ধরনের মানুষেই হোক না কেন, তাঁর সব লেখায় মানুষের মহত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। এটাই তাঁর লেখার বড় গুণ। সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন চিত্র তাঁর অনেক গল্পের ও উপন্যাসের বিষয়। সেখানে আরও আছে গ্রাম জীবনের ভাঙ্গনের কথা, নগর জীবনের বিকাশের কথা।

তারাশঙ্কর পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। লাভপুরের যাদব লাল হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য লেখাপড়া শেষ করতে পারেন নি। তিনি কংগ্রেসের কর্মী হয়ে সমাজসেবামূলক কাজ করেন। এরজন্য কিছুদিন জেল খাটেন। একবার তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। লেখালেখিতেই তিনি আত্মনিয়োগ করেন। মন প্রাণ দিয়ে লেখালেখির জন্য তিনি কলকাতায় চলে আসেন।

উপন্যাস ও ছোটগল্প উভয় ক্ষেত্রে তাঁর সীমাহীন কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে. তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'চৈতালি ঘূর্ণি', 'পাষাণপুরী', 'নীল কণ্ঠ', 'রাইকমল', 'প্রেম ও প্রয়োজন', 'আগুন', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'মন্বন্তর', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'ঝড় ও ঝরাপাতা', 'অভিযান', 'পদচিহ্ন', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনি', 'আরোগ্য নিকেতন', 'না', চাঁপাডাঙ্গার বউ', 'পঞ্চপুত্তলী', 'কালান্তর', 'বিচারক', 'কালবৈশাখী', 'একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে', 'মঙ্গলগড়', 'মঞ্জরী অপেরা', 'সংকেত', 'ভুবন পুরের হাট', 'বসন্তরোগ', 'স্বর্গমর্ত্য গন্নাবেগম', 'অরণ্যচিহ্ন', 'হীরা পান্না', 'মহানগরী', 'গুরুদক্ষিণা', 'শুক সারী কথা', 'যাজ্ঞবল্ক', 'মনিবৌদি', 'ছায়াপথ', 'কালরাত্রি', 'অভিনেত্রী', 'ফরিয়াদ', 'ব্যর্থ নায়িকা', 'সুখী ঠাকরুণ', 'ভূতপুরাণ', 'জনপদ', 'নব দিগন্ত', 'কীর্তি হাটের কড়চা' ইত্যাদি।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প গ্রন্থগুলো হল : 'ছলনাময়ী', 'জলসাগর', 'রসকলি', 'তিন শূন্য', 'প্রতিধ্বনি', 'বেদেনী', 'দিল্লিকা লাড্ডু', 'যাদুকরী', 'স্থল পদ্ম', 'প্রসাদ মালা', 'হারানো সুর', 'ইমারৎ', 'রামধনু', 'তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প', 'শ্রীপঞ্চমী', 'কামধেনু', 'মাটি', 'শিলাসন', 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় গল্প', 'স্বনির্বাচিত গল্প', 'গল্প সঞ্চয়ন', 'বিস্ফোরণ', 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প', 'তামস তপস্যা', 'গল্প পঞ্চাশৎ', 'আয়না', 'একটি প্রেমের গল্প', 'কিশোর সঞ্চয়ন', 'তপোভঙ্গ', 'দীপার প্রেম', 'নারী রহস্যময়ী', 'পঞ্চকন্যা', 'শিবানীর অদৃষ্ট', 'গবিন সিংহের ঘোড়া', 'এক পশলা বৃষ্টি', 'রূপসী বিহঙ্গিনী', 'উত্তর কিষ্কিন্দাকাণ্ড' ইত্যাদি। তাঁর কিছু নাটকও রয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালীন উপন্যাসে সবচেয়ে সমাজ-সচেতন শিল্পীমনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল রাঢ় প্রত্যন্তবর্তী আপন জন্ম-মাটি বীরভূম-লাভপুরের গ্রামজীবন-নির্ভর। অশিক্ষা, সামাজিক উপেক্ষা, আর্থিক রিক্ততা ও

অন্ধকুসংস্কার জড়ানো সে জীবনের সংকট সমস্যা তাঁর রচনায় বিধৃত হয়েছে। তিনি ব্যক্তির ওপর সমাজকে স্থান দিয়ে সার্থক সামাজিক উপন্যাসের সৃষ্টি করেছেন। 'চৈতালি ঘূর্ণি' তাঁর প্রথম উপন্যাস। 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' এই প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। মানবজীবনকে গভীরভাবে দেখার ক্ষমতার ফলে তাঁর উপন্যাসে মানুষের অমর প্রাণশক্তির জয়গান উচ্চকিত হয়েছে। 'রাইকমল' ও 'কবি' উপন্যাসে বৈষ্ণব ও কবিয়ালের জীবনের রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। বিচিত্র জীবনধারার পরিচয় তাঁর উপন্যাসে সহজলভ্য। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় রাঢ়ের নিম্ন শ্রেণি হিন্দুর জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পরচনায়ও তাঁর অপরিসীম কৃতিত্ব বিদ্যমান ছিল। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে 'কালিন্দী', 'চাঁপা ডাঙার বৌ', 'মন্বন্তর', 'আগুন', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'বিপাশা', 'একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে', 'উনিশ শ একাত্তর', 'নবদিগন্ত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সমকালীন কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন ছিল অত্যুচ্চ শীর্ষবর্তী। তিনি তাঁর দেশ দক্ষিণপূর্ব বীরভূমের সাধারণ মানুষের জীবন— পুরানো জমিদার ঘর থেকে মালো-বেদে পাড়ার পর্যন্ত পরিচয় গল্পে রূপায়িত করেছেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচয় তাঁর গল্পে সহজলভ্য। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, বেদে-বেদেনী ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের চরিত্র অবলম্বন করে তাঁর গল্পগুলো রচিত। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের পরিচয়ও তাঁর গল্পে পাওয়া যায়। 'পাষাণপুরী', 'নীলকণ্ঠ', 'ছলনাময়ী', 'জলসাগর', 'রসকলি', 'তিন শূন্য' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, 'তারাশঙ্করের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা, সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্যঘোষণার কৃত্রিমতায় তাঁর বিষয়গুলো সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকে নি।'

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইতিহাশ্রয়ী গল্প, সামাজিক গল্প, কবিতা সাহিত্যের প্রায় শাখাতেই বিচরণ করেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম উত্তর প্রদেশের জৌনপুর শহরে। কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে আইন নিয়ে পড়াশুনার সময়ে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তিনি ১৯৩৮ সালে বম্বের সিনেমা জগতে চিত্র নাট্যকার রূপে কাজ শুরু করেন। ১৯৫২ সাল থেকে পুনায় বসবাস করেন। পরবর্তী জীবন তিনি সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন।

তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হল : 'ব্যোমকেশের ডায়েরি', 'ব্যোমকেশের কাহিনি', 'ব্যোমকেশের গল্প', 'দুর্গরহস্য', 'চিড়িয়াখানা', 'আদিম রিপু', 'বহ্নি-পতঙ্গ', 'সসেমিরা', 'কহেন কবি কালিদাস', 'ব্যোমকেশের ছ'টি', 'ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন', 'মগ্নমৈনাক', 'শজারুর কাঁটা', 'বেণীসংহার'।

সংকলন : 'শরদিন্দু অমনিবাস (প্রথম খণ্ড)', 'শরদিন্দু অমনিবাস (দ্বিতীয় খণ্ড)', 'ব্যোমকেশ সমগ্র।'

ঐতিহাসিক উপন্যাস : 'কালের মন্দিরা', 'গৌড়মল্লার', 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ', 'কুমারসম্ভবের কবি', 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'।

গল্প-সংকলন : 'জাতিস্মর', 'চুয়াচন্দন', 'বিষকন্যা', 'কাঁচামিঠে', 'শাদা পৃথিবী', 'এমন দিনে', 'শঙ্খ-কঙ্কণ' ইত্যাদি।

শরদিন্দুর প্রসিদ্ধতম সৃষ্টি হল সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী। ১৯৩২-এ 'পথের কাঁটা' উপন্যাসে ব্যোমকেশের আত্মপ্রকাশ। প্রথমে শরদিন্দু অজিতের কলমে লিখতেন। কিন্তু পরে তিনি তৃতীয় পুরুষে লিখতে শুরু করেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপন্যাস। যেমন 'কালের মন্দিরা', 'গৌড় মল্লার', 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ', 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' ইত্যাদি। সামাজিক উপন্যাস যেমন 'বিষের ধোঁয়া' বা অতিপ্রাকৃত নিয়ে তার 'বরদা সিরিজ' ও অন্যান্য গল্প এখনো বেস্টসেলার।

বনফুল

বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) একজন খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি। সাহিত্য চর্চার জন্য ছোট বেলায় অভিভাবক ও শিক্ষকদের বিরূপ দৃষ্টি আড়াল করার জন্য বনফুল ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন এবং সে নামেই তিনি বেশি পরিচিত হন।

বনফুলের জন্ম পিতার কর্মস্থল বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মনিহারীতে। তবে তিনি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শিয়াখালা গ্রামের বিখ্যাত কাঁটাবুনে মুখুজ্জের বংশধর ছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তবে পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি ডিগ্রি লাভ করেন। প্যাথলজিস্ট হিসেবে ৪০ বৎসর কাজ করেছেন। ১৯৬৮ সাল থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পরে সেখানেই মারা যান।

লেখক হিসেবে বনফুল হাজারেরও বেশি কবিতা, ৫৮৬টি ছোটগল্প, ৬০টি উপন্যাস, ৫টি নাটক, জীবনী ছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচনাবলি সমগ্র ২২ খণ্ডে প্রকাশিত।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'তৃণখণ্ড', 'বৈতরণীর তীরে', 'নিরঞ্জনা', 'ভুবন সোম', 'মহারাণী', 'অগ্নীশ্বর', 'মানসপুর', 'এরাও আছে', 'নবীন দত্ত', 'হরিশ্চন্দ্র', 'কিছুক্ষণ', 'সে ও আমি', 'সপ্তর্ষি', 'উদয় অস্ত', 'গন্ধরাজ', 'পীতাম্বরের পুনর্জন্ম', 'নঞ তৎপুরুষ', 'কৃষ্ণপক্ষ', 'সন্ধিপূজা', 'হাটে বাজারে', 'কন্যাসু', 'অধিকলাল', 'গোপালদেবের স্বপ্ন', 'স্বপ্নসম্ভব', 'কষ্টিপাথর', 'প্রচ্ছন্ন মহিমা', 'দুই পথিক', 'রাত্রি', 'পিতামহ', 'পক্ষীমিথুন', 'তীর্থের কাক', 'রৌরব', 'জলতরঙ্গ', 'রূপকথা এবং তারপর', 'প্রথম গরল', 'রঙ্গতুরঙ্গ', 'আশাবারি', 'সাত সমুদ্র তেরো নদী', 'আকাশবাসী', 'তুমি',

'অসংলগ্ন', 'সীমারেখা', 'ত্রিবর্ণ', 'অলংকারপুরী', 'জঙ্গম', 'অগ্নি', 'দ্বৈরথ', 'মৃগয়া', 'নির্মোক', 'মানদণ্ড', 'নবদিগন্ত', 'কষ্টিপাথর', 'স্থাবর', 'ভীমপলশ্রী', 'পঞ্চপর্ব', 'লক্ষ্মীর আগমন', 'ডানা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

বনফুলের রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তুর সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা এবং নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানবচরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে। বনফুলের লেখা ছোটগল্পগুলোকে বাংলা সাহিত্যে এক অপরূপ বিস্ময় বলে মনে করা যায়। এই বিস্ময় কেবল আশ্চর্য বাকসংক্ষিপ্তির কল্যাণেই নয়,— শৈলী ও ভাষানুষঙ্গে এমন অনির্বচনীয় রহস্যময়তা বিদ্যমান, যার অদৃশ্য প্রভাবে স্বল্পকথার সর্বাঙ্গ ঘিরে বচনাতীতের এক মৌন স্পর্শ যেন গুঞ্জন করে। গল্পে তাঁর আঙ্গিক চিন্তা ছিল নিয়ত নতুন।

তাঁর গল্প সংকলনগুলো হল : 'বৈতরণী-তীরে', 'বনফুলের গল্প', 'বনফুলের আরো গল্প', 'বাহুল্য', 'বিন্দু-বিসর্গ', 'অদৃশ্য-লোকে', 'তন্বী', 'ঊর্মিমালা', 'রঙ্গনা', 'করবী', 'মনিহারী', 'অদ্বিতীয়া' ইত্যাদি তাঁর গল্পগ্রন্থ। বনফুলের গল্পে এমন রচনা সুলভ, যেখানে আপন জীবন অথবা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন। সকল সার্থক সৃষ্টির মতই তাঁর সকল লেখা আত্মকথারই ফসল। নতুন কথার সঙ্গে নতুন ধরনের কথা বলার আগ্রহ তাঁর শিল্পীচেতনায় প্রবল ছিল।

বনফুল উপন্যাসে আঙ্গিক বা রূপরীতির নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষায় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। বিচিত্র মানুষের চরিত্র চিত্রণে তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক রচনার ক্ষেত্রে বনফুলের কৃতিত্ব প্রকাশ পেলেও একষট্টিটি উপন্যাস রচনায় তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। চিকিৎসা বিদ্যা তাঁর পেশা হলেও সাহিত্য ছিল নেশা। তাঁর সব লেখাই তাঁর ব্যক্তিজীবন, জীবন-অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধের সঙ্গে জড়িত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-৭৬) একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হিসেবে নিজের মর্যাদার আসন লাভ করেছিলেন। বিশেষত কয়লা খনি এলাকার মানুষের কথা তাঁর লেখায় চমৎকার ভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় রানীগঞ্জের অঞ্চলে তাঁর জন্ম। এখানেই বাল্যবন্ধু হিসেবে পান কাজী নজরুল ইসলামকে। দুজনে ছিলেন সহপাঠী। 'কালিকলম', 'ভারতবর্ষ', 'গল্প ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সাধারণত পরিচিত সংসার নিয়ে গল্প উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রোমান্স নয়—সংসার বা সমাজচিত্রই তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য। কয়লাকুঠির কুলি-মজুর-সাঁওতালদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, উৎসব অনুষ্ঠান, প্রণয়লীলা প্রভৃতি তিনি তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। তাঁর আসল নাম ছিল শ্যামলানন্দ, ডাক নাম শৈল। গল্প ছাপাবার আগ্রহে মেয়েলি নাম নিলেন শৈলজা। পরে স্বরূপ প্রকাশ

করলেন শৈলজানন্দ নামে। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সমকালীন জীবনানুভবের শিল্পী শৈলজানন্দ ছোট মানুষের ভেতরকার মানুষকে অনাবৃত করে তুলতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লিখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই।' তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে : 'ঝড়ো হাওয়া', 'রাঙা শাড়ি', 'বাংলার মেয়ে', 'জোয়ার ভাঁটা', 'পূর্ণচ্ছেদ', 'খরস্রোতা', 'অপরাধী', 'অরুণোদয়', 'গঙ্গা-যমুনা', 'আকাশ-কুসুম', 'শোভাযাত্রা', 'বিজয়া' ইত্যাদি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর গল্পে কয়লা খনির আদিম জীবনরূপ, মহানগরীর জৌলুস ও উজ্জ্বলতার অন্তরালে শিল্পশহরের স্বাভাবিক ক্ষুধা আর লালসা, আর একদিকে বাংলার গ্রামীণ জীবনের রাঢ়পল্লীর শান্তস্নিগ্ধ ক্ষয়িষ্ণু রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অতসী', 'বধূবরণ', 'মারণমন্ত্র', 'নারীমেধ', 'দিনমজুর' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ তাঁর প্রতিভার নিদর্শন। বাংলা গল্পে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য নিয়ে এলেন শৈলজানন্দ। রানীগঞ্জে ধানবাদের কয়লা খাদের পটভূমিতে রচিত গল্পগুলো এর সাক্ষ্য। সাঁওতাল ও কুলির রুক্ষ জীবনের বিরোধ, অপমান, ভালবাসা, সাঁওতালি পুরুষের মাতোয়ারা মন, দীপ্ত স্বাস্থ্য, সাঁওতাল নারীর চঞ্চল হাসি তাঁর গল্পে এক বিচিত্র মাধুর্য দিয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনের ব্যথা, বেদনা, সামাজিক বৈষম্য ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতির চিত্র তাঁর গল্পে সহজেই দেখা যায়।

শৈলজানন্দ সমকালীন জীবনানুভবের শিল্পী হিসেবে ছিলেন অনন্য। তিনি ছোট মানুষের ছোটতাকে, তাদের অভাব-অভিযোগ দৈন্যকে পাশ কাটিয়ে যান নি।

মনোজ বসু

মনোজ বসু (১৯০১-৮৭) রোমান্টিক ধরনের উপন্যাসের রচয়িতা। তাঁর লেখা সহজ সরল স্বচ্ছন্দ ও দ্রুতগতিসম্পন্ন। মেজাজে মনোজ বসু ছিলেন স্বপ্নাবেশে উদ্বেল রোমান্টিক, স্বভাবে জলজঙ্গলাদ্র জন্মভূমি দক্ষিণপূর্ব বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতি ও জীবন যাত্রার অনুসারী। 'জলজঙ্গল', 'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'আমার ফাঁসি হল', 'রক্তের বদলে রক্ত', 'মানুষ গড়ার কারিগর', 'রূপবতী', 'বন কেটে বসত', 'নিশিকুটুম্ব', 'মৃত্যুর চোখে আগুন', 'রাজকন্যার স্বয়ম্বর', 'স্বর্ণসজ্জা', 'ছবি আর ছবি', 'সাজবদল', 'রানী', 'প্রেমিক' ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করে তিনি নতুন নতুন বিষয়ের সাহায্যে বাংলা উপন্যাসের পরিধি বিস্তার করেছেন।

মনোজ বসু প্রচুর লিখেছেন। তাঁর গল্পের বই 'বনমর্মর', 'নরবাঁধ', 'দেবী কিশোরী', 'পৃথিবী কাদের', 'একদা নিশীথ কালে', 'দুঃখ নিশার শেষে', 'উলু', 'খদ্যোত', 'কাঁচের আকাশ', 'দিল্লি অনেকদূর', 'কুসুম', 'কিংশুক', 'মায়াকান্না', 'গল্পপঞ্চাশৎ', 'কনকলতা', 'ওনারা' ইত্যাদি। সমালোচকের মতে, 'রোমান্সপ্রিয় লেখক তিনি, কিন্তু তাঁর রোমান্সে মিশিয়ে আছে গ্রামবাংলার একেবারে মাটি মাখানো আকৃতি; বিদেশি ফেস-পাউডারের গন্ধ জড়ানো অন্য জগতের রোমান্স। এই তাঁর সাফল্যের

চাবিকাঠি। এইখানেই তাঁর সিদ্ধি, প্রাকৃতিক পরিবেশ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম : 'জাতিস্মর', 'ডিটেকটিভ', 'চুয়াচন্দন', 'কাঁচামিঠে', 'কালকুট', 'গোপন কথা', 'দন্তরুচি', 'পঞ্চভূত', 'ছায়া পথিক', 'কানু কহে রাই' ইত্যাদি।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০১-৭২) বাস্তবতার অনুসারী উপন্যাস রচনা করেছেন এবং মুর্শিদাবাদ এলাকার চিত্র তাঁর উপন্যাসে রূপ লাভ করেছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'বন্ধনী', 'দেহযমুনা', 'ময়ূরাক্ষী', 'ক্ষুধা', 'পান্থনিবাস', 'শৃঙ্খল', 'আকাশ ও মৃত্তিকা', 'গৃহকপোতী', 'শতাব্দীর অভিশাপ', 'সোমলতা', 'কালোঘোড়া', 'হংস বলাকা', 'অনুষ্টুপ ছন্দ' প্রভৃতি। মূল্যবোধের অবক্ষয়কে তিনি তাঁর উপন্যাসে নগ্নভাবে দেখিয়েছেন। ড. ক্ষেত্রগুপ্তের মতে, 'সরোজ কুমার রায়চৌধুরী বাস্তবতার সাধনা করেছিলেন। এই বাস্তবতা আর পাঁচজন থেকে স্বতন্ত্র। বাস্তববাদী শিল্পী জীবনের তটস্থ দর্শক, ভাসমান ভোক্তা নয়। রোমান্টিক চোখে বহু রঙের ভাণ্ডার আছে। বাস্তবতার উপাসক তা পরিহার করতে চায়। সরোজকুমারের বাস্তবতা মৃদুকণ্ঠ; কারও বিরুদ্ধে তার অভিযোগ নেই। সরোজকুমার ছিলেন সচেতন বাস্তববাদী সাহিত্যিক। তাঁর উপন্যাসে তারাশঙ্করের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।'

জরাসন্ধ

জরাসন্ধের আসল নাম চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০২-৮১)। তিনি কারাগারের কাহিনি লিখে একসময় পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। কারাগারের জীবন, রাজনীতি, বাস্তুহারা সমস্যা, সমাজের দুর্বিষহ বেকারত্ব প্রভৃতি নিয়ে তাঁর সাহিত্য রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

জরাসন্ধের জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে। অর্থনীতি বিষয় নিয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩০ সালে কারাবিভাগের চাকরিতে যোগদান করেন। ডেপুটি জেলর হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৬০ সালে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। প্রায় কুড়িটি উপন্যাস তিনি লিখেছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'লৌহকপাট (৪খণ্ড)', 'তামসী', 'পাড়ি', 'মসিরেখা', 'ন্যায়দণ্ড', 'মল্লিকা', 'আবরণ', 'আশ্রয়', 'অর্পণা', 'তনুমন', 'নিঃসঙ্গ পথিক (২খণ্ড)', 'পরশমণি', 'মহাশ্বেতার ডায়েরি', 'নমিতা', 'মানসকন্যা ইত্যাদি। তাঁর লেখা ছোটগল্প গ্রন্থগুলো হল : 'রংচং', 'গল্প লেখা হল না', 'যমবাজার', 'বিপদ', 'কিশোর অমনিবাস', 'জরাসন্ধের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' ইত্যাদি।

তাঁকে চাকরি সূত্রে বদলি হতে হয়েছে নানান জেলে। জেল-জীবনকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন খুবই কাছ থেকে। কয়েদিদের কাছে শুনেছেন তাদের কাহিনি।

সহকর্মীরাও শুনিয়েছেন নানা বিচিত্র ঘটনা। সেইসব খণ্ড-কাহিনি সুনিপুণ ভাবে জোড়া দিয়ে লেখা হয়েছে 'লৌহকপাট।' 'লৌহকপাটে'র অবতরণিকাতে জরাসন্ধ লিখেছেন, 'জীবনের এমন একটা পথে চলতে হয়েছে, যেটা প্রকাশ্য রাজপথ নয়। সে এক নিষিদ্ধ জগত। সেখানে যাদের বাস, তাদের ও আমাদের এই দৃশ্যমান জগতে দাঁড়িয়ে আছে লৌহদণ্ডের যবনিকা। তার ওপরে পাষাণ-ঘেরা রহস্যলোক। কিন্তু তারাও মানুষ। তাদেরও আছে বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী—সুখে সমুজ্জ্বল, দুঃখে পরিম্লান, হিংসায় ভয়ঙ্কর, প্রেমে জ্যোতির্ময়! সেই পাষাণ পুরীর দীর্ঘ প্রকোষ্ঠের স্তব্ধ বাতাসে জমে আছে অলিখিত ইতিহাস, সভ্য পৃথিবী তার কতটুকু জানে? আমি যে সেখানে বিচরণ করেছি, এই দীর্ঘ জীবন ধরে, প্রভাতে সন্ধ্যায়, নিভৃত রাত্রির অন্ধকারে—আমিইবা কতটুকু দেখেছি, কতখানিইবা শুনেছি।—আহরণ যা করেছি, তোলা আছে স্মৃতির মণিকোঠায়। এখানে যেটুকু দিলাম সে শুধু আভাস কিংবা তার ব্যর্থ প্রয়াস।'

কারাজীবন নিয়ে এর আগেও অনেক ভালো বই বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে, সাহিত্য-গুণে সেগুলিও উজ্জ্বল। কিন্তু তাদের লেখকরা ছিলেন প্রধানত রাজনৈতিক বন্দী। তাঁদের লেখায় কারাজীবনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে—সেটা কারা জীবনের একটা দিক। 'লৌহকপাট' সেদিক থেকে স্বতন্ত্র। এর লেখক কারা-শাসনের সঙ্গে যুক্ত—তাই এর পটভূমি অনেক বিস্তৃত। লেখক কারাজীবনকে দেখেছেন পরম ঔৎসক্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে। কিন্তু জীবনকে জানলেও তার কাহিনি শোনানো সব সময়ে সহজ হয় না। তার ওপর সরকারি দপ্তরখানার অনেক বাধা নিষেধ থাকে। লেখকের নিজের কথায়, "অনেক মুখরোচক তথ্যের স্বাদ থেকে পাঠককে বঞ্চিত করেছি।" তা হয়তো করেছেন, কিন্তু ওঁর প্রসাদগুণে পাঠকদের রস-তৃপ্তির তাতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে নি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬) ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার ও সম্পাদক। তবে কথা সাহিত্যিক হিসেবেই তিনি বিশেষ খাতিমান ছিলেন। কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। উপন্যাস ও ছোটগল্পে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। কবিতা রচনাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

তাঁর জন্ম নোয়াখালীতে—পিতার কর্মস্থলে। তবে তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ছিল বর্তমান মাদারীপুর জেলায়। তাঁর বাবা রাজকুমার সেনগুপ্ত নোয়াখালীর আদালতের আইনজীবী ছিলেন। তাঁর শৈশব, বাল্য জীবন ও প্রাথমিক শিক্ষা নোয়াখালীতেই সম্পন্ন হয়। ১৯১৬ সালে বাবার মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাশ করেন। সেই সঙ্গে বি এল ডিগ্রি নেন। কর্মজীবনে অস্থায়ী মুন্সেফ হিসেবে শুরু করে ক্রমে সাব জজ, জেলা জজ ও ল' কমিশনে স্পেশাল অফিসার পদে উন্নীত হয়ে ১৯৬০ সালে অবসর নেন। পদ্মশ্রী খেতাব তিনি ফিরিয়ে দেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গ্রন্থ সংখ্যা সত্তরের মত। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'বেদে', 'কাকজ্যোৎস্না', 'আকস্মিক', 'বিবাহের চেয়ে বড়ো', 'প্রাচীন ও প্রান্তর', 'ছিনিমিনি', 'নবনীতা', 'ইন্দ্রানী', 'প্রথম কদম ফুল', 'তৃতীয় নয়ন' ইত্যাদি। তাঁর ছোটগল্প গ্রন্থগুলো হল : 'টুটা ফুটা', 'কাঠ খড় কেরোসিন', 'চাষাভুষা', 'হাড়ি মুচি ডোম', 'একরাত্রি' ইত্যাদি। তাঁর স্মৃতিচারণমূলক বই কল্লোল যুগে পাঠকমহলে বেশ সাড়া জাগায়। বিচার বিভাগে চাকরির বদৌলতে তিনি দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সংস্পর্শে আসেন। এইসব অন্তরঙ্গ পরিচিত জনদের জীবনের নানা কাহিনি তাঁর ছোটগল্পগুলোতে নিপুণ ভাবে আঁকা হয়েছে।

'বেদে' তাঁর প্রথম উপন্যাস। ন্যুট হ্যামসুনের 'প্যান' উপন্যাস তিনি 'মীনকেতন' নামে অনুবাদ করে কল্লোলে প্রকাশ করেছিলেন। এই প্যান উপন্যাসের আখ্যানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি 'বেদে' উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে বাউণ্ডুলে জীবনধারা, বস্তির জীবন, নরনারীর যৌনতা প্রভৃতি গুরুত্ব লাভ করেছে। 'কাকজ্যোৎস্না' উপন্যাসে প্রদীপ ও অজয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিধবা নমিতা যে ব্যক্তিত্ববোধের প্রকাশ ঘটিয়েছে তার কোনো তুলনা নেই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮) একজন বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে কবি, ছোটগল্পকার, উপন্যাসিক ও চিত্র পরিচালক ছিলেন। তবে কথা সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনার যোগ্য। বিখ্যাত 'কল্লোল' পত্রিকার প্রধান তিন লেখকের অন্যতম ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনি ৫০টি উপন্যাস, ৩০টি ছোটগল্প সংকলন এবং ৩০টি কিশোরদের গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর ছোটগল্পের মোট সংখ্যা ১৩০টি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম বাংলাদেশে। ১৯২৩ সালে তিনি ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে যান। সেখানেই তার সাহিত্যিক জীবনের বিকাশ ঘটে। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'প্রথমা', প্রথম উপন্যাস 'পাঁক' এবং প্রথম ছোটগল্প 'শুধু কেরানী'। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম বাঙালি সাহিত্যিক যিনি নিয়মিত কল্পবিজ্ঞান বা বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প-উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান গল্প-উপন্যাস হল : গল্প—'কালাপানির অতলে', 'দুঃস্বপ্নের দ্বীপ', 'যুদ্ধ কেন থামল', 'মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী', 'হিমালয়ের চূড়ায়' ইত্যাদি। উপন্যাস—'পিঁপড়ে পুরাণ', 'পাতালে পাঁচ বছর', 'ময়দানবের দ্বীপ', 'শুক্রে মারা গিয়েছিল', 'সূর্য যেখানে নীল' ইত্যাদি।

উপন্যাস ও ছোটগল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিশেষ খ্যাতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'পাঁক', 'মিছিল', 'উপনয়ন', 'আগামীকাল', 'প্রতিশোধ', 'কুয়াশা', 'পথ ভুলে', 'যখন বাতাসে নেশা', 'হৃদয় দিয়ে গড়া', 'জড়ানো মালা', 'পথের দিশা' ইত্যাদি। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প গ্রন্থগুলো হল : 'পঞ্চশর', 'বেনামী বন্দর', 'পুতুল

ও প্রতিমা', 'মৃত্তিকা', 'ধূলিধূসর', 'অফুরন্ত', 'মহানগর', 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে', 'সামনে চড়াই', 'সপ্তপদী', 'ডাল পায়রা', 'প্রেমই ধন্বন্তরী', 'নানা রঙে বোনা' ইত্যাদি।

উপন্যাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র বাস্তববাদী শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পাঁক' হল অখ্যাত মানুষের জীবনের আখ্যান। ইঙ্গিত ময়তা ও পরিমতিবোধ তাঁর উপন্যাসগুলো শিল্প-সার্থক করে তুলেছে। তাঁর ভাষা ব্যঞ্জনাধর্মী। তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসে ওঠে এসেছে দরিদ্রক্লিষ্ট নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনধারা এবং মনোজগতের সংকট। প্রেমহীন দাম্পত্য, মূল্যবোধের অপচয়, অস্তিত্বের অসহায়তা তাঁকে ভাবিয়েছে।

রোমান্টিক ভাবাবেগ নয়, মানবপ্রীতিই প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসের মূল কথা। তিনি যে সময়ে উপন্যাস লিখেছেন, তখন চার পাশে অনিশ্চয়তা হতাশ আর অসহায়তার ছবি। তাঁর উপন্যাসে সময়ের সেই ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। সামাজিক অবক্ষয়, শোষক শোষিতের দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসের বিষয় যেমন হয়েছে তেমনি দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মানুষগুলোর অন্তরাত্মা লেখনির যাদুতে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়েছে।

ছোটগল্পের বিষয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর গল্পে গোটা মানুষের মানে খুঁজেছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে তিনি কখনো এড়িয়ে যেতে পারেননি। তিনি একই সঙ্গে কবি ও গল্পকার। অনেক সময় তাঁর গল্প পড়তে পড়তে মনে হয় কবিতা পড়ছি। তাই কবিতার ভাষা ও গল্পের ভাষা অনেক সময় মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

প্রবোধকুমার সান্যাল

গল্প ও উপন্যাস উভয় প্রকার রচনাতে প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-৮৩) দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী কথা সাহিত্যিক। কল্লোলে প্রকাশিত 'মার্জনা' গল্পের মাধ্যমে তিনি পাঠক সমাজে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : উপন্যাস : 'যাযাবর', 'কলরব', 'প্রিয় বান্ধবী', 'আঁকাবাঁকা', 'নদ ও নদী' ইত্যাদি। গল্প গ্রন্থ : 'চেনা ও জানা', 'নিশিপদ্ম', 'অবিকল', 'অন্তরাগ' ইত্যাদি। 'মহা প্রস্থানের পথে' তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনি।

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাসে পরিচিত মানুষের বাস্তব জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসে শ্রীমতী ও জহরের অভিনব সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। জহরের ক্লান্ত ও দুঃখী জীবনে শান্তির শিখা ছড়াতে শ্রীমতীর আগমন ঘটেছে। 'অগ্রগামী' উপন্যাসে মায়লিতা ও সুরপতির অদ্ভুত সম্পর্কের চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। 'হাসুবানু' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের গুরুত্ব কম নয়। মানুষের জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনি তাঁর গল্পে চমৎকার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর প্রথম গল্প 'অবৈধ'-তে আছে গ্রাম্য বালিকা হরিদাসীর রেল গাড়িতে মাতৃপরিত্যক্ত শিশুর প্রতি আকর্ষণের কথা। তাঁর গল্প সংগ্রহের অধিকাংশের মধ্যেই আছে সামাজিক জীবন সংকটের চিত্র।

হুমায়ুন কবির

হুমায়ুন কবির (১৯০৬-৬৯) ভারতীয় বাঙালি শিক্ষাবিদ রাজনীতিবিদ লেখক ও দার্শনিক। উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনায় তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। একটি মাত্র উপন্যাস 'নদী ও নারী' রচনা করে ঔপন্যাসিকের বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন।

হুমায়ুন কবিরের জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোমরপুর গ্রামে। নওগাঁ কে বি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশের পর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে বি এ অনার্সসহ এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি এ অনার্স পাশ করেন। তিনি দুই দফায় ভারতের শিক্ষা মন্ত্রির দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

'নদী ও নারী' উপন্যাস ছাড়াও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হল : 'ইমানুয়েল কান্ট', 'শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব', 'বাংলার কাব্য', 'মার্ক্সবাদ', 'মীর্জা আবু তালিব খান', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' ইত্যাদি। এছাড়া ইংরেজিতেও কিছু বই লিখেছেন। তিনি বিখ্যাত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

কথা সাহিত্যে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ আসন 'নদী ও নারী' উপন্যাসের জন্য। 'নদী ও নারী' তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। 'নদী ও নারী' তিন খণ্ডে রচিত। পদ্মানদীর তীরে বসবাসরত দীনহীন মানুষের করুণ চিত্র এ উপন্যাসে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী

শিল্প সচেতন ঔপন্যাসিক হিসেবে সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-৬৫) বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। তাঁর উপন্যাসে ১৯৪৫ থেকে ৬৫ পর্যন্ত সমাজ জীবনের পটভূমি স্থান পেয়েছে। উপন্যাস ও ছোটগল্প—উভয় ক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে।

বিহারের পূর্ণিয়ায় তাঁর জন্ম। সেখানেই তাঁর কর্ম জীবন অতিবাহিত হয়। ওকালতি ছিল তাঁর পেশা। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে জেল খেটেছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'জাগরী', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', 'অচিন রাগিনী', 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', 'দিগভ্রান্ত' ইত্যাদি। তাঁর ছোটগল্প সংকলনগুলো হল : 'পথনায়ক', 'অপরিচিতা', 'চকাচকী', 'পত্রলেখার বাবা', 'জলভ্রমি', 'আলোক দৃষ্টি' ইত্যাদি।

'জাগরী' সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম উপন্যাস। জেলে বসে তিনি এটি রচনা করেছিলেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত। এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবর্গের অভিঘাত নিম্ন বর্ণের চৈতন্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কী স্বরূপ ছিল

আর সমাজ কাঠামোর মর্মমূলে তা কী আলোড়ন তুলেছিল তারই নিখুঁত রূপক আখ্যান ঢোঁড়াই চরিত মানস। 'অচিন রাগিনী' উপন্যাসে গল্প বলার চমৎকার ভঙ্গি ফুটে উঠেছে। সতীনাথ ভাদুড়ী শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক উপন্যাসের স্রষ্টা। সেই সঙ্গে আধুনিক জীবনের আলেখ্য তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রাম্য সমাজের পরিবর্তন তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

উপন্যাসের মত ছোটগল্পেও সামাজিক দায়িত্বকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। সমকালীন রাজনীতি সমাজনীতি তাঁর ছোটগল্পে চমৎকার ভাবে রূপলাভ করেছে। চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতার কোনো অভাব ছিল না।

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) ছিলেন খ্যাতনামা বাঙালি সাহিত্যিক। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গল্পকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও সমালোচক ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকের নতুন কাব্যরীতির সূচনাকারী কবি হিসেবে তিনি সমাদৃত। অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনা করেছেন, ছেলে জুটিয়ে নাটকের দল তৈরি করেছেন। 'প্রগতি' ও 'কল্লোল' নামে দু'টি পত্রিকায় লেখার অভিজ্ঞতা সম্বল করে যে কয়েকজন তরুণ বাঙালি লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের বাইরে সরে দাঁড়াবার দুঃসাহস করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ইংরেজি ভাষায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধাদি রচনা করে তিনি ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : উপন্যাস : 'সাড়া', 'সানন্দা', 'লাল মেঘ', 'পরিক্রমা', 'কালো হাওয়া', 'তিথিডোর', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'মৌলিনাথ', 'নীলাঞ্জনের খাতা', 'পাতাল থেকে আলাপ', 'রাতভর বৃষ্টি', 'গোলাপ কেন কালো', 'বিপন্ন বিস্ময়', 'রুক্মি' প্রভৃতি।

গল্প : 'অভিনয়', 'অভিনয় নয়', 'রেখাচিত্র', 'হাওয়া বদল', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু', 'হৃদয়ের জাগরণ', 'ভালো আমার ভেলা', 'প্রেমপত্র' ইত্যাদি।

অতি আধুনিক উপন্যাসের ধারায় গীতিকাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদ সব মিলিয়ে তাঁর ১৫৩টি গ্রন্থের কথা জানা গেছে। এর মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা পঞ্চাশ। রচনার অজস্রতা এবং অভিনব লিখনভঙ্গির দিক দিয়ে তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে যে ঘাতপ্রতিঘাত ও মানসিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন তাতে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের পরিবর্তে, কাব্যোচ্ছ্বাসের প্রাধান্য বিদ্যমান। 'অকর্মণ্য', 'রডোড্রেনড্রন গুচ্ছ', 'যেদিন ফুটল কমল' প্রভৃতি উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু কাব্যপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। 'তিথিডোর', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'শেষ পাণ্ডুলিপি' ইত্যাদি উপন্যাস নতুন জীবন-সমীক্ষা-রীতির পরিচয়বাহী।

বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যের অপরাপর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ছোটগল্প প্রধানত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ এবং রোমান্টিক মাধুর্যে মণ্ডিত। তাঁর গল্প নিটোল পূর্ণাঙ্গ কবিতাধর্মী—তার শরীরে কাব্যাড়ম্বর নেই, অথচ

রূপে ও স্বভাবে ছড়িয়ে আছে কবিতার সুস্পষ্ট স্বাদুতা। তাঁর গল্পের রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা-মেদ, মায় প্রাণ পর্যন্ত অনেক সময়ে কবিতার ধর্মে গড়া,—তাই তার শরীরে কাব্য গড়ে তোলার অতিসচেতন আড়ম্বর নেই। তাঁর দুর্লভ ঝঙ্কার স্পন্দিত সুপ্রযুক্ত ভাষার শৈলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্লটের মধ্যে আর কিছু এমন বস্তু থাকে না যাকে দু হাত দিয়ে ধরা যায়। 'অভিনয়', 'অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প', 'এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে', 'অসামান্য মেয়ে', 'ঘরেতে ভ্রমর এল', 'নতুন নেশা', 'খাতার শেষ পাতা' ইত্যাদি অনেক গল্পগ্রন্থ তাঁর রচিত। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন সমকালীন সাহিত্য-শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টির অধিকারী। তিনি অসংখ্য গল্প লিখে গেছেন। তাঁর গল্পে রূপের প্রকরণে সচেতন বৈচিত্র্য-বিলাসের পরিচয় বিদ্যমান। তাঁর গল্পের কোথাও পত্র-প্রধান, কোথাও সুরের মত সংলাপ, কোথাও কথা, বিবৃতি, মনস্তত্ত্ব। তাঁর সকল সফল রচনাতেই আছে একটানা কবিতার আবহ। তাতে সুরের রেশও আছে। তিনি নিজেই বলেছেন, 'এমন গল্প কিছু লিখেছি যাকে গল্পাকারে প্রবন্ধ বললে দোষ হয় না।'

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

গল্প ও উপন্যাস রচনায় গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-) বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি পুস্তক ব্যবসায়ের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। কলকাতার প্রকাশনা সংস্থা 'মিত্র ও ঘোষ' তিনিই বন্ধু সহযোগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র কাশীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় কাশীর অ্যাংলো বেঙ্গলি স্কুলে। কলকাতায় ঢাকুরিয়ায় এসে ভর্তি হন বালিগঞ্জ জগবন্ধু ইনসটিটিউশনে। স্কুল জীবন শেষ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন। তখন বন্ধুর সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি পঞ্চাশের বেশি উপন্যাস ও এক হাজারের বেশি ছোটগল্প রচনা করেছেন। 'কলকাতার কাছেই' গ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি এবং 'পৌষ ফাগুনের পালা' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। 'বহ্নি কন্যা', 'রাত্রির তপস্যা' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। 'পাঞ্চজন্য' তাঁর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস। পুরাণের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত হয়েছে।

লীলা মজুমদার

লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক। গল্প উপন্যাস নাটক ছড়া শিশু সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি সমান দক্ষতায় বিচরণ করেছেন।

লীলা মজুমদারের জন্ম কলকাতায়। তাঁর পিতা প্রমদা রঞ্জন রায়। উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর ভাই, সত্যজিৎ রায়ের পিসি ও সুকুমার রায়ের খুড়তুতো বোন হলেন লীলা মজুমদার। তাঁর বাল্য জীবন কাটে শিলঙে। সেখানে লরেটো কনভেন্টে তিনি লেখাপড়া করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণি লাভ করেন। তিনি কর্মজীবনে ১৯৩১ সালে প্রথম দার্জিলিং-এ মহারানী গার্লস স্কুলে

যোগ দেন। পরে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি শান্তি নিকেতনে যান। এক বছর পর তিনি কলকাতা আশুতোষ কলেজে যোগদান করেন। সেখানেও বেশিদিন টিকেননি। তিনি নিজের লেখা লেখিতেই ব্যস্ত থাকেন। অনেকদিন পর তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রোডিউসার হিসেবে যোগ দিয়ে আট বছরের মত কাজ করেন। তিনি সত্যজিৎ রায়ের 'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৯৬৩ থেকে ৯৪ পর্যন্ত সাম্মানিকসহ সম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প গ্রন্থগুলো হল : 'বদ্যিনাথের বাড়ি', 'দিন দুপুরে', 'ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প', 'মনিমালা', 'লাল নীল দেশলাই', 'বাঘের চোখ', 'ইষ্টিকুটুম', 'টাকা গাছ', 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প', 'হাস্য ও রহস্যের গল্প', 'বড় পানি', 'রহস্যের গল্প', 'গুণু পণ্ডিতের গুণপণা', 'নতুন ছেলে নটবর', 'সব সেরা গল্প', 'বহুরূপী', 'ভূতের গল্প', 'সেজো মামার চন্দ্র যাত্রা', 'ময়না শালিখ', 'আজগুবি', 'বাঁশের ফুল', 'গুপের গুপ্তধন', 'ছোটদের বেতাল বত্রিশ', 'সব ভূতুরে', 'গুপী পানুর কীর্তিকলাপ', 'কুকুর ও অন্যান্য', 'অন্য গল্প', 'শুধু গল্প নয়', 'ভূতের বাড়ি', 'মামা দাদুর ঘোড়াবাজি', 'ত্রিমুকুট', 'আগুনি বেগুনি', 'আম গো আম', 'টিপুর উপর টিপ্পনি', 'জানোয়ার গল্প', 'পটকা চোর', 'বেড়ালের বই', 'আষাঢ়ে গল্প', 'চিচিং ফাঁক', 'কল্পবিজ্ঞানের গল্প', 'আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ', 'নেপোর বই', 'ফুলমালা', 'বাঘ শিকারী বামুন', 'মণিমানিক', 'চিরদিনের গল্প' ইত্যাদি।

উপন্যাস : 'পদি পিসীর বর্মী বাক্স', 'হলদে পাখির পালক', 'জোনাকী', 'শ্রীমতী', 'ঝাঁপতাল', 'গুপির গুপ্ত কথা', 'বক ধার্মিক', 'চীনে লণ্ঠন', 'মাকু', 'ফেরারী নাকুগামা', 'বাতাস বাড়ি', 'টংলিং', 'হাওয়ার দাঁড়ি', 'চকমকি মণি', 'মণিকাঞ্চন' ইত্যাদি।

গল্প উপন্যাস ছাড়াও তিনি প্রবন্ধ নাটক জীবনী, স্মৃতি কথা রচনা সংগ্রহ, অনুবাদ ইত্যাদি রচনা করেছেন।

লীলা মজুমদার ছিলেন সমকালীন লেখক-লেখিকাদের মধ্যে ভিন্ন শ্রেণির লেখিকা। পাকদণ্ডী নামে তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর শিলঙে শান্তি নিকেতন ও আল ইন্ডিয়া রেডিও-র সঙ্গে তাঁর কাজ কর্ম, রায়চৌধুরী পরিবারের নানা মজার ঘটনাবলী ও বাংলা সাহিত্যের মালঞ্চে তাঁর দীর্ঘ পরিভ্রমণের কথা বর্ণিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি কথা-সাহিত্যিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে মানবিক মূল্যবোধের চরম সংকটময় মুহূর্তে বাংলা কথাসাহিত্যের যে কয়েকজন লেখকের হাতে সাহিত্য জগতে নতুন এক বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি। তিনি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরতর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যা তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে। জীবনের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি রচনা করেন বিয়াল্লিশটি উপন্যাস ও দুই শতাধিক ছোটগল্প।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা শহরে। তাঁর পিতার দেওয়া নাম ছিল প্রবোধকুমার আর ডাক নাম মানিক। লেখা লেখিতে এই ডাক নামটিই তিনি ব্যবহার করেন। তাঁর পিতা ছিলেন তৎকালীন ঢাকা জেলার সেটেলমেন্ট বিভাগের সাবরেজিস্ট্রার। পিতার বদলির চাকরির সুবাদে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈশব-কৈশোর ও ছাত্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নানা শহরে। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঢাকায়ও তিনি অবস্থান করেছিলেন। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিত বিষয়ে অনার্সে ভর্তি হয়েছিলেন। এ সময়ে বিখ্যাত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'অতসী মামী' প্রকাশিত হলে তিনি লেখক হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশের ফলে তাঁর পড়াশুনায় ব্যাপক ক্ষতি হয়, শেষ পর্যন্ত শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে। সাহিত্য রচনাকেই তিনি মূল পেশা হিসেবে বেছে নেন। এরপর 'কিছুদিন নবারুণ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এবং পরবর্তী কালে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহসম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। পরে একটি প্রেস ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ব্যর্থ হন। তিনি কয়েক মাস একটি সরকারি পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৩ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫৬ সালে তিনি মৃগী মারা যান।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'জননী', 'দিবা রাত্রির কাব্য', 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'জীবনের জটিলতা', 'অমৃতস্য পুত্র:', 'সহরতলি', 'অহিংসা', 'ধরাবাঁধা জীবন', 'চতুষ্কোণ', 'প্রতিবিম্ব', 'দর্পণ', 'চিন্তামণি', 'সহরবাসের ইতিকথা', 'চিহ্ন', 'আদায়ের ইতিহাস', 'জীয়ন্ত', 'পেশা', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'সোনার চেয়ে দামী', 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি', 'সার্বজনীন', 'নাগপাশ', 'ফেরিওয়ালা', 'আরোগ্য', 'চালচলন', 'তেইশ বছর আগে পরে', 'হরফ', 'শুভাশুভ', 'পরাধীন প্রেম', 'হলুদ নদী সবুজ বন', 'মাশুল' ইত্যাদি।

তাঁর ছোটগল্প গ্রন্থগুলো হল : 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'মিহি ও মোটা কাহিনি', 'সরীসৃপ', 'বৌ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'ভেজাল', 'হলুদ পোড়া', 'আজ কাল পরশুর গল্প', 'পরিস্থিতি', 'খতিয়ান', 'মাটির মাশুল', 'ছোটবড়', 'ছোট বকুল পুরের যাত্রী', 'ফেরিওলা', 'লাজুক লতা' ইত্যাদি।

জীবনের প্রথমভাগে তিনি ফ্রয়েডীয় মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এছাড়া মার্কসবাদও তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই এই দুই মতবাদের নিবিড় প্রভাব লক্ষ করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে মানিক ছিলেন মধ্যবিত্ত মানসিকতার উত্তরাধিকারী। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'আতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' সংকলনের সব কয়টি গল্প এবং প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' মধ্যবিত্ত জীবনভিত্তিক কাহিনি নিয়ে গড়া। এছাড়া গ্রামীণ হতদরিদ্র মানুষের জীবন চিত্রও তাঁর বেশ কিছু লেখায় দেখতে পাওয়া যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে বস্তুবাদের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। মনুষ্যত্ব ও মানবতাবাদের জয়গানই তার সাহিত্যের মূল উপজীব্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আর্থ-

সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ভাঙ্গা গড়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবকে তিনি তাঁর সাহিত্যে চিত্রায়িত করেছেন। সমাজের শাসক ও পুঁজিপতিদের হাতে দরিদ্র সমাজের শোষণ বঞ্চনার স্বরূপ তুলে ধরেছেন সাহিত্যের নানা চরিত্রের আড়ালে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ করে উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর জীবনে অভিজ্ঞতার পরিধি ছিল ব্যাপক। বিজ্ঞানের ছাত্র, কমিউনিজমের অনুসারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভদ্র আভিজাত্যের সচেতন গৌরববোধ থাকলেও সমাজের নিম্নতম প্রত্যন্ত গণ্ডীর সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। তাই সাধারণ বাস্তব মানুষ তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুল নাচের ইতিকথা' প্রভৃতি উপন্যাসে উদ্ভট কল্পনাবিলাস ও সূক্ষ্ম বাস্তব পর্যালোচনা লক্ষগোচর হয়। 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে লেখক আশ্চর্য সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'অতসী মামী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'মিহি ও মোটা কাহিনি', 'আজ কাল পরশুর গল্প' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থের গল্পের মাধ্যমে যে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছেন তাতে তাঁকে প্রথম শ্রেণির গল্পলেখকের পর্যায়ভুক্ত মনে করা চলে। কল্লোল যুগের বাস্তবধর্মিতার আদর্শ তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক জীবনদৃষ্টির মাধ্যমে জীবনের ক্লেদ-গ্লানি-নিষ্ঠুরতার অন্তরালবর্তী সত্য রূপটিকে খুঁজেছেন। অকল্পনীয় দক্ষতায় জীবনের অমৃতস্বাদ আর বিষাক্ত লাভাস্রোতকে একই পাত্রে ঢেলে তিনি পান করেছেন। তাঁর গল্প সে নিদর্শনের বাহক।

তিনি ছিলেন আদর্শ বিজ্ঞানীর মত তথ্যনিষ্ঠ। তিনি তীব্র বিচ্ছুরিত বিশ্লেষণী দৃষ্টির ছুরিকাঘাতে জীবনের ক্লেদ-গ্লানি-নিষ্ঠুরতার অন্তরালবর্তী সত্যরূপটিকে টুকরো টুকরো করে খুঁজে দেখেছেন। কোন উচ্ছ্বাস কোন বিহ্বল পক্ষপাত তাঁর কঠিন অনুসন্ধিৎসাকে বিন্দুমাত্র কম্পিত বা পথভ্রস্ট করতে পারে নি। তিনি মনে করতেন, 'এ যুগে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অসম্ভব—তাতে শুধু পুরনো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে।'

আশাপূর্ণা দেবী

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-৯৫) বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙালি ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার ও শিশুসাহিত্যিক। বিংশ শতাব্দির বাঙালি জীবন বিশেষত সাধারণ মেয়েদের জীবন যাপন ও মনস্তত্ত্বের চিত্রই ছিল তাঁর রচনার মূল উপজীব্য। ব্যক্তিজীবনে নিতান্তই এক আটপৌরে মা গৃহবধূ আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে অনভিজ্ঞা। বাংলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ভাষা তাঁর জানা ছিল না। বঞ্চিত হয়েছিলেন প্রথাগত শিক্ষা লাভে। কিন্তু গভীর দৃষ্টি ভঙ্গি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি দান করে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকার আসন পেয়েছেন। তাঁর প্রথম প্রতিশ্রুতি-সুবর্ণলতা-বকুলকথা উপন্যাস ত্রয়ী বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত হয়। দেড় হাজার ছোটগল্প ও আড়াই শো-র বেশি উপন্যাসের রচয়িতা আশাপূর্ণা দেবী সম্মানিত হয়েছিলেন দেশের একাধিক সাহিত্য পুরস্কার, অসামরিক নাগরিক সম্মান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডক্টরেট ডিগ্রিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তাঁকে প্রদান করেন পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সম্মান রবীন্দ্র পুরস্কার। ভারত সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সাহিত্যসম্মান সাহিত্য আকাদেমি ফেলোশিপে ভূষিত করেন।

আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম উত্তর কলকাতার মাতুলালয়ে। রক্ষণশীলতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি। বাড়ির গ্রন্থাগারে তাঁর শিক্ষালাভ সম্ভব হয়। চলমান সমাজ জীবন তাঁর সাহিত্যে বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে। তাঁর সাহিত্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবন আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'আমি কখনো আমার জানা জগতের বাইরে কোথাও পা ফেলতে যাই না এবং আমার সেই জগৎ একেবারে চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবু তার মধ্যে দেখে চলেছি কী অফুরন্ত জীবন বৈচিত্র্য। কী বিচিত্র সব চরিত্র।'

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'মিত্তির বাড়ি', 'বলয় গ্রাস', 'অগ্নি পরীক্ষা', 'কল্যাণী', 'নির্জন পৃথিবী', 'শশীবাবুর সংসার', 'উন্মোচন', 'অতিক্রান্ত', 'নেপথ্য নায়িকা', 'জনম জনম কি সাথী', 'সমদ্র নীল আকাশ নীল', 'যোগ বিয়োগ', 'ছাড়পত্র', 'নবজন্ম', 'আংশিক' ইত্যাদি।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' আশাপূর্ণ দেবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এর পরবর্তী খণ্ডগুলো হল 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা'। উনিশ শতকে কলকাতায় মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও গ্রাম ছিল তিমিরে। সে গ্রামকে বদলাতে যারা এগিয়ে এসেছিলেন লেখিকা তাদের স্মরণ করেছেন এইসব গ্রন্থে। তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে বহির্জগতের আকর্ষণ কিছুটা বিসদৃশভাবে মিশেছে। কোথাও বা রোমাঞ্চের সুলভ কর্ম প্রক্ষেপ এই ধূসর সমস্যাক্ষুব্ধ জীবনে কিছুটা বৈচিত্র্য এনেছে। কিন্তু লেখিকার জীবন নিরীক্ষার সত্যসার এই গৃহজীবনের মধ্যেই নিহিত আছে। যৌথ পরিবার ও ভেঙে যাওয়া পরিবার জীবনের সমস্যার কথা লেখিকা তাঁর উপন্যাসে নিপুণ হাতে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাধারণ কথাকে তিনি অসাধারণ করে তুলেছেন। লেখিকা তাঁর উপন্যাসে নতুন কালের পটভূমিকায় একান্নবর্তী পরিবারকে উপস্থাপিত করেছেন। লেখিকা উপন্যাসে হাস্য ও করুণ রস সৃষ্টিতে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর ছোটগল্প সংকলন গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হল : 'শ্রেষ্ঠগল্প', 'গল্পসমগ্র', 'নায়িকা পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি। তাঁর গল্পে বাঙালির পরিচিত জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা হয়েছে। গল্পগুলোতে মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বপ্ন ও ইতিহাস দুটোই ধরা পড়েছে। জীবনের নিষ্ঠুরতম সত্যগুলো, বঞ্চনা, লাঞ্ছণা, বিড়ম্বনার কাহিনিগুলো তিনি তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ছিন্নমস্তা' তাঁর শ্রেষ্ঠগল্প। চিরপরিচিত মধ্যবিত্ত সমাজের শাশুড়ি ও বধূর দ্বন্দ্ব এই গল্পের পটভূমিতে এসেছে।

সুবোধ ঘোষ

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত খুলেছিলেন সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-৮০)। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন ছোটগল্প রচনায়। তাঁর ছিল ছোট গল্প লেখকের আবিষ্কারের চোখ। তিনি তাঁর গল্পের জন্য জীবনের এমন সব ভগ্নাংশ

নির্বাচন করেছেন যা সাধারণত সবার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এবং যা হল অপ্রত্যাশিত ও রসসমৃদ্ধ। তিনি জীবনের বিরল পথিক হিসেবে সীমান্ত প্রদেশ থেকে কত না মৃদু সৌরভপূর্ণ বনফুল সংগ্রহ করেছেন।

সুবোধ ঘোষের জন্ম বিহারের হাজারি বাগে। কিন্তু তাঁর পূর্ব পুরুষের বাসস্থান ছিল বাংলাদেশের বিক্রমপুরের বহর গ্রামে। তিনি হাজারি বাগেই বাল্য কৈশোর কাল কাটিয়েছেন। হাজারি বাগে অবস্থিত সেন্ট কলাম্বাস কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হন। কিন্তু পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, আদিবাসী জীবন, সামরিক বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অপরিসীম কৌতুহল ছিল। মহেশ ঘোষের লাইব্রেরিতে বেশির ভাগ সময় নানা বিষয়ে পাঠ করে কাটাতেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর দারিদ্র ছিল। স্নাতক শ্রেণির পাঠক্রম আর শেষ করতে পারেন নি। পনের বছর বয়সেই জীবিকার জন্য পথে নামতে হল। হাজারিবাগে কুলি বস্তিতে টীকা দেওয়ার কাজ নিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর বাসের কন্ডাক্টর, গৃহ শিক্ষকতা, বাসের ড্রাইভার, মুম্বাই সার্কাস দলের ক্লাউন।

পৌরসভার ঝাড়ুদার, মহামারী দমনে চাকরি নিয়ে চলে যান আফ্রিকায়, সেখান থেকে ফিরে এসে জড়িত হন স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং এর জন্য চারমাস জেল খাটেন। জেল থেকে বেরিয়ে মুম্বাইয়ের দোকানে দোকানে কেক পাউরুটি সরবরাহ করতে থাকেন। অনেক অভ্রখনির সুপার ভাইজার ছিলেন। পরে কলকাতায় এসে প্রেসের প্রুফ রিডার তারও পরে আনন্দ বাজার পত্রিকায় কাজ পান। পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখক হিসেবে উন্নীত হন।

সুবোধ ঘোষ উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্য রচনা, নাটক, আত্মজীবনী, লিখলেও ছোটগল্পকার হিসেবেই তিনি বেশি পরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প গ্রন্থগুলো হল :

'ফেনিল', 'পরশু রামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার', 'ফসিল', 'জতুগৃহ', 'কিংবদন্তির দেশে', 'ক্যাকটাস' ইত্যাদি।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী', 'শ্রেয়সী', 'শতকিয়া', 'একটি নমস্কারে', 'ত্রিযামা', 'সুজাতা', 'বহুত মিনতি', 'রূপসাগরে', 'সীমান্ত সরণি', 'বর্ণালী', 'মুক্তি প্রিয়া', 'নাগলতা', 'মীন পিয়াসী', 'শুন বর নারী', 'জল কমল', 'কান্তিধারা', 'ছায়াকৃত', 'জিথাভরলি', 'বন উপবন', 'বাসবদত্তা', 'বন্ধু গোলাপ', 'এসো পথিক', 'কালকেতু', 'দুই গর্ব', 'সেই অদ্ভূত অভ্রখনি', 'পুনর্ববা' ইত্যাদি।

মহাভারতের প্রেম কাহিনি নিয়ে লেখা 'ভারত প্রেমকথা' তাঁর অনবদ্য রচনা।

সুবোধ ঘোষের লেখা গল্পের সংখ্যা ১৪৭টি। তাঁর গল্প সংকলনের সংখ্যা পনের। তিনি মূলত চার শ্রেণির গল্প লিখেছেন। ১. চরিত্রাত্মক ২. মনস্তাত্তিক, ৩. সমাজ সমস্যামূলক ও ৪. বিচিত্র বিষয় কেন্দ্রিক গল্প।

'অযান্ত্রিক' তাঁর প্রথম গল্প। এ গল্প লিখেই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। আধুনিক যুগে যন্ত্র আর মানুষ কত গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত তা এ গল্প থেকে সহজে উপলব্ধি

করা যায়। 'ফসিল' গল্পটিও তাঁর জন্য বিশেষ খ্যাতি বয়ে আনে। এ গল্পে যুদ্ধের ছবি যেমন আছে, তেমনি আছে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব।

সুবোধ ঘোষ জাত ছোটগল্পকার। তিনি মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সংশয়াতুল মানসিকতার কঠোর কঠিন সমালোচনা করেছেন তাঁর ছোটগল্পে।

অবধূত

অবধূত (১৯১০-৭৮) প্রধানত বিষয়বস্তুর নতুনত্বের জন্য খ্যাতিমান। তাঁর 'মরুতীর্থ হিংলাজ' উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত জনপ্রিয় ভ্রমণ কাহিনি। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'দুর্গম পন্থা', 'ভূমিকালিপি পূর্ববৎ' ইত্যাদি তাঁর উপন্যাস। 'উৎকট তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভীষণতা, শ্মশান-সমাগত শোক-বিহ্বল নরনারীর আকস্মিক মানস প্রতিক্রিয়া, মৃত্যুসম্মুখীন মানবের উদাস বৈরাগ্য ও বেপরোয়া মনোবৃত্তি' তাঁর রচনায় চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নীহাররঞ্জন গুপ্ত (১৯১১-৮৬) একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন। বিশেষত গোয়েন্দা কাহিনি রচনায় তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন পেশায় একজন চিকিৎসক।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত বাংলাদেশের যশোর জেলার লোহাগড়া উপজেলার ইটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবকাল অতিবাহিত করেন কলকাতায়। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে আই এসসি পাশের পর কলকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি লন্ডন থেকে চর্মরোগে ডিগ্রি অর্জন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনিতে যোগ দেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূত্রে ভ্রমণ করেন। তিনি মেজর হিসেবে পদোন্নতি পান। এই সুবাদে তিনি চট্টগ্রাম, মায়ানমার থেকে মিশর পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে ঘুরে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। যুদ্ধের পর কলকাতা মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন এবং কর্মসূত্রে ভারতের বিভিন্ন স্থানে চাকরি জীবন অতিবাহিত করেন। ভারত বিভক্তির পর তিনি সপরিবারে কলকাতায় অভিবাসিত হন।

আঠার বছর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রাজকুমার' প্রকাশিত হয়। লন্ডনে অবস্থান কালীন তিনি গোয়েন্দা গল্প রচনায় আগ্রহান্বিত হন। ভারতে ফিরে এসে তিনি তাঁর প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস 'কালো ভ্রমর' রচনা করেন। এতে তিনি গোয়েন্দা চরিত্র হিসেবে কিরীটি রায়কে সংযোজন করেন যা বাংলা কিশোর সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি বাংলা সাহিত্যে রহস্য কাহিনি রচনার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক ছিলেন। তাঁর প্রায় পঁয়তাল্লিশটি উপন্যাসকে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় চলচ্চিত্রায়ণ করা হয়েছে। তিনি শিশুদের উপযোগী সাহিত্য পত্রিকা সবুজ সাহিত্যের সম্পাদকও ছিলেন।

তিনি মোট দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল : 'কালো ভ্রমর', 'মৃত্যুবাণ', 'কালনাগ', 'উল্কা', 'উত্তর ফাল্গুনী', 'হাসপাতাল', 'কলঙ্কিণী কঙ্কাবতী', 'লালুভুলু', 'রাতের রজনীগন্ধা', 'কিরীটি অমনিবাস', 'অপারেশন' ইত্যাদি। তিনি বড়দের ও ছোটদের উপযোগী উভয় ধরনের গোয়েন্দা উপন্যাস রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন।

বিমল মিত্র

বিমল মিত্র (১৯১২-৯১) সুবৃহৎ জনপ্রিয় উপন্যাস লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সমকালীন জীবনের আনন্দ-বেদনার চিত্র তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

বিমল মিত্রের জন্ম কলকাতায়। তিনি ছিলেন নদিয়া জেলার ফতেপুরের মানুষ। রেলে চাকরি করতে করতেই তাঁর সাহিত্যচর্চা। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চাই'। বিশ শতকের পাঁচের দশকে 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়ে উঠেন। এরপর রেলের চাকরি ছেড়ে পুরাপুরি সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস—'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'একক দশক শতক', 'চলো কলকাতা' ইত্যাদি। তিনি পাঁচ শ গল্প ও শতাধিক উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

কথা সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর গ্রন্থের তালিকা : 'চাই', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'একক দশক শতক', 'বেগম মেরী বিশ্বাস', 'চার চোখের খেলা', 'পতি পরম গুরু', 'আসামী হাজির', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'মিথুন লগ্ন', 'নফর সংকীর্তন', 'সখী সমাচার', 'সাহিত্য বিচিত্রা', 'তিন নম্বর সাথী', 'ও হেনরির শ্রেষ্ঠগল্প', 'ইয়ার্লিং', 'অন্যরূপ', 'মন কেমন করে', 'কন্যাপক্ষ', 'নিশি পালন', 'বরনারী', 'বেনারসী', 'চলো কলকাতা', 'ফুলফুটুক', 'লজ্জাহরণ', 'রাগ ভৈরব', 'কেউ নায়ক কেউ নায়িকা', 'আমি বিশ্বাস করি', 'নটনী', 'কা তব কান্তা', 'সরস্বতীয়া', 'কুমারী ব্রত', 'আমি', 'যে অঙ্ক মেলেনি', 'জনগণমন', 'স্বামী স্ত্রী সংবাদ', 'পয়সা পরমেশ্বর', 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন', 'কলকাতা থেকে বলছি', 'দু'চোখেই বালাই', 'গল্প সম্ভার', 'পুতুল দিদি', 'দিনের পর দিন', 'প্রথম পুরুষ', 'কথা চরিত মানস', 'টক ঝাল মিষ্টি', 'এক রাজার ছয় রানী', 'মৃত্যুহীন প্রাণ', 'মনে রইলো', 'শনি রাজার রাহু মন্ত্রী', 'তোমরা দুজনে মিলে', 'রং বদলায়', 'নিবেদন ইতি', 'নবাবি আমল', 'তিন নয় ছয়', 'গুলমোহর', 'হাতে রইলো তিন', 'রানী সাহেবা', 'যে যেমন', 'সুয়োরানী', 'পরস্ত্রী', 'পাঁচ কন্যার পাঁচালি', 'আর এক যুধিষ্ঠির', 'রাজা রানী হও', 'সব ঝুট হ্যায়', 'স্ত্রী', 'বিষয় বিষ নয়', 'বাহার', 'যশোর মাশুল', 'বিনিদ্র', 'চাঁদের দাম এক পয়সা', 'বলতে বলতে' ইত্যাদি।

বিমল মিত্র 'সাহেব বিবি গোলাম' লিখেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। এই উপন্যাসে ধরা পড়েছে পুরানো কলকাতার জীবন চিত্র। উপন্যাসের ভূতনাথ হলো বিমল মিত্র। এতে কলকাতার ব্রিটিশ আমলের ছবি যেমন আছে তেমনি

গ্রামীণ এলাকার কথা বলা হয়েছে। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসে লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালের দেশের চিত্রকে পরিপুষ্ট করেছেন। জীবনের প্রত্যেক স্তরের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে যে ভাঙ্গন ধীরে ধীরে ক্রিয়াশীল বিমল মিত্রে মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসে তার বিরাট, অসংখ্য জীবন প্রসারিত কেন্দ্র প্রেরণা প্রলয়ঙ্কার মহিমায়, মনুষ্যত্বের মূলোচ্ছেদী নিদারুণ তীব্রতায় উদ্‌ঘাটিত। এর বিপুল বিচিত্র সংঘাতময় কণ্ঠে টাকার সর্ব শক্তিমত্তা, আমোঘ প্রভাব 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর পুনঃপুন উদ্গীত ধূয়া ধ্বনিত হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-৮২) ছোটগল্প ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই সমান দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সমস্যা ও সংকট তাঁর ছোটগল্পে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। তেমনি তাঁর উপন্যাসে মানব জীবনের বিচিত্র প্রেম ভালবাসা স্থান পেয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কুমিল্লা শহরে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলাতেই লেখালেখি শুরু করেছিলেন। বি এ পড়ার সময় সন্ত্রাসবাদী দলে যোগদানের অভিযোগে চার মাস কারা ভোগ করেন এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞায় তাঁর লেখালেখির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে জ্যোৎস্না রায় ছদ্মনামে তখন লিখতেন। বি এ পাশ করে কলকাতায় চলে যান। বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করলেও কোথাও স্থির হতে পারেননি। সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শেষ দিকে যুগান্তর থেকে দৈনিক আজাদে চলে আসেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'সূর্যমুখী', 'মীরার দুপুর', 'বারো ঘর এক উঠোন', 'নীল রাত্রি', 'গ্রীষ্মবাসর', 'সমুদ্র অনেক দূর', 'আলোর ভুবন', 'স্বর্গোদ্যান', 'আকাশলীনা', 'মনের মতন', 'মনের আয়না', 'নাগকেসরের দিনগুলো', 'প্রেমের চেয়ে বড়ো', 'সমান্তরাল', 'অনুজ্ঞার স্বপ্ন', 'সুনন্দার প্রেম', 'অপারেশন', 'ঝড়', 'হরিণমন', 'সর্পিল', 'দ্বিতীয় প্রেম', 'লড়াই', 'দুই সমুদ্র', 'স্বর্গখোলশ', 'এই তার পুরস্কার', 'হৃদয় জ্বালা', 'অভিনয়', 'বিশ্বাসের বাইরে', 'তিন পরী ছয় প্রেমিক', 'রাবণ বধ', 'লাস্ট চ্যাপ্টার', 'ছোট পাখি নীল আকাশ', 'বনহরিণী', 'রাঙা শিমূল', 'প্রেমিক', 'সোনার ভোমরা', 'কলকাতার নট', 'যুবতীর মন নদী', 'স্বাতী ও দীপু', 'সাঁকোর ওপরে নীরা', 'আততায়ী', 'জীবনের স্বাদ', 'জ্যোৎস্নার খেলা', 'শেষ বিচার', 'সাদা ফুল কালো কীট', 'অবেলায় বসন্ত', 'রঙিন', 'নিঃসঙ্গ যৌবন', 'নীড়' ইত্যাদি।

তাঁর ছোটগল্প গ্রন্থগুলো হল : 'খেলনা', 'শালিক কি চড়ুই', 'চন্দ্র মল্লিকা', 'চার ইয়ার', 'বন্ধুপত্নী', 'ট্যাক্সিওয়ালা', 'বনানীর প্রেম', 'পর্বতীপুরের বিকেল', 'খাল পোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর', 'পতঙ্গ', 'মহিয়সী', 'স্বাপদ শয়তান ও রূপালী মাছেরা', 'আজ কোথায় যাবেন', 'ছিদ্র' ইত্যাদি।

উপন্যাসের বেলায় লেখক নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্যমুখী' কুমিল্লাকে পটভূমি করে লেখা। এই উপন্যাসে মধ্যবিত্তের

অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে। 'প্রেমের চেয়ে বড়ো' উপন্যাসে তেমনি মধ্যবিত্তের অবক্ষয়ের চিত্র আছে। 'এই তার পুরস্কার' লেখকের বিখ্যাত উপন্যাস। কবি রমানন্দকে নিয়ে উপন্যাসটি লেখা। রমানন্দ গরিব বলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু কবি হিসেবে যে মর্যাদার অধিকারী তা কোনো ভাবেই ম্লান হয়নি। লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'বারো ঘর এক উঠোন।' এই উপন্যাসে দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শহরবাসী বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

ছোটগল্পে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রথম গল্প 'নদী ও নারী' দীর্ঘ দিন ধরে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিশ শতকের চল্লিশ দশকে লেখা 'চোর' গল্পটিও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এক কিশোরের মন মানসিকতার কথা এখানে বলা হয়েছে। জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্র থেকে উপকরণ নিয়ে তাঁর গল্পের পশরা সাজিয়েছেন।

মৈত্রেয়ী দেবী

মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪-৯০), কবিতা ও বাস্তবধর্মী উপন্যাস লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের জন্যও তিনি বিশেষ খ্যাতিমান।

মৈত্রেয়ী দেবী ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কন্যা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট সান্নিধ্যে এসে কবির স্নেহধন্য হন তিনি। কবিতা দিয়েই তাঁর সাহিত্য সাধনার শুরু। তাঁর প্রথম কাব্য 'উদিতা' গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে লেখিকা গদ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর গদ্য রচনা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বিখ্যাত বই। তবে উপন্যাস রচনাতেই তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক। তাঁর সবচেয়ে খ্যাতিমান উপন্যাস 'ন হন্যতে' ১৯৭৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় বইটি অনূদিত হয়। 'ন হন্যতে' উপন্যাসে বাস্তবধর্মী এবং সমকালীন অনেক ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ এতে তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসের অমৃতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে মৈত্রেয়ী দেবীর জীবন খুঁজে পাওয়া যায়। বয়সান্তিক জীবনে যৌবনের স্মৃতিচারণ করেছেন লেখিকা। উপন্যাসটি মোট চার পর্বে বিভক্ত। লেখিকা জীবনে যাঁদের সাক্ষাতে এসেছিলেন তাঁদের প্রসঙ্গ নিয়েই এই উপন্যাস।

মৈত্রেয়ী দেবীর জন্ম পশ্চিমবঙ্গে। তিনি কলকাতার যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন।

কমলকুমার মজুমদার

কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-৭৯) পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যের সার্বভৌম কথা শিল্পী হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি বাংলায় দুরূহতম লেখকদের একজন। 'দীক্ষিত পাঠকের কাছে কমলকুমার অবশ্য পাঠ্য এবং প্রিয় পাঠ্য লেখা হিসেবেই সমাদৃত।' তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের দুর্বোধ্যতম লেখক-উপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

কমলকুমার মজুমদার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার টাকি নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলা সরকারের জনগণনা বিভাগে, গ্রামীণ শিল্প ও কারু শিল্পে, ললিত কলা একাডেমি ও সাউথ পয়েন্ট স্কুলের চাকরি। তাছাড়া তিনি ছবি, নাটক, কাঠের কাজ, ছোটদের অঙ্কন শেখানো, ব্যালেনৃত্যের পরিকল্পনা, চিত্রনাট্য রচনা ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্জ্জলী যাত্রা' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। তিনি নানা রকম বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। তবে ঔপন্যাসিক হিসেবেই তিনি সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলো হল : 'অন্তর্জ্জলী যাত্রা', 'গোলাপ সুন্দরী', 'অনিলা স্মরণে', 'শ্যামনৌকা', 'সুহাসিনীর পমেটম', 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক', 'খেলায় প্রতিভা'। 'অন্নপূর্ণা গল্প সংগ্রহ' ছোটদের জন্য তাঁর লেখা গল্পের সংকলন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-৭৫) বাঙালির মধ্যবিত্ত জীবনের পারিবারিক সমস্যা ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত করে তুলেছেন। বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবন তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সদরদী নামক গ্রামে। পরে তিনি কলকাতাবাসী হন। প্রথম জীবনে কবিতা লিখলেও ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর স্মরণীয় উপন্যাসগুলো হল : 'চেনা মহল', 'দ্বীপপুঞ্জ', 'দেহমন', 'দূরভাষিণী' ইত্যাদি মোট ৩৭টি। তাঁর ছোটগল্পগুলো হল : 'হলদে বাড়ি', 'কাঠ গোলাপ' ইত্যাদি মোট ৪৭টি।

'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসটি 'হরিবংশ' নামে দেশ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারে প্রকাশের সময় নাম বদলিয়ে 'দ্বীপপুঞ্জ' করা হয়। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। বাংলাদেশের গ্রাম্যজীবন এর উপজীব্য। 'চেনামহল' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। কলকাতা শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনি এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'দেহমন' উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন নাগরিক ও যান্ত্রিক জীবন কীভাবে নারীত্ব, সতীত্ব ও মাতৃত্বের মতন সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো ধ্বংস করে। 'দূরভাষিণী' উপন্যাসে টেলিফোনে কাজ করা মেয়েদের জীবন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র মোট ৪০০-র মত ছোটগল্প রচনা করে গেছেন। তাঁর ছোটগল্প গুলোকে অনেকে মোপাসাঁ, চেকভ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসের মত ছোটগল্পও মনস্তত্ত্ব প্রধান। প্রেমসৌহার্দ্য, স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভালবাসা পারিবারিক গণ্ডীর ভেতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা বারবার তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। গল্পের চরিত্রগুলো যেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। লেখকের মতে, 'লেখার প্রবণতা নিশ্চয়ই নিজের। তার উৎপত্তি বৃদ্ধি পরিণতি মৃত্যু সবই রহস্যজনক। অন্তত দুর্জ্ঞেয়, দুর্ভেদ্য সন্দেহ নেই।'

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭০) ছিলেন বিশ শতকের একজন খ্যাতিমান উপন্যাসিক। ছোটগল্প ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। ভাষার কাব্যিক প্রবহমানতা এবং আপাত সুস্থ শান্ত জীবনের তলে তলে অকস্মাৎ বিকার ও বীভৎসের অনুপ্রবেশ তাঁর ভাব ও রীতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম বাংলাদেশের দিনাজপুরের বালিয়াডাঙ্গি গ্রামে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি বরিশালের বাসুদেবপুর গ্রামে। তাঁর আসল নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর শিক্ষাজীবন কেটেছে দিনাজপুর, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ, বরিশালের বি এম কলেজ ও কলকাতায়। ১৯৪১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম এ পাশ করেন এবং ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৬০ সালে। এরপর তিনি জলপাইগুড়ি কলেজ, সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোট বেলা থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর প্রথম লেখা ছাপা হয় মাস পয়লা শিশু মাসিকে। সন্দেশ মুকুল পাঠশালা শুকতারা প্রভৃতি ছোটদের পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় সুনন্দার জার্নাল লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেন। এ সময় তিনি আনন্দবাজার, বিচিত্রা, শনিবারের চিঠি ও চতুরঙ্গে লেখালেখি করেন। তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল কাব্যচর্চা দিয়ে। পরে তিনি গল্প উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। বড়দের জন্য প্রথম প্রকাশিত 'উপনিবেশ' ছাপা হয় মাসিক ভারতবর্ষে এবং তা গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। তাঁর অমর খ্যাতি বড়দের জন্য রচিত গল্প উপন্যাসের জন্য। তবে শিশু কিশোর সাহিত্য রচনায় তাঁর খ্যাতি বড়দের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। তাঁর লেখা : 'পদ্ম পাতার দিন', 'পঞ্চাননের হাতি', 'লালমাটি', 'তারা ফোটার সময়', 'ক্যাম্বের আকাশ', 'বাংলা গল্প বিচিত্রা', 'ঘণ্টাদার কাবলু কাকা', 'খুশির হাওয়া', 'কম্বল নিরুদ্দেশ', 'চারমূর্তির অভিযান', 'ঝাউ বাংলার রহস্য' ও 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' বাংলা শিশু সাহিত্যে নতুন সংযোজন। বড়দের জন্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : 'একতলা', 'কালা বদর', 'কৃষ্ণপক্ষ', 'গন্ধরাজ', 'ট্রফি', 'তিমির তীর্থ', 'দুঃসাহস', 'পদ সঞ্চার', 'বনজ্যোৎস্না', 'বিদিশা', 'বীভৎস', 'বৈতালিক', 'ভাঙাবন্দর', 'চন্দ্রমুখর', 'মহানন্দা', 'রামমোহন', 'শিলালিপি', 'স্বেতকমল', 'সাগরিকা', 'স্বর্ণ সীতা', 'সূর্য সারথি', 'সঞ্চারিণী', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'সাপের মাথার মণি', 'আশি ধারা', 'ভাটিয়ালী', 'আগন্তুক', 'অমাবশ্যার গান', 'বিদূষক', 'সাহিত্যে ছোটগল্প', 'বাংলা সাহিত্য পরিচয়', 'ছোটগল্পের সীমারেখা' ও 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ'।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রন্থ সংখ্যা ৯৪টি। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হল : 'আর্থলক্ষভেদ', 'অমনিবাস', 'অমাবস্যার গান', 'অষ্টাদশী', 'অসিধরা', 'আগন্তুক', 'আলোয়ার রাত', 'আলোকপালী', 'ইস্টিশান আমলাপুর', 'উপনিবেশ (৩খণ্ড)', 'উর্বশী', 'একজিবিশন', 'একতলা', 'কম্বল নিরুদ্দেশ', 'কলধ্বনি', 'কাঁচের দরজা', 'কালাবদর', 'কিশোর অমনিবাস', 'কৃষ্ণচূড়া', 'কৃষ্ণপক্ষ', 'খুশির হাওয়া', 'গন্ধরাজ', 'গল্প বলি গল্প

শোন', 'গল্প সংগ্রহ', 'ঘণ্টাদার কাবলু কাকা', 'ঘূর্ণি', 'ঘূর্ণিপাকে লাল নিশান', 'চম্পাবতী', 'চাঁপার গান', 'চারমূর্তি', 'চারমূর্তি অভিযান', 'চিত্ররেখা', 'চোখের বাহিরে', 'ছায়াতরী', 'ছুটির আকাশ', 'ছুটির ভালো ভালো গল্প', 'ছোটগল্পের সীমা রেখা', 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প', 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প', 'জয়তী', 'জন্মান্তর', 'ঝাউ বাংলার রহস্য', 'ট্রফি', 'টেনিদা ও ভূতুরে কামরা', 'টেনিদা ও সিন্ধু ঘোটক', 'টেনিদা দি গ্রেট', 'টেনিদার অভিযান', 'টেনিদার কুট্টি মামা', 'টেনিদার গল্প', 'তপন চরিত', 'তারা ফোটাবার সময়', 'তিন প্রহর', 'তিমির তীর্থ', 'তৃতীয় নয়ন', 'দুঃশাসন', 'দূর-মেদুর', 'নতুন তোরণ', 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাসির গল্প', 'নির্জন শিখর', 'নীল দিগন্ত', 'পঞ্চসায়ক', 'পঞ্চাননের হাতি', 'পটলডাঙার টেনিদা', 'পদ্মপাতার দিন', 'পদসঞ্চার', 'পাতাল কন্যা', 'বনজ্যোৎস্না', 'বন-বাংলো', 'বারোভূতে', 'বাংলা গল্প বিচিত্রা', 'বাংলা ভাণ্ডার', 'বাংলা সাহিত্যের পরিচয়', 'বিদিশা', 'বিদূষক', 'বিভীষিকার মুখে', 'বীতংস', 'বৈতালিক', 'ভস্মপুতুল', 'ভাঙ্গা বন্দর', 'ভাটিয়ালী', 'ভাড়াটে চাই', 'ভোগবতী', 'মগ্নত্রা', 'চন্দ্রমুখর', 'মরণের মুখোমুখি', 'মহানন্দা', 'মাটির দেবতা', 'মেঘরাগ', 'মেঘের ওপর প্রাসাদ', 'রঞ্জনা', 'রাঘবের জয়যাত্রা', 'রাতের মুকুল', 'রামমোহন', 'রোমাঞ্চ', 'লক্ষ্মীর পা', 'লালমাটি', 'শিলালিপি', 'শুভক্ষণ', 'শ্বেতকমল', 'শ্রেষ্ঠগল্প', 'সঞ্চারিণী', 'স্বর্ণসীতা', 'সন্ধ্যার সুর', 'স্বনির্বাচিত গল্প', 'সপ্তকাণ্ড', 'সবার প্রিয় টেনিদা', 'সমগ্র কিশোর সাহিত্য', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'সরস গল্প', 'সাগরিকা', 'সাপের মাথার মণি', 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক', 'সাহিত্যে ছোটগল্প', 'সুনন্দার জার্নাল', 'সুনেত্রা', 'সুপ্রভাত', 'সূর্য সারথী', 'সেই সকালে', 'সেরা গল্প', 'স্রোতের টানে', 'স্রোতের সঙ্গে', 'হনোলুলুর মাকুদা', 'হাসির গল্প', 'হাসের আকাশ'।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলোকে মোট তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। আদি পর্বের সময়সীমা ১৯৪৩ থেকে ৪৮ সাল পর্যন্ত। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'উপনিবেশ', 'স্বর্ণসীতা', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'সূর্য সারথি' ইত্যাদি। মধ্য পর্বের সময়সীমা ১৯৪৯ থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত। এই পর্বের স্মরণীয় উপন্যাসগুলো হল : 'শিলালিপি', 'লাল মাটি', 'মহানন্দা', 'পদসঞ্চার', 'নিশি যাপন' ইত্যাদি। অন্তপর্বের সময়সীমা ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। এই পর্বের উপন্যাসগুলো হল : 'সন্ধ্যার সুর', 'নির্জন শিখর', 'কাঠের দরজা', 'আলোকপর্ণা' ইত্যাদি।

'লাল মাটি' তাঁর স্মরণীয় উপন্যাসগুলোর অন্যতম। এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। প্রজাদের ওপর জমিদারের অত্যাচার এবং প্রজাদের প্রতিবাদ উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। মার্কসীয় দর্শনের জীবন চেতনা এখানে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। আবার সাম্প্রদায়িকতার বিষও প্রত্যাক্ষ করা হয়েছে।

'উপনিবেশ'কে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচনা করা হয়। বরিশাল ও নোয়াখালির সমুদ্র মোহনার প্রকৃতি, পরিবেশ ও চরিত্র নিয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, গৌরব, ভূতত্ত্ব ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসে। 'মহানন্দা' উপন্যাসে মহানন্দার কাব্যময় বর্ণনা পাঠককে বিমুগ্ধ

করে। 'চন্দ্রমুখর', 'স্বর্ণসীতা' উপন্যাসে রচিত হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তের ভারতের অবস্থা। 'সন্ধ্যার সুর', 'কাচের দরজা', 'নির্জন শিখর' ও 'তৃতীয় নয়ন' উপন্যাসে ব্যক্তির আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস ও ব্যর্থতার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

ছোটগল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রেম প্রকৃতির সঙ্গে মনস্তত্ত্বের সমানভাবে ক্রিয়াশীল দেখিয়েছেন।

সাবিত্রী রায়

সাবিত্রী রায় (১৯১৮-৮৫) পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট মহিলা কথা সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর জন্ম ঢাকায়। তাঁর স্বামী ছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক শান্তিময় রায়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'সৃজন', 'স্বরলিপি', 'পাকা ধানের গান', 'মানশ্রী', 'ত্রিস্রোতা' ইত্যাদি।

'সৃজন' তাঁর প্রথম উপন্যাস। বাস্তবতার ভিত্তিতে তা রচিত। 'স্বরলিপি' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। এ উপন্যাসে উদ্বাস্তু সমস্যা ও তেভাগা আন্দোলন প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেয়েছে। দেশবিভাগ বাঙালির জীবনে যে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল তার করুণ পরিণতির চিত্র এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। তেভাগা আন্দোলনের কথাও বারবার এসেছে এ উপন্যাসে। কম্যুনিস্ট পার্টির চিত্র এখানে অঙ্কন করা হয়েছে। পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বের কথাও এখানে বলা হয়েছে। 'পাকা ধানের গান' উপন্যাসটি লেখিকার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তেভাগা আন্দোলন নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। সাবিত্রী রায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনে জড়িত হয়েছিলেন। আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থেকে তিনি গ্রামীণ কৃষক সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে তাদের নিয়ে উপন্যাস রচনার প্রেরণা পান। পার্থ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। আন্দোলনের কারণে সে জেলে যায়। এক সময় জেল থেকে বেরিয়ে আন্দোলন জোরদার করে। আসে বন্যা। ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অসহায় কৃষকেরা আন্দোলনে নামে। নেতৃত্ব দেয় পার্থ। আন্দোলনে বিজয়ী হয় কৃষকেরা। কিন্তু যার নেতৃত্বে এ সাফল্য সেই পার্থ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। চরিত্র চিত্রণ ও বর্ণনা ভঙ্গিতে লেখিকা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বর্ণনা ভঙ্গি সহজ সরল ও পাঠকের হৃদয়গ্রাহী।

অমিয়ভূষণ মজুমদার

অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১) পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলের কোচবিহার এলাকার লেখক হিসেবে খ্যাতিমান। বাংলা সাহিত্যের লেখকদের কাছে বিষয় ও রীতির দিক থেকে তিনি ছিলেন অন্যতম অনুকরণযোগ্য লেখক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন স্কটিস চার্চ কলেজ থেকে তিনি দর্শন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। উপন্যাস রচনার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি

উপন্যাসের জন্য বঙ্কিম পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি আকাদেমি পুরস্কারও লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : 'গড় শ্রীখণ্ড', 'মহিষপুরের উপাখ্যান', 'রাজনগর', 'মধু সাধু খাঁ' ইত্যাদি।

অমিয়ভূষণ মজুমদার যে সাহিত্য সাধনায় অনবদ্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন তার প্রমাণ তাঁর লব্ধ পুরস্কারগুলো।

সন্তোষকুমার ঘোষ

সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-৮৫) পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের কলকাতার মানুষের ছবি তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের ফরিদপুরের রাজবাড়িতে তাঁর জন্ম। রাজবাড়ি থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই এ ও বি এ পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম এ ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু লেখাপড়া শেষ করেননি। কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কনিষ্ঠ কেরানির চাকরি নিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে প্রত্যহ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রূপে নিয়োজিত হন। এরপর যুগান্তর, মর্নিং নিউজ, নেশন, স্টেটসম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ঘুরে আনন্দ বাজার পত্রিকায় যোগ দেন। আনন্দ বাজারে থাকতেই তাঁর কর্মজীবনের অবসান ঘটে। সাংবাদিকতায় নিয়োজিত থাকাকালীন তিনি গল্প ও উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : 'কিনু গোয়ালার গলি', 'নানা রঙের দিন', 'মোমের পুতুল', 'রেনু তোমার মন', 'মুখের রেখা', 'জল দাও', 'স্বয়ং নায়ক', 'সকাল থেকে সকালে', 'শেষ নমস্কার', 'শ্রীচরণেষু মাকে', 'সময় আমার সময়' ইত্যাদি।

'কিনু গোয়ালার গলি' তাঁর প্রথম উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুনশ্চ কাব্যের বাঁশি কবিতার একটি লাইন থেকে উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে। কলকাতার গলিতে বসবাসরত মানুষের কষ্টের জীবনচিত্র এ উপন্যাসে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। 'মোমের পুতুল' উপন্যাসে কলকাতার জীবনচিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে। 'নানা রঙের দিন' উপন্যাসে বিশ শতকের ত্রিশ দশকের পশ্চিমবঙ্গের জীবন চিত্রায়িত হয়ে উঠেছে। 'জল দাও' উপন্যাসটি এর ভাষা ভঙ্গির জন্য স্বতন্ত্র স্বাদের। নায়কের অপরাধবোধ ও স্বীকারোক্তি নিয়ে আত্মকথার ভঙ্গিতে উপন্যাসটি রচিত। 'স্বয়ং নায়ক' উপন্যাসে নায়কের আত্মবিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মাকে' উপন্যাসটি স্মৃতি নির্ভর উপন্যাস।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও সন্তোষকুমার ঘোষের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প গ্রন্থগুলো হল : 'ভগ্নাংশ', 'শুকসারী', 'আমার প্রিয় সঙ্গী', 'ফুলের নামে নাম',

'ছায়া হরিণ', 'ত্রিণয়ন', 'বহেন্দী গল্প' ইত্যাদি। গল্পগুলো নানা স্বাদের। কলকাতার মানুষের বাস্তব জীবনের ছবি এসব গল্পের অনেকগুলোতেই পাওয়া যায়। তাঁর ভাষা সহজ মাধুর্য মণ্ডিত। সে কারণে পাঠকের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন।

প্রভাতরঞ্জন সরকার

প্রভাতরঞ্জন সরকার (১৯২১-৯০) বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সাহিত্য, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় তাঁর লেখা লেখির মধ্যে স্থান পেয়েছে। এসব বিষয়ে তাঁর দু শ'রও বেশি রচনা রয়েছে। কলকাতা বিদ্যা সাগর কলেজে পড়ার সময় তিনি ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা, উর্দু ভাষায় গল্প প্রবন্ধ কবিতা ছড়া গান ইত্যাদি রচনা করতেন। তিনি বাংলা লিপি সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। রাঙা দাদু ছদ্মনামে মাত্র তেইশ বছর বয়সে একটি বাংলা পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লেখেন শিশু সাহিত্য 'নীল সায়রে স্বর্ণকমল' এবং 'নীল সায়রের অতল তলে'। তাঁর সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 'লিপি পরিচয়', 'নতুন বর্ণ পরিচয়', 'তাড়া বাঁধা ছড়া', 'নীল সায়রে স্বর্ণকমল', 'হট্টমালার দেশে', 'হট্টমালার আরও গল্প', 'নীল সায়রের অতল তলে', 'প্রভাতরঞ্জনের গল্প সঞ্চয়ন', 'প্রভাতরঞ্জনের নাট্য সঞ্চয়ন', 'বিচিত্র অভিজ্ঞতা', 'কবি কথা', 'আমাদের প্রতিবেশী ও পশু পাখি', 'দেশ প্রেমিকদের প্রতি', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'প্রয়োজনের পরিভাষা', 'পথ চলতে ইতিকথা', 'প্রভাতরঞ্জনের ব্যাকরণ বিজ্ঞান', 'লঘু নিরুক্ত', 'বাংলা ও বাঙালি', 'বর্ণবিজ্ঞান' ইত্যাদি।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রভাতরঞ্জন সরকারের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সামাজিক ও পারিবারিক গল্প, পৌরাণিক ও অতিপ্রাকৃত গল্প, শিশুদের উপযোগী গল্প ইত্যাদি জাতের গল্প রচনা করেছেন। গ্রাম্য ও পারিবারিক জীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখ নিয়ে সামাজিক, পারিবারিক গল্পগুলো রচিত হয়েছে। পৌরাণিক গল্পগুলোতে পুরাণের চরিত্র আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষের সামনে নতুন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অতি প্রাকৃত গল্পে ভয় ভালবাসা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

বিমল কর

বিমল কর (১৯২১-২০০৩) ছিলেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে কথা সাহিত্যিক রূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বিমল কর পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণার টাকীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জব্বলপুর, হাজারিবাগ, ধানবাদ, আসানসোল প্রভৃতি জায়গায় ছোট বেলা কাটিয়েছেন। তিনি কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। ১৯৪২ সালে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় এআরপিতে। পরে আসানসোল অ্যামিউনিশান প্রোডাকশান ডিপোয় কর্মরত ছিলেন। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পরাগ পত্রিকার সহ-সম্পাদক, পরে পশ্চিমবঙ্গ ও সত্যযুগ পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন। ১৯৫৪-৮২ পর্যন্ত দেশ পত্রিকার

সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এরপর শিলাদিত্য পত্রিকার সম্পাদক হন। তিনি বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালে তাঁর লেখা প্রথম ছোটগল্প 'অম্বিকানাথের মৃত্যু' প্রবর্তক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ সালে তাঁর রচিত প্রথম ছোটগল্প সংকলন 'বরফ সাহেবের মেয়ে' প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'নিম ফুলের গন্ধ', 'কুশীলব', 'অসময়', 'সান্নিধ্য', 'দংশন', 'খড়কুটো', 'মোহ', 'দ্বীপ', 'প্রচ্ছন্ন', 'এ আবরণ', 'স্বপ্নে নিরস্ত্র', 'অশেষ', 'বালিকা বধূ', 'দেওয়াল', 'মল্লিকা', 'যদুবংশ', 'পূর্ণ অপূর্ণ' ইত্যাদি। তিনি বহু ছোটগল্প ও ছোটদের জন্য উপন্যাস রচনা করেছেন। ছোটদের জন্য তাঁর রচিত একটি চরিত্র অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিসিয়ান কিঙ্কর কিশোর রায় বা কিকিরা। কিকিরার উপন্যাস পূজা বার্ষিকী আনন্দ মেলায় প্রকাশিত হত। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'দেওয়াল' অন্যতম। উপন্যাসের তিনটি খণ্ড। এ উপন্যাসের সঙ্গে লেখকের জীবন গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত। মহাযুদ্ধের কথা এতে বলা হয়েছে। বিশেষত মহাযুদ্ধের পরবর্তী সমাজে বাঙালি জীবনে যে অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তার চিত্রও বর্ণিত হয়েছে। তাঁর 'খড়কুটো' উপন্যাসটিও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অন্তর্গত। প্রেম এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। 'পূর্ণ-অপূর্ণ' তাঁর একটি স্মরণীয় উপন্যাস। মূলত তিনজন মানুষের শোক উদ্বেলিত জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস। 'যদু বংশ' উপন্যাসে সমকালের জীবন যন্ত্রণা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। সাংকেতিকময় গদ্যের প্রয়োগ করে ছোটগল্পকে তিনি অসাধারণ ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলেছেন।

রমাপদ চৌধুরী

রমাপদ চৌধুরী (১৯২২) ছোটগল্প ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক মানুষের জীবন যন্ত্রণা ও জটিল মানসিকতাকে তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে যথাযথভাবে রূপায়িত করে তুলেছেন।

রমাপদ চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের খড়্গপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে এম এ পাশ করেন। তিনি দীর্ঘদিন আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মূলত তিনি আনন্দ বাজার পত্রিকার রবিবারের রবিবাসরীয়কির সম্পাদক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর লেখা শুরু হয়। তাঁর অনেক গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। তিনি অনেক পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর প্রথম গল্প 'উদয়াস্ত' যুগান্তরে প্রকাশিত হয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : 'আকাশ প্রদীপ', 'অহংকার', 'অজীবন', 'অংশ', 'বাড়ি বদলে যায়', 'বাহিরি', 'বনপলাশির পদাবলি', 'বেঁচে থাকা', 'চড়াই', 'ছাঁদ', 'সুন্দরী', 'সুখ দুঃখ', 'লালবাঈ', 'এখনই', 'প্রথম প্রহর' ইত্যাদি।

'স্বর্ণমারীচ', 'দরবারী' এসব তাঁর ছোটগল্প। 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। এ দেশের রেল লাইন প্রবর্তনের সময় দেশের অবস্থা কেমন ছিল তার বর্ণনা

এতে দেওয়া হয়েছে। রেল প্রবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় সমাজের মানুষের যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার চিত্রও এখানে পাওয়া যায়। 'এখনই' লেখকের বিশিষ্ট উপন্যাস। লেখক উপন্যাস রচনার পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন সে আমলের তরুণ তরুণীদের কথা। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী দশ-বিশ বছরের কথা। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা কি ধরনের আচরণ করত। তারাই তখন দেশের চালক হয়ে উঠল। নানা কাজে কর্মে জীবন ছড়িয়ে পড়ে। লেখক বলেছেন, শহুরে জীবনযাত্রা, বিচ্ছিন্নতা একাকীত্ব এই প্রজন্মের মনে জন্ম দিয়েছে হতাশা। লেখক জানিয়েছেন, 'সুখের লোভে, হারানোর ভয়ে শুধু মানিয়ে চলা, মেনে নেওয়া। সেটাই বোধহয় এ যুগের ট্র্যাজেডি।'

গৌরকিশোর ঘোষ

গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩-২০০০) অল্প কয়েকটি উপন্যাস লিখলেও বিষয়বস্তুর গুণে সেসব বিশিষ্ট হয়ে আছে। সমকালীন জীবনের জটিলতাকে তিনি উপন্যাসের উপকরণে রূপ দিয়েছিলেন। তাই সেকালের ছবি তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'কমলা কেমন আছে', 'দেশ-মাটি-মানুষ', 'জল পড়ে পাতা নড়ে', 'প্রেম নেই' ইত্যাদি।

নকশাল আন্দোলন, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ইত্যাদি তাঁর উপন্যাসের বিষয় আশয়। 'কমলা কেমন আছে' উপন্যাসের পটভূমিকা নকশাল আন্দোলন। কমলার স্বামী নকশাল। স্বামী ও বন্ধুরা পলাতক। বিয়ের রাতেই পুলিশের ভয়ে কমলার স্বামী নিখোঁজ। এই প্রেক্ষিতে কমলা ও তার স্বামীর জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল তারই চমৎকার বর্ণনা লেখক দান করেছেন। 'দেশ-মাটি-মানুষ' উপন্যাসে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস—এসবই এসেছে কাহিনির মধ্যে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাস লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন লেখক। এতে সে আমলের উচ্চ সম্প্রদায়ের হিন্দুরা মুসলমানদের কেমন চোখে দেখত তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'প্রেম নেই' উপন্যাসে সাধারণ কৃষকদের সমস্যা ও হিন্দু মুসলমান সমস্যা গুরুত্ব লাভ করেছে।

সমরেশ বসু

সমরেশ বসু (১৯২৪-৮৮) পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার। কথা সাহিত্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব আলেখ্য তাঁর উপন্যাসে ও ছোটগল্পে চমৎকার ভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ছোটদের জন্যও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাহিত্যিক নাম কালকূট। এ নামেও তাঁর কিছু সাহিত্য সৃষ্টি রয়েছে।

সমরেশ বসুর জন্ম বাংলাদেশের বিক্রমপুরে। দেশ বিভাগের পর তিনি পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন এবং সেখানেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। সমাজের

নিচু স্তরের মানুষের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন এবং সে কারণে তিনি কিছুদিন জেলে কাটিয়েছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' জেলে বসেই লেখা। তিনি সব মিলিয়ে ২০০টি ছোটগল্প ও ১০০টি উপন্যাস রচনা করে গেছেন। কলকূট ও ভ্রমর ছদ্মনামে লেখা উপন্যাসগুলো এর অন্তর্গত।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : 'আম মাহাত্ম্য', 'অবশেষে', 'অচিনপুরের কথকতা', 'অপদার্থ', 'রাগিনী', 'বিবর', 'বিবেকবান', 'বিজন বিভূঁই', 'বিজড়িত', 'বিটি রোডের ধারে', 'ছায়া ঢাকা মন', 'দাহ', 'দেখি নাই ফিরে', 'দশ দিন পরে', 'দুই অরণ্য', 'গঙ্গা', 'গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর সমগ্র', 'হারিয়ে পাওয়া', 'হৃদয়ের মুখ', 'জবাব', 'যুগ যুগ জিয়ে', 'কামনা কাসনা', 'কে নেবে মোরে', 'খণ্ডিতা', 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'মরশুমের একদিন', 'মহামায়া', 'নয়ন পুরের মাটি', 'পদক্ষেপ', 'পঞ্চ বহ্নি', 'পথিক', 'পাঠক', 'প্রজাপতি', 'প্রকৃতি', 'প্রাণ প্রতিমা', 'পূর্ণযাত্রা', 'রক্তিম বসন্ত', 'রানীর বাজার', 'স্বর্ণচঞ্চু', 'টানাপোড়েন', 'তিন পুরুষ', 'উদ্ধার' ইত্যাদি।

সমরেশ বসুর উপন্যাস ও ছোটগল্পে সমকালীন জীবনের ছবি রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কলকাতা ও শহরতলীর মানুষের কথা নানা ভঙ্গিতে রূপদান করেছেন। ছোটদের জন্য তাঁর লেখাগুলোর বিশেষ আকর্ষণীয়তা রয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবী

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬) পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে ভারতের বিভিন্ন উপজাতি নিয়ে কাজ করেছেন। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর জন্ম ঢাকায়। দেশ বিভাগের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। তাঁর পিতা মনীষ ঘটক ছিলেন কল্লোল যুগের প্রখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে বি এ পাশের পর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাশ করেন। তিনি বিজয়গড় কলেজে শিক্ষকতায় যোগ দেন। এ সময় থেকে তিনি সাংবাদিকতা ও লেখালেখির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্য প্রদেশ, ও ছত্তিশগড় রাজ্যগুলোর গ্রামীণ উপজাতি সম্প্রদায় নিয়ে গবেষণা করেন এবং তাদের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে উপজাতি সম্প্রদায়ের ওপর ক্ষমতাশালী জমিদার, মহাজন ও সরকারি কর্মকর্তাদের অবিচার অত্যাচারের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর উপন্যাস : 'ঝাঁসির রানী', 'হাজার চুরাশির মা', 'অরণ্যের অধিকার', 'অগ্নিগর্ভ', 'চট্টি মুণ্ডা ও তার তীর', 'তিতুমীর', 'রোদালি', 'এক কড়ির স্বপ্ন', 'দ্রৌপদী', 'কুলপুত্র', 'ডাকাতে কাহিনি' ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর কিছু ছোটগল্প ও প্রবন্ধ গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর গল্প ও উপন্যাস অবলম্বনে কয়েকটি চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়েছে। তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ ইংরেজিতে

অনূদিত হয়েছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি অনেকগুলো পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর বৈচিত্র্যধর্মী অবদানের জন্য বিশিষ্ট আসনের দাবিদার। তিনি নিছক সাহিত্য সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করেননি, পশ্চিমবঙ্গ ও আশেপাশের রাজ্যগুলোর অবহেলিত উপজাতীয় সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রামের চিত্র অঙ্কনে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব ভারতীতে পড়াশোনা করলেও এবং ইংরেজি সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি থাকলেও নিগৃহীত উপজাতি সম্প্রদায়ের অবহেলিত মানুষগুলোর জন্য সহানুভূতির কোনো অভাব ছিল না তাঁর। তার ফলেই তিনি বাস্তবে দেখা আশে পাশের উপজাতীয় লোকদের সংগ্রামী জীবনের চিত্র অঙ্কনে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর মধ্যে সমাজকর্মী ও সাহিত্যিকের প্রতিভা একত্রিত হয়েছে। ইংরেজিতে অনেক গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ অনূদিত হওয়ায় তাঁর লেখনির গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে। ভাষা ব্যবহারে তিনি সরলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্প উপন্যাসের কাহিনি পাঠকের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

অসীম রায়

অসীম রায় (১৯২৭-৮৬) একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। তিনি তাঁর উপন্যাস প্রকাশ ভঙ্গির অসাধারণত্বের জন্য খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'ফুটপাথে ফুলের গল্প', 'একালের কথা', 'গোপাল দেব', 'দ্বিতীয় জন্ম', 'আবহমান কাল', 'দেশদ্রোহী', 'শব্দের খাঁচায়', 'অর্জুন সেনের জিজ্ঞাসা' ইত্যাদি।

'আবহমান কাল' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। একে মহাকাব্যিক ও আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলে অভিহিত করা যায়। উপন্যাসের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে প্রথম পুরুষে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র টুটুল। তিন প্রজন্মের কাহিনি নিয়ে এটি রচিত। বিচিত্র সব চরিত্র-কাহিনি-উপকাহিনির মধ্যে সংযোগসূত্র খুব সূক্ষ্ম কিন্তু স্পষ্ট। তাই এর স্থাপত্যগত নির্মাণ রুচি—সামগ্রিকতা ও অখণ্ডতার পরিচয় বাহী। সুর ও অনুভূতির বিচারে অনুপম। এসব কারণেই উপন্যাসটি একটি মর্যাদাপূর্ণ শিল্প কর্ম। সমকালের সমাজের চিত্র এই উপন্যাসে যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সমকালের মতাদর্শ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সমাজের আত্মদর্শন এই উপন্যাসে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। 'শব্দের খাঁচায়' উপন্যাসের পাঁচটি পর্ব। বিভিন্ন পর্বে সমাজের বিচিত্র মানুষের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২) সাংবাদিক হিসেবে জীবনের পেশা অবলম্বন করলেও সাহিত্য সাধনাকেই ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষত কথা সাহিত্যিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। 'অলীক মানুষ' নামক উপন্যাসটি লিখে

তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ভারতের উল্লেখযোগ্য সব ভাষাতেই তাঁর উপন্যাস অনূদিত হয়েছিল। তিনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর নামক গ্রামে। প্রথম জীবন বাড়ি থেকে পলাতক কিশোর হিসেবে অতিবাহিত করেন। রাঢ় বাংলার লোকনাট্য আলকাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওস্তাদ হিসেবে দল নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পরে তিনি বাউণ্ডেলে জীবন ত্যাগ করে লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করেন এবং বহরমপুর কলেজে লেখাপড়া করেন। ষাটের দশকে তিনি পাকাপাকিভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘদিন তিনি আনন্দ বাজার পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে চাকরি করেছিলেন। সেই সঙ্গে লেখালেখি চালিয়ে যান। তাঁর জ্ঞান ও অধীত বিদ্যাসমূহ তাঁকে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিদ্বানসমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নতৃত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব সব বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা তাঁকে পণ্ডিত মহলে পরিচিত করে তুলেছিল।

নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে সাহিত্যসাধনা করেছিলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তাঁর লেখক সত্তায় জড়িয়ে ছিল রাঢ়ের রুক্ষ মাটি। মুর্শিদাবাদের পাশের জেলা বীরভূম, সেখানে লাভপুর গ্রামে তারাশঙ্করের জন্ম। একই আবহাওয়া তাঁদের দুজনকেই প্রাণোন্মাদনা দিয়েছিল। তাই তারাশঙ্কর বলতেন, 'আমার পরেই সিরাজ, সিরাজই আমার পরে অধিষ্ঠান করবে।' তাঁর কিছু ছোটগল্প ও উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

ছোটগল্প ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পের উপকরণ-বিষয়বস্তু ও চরিত্র বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে। তাঁর 'ইন্তি পিসি ও ঘাট বাবু', 'ভালবাসা ও ডাউনট্রেন', 'তরঙ্গিনীর চোখ', 'জলসাপ ভালোবাসা', 'হিজলবিলের রাখালেরা', 'নৃশংস,' 'রণভূমি', 'মাটি', 'উড়োপাখির ছায়া', 'মানুষের জন্ম,' 'রক্তের প্রত্যাশা', 'মৃত্যুর ঘোড়া', 'গোঘ্ন', 'রাণী ঘাটের বৃত্তান্ত', 'অন্ধকারে রাত বিরেতে' ইত্যাদি অসংখ্য ছোটগল্পের জন্য তিনি বিশ্ব সাহিত্যে মর্যাদার স্থান পাওয়ার যোগ্য।

তাঁর উপন্যাসগুলো হল : 'নীলঘরের নটী', 'পিঞ্জর সোহাগিনী', 'কিংবদন্তীর নায়ক', 'হিজল কন্যা', 'আশমান তারা', 'উত্তর জাহ্নবী', 'তৃণভূমি', 'প্রেমের প্রথম পাঠ', 'বন্যা', 'নিশিমৃগয়া', 'কামনার সুখ দুঃখ', 'নিশিলতা', 'এক বোন পারুল', 'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি', 'নৃশংস', 'রোড সাহেব', 'জানগুরু', 'অলীক মানুষ' ইত্যাদি।

কিশোর পাঠকদের জন্য তিনি গোয়েন্দা সিরিজ রচনা করেছিলেন। গোয়েন্দা কর্নেল নামে একজন রহস্যময় চরিত্র—তাঁর মাথাজোড়া টাক, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা প্রজাপতি ও পাখি দেখতে ভালবাসেন। অথচ তিনি অনেক অপরাধ ও হত্যার কিনার করে শখের গোয়েন্দাগিরি করেন। গোয়েন্দা কর্নেল পাঠকের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। 'গোয়েন্দা কর্নেল সমগ্র' কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নীলঘরের নটী'। তিনি কৈশোরে কিছুটা সময় নবগ্রামে কাটিয়েছিলেন। সেই নবগ্রাম গোপালপুরের প্রেক্ষাপটে তিনি লিখেছিলেন 'প্রেমের প্রথম পাঠ' উপন্যাসটি। এটি তাঁর লেখক জীবনের প্রথম দিকের অপূর্ব উপন্যাস। তাঁর 'তৃণভূমি' উপন্যাসে কান্দী মহকুমার এক বৃহৎ অঞ্চল ধরা আছে। 'উত্তর জাহ্নবী' উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে এক বিশেষ সময় ও সমাজের কথা—যা বাংলা সাহিত্যে অনন্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ ও পুরস্কৃত উপন্যাস 'অলীক মানুষ'। অলীক মানুষ এক বিস্তৃত ভুবনের কাহিনি যা এক মুসলিম পিরের বংশে জাত পুরুষের আত্মানুসন্ধান। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ ভাগে এক পরিবর্তনীয় সময়ের নিখুঁত স্থির ছবি। এই 'অলীক মানুষ' উপন্যাসটি তাঁকে ভিন্ন লেখকের মর্যাদার চূড়ান্ত শিখরে উন্নীত করেছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান ছিল প্রবল। তাঁর পাঠকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মধুর। 'অসামান্য প্রতিভাশালী এই লেখকের মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার বহুধা বিস্তার মনে রেখেই করতে হবে।.. বাংলার এমন এক ধর্মীয়-নিগড়ে বাঁধা লোকন্তর পরিব্যাপ্ত গূঢ় জীবনকে তিনি উপস্থাপিত করেন যা নাগরিক নরনারীর মধ্যবিত্ততার বাইরে বহমান।'

মতি নন্দী

ক্রীড়া সাহিত্যিক হিসেবে মতি নন্দীর (১৯৩১-২০১০) স্বতন্ত্র অবদান রয়েছে। তাঁর খেলাধূলা নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলো পাঠকের আগ্রহ ও সমাদর লাভ করেছিল। ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে তিনি সাহিত্যকে যুক্ত করেছিলেন।

মতি নন্দীর জন্ম কলকাতায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন আনন্দ বাজার পত্রিকার ক্রীড়া সাংবাদিক। তিনি অনেকগুলো খেলা বিষয়ক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। 'সাদা খাম' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৯১ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

মতি নন্দীর উপন্যাসগুলো হল : 'সাদা খাম', 'উভয়ত সম্পূর্ণ', 'গোলাপ বাগান', 'ছায়া', 'ছায়া সরণীতে রোহিনী', 'জীবন্ত', 'দুটি তিনটি ঘর', 'দ্বিতীয়', 'ইনিংসের পর', 'দূরদৃষ্টি', 'পুবের জানালা', 'বনানীদের বাড়ি', 'বিজলীবালার মুক্তি', 'মালবিকা', 'সিবি', 'সহদেবের তাজমহল', 'সবাই যাচে', 'দশটি উপন্যাস', 'নক্ষত্রের রাত', 'দ্বাদশ ভক্তি', 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান', 'বারান্দা', 'করুণাবশত', 'ছোটবাবু' ইত্যাদি।

ছোটদের জন্য লেখা বইগুলো হল : 'কবি', 'অলৌকিক দিলু', 'স্টপার', 'স্ট্রাইকার', 'করুণ', 'জীবন অনন্ত', 'নারান', 'ফেরারি', 'তুলসী', 'দলবদলের আগে', 'মিনু চিনুর ট্রফি', 'আম্পায়ারিং', 'ধানকুড়ির কিংকং', 'বিশ্বজোড়া বিশ্বকাপ', 'বুড়ো ঘোড়া', 'ভুলি', 'শিব' ইত্যাদি।

মতি নন্দী কলাবতী চরিত্র নিয়ে কতগুলো উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কলাবতী সিরিজের বইগুলো হল : 'কলাবতী', 'কলাবতীদের ডায়েট চার্ট', 'কলাবতীর দেখা

শুনা', 'কলাবতী ও খয়েরি', 'ভূতের বাসায় কলাবতী', 'কলাবতী অপুর মা ও পাঁচু', 'কলাবতী ও মিলেনিয়াম ম্যাচ', 'কলাবতীর শক্তিশেল' ইত্যাদি।

মতি নন্দীর স্বাতন্ত্র্য তাঁর ক্রীড়া বিষয়ক উপন্যাসগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষভাবে কিশোরদের উপযোগী লেখাগুলো সমাদৃত হয়েছিল। তবে কুশলী কলাম তাঁর রচনায় কেবল কিশোরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি তা হয়ে গেছে যারা খেলা বোঝে, খেলা ভালবাসে এমন সব মানুষের। তাঁর কাহিনিতে খেলোয়াড়দের প্রতিপক্ষ কেবল বিরোধী দলই নয়, প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে আছে তার পরিবার, পাড়াপ্রতিবেশী অর্থের লোভ আর খেলাধুলার নোংরা রাজনীতির মাঝে। বিষয় বৈচিত্রের জন্যই বাংলা সাহিত্যে মতি নন্দীর গুরুত্ব।

শংকর

শংকরের (১৯৩৩) প্রকৃত নাম মণিশংকর মুখোপাধ্যায়। শংকর তাঁর সাহিত্যিক নাম। তিনি তাঁর উপন্যাসে সমকালীন সমাজ ও মানুষের বাস্তব চিত্র রূপায়িত করে তুলেছেন। কলকাতার মধ্যবিত্ত মানুষের ছবি তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাসিক।

শংকরের জন্ম যশোরের বনগ্রামে। আইনজীবী পিতা হরিপদ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেই সপরিবারে কলকাতায় চলে যান। হাওড়ায় শংকরের বসবাস বেড়ে ওঠা, লেখাপড়া ও সাহিত্য সাধনা। জীবনের শুরুতে কখনও ফেরিওয়ালা, টাইপ রাইটার ক্লিনার, কখনও প্রাইভেট টিউশনি, কখনও শিক্ষকতা অথবা জুট ব্রোকারের কনিষ্ঠ কেরানিগিরি করেছেন। তরুণ বয়সে পিতার মৃত্যু হলে তাঁর লেখা পড়ার পাট চুকে যায়। ফলে তাঁকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। শংকর একজন ইংরেজের প্রেরণায় লেখালেখি শুরু করেন।

তাঁর গ্রন্থগুলোর নাম : 'রসবতী', 'বঙ্গ বসুন্ধরা', 'চরণ ছুয়ে যাই', 'শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ', 'রূপতাপস', 'মরুভূমি', 'আশা-আকাঙ্ক্ষা', 'তীরন্দাজ', 'পটভূমি', 'কামনা-বাসনা', 'অনেক দূর', 'সুখ সাগর', 'স্থানীয় সংবাদ', 'চৌরঙ্গী', 'একদিন হঠাৎ', 'মুক্তির স্বাদ', 'কাজ', 'এ বি সি ডি', 'যেখানে যেমন', 'বাংলার মেয়ে', 'ঘরের মধ্যে ঘর', 'সোনার সংসার', 'মাথার উপর ছাদ', 'মানব সাগর তীরে', 'সুবর্ণ সুযোগ', 'সীমাবদ্ধ', 'স্থানীয় সংবাদ', 'এপার বাংলা ওপর বাংলা', 'নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি', 'বোধোদয়', 'এক দুই তিন', 'সার্থক জনম', 'মানচিত্র', 'যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ', 'পাত্র পাত্রী', 'পদ্ম পাতার জল', 'যা বলো তাই বলো', 'কত অজানারে', 'বিত্তবাসনা', 'সম্রাট ও সুন্দরী', 'মানসম্মান', 'হানিমুন', 'নগর নন্দিনী', 'জন অরণ্য', 'এক যে ছিল দেশ', 'লক্ষ্মীর সন্ধানে', 'সপ্তসাগর পারে', 'অবসরিকা', 'স্বর্গ মর্ত্য পাতাল', 'তনয়া', 'চিরকালের উপকথা', 'সহসা' ইত্যাদি।

'চৌরঙ্গী', 'জন অরণ্য', 'কত অজানারে' প্রভৃতি উপন্যাস ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। তাঁর অনেক উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে 'চৌরঙ্গী', 'জন অরণ্য', 'সীমাবদ্ধ' উল্লেখযোগ্য। শেষের দুটির পরিচালক ছিলেন সত্যজিৎ রায়।

'কত অজানারে' তাঁর প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসে কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ব্রিটিশ ব্যারিস্টারের জীবন অভিজ্ঞতা প্রাধান্য লাভ করেছে। 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসে কলকাতার অভিজাত পাড়ার হোটেল জীবন গুরুত্ব লাভ করেছে। 'জন অরণ্য' ও 'সীমাবদ্ধ' উপন্যাসে আধুনিক সমাজ জীবনের নীতিহীনতা ও অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে। সত্তর দশকের অশান্ত কলকাতা নিয়ে লিখেছেন 'স্থানীয় সংবাদ'। তাঁর ছোট গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-৭৯) ছিলেন জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক। ছোটগল্প ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এক সময় তিনি পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর ছোটগল্প সংকলন গ্রন্থের নাম 'কাছের যারা।' তাঁর উপন্যাসগুলো হল : 'আগামী', 'তৃতীয় ভুবন', 'শোক মিছিল', 'বিবাহ বার্ষিকী' ইত্যাদি।

'আগামী' তাঁর প্রথম উপন্যাস মাত্র আঠার বছর বয়সে লেখা। ছাত্র জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লেখা উপন্যাস 'তৃতীয় ভুবন।' 'শোক মিছিল' ও 'বিবাহ বার্ষিকী' আসলে দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি উপন্যাস এক মলাটে আবদ্ধ। উপন্যাস দুটি মানব জীবনের বিকার নিয়ে লেখা।

সাম্যবাদী বিনয় ভূষণ ও পারুলের চোখের সামনে পার্টি দু টুকরা হয়ে যায়। শহীদ হতে হয় অনেককে। বিনয় ভূষণের সঙ্গে পুত্র অজয়ের রাজনৈতিক বিতর্ক চলতে থাকে। অজয় তার মায়ের পার্টি বিরোধিতার কথা বলে অভিযোগ জানায় তার বাবার কাছে। মা-ও হার মানতে প্রস্তুত নয়। 'শোক মিছিল' উপন্যাসে এ কাহিনিই বিবৃত হয়েছে। 'বিবাহ বার্ষিকী' উপন্যাসে মণিমোহনের হৃদয়ের বেদনার কথা বলা হয়েছে।

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০১) একজন খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক ছিলেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

তাঁর জন্ম বাংলাদেশের খুলনায়। পরে কলকাতায় বসবাস করেন। অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরে যুগান্তর পত্রিকার সহকারী সম্পাদকও হয়েছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'বৃহন্নলা', 'কুবেরের বিষয় আশয়', 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'শাহজাদা দারাশুকো', 'অনিলের পুতুল', 'সরমা ও নীলকান্ত', 'দ্বাদশ ব্যক্তি', 'নির্বান্ধব' ইত্যাদি।

'বৃহন্নলা' উপন্যাসটির নাম বদলে পরবর্তী পর্যায়ে 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' করা হয়। নায়কের সংকট এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে। 'অনিলের পুতুল' উপন্যাসে

সাংসারিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসে গ্রাম জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গ্রামের মানুষ, প্রকৃতি ও কীট পতঙ্গের সঙ্গে অনাথবাবু ও তার পরিবারের বসবাসের কথা বলা হয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) কবি ও উপন্যাসিক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেছিলেন। তবে কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতির চেয়ে ঔপন্যাসিক হিসেবে বেশি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সমকালীন জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। তিনি কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, দমদম মতিঝিল কলেজ ও সিটি কলেজে লেখাপড়া করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ সালে বাংলায় এম এ পাশ করেন। ১৯৫৩ সালে 'কৃত্তিবাস' নামে একটি কবিতা পত্রিকা প্রকাশ করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তিনি এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কৃত্তিবাস পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন তরুণ কবিদের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি আনন্দ বাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর লেখক হিসেবে দীর্ঘদিন সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। তিনি ১৯৮৫ সালে 'সেই সময়' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি দুবার আনন্দ পুরস্কার লাভ করেছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজের নাম ছাড়াও নীল লোহিত, সনাতন পাঠক এবং নীল উপাধ্যায় ছদ্মনামেও লেখালেখি করেছেন। তিনি কবিতা লেখার পাশাপাশি গল্প উপন্যাস ভ্রমণ কাহিনি ও ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনা করে গেছেন। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা দুশোর বেশি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি ২০১২ সালে কলকাতায় মারা যান। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রি লাভ করেছিলেন।

কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু। তাঁর প্রথম কবিতা 'একটি চিঠি' প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৫১ সালে। তাঁর রচিত ছোটগল্প 'বাঁচা' প্রথম প্রকাশিত হয় রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত 'ইন্দানীং' পত্রিকায়। চতুর্থ কবিতা 'তুমি' কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পাঠকের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' গ্রন্থে সংকলিত হলে তা বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থগুলো হল : 'একা এবং কয়েকজন', 'হঠাৎ নীরার জন্য', 'ভোর বেলার উপহার', 'সাদা পৃষ্ঠা', 'তোমার সঙ্গে', 'সেই মুহূর্তে নীরা', 'কায়দাটা শিখে নেবে' ইত্যাদি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলো হল : 'আত্মপ্রকাশ', 'ছায়া দর্শন', 'অন্য জীবনের স্বাদ', 'স্বপ্ন সম্ভব', 'সুনীলের সাতদিন', 'বাণী ও অবিনাশ', 'কোথায় আলো',

'জল জঙ্গলের কাব্য', 'একটি রাত তিনটি জীবন', 'যমজ কাহিনি', 'মধু কাহিনি', 'গণেশ দিয়ে শুরু', 'উন্মোচনের মুহূর্তে', 'আঁধার রাতের অতিথি', 'আকাশ পাতাল', 'আশ্রয়', 'আলপনা আর শিখা', 'অচেনা মানুষ', 'আমার স্বপ্ন', 'নদীর ওপার', 'সত্যের আড়াল', 'সেই সময়', 'প্রথম আলো', 'পূর্ব-পশ্চিম', 'নিঃসঙ্গ সম্রাট', 'মনের মানুষ', 'সরস্বতীর পায়ের কাছে', 'ও রাধা ও কৃষ্ণ' ইত্যাদি।

কাকাবাবু সিরিজ : 'সবুজ দ্বীপের রাজা', 'কাকাবাবু ও সিন্দুক রহস্য', 'কাকাবাবু ও বজ্রগামা', 'সন্তু কোথায় কাকাবাবু কোথায়', 'বিজয় নগরের হীরে', 'জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল', 'ভয়ঙ্কর সুন্দর', 'সন্তু ও এক টুকরো চাঁদ', 'কাকাবাবু হেরে গেলেন', 'কলকাতার জঙ্গলে', 'ভূপাল রহস্য', 'পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক', 'খালি জাহাজের রহস্য', 'আগুন পাখির রহস্য', 'কাকাবাবু বনাম চোরা শিকারি', 'সাধু বাবার হাত (ছোট গল্প)', 'উল্কা রহস্য', 'কাকাবাবু ও ছদ্মবেশী', 'এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ', 'মিশর রহস্য', 'কাকাবাবু ও আশ্চর্য দ্বীপ', 'অগ্নিগিরির পেটের মধ্যে', 'কাকাবাবু ও জলদস্যু', 'গোলকধাঁধায় কাকাবাবু', 'কাকাবাবু সমগ্র' ইত্যাদি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ করলেও কবিতাই ছিল তাঁর প্রথম আকর্ষণ। তিনি কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' সংকলন গ্রন্থে তাঁর কবিতা স্থান পাওয়ায় তিনি পাঠক সমাজে সমাদৃত হন। কবিতা পত্র কৃত্তিবাসের সম্পাদক হিসেবে তিনি অনেক তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কবিতার ক্ষেত্রে নানান রীতির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর নিখিলেশ ও নীরা সিরিজের কবিতাগুলো বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

উপন্যাসেও একটি স্বতন্ত্র গদ্যরীতি সৃষ্টির মাধ্যমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' প্রকাশের মাধ্যমে পাঠক সমাজে প্রবল সাড়া জাগিয়েছিল। এ উপন্যাসে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষুব্ধ মনোভাব ও অনৈতিক বিষয়ের জন্য প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সেই সময়' অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য পুরস্কৃত হয়েছিল। এই উপন্যাসের মত তাঁর 'প্রথম আলো' ঐতিহাসিক উপন্যাসটিও পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর অপর উপন্যাস 'পূর্ব-পশ্চিম' দেশ বিভাগের ওপর ভিত্তি করে লেখা। দেশ বিভাগের ফলে বাঙালির জীবনে যে প্রভাব পড়েছিল তার বাস্তব চিত্র এ উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে 'কাকাবাবু' নামে একটি অনন্য চরিত্র অঙ্কন করেছেন। এই চরিত্রটি অবলম্বন করে অনেকগুলো উপন্যাস রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে কাকাবাবু চরিত্রটি একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। শিশু কিশোরদের কাছে কাকাবাবু সিরিজের উপন্যাসগুলো বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। এই সিরিজের কোনো কোনো উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

তাঁর কিছু উপন্যাস ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সমকালীন সমাজ ও জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কনে তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁর কবিতা ও গদ্যে একটি নিজস্ব রীতি রূপায়িত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য ও ভাষারীতির জন্য তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে বিবেচনার যোগ্য।

প্রফুল্ল রায়

প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪) পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কথা সাহিত্যিক। ছোটগল্প ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর দক্ষতা রয়েছে।

প্রফুল্ল রায়ের জন্ম বাংলাদেশের ঢাকায়। আঠার বছর বয়সে তিনি ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। যুগান্তর পত্রিকায় সাংবাদিকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। পরে এই পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক পদে উন্নীত হন। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মাঝি' তাঁর প্রথম গল্প। একুশ বছর বয়সে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রথম উপন্যাস 'পূর্ব পার্বতী' প্রকাশিত হয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'পূর্ব পার্বতী', 'কেয়া পাতার নৌকা', 'ধর্মান্তর', 'রাম চরিত', 'আকাশের নিচে মানুষ' ইত্যাদি। পূর্ব পার্বতী উপন্যাসে গোষ্ঠী জীবনের কথা বলা হয়েছে। পাহাড়ে বসবাসরত লোকদের জীবনাচরণ, সংস্কৃতি, প্রেম, হিংসা, যৌনতা, পূর্ব পার্বতী উপন্যাসের বিষয়বস্তু। আঞ্চলিক ভাষার নমুনা এ উপন্যাসে পাওয়া যাবে। 'কেয়া পাতার নৌকা' উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন, পূর্ব স্মৃতি, প্রেম, সমস্যা, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি রূপায়িত হয়েছে। 'ভাগাভাগি' ঔপন্যাসে একটি হিন্দু পরিবার ও একটি মুসলিম পরিবারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'আকাশের নিচে মানুষ' উপন্যাসে মানবতার অপমান রূপায়িত হয়েছে।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

অমলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৪-২০০৯) মানুষের জীবন ও সংগ্রাম তাঁর উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। দায়বদ্ধ কথা সাহিত্যিক হিসেবে তিনি তাঁর পরিচয় তুলে ধরেছেন। ছোটগল্প ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর দক্ষতা রয়েছে। তাঁর গল্প গ্রন্থ হল : 'সানাই', 'অবিরত চেনামুখ'। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : গোষ্ঠীবিহারীর জীবন যাপন', 'আকাশের সন্ধানে', 'যাবজ্জীবন', 'রাধিকা সুন্দরী' ইত্যাদি। রাধিকা সুন্দরী তিন পর্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। গাঁয়ের মেয়ে রাধিকা শহরে এসেছিল বড়লোকের বাড়িতে দাসী হিসেবে কাজ করার জন্য। কলকাতার রূপ তার চোখে কীভাবে বদলে গেল সে কাহিনিই এতে বর্ণিত হয়েছে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪) এ কালের অন্যতম খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক। সমকালীন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'মানিকলালের জীবনচরিত', 'বিদেশিনী', 'বর্ণমালা মা আমার', 'অলৌকিক জলযান', 'সাদা জ্যোৎস্না' ইত্যাদি। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। উপন্যাসটি দুই খণ্ডে রচিত। বাংলাদেশের একটি গ্রামের স্মৃতি, দেশবিভাগ, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক, জমিদার প্রজার সম্পর্ক, আর সেই অতীতকে ফিরে না পাওয়ার বেদনা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেয়েছে। দেশ বিভাগের ফলে বাঙালি জনজীবনে যে দুর্গতি নেমে এসেছিল তারই বাস্তব চিত্র এই উপন্যাসটি। দেশ বিভাগের পরিণতিতে মানুষ শান্তির খোঁজ পাবে এমনই আশা ছিল অনেকের। কিন্তু সে আশা মিটেনি। মানুষ দেশত্যাগ করে বিপর্যস্ত হয়েছে। নতুন জীবন সুখকর হয়নি। সবকিছু ছাপিয়ে মনে জেগে রইল অতীত জীবনের সুখময় স্মৃতি। সুখের প্রতীক নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে অনেকেই ছুটে চলে। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও পাওয়া যায় দেখা যায় তার রং বদলে গেছে। 'অলৌকিক জলযান' লেখকের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫) সমাজের মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র তাঁর গল্প উপন্যাসে রূপায়িত করে তুলেছেন। গ্রাম বাংলার জনগণের জীবন বৈচিত্র্য তিনি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলেন বলে তাঁর গল্প উপন্যাসে সেসবের ছবি বাস্তব সম্মত ভাবে ফুটে উঠেছে।

তাঁর জন্ম বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। পিতার চাকরি ছিল রেলে। সেই সুবাদে তাঁর বাংলা বিহার ও আসামে বসবাস করার সুযোগ হয়েছিল। বাল্যকালের সে অভিজ্ঞতা তিনি পরবর্তীতে তাঁর লেখালেখিতে কাজে লাগিয়েছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'ঘুনপোকা', 'উজান', 'পারাপার', 'দূরবীন', 'পার্থিব' ইত্যাদি।

'ঘুনপোকা' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। সেখানে বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি সম্পর্কে লেখকের চিন্তা ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। 'যাও পাখি' উপন্যাস লিখে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ব্রজগোলাপ ও ননীবালা দাম্পত্য জীবনে নিজেরা সুখী হতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল বিশ্ব মানবের মধ্যেও যেন সুখ আসে। বাস্তবে তা হয়নি। স্বামী আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনায় উদাসীন। স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে তার বসবাস। ননীবালা সন্তানদেরও কাছে থাকতে পারেনি। ফলে যে সুখ সে চেয়েছিল তা থেকে সে দূরেই রয়ে গেল। 'পারাপার' উপন্যাসে নিঃসঙ্গতার চিত্র ফুটে উঠেছে। 'পার্থিব' উপন্যাসে নিঃসঙ্গতার কথা বলা হয়েছে। নায়ক কৃষ্ণজীবন গ্রামের দরিদ্রের সন্তান হলেও মেধার জোরে খ্যাতিমান বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শহুরে জীবন তার ভাল লাগেনি।

দেবেশ রায়

দেবেশ রায় (১৯৩৬) সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে পরিচিত। তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে সমাজের বিচিত্র মানুষের ছবি রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

দেবেশ রায় বাংলাদেশের পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকদিন 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল : 'যযাতি', 'মানুষ খুন করে কেন', 'মফস্বলী বৃত্তান্ত', 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত', 'লগন গান্ধার', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', 'তিস্তাপুরাণ', 'প্রতিবেদন', 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' ইত্যাদি। 'যযাতি' তাঁর প্রথম উপন্যাস। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে এক মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তিস্তাপারের মানুষের জীবন বৈচিত্র্য এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এ উপন্যাসে সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ভূগোল মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। জাত পর্ব, বন পর্ব, চর পর্ব, ফরেস্টের বৃক্ষ পর্ব, মিটিং মিছিল পর্ব, তিস্তা ব্যারেজ পর্ব, এক পর্ব থেকে অন্য পর্ব হয়ে তিস্তা আপন খেয়ালে বয়ে চলে যায়। সেখানে প্রকৃতি রং ছড়ায়, ইতিহাস কথা বলে, ভূগোলের পরিধি বেড়ে যায়। তিস্তার পারে প্রকৃতি আর মানুষ হাত ধরে চলে। নানা জাতের মানুষ তিস্তা পারে বসতি স্থাপন করেছে। তারা বৈচিত্র্যময় জীবন অতিবাহিত করে চলে। তাদের মধ্যে ঈর্ষা আছে বিদ্বেষ আছে, মিল মহব্বতও আছে। আছে উঁচু নিচু ভেদাভেদ। আছে শোষণ পীড়ন। মাঝে মাঝে নিপীড়িতেরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি হয়। সমাজের মধ্যে বর্ণবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এভাবেই সমাজের বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসটিকে বলা হয়েছে আধুনিক মানুষের মহাকাব্য। 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' উপন্যাসে আছে ভারতের শাসননীতি, রাজনীতি এবং বাংলা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আখ্যান।

সমরেশ মজুমদার

ভারতীয় বাঙালি ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার (১৯৪১) একজন জনপ্রিয় লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। মানব জীবনের নানা দিক নিয়ে তিনি প্রচুর উপন্যাস রচনা করেছেন। বিচিত্র স্বাদে তাঁর সেসব উপন্যাস পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ পাশ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : 'সত্যনেব জয়তে', 'আকাশ না পাতাল', 'তেরো পার্বন', 'সওয়ার', 'টাকা পয়সা', 'তীর্থযাত্রী', 'ভালবাসা থেকে যায়', 'নিকট কথা', 'ডানায় রোদের গন্ধ', 'জলছবির সিংহ', 'মেয়েরা যেমন হয়', 'উত্তরাধিকার', 'কালবেলা', 'কালপুরুষ', 'গর্ভধারিণী', 'হৃদয় আছে যার', 'সর্বনাশের নেশায়', 'ছায়া পূর্বগামিনী', 'এখনও সময় আছে', 'স্বনামধন্য', 'কলিকাল', 'স্বপ্নের বাজার', 'কলকাতা', 'অনুরাগ', 'তিনসঙ্গী', 'ভিক্টোরিয়ার বাগান', 'সহজপুর কতদূর', 'অনি',

'সিনেমা ওয়ালা', 'সূর্য চলে গেলে', 'আশ্চর্য কথা হয়ে গেছে', 'অগ্নিরথ', 'অনেকই একা', 'আট কুঠুরি নয় দরজা', 'আত্মীয় স্বজন', 'আবাস', 'আমাকে চাই', 'উজান গঙ্গা', 'কষ্ট কষ্ট সুখ', 'কুলকুণ্ডলিনী', 'কেউ কেউ একা', 'জল যাজক', 'জলের নিচে', 'প্রথম প্রেম', 'জ্যোৎস্নায় বর্ষার মেঘ', 'দায়বন্ধন', 'দিন যায় রাত যায়', 'দৌড়', 'বিনিসুতোয়', 'মনের মত মন', 'মেঘ ছিল বৃষ্টিও', 'শরণাগত', 'শ্রদ্ধাঞ্জলি', 'সাতকাহন', 'সুধারাণী ও নবীন সন্ন্যাসী', 'হরিণ বাড়ি', 'মধ্যরাতের রাখাল', 'আকাশে হেলান দিয়ে', 'কালোচিতার ফটোগ্রাফ', 'আকাশ কুসুম', 'স্বরভঙ্গ', 'ঐশ্বর্য', 'আকাশের আড়ালে আকাশ', 'কালাপাহাড়', 'অহংকার', 'শয়তানের চোখ', 'হৃদয়বতী', 'সন্ধেবেলার মানুষ', 'বুনোহাঁসের পালক', 'জাল বন্দী', 'মোহিনী', 'সিংহ বাহিনী', 'বন্দীনিবাস', 'মেঘের খুব কাছে', 'জীবন যৌবন', 'আহরণ', 'বাসভূমি', 'এত রক্ত কেন', 'এই আমি রেণু', 'উনিশ বিশ', 'মৌষল কাল' ইত্যাদি।

সমরেশ মজুমদারের ছোটগল্পের বই : 'একশো আকাশ', 'বড় পাপ হে' ইত্যাদি। তাঁর সমসাময়িক অন্য লেখকদের নিয়ে লেখা 'বই-কইতে কথা বাধে।' 'উত্তরাধিকার' 'কালবেলা' ও 'কালপুরুষ' তাঁর একটি উপন্যাস ত্রয়ী। তিনি কিছু গোয়েন্দা কাহিনী রচনা করেছেন। তাঁর অনেক রচনাতেই উত্তরবঙ্গের কথা ঘুরে ফিরে এসেছে।

আবুল বাশার

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট লেখকগণের মধ্যে আবুল বাশার (১৯৫১) উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিক জীবনের পাশাপাশি সাহিত্য সাধনায় রত থেকে তিনি বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে।

আবুল বাশারের জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার এক গ্রামের বাড়িতে। ছ বছর বয়সে সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের লালবাগ নবগ্রাম মহকুমার টেকা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের স্নাতক। তিনি হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে ডিপ্লোমো করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে দশ বার বছর শিক্ষকতার চাকরি করেছিলেন। পরে তিনি 'দেশ' পত্রিকায় যোগদান করেন এবং সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

দারিদ্র্যের চাপ এবং সামাজিক নির্মমতা ও পীড়ন তাঁকে কৈশোরেই লেখা লেখিতে প্ররোচিত করেছিল। তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থের প্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালে। কাব্যের নাম 'জড় উপড়ানো ডালপালা ভাঙা আর এক ঋতু'। তারপর তিনি গল্প লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প 'মাটি ছেড়ে যায়।' উপন্যাস রচনায় তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'ফুলবউ' উপন্যাসের জন্য তিনি আনন্দ পুরস্কার লাভ করেছেন। অগ্নিবলাকা উপন্যাসের জন্য তিনি সাহিত্য শিরোমণি পুরস্কারে ভূষিত হন।

আবুল বাশারের উপন্যাসে রাঢ় মুর্শিদাবাদের মুসলমান প্রধান অঞ্চলের বাস্তব চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে। তিনি মনে করতেন, 'জীবনের বেলায় হিন্দু-মুসলমান আমরা

পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছি, এর মধ্যে যে স্বাভাবিকতা রয়েছে তা প্রকৃতির আলো বাতাসের মত স্বাভাবিক, সেই স্বাভাবিকতায় এই সম্পর্ককে সাহিত্যে তুলে আনা চাই।'

তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৬৫) পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক। ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার পলাশী গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ পাশ করেন এবং পরে একটি কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন খ্যাতিমান পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। টেলিভিশনে তাঁর লেখা নাটকও প্রচারিত হয়েছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : 'বেদনার দিন রাত্রি', 'সাহেব ডাক্তার', 'পরমাপল্লীর পথে পথে', 'ভগবানের চিঠি', 'রুট নাম্বার তেইশ' ইত্যাদি।

ছোটগল্প দিয়ে তাঁর প্রথম লেখালেখির শুরু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অনুষ্ঠানে গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'বেদনার দিনরাত্রি'। এ সম্পর্কে আনন্দ বাজার পত্রিকা মন্তব্য করেছিল, 'তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প সংকলনের মধ্যেই এক প্রতিশ্রুতিময় তরুণ লেখককে বিশেষভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।' প্রাকৃতিক শ্যামলিমা আর গ্রাম বাংলার বিচিত্র সব চরিত্র তাঁর সাহিত্যে এমনভাবে এসেছে যা ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন রসের। তিনি যে পল্লী জীবনের কথা তাঁর গল্পে বলেছেন তা মোটের উপর সহজ সুন্দর, সরলতা মাখানো জীবন নয়। সেখানে রয়েছে জীবনযুদ্ধ, অন্যায়, প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার সব কিছুই। 'সাহেব ডাক্তার' তাঁর প্রথম উপন্যাস। 'পরমা পল্লীর পথে পথে' উপন্যাসটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'ভগবানের চিঠি' গ্রন্থের গল্পগুলো ব্যঙ্গ রসাত্মক। গল্পগুলোতে সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছে। 'রুট নম্বর তেইশ' উপন্যাস একটি বিশেষ এলাকার মানুষের চালচিত্র। এটি গ্রাম বাংলার পটভূমিকায় লেখা শক্তিশালী উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত।

নাট্য সাহিত্য

পশ্চিমবঙ্গের নাট্য সাহিত্য গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী হিসেবে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নাটকে যে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেছিলেন তাকে পরবর্তী নাট্যকারগণ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন, সেই সঙ্গে সমকালীন বিশ্বের নব উদ্ভাবিত নাট্যদর্শনের সঙ্গেও তাঁদের সংযোগ ঘটেছে। ফলে বাংলা নাটক এক সমৃদ্ধ পথে গতিশীল হয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। এর ফলে বিষয়বস্তুতে এসেছে নতুনত্ব এবং আঙ্গিকে এসেছে বিশ্বের নানা রকম আদর্শ। নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে প্রধানত সমাজ থেকে। কখনও ইতিহাস থেকে, কখনও পৌরাণিক কাহিনি থেকে। সমাজে নানা শ্রেণির মানুষ বসবাস করে। আছে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, আছে উচ্চবিত্ত। সমাজে উঁচু নিচু মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ অনেক। আছে সংঘাত বিরোধ আর সংগ্রাম। সমাজে আছে শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন। মধ্যবিত্ত সমাজের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার ছবি পশ্চিমবঙ্গের নাটকে বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজসচেতন নাট্যকারেরা সমাজকে নানাদিক থেকে দেখেছেন এবং সামাজিক চিত্র রূপায়ণে তৎপর থেকেছেন।

পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দেশবিভাগের সুদূর প্রসারী প্রভাবের কথা নাট্যকারেরা উপেক্ষা করতে পারেননি। এসব সংঘটনের কাল থেকে বহু দূরে এসেও তাঁরা তা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। পঞ্চাশের মনুষ্যসৃষ্ট মন্বন্তর দেশে প্রচণ্ড বিপর্যয় এনেছিল। অগণিত মানুষ মারা গেছে, অগণিত জনগণ চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েছে। সংবেদনশীল নাট্যকারেরা সেসবের বাস্তব চিত্র পরম সহানুভূতিশীল ভাবে দীর্ঘদিন রূপায়িত করে তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের নাটক দেশ বিভাগের ঘটনা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অনেকেই ভুক্তভোগী ছিলেন, তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার কোনো অভাব ছিল না। দেশ বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। সারা দেশের এই দুর্যোগের চিত্র পশ্চিমবঙ্গের নাটকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। রাজনৈতিক ঘটনাবলি নাটকে স্থান পেয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেশের জনগণকে সময়ে সময়ে বিপর্যস্ত করেছে। নাটকের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে নাট্যকারেরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। প্রতিবেশী বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের নাট্যসাহিত্যও তা অবহেলা করতে পারেনি। স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনা নাট্যকারগণের মনকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর নিদর্শন আছে পশ্চিমবঙ্গের নাটকে। ঐতিহাসিক নাটকগুলো সে চেতনাকে পরবর্তীকালে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশে এক শ্রেণির লোভী দুর্নীতিবাজ শোষকের উদ্ভব ঘটে। এখানকার নাটকে তার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা চলে। অনেক বামপন্থী বা সাম্যবাদী নাট্যকার তাঁদের নাটকে দলীয় আদর্শ প্রচারে তৎপর হয়েছেন। সাম্যবাদী চরিত্র অনেক নাটকের উপজীব্য হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের নাটকের বিকাশে ও উৎকর্ষ সাধনে বিভিন্ন নাট্য আন্দোলন ও নাট্য গোষ্ঠীর অবদানের কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করতে হয়। গণনাট্য আন্দোলন ও নবনাট্য আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের নাটকে উৎকর্ষবিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। 'যে নাটকে মানুষের দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, শোষণ, নির্যাতন, ও বঞ্চনার চিত্র থাকে এবং সেই শোষণ নির্যাতন বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের অসাম্প্রদায়িক এবং সমবেত প্রতিরোধ ও গণজাগরণের চিত্র থাকে তাকে গণনাট্য বলে। গণনাট্যের সঙ্গে রাজনীতির ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকে। গণনাট্যের ধারক ও বাহকেরা সাম্যবাদে বিশ্বাসী হন। নবনাট্যে গণনাট্যের মত দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বঞ্চনা, দরিদ্র মানুষের নানাবিধ সমস্যার কথা থাকলেও সেখানে নাট্যকৌশল এবং সৎ মানুষের জীবনবোধ ও নতুন সমাজ ভাবনা গুরুত্ব লাভ করে।' সারা বিশ্বে এইসব আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকারগণ এসব আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং তাঁদের নাটকে আন্দোলনের আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এইসব আন্দোলনের পাশাপাশি বহু নাট্য গোষ্ঠী সংগঠিত হয়েছে। নাট্যগোষ্ঠীর সদস্যগণ নিজেরা নট নাট্যকার ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে নাটকের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ভাল নাট্য রচনায় সহায়তা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের নাট্যসাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানে রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার বিশেষ গুরুত্ব আছে। কলকাতায় অসংখ্য অপেশাদার ও পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার ফলে দর্শকদের নাটকের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এসব রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মিটানোর জন্য নতুন নতুন নাটক রচিত হতে থাকে এবং নতুন নাট্যকারেরও আবির্ভাব ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে নানা শ্রেণির নাটক রচিত হয়েছে এবং এর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি এখনও অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, জীবনী নাটক, রূপক নাটক, এ্যাবসার্ড নাটক ইত্যাদি ব্যাপকভাবে রচিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের নাটকে আছে বিদেশি প্রভাব। অবশ্য বাংলা নাটকের শুরুই হয়েছিল বিদেশি প্রভাবে। আধুনিক যুগে বিদেশি প্রভাব ব্যাপকতর হয়েছে। এসেছে আঙ্গিকগত পরিবর্তন।

জলধর চট্টোপাধ্যায়

জলধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৬৪) ছিলেন খ্যাতিমান নাট্যকার। দেশ বিভাগের আগে থেকেই তিনি নাট্যকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বিখ্যাত অভিনেতা শিশির কুমার ভাদুরী তাঁর নাটকে অভিনয় করায় তাঁর নাটক 'রীতিমতো নাটক' (১৯৩৫) বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

তিনি অনেকগুলো নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'অহিংসা', 'রীতিমতো নাটক', 'হাউস ফুল', 'সত্যের সন্ধান', 'প্রাণের দাবি', 'রাঙারাখী', 'শক্তির মন্ত্র', 'আঁধারে আলো', 'সিঁথির সিঁদূর', 'নারী ধর্ম', 'ডা. শুভঙ্কর', 'কবি কালিদাস', 'থামাও রক্তপাত' ইত্যাদি।

জলধর চট্টোপাধ্যায় সমকালীন জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে নাটক রচনা করেছিলেন। সমসাময়িক জীবন ও সমাজের চিত্র অঙ্কনে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন বলে সেসব দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

'রীতিমতো নাটক' তাঁর বিশেষ জনপ্রিয় নাটক। শিশির কুমার ভাদুরীর উপদেশে নাটক রূপায়িত হয়েছিল। দাম্পত্য জীবনের কাহিনি নাটকটির উপজীব্য।

'সত্যের সন্ধান' নাটকটি অভিনয়ের দিক থেকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'নারী ধর্মের মূলকথা—প্রাণের দাবি দেহের বিকার নয়।'—এই তত্ত্ব নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নাটকে নারীর দৈহিক শুচিতা অপেক্ষা মানসিক সূচিতার ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'প্রাণের দাবি' নাটকটি লেখা হয়েছে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের চিত্র অবলম্বনে। 'রাঙ্গারাখী' কয়েকটি জীবন্ত চরিত্র অবলম্বনে লেখা পারিবারিক নাটক। জমিদারি শাসনের চিত্র আছে 'সিঁথির সিদুঁর' নাটকে। ১৯৪৬ সালে দেশে যে ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল তার পটভূমিকায় লিখেছিলেন 'থামাও রক্তপাত।' 'কবি কালিদাস' নাটকটি লেখা হয়েছিল কবি কালিদাসের জীবন কাহিনি অবলম্বনে।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১) সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বিখ্যাত অভিনেতা অতীন্দ্র চৌধুরীর প্রেরণায় তিনি নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

খুলনার সেনহাটি গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯০৯ সালে কলকাতায় এসে ন্যাশনাল মেডিকেলে ভর্তি হলেও ভাল না লাগায় ন্যাশনাল কলেজে সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। তবে সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'রক্তকমল', 'সতীতীর্থ', 'ঝড়ের রাতে', 'মাটির মায়া', 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজউদ্দৌলা', 'জননী', 'দশের দাবি', 'আবুল হাসান', 'প্রলয়', 'হরপার্বতী', 'নার্সিং হোম', 'শান্তি', 'ভারতবর্ষ', 'সুপ্রিয়ার কীর্তি', 'সিংহাসন', 'বাংলার দুলাল', 'এই স্বাধীনতা', 'তুষারকণা', 'সবার উপরে মানুষ সত্য', 'আর্তনাদ ও জয়নাদ', 'স্বামী-স্ত্রী', 'কামাল আতাতুর্ক', 'তটিনীর বিচার', 'ধাত্রীপান্না', 'রাষ্ট্রবিপ্লব', 'কালোটাকা', 'সংগ্রাম ও শান্তি।'

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রথম নাটক 'রক্তকমল' সামাজিক পটভূমিতে লেখা একাঙ্ক নাটক। 'সতীতীর্থ' নাটকে সমকালীন জীবনচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। সেখানে নারীর বিদ্রোহ আছে— আছে আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। 'ঝড়ের রাতে' নাটকে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। সামাজিক শৃঙ্খল না ভাঙার বেদনায় নায়িকার হৃদয় আর্তনাদ করেছে। ইতিহাস আশ্রয়ী ও সামাজিক নাটক লিখে তিনি রঙ্গমঞ্চে নাটকগুলোর যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছিলেন। তাঁর 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি ঐতিহাসিক নাটক হিসেব দীর্ঘদিন রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে দেশে স্বদেশ

প্রেমের বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। 'গৈরিক পতাকা' ঐতিহাসিক নাটক। এতে অসহযোগ আন্দোলন ও মহাত্মা গান্ধীর মতাদর্শ রূপায়ণে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর সারা দেশ দুর্নীতি আর অবক্ষয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'কালোটাকা' নাটকে। সামাজিক নাটকগুলোতে তৎকালীন সমাজ ও জীবনে নানা সমস্যাকে নাট্যকার অত্যন্ত বাস্তবধর্মী রূপে রূপদান করেছিলেন। শচীননাথ সেনগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস', পথের দাবি, বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' প্রভৃতি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন।

তুলসীদাস লাহিড়ী

তুলসীদাস লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯) ছিলেন একই সঙ্গে অভিনেতা, নাট্যকার, মঞ্চ পরিচালক ও গীতিকার। বিভিন্ন নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থেকে তিনি বাংলা নাটককে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ তাঁর নাটককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সাধারণ কৃষক জীবনের বাস্তব চিত্র সার্থকভাবে ফুটে ওঠে বাংলা নাটকে গণমানুষের কথা প্রথমবারের মত রূপায়িত হয়ে উঠেছে। তিনি ছিলেন সামাজিক দায়বদ্ধ শিল্পী।

তুলসীদাস লাহিড়ী জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের রংপুর জেলার নলডাঙায়। আইন পাশ করে ওকালতি শুরু করলেও তিনি কালক্রমে সঙ্গীত রচনা ও মঞ্চাভিনয়ে অনুরাগী হয়ে উঠেন। তিনি বহুরূপী ও আরও অনেক নাট্যসংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি তেরটি পূর্ণাঙ্গ নাটক ও পনেরটি একাঙ্ক নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর কিছু গদ্য রচনাও রয়েছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল :

পূর্ণাঙ্গ নাটক : 'মায়ের দাবি', 'দুঃখীর ইমান', 'পথিক', 'ছেঁড়া তার', 'বাংলার মাটি', 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার', 'ঝড়ের মিলন', 'চৌযানন্দ' ইত্যাদি।

একাঙ্ক নাটক : 'একাঙ্ক নাটকের সংকলন', 'শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটক' ইত্যাদি। 'নাট্যকারের ধর্ম' তাঁর নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ।

'ছেঁড়া তার' তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক। সাধারণ কৃষক জীবনের ছবি এতে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কৃষক রহিম ও তার স্ত্রীর সংকটময় সম্পর্ক এ নাটকের বিষয়। সেই সঙ্গে এসেছে মুসলিম সমাজের চিত্র, আঞ্চলিক জীবনের ছবি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পরিণতির কথা। দুর্ভিক্ষের কারণে রহিমের সংসার অভাব অনটনে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে, রহিম জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত এক মানুষ। নাটকের উপাদান হিসেবে আছে দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, পুঁজিপতির চক্রান্ত, জাপানের ভারত আক্রমণ ইত্যাদি। সব কিছু মিলিয়ে সমাজের একেবারে নিচুস্তরের ছবি। 'দুঃখীর ইমান' নাটকটি পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় কৃষক জীবনের ছবি নিয়ে লেখা। এতে হিন্দু মুসলমান সমাজের নিচুস্তরের চিত্র রূপলাভ করেছে। 'বাংলার মাটি' নাটকে হিন্দু মুসলমানের মিলনগীতি গাওয়া হয়েছে।

তুলসীদাস লাহিড়ী তাঁর নাটকে প্রচলিত নাট্যধারা থেকে বের হয়ে সমাজের সাধারণ মানুষকে চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী নাট্যকার। নাটককে তিনি শ্রেণি সংগ্রামের হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। তিনি মনে করতেন, যারা মানবতার ধ্বংসকারী তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া নাট্যকারের ধর্ম।

মন্মথ রায়

মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) বৈচিত্র্যধর্মী নাট্য প্রতিভার পরিচয় দান করে গেছেন। তিনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, দেশাত্মবোধক, জীবনী নাটক, একাঙ্ক নাটক ইত্যাদি শ্রেণির নাটক রচনা করে আধুনিক বাংলা নাটকের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁর প্রায় সব নাটকের মধ্যে স্বদেশ প্রেমের চেতনা রূপ লাভ করেছে। মন্মথ রায়ের প্রথম দিকের জীবন কেটেছে বালুর ঘাট শহরে। বি এল পাশ করে তিনি বালুর ঘাট সদর আদালতে ওকালতির মাধ্যমে কর্ম জীবন শুরু করেছিলেন। ১৯৩৮ সাল থেকে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল :

১. পৌরাণিক নাটক : 'চাঁদ সদাগর', 'দেবাসুর', 'সেমিরেমিস', 'কাজল রেখা', 'শ্রীবৎস', 'মহুয়া', 'কারাগার', 'সাবিত্রী', 'খনা', 'সতী', 'উর্বশী', 'কৃষ্ণবিলাসিনী মীরা', 'মীরাবাঈ', 'শ্রী শ্রীমা' ইত্যাদি।

২. ঐতিহাসিক নাটক : 'অশোক', 'মীরকাসিম', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'অমৃত অতীত' ইত্যাদি।

৩. সামাজিক নাটক : 'মমতাময়ী হাসপাতাল', 'জীবনটাই নাটক', 'ধর্মঘট', 'চাষীর প্রেম', 'আজব দেশ', 'লাঙল', 'বন্দিতা', 'জয় বাংলা', 'রূপকথা', 'রাজনটী', 'ভাঙাগড়া' ইত্যাদি।

৪. দেশাত্মবোধক নাটক : 'মহাভারতী', 'স্বর্ণকীট ও জওয়ান' ইত্যাদি।

৫. জীবনী নাটক : 'তারাস শেভচেঙ্কা', 'লালন ফকির', 'আমি মুজিব নই', 'শরৎ বিপ্লব', 'এদেশের লেনিন' ইত্যাদি।

৬. একাঙ্ক নাটক : 'মুক্তির ডাক', 'রাজপুরী', 'বিদ্যুৎ পর্ণা', 'বহুরূপী', 'একাঙ্কিকা', 'অপরাজিতা', 'অসাধারণ', 'নব একাঙ্কিকা', 'ফকিরের পাথর', 'বিচিত্র একাঙ্ক', 'একুশে ফেব্রুয়ারি' ইত্যাদি।

মন্মথ রায়ের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কারাগার'। স্বদেশ প্রেম নাটকটির বিষয়। তাঁর এ নাটক সম্পর্কে অজিত কুমার ঘোষ মন্তব্য করেছেন, 'পৌরাণিক কাহিনির প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়াও নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক সংগ্রামের এমন এক অগ্নিময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া মুক্তিকামী জনগণের চিত্তে প্রবল উদ্দীপনা জাগাইয়া আসিয়াছে।' সমকালীন দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা তাঁর অধিকাংশ নাটকের বিষয়বস্তু হয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন

তাঁর নাটকের উপজীব্য হয়েছিল, তেমনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়েও তিনি নাটক রচনা করেছিলেন।

পৌরাণিক নাটকগুলোতে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য মন্মথ রায় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকে অতি আধুনিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। পৌরাণিক নাটক হলেও পৌরাণিক নীতি ও ধর্মের গুণকীর্তন না করে প্রাচীনতার নীতি ও ভাব ত্যাগ করে সমকালীন চিন্তা চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'অশোক', 'মীরকাসিম', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' প্রভৃতিতে স্বাধীনতার চেতনা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

সামাজিক নাটকগুলোতে সমকালীন সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সে সময়ে সমাজের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল তার যথার্থ রূপায়ণ হয়েছে এসব নাটকে। জমিদারের অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে কোনো কোনো নাটকে। চাষীর জীবনের নির্মম চিত্র 'চাষীর প্রেম', 'লাঙল' প্রভৃতি নাটকে দেখা যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে লেখা হয়েছিল 'জয় বাংলা' নাটকটি। তাঁর জীবনী নাটকগুলোতে বেশ কয়েকজন স্মরণীয় মহামানবের জীবন রূপায়িত হয়ে উঠেছে। তিনি কয়েকটি একাঙ্ক নাটক রচনা করেছিলেন। সমকালীন দর্শকদের চাহিদা মিটানোর জন্য এইসব একাঙ্কিক নাটক রচিত হয়েছিল। তাঁর হাতেই বাংলা একাঙ্ক নাটকের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল।

তাঁর নাটকে স্বদেশ প্রেম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে। বাঙালির জাতীয় ভাব উদ্দীপনা তাঁর নাটকে বিদ্যমান। তাঁর নাটকে আধুনিক সমস্যা ও আধুনিক জীবনবোধের প্রকাশ পেয়েছে। চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অসাধারণ সংলাপের জন্য তাঁর নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কাব্যময় ভাষা তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য।

সুনির্মল বসু

সুনির্মল বসু (১৯০২-৫৭) ছোটদের জন্য নাটক লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। একাঙ্ক নাটক রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কবিতা রচনা করেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটকগুলো ছিল কৌতুক রসে পরিপূর্ণ।

তাঁর অভিনয়ের দক্ষতা ছিল যথেষ্ট। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' ও 'ডাকঘর' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। নাটকের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল বলেই তিনি ছোটদের জন্য প্রহসন জাতীয় রচনাগুলো লিখেছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'দাদার কথা মিথ্যে নয়', 'বুদ্ধুভুতুম', 'প্যাঁচা বাদুর শেয়াল', 'পবিত্তির মাসীমা', 'আনন্দবাড়ু', 'ত্রিরত্ন', 'উগো বুধো আর মামা', 'চঞ্চুচাঞ্চল্য', 'লাভের গুড় পিঁপড়ে খায়', 'বারবেলায় ঠেলায়', 'কাশির টোটকা', 'বস্তুবাগীশ', 'মুশকিল আসান', 'আরশোলা ফড়িং টিকটিকি' ইত্যাদি।

নাটিকা গুলোতে শিশুদের মনমানসিকতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। 'দাদার কথা মিথ্যে নয়' নাটকে দাদা নন্তুকে গাধা আর কমলিদিকে প্যাঁচা বলেছিল।

নন্তুর মনে হল সে বুঝি গাধা হয়ে যাচ্ছে। তার কান দুটো গাধার মত লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আর কমলিদির মনে হল সে হয়ে যাচ্ছে প্যাঁচার মত। নাটকের শেষে তারা বুঝতে পারে যে তারা গাধা নয় প্যাঁচা নয়।

সুনির্মল বসুর নাটিকাগুলো ছোটদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিল।

বিধায়ক ভট্টচার্য

সমকালীন বাংলা নাটকে বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-৮৬) একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁর কয়েকটি নাটক দীর্ঘদিন ধরে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। সামাজিক নাটক রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

বিধায়ক ভট্টাচার্যের জন্ম মর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে। কলকাতার টালা হাইস্কুল থেকে ১৯৩১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কলকাতার বাগবাজারের শিশির কুমার ইন্সটিটিউটের পাঠাগারে কেরানি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানেই তাঁর নাট্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'মেঘ মুক্তি', 'মাটির ঘর', 'মালা রায়', 'ক্ষুধা', 'বিশ বছর আগে', 'রক্তের ডাক', 'কুহকিনী', 'তাই তো', '১৩৫০', 'খবর বলছি', 'অন্ধদেবতা', 'পিতাপুত্র', 'সেতু', 'অতএব', 'অ্যান্টনি কবিয়াল', 'নটী বিনোদিনী', 'লগ্ন', 'দ্বিধা', 'উজান যাত্রা', 'জীবন জুয়া', 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'সরীসৃপ' ইত্যাদি। তিনি কিছু যাত্রাপালাও রচনা করেছিলেন। সেগুলোর নাম : 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত', 'রাষ্ট্রবিপ্লব', 'ভক্ত ভৈরব' ইত্যাদি।

সামাজিক নাটক রচনার দিকেই তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সামাজিক মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ তাঁর নাটকে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। তিনি সামাজিক নাটক রচনা করে এক সময় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি তাঁর নাটকের যেমন বিষয় হয়েছে, তেমনি আবার ব্যক্তির সংকট, দাম্পত্য সমস্যা, পরিবার জীবনের সমস্যা তাঁর নাটকে শিল্প সৃমদ্ধভাবে স্থান পেয়েছে। 'মেঘমুক্তি' তাঁর খ্যাতিমান নাটক। দীর্ঘদিন তা মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। এটি তাঁর প্রথম নাটক। নায়ক চরিত্র প্রদ্যোতের মানসিক টানাপোড়েন, আনমার নারীসুলভ ঈর্ষা এ নাটকের উপজীব্য। তাঁর অপর খ্যাতিমান নাটক 'মাটির ঘর'। এ নাটকে ত্রিভূজ প্রেম ও চরিত্রগুলোর মানসিক অস্থিরতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। চরিত্রকে বাস্তবতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে যে দক্ষতার প্রয়োজন ছিল তা এখানে বেশ স্পষ্টভাবে রূপ লাভ করেছে। 'বিশ বছর আগে' নাটকটিও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আধুনিক চরিত্রের প্রেম ভালবাসা, দ্বন্দ্ব সংঘাত, খুনোখনি, বিচারে দ্বীপান্তর—এসবই নাটকের

বিষয়। 'ক্ষুধা' নাটকটি জনপ্রিয়তার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্ষুধার্ত মানুষের জীবন সংগ্রাম এ নাটকের বিষয়বস্তু। কতিপয় চরিত্রের ক্ষুধা নিবারণের সংগ্রাম এ নাটকে শিল্প সম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী নাট্যকার ছিলেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৯০)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দেশে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর নাটকে। তৎকালীন অর্থনৈতিক সংকট, শ্রমিক ও মালিক বিরোধ, মেকি জাতীয়তা বোধ, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা দ্বন্দ্ব ইত্যাদি তাঁর নাটকের উপাদান হিসেবে স্থান পেয়েছে। তিনি তাঁর নাটকে সমকালীন দেশ ও সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল।

তাঁর জন্ম ঢাকা জেলার আদাবাড়ি গ্রামে মামার বাড়িতে। তিনি ১৯২৮ সালে রাজাদিয়া হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কর্ম জীবন শুরু করেন 'ডেইলি এডভান্স' পত্রিকায়। পরে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সাব এডিটর ছিলেন। শেষে ছিলেন 'শিশুসাথী' পত্রিকার সম্পাদক। তিনি অনেকগুলো পূর্ণাঙ্গ নাটক ও অসংখ্য একাঙ্ক নাটক রচনা করে গেছেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলো হল : 'দীপশিখা', 'অন্তরাল', 'তরঙ্গ', 'বাস্তুভিটা', 'পূর্ণগ্রাস', 'মোকাবিলা', 'মশাল', 'জীবনস্রোত', 'কেউ দায়ী নয়', 'মা', 'অমৃত সমান', 'ল্যাবরেটরি', 'নয়াশিবির', 'দুরন্ত পদ্মা', 'বিদ্রোহী সুভাষ', 'লালন ফকির' ইত্যাদি। তাঁর একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা অনেক। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 'অপচয়', 'পাকাদেখা', 'বেওয়ারিশ', 'পুনর্জীবন', 'আপেক্ষিক', 'অন্তস্থল', 'হারানো সুর', 'চিড়িয়া বিদ্রোহ', 'পাণ্ডুলিপি', 'দু-এর পিঠে এক শূন্য', 'সীমান্তের ডাক', 'বাঁধ ভেঙে দাও', 'কিন্তু এবং সুতরাং', 'গোলটেবিল', 'কণ্ঠরোধ', 'রেশন শপ', 'মুখর রাত্রি', 'রক্ত রাঙা সিঁথি' ইত্যাদি।

তাঁর নাটকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা, রাজনৈতিক সংঘাত, কৃষক জমিদার মহাজনের বিরোধ, দেশ ভাগ জনিত সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছিলেন সমাজবাদী ও মানবতাবাদী নাট্যকার। আধুনিক বাঙালি জীবনের নানা সংকটের কথা তাঁর নাটকে স্থান পেয়েছে। 'অন্তরাল' নাটকে মালিক শ্রমিক বিরোধ ও কুমারী মায়ের সমস্যা রূপ লাভ করেছে। দীপশিখা নাটকটি রচিত হয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর অবলম্বনে। 'তরঙ্গ' নাটকে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির কথা বলা হয়েছে। দেশবিভাগের সমস্যা 'বাস্তুভিটা' নাটকের বিষয়বস্তু। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলোতে জীবন ও সমাজের নানা সমস্যার কথা বলা হয়েছে। ড. অসীতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'নাটক রচনা তাঁহার পক্ষে আর্টের বিলাস নহে তাহা দুঃখব্রত সত্যসন্ধিৎসা। পরিবেশ রচনা, বাস্তবানুগ সংলাপ-প্রয়োগ, আবেগ-দ্বন্দ্বের বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্য এবং ক্ষিপ্র গতি ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার নাটকে সার্থক নাট্যরস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।'

লীলা মজুমদার

লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বড়দের জন্য তিনি লিখেছেন এবং ছোটদের জন্য লিখেছেন নাটক। ছোটদের জন্য লেখাতেই তাঁর কৃতিত্ব বেশি প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর জন্ম কলকাতায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ সালে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণি নিয়ে এম এ পাশ করেন। ইংরেজিতে শিক্ষকতা দিয়েই কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি শান্তি নিকেতনে শিক্ষকতা করেন। পরে কলকাতার আশুতোষ কলেজে শিক্ষকতা করেন। দাদা সুকুমার রায়ের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নাটক লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। তবে তাঁর প্রথম রচনা একটি গল্পগ্রন্থ—নাম 'বদ্যিনাথের বাড়ি।'

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'রূপ প্রতিযোগিতা', 'লঙ্কাদাহন পালা', 'থরহরি সংবাদ', 'দড়াবাজি', 'লোহার বিপত্তি', 'বালী-সুগ্রীব কথন', 'আলো', 'বকবধ পালা' ইত্যাদি।

'রূপ প্রতিযোগিতা' তাঁর প্রথম নাটক। এই এক অঙ্কের নাটকটিতে কলকাতার পাঁচজন সুন্দরীর রূপ প্রতিযোগিতার বিষয় নাটকীয় ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। পৌরাণিক বিষয় নিয়ে লেখা 'লঙ্কাদাহন' নাটকটি। হনুমানের লঙ্কাদাহন এই নাটকের বিষয়। পৌরাণিক চরিত্রগুলো এতে যথাযথ ভাবে ফুটে উঠেছে। 'থরহরি সংবাদ' নাটকে তরুণ ও রাগী থরহরি দেবতার কথা বর্ণিত হয়েছে। লোহার বিপত্তি নাটকে বৃষ্টির ভয়ে লোহার বিপত্তির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'বালী-সুগ্রীব কথন' নাটকে পৌরাণিক কাহিনি স্থান পেয়েছে। 'বকবধ পালা' নাটকে ভীম ও বকের যুদ্ধ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এখানে পৌরাণিক চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য যথাযথ রক্ষিত হয়েছে।

মহেন্দ্র গুপ্ত

মহেন্দ্র গুপ্ত (১৯১০-৮৪) ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রবল প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। তাঁর নাটকগুলো সফলভাবে মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল এবং তিনি অন্যতম কৃতী নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।

মহেন্দ্র গুপ্তের জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় দলুলী গ্রামে। দশ বছর বয়সে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় প্রথম নাটক 'দানব কেশরী' রচনা করেন। ১৯৩১ সালে রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। রাজেন্দ্র কলেজে পড়াকালীন 'উত্তরা' নাটক লিখে খ্যাতি লাভ করেন। পরে কলকাতায় এম এ পাশ করার সময় নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সান্নিধ্যে এসে নাটক ও অভিনয়ের ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এরপরে দিল্লিতে থাকাকালীন ১৯৩৬ সালে বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক 'সোনার বাংলা' রচনা করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল :

১. পৌরাণিক নাটক : 'উত্তরা', 'শ্রীদূর্গা', 'বসুমিত্রা', 'গয়াতীর্থ' ইত্যাদি।

২. ঐতিহাসিক নাটক : 'মহারাজা নন্দকুমার', 'হায়দার আলী', 'সোনার বাংলা', 'আবুল হাসান', 'টিপু সুলতান' ইত্যাদি।

৩. সামাজিক নাটক : 'কঙ্কাবতীর ঘাট' ইত্যাদি।

৪. জীবনী নাটক : 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' ইত্যাদি।

তাঁর নাট্য জীবনের স্মৃতিকথা 'মঞ্চে ও নেপথ্যে' এবং 'হে অতীত কথা কও।'

মহেন্দ্র গুপ্ত নাট্য রচনায় খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন প্রধানত ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে। ইতিহাসের ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি দেশ প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। স্বাধীনতা লাভের জন্য যখন ভারতবাসী আকুল হয়ে উঠেছিল তখন তাঁর নাটকগুলো বাঙালির স্বাধীনতা স্পৃহা ও দেশপ্রেম বিশেষ ভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলা নাট্যমঞ্চকে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিলেন।

বিজন ভট্টাচার্য

বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৫-৭৮) ছিলেন সমাজ সচেতন শিল্পী। তিনি তাঁর নাটকে কৃষক শ্রমিক শোষণ বিদ্রোহ সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে একটি আশাবাদী চেতনা প্রতিফলিত করেছিলেন এবং তাতে রূপলাভ করেছিল লৌকিক সংস্কৃতি ও একটি আশাবাদী সমাজের চিত্র।

বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর গ্রামে। ১৯৩০ সালে লেখাপড়ার জন্য কলকাতায় এসে আলবেনিয়া জে ডি হাইস্কুল, আশুতোষ কলেজ ও রিপন কলেজে অধ্যয়ন করেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং পত্রিকার কাজ ছেড়ে দিয়ে পার্টির কাজে সম্পূর্ণ রূপে আত্মনিয়োগ করেন। সুলেখিকা মহাশ্বেতা দেবীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু সংসার বেশিদিন টিকেনি। তিনি গণনাট্য আন্দোলন ও নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি নানা ধরনের নাটক রচনা করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ নাটক, একাঙ্ক নাটক, রূপক নাটক, গীতি নাট্য ইত্যাদি তিনি রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি কয়েকটি গল্প উপন্যাসও রচনা করেছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল :

পূর্ণাঙ্গ নাটক : 'নবান্ন', 'অবরোধ', 'জতুগৃহ', 'গোত্রান্তর', 'মরাচাঁদ', 'ছায়াপথ', 'মাস্টারমশাই', 'দেবীগর্জন', 'কৃষ্ণপক্ষ', 'ধর্মগোলা', 'আজ বসন্ত', 'গর্ভবতী জননী', 'সোনার বাংলা', 'চলো সাগরে' ইত্যাদি।

একাঙ্ক নাটক : 'আগুন', 'জবানবন্দি', 'কলঙ্ক', 'জননেতা', 'সাগ্নিক', 'লাশ খুইজ্যা যাউক', 'চুল্লি', 'হাঁসখালির হাঁস' ইত্যাদি।

'নবান্ন' নাটক বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ নাটক। যুদ্ধ মন্বন্তর মারী সড়ক কালোবাজারি অনাদরে মৃত্যু সেদিনের বাঙালি জীবনের দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলো উঠে এসেছে নাটকে। 'অবরোধ' নাটকে শ্রমিক জীবনের দুর্দশার চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে। 'গোত্রান্তর' নাটকে দেশ ভাগ ও উদ্বাস্তু সমসা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 'মরাচাঁদ' সঙ্গীত শিল্পীদের যন্ত্রণার আখ্যান।

সংগ্রামী জীবন চেতনা পরিণতি লাভ করেছে তাঁর নাটকে। বিজন ভট্টাচার্য নাটকের কাঠামো ধরে জীবনের দিকে এগোয় নি, জীবন থেকে নাটকের দিকে এগিয়েছেন।

শম্ভু মিত্র

শম্ভু মিত্র (১৯১৫-৯৭) নাট্যকার হিসেবে বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও অভিনেতা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তিনি ভারতীয় নাট্যের নিজস্ব রূপ খুঁজে বেড়িয়েছেন সারাজীবন। তিনি এদেশের নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন।

শম্ভু মিত্রের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'ঘূর্ণি', 'কাঞ্চন রঙ্গ', 'আয়োডিপাউস', 'পুতুল খেলা', 'শ্রী সঞ্জীব', 'উলুখাগড়া', 'বিভাব', 'চাঁদ বণিকের পালা' ইত্যাদি। তাঁর কিছু একাঙ্ক নাটকও রয়েছে। সেগুলো হল 'একটি দৃশ্য', 'গর্ভবতী বর্তমান', 'অতুলনীয় সম্বাদ' ইত্যাদি।

'ঘূর্ণি' নাটকটি রচিত হয়েছে প্রেমের বিচিত্র কাহিনি নিয়ে। একজন প্রকাশকের দুই মেয়ে। তাদের প্রেমের বিচিত্র আলেখ্য নাটকের উপজীব্য। খুকু আদিবাসী ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে জীবনে করুণ পরিণতি ডেকে আনে।

'উলুখাগড়া' নাটকটিও প্রেমের বিচিত্র কাহিনি নিয়ে রচিত। এতে প্রেমের সহজ সরল চিত্র যেমন আছে তেমনি আছে প্রেমের বিরোধিতা পরিণামে সংঘর্ষ।

'চাঁদ বণিকের পালা' তিন অঙ্কের নাটক। শিব ভক্ত চাঁদ বণিক প্রবল পৌরুষের অধিকারী। অপরদিকে চাঁদ বণিকের স্ত্রী মনসাকে পূজা করে বলে—'যুক্তির অতীত তুমি জ্ঞানের অতীত। তমসার রূপ মাগো আলোর অতীত।' চাঁদের কাছে মনসা হল সর্পিল অন্ধকার। সমুদ্রের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড়ে চাঁদ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হয়। চাঁদের সঙ্গীরা রক্ষা পেতে মনসার নিকট প্রার্থনা জানায়। কিন্তু চাঁদ মনসাকে মানে না। প্রতিদিন মদ্য পান করে সব কিছু ভুলে থাকতে চায়। শেষ পর্যন্ত উপায় না পেয়ে মনসাকে চাঁদ বাম হাতে পূজা দিয়ে রক্ষা পান।

'কাঞ্চন রঙ্গ' দুই অঙ্কের নাটক। বাড়ির চাকর পাঁচ লক্ষাধিক টাকা লটারিতে পাওয়ায় বাড়ির লোকদের মনের ভাব কেমন হয়েছিল তা বর্ণিত হয়েছে। কর্তা পাঁচুকে তোষামোদ করে, গৃহকর্ত্রী পাঁচুর সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিতে চায়। টাকা যে মানুষের আচরণকে বদলে দেয় তা পাঁচু বুঝতে পারে। সে সব টাকা বাড়ির ঝিকে দিয়ে দেয়।

শম্ভু মিত্রের তিনটি একাঙ্ক নাটকে জীবনের নানা বিচিত্র খণ্ড চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। চলমান জীবনের টুকরো টুকরো ছবি একাঙ্ক নাটকগুলোতে ফুটে উঠেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭০) নানা ধরনের নাটক রচনা করে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রতিভা ছিল বৈচিত্র্যধর্মী। তিনি শিশু নাটক, বেতার নাটক, একাঙ্ক নাটক, কৌতুক নাটক ইত্যাদি নানা জাতের নাটক রচনা করেছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'রামমোহন', 'আগন্তুক' ইত্যাদি। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলো হল : 'এক সন্ধ্যায়', 'ভাড়াটে চাই', 'বারো ভূতে' ইত্যাদি। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বীতংস', 'সূর্য সারথি', 'তিমির তীর্থ', 'আলোর সরণি', 'শিলালিপি', 'বৈতালিক', 'ইতিহাস', 'একতলা', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'অঙ্কুশ' ইত্যাদি।

'রামমোহন' জীবনী নাটক। এতে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। 'আগন্তুক' নাটকে সামাজিক জীবনের বাস্তব ছবি রূপায়িত হয়ে উঠেছে। 'এক সন্ধ্যায়' একাঙ্ক নাটকে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক সন্ধ্যাকালীন আড্ডার কথা বলা হয়েছে। 'ভাড়াটে চাই' একাঙ্ক নাটকে কৌতুকরসের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। বাড়ি ভাড়া দিতে গিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের নানা কৌতুক ও সংকটের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। বাস্তবতার আলেখ্য হিসেবে নাটিকাটি অনন্য। 'বারো ভূতে' নাটিকাটি একটি কৌতুকবহ ঘটনা নিয়ে রচিত। একটি ক্লাবের সদস্যদের নাটক অভিনয় করে অর্থ ব্যয় করার বদলে টাকা ত্রাণ তহবিলে পাঠিয়ে দেওয়ার কৌতুকপূর্ণ ঘটনা এতে বর্ণিত হয়েছে।

সলিল সেন

পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকার হিসেবে সলিল সেন (১৯২৪-৯১) খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সমাজের নিচু স্তরের মানুষের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার ছবি তিনি তাঁর নাটকে রূপায়িত করে তুলেছেন। সমকালীন সমাজের অবক্ষয় তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং সেই পর্যবেক্ষণ তাঁর নাটকে প্রতিফলিত হয়েছিল।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'নতুন ইহুদি', 'মৌচোর', 'সন্ন্যাসী', 'দর্পণ', 'দিশারী', 'ডাউন ট্রেন', 'উৎসর্গ', 'এলার্ম', 'স্বীকৃতি' ইত্যাদি। এছাড়া 'বিপন্ন নারী জাতি ও তিনটি একাঙ্ক' নামে একটি একাঙ্ক নাটকের সংকলন রয়েছে।

'নতুন ইহুদি' নাটকটি দেশ বিভাগের পটভূমিকায় রচিত। দেশ ভাগের ফলে অনেক উদ্বাস্তুকে দেশ ত্যাগ করে সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়। আজীবনের প্রতিবেশীকে হারিয়ে অনেকে গভীর বেদনা অনুভব করে। নতুন দেশে কেউ উপযুক্ত জীবিকার ব্যবস্থা না পেয়ে ধুকে ধুকে মরে কেউ বিপথে যায়। এভাবে বিপর্যস্ত মানবতার চিত্র এ নাটকে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। 'মৌচোর' নাটকে সুন্দর বনের মানুষের সুখ দুঃখের ছবি আঁকা হয়েছে। এখানে মধু সংগ্রহকারী মানুষের কথা বলা হয়েছে।

কিরণ মৈত্র

কিরণ মৈত্র (১৯২৪) মধ্যবিত্ত জীবন সমস্যা নিয়ে নাটক লিখেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটের চিত্র তাঁর নাটকে রূপলাভ করেছে। তিনি পেশাদার নাট্যদলের সঙ্গে অনেকদিন জড়িত ছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'বারোঘণ্টা', 'চোরাবালি', 'সংকেত', 'নাম নেই', 'বারো ঘণ্টার পড়ে', 'অন্যছায়া', 'নাটক নিয়ে নাটক', 'বিশ্ব পঞ্চাশ নাটক', 'গ্রহের ফের', 'রঙ্গ ছাড়া', 'এদের রাখব কোথায়', 'শেষ কোথায়', 'অমৃতে বিষ', 'আলোয় ফেরা', 'নাটক নয়', 'আমরা বেকার', 'রাতের কান্না', 'মৃতের মিছিল', 'শুধু ছবি', 'মহানায়ক', 'জীবন দর্পণ', 'জাগরণ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'তৃষ্ণা' ইত্যাদি। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলো হল : 'ভাগ্যে লেখা', 'বুদ বুদ', 'অন্ধকার কোথায় গেল', 'দেহ আলো', 'উৎসবের দিন', 'পথের ঠিকানা', 'জীবন্ত কবর', 'খুব', 'আলোর নিচে', 'ডুবুরি', 'একান্তে', 'চেতনা', 'অকল্পনীয়' ইত্যাদি।

'বারোঘণ্টা' নাটক লিখে কিরণ মৈত্র খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কেরানি অমিয়র সংসারের বিপর্যস্ত কাহিনি এই নাটকের উপজীব্য। পরিবারের সকল সদস্য কোনো না কোনো সমস্যায় পড়ে বিপর্যস্ত হয়। অভাবের তালি দেওয়া সংসার যন্ত্রণায় ক্রমশই তলিয়ে যেতে থাকে। 'চোরাবালি' নাটকে মধ্যবিত্ত সংসারের ক্ষণিকের আশা আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। ছোট খাট সুখ একসময় বিলীন হয়ে যায়। নানান সমস্যা নিয়েই জীবন কাটাতে হয়। 'নাটক নয়' নাটকটি মধ্যবিত্ত সংকটের চিত্র নিয়ে রচিত। কিরণ মৈত্রের কোনো কোনো নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ঋত্বিক ঘটক

ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-৭৬) ১৯৫০ সালে গণনাট্য সংঘে যোগদান করে বলেছিলেন, 'গণনাট্য আন্দোলনের বক্তব্য মানুষকে ভালবাসে। তার দুঃখ দুর্দশার সহমর্মী হয়। এ থেকেই গণনাট্য আন্দোলন জন্ম গ্রহণ করেছিল। ওই চেতনা থেকেই আমি যোগদান করেছিলাম।'

ঋত্বিক ঘটক রাজশাহী কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'জ্বালা', 'দলিল', 'সাঁকো', 'জ্বলন্ত', 'গ্যালিলিও', 'অফিসার' ইত্যাদি।

'জ্বালা' নাটকটি আত্মহত্যা ও জীবন যন্ত্রণা নিয়ে রচিত হয়েছে। পাঁচটি চরিত্রের আত্মহত্যা নাটকটিকে করুণরসাত্মক করে তুলছে। 'দলিল' নাটকে উদ্বাস্তু সমস্যা স্থান দেওয়া হয়েছে। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন, 'পদ্মার স্রোতের মতই বাস্তুচ্যুত বাঙালির ধারা চলেছে অলজ্ঘ্য পরিণতির দিকে। একদিকে রয়েছে চরম প্রতিকূল অবস্থা আর একদিকে চলেছে ঘটনা থেকে ঘটনার স্রোতের ঢেউয়ের মত ছাপিয়ে ছাপিয়ে।' দেশ ভাগের দুঃসংবাদে মানুষ বিচলিত হয়েছে, চরম দুর্ভোগ বরণ করতে হয়েছে তাদের। 'সাঁকো' নাটক দুই পর্বে লেখা। এক পর্বে আছে পশ্চিমবঙ্গের চিত্র, অন্য পর্বে

আছে পূর্ববঙ্গের ছবি। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার পটভূমিকায় এক অনবদ্য প্রেম কাহিনি নাটকে স্থান পেয়েছে। 'সেই মেয়ে' নাটকটি হাসপাতাল কেন্দ্র করে রূপলাভ করেছে। 'জ্বলন্ত' নাটকে চৈতন্যদেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষ্ণু প্রিয়ার স্বামী সান্নিধ্য থেকে বঞ্চনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'অফিসার' নাটকটি নিকোলাই গোগোলের কাহিনি অবলম্বনে লেখা। সরকারি কর্মচারী কীভাবে কাজে ফাঁকি দেয় তার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

তৃপ্তি মিত্র

তৃপ্তি মিত্র (১৯২৫-৮৯) আধুনিক নাট্য শিল্পে নট-নাট্যকার ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালিকা হিসেবে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। চারদশক ধরে তিনি বাংলা নাট্য জগতের সঙ্গে ছিলেন। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য প্রযোজনা নির্দেশনা ও রচনাতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একই সঙ্গে সমান দক্ষতায় তিনি হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তিতেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। নাট্য সংগঠনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

তৃপ্তি মিত্রের জন্ম বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলায়। তের বছর বয়সে কলকাতায় মামার বাড়িতে চলে যান। ১৯৪৩ সালে প্যারীচরণ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং সে সময় থেকেই তাঁর অভিনয় জীবনের শুরু হয়েছিল। মাসতুতো দাদা বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'আগুন' নাটকে গৃহবধূর ভূমিকায় অভিনয় করে সেই ১৯৪৩ সালেই দর্শকদের বিমুগ্ধ করেন। তিনি আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। খাজা আহমদ আব্বাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। খাজা আহমদ আব্বাস তাঁকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য মুম্বাই নিয়ে যান। সেখানে তাঁর শুরু হয় বর্ণাঢ্য অভিনয় জীবন। তিনি হিন্দি ও বাংলা উভয় ভাষার ছবিতে অভিনয়ে চরমোৎকর্ষ দেখান। শম্ভুমিত্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি নাটকেও অভিনয় করতে থাকেন এবং বিভিন্ন নাট্য সংস্থার সঙ্গে জড়িত হন। তিনি অসংখ্য নাটকে অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতিমান নাট্যশিল্পী হয়ে উঠেন।

চলচ্চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ে অপরিসীম খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'বলি', 'ইঁদুর', 'সুতরাং', 'প্রহর শেষে', 'কে?' 'বিদ্রোহিনী'। তাঁর একাঙ্ক নাটক হল : 'শতেক বরষ পরে।' তিনি কয়েকটি গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তিনি রাশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, ব্রিটেন ভ্রমণ করেছেন। তিনি নাট্য প্রতিভার জন্য পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে বহুরূপী নাট্য সংস্থা নবনাট্য আন্দোলনের মোড় পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল।

তৃপ্তি মিত্রের শেষ জীবন সুখের হয়নি। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, রোগযন্ত্রণা এবং নাট্যজগতের কিছু বন্ধুর অসহযোগিতায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। একরাশ দুঃখ আর অভিমান নিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

বাদল সরকার

পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন বাদল সরকার (১৯২৫)। তিনি পেশায় ছিলেন নগর পরিকল্পনা ও নির্মাণ কলাবিদ। নাট্য রচনায় তিনি বিশেষ পরিবর্তন আনয়ন ও উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বাকি ইতিহাস', 'পাগলাঘোড়া', 'ত্রিংশ শতাব্দী', 'মিছিল', 'ভোমা', 'সুখ পাঠ্য', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ইত্যাদি।

নাটকের ধারায় পাশ্চাত্য এ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন বাদল সরকার। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রথমে ফ্রান্সে এবং পরে ইউরোপ ও আমেরিকায় এক বিশেষ ধরনের নাটকের উদ্ভব ঘটে। সেগুলো ছিল বিষয় উপস্থাপনা সংলাপ ভাষা সমস্ত দিক থেকেই প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম। যুক্তি ও সংগতিহীনতা এই শ্রেণির নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই শ্রেণির নাটকে থাকে বিবর্ণ, নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতাবোধের জীবন চিত্র। এ্যাবসার্ড নাটকের এই বৈশিষ্ট্য ইন্দ্রজিৎ নাটকে যথাযথ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই নাটকেও আদি মধ্য অন্ত্যের সুসামঞ্জস্যতা নেই। সংলাপ ইঙ্গিত ধর্মী। নাটকের ভাষা হয়েছে সংলাপের একান্ত উপযোগী।

'বাকি ইতিহাস' একটি সার্থক মনস্তাত্ত্বিক নাটক। জটিল মনস্তত্ত্বের টানাপোড়েনে একটি সফল নাটক। খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি আত্মহত্যার কাহিনি অবলম্বন করে নাটকটি রচিত। আধুনিক যুগযন্ত্রণা নাটকটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য নাটকগুলোর মধ্যেও যুগযন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে। নবনাট্য ও গণনাট্য আন্দোলনে বাদল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত নাট্য প্রতিষ্ঠানের নাম 'শতাব্দী গ্রুপ থিয়েটার'।

রমেন লাহিড়ী

রমেন লাহিড়ী (১৯২৭-২০০৬) ছিলেন একাধারে নট, নাট্যকার ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালক। তিনি অনেকগুলো মৌলিক নাটক রচনা করেছিলেন, তার চেয়ে বেশি আছে অনুবাদ নাটক। মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র তাঁর নাটকে রূপলাভ করেছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'অপরাজিত', 'শততম রজনীর অভিনয়', 'চলমান জীবন', 'পরোয়ানা', 'ঢেউ', 'আরো গান চাই' ইত্যাদি।

তাঁর অনুবাদ নাটকগুলো হল : 'পান্থশালা', 'মরণখেলা', 'এলেম নতুন দেশে', 'রাজঘোটক' প্রভৃতি।

সমাজের সব চরিত্র ও তাদের ঘাত প্রতিঘাত রমেন লাহিড়ীর নাটকে সার্থকতা সহকারে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। শিক্ষক কন্যা জয়ন্তীর জীবন কাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে অপরাজিত। হৈমন্তী-ইন্দ্রজিৎ-শুভেন্দুকে নিয়ে গড়ে উঠেছে শততম রজনীর অভিনয়, পিতা নরেশ এবং পুত্র শংকরের আদর্শগত বিরোধ থেকে সৃষ্টি হয়েছে পরোয়ানা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অভিযান নিয়ে রচিত হয় 'সেতু।'

ধনঞ্জয় বেরাগী

ধনঞ্জয় বেরাগী (১৯২৭-৮৮) ছিলেন একজন কৃতি নাট্যকার। সমকালীন সমাজের চিত্র তাঁর নাটকে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। অভিনয় সফলতা তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'ধৃতরাষ্ট্র', 'রুপোলি চাঁদ', 'এক মুঠো আকাশ', 'এক পেয়ালা কফি', 'রজনীগন্ধা', 'আর হবে না দেরি' ইত্যাদি। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলো হল : 'অভিনয়', 'রঙের টেক্কা', 'ইস্কাপনের টেক্কা', 'আগন্তুক', 'বিচিত্র রূপিনী', 'পাকাদেখা', 'পরাজয়', 'এক পসলা বৃষ্টি', 'শহীদ', 'মানসী' ইত্যাদি।

'ধৃতরাষ্ট্র' নাটকে একটি পারিবারিক বিরোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বাড়ির কর্তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায় পুত্রেরা। পুত্রেরা পরস্পর বিরোধিতা করে একজনকে খুনী বলে। খুনী পুত্রকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য নাম হয় ধৃতরাষ্ট্র। 'রুপোলি চাঁদ' এক বস্তি জীবনের কাহিনি। দুই গ্যারেজ মালিকের বিরোধের ফলে বস্তিতে নেমে আসে বিপর্যয়। 'এক পেয়ালা কফি' নাটকে চলচ্চিত্র জগতের বিরোধের কথা বলা হয়েছে। রজনীগন্ধা নাটকে পারিবারিক দ্বন্দ্ব বিরোধের কথা বলা হয়েছে।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর একাঙ্ক নাটকগুলো নানান বিষয় নিয়ে লেখা।

উৎপল দত্ত

উৎপল দত্ত (১৯২৯-৯৩) ছিলেন নাট্য জগতের বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন নট, নাট্যকার, সংগঠক ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালক, সেই সঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য জগতের সঙ্গে তাঁর সুনিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু ছিল পুঁজিপতি কর্তৃক শোষিত মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষের কাহিনি। শেকস্‌পিয়রের নাটকগুলো তিনি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছিলেন। মানবমনের অবচেতন গহ্বরের অন্ধকার দিকগুলো তিনি তাঁর নাটকে শিল্প সম্মত ভাবে রূপ দিয়েছিলেন।

উৎপল দত্ত বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। জীবনের গোড়া থেকেই তিনি নাটকের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে তিনি দি শেকস্‌পিরিয়ন দল গঠন করেন। তিনি গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং সে কারণে কিছুদিন জেল খেটেছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'ছায়ানট', 'অঙ্গার', 'ফেরারি ফৌজ', 'রাতের অতিথি', 'কল্লোল', 'মানুষের অধিকার', 'টিনের তলোয়ার', 'ব্যারিকেড', 'রাইফেল', 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'মহাবিদ্রোহ', 'টোটা', 'দাঁড়াও পথিকবর', 'বেইমানী', 'চাঁদির কৌটো', 'ঘুম নেই', 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'মে দিবস', 'দ্বীপ', 'ইতিহাসের কাঠগড়ায়', 'কংসের কারাগারে', 'মৃত্যুর অতীত', 'সভ্য নামিক', 'ঠিকানা', 'ক্রুশবিদ্ধ কুবা', 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'নীলরক্ত' ইত্যাদি। তিনি কয়েকটি যাত্রা

পালা রচনা করেছিলেন। তার কয়েকটি হল : 'দিল্লি চল', 'মাও সে তুং', 'ভুলি নাই প্রিয়া', 'অরণ্য জাগছে', 'সমুদ্র শাসন' প্রভৃতি। তিনি কিছু নাট্যবিষয়ক আলোচনা গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

'ছায়ানট' তাঁর প্রথম নাটক। এই নাটকে চলচ্চিত্র জগতের মানুষের বাইরের চাকচিক্য সেই সঙ্গে ভেতরের দুঃখ, বঞ্চনা, ছলনা, সংগ্রামের চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। অঙ্গার নাটকে কয়লা খনির শ্রমিকদের দুঃসহ জীবন যাত্রার ছবি অঙ্কিত হয়েছে। শ্রমিকদের সংগ্রামময় জীবন, মালিকদের নির্মম শোষণ ও অত্যাচার এবং শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও বিক্ষোভ নাটকটির উপজীব্য। 'টিনের তলোয়ার' ব্যঙ্গাত্মক ও রূপক নাটক। 'কল্লোল' নাটকে নৌ বিদ্রোহের রাজনৈতিক আন্দোলন রূপ লাভ করেছে।

উৎপল দত্তের নাটক ফ্যাসিবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছে সাধারণ মানুষকে। তাঁর নাটকগুলো পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু। তাঁর নাটক সমাজের মুকুর বলে বিবেচিত হয়েছে।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-৮৩) একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ছাত্র জীবন থেকে তিনি নাটকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তাঁর বামপন্থী জীবনাদর্শ নাটকে প্রতিফলিত করেছেন।

তাঁর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার জয়পুরে। তিনি কলকাতার মনীন্দ্র কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি এ পাশ করেন। কলেজে থাকা কালীন তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তিনি নাটকের প্রতি আকর্ষণবোধ করে গণনাট্যসঙ্ঘে যোগদান করেন। পরে তিনি নান্দীকার নাট্য গোষ্ঠী গঠন করেন। এটি পরে নান্দীমুখে রূপান্তরিত হয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'তিন পয়সার পালা', 'সেতু বন্ধন', 'বিদ্রোহী', 'প্রস্তাব', 'চার অধ্যায়', 'সওদাগরের নৌকা', 'পাপপুণ্য', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'শের আফগান', 'যখন একা' ইত্যাদি। তাঁর অনেক নাটক অনুবাদমূলক। অনেক নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল। নট, নাট্যকার ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালক হিসেবে তিনি ছিলেন একজন সফলকাম শিল্পী।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪) বৈচিত্র্যময় নাট্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সমকালীন জীবন-অনুভূতি, যুগের সংকটের চিত্র নাটকীয় ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর নাটকে। তিনি বেশ কিছু এ্যাবসার্ড নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য

নাটকগুলো হল : 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'নীলরক্তের ঘোড়া', 'মৃত্যু সংবাদ', 'গন্ধরাজের হাততালি', 'মেটামরফসিস', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', 'দ্বীপের রাজা', 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ', 'নিষাধ', 'পুষ্পক রথ', 'উইল', 'শেকস্‌পীয়র', 'বাঘবন্দি', 'ক্যাপ্টেন হুররা', 'রাজরক্ত', 'মৃচ্ছকটিক', 'মহাকালীর বাচ্চা', 'স্বদেশি নকশা', 'গ্যালিলিওর জীবন', 'কানামাছি খেলা', 'ভূত', 'আলিবাবা', 'তোতারাম', 'সোক্রেতেস', 'নোনাজল', 'বসন', 'সুন্দর', 'শমীবৃক্ষ', 'তখন বিকেল', 'গুহাচিত্র', 'গজানন চরিত মানস', 'মুষ্ঠিযোগ', 'জন্মদিন', 'অকটোপাশ লিমিটেড', 'কাল বা পরশু', 'বিপন্ন বিস্ময়', 'হারুন রশিদ', 'তুষাগ্নি', 'জাম্বো', 'মিস্টার রাইট', 'মিসেস সেরিয়ানো', 'ঘুম' ইত্যাদি। তিনি ছোটদের জন্য কিছু নাটক লিখেছিলেন। সেগুলো হল : 'রিল', 'বাইরের দরজা', 'বৃত্ত', 'বাজপাখি', 'সোনার চাবি', 'লাঠি', 'মাছি', 'ফিনিক্স', 'রাক্ষস', 'জুতো' ইত্যাদি। তাঁর কিছু অনুবাদ নাটকও রয়েছে।

মনোজ মিত্র

মনোজ মিত্র (১৯৩৮) বৈচিত্র্যধর্মী নাট্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর আছে কিছু পূর্ণাঙ্গ নাটক আর কিছু একাঙ্ক নাটক। তাঁর নাটকে সমাজের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিয়ে অনেকগুলো ব্যঙ্গ নাটক রচনা করেছেন। ছোটদের জন্যও তাঁর কিছু নাটক রয়েছে। মনোজ মিত্র বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া করেন কলকাতায়। ১৯৬৯ সালে রানিগঞ্জ কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল : 'চাকভাঙা মধু', 'নেকড়ে', 'শিবের অসাধ্যি', 'পরবাস', 'কেনারাম বেচারাম', 'নরক গুলজার', 'সাজানো বাগান', 'মেষ ও রাক্ষস', 'রাজদর্শন', 'নৈশভোজ', 'কিনু কাহারে থিয়েটার', 'অলকনন্দার পুত্র কন্যা', 'দম্পতি', 'আত্মগোপন', 'অপারেশন ভোমরাগড়', 'রঙের হাট', 'যা নেই ভারতে' ইত্যাদি। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলো হল : 'মৃত্যুর চোখে জল', 'পাখি', 'তক্ষক', 'কালবিহঙ্গ', 'টাপুর টুপুর', 'আমি বদন বলছি', 'বাবুদের ডালপুকুরে', 'তেঁতুল গাছ', 'সত্যিভূতের গল্প', 'কাকচরিত্র', 'পাকে বিপাকে', 'আঁখি পল্লব', 'টু-ইন-ওয়ান', 'রূপের আড়ালে', 'নিউ রয়্যাল কিসসা', 'দন্তরঙ্গ', 'স্মৃতি সুধা', 'বৃষ্টির ছায়াছবি' ইত্যাদি। ছোটদের জন্য তিনি কিছু নাটকও লিখেছেন। সমাজ জীবনের সার্থক প্রতিফলনের জন্য তাঁর নাটক রঙ্গমঞ্চে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

কাব্য সাহিত্য

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে কাব্য বা কবিতার স্থান বিশেষ সবিশেষ গৌরবান্বিত—উৎকর্ষে সমুজ্জ্বল, গৌরবে অনন্য এবং গতিশীলতায় সর্বাগ্রগামী। সাহিত্যের অন্যান্য যে কোনো শাখার তুলনায় তার অগ্রগতি যা-ই হোকনা কেন সমৃদ্ধিতে তা অগ্রগণ্য, পরিচিতিতে ব্যতিক্রমধর্মী, স্বপরিচয়ে তা অত্যুজ্জ্বল। বাংলা কবিতাই পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্যের অগ্রগতির নিশান বাহক।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সর্বশেষ অধ্যায়টি সব শাখাতে রবীন্দ্র প্রতিভায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অত্যুজ্জ্বল প্রতিভায় কবিতায় যে উৎকর্ষ দান করেছিলেন তা সমকালে কারো পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। তবে তাঁর পাশাপাশি কিছু উজ্জ্বলতা দেখানো কারো পক্ষে দেখানো যে সম্ভব হয়নি তার পরিচয়ও উপেক্ষা করা যায়নি। তিরিশের কবিতায় নতুনত্ব দেখা দিয়েছিল। কল্লোল যুগেও অভিনবত্বের অভাব ছিল না। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষের পথটি দ্যুতিময় ছিল। সেজন্য ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য নানা দিক মিলিয়ে এক করে একটি যুগ বা অধ্যায়ের রূপলাভ করে।

এখানে অতীত যেমন গৌরবান্বিত অতীত, তেমনি সম্ভাবনাময় উজ্জ্বলতা। সাত চল্লিশের আগে যে সম্ভাবনা নবরূপ লাভ করেছিল তা দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নানা আনুকূল্যে আরও বেশি সম্ভবনাময় হয়ে উঠেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের কবিতা এক গৌরবময় অগ্রগতির নিদর্শন।

পশ্চিমবঙ্গের কবিতায় আধুনিকতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। পাশ্চত্যের সঙ্গে তার যোগোযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। বিদেশি সাহিত্যের সংশ্রব ঘনিষ্টতর হয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতা তার চূড়ান্ত রূপে উন্নীত হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও তার আঙ্গিক উভয়েরই উৎকর্ষ ঘটেছে এ সময়ে। বিষয়ে এসেছে নানা বৈচিত্র্য। দেশের স্বাধীনতা, এর অব্যবহিত আগের যুদ্ধ, মহামারী, মন্বন্তর সব মিলিয়ে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেছিল, দেশ বিভাগের ভালমন্দ প্রভাব জাতিকে আশ্বান্বিত করেছিল, তেমনি বিপর্যস্তও করেছিল। নতুন সমাজ গঠিত হয়ে নতুন চেতনা গড়ে উঠেছিল। নতুন অর্থনৈতিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, গড়ে উঠে নতুন সমাজ কাঠামো। ধর্মনৈতিক সমাজ কাঠামো রূপ নেয়। ফলে সমাজের নানা প্রতিফলন বিষয় হিসেবে কবিতায় প্রতিফলিত হতে থাকে। এভাবে নানা বিষয় সমাজের নানাদিক—মানুষের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা কবিতায় স্থান গ্রহণ করেছে। শ্রমিক সংগ্রাম কাব্যে স্থান পেয়েছে।

কবিতায় যেমন নানান বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে তেমনি পরিবর্তন ঘটেছে আঙ্গিকের ছন্দের অলঙ্কারের। নতুন যুগের ছন্দ অলঙ্কার ও রূপকল্প এ আমলে প্রত্যক্ষ করা গেছে। আধুনিক যুগের এই পশ্চিমবঙ্গে কবিতা এক নতুন সাহিত্যের পরিচয় দিয়েছে। তা নানা বর্ণে উজ্জ্বল এবং সমৃদ্ধময়।

অমিয় চক্রবর্তী

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৬) আধুনিক কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল ও দ্বিধাবিভক্ত কবিমানসের অধিকারী। 'খসড়া', 'এক মুঠো', 'মাটির দেয়াল', 'অভিজ্ঞান বসন্ত', 'পারাপার', 'পালাবদল', 'ঘরে ফেরার দিন', 'কবিতাবলী', 'উপহার', 'দূরযানী', 'হারানো অর্কিড', 'পুষ্পিত ইমেজ', 'অমরাবতী', 'অনিঃশেষ' ইত্যাদি তাঁর কাব্য।

'এই ধ্যানগম্ভীর 'সঙ্গতির' কবির প্রশান্তির অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক দ্বন্দ্বজর্জর আধুনিক মানস—এক অনিকেত ছিন্নমূল সত্তা—সমন্বয় যার কাম্য কিন্তু আজও অপ্রাপনীয়, যার অনুভূতি মৃন্ময়ী বাড়ি ও গোলক চাঁপার তলার জন্য আকুল, আবার যার আন্তর্জাতিক চেতনা বিদেশের পথে ঘাটে স্বজন খুঁজে বেড়ায়—এক কথায় দুই পৃথিবী হারিয়ে যে কেবল তাদের মধ্যে পারাপার করে চলে সেতুবন্ধনের দুর্মর আশায়।' অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন, 'বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যাঁর রচনায় নারী তার শরীর নিয়ে কখনোই প্রবেশ করে নি।'

দৃষ্টির জগৎ ও ধ্যানের জগতের বিরোধ তাঁর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। তিনি বিজ্ঞান চেতনারও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শব্দভাণ্ডার ছিল ক্রমবর্ধমান। কবির মাধুর্যমণ্ডিত সহজ কবিতার একটি নিদর্শন :

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনি কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জ্বলে রাতে,
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে জলের আঘাতে।
দুঃখের আবর্তে নৌকা ডোবে, ঝড় নামে
নূতন প্রাণের বার্তা জাগে গ্রামে গ্রামে।
নীলান্ত আকাশে শেষ পাইনি কখনো
আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে মামার বাড়িতে অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। অক্সফোর্ড থেকে ডি-লিট ডিগ্রি অর্জন করেন। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সচিব ছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০) বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি। বিশ শতকের ত্রিশ দশকে যে কজন কবি বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব কাটিয়ে আধুনিকতার সূচনা ঘটান তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন। তাঁকে বাংলা কবিতার ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক বলা হয়।

তিনি কলকাতার হাতিবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে কাশীতে। তিনি স্কটিস চার্চ কলেজ থেকে ১৯২২ সালে স্নাতক হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য ও আইন বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত যথারীতি পড়াশোনা চালিয়ে গেলেও কোনো বিষয়েই পরীক্ষা দেন নি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর পিতার ল ফার্মে কিছুদিন শিক্ষা নবিস হিসেবে থাকার পর কর্ম জীবন শুরু করেন লাইট অব এশিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে। তিনি ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। তিনি ১৯৩১ সালে 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন এবং বার বছর ধরে সম্পাদকের পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরে স্টেটসম্যান ও লিটারেরারি কাগজে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৯ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থ ছয়টি। সেগুলো হল : তন্বী (১৯৩০), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫৩), দশমী (১৯৫৬)। তাঁর দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে—স্বগত (১৯৩৮), কুলায় ও কালপুরুষ (১৯৫৭)।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কবিতায় অতি আধুনিকতার ধারা প্রবর্তনে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ মন্তব্য করেছেন, 'আধুনিক বাংলা কাব্যের সবচেয়ে বেশি নিরাশাকবোজ্জ্বল চেতনা। সর্বব্যাপী নাস্তিকতা, দার্শনিক চিন্তা, সামাজিক হতাশা এবং তীব্র বুদ্ধিবাদ তাঁর কবিতার ভিত্তি ভূমি।' ত্রিশের অন্যান্য কবি অবিশ্বাসী হলেও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঈশ্বরকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর কবিতা সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দ মন্তব্য করেছেন, 'প্রসঙ্গ, প্রকরণ ও বিন্যাস যার কথাই ভাবি না কেন, নব নব গন্তব্যে পৌঁছানোর উচ্চাশা কবির নেই। নেই রবীন্দ্রিক শতবিচিত্রিতা, একই কথা প্রায় একই ভঙ্গিতে তিনি বিভিন্ন কাব্য কোরাসে বলেছেন। একই কথা কিন্তু দ্বিতীয় রহিত। অর্থাৎ সহজীবী কবিদের থেকে একেবারে আলাদা। তাঁর প্রকাশরীতি ও অভিজ্ঞতার পরিধি ছোট ছোট কিন্তু গভীর, আর নিখুঁত নিটোল, নিজস্ব ও সমস্ত সুন্দর।'

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কাব্যরচনার মাধ্যমে পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও ঔৎসুক্য কাব্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তিনি জীবনের ফুটোফাটা জোড়াতালি বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন করে মহাকালে পৌঁছে জীবনের তাৎপর্য খুঁজেছেন। তাঁর কবিতায় মনন ও আবেগের সমন্বয় ঘটেছে। জীবনদর্শনেও তাঁর বিশিষ্টতা আছে। 'রূঢ় বাস্তব থেকে তিনি কোনদিন পলায়ন করেন নি, যুগের ট্র্যাজেডির ঘোর ঘনঘটায় ব্যক্তি মানুষের মর্মান্তিক বেদনা তার প্রকরণের সাহায্যে ফুটে উঠেছে। সুধীন্দ্রনাথ বিখ্যাত 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে স্বতন্ত্র লেখকগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে জীবন-জিজ্ঞাসার এক অনন্য—প্রায় অনুসরণীয় মান অর্জন করেছিল। তিনি ছিলেন পরিশ্রমী কবি। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যা জেনেছিলেন তার সঙ্গে সমকালীন প্রতীচ্য কবিতা-লোক

থেকে সমর্থন নিয়ে আপন কাব্যধারণা গড়ে তুলেছিলেন। ড. দীপ্তি ত্রিপাঠীর মতে, 'সুধীন্দ্রনাথের কাব্য যেন ভ্রষ্ট আদমের অর্তনাদ। তিনি স্বর্গচ্যুত কিন্তু মর্ত্যে অবিশ্বাসী। তাঁর মধ্যে বিজ্ঞতা আছে কিন্তু শান্তি নেই, যুক্তি আছে কিন্তু মুক্তি নেই। তাঁর কাব্য কোন আশ্বাসের আশ্রয়ে আমাদের পৌঁছে দেয় না। সুধীন্দ্রনাথের নঞর্থক ও পরে ক্ষণবাদী জীবনদর্শন আমাদের ধর্মপুষ্ট বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। এমনকি আধুনিক কাব্যের অনেকগুলো লক্ষণ যদিচ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান তথাপি এই দর্শন-বৈশিষ্ট্যে তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যেও স্বতন্ত্র। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠকালে মনে হয়, কবি যেন এক নিঃসঙ্গ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আধুনিক জীবনের নিঃসীম শূন্যতা-নৈরাশ্য ভারাতুর নয়নে অবলোকন করেছেন।' বুদ্ধদেব বসুর মতে 'সুধীন দত্ত তাঁর কবিতাকে গদ্যের মত নিয়মানুগত্য দিতে চেয়েছিলেন।'

জীবন সম্বন্ধে সংশয় থাকলেও জীবনকে তিনি স্বাদহীন মনে করেন নি :

এই নিষ্ঠুর অপচয়,
এর পাছে আছে আছে অভিপ্রায়,
আছে কি আকুতি?
হেথা যারা পরাজিত বৈকুণ্ঠে তাদের হবে জয়?
হায় ক্ষেমঙ্কর,
অজস্র মঙ্গল তব পারিবে কি করিতে সুন্দর
অবরুদ্ধ যৌবনের জীবন্ত মৃত্যুরে?

সুধীন দত্তের 'প্রতিধ্বনি' কাব্য তাঁর অনুবাদ কবিতার সংকলন। 'স্বগত', 'কুলায় ও কালপুরুষ' তাঁর গদ্যগ্রন্থ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮) আধুনিক জীবন কাব্যে রূপায়িত করেছেন। 'প্রথমা', 'সম্রাট', 'ফেরারি ফৌজ', 'সাগর থেকে ফেরা', 'হরিণ চিতা চিল', 'কখন মেঘ' ইত্যাদি কাব্য গ্রন্থে তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় বিদ্যমান। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতা ও কথাসাহিত্যে সব্যসাচী ছিলেন। তিনি আধুনিক কবিতার অন্যতম পথনির্মাতা ছিলেন, কিন্তু পরে গোত্র-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁকে আবেগধর্মী কবি বলে বিবেচনা করা হয়। অথচ আবেগকে সংযত নিয়ন্ত্রিত প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারার সামর্থ্যেই তাঁর শিল্পধর্মের সফলতা প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক জীবনের অস্থিরতাকে তিনি কাব্যরূপ দান করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, 'আপন যুগের বাণীহারা অমূর্ত যন্ত্রণাকে তিনি নিজের চেতনায় নিরন্তর বয়ে ফিরেছেন।' প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা ব্যক্তিগত জীবনাচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তাঁর কবিতায় আপন পরিবেশ-পরিপার্শ্বজ ব্যাপক জীবনের পরিমণ্ডলে স্পন্দিত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনের রহস্যসন্ধানী—তাঁর এই প্রচেষ্টার স্বাতন্ত্র্যেই তিনি নতুন যুগের এক প্রতিনিধি কণ্ঠ,

কেবল ভাবানুভবের নিবিষ্টতায় নয়, রূপনির্মিতির স্বতঃস্ফূর্তির বশেও। তাঁর কবিতার নমুনা :

ওরা অন্ধকার বেচে।
বিক্রী হয় অন্ধকার
প্রকাশ্য ও গোপন বাজারে
নানা মোড়কে মোড়া রঙীন লোভন,
কত না লেবেল-এ।

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। 'বন্দীর বন্দনা', 'পৃথিবীর পথে', 'কঙ্কাবতী', 'দময়ন্তী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি', 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর', 'যে-আঁধার আলোর অধিক', 'মর্মবাণী', 'মরচে পড়া পেরেকের গান', 'একদিন চিরদিন', 'স্বাগত বিদায়' ইত্যাদি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। কবির 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যের বলিষ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠা, ভাবনা ও প্রকাশের অভিনব রূপান্তর, শব্দচয়নের উদ্ভাবনী প্রতিভা দেখে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রশস্তি লিখেছেন—'এই রচনাগুলো জলভরা ঘন মেঘের মত যার ভিতর থেকে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত।'

কবি বুদ্ধদেব বসুর মনের ধর্ম প্রেম। তিনি প্রেমের কবি। এজন্য তাঁর অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ প্রধানত প্রেমের কাব্য। কিন্তু এ প্রেম রোমান্টিক প্রেম নয়। প্রেমকে রোমান্টিক কবিদের মত অতীন্দ্রিয়, অমূর্তভাবে তিনি দেখেন নি, দেখেছেন মূর্ত, শরীরী রূপে। প্রেমের দেহী রূপ মর্মে মর্মে অনুভব করলেও একান্ত দেহবাদেই কবি নিমজ্জিত হতে চান নি। কবি কামনার কারাগার থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল। কারণ কবি মনে করেন শুধু কামনার পরিতৃপ্তিতেই মনুষ্যত্বের চরম প্রকাশ ঘটে না।

আধুনিক নারী প্রেমের শোষণ রূপ সম্পর্কে সচেতন বলে কবি 'মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান' কবিতায় উচ্চারণ করেছেন :

'চেয়েছিলে প্রতি রাত্রে শয্যার সঙ্গিনী,
প্রত্যহ পরিচারিকা,
সন্তানের মাতা তব, নিপুণা গৃহিণী।
প্রিয়াকে পেতে না আর।
প্রেমের সমাধি হত অগোচরে মোদের দোঁহার,
হাজার প্রয়োজনের পুঞ্জিত জঞ্জালে
হয়ে পথ-হারা
লুপ্ত হত ক্ষীণ প্রেম-ধারা।

বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২) কলকাতার পটলডাঙার বিখ্যাত শ্যামাচরণ দে বিশ্বাসের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু দের পিতা অবিনাশ চন্দ্র দে ছিলেন একজন অ্যাটর্নি। বিষ্ণু দে কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউট এবং সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেন। ১৯২৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর বঙ্গবাসী কলেজে আই এ পড়তে যান। তিনি সাম্মানিক ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক হন সেন্ট পল্স কলেজ থেকে। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৪ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি রিপন কলেজে যোগদান করেন। এরপর তিনি ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত মৌলানা আজাদ কলেজে পড়ান। পরবর্তীতে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজেও পড়িয়েছিলেন।

১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে যে সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল কবি বিষ্ণু দে তার একজন দিশারী। ১৯৩০ সালে কল্লোলের প্রকাশনা বন্ধ হলে তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' পত্রিকায় যোগদান করেন এবং সেখানে একজন সম্পাদক হিসাবে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় তিনি 'সাহিত্যপত্র' প্রকাশ করেন। তিনি 'নিরুক্তা' নামের একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন।

তিনি 'উর্বশী ও আর্টেমিস', 'চোরাবালি', 'পূর্বমেঘ', 'সন্দ্বীপের চর', 'অন্বিষ্ট', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', 'সাত ভাই চম্পা', 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ', 'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ', 'সেই অন্ধকার চাই', 'ইতিহাসের ট্র্যাজিক উল্লাসে', 'রবিকরোজ্জ্বল নিজদেশে', 'দিবানিশা', 'চিত্ররূপমত্ত পৃথিবীর', 'উত্তরে থাকো মৌন', 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তিনি সমাজ সচেতন কবি এবং চিন্তায় মার্কসপন্থী। তাঁর বহু কবিতায় রাজনৈতিক মতের এবং তির্যক ব্যঙ্গদৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে। বিষ্ণু দে আধুনিক কাব্যের ক্লান্তি, জিজ্ঞাসা, সংশয়, বিতৃষ্ণা, নৈরাশ্য ও নির্বেদের বিশৃঙ্খল বাষ্পপুঞ্জ থেকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্বাসের ধ্রুবলোক। তিনি আধুনিক কাব্যজগতের প্রথম অস্তিবাদী কবি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, হাঁ-ধর্মী; যদিও সে হাঁ-ধর্মের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আধুনিক এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ থেকে উৎসারিত অস্তিবাদ থেকে তার মৌল পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিষ্ণু দের অন্বিষ্ট একক সাধনার পথে মেলে না—মেলে সচেতন সামাজিক সমবায়ের পথে। যন্ত্রের শৃঙ্খলে বন্দী মানবের অসহায়তা এবং অপরাজেয় মানবাত্মার নভোবিহার এ দুটি চিত্র পাশাপাশি রেখে বিষ্ণু দে আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথের যুগের দুস্তর ব্যবধান বৈপরীত্যের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যে তিরিশের কবিগণ যে নতুনত্ব এনেছিলেন তাঁদের কাব্যধারায় বিষ্ণু দের মধ্যেই প্রথম রাবীন্দ্রিক কাব্য বলয় অতিক্রমণের সার্থক প্রয়াসলক্ষ করা গিয়েছিল। তিনি মার্কসীয় তত্ত্বকে জীবনাবেগ ও শিল্পসম্মত করে অপরিসীম সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন 'পরিচয় গোষ্ঠীর' অনন্য সৃজনশীল শিল্পী। তিনি প্রাচ্যবিদ্যা-সংস্কৃতির প্রগাঢ় অধিকার অর্জন করেও প্রতীচ্য সৃজন-মননের গহনে

প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। বিষ্ণু দে ছিলেন স্বভাবতই লিরিক্যাল কবিধর্মের অধিকারী। তবে তাঁর প্রতিভায় ছিল তীক্ষ্ণধার শিল্পসচেতনতা। ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'বিষ্ণু বাবুর কবিপ্রকৃতি বিদ্যার বন্ধুর পথবাহী বুদ্ধিরই অনুসরণ করিয়াছে।'

বিষ্ণু দে-র কবিতার কিছুটা নমুনা :

চেয়েছি অনেকদিন
আজো তাঁকে খুঁজি সারাক্ষণ
কখনো বা পাশ দিয়ে কখনো আড়ালে
কখনো বা দেশান্তরে কখনো বা চোখাচোখি
কখনো বা ডাকে কানে কানে কাছাকাছি
নিশ্বাসের তাপে একান্ত আপন ছন্দময়
বুঝিবা অলক তাঁর কাঁপে আমার কপালে
কখনো হাওয়ায় লাগে হাওয়া
তবু তাকে পাওয়া আজো হল না নিঃশেষ।

তিনি বামপন্থী দর্শন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এছাড়া কবি টি এস এলিয়টের কায়দা এবং ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি 'ছড়ানো এই জীবন' নামে একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন।

অরুণ মিত্র

অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০) ছিলেন পরিশুদ্ধ মানবতার কবি। মানবমুক্তির নিরলস চেষ্টা তাঁর কাব্যে রূপলাভ করেছে। তাঁর কবিতার বিষয় ছিল পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ ও অত্যাচার এবং সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়াস। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, নগর জীবনের হতাশা ইত্যাদি।

অরুণ মিত্রের জন্ম বাংলাদেশের যশোরে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে দেশত্যাগ করেন। কলকাতায় শিক্ষা গ্রহণ এবং প্যারিস থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। অবসর নিয়ে কলকাতার আনন্দ বাজার পত্রিকায় কাজ করেছিলেন।

তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের তালিকা : প্রান্তরেখা (১৯৪৩), উৎসের দিকে (১৯৫৪), ঘনিষ্ঠ তাপ (১৯৬৩), মঞ্চের বাইরে মাটিতে (১৯৭০), শুধু রাতের শব্দ নয় (১৯৭৮), প্রথম পলি শেষ পাথর (১৯৮১), খুঁজতে খুঁজতে এতদূর (১৯৮৬), যদিও আগুন ঝড় ধ্বসা ভাঙা (১৯৮৮), এই অমৃত এই গরল (১৯৯১), টুপি কথার ঘেরাও থেকে বলছি (১৯৯২), খরা-উর্বরায় চিহ্ন দিয়ে চলি (১৯৯৪), অন্ধকার যতক্ষণ জেগে থাকে (১৯৯৬), ওড়া উড়িতে কাজ নেই (১৯৯৭), ভাঙনের মাটি (১৯৯৮), উচ্ছন্ন পৃথিবীর সুখ দুঃখ (১৯৯১) ইত্যাদি।

দেশের প্রতি মমত্ববোধ অরুণ মিত্রের কবিতার বৈশিষ্ট্য। বিদ্রোহের চেতনা তাঁর লেখার পেছনে কাজ করেছে। 'শান্তির শিশির মুক্তা ঝলমলে এক পৃথিবীর স্বপ্ন তিনি দেখেছেন যেখানে মানুষের উচ্ছল বেঁচে থাকার স্রোতে উচ্ছ্বাসের সমস্ত আলো জ্বলে ওঠে। পৃথিবী, ধুলো, নদী, ফসল, ধানশিষ, অশ্বারোহী সেনা ইত্যাদি অজস্র মুখ দেখতে দেখতে একসময় বিভোর হয়ে যান। সেই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সঙ্গে যোগস্থাপনে আগ্রহী অরুণ মিত্রের চারপাশে ক্রমে ঘনিয়ে আসে ধুলো-মাটির গান।' একজন নিষ্ঠাবান মার্কসবাদী হিসেবে তিনি তাঁর সমগ্র কবি জীবনে স্বতন্ত্র পরিচয় রেখে গেছেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কবিতায় দুর্বোধ্যতার প্রভাব থেকে নিজেকে সরিয়ে সহজ সরল ভাষায় কাব্যরচনা করেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-৬৯)। আধুনিক জীবন রহস্যকে তিনি প্রকাশ করেছেন ভাষার সারল্যে।

তাঁর প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থগুলো হল : সাগর ও অন্যান্য কবিতা (১৯৩৫), পৃথিবী (১৯৩৯), সংকলিতা (১৯৪২), নতুন দিনের কাহিনি (১৯৪৭), প্রাচীন প্রাচী (১৯৪৮), যৌবনোত্তর (১৯৪৮), স্বনির্বাচিত কবিতা (১৯৫৮), সবিতা (১৯৫৮), উত্তর পঞ্চাশ (১৯৬৩), উর্বর উর্বশী (১৯৬৫), সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা (১৯৭৬) ইত্যাদি।

বাংলা কবিতায় দুর্বোধ্যতা লক্ষ করে কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য কাব্য রচনায় ভাষার সহজ সরল পথটি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ফ্যাসীবাদীদের অমানবিকতা, অতিরিক্ত যান্ত্রিকতায় মানবিক অপচয় দেখে পীড়িত হয়েছিলেন। খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তিনি বলেছেন,

> ঘামের দামে আমরা পেয়েছি
> অজস্র সবুজ শস্য
> অফুরন্ত সূর্যময় কয়লা
> আর শক্তিময় শ্বেত ইস্পাত
> জীর্ণ পৃথিবীর দেহ কুঁদে
> ঘর্মাক্ত শিল্পীর হাতুড়ি
> তৈরি করে পৃথিবীর
> নূতন প্রতিমা।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

বিমলচন্দ্র ঘোষের (১৯১০-৮১) কবিতায় শোষিত মানুষের যন্ত্রণা ও আর্তনাদ প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রম ধর্মী কবি।

বিমলচন্দ্র ঘোষের জন্ম কলকাতায়। ১৯২৯ সালে ম্যাট্রিক পাশের পর বিজ্ঞান নিয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে গান্ধিজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। পরে তিনি ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের

সভ্য হন। প্রথম জীবনে আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং পরে তিনি বস্তুবাদী ভাবনায় আকৃষ্ট হন। তিনি ভারতবাসীর মুক্তির সাধনায় নিজেকে জড়িত করেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলো হল : জীবন ও রাত্রি (১৯৩৩), দক্ষিণায়ন (১৯৩১), উলুখড় (১৯৪৩), দ্বিপ্রহর ও অন্যন্য কবিতা (১৯৪৫), ফতোয়া (১৯৪৮), নানকিং (১৯৪৮), সাবিত্রী (১৯৫১), সপ্তকাণ্ড রামায়ণ (১৯৫১), ভুখা ভারত (১৯৫১) উদাত্ত ভারত (১৯৫৬), রক্ত গোলাপ (১৯৫৮), বিমলচন্দ্র ঘোষের কয়েকটি কবিতা (১৯৫৯), কলকাতা (১৯৭৬), উত্তরাকাশের তারা (১৯৬৭) ইত্যাদি।

কবির অনেকগুলো কাব্যে দেশপ্রেম ও জনচেতনা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। তৎকালীন আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে তাঁর কবিতায়। দেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য তিনি তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ফুটিয়ে তুলেছিলেন। নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব ছিল না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র (১৯১১-৭৭) একজন সাম্যবাদী কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর কবিতায় তথাকথিত নাগরিক মধ্যবিত্তের সমালোচনা আছে। সঙ্গীতশিল্পী হিসেবেও তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

বাংলাদেশের পাবনায় কবির জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স ডিগ্রি নেওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে এম এ পড়েন।

তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'মধুবংশীর গলি' (১৯৪৪)। সমাজের সংকটের ছায়া তার কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া দেশের মন্বন্তর ও মহামারীর কথা তাতে বলা হয়েছে। কবির অপর কাব্যগ্রন্থ 'রাজধানী ও মধুমতীর গলি' (১৯৭১)। এ কাব্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভিয়েতনামের যুদ্ধের কথা বলেছেন। 'যে পথেই যাও' (১৯৭৩) কাব্য সংকলনে দিল্লি জীবনের অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। সমকালীন পরিস্থিতি নিয়ে লিখেছেন,

> স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির
> উলটা দিনের জীব,
> অবহেলায় আর প্রবঞ্চনায় পুষ্ট
> নিষ্প্রভ শরীরটাকে নিয়ে এগিয়ে চলে
> শামুকের মত।

দিনেশ দাস

দিনেশ দাসের (১৯১৩-৮৫) কবিতায় সমকালীন সংকট রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। মানুষের সংগ্রামের কথা, মানুষের সমস্যার কথা অনিবার্য ভাবে এসেছে তাঁর কবিতায়। মানুষের প্রতি মমত্ববোধ তাঁকে বিদ্রোহে সচেতন করে তুলেছিল। দেশবিভাগে তিনি বেদনাহত হয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় তার স্বাক্ষর রয়েছে।

দিনেশ দাসের জন্ম কলকাতায়। বি এ পাশ করে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন শিক্ষকতাকে। সেই সঙ্গে তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থগুলো হল : কবিতা (১৯৪২), ভুখামিছিল (১৯৪৪), দিনেশ দাসের কবিতা (১৯৫১), অহল্যা (১৯৫৪), কাঁচের মানুষ (১৯৬৪), অসংগতি (১৯৭১), রাম গেছে বনবাসে (১৯৮১) ইত্যাদি।

'কাস্তে' কবিতা লিখে দিনেশ দাস প্রচুর খ্যাতি লাভ করছিলেন। তাঁর কবিতায় সংগ্রাম ও মানবতাবাদের কথা বলা হয়েছে। কবি মার্কস বাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে রাজনীতির সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠেছিল। শানিত ক্রোধ এবং বিদ্রূপ যেমন আছে তাঁর কবিতার শরীরে— তেমনি আছে উপলব্ধির গভীরতা। শব্দের তলোয়ার হয়ে ঝলসে উঠেছে কাস্তে।—এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে। প্রকৃতিপ্রেম দিনেশকে মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মানবতার অপমৃত্যু তাঁকে ব্যথিত করেছে। তিনি আগুন হাতে প্রেমের গান গেয়েছেন। মানুষের ক্ষুধা আর যন্ত্রণা তাঁর একান্ত সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। তিনি গণতন্ত্রের ওপর সব সময় বিশ্বাস রাখতে পারেননি। তাই বলেছেন,

লেনিন তোমার আগুন—স্বপ্ন হয়ে সাপ হয়ে ফণা তোলে
ছোবলাবে মাটি কখন অকর্মণ্য
পরগাছাগুলো বিষে-বিষে হবে নীল
শেষ হবে এই দুঃস্বপ্নের রাত
    কেটে যাবে এই অমাবস্যার ভোর,
    দেখা যাবে ঠিক
কাকের মুখেতে বটফল যেন
    টকটকে রাঙা ভোর।

সমর সেন

সমর সেন (১৯১৬-৮৭) মার্কসবাদী কবি হিসেবে স্বল্প সময়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর কবিতার রচনাকাল ছিল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তাতে স্বাতন্ত্র্য ও নতুনত্ব ছিল।

সমর সেনের জন্ম কলকাতায়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম এ পাশ করেন। রুশ ভাষাতেই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি বিভিন্ন খ্যাতনামা পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। সাংবাদিকতাকে তিনি জীবনের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যের নাম : কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭), গ্রহণ (১৯৪০), নানা কথা (১৯৪২), খোলা চিঠি (১৯৪৩), তিনপুরুষ (১৯৪৪), সমর সেনের কবিতা (১৯৫৪) ইত্যাদি।

সাম্যবাদী কবি সমর সেন মাত্র দেড় দশক কবিতা রচনা করেছেন। যদিও দীর্ঘদিন তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি কবিতা লেখা ক্ষান্ত দিলেন এই বলে যে—'এখন আর কবিতা লিখে হবে না; তরবারি চাই—যুদ্ধ করতে হবে।' সমর সেন সব সময় সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি অন্যতম আধুনিক কবি হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তাঁর কবিতায় প্রেম ও রোমান্টিকতা ফুটে উঠলেও পরে মধ্যবিত্তের সংকট ও ভণ্ডামি তাঁর কবিতার বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে। মার্কসবাদী এই কবি বিশ্বাস করতেন একমাত্র সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারে কাস্তে ও হাতুড়ি। তাই নিজের পরিচয় সম্পর্কে লিখেছেন,

আর রোমান্টিক কবি নই, মার্কসিস্ট।
অনেকে জিজ্ঞাসা করে গুরুদেবের সঙ্গে
তোমার তফাৎটা কী? তফাৎ এই
বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বরাবর
অক্লান্ত বাউল, একই নৌকায়
একঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন,
কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আমি
দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুল যশোধা
নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।

কবি শ্রমজীবী শক্তির জয় কামনা করে লিখেছিলেন—

অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল
পিষ্ট হবে হাতুড়িতে ছিন্ন হবে কাস্তেতে।

'নগর জীবনের নোংরামি ও ক্লান্তি সমর বাবুর কবিতায় বারবার প্রতিধ্বনিত, সেই সঙ্গে সাঁওতাল পরগনার শান্ত পরিবেশের মাধুর্যও।' সমর সেন ছিলেন মার্ক্সীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ কবি। তাঁর স্বল্পস্থায়ী কবিতাকর্মে সমসাময়িক নির্লিপ্ত মানসিকতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

কবি ও সম্পাদক হিসেবে খ্যাতিমান হলেও তিনি অনুবাদক হিসেবে অবদান রেখে গেছেন। তিনি ১৯৫৬ সালে প্রগতি প্রকাশনালয়ে চাকরিতে যোগ দিয়ে মস্কো চলে যান। সেখানে অনুবাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ১৯৬১ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন। চল্লিশ দশকে সমর সেন দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করেন। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনি দিল্লিতে ছিলেন। কলকাতায় ফিরে একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থায় চাকরি নিয়েছিলেন। 'নাও' নামে একটি সাময়িকীও বের করেছিলেন। তিনি ছিলেন বামপন্থী কবি।

সমর সেন খুব বেশি দিন কবিতা লেখেন নি। তাঁর কবিতা রচনার আয়ুষ্কাল মাত্র বার বছর। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। তিনি কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই 'বাবুর বৃত্তান্ত' ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সমকালীন সমাজের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

তাঁর কবিতার আরেকটি নমুনা হল :

পাশের ঘরে
একটি মেয়ে ছেলে-ভুলানো ছড়া গাইছে,
সে ক্লান্ত সুর
ঝরে-যাওয়া পাতার মতো হাওয়ায় ভাসছে,
আর মাঝে মাঝে আগুন জ্বলছে
অন্ধকার আকাশের বনে।

বৃষ্টির আগে ঝড়, বৃষ্টির পরে বন্যা। বর্ষাকালে,
অনেক দেশে যখন অজস্র জলে ঘরবাড়ি ভাঙবে,
ভাসবে মূক পশু ও মুখর মানুষ
শহরের রাস্তায় যখন
সদলবলে গাইবে দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছাসেবক,
তোমার মনে তখন মিলনের বিলাস,
ফিরে যাবে তুমি বিবাহিত প্রেমিকের কাছে।
হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও,
কী আনন্দ পাও সন্তানধারণে?

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

'পুরানো সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, পুরানো মূল্যবোধ ভেঙে যাচ্ছে, সুভাষ (১৯১৯-২০০৩) মর্মে মর্মে তা অনুভব করলেন। সুভাষ জানতেন পুরনো সামাজ না ভাঙলে নতুন সমাজ আসবে না। দিন বদলের জন্য সমাজ বদলের একান্ত প্রযোজন।' তাই নবযুগের তিনি নতুন সমাজ গড়ার জন্য ডাক দিলেন।

কমরেড, আজ নবযুগ আসবে না?
কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে।'

সভাষ মুখোপাধ্যয় পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে বি এ পাশ করার আগেই তিনি মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন এবং আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। শেষ জীবনে আস্থা হারিয়ে কমিউনিজম ত্যাগ করেন।

তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ গুলো হল : পদাতিক (১৯৪০), অগ্নিকোণ (১৯৪৮), চিরকূট (১৯৫৩), ফুল ফুটুক (১৯৫৭), যত দূরেই যাই (১৯৬২), কাল মধুমাস (১৯৬৬), ছেলে গেছে বনে (১৯৭২), একটু পা চালিয়ে যাই (১৯৭৯), জল সইতে (১৯৮১), রোদ উঠেছে চলে যাই (১৯৮১), চই চই চই (১৯৮৩), বাঘ ডেকেছিল (১৯৮৫), যারে কাগজের নৌকা (১৯৮৯), ধর্মের কল (১৯৯১), একবার বিদায় দে মা (১৯৯৫), ছড়ানো মাটি (২০০১) ইত্যাদি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। পদাতিক কবি নামে তিনি খ্যাত হয়েছিলেন। তিনি অন্যায় অবিচারের প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন।

দেশের লোকেরা ছাড়ছে নাড়ি
বাড়ছে দলের গাড়ি বাড়ি
মন্ত্রী মশাই করেন কী?
পরের ধনে পোদ্দারি।

ক্ষুধার্ত মানুষের গর্জন শোনো যায় তাঁর কবিতায়—

পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে,
হুজুর জেনে রাখুন
খাজনা এবার মাফ না হলে
জ্বলে উঠবে আগুন।

মণীন্দ্র রায়

মণীন্দ্র রায় (১৯১৯-২০০০) বামপন্থী ও সমাজবাদে বিশ্বাসী কবি। কবিতার পাশাপাশি কাব্যনাটক, অনুবাদ ও প্রবন্ধ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

মণীন্দ্র রায় পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলো হল : ত্রিশঙ্কু (১৯৩১), একচক্ষু (১৯৪২), ছয়সহচর (১৯৪৪), সেতুবন্ধের গান (১৯৪৮), অন্যপথ (১৯৫১), কৃষ্ণচূড়া (১৯৫৫), অমিল থেকে মিলে (১৯৫৮), মুখের মেলা (১৯৫৯), অতিদূর আলোর রেখা (১৯৬২), কাব্যের বিশ্বাস (১৯৬৬), মোহিনী আড়াল (১৯৬৬), ঢেউ নদী ঝিলিমিলি নয় (১৯৬৮), এই জন্ম জন্মভূমি (১৯৬৯), ভিয়েতনাম (১৯৬৯), আমার রক্তের দাম (১৯৭০), স্বাধীন কিশোর ও মানুষ (১৯৭১), আমাকে বাঁচতে দাও ইত্যাদি।

মণীন্দ্র রায় সময় চেতনার কবি, জনতার কাছের কবি। অতীত নয়, প্রত্যক্ষ বর্তমানকেই ধরতে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন :

সময় জ্বালায় কত।
লেট করা ট্রেনের মতো
ক্রমাগত রাখে দোটানায়।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩) ছিলেন একজন আশাবাদী কবি। তাঁর কবিতায় মানুষ, প্রকৃতি, দেশপ্রেম এক হয়ে উঠেছিল।

কবির জন্ম যশোর জেলার নল ডাঙায়। বরিশালে বামপন্থী ভাবধারার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত হন। তাঁর কাব্যে এসব ভাবেরই বিকাশ ঘটেছে।

তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম : স্নায়ু, মনপবন (১৯৪২), তেলেঙ্গনা ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪৮), মেঘ বৃষ্টি ঝড় (১৯৫২), কবি কবিতা ও একলব্য (১৯৫৯), কোথায়ও যাবার কথা ছিল (১৯৮৬) ইত্যাদি।

তাঁর কাব্যে দেশপ্রেমের আবেগ আছে, আছে মেহনতি মানুষের প্রতি ভালবাসা। সাম্যবাদী কবি কৃষক ও শ্রমিকের সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যুগের অবক্ষয় এবং শোষিত মানুষের যন্ত্রণা দেখে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-৮৫) প্রতিবাদী কবি হিসেবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। দেশের বর্তমান সময়ের ইতিহাস তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

কবির জন্ম মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরে। পরে তিনি কলকাতাবাসী হন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম : গ্রহচ্যুত (১৯৪২), রানুর জন্য (১৯৫১), উলুখড়ের কবিতা (১৯৫৪), লখিন্দর (১৯৫৩), মৃত্যুত্তীর্ণ (১৯৫৫), জাতক (১৯৫৮), তিন পাহাড়ের স্বপ্ন (১৯৬৩), সভা ভেঙে গেল (১৯৬৪), মুখে যদি রক্ত উঠে (১৯৬৪), ভিসা অফিসের সামনে, মহাদেবের দুয়ার (১৯৬৭), ওরা যতই চক্ষু রাঙায় (১৯৬৮), নভেম্বর ডিসেম্বরের কবিতা (১৯৬৮), মানুষের মুখ (১৯৬৯), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০), মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে (১৯৭১), আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা (১৯৭২), রাস্তায় যে হেঁটে যায় (১৯৭২), মানুষ খেকো বাঘেরা লাফায় (১৯৭৩), বাহবা সময় তোর সার্কাসের খেলা (১৯৭৪), পৃথিবী ঘুরছে (১৯৭৫), বেঁচে থাকার কবিতা (১৯৭৭), নীল কমল লাল কমল (১৯৭২), সায়েরী (১৯৮০), অফুরন্ত আমার গান (১৯৮৬) ইত্যাদি।

সাম্যবাদে বিশ্বাসী এই কবি ছিলেন বাস্তববাদী ও মানবতাবাদী। তাঁর কাব্যে কৃষক শ্রমিক, মেহনতি মানুষ উপকরণে পরিণত হয়েছে। তাঁর কবিতায় আশাবাদী জীবনের প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে। শোষণ লাঞ্ছণা অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবি সরব হয়েছেন। অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর—

> গুলি চলছে, গুলি চলছে, গুলি চলবে এই না হলে শাসন?
> ভাই চাইলে গুলি, করলে গুলি, বাংলা বন্ধ গুলির মুখে
> উড়িয়ে দেওয়া চাই।
> দেশের মানুষ না খেয়ে দেয় ট্যাক্স, গুলি কিনতে পুলিশ ভাড়া করতে
> গুণ্ডা পুষতে ফুরিয়ে যায় তাই।

একত্রে বলে গণতন্ত্র : এরই জন্য কবিতার সর্দার সাহিত্যের মোড়লেরা
কেঁদে ভাসান : যখন
গুলিবিদ্ধ রক্তে ভাসে আমার ঘরের বোন, আমার ভাই।

নরেশ গুহ

নরেশ গুহ (১৯২৩-২০০৯) তাঁর কবিতায় স্মৃতি ও সময়কে যথাযথভাবে মিলিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল বৈচিত্র্যধর্মী। তিনি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, অনুবাদ নাটক ও গ্রন্থ সম্পাদনায় অবদান রেখেছেন। তবে কবিতা রচনাতেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে।

নরেশ গুহের জন্ম বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে। জাহ্নবী হাই স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় চলে আসেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাশ করেন। পরে পি-এইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথমে সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু হয়। পরে কলেজে অধ্যাপনা ও তৎপরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেন। সবশেষে তিনি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র ভবনে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলোর নাম : 'দুরন্ত দুপুর', 'তারার সমুদ্র ঘেরা', 'বিদিশার ইনি আর উনি', 'কবিতা সংগ্রহ' ইত্যাদি। এসব ছাড়া 'তপতীর মন' নামে গল্পগ্রন্থ এবং 'অন্তরালে ধ্বনি প্রতিধ্বনি' নামে প্রবন্ধগ্রন্থ রয়েছে। 'দুরন্ত দুপুর' কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'ভালো লেগেছে সেই কবিতার স্নিগ্ধতা, স্বপ্নিলতা, রচনা শিল্পের সৌরভ। ভালো লেগেছে লিরিকের দিকে ঝোঁক, নিচু গলায় নরম করে বলার উন্মুখতা।'

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪) আধুনিক বাংলা কবিতায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর কাব্যে রোমান্টিকতা, প্রেম, প্রকৃতি স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছে। মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ তাঁর কবিতার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মানুষ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল গভীর ও ব্যাপক। আধুনিকতার দুর্বোধ্যতা নয়, বরং সহজ সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার চান্দ্রা গ্রামে। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং সেখানেই ছিল তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন। তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পৃক্ত ছিলেন। 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৭৪ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান সূচক 'ডক্টর অব সায়েন্স' ডিগ্রি প্রদান করে। তিনি শিশু-কিশোরদের জন্য বিখ্যাত পত্রিকা 'আনন্দ মেলা'র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও অনেকগুলো পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হল : নীল নির্জন (১৯৫৪), অন্ধকারের বারান্দা (১৯৬১), প্রথম নায়ক (১৯৬১), নীরক্ত করবী (১৯৬৫), নক্ষত্র জয়ের জন্য (১৯৬৯), কলকাতার যীশু (১৯৬৯), উলঙ্গ রাজা (১৯৭১), খোলা মুঠি (১৯৭৪), কবিতার বদলে কবিতা (১৯৭৬), আজ সকালে (১৯৭৮), পাগলা ঘন্টি (১৯৮১), ঘর দুয়ার (১৯৮৩), সময় বড়ো কম (১৯৮৪), রূপকাহিনী (১৯৮৭), জঙ্গলে এক উলঙ্গিনী (১৯৮৯), আয় রঙ্গ (১৯৯১), চল্লিশের দিনগুলি (১৯৯৪), সত্য সেলুকাস (১৯৯৫), সন্ধ্যারাতের কবিতা (১৯৯৭) ইত্যাদি।

কবির কাব্য প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'চল্লিশ দশকের বিশিষ্ট কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি আর প্রেমিক মনোভাবের জন্য পাঠক প্রিয় হয়েছিলেন। তৎকালীন রাজনীতি আশ্রিত কবিতার বদলে তাঁর 'নীলনির্জন' ভাবনা পাঠকের স্বাদ বদল ঘটিয়েছিল। যদিও কবি হিসেবে তিনি গজদন্ত মিনারবাসী ছিলেন না। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি পড়লেই দেখা যায়, এক আদর্শ সমাজ, আদর্শ মানুষ তিনি খুঁজে চলেছেন। 'উলঙ্গ রাজা'কে তিনি উলঙ্গ বলে সরল, সৎ, নির্ভীক শিশুর জন্য প্রতীক্ষা করেছেন। তাই স্বদেশ দেশবাসী সকলের জন্য তাঁর সমবেদনা ও ভালবাসার অভাব নেই।'

বর্তমান সময় কবির কাছে অন্ধকার-এর রূপক হয়েছে। তাই তিনি বলেছেন,

> পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর নদীর ঠিক পাশে,
> দাঁড়িয়ে রয়েছি পিতামহ,
> দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি, রাত্রির আকাশে
> ওঠেনি একটিও তারা আজ।
> পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর মৃত্যুর কাছাকাছি
> নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
> যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে
> যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।

কবি যা দেখেন, মনের অনুভূতি দিয়ে যে সব বাস্তব ছায়াছবি ও ঘটনার মুখোমুখি হন—তাই তিনি ছেলে বেলার খোলামকুচি খেলার মত খুব সহজেই তুলে আনেন নিপুণ চিত্রকরের দক্ষতায়। এখানেই তিনি এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। সবার মাঝেও এক অন্যসুরের, অন্য কণ্ঠস্বরের কবি।

রাম বসু

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে জনতার কাছে কবিতা পৌঁছে দিয়েছিলেন রাম বসু (১৯২৫-২০০৭)। সে সময়ের উত্তাল আবহাওয়া বন্যার স্রোতের মত তাঁর কাব্যে আছড়ে পড়েছিল। জীবনবাদী কবি সময়ের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন। মুক্তি নয়, সংগ্রামই ছিল তার কাছে জীবন।

রাম বসুর জন্ম গ্রামাঞ্চলে। লেখাপড়া করেন কলকাতায় এবং সেখানে কমিউনিজমের সঙ্গে জড়িত হন। বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি লেখালেখি করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থগুলো হল : তোমাকে (১৯৫০), যখন যন্ত্রণা (১৯৪৪), দৃশ্যের দর্পণে (১৯৫৬), অন্তরালে প্রতিমা (১৯৬৭), হে অগ্নি প্রবাহ (১৯৬৭), মলিন আয়না (১৯৬৯), কানামাছি (১৯৭২), সময়ের কাছে সমুদ্রের কাছে (১৯৭৯), মন্ত্র খুঁজি (১৯৮৪) ইত্যাদি।

কবি রাম বসু মানবতার অপমান দেখে কেঁদেছেন। শোষণের বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেছেন। সুবিধাবাদী শূন্যগর্ভ মানুষকে হায়েনার মত শিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। তাদের বিরুদ্ধে তাঁর বাণী তরবারির মত ঝলছে উঠেছে :

এক একটা কৃষক পাহাড়ের মত অনধিগম্য
এক একটা মজুর সড়কির মত অব্যর্থ।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭) অকালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'ছাড়পত্র', 'পূর্বাভাস', 'ঘুম নেই', 'মিঠেকড়া' ইত্যাদি কাব্যে তাঁর প্রতিভার নিদর্শন বিদ্যমান। ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'সুকান্তের ব্যক্তিত্ব ও কবিতাকর্মের অনন্যতা তাঁর অদম্য অখণ্ড সম্পূর্ণতায়। কবিতা তাঁর হাতে সংগ্রামী হাতিয়ার—তাই কবিতা কখনও শ্লোগান হতে দ্বিধা করে না, শ্লোগান প্রায়ই হারায় না কবিতার আন্তরিক জোর। নানাদিক থেকেই এই অতি স্বল্পজীবী দুর্দান্ত প্রতিভাটি সমকালীন ইতিহাসের অদ্বিতীয় দিশারী। .... আর আক্ষরিক অর্থেই সুকান্ত ছিলেন আজন্ম স্বভাবকবি। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, অনুভব, উত্তেজনামাত্রই তাঁর অস্তিত্বের স্বতই প্রকাশ পেয়েছিল কবিতার কণ্ঠস্বরে।'

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭—মাত্র এই কয়েকটি বছরই সুকান্তের কবিভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের কাল। আর এই স্বল্পকালীন পথচলার মধ্যেই দেখা যায় সুকান্ত অদ্ভুত নিয়মে জীবনের পরিমিতি বোধকে আয়ত্ত করে নিয়েছেন এবং তাঁর কবিতার চেতনা পারম্পরিকভাবে ফুলের মালার মতোই সূত্রানুযায়ী গ্রথিত। 'বোধন' কিংবা 'রানার' কবিতায় যেখানে তিনি গভীর আবেগে দীপ্যমান সেখানেও যেমন সংযম-স্বাধীন কাব্যভাবনার বিকাশ আবার ঠিক তেমনি 'প্রিয়তমাসু'র মধ্যে যে মানসিক রোমান্টিকতাবাদ তা বস্তুতান্ত্রিক মূল্যবোধের সীমানা ছাড়িয়ে অস্থির আবেগে ভেসে যায় নি। তাঁর জীবনের দর্শনবোধ যে প্রচণ্ড রাজনীতি-সচেতনতার কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে বাঁধা তা তাঁর এই পরিমিত পথসঞ্চারী ছন্দের মধ্যেই ধরা পড়ে।

তাই সুকান্তের সমগ্র কবিতার দর্শনে একটা মানুষের ছবি ভেসে ওঠে যে মানুষ জোর করে বলতে পারে 'আমাদের পথচলা এমনি করেই, এমনি ভাবেই। এ ভাবেই পথ চলতে হয় এবং হবেই।'

সেই মানুষ তাই শুধু জীবনের চারণ মানুষ নয়। সেই মানুষ বাস্তবতই যেন এক ঋত্বিক। তাই কবি যখন লেখেন :

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব— তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস ॥

কিংবা যখন কবি বলেন :

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিল তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলিতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।

তখন সুকান্তের এ লেখা পড়ে যদি কেউ বলে থাকেন এ লেখা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফসল, তবে তা মোটেই অত্যুক্তি নয়। এবং আমাদেরও মনে পড়ে তখন লুই আরাগঁ-এর একটি সমালোচনামূলক মন্তব্য—"এ কথা বলছি বলছি না যে, সাহিত্যে কদাচ শেণিগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত নয়। সাহিত্যিকদের রচনায় সর্বদাই একটা শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। প্রশ্নটা শুধু এইটুকু যে, শ্রেণিটি কোন্ শ্রেণি? কিন্তু লেখকের শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এমন সব মূল্য সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক যা তাঁর শ্রেণি সীমানার বাইরেও স্বীকৃতি লাভ করবে।" এখানেই সুকান্ত তাঁর সমসাময়িক কবিদের ছাড়িয়ে এমন শীর্ষে পৌঁচেছেন যেখানে শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাঁর সমগ্র কাব্যদর্শন সঞ্জীবিত—কিন্তু কাব্যমূল্য তাতে ব্যাহত নয়—আর এই কাব্যদর্শন কোথাও অস্থির আবেগে খাপছাড়াভাবে চ্যুতও নয়। বরং তা একটা নিটোল বুনোনের মতো জীবনের সমগ্র প্রান্তর ভরে আছে। সুকান্ত তাই একটা সংযত স্থিরচিত্ত অভিজ্ঞান।

রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁর জীবন সায়াহ্নে যে পথচলার নতুন বাঁক উপলব্ধি করেছিলেন—যে পথের বিরাট ব্যাপ্তি সুকঠিন শপথে নজরুলের মধ্যে সোচ্চারিত—সেই পথপরিক্রমা

একটি সঠিক সিদ্ধান্তের মতো এসে আশ্রয়স্থল খুঁজে নিয়েছে সুকান্তে। তাই অবশ্য নিয়মে সুকান্ত হলো জীবন-দর্শনের সিদ্ধান্ত। বাংলা সাহিত্যে গণচেতনার কবিতাধারা এমনি করেই ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়েছে। আর এই ধারায় সুকান্ত একটা উজ্জ্বল উপস্থিতি যা বাংলা কবিতার আত্মায় অঙ্গাঙ্গীভাবে অঙ্গীকৃত।

শঙ্খ ঘোষ

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২) পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান কবি। সাহিত্য সমালোচক হিসেবেও তিনি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। একজন রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে। তাঁর প্রকৃত নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ, কিন্তু শঙ্খ ঘোষ নামেই তিনি পরিচিত। পেশাগত দিক থেকে তিনি একজন অধ্যাপক। তিনি যাদবপুর, দিল্লি ও বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কবি শঙ্খ ঘোষের জন্ম বাংলাদেশের চাঁদপুরে। পরে দেশ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। অধ্যাপক হিসেবে তিনি কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। কবিতা ও গদ্য উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ বিচরণ। রবীন্দ্র সাহিত্যে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলে খ্যাতি পেয়েছেন।

তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো হল : দিনগুলি রাতগুলি (১৯৫৬), নিহিত পাতাল ছায়া (১৯৬৭), এখন সময় নয় (১৯৬৭), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০), আদিম লতা গুল্মময় (১৯৭২), মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয় (১৯৭৫), বাবরের প্রার্থনা (১৯৭৬), তুমি তো তেমন গৌরী নও (১৯৭৮), পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ (১৯৮০), প্রহর জোড়া ত্রিতাস (১৯৮২), রাগ করো না রাগুনি (১৯৮৩), মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে (১৯৮৪), বন্ধুরা মাতি তরজায় (১৯৮৪), বহুল দেবতা বহুল স্বর (১৯৮৬), সব কিছুতে খেলনা হয় (১৯৮৭), ধুম লেগেছে হৃদ কমলে (১৯৮৭), আমন ধানের ছড়া (১৯৯১), লাইনেই ছিলাম বাবা (১৯৯৩), গন্ধর্ব কবিতা গুচ্ছ (১৯৯৪) ইত্যাদি।

তিনি 'বাবরের প্রার্থনা' নামক কাব্যগ্রন্থের জন্য ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

শঙ্খ ঘোষের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'বাংলা কবিতায় কঠিন শব্দ বা তৎসম শব্দের ব্যবহার অনেকদিনের। ইদানীং দেখছি এই প্রবণতা আরও বেশি। সেখানে শঙ্খ ঘোষের কবিতা যেন মরুদ্যান। কী সুন্দর সহজবোধ্য শব্দের ব্যবহার, মুখে মুখে বলা কিছু শব্দ নিয়ে অনায়াসে তৈরি করেন অপার রহস্যময়তা। সাধারণ শব্দের সাহায্যে নির্মিত হয়—অসাধারণ বুনট।'

কবির কবিতায় আছে সহজবোধ্য শব্দের চমৎকার ব্যবহার। দুর্বোধ্যতার দিকে তাঁর মনোযোগ নেই। সহজ সরল শব্দ ব্যবহারেই তাঁর প্রবণতা। কবি সহজ কথায় অনায়াসে মূল বক্তব্যটুকু স্পষ্ট করেন। 'মাতাল' নামক কবিতায় কবি বলেছেন, যৌবনের তেজী রক্ত প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এমনভাবে যে চারপাশে ঘটে যাওয়া অন্যায়

অবিচারগুলোকে মেনে নিতে পারা কঠিন হয়ে পড়ে বোধবুদ্ধি সম্পন্ন অবস্থায়। প্রতিবাদী যুবার সুতীব্র প্রতিবাদ নানা ভাবে ভাঙ্গন ধরাতে পারে সমস্ত 'কু'র মধ্যে :

প্রৌঢ়ত্বের শীতল হয়ে আসা রক্ত, সমস্ত কিছু মেনে নিতে শিখে ফেলে বিনা প্রতিবাদে। যেমন :

আরো একটু মাতাল করে দাও।
নইলে এ বিশ্বসংসার
সহজে ও যে সইতে পারবে না!

এবার তবে প্রৌঢ় করে দাও—
নইলে এ বিশ্বসংসার
সহজে ওকে বইতে পারবে না।

কঠিন আভিধানিক শব্দ ব্যবহার না করেই কীভাবে আধুনিক আত্মোপলব্ধির কথা কবিতায় রূপ দেওয়া যায় তার নমুনা আছে 'রাস্তা' কবিতায়।

রাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা করে নিন।
মশাই দেখছি ভীষণ সৌখিন...।

তখন কেউ রাস্তা ছেড়ে দেবে, এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দেবে সেই কথা ভেবে অপেক্ষায় থাকলে ঠকতেই হবে শুধু, সকলেই নিজের নিজের গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছে একে অপরকে পেছনে ফেলে। সেই প্রতিযোগিতায় জিততে হলে নিজেকেও পাল্লা দিয়ে ছুটতে হবে বেছে নেওয়া রাস্তায়।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতা সম্পর্কে লিখেছেন, 'কাল ও-কথা বলেছিলাম নাকি? হাতেও পারে আজ সেটা মানছি না। কাল যে-আমি ছিলাম, প্রমাণ করো আজও আমি সেই আমিটাই কিনা। মানুষ তো আর শালগ্রাম নয় ঠিক একই রকম থাকবে সারাজীবন। মাঝে মাঝে পাশ ফিরতেও হবে মাঝে মাঝে উড়াল দেবে মন। কাল বলেছি পাহাড় চূড়াই ভাল আজ হয়ত সমুদ্রটাই চাই। দুয়ের মধ্যে বিরোধ তো নেই কিছু মুঠোয় ভরি গোটা ভুবনটাই। আজ কালকে যোগ দিয়ে কী হবে? সেটা না হয় ভাববো অনেক পরে। আপাতত এই কথাটি ভাবি—ফুর্তি কেন এত বিষম জ্বরে?'

শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা :

পদ্ম, তোর মনে পড়ে খালযমুনার এপার ওপার
রহস্যনীল গাছের বিষাদ কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?

স্পষ্ট নৌকো, ছৈ ছিল না, ভাঙা বৈঠা গ্রাম হারানো
বন্য মুঠোয় ডাগর সাহস, ফলপুলন্ত নির্জনতা

আড়ালবাঁকে কিশোরী চাল, ছিটকে সরে মুখের জ্যোতি
আমরা ভেবেছিলাম এরই নাম বুঝি বা জন্মজীবন।

কিন্তু এখন তোর মুখে কী মৃণালবিহীন কাগজ-আভা
সেদিন যখন হেসেছিলি সত্যি মুখে ঢেউ ছিল না!

আমিই আমার নিজের হাতে রঙিন ক'রে দিয়ে ছিলাম
ছলছলানো মুখোশমালা, সে কথা তুই ভালই জানিস—
তবু কি তোর ইচ্ছে করে আলগা খোলা শ্যামবাজারে
সবার হাতে ঘুরতে-ঘরতে বিন্দু বিন্দু জীবনযাপন?

শঙ্খ ঘোষ মানবতার কবি হিসেবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। জীবনের চারপাশে যে যন্ত্রণা ও হতাশা বিদ্যমান তা প্রত্যক্ষ করে তিনি নিরাশ হননি। তিনি আবহমান পৃথিবীর রূপসুধা, প্রভৃতির শঙ্খমালা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। মানুষের মধ্যে তিনি সে বৈশিষ্ট্যের খোঁজ করেছেন।

প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব বিদ্যমান। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থগুলো হল : 'নিঃশব্দের তর্জনী', 'ছন্দের বারান্দা', 'শব্দ আর সত্য', 'শব্দ নিয়ে খেলা', 'সকাল বেলার আলো', 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ', 'কালের যাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক', 'এ আমি আবরণ', 'নির্মাণ আর সৃষ্টি', 'কল্পনার হিস্টিরিয়া জার্নাল', 'ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম' ইত্যাদি।

শঙ্খ ঘোষের স্বাধীনতা-পরবর্তী সমাজ ও জীবন সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই নারীত্ব, সতীত্ব, মাতৃত্বের মতন সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি কলকাতার ফ্ল্যাটে ভেঙে পড়ল, ফুটপাত ভরে গেল উদ্বাস্তুতে, বাতাসে লেগে রইল বারুদের গন্ধ, কালবাজারী ও মুনাফাবাজদের ভিড়ে ছেয়ে গেল শহর কলকাতা। এইসব নানান বিপর্যয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস দিশেহারা হয়ে পড়ল। চারপাশের মানুষের মধ্যে শুধু অবিশ্বাস আর অনিশ্চয়তা এই অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়ে। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন,

প্রিয়তম, এই দুঃখের কাঁটা ঝোপে
রজনীগন্ধা নেই।
তবু তুমি ফেরো ভাঙা বাগানের মাঠে
ফুলের সন্ধানেই।
আশাহীন, তবু কি আশায় দিন কাটে।

শঙ্খ ঘোষ আশাবাদী কবি। চারদিকে বিপর্যস্ত অবস্থা দেখেও তার মধ্যে নতুন জীবন গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন। যে বিজ্ঞান তাঁদের পুরানো জগতকে ভেঙে

দিয়েছিল, সেই বিজ্ঞানই কবিকে নতুন জগৎ গড়ে তুলতে সাহায্য করল। কবি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। বিরহ-বিষাদ তাঁর কাব্যের অস্থি মজ্জায় প্রবাহিত। তাঁর কবিতায় সৌন্দর্য চেতনা বড় হয়ে উঠেছিল। যেমন,

হে নিবিড় রাত্রি তুমি কি লাবণ্য ছড়িয়েছ চুলে
মৃদু মৃদু মায়া ঢেলে ও চিবুক নেমেছে ক্লান্ত হাতে
ধীরে ধীরে, আর তুমি অন্য মানে বিশীর্ণ আঙুলে
জড়িয়েছ অবসন্ন, জ্যোৎস্নার আঁচল। নিত্য তাতে
দুফোঁটা করুণ মেঘ, বৃষ্টি হতে চায় বারবার।

তরুণ সান্যাল

তরুণ সান্যাল (১৯৩২) সাম্যবাদী কবি হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। সমাজ ও মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অভাব ছিল না।

তরুণ সান্যাল জন্ম নিয়েছিলেন বাংলাদেশের পাবনা জেলায়। ১৯৪৮ সালে দেশ ত্যাগ করে তিনি পশ্চিমবঙ্গবাসী হন। তিনি ১৯৫৭ সালে অর্থনীতি বিষয়ে এম এ পাশ করেন। কলেজের অধ্যাপনায় ও সাংবাদিকতায় তিনি তার কর্মজীবন অতিবাহিত করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থগুলো হল : মাটির বেহালা (১৯৫৬), অন্ধকার উদ্যানে যে নদী (১৯৬২), রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা (১৯৬৮), তোমার জন্যই বাংলাদেশ (১৯৬৮), এরই নাম অন্য বাংলাদেশ (১৯৭২), যেমন উদ্ভিদ (১৯৭৯), চতুর্থ পেরেক (১৯৮১), কবি এক জাগো (১৯৯৫), রূপের ভুবনডাঙা (২০০০), ইত্যাদি।

তাঁর কবিতায় নিজের জীবনাদর্শ চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর বামপন্থী চেতনা থেকে কখনই ফিরে আসেননি। তিনি বলেছেন, 'নিজের দার্শনিক অবস্থান থেকে কখনও সরে না গিয়ে আমি যেমনটি সাহিত্য শিল্প বুঝেছি তেমনি লিখেছি।'

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-৯৫) জীবনকে দেখেছেন কঠিন বাস্তবের মাটি থেকে। বুর্জোয়া উদারনীতিবিদ এবং সমাজের বিকৃতি ও ব্যভিচার দেখে কবি মানস বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। জীবন যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত মানুষের জন্য কবির হৃদয় ডুকরে উঠেছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবি হিসেবে অস্থির অশান্ত, অব্যবস্থিত চিত্ত, কিন্তু দুরন্ত দুর্বার অথচ শক্তিমান। তাঁর কাব্য জগৎ বিচিত্র বর্ণগন্ধের উচ্ছ্বাস নিয়ে চঞ্চলতার সৃষ্টি করে।

কবির জন্ম চব্বিশ পরগণার বহড়ুতে। কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন তিনি মার্কসবাদে প্রভাবিত হন এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। বাংলায় উচ্চ শিক্ষা নিয়ে জীবনে পেশা গ্রহণ করেন সাংবাদিক হিসেবে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর তালিকা এ রকম : ছিন্নবিচ্ছিন্ন (১৯৭৫), প্রেমের কবিতা (১৯৭৬), শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ (১৯৭৬), কুমার

সম্ভব কাব্য (১৯৭৬), সুন্দর এখানে একা নয় (১৯৭৬), আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল (১৯৭৬), কিন্নর কিন্নরী (১৯৭৬), আমি যে পাথরে (১৯৭৭), কবিতার তুলো উড়ে (১৯৭৭), হেমন্ত যেখানে থাকে (১৯৭৭), পাতাল থেকে ভাবছি (১৯৭৭), উড়ন্ত সিংহাসন (১৯৭৮), শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ (২য় খণ্ড ১৯৭৮), মানুষ বড়ো কাঁদছে (১৯৭৮), ভালোবেসে ধুলায় নেমেছি (১৯৭৮), পরশুরামের কুঠার (১৯৭৮), কুড়ি বছরের কুড়িটি (১৯৭৯), হাইনের প্রেমের কবিতা (১৯৭৯), ভাত নেই পাথর রয়েছে (১৯৭৯), লোরকার কবিতা (১৯৭৯), আমাকে দাও কাল (১৯৮০), আমি চলে যেতে পারি (১৯৮০), মন্ত্রের মতন আছি স্থির (১৯৮০), অঙ্গুরী তোর হিরণ্য জাল (১৯৮০), সুন্দর রহস্যময় (১৯৮০), আমি একা বড়ো একা (১৯৮১), প্রচ্ছন্ন স্বদেশ (১৯৮২), কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে (১৯৮৩), যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো (১৯৮২), একপাত্র সুধা, কক্সবাজার সন্ধ্যা, সে তার প্রতিচ্ছবি, সন্ধ্যায় সে শান্ত উপহার, এই তো মর্মমূর্তি, বিষের মধ্যে সমস্ত শোন, আমারে জাগাও, ইত্যাদি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় একান্ত অন্ত্যজ শব্দের পাশে মাত্রার ভারসাম্য রেখে অবলীলায় তৎসম শব্দ ব্যবহার করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁর 'কবিতা গড়ে উঠেছে নিসর্গের বুকে আশ্রয় কামনায়, অতীতের স্নিগ্ধধূসরতার শান্তির সন্ধানে, নির্মোহ আত্মানুসন্ধানে, ব্যক্তিগত স্বগতোক্তিতে, স্বরচিত বিষাদে, জীবনের অসংলগ্নতায়, মৃত্যু ভাবনায় ইত্যাদিতে।' তার কবিতায় আছে এক জাতীয় সাধারণ মানুষের বাচনভঙ্গির প্রবণতা। তাঁর কবিতায় গড়ে ওঠে স্বপ্ন জাগরণ প্রেম অপ্রেম প্রতীক্ষা প্রাপ্তি বাৎসল্য আত্মপরতা নারী অশ্রুপাত আশা ঔদাসীন্য ইত্যাদি কেন্দ্র করে। তাঁর আত্মজাগরণ ঘটেছে নারী ও প্রকৃতিকে অবলম্বন করে। কবি তাঁর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন বাস্তরের ভেতরে নব্য রোমান্টিক চিন্তা দিয়ে।

কবি তাঁর বিরুদ্ধে শক্তির সঙ্গে লড়তে পারেন নি, লড়েছেন নিজের বিরুদ্ধে। তিনি পথ চলেছেন একা। গতানুগতিক বেঁচে থাকা তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়েছে।

> আশ্চর্য সময় এই, মানুষের পশু পাখিদের
> মনের ঘনিষ্ঠ তাপ নেই বুঝি, শীতল বরফ
> হয়ে গেছে পৃথিবীর সব ঘর, বিছানা পাঁচিল—
> আছে তাপ শয়তানের আর আছে রক্তচক্ষু শঠ
> সে ভয় দেখায়, মারে, যদি পারে টেনে নেয় দূরে—
> মানুষের কাছ থেকে তার প্রিয় যা কিছু সম্পদ।
> এভাবে কি বাঁচা যায়?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় অরণ্যের কথা, প্রকৃতির কথা, বন প্রেমের কথা এসেছে। এগুলো তাঁর কবিধর্মের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতায় আছে ক্ষুরধার ব্যঙ্গ। চলিত ভাষার স্বচ্ছন্দ ব্যবহারকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩) একজন ব্যতিক্রমধর্মী কবি। তিনি বাংলা কবিতাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর জীবনানন্দ দাশের মধ্যে স্বতন্ত্র একটি কাব্য মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

আলোকরঞ্জন দাশের জন্ম ১৯৩৩ সালে। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য ও বাংলা ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি জার্মানির হাইডেল বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেছেন। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ও জার্মান ভাষাতেও তাঁর কিছু গ্রন্থ আছে।

কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল : যৌবন বাউল (১৯৬৬), নিষিদ্ধ কোজাগরী (১৯৬৮), রক্তাক্ত বরোফ (১৯৬৯), ঈর্ষার দুহিতা (১৯৭১), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৩), গিলোটিনে আলপনা (১৯৭৭), লঘু সংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে (১৯৭৮), জবাবদিহির টিলা (১৯৮২), দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে (১৯৮৩), দুই বন্ধু (১৯৮৪), এবার চলো বিপ্রতীপে (১৯৮৪), ঝরছে কথা আতস কাঁচে (১৯৮৫), ধনুতে দিয়েছি টঙ্কার (১৯৮৮), নিজস্ব এই মাতৃভাষায় (১৯৯০), মরমীরাত (১৯৯০), আয়না যখন নিঃশ্বাস নেয় (১৯৯১), রক্ত মেঘের স্কন্দপুরাণ (১৯৯৩), নদী ও রাত্রি বণ্টন হয়ে গেল (১৯৯৪), জ্বরের ঘোরে তরাজু কেঁপে যায় (১৯৯৪), এক একটি উপভাষায় বৃষ্টি পড়ে (১৯৯৫), তুষার জুড়ে ত্রিশূল চিহ্ন (১৯৯৬), মুণ্ডেশ্বরী ফেরিঘাট পার হতে গিয়ে (১৯৯৮), ধুলো মাখা ইথারের জামা (১৯৯৯), এখনও নামেনি বন্ধু নিউক্লিয়ার শীতের গোধূলি (১৯৯৯) ইত্যাদি।

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এক স্বতন্ত্র চিন্তা ভাবনার কবি। কবি জীবনানন্দ দাশ কর্তৃক তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবও তাঁর ওপর বিদ্যমান। তিনি তাঁর কবিতায় দুঃখ-বেদনাকে ঠেলে রেখে প্রেম ও সৌন্দর্যকে বরণ করেছেন। হৃদয় আর বুদ্ধির সম্মিলন ঘটেছে তাঁর কবিতায়।

তাঁর কবিতা—

> এই যে ঘুম নিবিড় মাঠ, মুখরা এই নদী
> আমাকে অনায়াসেই ভোলে যদি,
> এখানে গত একুশে আশ্বিন
> শীর্ণ এক টিলায় সারাদিন
> বাটালি দিয়ে যত্নে গাঁথলাম
> ক্ষণপ্রাণ আমার নাম।

'আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত শব্দ সচেতন শিল্পী। শব্দই তাঁর কাছে কবিতা। সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের সঙ্গে কথ্য শব্দকে তিনি অবলীলায় ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতি মানুষ গার্হস্থ্য জীবন মোটামুটি এই হল তাঁর কবিতার বিষয়। অবক্ষয়িত সমাজে বাস করে কবি নিজের আত্মার দিকে তাকিয়ে যতবার ক্লান্ত হয়েছেন ততবারই তাঁর মনে হয়েছে 'জীবন যেন এক প্রগলভতা/মৃত্যু শান্তির জল।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) পশ্চিমবঙ্গের একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবে খ্যাতিমান। তিনি বৈচিত্র্যধর্মী লেখক। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী ছড়া ইত্যাদি রচনা করে তিনি তার বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কবি হিসেবে তিনি সহজ কথায় সহজ ভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম বাংলাদেশে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ পাশ করেন এবং সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। দুশোরও বেশি সংখ্যক বইয়ের তিনি রচয়িতা। সংখ্যায় ও বৈচিত্রে তিনি তুলনাবিহীন। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর কর্মজীবন নিয়োজিত ছিল এবং 'কৃত্তিবাস' কবিতা পত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলো হল : একা এবং কয়েকজন (১৯৫৭), আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি (১৯৬৪), বন্দি জেগে আছে (১৯৫৮), আমার স্বপ্ন (১৯৭২), সত্য বন্ধ অভিমান (১৯৮২), সোনার মুকুট থেকে (১৯৮২), জাগরণ হেমবর্ণ (১৯৮৩), স্মৃতির শহর (১৯৮৩), স্বর্গ নগরীর চাবি, স্মৃতির চাবি, সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে (১৯৮৬), বাতাসে কীসের ডাক শোনে (১৯৮৭), চল যাই (১৯৮৭), হঠাৎ নীরার জন্য (১৯৮৮), নীরা হারিয়ে যেও না (১৯৮৯), দেখা হল ভালোবাসা বেদনায় (১৯৮৯), সুন্দরের মন মাধুর্যের জ্বর (১৯৯১), অন্য আমি (১৯৯২), এ জন্মের দেখাশুনা (১৯৯৪), রাত্রির রঁদেভু (১৯৯৫), মন ভালো নেই (১৯৯৬), সেই মুহূর্তে নীরা (১৯৯৭), সবচেয়ে সেই মধুর শব্দ (১৯৯৭), এসেছি দৈব পিকনিকে (১৯৭৭), ভালোবাসা খণ্ড কাব্য (২০০১) ইত্যাদি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রোমান্টিক মনমানসিকতা সম্বলিত আধুনিক কবি। 'নীরা' নামের একটি চরিত্র তাঁর কাব্যের প্রেরণার উৎস বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। নীরার চোখের দিকে তাকিয়ে কবি চিরন্তন নারীকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। স্বপ্নের জগত, স্মৃতির জগতে বিচরণের সঙ্গিনী নীরা। তাই নীরা কবির কবিতা রচনা ও কর্মের প্রেরণা। নীরার প্রেম কবিকে নির্বিশেষ প্রেমের দিকে নিয়ে যায়। কবি লিখেছেন,

> প্রত্যেক অণুতে নারী, নারীর ভিতরে নারী,
> শূন্যতায় সহাস্য সুন্দরী,
> তুমিই গায়ত্রী ভাঙা মনীষার উপহাস, তুমি যৌবনের
> প্রত্যেক কবির নীরা, দুনিয়ার সব ধাপাধাপি, ক্রুদ্ধ লোভ
> ভুল ও ঘুমের মধ্যে তোমার মাধুরী ছুঁয়ে নদীর তরঙ্গ
> পাপীকে চুম্বন কর তুমি, তাই দ্বার খুলে স্বর্গের প্রহরী।

'সুনীলের কাব্যে প্রেম রূপ এবং রূপান্তরের মধ্যে বিধৃত। তাঁর প্রেম রামধনু আকাশের মত নানা রঙে নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে— দেহ পেয়েছে দেহাতীতের বর্ণালী। নীরাকে কেন্দ্র করে তিনি চিরন্তন নারী প্রেমে ডুব দিয়েছেন। নীরা কবিকে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সর্বত্র নিয়ে গেছে। নীরা কবির সর্বাতিশায়ী আধুনিক প্রেম কাব্যের নায়িকা।'

আধুনিক বাংলা কবিতার কবিগণের সহযাত্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবির রোমান্টিক মনমানসিকতা তাঁকে রোমান্টিক কবি করে তুলেছে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। তিনি জীবনপ্রেমিক কবি।

সমালোচকের মতে, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রাণ এবং প্রচণ্ড গতিবেগ। যেকোন প্রাণশক্তিতে ভরপুর। যে কোন কাব্যগ্রন্থ দুর্বার গতিবেগ সম্পন্ন। তিনি যত প্রসারিত হচ্ছেন সামনের দিকে, ততই তাঁর কবিতা থেকে সরে যাচ্ছে সেই যুব নায়ক, সেই উৎকণ্ঠাময় আমি, প্রতীক্ষাময় কিংবা প্রেমময় আমি।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা সহজ সরল আর আছে রহস্যময়তা। তাঁর কবিতা হৃদয়কে যত দোলায়, ভাষাকে তার চেয়ে বেশি নাড়া দেয়।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

অমিতাভ দাশগুপ্ত (১৯৩৫-২০০৭) সংকটাপন্ন সমকালীন সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বপ্নময় জীবনের প্রত্যাশা করেছেন। তিনি প্রকৃত সাম্যবাদী কবি। তাঁর প্রত্যাশায় চিৎকার নেই, আছে গভীর বিশ্বাসের সংগ্রামময় শিল্পী সত্তা। স্বপ্ন, সংগ্রাম, আর সুস্থ সমাজ তৈরি—এসব নিয়েই তাঁর কবিতা।

অমিতাভ দশগুপ্ত পেশাগত দিক থেকে ছিলেন বাংলার অধ্যাপক। জীবন যাপন করেছেন বিভিন্ন কয়লাখনি এলাকায়। সেই সুবাদে তিনি সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষের জীবন-পদ্ধতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের কথাই প্রধানত তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থগুলো হল : সমুদ্র থেকে আকাশ (১৯৫৭), মৃত শিশুদের জন্য টফি (১৯৬৪), মধ্যরাত ছুঁতে আরও সাত মাইল (১৯৬৭), নির্বাচিত কবিতা (১৯৭৪), মৃত্যুর অধিক খেলা (১৯৮৭), আগুনের ডালপালা (১৯৮৪), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৬), বারুদ বালিকা (১৯৮৮), আমাকে সম্পূর্ণ করে নাও। (১৯৯২), এসো স্পর্শ করো (১৯৯৩), কয়েকটি কবিতা (১৯৯৪), ছিন্নপত্র নয় ছেঁড়াপাতা (১৯৯৫), কবিতা (১৯৭৭), আমার নীরবতা আমার ভাষা (১৯৯৮), একশো প্রেমের কবিতা (১৯৯৮), জলে লেখা কবিতার নাম (১৯৯৯), এসো রাত্রি এসো হোম (২০০০), নীল স্বরস্বতী (২০০১), এত যে পাতাল খুড়ছি (২০০১), অগ্নিবিষয়ক সতর্কতা (২০০১), দ্রাবিড় শবরী (২০০২), উজ্জ্বল ফোয়ারার আনন্দ (২০০২) ইত্যাদি।

অমিতাভ দাশগুপ্ত মানুষের জন্য কবিতা লিখেছেন। কৃষক শ্রমিকের বাস্তব সমস্যা সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কবিতায় ওঠে এসেছে। কবি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে কখনও পরিহার করেননি। তাই শোষণ, বঞ্চনা ও প্রতিবাদের চিত্র তাঁর কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারী শোষণের চিত্র তাঁর কবিতায় এসেছে এভাবে—

গাঁ থেকে এসেছে চাষার ঝিয়ারি
ফুটপাতে পাল পাল
জানে না কোথায় কার পাশে শুলে
হাত ভরে মেলে চাল।

গণেশ বসু

সাম্যবাদী কবি হিসেবে গণেশ বসু (১৯৪৬) পরিচিত। তাঁর কবিতায় প্রেমের অনুভূতি ও সমাজ সচেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে। পেশাগত দিক থেকে তিনি ছিলেন অধ্যাপক। সেই সঙ্গে বাংলা কবিতায় তাঁর কিছু অবদান রয়ে গেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হল : বনানীকে কবিতাগুচ্ছ, নিজের মুখোমুখি, রক্তের ভিতরে রৌদ্র, অধিকার রক্তের কবিতায় (১৯৬৯), বাঘের থাবার নিচে, নীরব সন্ত্রাস (১৯৯৯) ইত্যাদি।

গণেশ বসুর কবিতায় নারী এসেছে প্রেমিকারূপে। 'বনানী' তাঁর ভালবাসার রমণী। তাকে কেন্দ্র করেই ভালবাসায় তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। কবির মনে রয়েছে সমকালীন চেতনা। সেখানে সমাজের বিপর্যয় কবি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তা নিরাময়ের স্বপ্ন দেখেছেন। কবি মনে করেন, পুঁজিবাদী সমাজকে ধ্বংস করে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলে কখনই শান্তি আসবে না। কবির বিশ্বাস একমাত্র সাম্যবাদী সমাজেই মানবতার জয় সম্ভব।

সমকালীন ঘটনা নিয়েও কবিতা লিখেছেন এই কবি। উনিশ শ পয়ষট্টি সালে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ঘটনাটি তাঁর কবিতার উপজীব্য হয়েছে। সেখানে কবি স্বদেশের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছেন। আবার সমাজ ও মানুষের জন্য কবির যে দায়বদ্ধতা রয়েছে সে কথাও তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে। সন্ত্রাসের প্রতি কবির বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। কবি বলেছেন,

'সন্ত্রাসের থেকে ফের জন্ম নেয় আরেক সন্ত্রাস।'

জয় গোস্বামী

জয় গোস্বামী (১৯৫৪) সত্তর দশকের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। তাঁর কবিতা জনগণের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। ছন্দের কারুকাজে শিল্প কর্ম হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতা। একদিকে রোমান্টিকতা যেমন তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে, অন্যদিকে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

জয় গোস্বামীর জন্ম কলকাতায়। একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে কবিতাকেই জীবনের নেশা করে তুলেছেন। 'দেশ' পত্রিকার কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও অনবরত কবিতা লিখে গেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থগুলো হল : ক্রিসমাস ও ঝাউপাতা (১৯৭৭), প্রত্নজিৎ (১৯৭৮), উন্মাদের পাঠক্রম (১৯৮৬), আলেয়া হ্রদ, ভুতুম ভগবান, ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা (১৯৯৬), আজ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো (১৯৯১)।

জয় গোস্বামীর কবিতায় অপ্রচলিত শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। সেই সঙ্গে আছে প্রতীক চিত্রকল্প। তবে এতে তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। রূপনির্মিতির অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর আছে, তেমনি তিনি ভালবাসেন কবিতা দিয়ে ছবি আঁকতে। কবিতা রচনার বেলায় তিনি যুগ যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেননি। আধুনিক জীবনের নানা

বিপর্যয়কে তিনি কাব্যের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অনেক সময় কবিতা তাঁর জীবন সংগ্রামের অস্ত্র হয়ে ওঠে। গতানুগতিক জীবন যাপনের বাইরে তখন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তা কবিতায় রূপ দেন।

জয় গোস্বামী কবিতার ভাষা, শব্দ, ছন্দ অর্থাৎ কবিতার আঙ্গিক নিয়ে নতুন, নতুন পরীক্ষা করে চলেছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৫৫) প্রধান পরিচয় রাজনীতিবিদ হিসেবে। তিনি বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, তথ্য ও সংস্কৃতি পার্বত্যাঞ্চল বিষয়ক, কৃষি, বিদ্যুৎ, কর্মী ও প্রশাসনিক, সংখ্যালঘু কল্যাণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগেরও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। তিনি একজন বাগ্মী রাজনীতিবিদ। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তিনি দুইবার রেল, একবার কয়লা মন্ত্রকের এবং একবার মানব সম্পদ উন্নয়ন, যুব, ক্রীড়া, নারী ও শিশু কল্যাণ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি কিছু সাহিত্য সাধনা করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার হাজরা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে কলকাতার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজ অব ল থেকে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করার পর সংসার চালনার জন্য কিছুকাল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন।

এমন ব্যস্ততার মধ্যেও সময় পেলেই সাহিত্যের জন্য কলম ধরেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থগুলো হল : 'মা', 'জন্মাইনি', 'সরণী', 'লাঙল মাটি মানুষ' ইত্যাদি। ছোটদের জন্য লিখেছেন— 'ছোটদের আজব ছড়া', 'শিশু সাথী।'

তাঁর অন্য গ্রন্থগুলো হল : 'জনতার দরবার', 'ক্রোকোডাইল আইল্যান্ড', 'তৃণমূল', 'অশুভ সংকেত', 'একান্তে', 'জাগো বাংলা', 'গণতন্ত্রের লজ্জা', 'অনশন কেন', 'অনুভূতি, আন্দোলনের কথা' ইত্যাদি। 'বাস্তব অভিজ্ঞতা, ব্যক্তি মমতার কৈফিয়ৎ এবং শিল্পী মমতার মানসিকতা যথাযথ প্রকাশিত হয়েছে রাজনৈতিক মমতার গ্রন্থে।'

গ্রন্থপঞ্জি

লেখক	গ্রন্থ
অজিতকুমার ঘোষ	বাংলা নাটকের ইতিহাস
ড. অধীর দে	আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা
ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,
	ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য
ড. আনিসুজ্জামান	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য
	মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র
	পুরোনো বাংলা গদ্য
	স্বরূপের সন্ধানে
	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (সম্পাদিত)
ড. আশরাফ সিদ্দিকী	লোকসাহিত্য
ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস
	বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস
	বাংলার লোকসাহিত্য
অরবিন্দ পোদ্দার :	বঙ্কিমমানস
ড. আহমদ শরীফ :	বিচিত চিন্তা
	পুঁথি পরিচিতি,
	মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ
	বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য
ড. ওয়াকিল আহমদ	বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
	বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত
	বাংলার লোকসংস্কৃতি
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	বাংলার বাউল ও বাউল গান
ড. কাজী আবদুল মান্নান	আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা
গোপাল হালদার	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা
ড. গোলাম সাকলায়েন	বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য
ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়	আধুনিক বাংলা কাব্য
ড. দীনেশচন্দ্র সেন	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী	আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়
নীলরতন সেন	বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়

ড. নীলিমা ইব্রাহীম : উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক
বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা
প্রমথনাথ বিশী : বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক
ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা
মাহবুবুল আলম বাংলাদেশের সাহিত্য
মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
সৈয়দ আলী আহসান
ড. মুহম্মদ এনামুল হক মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য
ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য
মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : বাংলা সাহিত্যের কথা
ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : আধুনিক বাংলাকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র, বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা
মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরী : বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি
ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের একদিক
শামসুল হক : বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী
ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
সজনীকান্ত দাশ : বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস
সরদার ফজলুল করিম : আমাদের সাহিত্য
ড. সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
বাংলা সাহিত্যে গদ্য
ইসলামি বাংলা সাহিত্য
সুখময় মুখোপাধ্যায় পুরাতন বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা
হুমায়ুন কবির বাঙলার কাব্য